জীবনানন্দ দাশ

রচনাবলী

জীবনানন্দ জন্ম-শতবর্ষ সংস্করণ

জীবনানন্দ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
-সম্পাদিত

গতিধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশক
সিকদার আবুল বাশার
গতিধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সিকদার আবুল বাশার

পরিবেশক
বইপত্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটারস্
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
আল মদিনা প্রিন্টিং প্রেস
১১ বাসাবাড়ী লেন, তাঁতীবাজার
ঢাকা ১১০০

মূল্য

অফসেট ৪৫০ টাকা

ISBN 984-461-89-X

সূচীপত্র

জীবনানন্দ দাশ, তাঁর কবিতা

জীবনানন্দ দাশের আদি বাড়ি পদ্মাপারে, এখন পদ্মাগর্ভে, বিক্রমপুর গাউপাড়া গ্রাম, সেখানে তাঁদের বাড়ি মুনশি বাড়ি বলে পরিচিত ছিল। তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাস (১৮৩৮–১৮৮৫) সরকারি অফিসে কর্মরত পিতৃব্যের কাছে থেকে বরিশাল জেলা স্কুলে পড়তে আসেন, প্রবেশিকা পাশ করার পর এখানেই সিভিল কোর্টে চাকুরি নেন, স্বগ্রামের তারিণীচরণ সেনের কন্যা প্রসন্নকুমারীকে বিবাহ ক'রে হরিচরণ দুর্গামোহন দুই পুত্র জন্মের পর ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে এখানেই স্থায়ী বসতি করেন। এখানে এসে তাঁর স্ত্রী–পুত্রও ব্রাহ্ম হন, দুর্গামোহনের নতুন নাম হয় সত্যানন্দ। সত্যানন্দ লিখেছেন, 'পরে আমার ভ্রাতাদের নামে ও তাঁহাদের পুত্রদের নামকরণে "আনন্দ" শব্দ যুক্ত হইয়াছে।' হরিচরণ পরিজনদের কাছে দেশের বাড়িতেই থেকে যান, পিতার মৃত্যুর পর তিনিও ব্রাহ্ম হয়ে ভাইদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলেন।

বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম যুগে সর্বানন্দ নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি ছিলেন আজীবন সম্পাদক, শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন 'The energetic Secretary of the Samaj for many years' ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্টডীডের পাণ্ডুলেখ্য তাঁর নামে প্রকাশিত, ব্রাহ্ম মন্দিরের অন্যতম ট্রাস্টিও হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে'র ১৮৭৭ খণ্ডে বরিশাল থেকে বাবু জগৎবন্ধু লাহা জানিয়েছেন, আচার্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও সম্পাদক সর্বানন্দ দাস 'to both or these gentlemen the Brahmo Samaj of Barisal is deeply indebted'। গিরিশচন্দ্র ও সর্বানন্দ ছিলেন 'বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণস্বরূপ ও যুগল বন্ধু।' ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা হলেও গিরিশচন্দ্রের স্ত্রী মনোরমা তার আচার্য ও প্রসন্নকুমারী সম্পাদিকা হন। কলকাতায় কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মনামকীর্তনের প্রচলন করলে বরিশাল সমাজে তার প্রভাব পড়ে, সে সময়ের ভক্ত ব্রাহ্ম কীর্তনপ্রিয় অশ্বিনীকুমার দত্তের বন্ধু সতীর্থদের মধ্যে সর্বানন্দ ছিলেন প্রধান । কীর্তন সমাবেশের এক স্থান ছিল লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ি, অশ্বিনীকুমার তার নাম রেখেছিলেন 'মুক্তি মণ্ডপ', আর–এক স্থান সর্বানন্দের বাসাবাড়ি। 'রাজার বাড়ির পূর্ব দিক এবং ভুঁইয়ার বাসার দক্ষিণ দিকে' এই বাসাবাড়িতেই সর্বানন্দের অপর পুত্রকন্যা এবং জ্যেষ্ঠ পৌত্র জীবনানন্দের জন্ম। মালিকানা হস্তান্তর হয়ে গেলে পরে বরিশালের পশ্চিম সীমানায় অক্সফোর্ড মিশনের কাছে বগুড়া রোডের পশ্চিমে ব্রাহ্মপল্লীতে তাঁর পুত্রেরা পিতার স্মৃতিতে 'সর্বানন্দ ভবন' নাম দিয়ে নতুন বাড়ি করে উঠে আসেন।

কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজে মতভেদ দলভেদ কালে বরিশাল সমাজ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংযুক্ত হয়েছিল। তখনকার লাখুটিয়ার ব্রাহ্ম জমিদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির। ফ্লোটিলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুলনা–বরিশাল লাইনে স্বদেশি জাহাজ চালানোর ব্যবসায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অংশীদার ছিলেন রাখালচন্দ্র। দুই পরিবারে কুটুম্বিতাও হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথ রাখাল রায়চৌধুরীর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে সুশীলা ও চারুবালার সঙ্গে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মে উপবীত গ্রহণ করে পরিণীত হন। চারুবালার বিবাহে বরপক্ষীয় হয়ে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, উপবীত ধারণ নিয়ে স্থানীয় ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁদের মনান্তর হয় (নভেম্বর ১৮৮৫), কিন্তু কথিত আছে প্রসন্নকুমারীর হাতের পিষ্টকাদি খেয়ে তাঁরা পরিতোষ লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা মীরারও বিবাহ হয় বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী আচার্য বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আদি সমাজের পদ্ধতিতে (জুন ১৯০৭)। সে ক্ষেত্রেও স্থানীয় ব্রাহ্মেরা উপবীত গ্রহণ অনুমোদন করেন নি, বামনচন্দ্র উপাচার্য পদ থেকে অপসৃত হন।

চারুবালার বিবাহের অল্প দিন মধ্যেই মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে ওলাউঠায় সর্বানন্দের মৃত্যু হয় (ডিসেম্বর ১৮৮৫)। বরিশাল শহরে ধর্ম শ্রেণী নির্বিশেষে অভূত শোকযাত্রা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুতে। কলকাতা 'তত্ত্বকৌমুদী' কাগজে 'বিশ্বাসীর পরলোকগমন' নামে শোকসংবাদে লেখা হয়েছিল, তিনি 'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধর্মান্দোলন সমাজসংস্কার নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য অবিশ্রান্ত খাটিয়া আপনার জীবনের অভিনয় শেষ করিলেন। তাই আজ তাঁহার জন্য সমস্ত বরিশাল নগরী শোকসন্তপ্ত এবং আজ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান সকলে সমস্বরে তাঁহার গুণগান করিতেছে...' (সংখ্যা: ১৬

ফাল্গুন ১৮০৭ শক)। মৃত্যুকালে তাঁর প্রথম দুই পুত্র কলকাতায় মেসে থেকে এফ. এ. পড়ছেন, শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং সেখানে তাঁদের সান্ত্বনা করতে গিয়েছিলেন।

সর্বানন্দের ব্যাপক জনপরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন সেবাব্রতী, নানা কর্ম-নিপুণ, স্থানীয় ছোটো আদালতের হেডক্লার্ক হিসেবেও কর্মস্থলে তাঁর সুনাম ছিল। নিজ বাড়িতে তিনি একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় করেছিলেন, স্থানীয় স্ত্রী শিক্ষার সেটি দ্বিতীয় উদ্‌যোগ (ব্রাহ্মদের প্রথম মেয়ে স্কুল সাধারণের অনুৎসাহে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল), সরকারি সাহায্য লাভ করে সর্বানন্দের স্কুল মধ্য ইংরেজি স্কুলে উন্নীত হয়. তাঁর বাসাবাড়ির এককোণেই খড়ের চালের ঘরে তার কাজ চলতে থাকে। বরিশাল মিউনিসিপাল ইলেক্‌শনেও একবার 'সর্বজনবিদিত অশ্বিনীকুমারকে অতিক্রম ক'রে সর্বানন্দ কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সর্বানন্দের মৃত্যুর পর অশ্বিনীকুমার অভিভাবকহারা পরিবারে সহায় হয়েছিলেন, যদিও প্রায় তখনই ব্রাহ্ম সমাজ থেকে তাঁর অন্তর শুরু হয়েছে, ধর্ম থেকে শিক্ষা, শিক্ষা থেকে স্বদেশির পন্থী হয়ে উঠেছেন তিনি ক্রমান্বয়ে।' ভক্তিযোগ' থেকে অশ্বিনীকুমারের যাত্রা বিবেকানন্দ প্রাণিত 'কর্মযোগে', ভক্তিগীতি থেকে অগ্নিময়ী 'ভারতগীতি'তে। 'সত্য প্রেম শুদ্ধি'র আদর্শে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পুরোনো মান্য সরকারি স্কুলের পাশে, তার পর কলেজ (পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে বি. এম. স্কুল ১৮৮৪, বি. এম. কলেজ ১৮৮৯)। কংগ্রেসে যোগ দিলেন তিনি, ত্রাণ বয়কট স্বদেশিতে জড়িয়ে পড়লেন, গ্রেফতার হলেন, নির্বাসিত হলেন । তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কলেজে শিক্ষা বা শুদ্ধির পরেও তবু স্বদেশির একটি গূঢ় কর্মকাণ্ড ছিল বহু দিন। 'অগ্নিকাণ্ডে কেহ সর্বস্ব খোয়ায়, দাঁড়ায়ে রব না পুতুলের প্রায়'— স্কুলের এই আরম্ভিক প্রার্থনা-গান থেকেই যেন তার দীক্ষা। বি. এম. স্কুল ন্যাশনাল স্কুল হয়েছিল পরে, ১৯২১ এ।

জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাস (১৮৬৩-১৯৪২) বি. এ. পাশ করে এই ব্রজমোহন স্কুলেই শিক্ষক রূপে যোগ দেন, কালক্রমে সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন, ১৯২১এ বি. এম. স্কুল ছেড়ে মডেল স্কুলে যান প্রধান শিক্ষক হয়ে। তার পরেও তিনি ছিলেন অনবসিত শিক্ষাব্রতী 'with whom teaching was a passion' জীবনানন্দ তার প্রথম বয়সের স্মৃতি থেকে লিখেছেন, 'বাবাকে কেন্দ্র করে, বি. এম. স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছেলেদের এক উন্মেষধর্মী সংঘ গড়ে উঠেছিল। যেখানে সাহিত্যিক নৈতিক রাষ্ট্রিক আলোচনারও প্রসার ছিল, কিন্তু তিনি প্রচলিত nationalism ও স্বদেশ প্রীতির পার্থক্য অনুভব করতেন... জোর দিয়েছিলেন তিনি চরিত্র ও চেতনাশুদ্ধির উপর।' স্বদেশব্রতীও তখন চরিত্র ও চেতনাশুদ্ধির শর্তবদ্ধ, রজস্তমঃ ছেড়ে সত্ত্ব আশ্রয় করার উপদেশ দিয়েছেন অশ্বিনীকুমারও। কিন্তু তাঁদের ভিন্ন পথ।

শিক্ষার বাইরে পরিধি ছিল সত্যানন্দেরও। ছাত্রাবস্থাতেই বরিশাল ছাত্র সেবা দল ও তার মুখপত্র 'স্বদেশী' পাক্ষিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজেও তিনি সম্পাদক হন, উপাচার্যও হন। বাংলা শেখানো, প্রার্থনাপুস্তকের অনুবাদ ইত্যাদি সূত্রে অক্‌স্‌ফোর্ডে মিশনের সাধুদের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। মনোরঞ্জন গুহের সঙ্গে 'সহযোগী' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে বের করেন 'ব্রহ্মবাদী'। ১৩০৭এর বৈশাখ থেকে 'ডিমাই ২০ পৃষ্ঠা পূর্ণ' এই 'ধর্ম নীতি শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' বরিশাল আদর্শ প্রেস থেকে ছেপে তাঁরই বাড়ি থেকে বের হতে থাকে। সাত বছর পর সম্পাদকতা ত্যাগ করলে পত্রিকার স্বত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর শ্যালক মনোমোহন চক্রবর্তী।

ধর্ম নীতি শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ে সত্যানন্দ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন 'ব্রহ্মবাদী'তে, কলকাতার 'তত্ত্বকৌমুদী', *Indian Messenger*এ, 'প্রবাসী'র মতো প্রসিদ্ধ পত্রিকায়। সে সব লেখা সংকলিত হলে 'একখানি সুচিন্তিত ব্রাহ্ম সাহিত্য হইবে' বলেও অভিমত লক্ষ্য করা গেছে। ব্রাহ্মমণ্ডলীরই অভিমত, তার কারণ সত্যানন্দের জীবনকালে ব্রাহ্ম সমাজের হ্রাস হয়ে চলেছিল, ১৯২৭এর এক তথ্যে পাওয়া যায় বরিশালে 'আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা বর্তমান সময়ে বারো-তেরোটি মাত্র' এবং 'দীক্ষা গ্রহণ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।' এই ক্ষীয়মাণ স্থানটুকু একভাবে তাঁর অবলম্বন ছিল। দুটি পূরক অবধারণ উল্লেখ করি পাশাপাশি। জীবনানন্দ তাঁর শোকার্ঘ্যে লিখেছেন, শিক্ষাব্রতের পুনরুক্তি-অত্যুক্তির হাত থেকে তাঁকে 'সংযম ও মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করেছিল তাঁর ধর্ম-জীবন।' আর 'তত্ত্বকৌমুদী' তাঁর পারলৌকিক বিবরণে লেখেন, 'বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণস্বরূপ হইয়া সাপ্তাহিক উপাসনা, বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়া তিনি ইহাকে সজীব রাখিয়াছিলেন।' (দ্র· 'তত্ত্বকৌমুদী' ১ পৌষ ১৮৬৪ শক।) সে সমাজ জীর্ণ হয়ে যাবার পর সত্তর পার হয়ে চলা গ্রন্থিহীন নিঃসঙ্গ মানুষটির অন্তরঙ্গ ছাপটুকু দেখা যায় জীবনানন্দের উপর্যুপরি গল্পে-উপন্যাসে, যিনি অপ্রবাসী হয়েও চারি পাশের আশা-সম্ভাবনার ভিতর আবছায়া দেশের বাড়িতে একাধিক্রমে সত্তর বছর কাটানো বড়ো কঠিন জিনিস বলে বোধ করেন, তবুও 'আজকালকার

নানারকম নবীন-তরুণ মানুষদের মধ্যে তিনি এমন একজন সাবেকি লোক যিনি চলে গেলে আমাদের পরিবারের শাখায়-প্রশাখায় কেউ কোথাও তাঁর স্থান পূর্ণ করতে পারবে না' বলে মনে হয়।

সাত পুত্র চার কন্যা সর্বানন্দের। সত্যানন্দের অপর ভাইবোনদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিচরণও শিক্ষকতা করতেন, 'সর্বানন্দ ভবন' বাড়ি নির্মাণে তাঁরই যত্ন ও শ্রম সমধিক ছিল বলে সত্যানন্দ জানিয়েছেন। তৃতীয় যোগানন্দ চাকুরিয়া ছিলেন আবগারি বিভাগে, বাড়ির 'সর্বানন্দ ভবন' নাম তাঁর দেওয়া। চতুর্থ প্রেমানন্দ সিভিল সার্জেন ছিলেন পুরীতে, তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন, তাঁর পুত্র অমলানন্দও ডাক্তার—কটকে জয়ন্ত রাও—সুখলতা রাওয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। পঞ্চম অতুলানন্দ বনবিভাগের ডেপুটি কনজার্ভেটর, ডিব্রুগড়ে কর্মস্থল, তাঁর শিকারের কথা আছে অশোকানন্দ দাশের জীবনানন্দস্মৃতি লেখাতে। ষষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ চা বাগানের ব্যবসায়ী, কলকাতা 'জলযোগে'র প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর জামাতা চিদানন্দ দাশগুপ্ত জীবনানন্দ সম্বন্ধে একখানি ইংরেজি বই লিখেছিলেন সত্তরের দশকে। সপ্তম জ্ঞানানন্দ নানাভাবে স্থানীয় সমাজের সংযুক্ত। চার ভাইকেই বাইরে থাকতে হত কর্মব্যপদেশে। তাতেও বৃহৎ একান্ন পরিবার। জীবনানন্দ লিখেছেন,'পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে আমাদের বরিশালের বাড়িতে লোকসংখ্যা অনেক ছিল, জেঠিমা ও মাকে সারা দিন গৃহস্থালির কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি।' জেঠিমা হরিচরণের স্ত্রী। প্রসন্নকুমারীও জীবিত ছিলেন ছিয়াশি বছর, প্রথম পৌত্রের বিবাহ দেখে যাওয়ার সাধ তাঁর পূর্ণ হয়েছিল, জীবনানন্দের বিবাহের মাসাধিক কাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। বোনেরা ছিলেন। বড়ো প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয় পাঞ্জাববাসী ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে। সেজো বিনোদার মৃত্যু হয় অকাল বয়সে। বিবাহের পরেও দ্বিতীয় বোন প্রেমদা সম্ভবত সর্বনান্দ ভবনেই থেকে যান। ছোটো বোন স্নেহলতা চিরকুমারী, বাবার প্রতিষ্ঠিত সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। সে স্কুল ছেড়ে শেষ জীবনে 'বালিকা শিক্ষালয়' নাম দিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল করেন বাড়ির হাতার ভেতর, জীবনানন্দের মাও যুক্ত ছিলেন সেখানে। জীবনানন্দের বরিশালের এক ছাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দীনের লেখায় উল্লেখ আছে স্কুলটির। 'বাড়ি তাঁর একটা মেয়ে ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে', জীবনানন্দের বাড়ির কথাতে তিনি লিখেছেন। আগের স্কুল সূত্রে ১৯১৫ সালের ছাত্রী শান্তিসুধা ঘোষের বিবরণ এইরকম:

'বরিশাল শহরে তখন মেয়েদের জন্য এই একটিমাত্র বড়ো ইস্কুল... মধ্য ইংরাজি স্কুল। ...১৯১৫ সালের বরিশালে এইটিই নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র! স্কুলটির প্রতিষ্ঠাত্রী একজন ব্রাহ্ম মহিলা শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস। তাঁকেই আমরা হেডমিস্ট্রেস্ রূপে দেখলাম। ছোটোখাটো মানুষটি, চলাফেরায় বসনেভূষণে একান্ত শাদাসিধে, বলতে কি ভূষণ তাঁর অঙ্গে কোনো দিনই দেখি নি, বসনের মধ্যে শেষ দিন পর্যন্তই দেখেছি পুরো আস্তিনের শাদা আদ্দির ব্লাউজ ও কালো সরু পাড়ের শাড়ি, যাকে ধুতি বললেই চলে। দেখলে মনে হয় বিধবা, কিন্তু তিনি অবিবাহিতা, আজন্ম ব্রহ্মচারিণী... স্বল্পভাষী, সদাপ্রসন্ন, শান্ত, স্নেহময়ী।'

স্নেহলতা তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের সিলেবাস অনুসারে তিন খণ্ড 'রন্ধন-শিক্ষা' বই লিখেছিলেন (কলকাতা স্টুডেন্ট লাইব্রেরি প্রকাশিত), কবি কামিনী রায় তার ভূমিকা লিখে দেন। জীবনানন্দের উত্তরপর্ব সময়ের এই বাড়ির অনেক আদল ছায়া উত্তাপ পাওয়া যায় তাঁর নানা গল্পে-উপন্যাসে।

জীবনানন্দের মাতামহ চন্দ্রনাথ দাস এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ কালীমোহন দাসও পুরাতন বরিশাল সমাজের ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁদের বাড়ি গৈলা। কালীমোহন ছিলেন সমাজের প্রথম প্রচারক, চন্দ্রনাথ স্বভাবকবি—সরস পদ বাঁধতে দড়ো (পরে 'হাসির গান' নামে তাঁর কতকগুলি গান বইয়ে সংকলিত হয়, ১৩১৪)। দুই ভাইই বিপত্নীক। চন্দ্রনাথের বাসা ছিল আলেকান্দায়, তিনি জজ কোর্টে চাকুরি করিতেন। তাঁর চার ছেলেমেয়ের একটি পুত্র, প্রিয়নাথ, সাব-ডেপুটি কালেক্টর হয়ে পরে কৃষ্ণনগরে বাড়ি করেন, সেখানেই চন্দ্রনাথ শেষ জীবন কাটিয়েছেন। প্রিয়নাথের সঙ্গে জীবনানন্দের দুই ভাইয়ের অতি আন্তরিক সম্বন্ধ ছিল, আর কোনো পরিজনের কথাই তাঁদের বিবরণ থেকে এত সবিস্তারে জানা যায় না। অশোকানন্দ লিখেছেনঃ

'বড়োমামা ছিলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে। নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী। আমরা দু ভাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। আমরা যখন খুব ছোটো ছিলাম—যখন সাঁতার শেখা হয় নি—বড়োমামা আমাদের পিঠে নিয়ে দিঘির জলে সাঁতার কাটতেন, ভয় ভাঙাবার জন্য। বড়োমামা শিশুদের বন্ধু ছিলেন। তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের একজন হয়ে গল্প করতে,ভালোবাসতেন বড়োমামা। নানা বিষয়ের পুস্তক পাঠে অনুরাগ ছিল দাদার ছোটোবেলা থেকেই। তাই বড়োমামা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, গল্প বলতেন। মামাবাড়িতে যখন যেতাম, রাত্রিতে আঙিনার উপর মাদুর পেতে আকাশের তারার সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিতেন মামা। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অতি ছোটো বয়সেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল মামার কল্যাণে। মামা যখন নৌকায় করে মফস্বলে যেতেন, আমরাও কখনও কখনও তাঁর সঙ্গী হতাম। এই উপায়ে বরিশালের গ্রাম্য প্রকৃতি, অনেক নদী নালা খালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।'

চন্দ্রনাথের তিন মেয়ের জ্যেষ্ঠা কুসুমকুমারীকে সত্যানন্দ বিবাহ করেন। বিবাহ হয় স্থানীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে ২৩ মে ১৮৯৪ তারিখে, বিবাহে আচার্য ছিলেন গিরিশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্নী ও কন্যা এসেছিলেন বিবাহে। রাখাল রায়চৌধুরীর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ঝামাপুকুর লেনের বাড়িতে থেকে কুসুমকুমারী কলকাতা বেথুন স্কুলে পড়তেন, প্রবেশিকা দেবার পূর্বাহ্নেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর সহজাত কবিত্ব ও রচনা স্ফূর্তির তাতে বাধা হয় নি। আগেই স্থানীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে তিনি প্রবন্ধটি পড়েছেন, বিবাহের কিছু দিন পর 'কবিতা মুকুল' নামে তাঁর কবিতার বই বেরোয়, 'প্রবাসী' 'মুকুল' 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে, এবং অবিরলভাবে মাসে মাসে তিনি লিখেছেন বাড়ির 'ব্রহ্মবাদী' কাগজে। তাঁর পুত্র লিখেছেন, 'ব্রহ্মবাদী'র পৃষ্ঠায় সে সব কবিতা পড়ে স্বভাবকবিদের কথা মনে হত তাঁর, 'আমাদের দেশের লোককবিদের স্বভাবী সহজতাকে।' হয়তো এদিকে কুসুমকুমারী পিতারই পুত্রী, কিন্তু জীবনানন্দ লিখেছেন, তাঁর প্রাপ্য সাহিত্যিক ও কবির গরিমাকে 'অন্তর্দমিত করে রাখলেন তিনি, প্রকাশ্যে কোনো পুরস্কার নিতে গেলেন না।' কিছু সাহিত্য-যশ অবশ্যই তাঁর হয়েছে। তাঁর 'নারীত্বের আদর্শ' প্রবন্ধ সরোজনলিনী স্বর্ণপদক লাভ করেছিল, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বঙ্গের মহিলা কবি' (২য় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬০) গ্রন্থে অন্যূন পনেরো পৃষ্ঠা ব্যাপী লেখা হয়েছে তাঁর পরিচয়।

কুসুমকুমারীর আরেক বোনের কথাও উল্লেখ করতে হয়। চন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ে হেমন্তকুমারীর বিবাহ হয়েছিল মাহিলাড়া গ্রামের রসরঞ্জন সেনের সঙ্গে, ইনি বরিশালে স্বপ্রতিষ্ঠিত বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজ পুস্তিকায় 'বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের ভবিষ্যৎ কার্যভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ আশা রহিয়াছে' বলে উল্লেখ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে জীবনানন্দ তাঁর 'শিক্ষক রূপে উৎকর্ষ' ও 'দুর্লভ পাণ্ডিত্যে'র পরেও 'কী করে জীবনকে যথাযথ বিচার-পদ্ধতির পথে আবিষ্কার করতে পারা যায়— পরিবারে সমাজে ধর্মে রাষ্ট্রে—এই আপ্রাণ সংগ্রাম নিয়ে যুবা বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন জনসাধারণের ভিতরে থেকেও অসামান্য হয়েছিল' বলে পরিচয় দিয়েছেন। রসরঞ্জনের বাণীপীঠ বিদ্যালয় নেপথ্য কেন্দ্রভূমি ছিল বরিশাল স্বদেশী আন্দোলনের।

২

জীবনানন্দের জন্ম ৬ ফাল্গুন ১৩০৫, ইংরেজি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। শৈশবে কঠিন পীড়া হয়েছিল একবার, যকৃতের, স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় মা আর মাতামহ তাঁকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন পশ্চিমে— লখনৌ আগ্রা দিল্লি, হাওয়াবদল করতে। এই ব্যাধির স্থায়ী কুফল হয়েছিল ক্রোধ, রাগলে ' অনেক সময় লঘুগুরু জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।' অশোকানন্দ লিখেছেন, ' উত্তরজীবনে এই ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় না করলেও দমিত করেছিলেন।' ১৯০৮ জানুয়ারিতে জীবনানন্দ বি. এম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর পিতা তখন শিক্ষক। তার আগের পূর্ণ আট বছর ছিলেন প্রকৃতি ও পরিজনের নিঃসপত্ন তত্ত্বাবধানে। সে সময়ের ঈষৎ মাত্র বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর ভাই ও বোনের, বিশেষ অশোকানন্দের স্মৃতিবিবরণে,অশোকানন্দ লিখেছেন, 'দাদা আমার চেয়ে পুরো তিন বছরেরও বড়ো নন। শৈশবে ও কৈশোরে অনেক সময়েই আমি তাঁর সাথী ছিলাম। আমাদের শৈশব অত্যন্ত আনন্দে কেটেছে। বাবা কম বয়সে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার বিরোধী ছিলেন। ছোটোবেলায় আমরা মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি। সে পাঠ খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়। খেলবার, বাগানে বেড়াবার, প্রজাপতির পেছনে দৌড়াবার, ঘুড়ি ওড়াবার প্রচুর অবকাশ ছিল।' পরে অন্যত্র যোগ করেছেন 'এক সঙ্গে হা-ডুডু, কুস্তি,মার্বেল খেলা'র কথা। বাড়ির ছেলেমেয়েদের একত্র প্রাতরাশেরও একটি ছবি দিয়েছেন অশোকানন্দ : 'শীতের প্রভাতে রান্নাঘরের উনুনের পাশে গোল হয়ে বসে... আমরা একান্নবর্তী পরিবারের জ্যেঠতুতো খুড়তুতো ভাই বোনেরা সদ্য তৈরি হাতে গড়া, আগুনে সেঁকা রুটি গুড়ের সঙ্গে পরমানন্দে খেতাম।'

এর পর বাড়ির পরিচারকদের কথা। গাছ বাইতে বেড়া বাঁধতে পারদর্শী অলী মামুদ, সাঁতার আর প্রকৃতি পাঠ শেখা হয়েছিল যার কাছে; জমি নিড়োতে দুধ যোগাতে আসা চাষিবাসি ফকির আর প্রহ্লাদ; কাশীপুর লাখুটিয়ার জঙ্গলের শিকারী মুনিরুদ্দি; মোতির মা যে ঘুম জাগা ছেলেকে পরণ কথা বলত, আর মাছ ধরার গুরু ও সাথী মোতির মার দুই ছেলে। ঠাকুমাও গল্প বলতেন, সে তাঁর পদ্মাপাড়ের

পুরোনো দেশের গল্প, সম্ভবত তাঁর কাছেই সুচরিতা তাঁদের পরীতে পাওয়া পূর্বপুরুষের গল্প শুনেছেন। ঠাকুমার আচার আমসত্ত্ব দেয়ার কথাও জানতে পাই, দু'ভাই ছিলেন তার পাহারাদার।

মার কথা বিশদ করে পাওয়া যায় জীবনানন্দের ছোটোবেলার স্মৃতি-লেখায়: 'মনে পড়ে বরিশালের শীতের সেই রাতগুলো—যখন খুব ছোটো ছিলাম—প্রথম রাতেই চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেত। সংসারের শেষ মানুষটির খাওয়া-দাওয়া হলে তবে মা ঘরে ফিরবেন—কিন্তু যত রাতই হোক না কেন, মা ঘরে না ফিরলে দু চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসলেও ঘুম প্রতিরোধ করে জেগে থাকতে চাইতাম, মা ঘরে এলে তবে ঘুমোব। খুব দেরিতে ঘরে আসতেন; চারিদিকে শীতরাত তখন নিথর নিস্তব্ধ। বাইরে পৃথিবীর অন্ধকার —অঘ্রাণ পৌষের শীত। ভয় পেতাম। কোনো পড়শির বাড়ির থেকে ডাক আসতে পারে,কারু মারাত্মক রোগ হয়েছে, হয়তো কোনো দুস্থ পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের আশ্রয় থেকে, হয়তো কোনো নিম্ন শ্রেণীর লোকের মৃত্যু হয়েছে, হয়তো কোনো অনাথ স্ত্রীলোক বিশেষ কারণে বিপন্ন, হয়তো কোনো প্রতিবেশীর ঘরে ছেলেপিলে হবে— মার কাছে খবর এসে পৌঁছলেই তিনি চলে যাবেন—সারা রাত বাড়িতেই ফিরবেন না হয়তো আর। জেগে বা ঘুমিয়ে একাই পড়ে থাকতে হবে আমাদের। বাইরের থেকে ওরকম কোনো ডাক না এলে মা প্রদীপের পাশে সেলাই করতে বসে যেতেন। হয়তো।কিংবা সমস্ত দিনের শেষে দু-চারটে পত্র-পত্রিকা বই নিয়ে বসে পড়তেন! মায়ের মুখ-চোখের সামনের সেই প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তাম।' গল্পে-গ্রথিত বয়সী দিনের স্মৃতিও এইরকম:

'গভীর রাতে ঘরের ভিতর একবার নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চার শুনি। শুপুরি কাটার শব্দ। গুনগুন করে খানিকটা গান; বুঝি মা সারা দিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরছেন; এমনি করে চৌত্রিশ বছর দেখলাম ...'।

স্কুলে ভালো ছাত্র ছিলেন জীবনানন্দ। কল্যাণকুমার বসু লিখছেন, তাঁর এক সহপাঠী হরিজীবন ঘোষের সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা ছিল, 'সারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় জীবনানন্দ হরিজীবনের থেকে এগিয়ে থাকেন সর্বদাই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে।' নানা বিষয়ের বই পড়তে ভালোবাসতেন, রামায়ণ মহাভারত, মনে হয় কৃত্তিবাসী কাসীদাসী বই ('আদি গ্রন্থ আজকালকার সংস্কৃতি সভ্যতার বিরাট ইংরেজায়নের দিনে প্রায় সকলের কাছেই অগম্য।' দ্র 'কী হিসেবে শাশ্বত' কবিতার কথা) অনেকবার করে পড়েছিলেন। 'বাবা প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার করে বইয়ের দোকানে নিয়ে যেতেন,' অধীর আগ্রহ থাকত সে দিনের জন্য। উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকে দেখা গিয়েছিল 'কাব্যে অনুরক্তি', ওয়ার্ডসোয়র্থ ও ব্রাউনিংয়ের কাব্যসংগ্রহ ছিল বাবার, এ ছাড়া বায়রন কীট্স্ শেলি ও সুইনবর্ণের কাব্যসংগ্রহের 'দু'খানা দাদা স্কুলের প্রাইজে পেয়েছিলেন এবং দু'খানা নিজে কিনেছিলেন'। হয়তো আরো বই: 'নানারকম ইংরেজি বই, হাক্সলি, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডিকেন্সের সম্পূর্ণ সেট' বাবা কিনে দিয়েছিলেন স্কুলে পড়ার দিনেই, গল্প পড়ে মনে হয়। অশোকানন্দ লিখেছেন, স্মারা স্কুল-জীবনে তাঁর 'অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল।... মাস্টারমশাইদের প্রিয় ছিলেন। নিজেদের বাড়ির মাঠেই ফুটবল খেলা হত, ক্রিকেট খেলা হত। তাস খেলার আসর বসত।... উঁচু ক্লাসে পড়বার সময় দাদা ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ঘরোয়া সাহিত্যসভা গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রামায়ণের নানা চরিত্র নিয়ে মায়ের সঙ্গে এরা সব তর্কবিতর্ক করতেন।'

অশোকানন্দ আরো লিখেছেন, 'স্কুলে অধ্যায়ন করবার সময় থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সে সব কবিতা তিনি রক্ষা করেন নি।'

কবিতাপ্রিয় উঁচু ক্লাসের ছাত্রের একটু ছবি দেখতে পাই ১৯৩২এ লেখা এক গল্পে, ১৯৩২ এর লেখা ১৯১৩-১৪ বা ১৫রে সময়কার গল্প, যেখানে কবিতাবশ ইস্কুলের ছেলে চারু সাইকেল ক্রিকেট উৎসব হইচই মেয়ে কাড়া করণকৌশলের বাইরে হযে আছে তার অপ্রকাশ ভালোবাসা আর কবিতার অকৃতার্থতা নিয়ে। ক্রিকেটের ব্যাট ধরতে এক বলে হার হয়ে সে ফিরে আসে। সে সাইকেল চড়তেও শেখেনি। 'সাইকেল চারু কোনো দিনও শিখতে চাইবে না।... ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে সন্ধ্যার সময় একা একা হেঁটেই কি যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায় না?' চারু ভাবছে: 'সে কারু মতোই নয়।... এদের চেয়ে সে-আলাদা। আলাদা নয়? যদি চারু বুঝতে পারত সাইকেল চালিয়ে রাস্তা দিয়ে মাইলকে মাইল প্যাডেল করে ওদের মতো সুখ সে পাবে, তবে কবে শিখে ফেলত সাইকেল সে। কিন্তু সাইকেল চড়ে কী সুখ? ব্যাট পিটিয়েই বা কী আমোদ? বইয়ের পড়া মুখস্থ করে, এগজামিনে খুব খানিকটা বা কী

আনন্দ?... কেমন একটা বিষণ্ণতা মনের ভেতর জেগে ওঠে। তখন তার ভেতরেই বরং খানিকটা টিকে থাকবার মতো খোরাক আছে'—চারু ভাবছে। যে মেয়েকে তার ভালো লাগে, বুঝতে পারে সে দূরের উজ্জ্বল পৃথিবীর। যাকে সে অতৃপ্ত হয়ে পার হয়ে এসেছে, আজ দেখে 'সে একা বসে থাকতে জানে, সমস্তটা জীবন ধরেও যদি দরকার হয়।' চারুর কবিতা নিয়ে সে গোপন জিনিসের মতো রেখে দিল ব্লাউজের ভেতর। হয়তো ফিরিয়ে দেবে না আর। চারুর সেই মুহূর্তে অসহায়ের কথাতে ১৯৩২ সালের পরিণত কবি লিখছেন: 'আজ নয়, এক দিন তবুও বুঝবে সে, এ কবিতাগুলো সাহিত্য হয় নি। এর পর আরো অনেক কবিতা, আরো অনেক লেখা নষ্ট হয়ে যাবার পরও আরো ঢের নষ্ট করতে হবেই তাকে', কিন্তু তখনও তাঁর ভাবনা: তার পরের লেখাগুলোও যদি অমনি স্থান পেত কোথাও।

জীবনানন্দ ১৯১৫ সালে বি. এম স্কুল থেকে ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করেন। ষোলো বছর বয়স না হওয়ায় এক বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯১৭ য়. বি. এম কলেজ থেকে তিনি আই.এ. পাশ করেন। ১৯১৭তেই কলকাতা অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে থেকে জীবনানন্দ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. পড়তে গেলেন। প্রথম বরিশাল পর্ব শেষ হল এইখানে।

৩

জীবনানন্দের সময়ে সর্বানন্দ ভবনে তাঁদের তিন পুরুষ সম্বন্ধ হল বরিশালের সঙ্গে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে, পাঁচ–ছয় বিঘা জমির উপর বাড়ি। 'সেই জমির ঝোপের মধ্যে কোথায় আনারস ফলের গায়ে হলুদের ছোপ এসেছে, কাঁঠালগাছে কাঁঠাল কত বড়ো হল, কত আম হয়েছে নানান গাছে এ সব তাঁর নখদর্পণে থাকত' ছেলেবেলায়। স্কুলের উঁচু ক্লাসে বা কলেজের প্রথম বছরে কলকাতা নার্সারি থেকে চারা আনিয়ে ফুলের বাগান করেছিলেন পড়ার ঘরের সামনে কতকটা জায়গা ঘিরে, 'তাঁর বাগানের "পলনির" গোলাপ ফুল বরিশালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।' সর্বানন্দেরও সুখ্যাতি ছিল বাগান করার। 'অনেকটা জমি পড়েছিল বাড়িতে', অশোকানন্দ লিখেছেন, 'বাড়িতে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণ ছিল, দাদা সেখানে বসে আলাপ–আলোচনা করতেন।' আবার লিখেছেন, 'বরিশালে আমাদের বাড়িতেই ফাঁকা মাঠ ছিল, বাবা ও দাদা অনেক সময় সেখানে পদচারণা করতেন।' প্রাঙ্গণে বহু ফুল ফোটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল, সুচরিতা জানিয়েছেন। 'পাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ ছিল। একটু দূরে বাড়ির দক্ষিণপ্রান্তে ছিল বেতবন... বাড়ির পাশ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিল। সেই পথ দিয়ে একটু অগ্রসর হলেই দেখা যেত দু ধারে ক্ষেত।' ধানে ভরা, ধান কাটার পর নেড়া মাঠ। পুব সীমানায় বরিশাল নদীর ঝাউ সারি বাঁধা স্ট্র্যাণ্ড রোড— 'ঝামা সুরকির নীলচে লাল রাস্তা তিন–চার মাইল... উত্তরে পুবে তাকালে নদীর জল বেশি দেখা যায় না'— নৌকো জাহাজে ছেয়ে ফেলেছে— জীবনানন্দের উপন্যাসের বর্ণনা। আঠারো শো আশির দশকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বরিশালের পত্রে' লিখেছিলেন:

'বরিশাল শহরটি দেখতে অতি সুন্দর। সামনে দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্চে। নদীটি তেমন বড়ো নয়। নদীর ঘাটে অনেকগুলি বজরা ও নৌকা বাঁধা থাকে। আর এখন তো রোজই আমাদের স্টিমার যাতায়াত করচে। নদীর ধার দিয়ে বরাবর একটা পাকা রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তায় সাহেব সুবোরা গাড়ি চড়ে হাওয়া খান– অনেক ভদ্রলোক সকালে বৈকালে এখানে বেড়াতে আসেন। এই রাস্তার ওধারে কতকটা স্থান ব্যেপে সারি সারি ঝাউ গাছ। এই ঝাউ- গাছগুলিতে নদীর ধারের বড়ো শোভা হয়েছে। শহরের চারি দিকেই বাগান বাগিচা। সুপারি নারিকেল ঝাউ আঁব কাঁঠালের গাছে সমস্ত স্থান যেন ছেয়ে রয়েছে। চারি দিকে থেকে কোকিল পাপিয়ে ডাকচে, আর কতরকম পাখি শিস দিচ্চে। এই সমস্ত মিলে একটি একতানসংগীত যেন রাত দিন উচ্ছ্বসিত হচ্চে। শহরের মধ্যে রাস্তার ধার দিয়ে ছোটো ছোটো খাল নালা গিয়াছে, তাতে সর্বদাই জল থাকে...'

সে সব খাল গেছে পথে, নানা গ্রামের হাটের গঞ্জের পাশ ধরে। লাখুটিয়ার খালপাড় ধরে হাঁটলে শ্মশান ছাড়িয়ে লাসকাটা ঘর, কয়েকটা রবার গাছের ভিড় পার হয়ে ভাঙা মঠ পোড়ো অট্টল পাশে পড়ে, অশোকানন্দ লিখেছেন, 'বরিশালে এই সব পথ ঘাট মাঠ নদীতীর দাদার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।'

জীবনানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র রণেশ দাশগুপ্ত বাড়ির কথাতে লিখেছেন: 'নারিকেল আর সুপারি গাছের কুঞ্জ দিয়ে ঘেরা ভিটায় মাছের চোখের মতো ঝকঝকে ছোট্ট একটি পুকুর আর পরিচ্ছন্ন একটি আঙিনাকে ঘিরে আধা শহরে আধা গ্রামীণ ধরনের কয়েকটি ছোটো বড়ো ঘর।' পাকা ছাদ হয় নি জীবনানন্দেরও আমলে। সুচরিতা লিখেছেন, 'তাঁর ঘরে তিনি পাকা ছাদ তৈরি করতে দেন নি। তা ছিল

খড়ের।' জীবনানন্দের ছাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, 'বাংলো ধরনের বাড়ি— উপরে শণের চাল। বেড়া আধেক ইট আর আধেক বাঁশের। কিন্তু ভিতরে সাহিত্য-পাঠকের কাছে আশ্চর্য এক জগৎ। বই বই আর বই।' আরো বিবরণ রণেশ দাশগুপ্তের: 'বরিশালের গোলপাতায় ছাওয়া বেড়ার ঘরের জানালার পাশে ছোটো টেবিলে হাত রেখে তাঁর অনেক কবিতাই রচিত।'

পুব দিকের এই আটচালা খড়ের ঘরের কথা জীবনানন্দের নানা গল্পে এসেছে। সে ঘরের 'জানলাটার পাশে আমি একটা টেবিল ফেলে নিয়েছি; টেবিলটা বেশ বড়ো.. টেবিলের উপর বই চাপাবার অভ্যাস আমার নেই... এক কোণে একটা দোয়াত আর কলম পড়ে রয়েছে... পাশেই জারুল কাঠের একটা চেয়ার। এই ঘরের ভিতর। ঘরটায় তিনটে কোঠা রয়েছে; পুব দিকে এই কোঠাটায় বরাবরই আমি থাকি; টেবিলের থেকে খানিকটা দূরে শোবার চৌকিটা; চৌকির ওপর সারা দিন মাদুর পাতা থাকে..'। আবার আর-এক লেখায়: পুব দিকের আটচালার সেই ছোট্ট কোণটুকুর ভিতর খাটের উপর মাদুর ফেলে শুরু থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে...'। আরো লেখায়: 'পুব দিককার এই খড়ের ঘরটায় আমি একাই থাকি, মাস দুই আগেও সবাই ছিলেন।...—বাড়িটা কম বড়ো নয়, এক সময় চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক এই উঠানে বসে মজলিস করত...'। ১৯৩৩এর লেখা সব। একে একে চলে গেছে ঘরের লোকজন। তবু, কবি লিখছেন: 'এই সমস্ত ঘর-দোর যদি প্রাণীহীন হয়ে পড়ে থাকে তা হলেও দেশের বাড়ির এই মাঠ-প্রান্তরের আস্বাদ, জোনাকী জ্বলা সন্ধ্যা, ভুতুম পেঁচার ডাকে ভরা রহস্যময় রাত, পথপ্রান্ত-মানব-আত্মাকে অনেক দিন পর্যন্ত নিবিষ্ট করে রাখতে পারে।' আরো: 'বয়স যতই বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভালো লাগছে আমার; চার দিকে এই আম -কাঁঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা... এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

শেষ দিকের উপন্যাসের আরো খানিকটা বিবরণ তুলে দি এইখানে। সেখানে 'চার বিঘে জমি নিয়ে বাড়ি'তে 'দুখানা ঘর- পশ্চিম পোতায় আর দক্ষিণ পোতায়', ইলেক্ট্রিক কানেক্‌শন আসে নি। দক্ষিণ পোতার বাড়িটা পাকা নয়, মেঝেটা পাকা অবিশ্যি। কিন্তু ছনের চাল, খলকার বেড়া। ... উঠোনের পশ্চিম পোতার মাটির মেঝে, শাল সুন্দরী গরাণের খুঁটি, আসাম থেকে আনানো হয়েছিল, এক কাকা এনেছিলেন- প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় নি তখন। খুঁটিগুলো এখনও নিরেট তরুদানবের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন... দক্ষিণ পোতার ঘরে গল্পের লোকটি থাকে, অন্য ঘরটায় আত্মীয়স্বজনরা থাকত। কিন্তু একে একে তারা সকলেই কলকাতায় বিহারে আসামে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, কৃচিৎ আসে এদিকে।' বাড়িতে 'দুটো পুকুর আছে। দুটোই প্রায় মজে এসেছে।... কিছু মাছ আছে দুটো পুকুরেই', বর্ষাকালে, গভীর রাতে 'গরিবগুরবোরা বদমায়েশরা এসে মাছ চুরি করে নিয়ে যায়'! 'পুকুরের চার দিক ঘিরে সুপুরির জঙ্গল, বুনো লতার ঝাড়, কাগজি লেবুর জঙ্গল, বড়ো বড়ো লিচু জামরুল গাছের বিরাট অন্ধকার পাহাড় যেন সব...।' এ হল শেষ পর্বে, ১৯৪৮এ বসে লেখা বিবরণ। পুরোনো দেশের পুরোনো অধ্যায়ের শেষ দিকের দেশ তখন, সর্বানন্দ ভবনেও শেষ দিকের হাওয়া লেগেছে।

কলকাতা থেকে ১৮৩ মাইল পুবে অনেকখানি জলপথের ব্যবধানে ছোটো মফস্বল শহর বরিশাল। সাড়ে-সাত বর্গমাইল আয়তন: দক্ষিণে সাগরদীর হাট, উত্তরে আমানতগঞ্জের জলের কল, পশ্চিমে নথুল্লাবাদের পুল এবং পূর্বে কীর্তনখোলা বা বরিশাল নদী। এই সীমানা প্রাক্‌স্বাধীনতা কালের, পুরসভা প্রতিষ্ঠা থেকে জীবনানন্দের সময়কার। আঠারো শো আশির দশকে পিরোজপুর বাগেরহাটের মধ্যে দিয়ে খুলনা পর্যন্ত স্টিমার পরিবহণ শুরু হলে সময়ের দূরত্ব আট-দশ দিন থেকে আঠারো ঘণ্টার কমে আসে। খুলনা থেকে শিয়ালদা ট্রেন। শেষ দুপুরে ট্রেনে চেপে রাত্রিবেলা 'মাঠ-প্রান্তরের সীমানায় জোনাকী মাখা বাতাসের ভিতরে ট্রেন এসে থামে। তার পর স্টিমার...'। বরিশালে রেলপথ আসে নি।

১৭৯৭এর কোম্পানি রেগুলেশন অনুসারে ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্গত বাখরগঞ্জ জেলা পত্তন হয়, ১৮০১এ বাখরগঞ্জ জেলার চার মহকুমার সদর মহকুমা হয় বরিশাল, ১৮১৭য় পৃথক কালেক্টরেট হয় বরিশালে। ১৮২৯এ খৃষ্টান মিশনারিরা মিশন ও ইংরেজি স্কুল করেছিলেন শহরে। ১৮৫৪য় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্যারেট সাহেবের যত্নে আরেকটি ইংরেজি স্কুল হয়, ১৮৫৮য় সরকার সেটি অধিগ্রহণ করেন, এটিই বরিশাল জেলা স্কুল- সর্বানন্দ সত্যানন্দ দুজনেই ছাত্র ছিলেন এখানে। ১৮৬০ সালে রামতনু লাহিড়ী এসেছিলেন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে।

১৮৬১, ২৩শে জুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় বরিশালে, ১৮৬৫ নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠা হয় ব্রাহ্ম মন্দির। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসেছিলেন ১৮৬৫তে, তার পরেও কয়েক বার এসেছিলেন। ১৮৬৭তে

জমিদার রাখাল রায়চৌধুরীর বাড়ি প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহের আচার্য হয়ে আসেন সপরিচর কেশবচন্দ্র সেন। দুর্গামোহন দাসের চেষ্টায় প্রথম বিধবা বিবাহও হয় ওই সময়ে, পরে অসবর্ণ বিবাহও হয়েছে ব্রাহ্ম বিধি অনুসারে। ১৮৬৮ সালে প্রথম স্ত্রী শিক্ষা স্কুল হয় ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে, ১৮৭১এ ফিমেল ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৭৩এ ছাত্র সেবা দল বা ছাত্র সমাজ, ১৮৭৭এ বিহারীলাল রায়চৌধুরীর পত্নী শিবসুন্দরী দেবীর উদ্যোগে ব্রাহ্মিকা সমাজ। বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েরা অনেকেই সুবক্তা সুলেখিকা সংস্কার মুক্তা ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এখানকার 'নারীসমাজের অকুণ্ঠিত অগ্রগতি'র কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত ১৮৮৩,১৮৯০, ১৮৯৬ ও ১৯০১ এই চার বার শিবনাথ শাস্ত্রী এসেছেন বরিশালে। ১৮৮১তে বরিশাল সমাজের প্রথম প্রচারক নিযুক্ত হন কালীমোহন দাস। ১৮৯০এ মনোরঞ্জন গুহ, ১৮৯৭এ বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯০২এ মনোমোহন চক্রবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক হন। মনোমোহন পৈতা ছেঁড়া ব্রাহ্ম, সর্বানন্দের দ্বিতীয় কন্যা প্রেমদাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ১৮৮২তে লাখুটিয়া খালপাড়ে জগচ্চন্দ্র দাসের বাগানে হয় ব্রাহ্ম শ্মশান। ১৮৯৭, ১৯১৫ ও ১৯২২এ তিন বার পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনী হয় বরিশালে।

বরিশালে মুদ্রাযন্ত্র আসে ১৮৬২তে, তারপাশার হরকুমার রায় 'পরিমল বাহিনী' নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬৯এ পৌরকর্ম নির্বাহার্থ গঠিত হয় টাউন কমিটি, শাসন বিভাগীয় ইংরেজ ছাড়া তাতে স্থানীয়েরাও ছিলেন। ১৮৭৬এ হল বরিশাল মিউনিসিপালিটি, ১৮৮৫তে মিউনিসিপাল বোর্ড। ১৮৮০তে অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে এসে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁর আসার আগেই স্থানীয় উকিল-জমিদারেরা মিলে বরিশাল পীপ্‌ল্‌স অ্যাসোসিয়েশন করেছিলেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হবার পরে এই সভা 'কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত পথে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়।' প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনে বরিশাল থেকে জনপ্রতিনিধি যেতেন। দেশীয় ব্যক্তি পরিচালিত ব্যবস্থাপক সভার দাবি করে বরিশাল থেকে চল্লিশ হাজার স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন গিয়েছিল ১৮৮৭র মাদ্রাজ অধিবেশনে। ১৮৯৩এ রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় 'বরিশাল হিতৈষী' বের করেন, কালক্রমে সে কাগজ হয়ে ওঠে স্বদেশির মুখপত্র। ১৮৯৮এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'দেশবন্ধু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের কংগ্রেস সম্বন্ধীয় আলোচনাপত্রে'র উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সকে ক্রমে ধীরে ধীরে... ধিক্‌কৃত ভিক্ষাবৃত্তির অনন্ত লাঞ্ছনার পথ হইতে স্বচেষ্টায় স্বকার্যসাধনের দিকে' ফিরিয়ে আনার কথা লেখেন।

বি.এম. স্কুলের দ্বিতীয় বছরে এসেছিলেন জগদীশ মুখোপাধ্যায়, পরে প্রধান শিক্ষক হন। অকৃতদার, আদর্শবান মানুষ তিনি, সনাতন ভাবধারায় 'অমৃত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বরিশালে তাঁর বাড়ি আশ্রম বলে পরিচিত ছিল। ১৮৯৮এ বি.এম.কলেজে অধ্যাপক হয়ে এলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশিতে যুক্ত হওয়ার ফলে ১৯০৮এ তাঁর নির্বাসন হয়, দণ্ড কালের পবে অধ্যাপক হয়েছিলেন সিটি কলেজে। ১৯০৫এ স্কুলে আসেন সতীশ মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামে সন্ন্যাস নিয়ে শঙ্কর মঠ স্থাপন করেছিলেন বরিশালে, বিপ্লবীদের সেটি ছিল গূঢ় সাধনপীঠ। স্কুলের আরেক শিক্ষক কালীশ বিদ্যাবিনোদ অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় লিট্‌ল ব্রাদার্স অফ দি পুয়োর নামে সেবা দল করেছিলেন ছাত্রদের নিয়ে, কল্যাণকুমার বসু লিখেছেন, 'ছাত্ররা তাঁকে ভালোবাসত, জীবনানন্দের মনেও তাঁর প্রভাব পড়েছিল বৈকি।'

১৯০৫এ বঙ্গ ভাগ আদেশের উপলক্ষ্যে স্বদেশি আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠল বরিশালে। ১৩ই জুলাইয়ের 'সঞ্জীবনী' কাগজে বৃটিশ পণ্য বয়কট আহ্বানের পিঠোপিঠি ১৯শে জুলাই সংখ্যা 'বরিশাল হিতৈষী'তে তার পুনঃপ্রচার হয়। কার্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ হয় বরিশালে। ৭ই অগষ্ট কলকাতা টাউন হলের সভায় বয়কট ও বন্দেমাতরমের ডাক দেওয়া হল, তার আগের দিন ৬ই অগষ্ট স্বদেশবান্ধব সমিতি গঠন করলেন অশ্বিনীকুমার। তাঁর সংগঠন দক্ষতায় 'বিলাতি কাপড় ও নুন বিক্রয় বন্ধ হল শুধু বরিশালে নয়, জিলার দূরতম প্রান্তের বাজার হাট ও বন্দর থেকেও জিনিসগুলো অদৃশ্য হল ভোজবাজির মতো। ম্যাজিস্ট্রেট নিজে দোকান দোকান ঘুরে একখণ্ড বিলাতি কাপড় কিনতে পারলেন না... নদীপথে মাঝিদের মুখে, শহরে গাড়োয়ানদের মুখে, পল্লীতে পল্লীতে জনগণের মুখে ধ্বনিত হতে লাগল একটি মন-মাতানো শক্তিসঞ্চারী মোহন মন্ত্র ''বন্দেমাতরম্"।' 'কোনো কোনো স্থলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়েছে' বলে স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ সংবাদ প্রকাশ করলেন। গুর্খা পুলিশ নামল শহরে। সরকারি দমন ব্যাপক হয়ে উঠল। নির্যাতন চরমে উঠল ১৯০৬এ এপ্রিলে আয়োজিত বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে। কলকাতা ও ঢাকার মুখ্য নেতৃবর্গ এসেছিলেন সম্মেলনে, জেলার নানা স্থান থেকে এসেছিলেন আরো বহু সহস্র লোক। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নিষেধ করে

সরকারি আদেশ জারি হয়েছিল। দেশের প্রথম আইন অমান্য হল বরিশালে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিগৃহীত হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে, যজ্ঞ ভঙ্গ হল তুমুল বিক্ষোভ আর রক্তপাতে, কিন্তু তার ফলে দেশের মডারেট রাজনীতি ঘা খেয়ে গেল, সারা দেশে বরিশালের নাম উঠল হেডলাইনে, সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলে শিয়ালদা স্টেশনে ঘোড়া খুলে দিয়ে জনতা তার গাড়ি টেনে আনল গোলদিঘি পর্যন্ত,রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'দেশনায়ক' রূপে বরণ করে নেয়ার আহ্বান জানালেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'তাহার পর প্রত্যহই নানা স্থানে জনাকীর্ণ সভায় বরিশালের কাহিনী আলোচিত হইতে লাগিল। যে শ্রেনীর লোক সাধারণতঃ কোনো রাজনীতিক বিষয়ে যোগদান করেন না, এমন কি যে সব গ্রন্থকীট অথবা ধর্মপিপাসু ব্যক্তি নিরালায় ঘরে বসিয়া থাকিতেই অভ্যস্ত তাঁহারাও স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গ বিভাগ ব্যাপারে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন এবং শোভাযাত্রা জনসভা প্রভৃতিতে যোগ দিতে লাগিলেন'।' কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন, কনফারেন্সের পর দুটি অপরিচিত যুবক সুরেন্দ্রনাথের ব্যারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে এই নিপীড়নের জন্য দায়ী ছোটোলাট ফ্যুলার সাহেবকে হত্যা করার সংকল্প জানায়, সুরেন্দ্রনাথ তাদের নিরস্ত করেন। কিন্তু ১৯০৬ ডিসেম্বরের কলকাতা কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, জনসাধারণ সরকারের উপরে আস্থা হারিয়েছে, বঙ্গভঙ্গের এটি প্রথম ফল, আর 'whatver that matter may be, there is the fact that a class has sprung up in our midst who do not belive in petetioning or praying to Government and who do not belive in constitutional agitation', শ্রীযুক্ত মর্লের সমীপে নিবেদনযোগ্য বঙ্গভঙ্গের এটি দ্বিতীয় ফল(দ্র' আপ্পাইদোরাই: Documents on Political Thought in Modern India,Vol 1,1973 pp 182-183)। সুরেন্দ্রনাথ সে বছরেই এসেছিলেন বরিশালের সংবর্ধনা নিতে, পরের দিনে মন্ত্রী হয়ে যখন আসেন তখন পট বদল হয়ে গিয়েছে, তিনিও দাড়িয়ে সম্পূর্ণই বিপরীত ভূমিকায়।

১৯০৬এ দুর্ভিক্ষ লাগল বরিশালে। নিবেদিতা এসেছিলেন, কলকাতায় ফিরে অশ্বিনীকুমারের ত্রাণ ব্যবস্থার তিনি ভূয়সী প্রশংসা লিখেছিলেন। ১৯০৬এ আরো এসেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিপ্লবী দল গড়ার মানসে, এসে সংযোগ করেছিলেন বি.এম.স্কুলের শিক্ষক সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অরবিন্দ ঘোষ প্রাদেশিক সম্মেলনে এসেছিলেন, ১৯০৯এ ঝালকাটি বরিশাল জেলা সম্মেলন সেরে আবার আসেন বরিশালে, তিনিও এসে সতীশ মুখোপাধ্যাযের সঙ্গে সংযোগ করেন। অনুশীলন দল যুগান্তর দলের সম্বন্ধ নিয়ে ১৯০৮এ স্বতন্ত্র বিপ্লবী বরিশাল দল হল এখানে, ১৯১২-১৩ সাল থেকে তার কার্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা। বঙ্গভঙ্গেব সময়েই স্বদেশি যাত্রা স্বদেশি গানের মুকুন্দ দাসের অভ্যুদয়। তাঁর পালা, গান উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা দেশে। জনশ্রুতি, তাঁর কোনো কোনো গান সত্যানন্দের শ্যালক মনোমোহন চক্রবর্তী রচনা। মনোমোহন নিজে অবশ্য 'সুখের বিষয় আমার কোনো সংগীতই জাতীয় সংগীত নয়, বলিতে বাধা নাই আমি চিরদিনই সকল বিষয়ে মধ্যপন্থী' বলে জানিয়েছেন (দ্র' 'ব্রহ্মবাদী',মাঘ ১৩৪২)।

১৯১২য ব্রজমোহন কলেজ সরকারি সাহায্য স্বীকার করে ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে চলে গেল, সতীশ মুখোপাধ্যায়ও স্কুল ত্যাগ করে শঙ্কর মঠ স্থাপন করলেন। তারপর ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরণের ঘোষণার দিনে বোমা বিস্ফোরণ হল দিল্লী দরবারে। ১৯১৪ ৪ঠা অগস্ট ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানির বিরুদ্ধে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করতে সহায় হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারা। কেবলই আনুগত্য দেখাতে নয়। চিত্তরঞ্জন দাশের অভিপ্রায় শুনেছি নিরীহ বাঙালির ছেলেকে বারুদের গন্ধ শুঁকিয়ে এনে পোক্ত করে তোলা। বিপ্লবীরা এখানে ব্রিটেনের প্রতিপক্ষতা সূত্রে জার্মানির সাহায্যের ভরসাও করেছিলেন, ১৯১৪র গোড়ায় জার্মান অস্ত্র পৌছেছিল খোদ উলস্টার বিপ্লবীদের হাতে, এখানে অস্ত্রবারুদবাহী জার্মান জাহাজ সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে ভিড়লে আশা ছিল তার এক ভাগ যাবে বরিশাল বিপ্লবীরও হাতে, জাহাজ পৌছয় নি। জার্মানির অর্থনীতি ও দেশ বিস্তার প্রকল্পের মানচিত্রে তখন ভারত ছিল কিনা জানা যায় না, যদিও বহির্ভারতে ভারতের বিপ্লব চেষ্টা কিছু পরিমাণে কেন্দ্রিত ছিল জার্মানিতে, কাবুলে মহেন্দ্রপ্রতাপ যে ভারতের প্রভিশনাল সরকার গঠন করেন তাতেও জার্মানির আনুকূল্য ছিল। কবি ইয়েটস্ 'জীবনস্মৃতি'র ইংরেজি পড়তে আগ্রহ করেছিলেন এই সময়, বাংলার স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে জানার কৌতূহলে। ১৯১৪র গোড়াতেই সরকারি পুরাতত্ত্ব বিভাগ পাটনার কাছে খনন চালিয়ে সন্ধান পেলেন আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের। ১৯১৫র গোড়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ অভিজ্ঞতা নিয়ে গান্ধী দেশে ফিরলেন।বোম্বাইয়ে তাঁর সংবর্ধনা সভায় সভাপতি হলেন মহম্মদ আলী জিন্না। তারপর সাধারণ মানুষ হয়ে এক বছরের দেশ পরিক্রমা শুরু করলেন তিনি

গোখেলের পরামর্শে। ১৯১৬য় স্বরাজের দাবিতে অ্যানি বেসান্ত ও বালগঙ্গাধর টিলক দুটি হোম রুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন, বাংলায় সে আন্দোলন বিস্তার করার ভার নিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯১৭য় পুজোর ছুটিতে চিত্তরঞ্জন ময়মনসিংহ ঢাকা বরিশাল সফর করে উন্মাদনা সঞ্চার করে আসেন পূর্ব বঙ্গে। কিন্তু যে দেশবন্ধুর কথা জীবনানন্দের শোকের, স্মৃতির কবিতায় (দ্র.'ঝরা পালক', এই বই পৃ ৩৯–৪০ 'রূপসী বাংলা' ২৩ সংখ্যক) পাই, রাউলাট বিল প্রতিবাদের, অসহযোগের পূর্ণায়ত দেশনায়ক, এক দিকে ক্লৈব্য সংহারী, আর দিকে 'ভেঙেছিলে বিলাসের সুরা ভাণ্ড তীব্র দর্পে, বৈরাগের রাগে'–নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফেরার পর পূর্ণ বৈরাগ্যব্রতী তিনি। প্রসঙ্গত নাগপুর থেকে ফেরার পরেই ১৯২১এর বর্ষারম্ভ সময় থেকে তাঁর 'দেশবন্ধু' পরিচয়েরও শুরু। ১৯১৬য় সান ফ্রান্সিস্কোয় ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লব আন্দোলনে অসংসক্তি হেতু গদর পার্টি রবীন্দ্রনাথের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন বলে কথিত, এদেশি ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট অবশ্য জার্মান গুপ্ত কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ করার জন্যই রবীন্দ্রনাথের এবারের আমেরিকা যাওয়া। লণ্ডনের টাইম্‌স কাগজের এক বছরের যুদ্ধ কবিতা সংকলন ৯ অগস্ট ১৯১৫র ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছিল তাঁর *The Trumpet* কবিতা,'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে সইব'। সে কবিতা প'ড়ে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন বাইশ বছরের তরুণ যোদ্ধ কবি উইলফ্রেড ওয়েন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আবেভিলের ফ্রন্ট লাইন থেকে মাকে তিনি লিখেছেন, 'everything unnatural, broken, blasted; the distortion of the dead, whose unburiable bodies sit outside the dug-outs all day, all night, the most execrable sights on earth.' তাঁর এই নতুন বদলি–র আদেশপত্রীর পিছন–পিঠে ওয়েন পেন্সিলে লিখে রেখেছিলেন 'গীতাঞ্জলি'র গান। কিন্তু গানের সে শান্তি অবশেষ ছিল না কোনোখানে। ১৯১৫য় জ্যুরিখের শিল্পীদের যে দাদা বিক্ষোভ সে যেন যুদ্ধে দলিত মানবমূল্যের প্রতিক্রিয়া । ১৯১৭র ফেব্রুয়ারী ও অক্টোবরে গণতন্ত্রী ও বলশেভিক বিপ্লব হয় রাশিয়ায়। ১৯১৭য় সদ্য ট্রেঞ্চ থেকে ফিরে আপলিনের চিঠিতে একটি শব্দ বানিয়ে লিখলেন: surre'alisme। তত্ত্বগতভাবে এ হল বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ব্যক্তি ও সমূহের বাঁচার একটা নতুন সন্ধান, কাব্য ও শিল্প সৃষ্টিকে রাজনীতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সঙ্গে মিলিয়ে গড়া একটা নন্দন প্রকল্প, আরম্ভেই তার দলীয়েরা সুররিয়ালিস্টিক মুক্তিকে কমিউনিস্ট মুক্তির সজাতীয় বলে স্থির করেছিলেন । রজনী পাম দত্ত লিখেছেন, ব্রিটেন–ভারত সম্বন্ধেরও নানা স্তরে বলশেভিক বিপ্লবের প্রতিফলন ঘটেছিল। ১৯১৭ ডিসেম্বরের কলকাতা কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসন দাবি অনুমোদন হল। অধিবেশন আরম্ভের দিনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন 'victory to the all conquering Light!' তাঁর India's Prayer কবিতা। পরে বিস্তারে ছাপা হয়েছিল তাঁর মতামত: যুযুধান ইয়োরোপের জঙ্গী জাতীয়তাবদ্ধ দেশের প্রতিশ্রুত ডোল আর আমাদের আত্মশক্তির (বা. শক্তিহীনতার) সে হল অপ্রিয় বিচার, পরিণামে সদ্য জাতিপূজা নিষ্ক্রান্ত সত্যসন্ধী অনতিজ্ঞাত আধুনিক রাশিয়ার আশাপ্রদ দৃষ্টান্ত অনুমান করে 'ভারতের প্রার্থনা'র অনুবন্ধের মতো দেখতে পাই এই আহ্বান: to take her place in the procession of the morning going on the pilgrimage of truth...' (দ্র' *At the Cross Roads*, মডার্ন রিভিউ, জুলাই ১৯১৮)। এই ১৯১৭য় জীবনানন্দ কলকাতায় পড়তে এলেন।

কিভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর চিৎসংস্কার? জীবনানন্দ লিখেছেন, 'কার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম আমরা? আমি অন্তত তিনজন মানুষের কাছে। একজন বাবা, একজন মা, আর একজন ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাস্টার জগদীশ মুখোপাধ্যায়।' তাঁর জীবনপ্রণালী কাব্যসংস্কার দু দিকেই এঁরা সঞ্চার হয়ে আছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত তাঁর 'দেশবন্ধু' কবিতা পড়ে 'মা বিক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন... দেশের নানা রকম সাময়িক ঘনঘটাচ্ছন্নতার অতীত একটা স্পষ্ট জীবনবেদ দেখতে চাইতেন তিনি।' সে সময়েও , সেই প্রবল সামাজিক আলোড়নের দিনেও বাইরে থেকে সতীর্থ বন্ধুরা তাঁকে দেখেছেন বিচ্ছিন্ন সুদূর আত্মমগ্ন। দেশনীতির ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র জাতীয়তাকে শুদ্ধ লোক–কল্যাণের সঙ্গে মেলাতে পারেন না, যেন রবীন্দ্রপ্রভাবে, মনে হয়। মধ্য পর্বের প্রবলতার সমাজতন্ত্রী চাপের দিনে তাঁকে দেখি সরব আত্মবাদী , যেন তার গুরুত্ব উপেক্ষা করা তাঁর অসাধ্য। ১৯৫২তেও দেখি লিখছেন, 'রুশ বিপ্লবের ফলে বাংলায় (ও ভারতবর্ষে) বোলশেভিক, সোভিয়েট প্রভাব সাময়িক ও অনেক প্রশস্তভাবে দেখা দিলেও সে পথে চলার মতো তেমন কোনো যোগ্য চিন্তা বা কাজকর্ম দেখা গেল না।' তারও পরে লিখেছেন, প্রায় সিদ্ধান্তোপম: 'জীবন ও সমাজের কোনো শাশ্বত সুধী বা শাশ্বত মীমাংসা আছে বলে মনে হয় না।' অন্তত তার কোনো সরল ব্যবস্থা কারোই দেওয়ার নেই (দ্র.'যুক্তিজিজ্ঞাসা ও বাঙালি', পূর্বাশা, বৈশাখ ১৩৫৯)।

জীবনানন্দের কন্যা লিখেছেন,'কোনো সময় বাবা বলেছিলেন, আমাদের যখন তরুণ বয়স তখন ইংরেজ সরকারে ভালো কাজ পাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু যখন অধ্যাপক হলাম তখন দেশের মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমি তো সেই ইংরেজের দাস হতে পারি না' (দ্র' 'আমার বাবা'। রবিবারের যুগান্তর ৫ এপ্রিল ১৯৮১)। অধ্যাপক হয়ে জীবনানন্দ খুশি হন নি। এক-আধ অবচ্ছেদ বাদ দিয়ে তাঁকে অবশ্য অধ্যাপনাই করতে হয়েছে সারা জীবন।

৪

১৯১৯ সালে জীবনানন্দ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২১এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পাশ করেন ইংরেজিতে, আইনও পড়তেন এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ল কলেজে, পড়া সম্পূর্ণ করেন নি। এম.এ. ও ল পড়ার সময় অক্স্‌ফোর্ড মিশন হোস্টেল থেকে উঠে আসেন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে। পরীক্ষার আগে অসুস্থ হয়েছিলেন ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রিতে, বাড়ির নির্বন্ধে পরীক্ষায় বসতে হয়। ১৯১৯এর বৈশাখ 'ব্রহ্মবাদী' কাগজে শ্রী জীবনানন্দ দাস বি. এ. প্রণীত ষোলো ছত্র 'বর্ষ আবাহন' কবিতা প্রকাশিত হয়, এখনও পর্যন্ত এটিই তাঁর প্রথম ছাপা কবিতা বলে জানা গেছে। ১৯২১এ সিটি কলেজের ইংরেজি বিভাগে টিউটর হিসেবে তাঁর চাকরি হল। চাকরির এক বছরের মধ্যে বাসা বদল করেছিলেন কয়েক বার, অশোকানন্দ লিখেছেন, 'হ্যারিসন রোডের একটি বোর্ডিং, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের একটি মেস, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সংলগ্ন একটি গলির মধ্যে একখানি ঘর, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের একখানা ঘর এবং পরে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং— এক বৎসরের মধ্যে বাসস্থানের এত পরিবর্তন হয়।' জীবনানন্দের সম্প্রতি প্রকাশিত গল্পে-উপন্যাসে মেসবাড়ি-মেসজীবনের একটা পরিসর দেখতে পাওয়া যায়।

সম্ভবত প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে থাকা কালেই কলকাতার পত্রিকাসমূহে জীবনানন্দের লেখার প্রসার হতে শুরু করে। 'প্রবাসী' ও 'বঙ্গবাণী'র সঙ্গে পারিবারিক যোগ ছিল তাঁর, রামানন্দের স্নেহপাত্রী ছিলেন কুসুমকুমারী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন কুটুম্ব স্থানীয়। 'কল্লোলে'র আরম্ভ পর্বে ভূমিকা ছিল বিজয়চন্দ্র ও তাঁর কন্যা সুনীতি দেবীর, 'কল্লোলে'র সঙ্গে জীবনানন্দের সংস্রবের মূলেও তাঁরা থাকতে পারেন, অশোকানন্দ অবশ্য কবি উমা দেবী ও তাঁর ফোর আর্টস ক্লাবের মধ্য-বর্তিতার কথা বলেছেন। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোল' থেকে সরে গিয়ে 'কালি-কলম' পত্রিকা করলে জীবনানন্দ সেখানেও লেখক রূপে গৃহীত হন। মুখ্যত এই চারখানি কাগজের লেখা নিয়ে তাঁর প্রথম বই বেরোয় 'ঝরা পালক' (১৯২৭)। জীবনানন্দ ভূমিকায় উল্লেখ করেন, 'ঝরা পালকের কতকগুলি কবিতা প্রবাসী,বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।' 'প্রগতি'র একটি মাত্র কবিতা আছে বইয়ে ('কবি), 'বিজলী'র কবিতার সন্ধান হয় নি। 'কল্লোল' ছাড়া অপর কোনো কাগজ অবশ্য বিজ্ঞপ্তি করেন নি বইখানির।

'কল্লোল'-'কালিকলমে'র লেখকদের সঙ্গে জীবনানন্দের সম্বন্ধ হয়েছিল। তিনি লিখেছেন,— "কল্লোলে'র যুগে আমি কলকাতায় থাকতাম। "কল্লোলে'র শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা, কথাবার্তা হত। কিছু কাল পরে 'কালিকলম' বেরুল; 'কালিকলমে'র দিক্-নিরূপক ছিলেন প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। মোহিতলাল "কালিকলমে" কবিতা লিখতেন। "কালিকলম" অফিসেই নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখেছি।' প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে 'মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কবিতা প'ড়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন,' অশোকানন্দ আরো লিখেছেন, 'অনেক শীতের সন্ধ্যায় দেখেছি মোহিতবাবু কালো কোট প'রে গলায় comforter জড়িয়ে এসে আসন গ্রহণ করতেন। বহুক্ষণ ধরে কবিতা নিয়ে তাঁদের আলাপ আলোচনা চলত।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও 'মাঝে মাঝে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে এসে গল্প করে যেতেন।' জীবনানন্দও লিখেছেন অচিন্ত্যকুমারকে লেখা চিঠিতে: 'তুমি Presidency Boardingএ প্রায়ই আসতে-বেড়াতে বেরুতাম তার পর— চৌরঙ্গির দিকে প্রায়ই। সে কথা অচিন্ত্যকুমারও বলেছেন চিঠিতে, প্রবন্ধে' 'কল্লোলযুগ' বইয়ে: 'বিনা সই-সুপারিশে সটান হাজির হলাম তার মেসে... দুজনে বেড়াতে গিয়েছি চৌরঙ্গি ছাড়িয়ে গড়ের মাঠের দিকে, মাঝে ইন্ডো-বর্মায় চা-চপ-কাটলেট খেয়ে নিয়েছি, জীবনানন্দই খাইয়েছে'। বুদ্ধদেব বসুও 'হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিংয়ের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ' করেছিলেন বলে স্মরণ করেছেন।অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, যে সব দিনে 'হৈ হল্লা জনতা জটলা ভালো লাগে না... সে সব দিন পটুয়াটোলা লেনে না ঢুকে পাশ কাটিয়ে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট দিয়ে জীবনানন্দের মেসে এসে হাজির হতাম। পেতাম একটি অস্পর্শশীতল সান্নিধ্য...'।

১০/২ পটুয়াটোলা লেনে 'কল্লোলে'র কার্যালয় , তার ৩/১১ ফাল্গুন ১৩৩২ সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রমাদ মুদ্রণে জীবনানন্দের প্রথম 'নীলিমা' কবিতা প্রকাশিত হয়, তার পৌনে-সাত বছর আয়ুষ্কালে অন্যূন বারোটি কবিতা লেখেন তিনি। 'কল্লোলে'র চতুর্থ বছরে 'কালি-কলম' বেরোলে জীবনানন্দ সেখানেও ১৩৩৩-১৩৩৫ এই তিন বছরে লেখেন এগারোটি কবিতা, সেখানে 'আর্টের আটচালা' কলমে 'পাহাড়িয়া কবি' বলে উপহাস ছাপা হলে পরে লিখতে নিরস্ত হন। তত দিনে ৪৭নং পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'বাংলার নবযুগের সাহিত্যেব মুখপত্র' 'প্রগতি' আরম্ভ হয়ে গেছে, তার ১৩৩৪-১৩৩৬ তিন বছরে জীবনানন্দ লেখেন তেরো বা চোদ্দটি দীর্ঘ অবারিত কবিতা (প্রথম সংখ্যাটি আমরা দেখতে পাই নি, বুদ্ধদেব বলেছেন প্রথম সংখ্যাতেও একটি কবিতা ছিল), আর তাঁর 'স্বাতন্ত্র্য ও নবত্বে'র নিরূপণ করে অন্তত তিনটি বিশদ আলোচনা বেরোয় তাঁর লেখা নিয়ে, যে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis, ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতish মোহিতলালের বিপরীত, 'আজকালকার ইংরেজি কবিতার মতো' মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ ক'রে কবিতায় 'অনাড়'র গভীরতা, আনার প্রয়াসী, কবিতার আদি অপরিহার্য দুই গুণ sincerity ও originality রয়েছে তাতে, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ'ও সূচিত হয়েছে সে সব লেখায়। জীবনানন্দ দাশ সেই আসন্ন 'হাওয়া-বদলের কবি' এবং 'খাঁটি কবি'। লেখা বুদ্ধদেব বসুর। বুদ্ধদের জীবনানন্দেব লেখায় বিশেষ করে পেয়েছেন, 'শব্দের মূল্যাবোধের পরিচয়, আবার তাঁর মতে সে লেখা 'সরল নিরলঙ্কার ঘরোয়া ভাষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ'। বুদ্ধদেব লিখেছেন, জীবনানন্দের কবিতা টুকরো টুকরো অসংলগ্ন ছবি' গ্রথিত ক'রে 'বিষন্ন subdued একটা tone, একটা ক্লান্ত উদাস meandering' রচনা করে যার অদ্ভুত diction অত্যধিক self-consciousnessএর ফলে অদ্ভুত, grotesque' সে লেখা, কিন্তু সে কবিতার ভাষা purest বাংলা।

কবিতার ক্ষেত্রে 'শব্দের মূল্যবোধে'র কথা 'কল্লোলে'ব সম্পাদকীয় প্রস্তাবেও পাওয়া যায়। কবিদের 'পরিচয়লিপি'তে সেখানে লেখা হয়েছে, 'কবিব লেখার প্রত্যেকটি অক্ষব, প্রত্যেকটি শব্দপ্রয়োগ, প্রতিটি ছত্র কত দীর্ঘ কালের অনির্বচনীয়, অপরিমেয় শক্তি বিকাশ! তাহা অন্যান্য কথাবার্তা বা কাজকর্মের মতো ক্ষণিকের প্রয়োজনজনিত নহে' (ভাদ্র ১৩৩১)। কিন্তু 'কল্লোলে'ব কবিতার মাত্রা রচনা করেছে এক দিকে নজরুল ইসলামের 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', এক দিকে বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'; 'অগ্নি বীণা' 'দোলন চাঁপা'র কবি লাল কালিতে লিখছেন তখন 'বিষেব বাঁশি'র কবিতা, 'রজনী হল উতলা'র রোমাঞ্চ লাগছে বুদ্ধদেবের কবিতায়। অজিত দত্ত লিখেছেন জীবনানন্দের 'লেখা কল্লোল খুব বেশি পছন্দ করত না'। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হেমচন্দ্র বাগচীব লেখা নিশ্চয় করত তার কারণ তাঁবা সেখানে অনেক লিখেছেন, তবুও প্রমুখ হতে পান নি। কিন্তু জীবনানন্দ গুরুত্ব দিয়েছেন কল্লোল'কে। 'ভারতী'র যুগের পর এ হল পর্বান্তরের নতুন যুগভাবনাব মুখপত্রিকা, মানস-পরিধি থেকে দেশগত 'পূর্বজেরা তখন সরে গিয়েছেন খানিক দূরে— অনেক দূরে; —ববীন্দ্র বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড়ো বড়ো বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোর কাছে' জীবনানন্দ লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে "কল্লোল" আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল।'

জীবনানন্দও তাব সহাযতা পেয়েছিলেন, কবিতাপ্রয়সী আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর লেখাতে। 'কল্লোলে' তাঁর প্রথম লেখা 'নীলিমা' অচিন্ত্যকুমারকে 'ঠিক এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মতো' আকর্ষণ করেছিল, 'নীলিমা' পড়েই বুদ্ধদেব সাগ্রহ আমন্ত্রণ করেছেন কবিকে 'প্রগতি'তে।' 'কল্লোলে' প্রকাশিত জীবনানন্দের শেষ লেখা 'পাখিরা' সূত্রে কবির জীবনান্তের পরেও বুদ্ধদেব লিখেছেন 'মনে পড়ছে "পাখিরা" কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিল। "স্কাইলাটে"'র জন্য, "প্রথম ডিমে"র জন্য, "রবারের বলের মতন" ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে "লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে" মৃত্যু ছিল বলে।' 'কল্লোল' জীবনানন্দের প্রথম কাব্যের যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেছিলেন, 'তারুণ্যের উল্লাস' ছাড়াও তাতে 'মোহিতলাল নজরুলের প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন' বলে স্বীকার দেখতে পাওয়া যায়।

'বাংলা কবিতার ভবিষ্যতে'র গুরু প্রতিবাদ লেখেন 'মরীচিকা' কাব্যের সুপ্রতিষ্ঠ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'উপাসনা' কাগজে। বুদ্ধদেবকে খণ্ডন করে যতীন্দ্রনাথ লেখেন, তাঁর আলোচিত 'কবি হয়তো original,কবিতায় যৎসামান্য Musicও আছে, কিন্তু sincere নয়...' 'হয়তো কবিতাটি ('বোধ',

প্রগতি, ভাদ্র ১৩৩৬) আমাদের অপঠিত কোনো বিদেশী কবিতার ব্যর্থ অনুবাদ,' সর্বোপরি এ কবিতার 'ভাষা সরল নয়, সহজ নয়, কারণ চেষ্টা করেও এর অর্থ বোধগম্য হয় না। অনাড়ম্বরের এ ভাষা নয়– মোহিতলালের "কটাক্ষ ঈক্ষণ তার হৃদয়ের বিশল্যকরণী" এই সংস্কৃতাড়ম্বের বদলে 'কুঁজ গলগণ্ড নষ্ট শসা পচা চালকুমড়ার" আড়ম্বরের মধ্যে ভাষার শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে।' যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন এই জাতীয় অসংবদ্ধ insincere ব্যর্থ মুদ্রাদোষে ভরা রচনা যদি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ হয় তবে সে ভবিষ্যৎ 'আজই অতীত হলে কোনো ক্ষতি হয় না' (উপাসনা, আশ্বিন ১৩৩৬)। জীবনানন্দের 'নিরর্থক বাক্য ও অসম উপমায় পরিপূর্ণ... অসংখ্য উপমাবহুল গণ্ডারমারী' কবিতা নিয়ে অসন্তোষ ও তিরস্কার প্রায় প্রথমাবধিই দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো আগ্রহী পাঠকের চোখে পড়ে নি 'বোধ' কবিতার কুঁজ গলগন্ড নষ্ট পচা সবজীর বিবরণে সুন্দরওকুৎসিতের যে ভেদরেখা কবি মুছে দিতে চাইছেন সে পূর্ব-প্রস্তাবিত, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'কবি'তেই (মাঘ ১৩৩৪) কবি নিজেকে সুন্দরের দৌবারিক ঘোষণা করে 'ঘৃণ্য নগণ্যের মুখে... বীভৎস কুৎসিত কুণ্ডে, পঙ্কের ভাণ্ডারে' দেখা পেয়েছেন, স্তব করেছেন সে সুন্দরের, আর তা একা জীবনানন্দের মনগ্রসূত্র নয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তও প্রায় পাশাপাশি, আরো অপরোক্ষে লিখেছেন, 'রুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক আভিজাত্য লয়ে' তিনি লিখবেন পতিত অন্ত্যজ অস্পৃশ্য 'কুক্কুটে'র চমৎকৃত তীব্র পরিচয়, সে লেখার ভাষা মোহিতলালেরই অনুরূপ, 'বোধ' বা জীবনানন্দের অপরাপর লেখার মতো সংস্কারে ঘা দেওয়া নয়। কেবল অসুন্দর নয়, অপাঙক্তেয়তম শব্দ, অপাঙক্তেয়তম বিষয়ও জীবনানন্দের নির্ভর— 'ফোঁফরা হাড্ডি', 'বাসা গাড়া', 'নাকের ডাঁশা' 'ছুড়ির চুড়ি', 'মাটির বাঁটের চুমা,' বাদুড় পেঁচা ইঁদুরের রাত্রিজগৎ 'মাছিদের কানাকানি', 'কীটের পাখায় অস্ফুটতম বেদনা'– দ্বিতীয় বইয়ে আরো ব্যাপক, অবারিত হয়ে উঠেছে। এই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতা-পর্যায় থেকেই 'শনিবারের চিঠি'র ধারাক্রমিত উপহাস-মালারও সূত্রপাত। কিন্তু সজনীকান্তের লঘুকরণের প্রসার বা আয়ু যাই হোক, যতীন্দ্রনাথের 'দুর্বোধ্য' ও 'বিভ্রান্ত' এই অদ্ব্যর্থ দুই ইঙ্গিতের পরিচয় জীবনানন্দকে আজীবন, মৃত্যুর পরেও বহন করতে হয়েছে।

জীবনানন্দের দ্বিতীয় বই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রস্তুত হয় মূলত 'প্রগতি' পত্রিকার, প্রধানত ১৩৩৪-১৩৩৬ তিন বছরের লেখা নিয়ে। ১৩৩৬ সালেই 'বার করবার আকাঙ্খা হয়েছিল' কিন্তু ডিসেম্বর ১৯৩৬এর আগে সে বই তিনি ছাপতে পারেন নি। 'প্রগতি' ছাড়াও 'ধূপছায়া', 'কল্লোল, 'যে সব মাসিক পত্রিকায়... এই বইযেব প্রায় সমস্ত কবিতাই প্রকাশিত হযেছিল' তখন তারা আর নেই। তাঁর কবিতা নিযে অস্বাচ্ছন্দ্যের একটা হাওয়া রয়ে গেছে। সম্ভবত ১৯২৮এই কর্মহীন হয়ে কলকাতা ছাড়তে হযেছিল তাঁকে। ১৯২৮এর মাঝমাঝি জীবনানন্দের সিটি কলেজের চাকরি যায়।

চাকরি যাওয়া নিয়েও একটা কিংবদন্তি প্রচার হযে ছিল অনেক দিন। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে বুদ্ধদেব বসু লেখেন 'এ কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে "পরিচযে" প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতার নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে কলকাতার কোনো এক কলেজের শুচিবাযুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করে দেন।' বুদ্ধদেব এ নিযে পবে 'দেশ' ১৯৭৫ সাহিত্য সংখ্যায 'চরম চিকিৎসা' নামে একটি নাটিকাও লেখেন। সে নাটকের খণ্ডন করে তাঁকে যখন চাকরি যাওয়ার 'অন্য কারণে'র কথা জানানো হয় তিনি লেখেন 'আমার যত দূর মনে পড়ে, আমি জীবনানন্দের মুখেই একবার শুনেছিলাম যে ঘাইহরিণী লেখার জন্য তিনি তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক মহাশযের দ্বারা তিরস্কৃত হযেছিলেন।' 'পরিচয়ে' 'ক্যাম্পে' কবিতা প্রকাশ হয় চাকরি যাওয়ার অন্তত তিন বছর পর। বুদ্ধদেবের আগে অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' লিখেছিলেন: 'সিটি কলেজে লেকচারারের কাজ কবত জীবনানন্দ। কবিতায় শস্যশীর্ষে স্তনশ্যামমুখ কল্পনা করেছিল বলে শুনেছি সে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে, অশ্লীলতার অপবাদে তার চাকরিটি কেড়ে নেয়। যত দূর দেখতে পাই অশ্লীলতার হাড়িকাঠে জীবনানন্দই প্রথম বলি।'

অচিন্ত্যকুমারের বোধ করি মনে পড়েছে 'পিপাসার গান' কবিতায় 'ফসলের স্তন' (প্রগতি, ফাল্গুন ১৩৩৪), চাকরি যাওয়ার মুখে মুখে লেখা। পরেও জীবনানন্দের 'অবসরের গান'এ আছে: 'চারি দিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল/ তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল...'। সে কবিতা অবশ্য বেরোয় চাকরি যাওয়ার বর্ষ কাল পর 'প্রগতি' কার্তিক ১৩৩৬ সংখ্যায়। কিন্তু মান্য ইতিহাসেও তথ্য হয়ে উঠেছে চাকরি যাওয়ার এই উপলক্ষ্য। সুকুমার সেন লিখেছেন,'কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে তাঁহার কোনো কোনো কবিতার ভাব সুরুচির গন্ডি উল্লঙ্ঘন করার অজুহাতে তাঁহার কর্মচ্যুতি হয়।'

জীবনানন্দেব চাকবি অবশ্য যায কলেজেব আভ্যন্তবিক, বা তজ্জনিত ব্যাপক সমস্যাব ফলে, যত দূব জানা যায। কলকাতা ১৯ থেকে সবোজেন্দ্রনাথ বায 'দেশ' ১৩ই জুলাই ১৯৬৮ সংখ্যা কাগজে এক পত্রে লেখেন

'জীবনানন্দবাবু বছব দুযেক সিটি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯এ সেখান থেকে তাঁব চাকুবি যায। এই সময সিটি কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টব হেবম্বচন্দ্র মৈত্র। মৈত্র মহাশয অতি নীতিপবাযণ ও রুচিবাগীশ ব্যক্তি বলে খ্যাত। তাঁব নীতিপবাযণতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে যাব কিছু কিছু তিনি নিজেও জানতেন ও কৌতুক অনুভব কবতেন। জীবনানন্দবাবুব চাকবি যাওযা ও তাঁব নীতিপবাযণতাকে যুক্ত কবে একটি কাহিনী বচিত হওযা অস্বাভাবিক নয। শুধু বুদ্ধদেব বসু একলা নন, আবো কেউ কেউ কবেছেন। আমি এই সময সিটি কলেজে দাযিত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। তখনকাব অনেক বৃত্তান্ত আমাব জানা আছে। আসল কথা এই যে ১৯২৮ সালে সবস্বতী পূজাকে কেন্দ্র কবে কলেজে ভীষণ ছাত্রবিক্ষোভ হয। ফলে কলেজেব আড়াই হাজাব ছাত্রেব মধ্যে প্রায দু হাজাব কলেজ ছেড়ে চলে যায ও কলেজ নিদারুণ অর্থসঙ্কটেব সম্মুখিন হয। এই কাবণে কলেজেব প্রত্যেক বিভাগ থেকে কিছু কিছু ছাঁটাই হয। জীবনানন্দবাবু ইংবেজী বিভাগে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন। ফলে তাঁব চাকবি যায। এ ঘটনা খুবই দুঃখদাযক। কিন্তু ব্যাপাবটি এইরূপ।'

এই পত্রে সিটি কলেজে জীবনানন্দেব দু বছবেব চাকবি এবং ১৯২৮এব বর্ষাবম্ভেব ঘটনাব জন্য '১৯২৮ কিংবা ১৯২৯' এর দ্বিধাটুকু মাত্র দূবস্মৃতিজনিত।

সিটি কলেজ হাঙ্গামা সে সমযে ব্যাপক আকাব ধাবণ কবেছিল। ব্রাহ্ম পবিচালিত কলেজেব বামমোহন বায হোস্টেলে ছাত্রদেব সবস্বতী পূজা নিযে কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে বিবোধ বাজনীতিজড়িত হযে পড়ে অচিবেই। অধ্যক্ষ হেবম্বচন্দ্র মৈত্র এবং ছাত্রাবাসেব সুপাবিন্টেণ্ডেন্ট ব্রজসুন্দব বায কঠোবতা অবলম্বন কবেছিলেন, অবাধ্য ছাত্রদেব জবিমানা, বহিষ্কাব পর্যন্ত দণ্ড হয। ছাত্রবা ধর্মঘট কবেন, পুলিশ ও প্রশাসন এসে হস্তক্ষেপ কবে, ছাত্র গ্রেফতাব হয। হিন্দু ধর্মনেতাবা 'হিন্দু ধর্মেব অপমান, সিটি কলেজ বর্জনে'ব আহ্বান তোলেন, বাজনীতি নেতাবা ছাত্রদেব পক্ষ নিযে আলোচনা মামাংসায নিবত হন। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব কলেজ কর্তৃপক্ষেব সমর্থন কবে 'মডার্ন বিভিউ'যে পত্র লেখেন (মে ১৯২৮) এবং প্রবাসী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ সংখ্যায 'সিটি কলেজেব ছাত্রবাসে সবস্বতী' পূজা নামে প্রবন্ধ, 'শনিবাবে চিঠি' আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৫ সংখ্যায ছাত্রপক্ষীযদেব বিরুদ্ধে যোগানন্দ দাস অশোক চট্টোপাধ্যায সজনীকান্ত দাস গদ্য পদ্য ও ব্যঙ্গ বচনা প্রকাশ কবেন। 'দেশ' পত্রিকাব পূর্বোদ্ধৃত পত্রেব লেখক সবোজেন্দ্রনাথ বাযই সম্ভবত অধ্যাপক অমিযকুমাব সেনগুপ্তেব সঙ্গে কলেজেব পক্ষে মীমাংসাব জন্য বর্মা জেল থেকে সদ্য মুক্তি পেযে ফেবা সুভাষচন্দ্র বসুব কাছে গিযেছিলেন।

'আনন্দবাজাব পত্রিকা' ৩০ জানুযাবি ১৯২৮এব কাগজে লেখেন, ব্রাহ্মবা মূর্তিপূজাব বিবোধী, কিন্তু তাই বলিযা ইহা কর্তব্য নহে যে অপবেব উপব জোব কবিযা সেই বিধি চাপাইযা দেওযা। হোস্টেলে হিন্দু ছেলেবা সবস্বতী পূজা কবিলে ব্রাহ্ম সমাজেব কী ক্ষতি বৃদ্ধি হয? ববং ছেলেদেব পূজা উৎসবে বাধা না দিলেই তাঁহাবা ছেলেদেব শ্রদ্ধা ভক্তি অধিকতব সহজে আকর্ষণ কবিতে সমর্থ হইবেন।' ১৩ ফেব্রুযাবি ১৯২৮এব কাগজে 'সিটি কলেজ সবস্বতী পূজা বিতর্কে'ব উত্তব লেখেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায। ১৪ ফেব্রুযাবিব কাগজে 'সিটি কলেজেব ব্যাপাব/ছাত্রদেব স্বাধীনতা চাই নামে দীর্ঘ দু কলম 'বামমোহন বায হোস্টেলেব ছাত্রদেব বর্ণনা' ছাপা হয, ১৮ই ফেব্রুযাবি সিটি কলেজেব গণ্ডগোলেব এবং ২২শে ফেব্রুযাবি হিন্দু ছাত্রদেব উপব 'বাস্টিকেশন ও একসপালশনে'ব সংবাদ। ১লা মার্চ ১৯২৮ অ্যালবার্ট হলে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদাব কিবণচন্দ্র দত্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিদেব উপস্থিতিতে সভা হয, 'সিটি কলেজেব ধর্মঘটি ছাত্রদেব গ্রেফতাবে' অতঃপব ২০শে জুলাই সভা হয, পুনবায ৮ই অগস্ট সভা হয, ওই হলেই। তিন সভাতেই সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ দিযেছিলেন।

ববীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'ব প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'প্রতিমা পূজাব সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও যে সিটি কলেজকে দেশেব সকল সম্প্রদায অনাযাসে এত কাল স্বীকাব ও ব্যবহাব ক'বে এসেছে আজ তাকে নানা উৎপাতে ধ্বংস করে দেওযা দুঃসাধ্য না হতে পাবে কিন্তু এই আঘাতে আমাদেব দেশেব এক সম্প্রদাযেব মনে যে কাঁটা গাছ রোপণ কবে দেওযা হবে, সেটা দিযে আমাদেব এই শতধা বিচ্ছিন্ন দুর্ভাগা দেশে আস্ফালন কবাতে কি পৌরুষ আছে, না তাতে ধর্মবুদ্ধি বা কর্মবুদ্ধিব পবিচয দেওযা হয?' সুভাষচন্দ্র যুক্তি

দেখিয়েছিলেন, 'সরকার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দু কয়েদিদিগকে জেলখানায় পূজা করার যে অধিকার দান করিয়াছিল, আশ্চর্যের বিষয় সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ সে অধিকার দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।' সুভাষচন্দ্র অন্তরীণ থাকা কালে মান্দালয় জেলে রাজবন্দীরা দুর্গা পূজা ও সরস্বতী পূজা করেছিলেন।

সজীনকান্ত দাস এই ঘটনাকে 'আন্দোলনের নামে ছাত্রসমাজের ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন (দ্র''আত্মস্মৃতি' ১৩৮৪ পৃ ২৪৪–২৪৯)। কিন্তু·বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনে ছাত্রদের উত্তরোত্তর যোগ, বিশেষ করে অব্যবহিত সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৮এ সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে ব্যাপক হরতাল ও বয়কটে ছাত্রদের সক্রিয়তার ফলে সরকারি ছাত্র দমন নীতির মধ্যে সিটি কলেজের ঘটনাও জড়িয়ে গিয়েছিল। সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে হরতালে বা অপর সরকারবিরোধী কার্যক্রিয়ায় অংশ নেওয়ায় বরিশালের ভোলা ও সরকারি স্কুলে, খুলনার দৌলতপুর কলেজে, কলকাতাব স্কটিশ চার্চ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রেরা দণ্ডিত হয়। স্কটিশের শচীন্দ্রনাথ মিত্র সাস্পেন্ড হন। প্রেসিডেন্সির প্রমোদ ঘোষাল গ্রেফতার হন। ১০ই ফেব্রুয়ারি ও ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৮এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য 'প্রেসিডেন্সি কলেজে পুলিশি তাণ্ডব', 'হিন্দু হোস্টেলের ছাত্র বহিষ্কার', 'প্রমোদ ঘোষালের গ্রেফতার' ইত্যাদি বিবরণ ছাপা হয়েছে। সিটি কলেজের সরস্বতী পূজা নিয়ে এতখানি ঘটনা এরই প্রসার বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত সে সময়ের ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, ১৯২৮এব কলকাতা কংগ্রেসে প্রধানত ছাত্রদের নিয়েই তিনি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করেছিলেন, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামে তা সারা দেশে ছড়িয়ে যায়, ১৯৩০এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে এঁদেরই কারও অনন্য ভূমিকা ছিল।

সিটি কলেজের ঘটনায হিন্দু ছেলেবা সদলে কলেজ ত্যাগ করলে কলেজে যে অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় তাতে আরো অনেকের সঙ্গে জীবনানন্দের কাজ যায়। কলকাতার যশস্বী অধ্যাপকেরা অনেকে সিটি কলেজে তখন অবৈতনিকভাবে পড়িয়েছিলেন। চাকবি যাওয়ার পর অন্যূন বৎসরকাল কর্মহীন থাকার পব ১৯২৯এব কোনো সময পুনরায় তিনি খুলনা বাগেরহাটের প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে কর্ম লাভ করেন, কযেক মাস না যেতে ডিসেম্বরে এসে যোগ দেন দিল্লী উপকণ্ঠের রামযশ কলেজে, অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার দত্ত তখন সেখানে অধ্যাপক, সম্ভবত তাঁরই সূত্রে চাকরি। সুধীরকুমার জীবনানন্দেব বন্ধুস্থানীয, ১৯৩৪এ তিনি পি. এইচ. ডি. হন, জীবনানন্দ 'স্মৃতি–তর্পন' লিখেছিলেন তাঁব মৃত্যুতে (এপ্রিল ১৯৪২)। প্রসঙ্গত, সুকুমাব দত্ত ও হীরালাল দাশগুপ্ত একত্রে বরিশাল থেকে 'তরুণ' মাসিকপত্র সম্পাদনা করতেন 'কল্লোলে'র কালে, 'কল্লোলে'র প্রায একই সময়ে বেরোতে শুরু করে 'তরুণ', জীবনানন্দ সে কাগজে লিখেছেন বলেও সম্ভব, কিন্তু তাব কোনো তথ্য জানা যায় নি।

কিভাবে কেটেছিল কবিব ১৯১৭ থেকে ১৯২৮ বাবো বছর? কলকাতার সাহিত্যমণ্ডলীতে তাঁর পরিচয হয়েছিল, ঘনিষ্ঠতা হয নি। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, 'জোর কবে তাকে দু–একদিন কল্লোলেব অফিসে টেনে নিযে গেছি, কিন্তু একটুও আরাম পায নি, সুর মেলাতে পারে নি সেই সপ্তস্বরে।' বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও "কল্লোল" আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন অন্তত আমি তাঁকে সেখানে কখনও দেখি নি।' আরো লিখেছেন, 'কোনো সাহিত্যিক আলোচনাব মধ্যেও তাঁকে টানতে পারি নি আমরা, "কল্লোলে"র, "পরিচয়ে"র, "কবিতা"র আড্ডা তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন।' 'পরিচয বা 'কবিতা' জীবনানন্দের কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পরের ব্যাপার, কিন্তু 'আমৃত্যু তাঁব কবিজীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও', বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'তাঁর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আমি স্থাপন করতে পারি নি, অন্য কেউ পেরেছিলেন বলেও জানি না।' মনে হয একা সজনীকান্ত অনবচ্ছেদ টিপ্পনী সহকারে জনচিত্তে কৌতূহলপ্রদ করে রেখেছিলেন তাঁকে (বাণী বাযকে জীবনানন্দ বলেছেন, 'সজনীবাবুকে বলবেন এমনিভাবেই যেন আমার আরো প্রচাব করেন।' দ্র. 'বিহঙ্গ নিঃসঙ্গ' ১৩৮০ পৃ ১১), কিন্তু তারও সূত্রপাত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতা দিয়ে, জীবনানন্দের শহর ছাড়ার সময থেকে।

জীবনানন্দের কলকাতা বাসের আরম্ভ বছরে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে, ভার বদল হতে চলেছে আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে। অর্থ ও শক্তির স্থানান্তর ঘটছে ইয়োরোপ ছেড়ে, আর্মিস্টিসের সময় সম্পন্ন ইয়োরোপ তখন দেনদার; তখনও পৃথিবীর সে কৃষ্টি কেন্দ্র, কিন্তু যুদ্ধ ব্যয় নিরাপত্তা আর আরোগ্য নিয়ে বিব্রত তখন— এক দিকে তার বিপণন রাজ্যসমূহে প্রভাব পড়ছে আমেরিকার, অপর দিকে এশিয়াদেশি জাপান বাণিজ্য ও প্রভুত্বের সাম্রাজ্য বিস্তার করছে দূর প্রাচ্যে। পারির শান্তি

অধিবেশনে মুখ্য ভূমিকা নিতে এলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, নতুন একটা বিশ্ব বিন্যাস, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের নতুন আচরণবিধির প্রস্তাব নিয়ে দেশ ছেড়ে ছ মাস ইয়োরোপে কাটিয়ে যেতে তাঁর অনবকাশ নেই। অগোপন কূটনীতি, জনমতের মর্যাদা স্বীকার আর স্বাধীনতাপ্রয়াসী জাতিসমূহের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দান—শান্তি অধিবেশনে তাঁর এই তিন প্রস্তাবের সূত্র ধরে গড়ে উঠছে লীগ অফ নেশন্‌স্। সে জাতিসঙ্ঘে অশ্বেত প্রজাপুঞ্জের কী ভূমিকা? চীনে জাপানি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রসিদ্ধ একুশ দফা দাবি শান্তি অধিবেশনে অনুমোদিত হলে পরে উইলসনের এশিয় দেশসমূহের আত্মনির্ধারণ অধিকারের নীতি ঘা খেয়ে গেল, তার বিরুদ্ধে ১৯১৯এ চতুর্থ জাতীয় নির্যাতন দিবসে ব্যাপক ৪ঠা মে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল বিজিং থেকে চীনের অন্যান্য শহরে—চীনের প্রথম দেশপ্রেমী গণতন্ত্রী আত্মনির্ধারণের এই আরম্ভ। মুস্তাফা কামাল তুরস্কের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, কৃষ্ণ সাগর কূলের সমসুন নগরী থেকে, পরে সে হল ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কি রিপাবলিক; 'কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই' বলে তার সংবর্ধনা করে উঠেছেন নজরুল ইসলাম। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, আর্মিস্টিস ঘোষণার দিনে সন্ধ্যেবেলা ফরাশি প্রধানমন্ত্রী ক্লমাঁসো কঁতেস্ দ নোয়াইকে ডেকে তাঁর মুখে 'গীতিঞ্জলি'র কবিতা শোনেন। জাপান ও আমেরিকার এই অভূত বিকাশের দিনে রবীন্দ্রনাথ পর পর উভয় দেশ পরিক্রমা করে লেখবন্দ্ধ কবে তুললেন জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতামত। এই রাষ্ট্রচিন্তা রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করার অভিলাষ করেছিলেন উড্রো উইলসনকে। অনুমতি মেলে নি। উইলসন ১৯২৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

ভারতে ব্রিটিশ আচরণে ক্ষমতা হারাবার অস্থিরতা নিষ্ঠুরতা যেন প্রকট এই সময় থেকে। ১৯১৯এ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ খেতাব প্রত্যাহার করলেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীরও কার্যারম্ভ হল প্রায় পিঠোপিঠি, সেখানে ইংরেজ আওতার বাইরে থেকে অধ্যাপক হয়ে এলেন সিলভাঁ লেভি। পরে এলেন জার্মান ভিন্টারনিট্‌স্, ফরাসি বেনোয়া, রুশ বগদানভ। পরে: লেস্‌নি স্টেলা ক্রামরিশ, গ্লোমিয়ো ফ্লাউম। সমাজবিপ্লবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লেনিনিস্ট নীতির প্রতি অনুগতি পরায়ণ নানা দেশি ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুদয় হল, সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে মার্চ ১৯১৯এ কমিন্‌টার্ন গঠিত হল রাশিযায়। ১৯২০তে ভারতের বাইরে তাসখন্দে সূচনা হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, ডাঙ্গে মুজফফর আহমেদ তাতে যোগ দিলেন। ১৯২১এ (সক্রিয় কার্যারম্ভ কানপুর ১৯২৫এ)। মানবেন্দ্রনাথ বাযের তত্ত্ব ছিল বিশ্ব কমিউনিজ্‌মের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এশিযায বিপ্লব ঘটানো, কেননা যে উপনিবেশ দেশসমূহের লভ্যার্থে ধনতন্ত্রের নির্ভর তার কোনোটাই ইযোবোপে নয, সবটাই এশিয়ার দেশে।

নতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল ১৯২১এ। কবি-লেখকদের মধ্যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মোহিতলাল মজুমদার সুশীলকুমার দে সেখানে গেলেন অধ্যাপক হযে, 'প্রগতি'ব মূল লেখকেরা অনেকেই ছাত্র হযে এলেন সেখানে। এই ১৯২১এ অসহযোগের তীব্র বছরের মাঝামাঝি সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরলেন। বোম্বাইয়ে 'মহাত্মা'র সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁকে কলকাতায দেশবন্ধু সি. আব. দাশের সঙ্গে সংযোগ করতে উপদেশ দিলেন, সাক্ষাতেব পর, সুভাষচন্দ্র লিখছেন, 'By the time our conversation came to end. my mind was made up. I felt that I had found a leader and I meant to follow him'.তাঁর কারাবরোধ হল ডিসেম্বরেই। 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্র বেরিয়েছিল ১৯২০তে, নলিনীকান্ত সরকারের সম্পাদনায, আন্দামান দ্বীপান্তর মুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যুক্ত হয়েছিলেন তার সঙ্গে। ১৯২২এ নজরুল বের করলেন 'ধূমকেতু', তারপর 'ভারতের আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের জাগরণশীল শ্রেণীচৈতন্যের' মুখপত্র 'লাঙল'। রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতু'র প্রতি সংখ্যায ছাপবার কবিতায লিখে দিয়েছিলেন: 'জাগিয়ে দে রে ডঙ্কা মেরে আছে যারা অর্ধচেতন।' ১৯২২এর ৯ই জুলাই রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ এসে পড়ে গেলেন তাঁর 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' শোক কবিতা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মৃত্যু ২৪শে জুন ১৯২২)। সেই সভায় অ্যান্ড্রুজ সাহেব এসেছিলেন খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে, তরুণ কবি-লেখকেরা গিযেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠন করতে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরে সভা আর জমল না। ১৯২৩এ দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে হল স্বরাজ্যপার্টি, 'ধূমকেতু'র লেখার জন্য রাজরোষে পড়লেন নজরুল, অনশন শুরু করলেন হুগলি জেলে। তাঁর জন্য দেশবন্ধু সভা করলেন কলেজ স্কোয়ারে (চিত্তরঞ্জন, পরে সুভাষচন্দ্রের প্রিয়জন হয়েছিলেন নজরুল, তাঁদের জনসভার উদ্‌বোধন হত অনেক সময়েই নজরুলের গান দিয়ে), রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' (স্বরলিপি খণ্ড) উৎসর্গ করে পাঠালেন তরুণ কবিকে, টেলিগ্রাম লিখে পাঠালেন 'give up

hunger strike, our literature claims you.' অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুও এই বছর। বরিশাল জেলে ৬১ দিন অনশন করে তাঁর শূন্য স্থানে মুক্তি পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন অসহযোগের বন্দী সতীন্দ্রনাথ সেন, সেও এই বছর। সতীন সেন পরে গান্ধীপন্থী হন,কারারুদ্ধ হয়ে দীর্ঘতর দিন অনশন করেন আম্বালা জেলে। ১৯২৪এ পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গির মোড়ে কুখ্যাত টেগার্ট সাহেব ভ্রমে অপর এক ইংরেজকে হত্যা করে ফাঁসি গেলেন গোপীমোহন সাহা। মার্চের প্রথম তিন দিন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ে তিনটি ভাষণ দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' তার সারাংশ উদ্ধৃত করেছেন। এ বছরেই কার্তিক সংখ্যা 'কল্লোলে' বিশ লাইন আলোচনা বেরোলো শৈলেশনাথ বিশীর 'বোলশেভিকবাদ' বইয়ের। ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনী সেরে ফিরে আসার পর চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হল ১৯২৫এ ১৬ই জুন। ১৯২৬এর এপ্রিলে দাঙ্গা বাধল কলকাতায়, খুন ক্ষয় হল সারা মাস ধরে। ১২ই জানুয়ারি ১৯২৬এর বিজ্ঞপ্তিতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' নিষিদ্ধ হল। মার্চে সাম্প্রতিক লেখার বেআব্রু বাস্তবতা আর সঙ্গত সাহিত্যধর্ম নিয়ে তুমুল বাদাবাদির মীমাংসা সমাবেশ হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে, ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪। তাতে নবীন কবি-সাহিত্যিকেরা অংশ নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূল বক্তা। ১৯২৮এর কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু জওয়াহরলাল নেহেরু—অভ্যুদয় হল দুই নবীন নেতার। তরুণ লেখকের আবাধ্য দুই উপন্যাস বেরোলো দেশেবিদেশে: 'শেষের কবিতা' আর 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার'। লরেন্স সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথের 'শ্রদ্ধা প্রায় অসীমের কাছাকাছি'। আর 'শেষের কবিতা'য় বুদ্ধদেব বসু দেখেছেন 'গতিশীল দ্যুতিময় ভাষায় লেখা আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ ধাঁধানো মূর্তি'। ১৯২৯এ কোরীয় যুবকের জাপানি রাষ্ট্রশাসনের সহস্রমুখী শোষণের অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই যে কথাগুলি ভাবছ, এবং বলছ, এই যে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় আত্মসম্মানের জন্যে তোমার আগ্রহ, তার কারণ কি এই নয় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তোমরা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত। আরো বলেন, 'মনে করো, রাশিয়া যদি কোরিয়ায় ধ্বজা গেড়ে বসে তবে সেটা, কেবল কোরিয়ার পক্ষে নয়, জাপানের পক্ষেও বিপদ।' এমন অবস্থায় জাপানকে 'প্রাণের দায়ে'ই কোরিয়ায় শাসন টিকিয়ে রাখতে হয়। ১৯২৯এর গোড়ায় 'সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তাহার' নামে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ ছাপলেন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টির আবদুল হালিম। সৌম্যেন্দ্রনাথ ১৯৩২এ 'মশাল' কাব্যগ্রন্থ বের করেছিলেন, তাতে 'বিপ্লবের দীক্ষাগুরু' লেনিন, বিপ্লবের নগরী 'মস্কভা', কার্ল মার্কসের ১৮৩৭এ লেখা 'বিপ্লবমূলক শ্রেণী সংঘাতে'র মূল জার্মান থেকে তর্জমা ছাপা হয়েছিল এবং পুরোভাগে 'আমাদের কবিতা' বলে এই বিপ্লবী আর্স পোয়েতিকা, তার প্রস্তাব:

'আমাদের কবিতা বুর্জোয়া সমাজের এই বাংতায় মোড়া জীবনের রাংতা ঘোচাবার কবিতা।'...

'আমাদের কবিতা মানুষের মন ভোলানো ভাবুকতার রামধনু সৃষ্টি করে না।'...

'আমাদের কবিতা এস্‌থেটিক-বিরোধী, অনন্ত-বিরোধী, সৌন্দর্য-বিরোধী, ধর্ম-বিরোধী, যেহেতু এস্‌থেটিক অনন্ত সৌন্দর্য ধর্ম সবই হচ্ছে বুর্জোয়াদের লোকঠকানো ইন্দ্রজাল, এই জীবনের বাস্তব অবস্থা থেকে লোকদের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার ভানুমতীর খেলা...।'

সৌম্যেন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে (সেপ্টেম্বর ১৯৩০। রেভলিউশ্যানারি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন পরে। তাঁর এই প্রস্তাবিত ধারায় কবিতা লেখা শুরু হতে অবশ্য আরো দিন লেগে গেছে এদেশে।

জীবনানন্দ কত দূর বিচলিত হয়েছিলেন ঘটনাপ্রবাহে? অসহযোগ-সত্যাগ্রহে? হরতালে বিক্ষোভে? নেতৃদলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়? বিশ্বাবর্তে, বা তার স্থানিক সঞ্চারে? নজরুলের কবিতায়, অনশনে? তিনি কি সত্যেন্দ্র-স্মৃতিসভায় গিয়েছিলেন, অথবা জোড়াসাঁকো সাহিত্য মীমাংসার সভায়? 'অ্যালবার্ট হলের পোলিটিকাল বক্তৃতা'র দু-এক ছত্র অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় বটে তাঁর উপন্যাসে। 'বিবেকানন্দ','দেশবন্ধু' কবিতাতেও সেকালীন উদ্দীপনা আছে। ক্লৈব্য সংহারী সব্যসাচী অস্ত্রীর, রুদ্র ও বুদ্ধের, বাউল-বৈরেগীর একই উপমায় নির্ণীত হয়েছেন দুজনে। বইয়ে না ছাপা 'রামদাস' কবিতাতেও 'জাতির মুক্তি, দেশের সেবায় আত্মাহুতি' দেবার কথা আছে, 'হিন্দু-মুসলমান' ১৯২৬এর দাঙ্গা ও মৈত্রী কর্মসূচীর তথ্য দিয়ে লেখা: 'মোসলেম বিনা ভারত বিফল, বিফল হিন্দু বিনা'। 'পতিতা' কিংবা 'নব নবীনের লাগি' কবিতায় দেখা যায় সে সময়ের সমাজবাদ-মানববাদের অভ্যস্ত ভাষা: 'মানুষ তবুও, তার চেয়ে বড়ো সে যে নারী, সে যে নারী' বা 'প্রদীপ নিভায়ে মানবদেবের দেউল যাহারা ভাঙে, আমরা তাদের শস্ত্র শাসন আসন করিব ক্ষয়।' 'কল্লোল' জীবনানন্দের কবিতার 'তারুণ্যের উল্লাস' বলে পরিচয় লিখেছিলেন, কল্লোলীয়েরা অশ্লীলতার

জনশ্রুতি চাউর করে হয়তো পাঠক বিস্তার করতে চেয়েছিলেন তাঁর, কিন্তু জীবনানন্দের প্রথম কাব্যেও এর ভাগ বেশি নয়। বরং কিছু মনশ্চিত্র ছড়িয়ে আছে বইয়ের ছিন্নাংশ শহররেখায়— নিষ্করুণ রাজপথে হেঁটে চলা ছিন্নবাস নগ্নশির ভিক্ষু দল, দরিয়ার দেশ ছেড়ে এসে জ্বলন্ত নিষ্ঠুর দাব-মরুভূমির মতো নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষের মৃত্যুপ্রেতপুরী— এই সব পঙ্‌ক্তিতে। শহর যে তাঁর কাছে 'নগরী-মরু', নদীদেশ ছেড়ে যে তাঁর নিরুপায় বাস এখন এখানে সে কি'ডাকসাইটে খেঁদির দলে'র সেই শহর? 'পাঁক' নভেলের? নভেলের 'সমসাময়িক ঘনঘটাচ্ছন্নতা' অবশ্য এ লেখায় থাকবার নয়। সত্যেন্দ্র দত্তের 'আঙ্গিকের অসংখ্য কৌশল নিয়ে বিলাস ও ব্যসনের সদিচ্ছা' কি আছে তাঁর ছন্দকলায়? হয়তো সে সময়েও জীবনানন্দের সে বিশেষ গণনীয় মনে হয় নি। হয়তো তখনই তিনি নিশ্চয় হয়েছিলেন নজরুলের নিশানবাহী সময়োত্থ কবিতা 'চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়।' ১৯৫০এ লিখেছেন, তখন সময়ের কতকগুলো আনুষঙ্গিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে 'তখনকার কবি ও সহজ সাধারণ পাঠকদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে এ সব ভাসমান "সামাজিক: জিনিসগুলো— জাতির পাঁতির অন্যায়, পাতিল বিল কেন বাতিল হল ও তার কী অর্থ ও পরিণাম, হোমা পাখির (হোম রুলের) ডিম কী জাতীয় জিনিস, অস্পৃশ্যতা, বিধবারা, পতিতারা সমাজে কী অতিপ্রাথমিক সমস্যার সৃষ্টি করছে... এ সব ভাসমান ধার্য জিনিসগুলো ছাড়া কবিতার অন্য কোনো সত্য বিষয়বস্তু নেই...', সে ক্ষেত্রে তাঁদের কবিতা 'আজ পর্যন্ত, আমার মনে হয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রকর্মের বৃত্তান্তে তেমন কিছু আবেগ ও মননভূমি না পেয়েও গভীরতর প্রসার পেয়েছে'। (দ্র' 'আধুনিক কবিতা' ও 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ, কবিতার কথায় সংকলিত)।

'ঝরা পালক' প্রসার হয়ে আছে আর-এক দিকে! আসিরিয়া-ব্যাবিলনের প্রত্ন নিঃশ্বসিত রূপ ও কামনা, পাঁজরের নীচে বওয়া 'দুরন্ত ঝাঁঝালো খুন',অবগুণ্ঠিতার হিম কালো কঙ্কালস্পর্শের অনুভব, হয়তো রবীন্দ্রনাথের কালিদাসের কালের চেয়ে, বা ব্রাউনিঙের বাসন্তী রোমান জগতের চেয়েও আরো পিছনের অবকাশ। 'ঝরা পালকে'র ঝরা ফসলের 'ঝরা পাতা ভরা মরা দরিয়া'র (ধানসিড়ি নদী?) পাশে বিস্তার হয়ে আছে 'আলেয়ার ভিজা মাঠ', 'প্রেত জ্যোৎস্না, বধির জোনাকী', 'পল্লীকান্তারের ছায়া, তেপান্তর পথের বিস্ময়', 'ঘুঘু হরিয়াল ডাহুক শালিখ গাঙচিল বুনো হাঁসে'র জগৎ। সে অজনে, কিংবা আর-কোনো সমাজপ্রান্তে—ভাঙা হাট খেয়া ঘাটে জনচ্ছিন্ন একা কবি হারানো খুঁজে ফিরছেন। সে কোন্ হারানো? 'ঝরা পালকে'র অনেকটাই স্মৃতি—দূর স্মৃতি, বন্দী স্মৃতি, উন্মাদনাময় স্মৃতি; সে দূরান্তের কোথাও পানপাত্র নৃত্যগীতের প্রমোদ মন্দির, কোথাও বালু-সমুদ্রে কশাঘাত জর্জর ক্লান্ত ঘোড়া অথবা সমুদ্রের যৌবন গর্জন, সিন্দু ঝড়। কবি সেখানে ওয়েসিস্-খোঁজা তাতার বেদুয়িনের, যেন দ্বীপবন্দরলক্ষ্য মাল্লার পঙ্‌ক্তি নিয়ে ছুটে চলেছেন— কল্লোলীয় বোহেমিয়ায়, হয়তো পরিণামক্ষান্তিহীন অনিকেতে,মাঝে পথে কখনও পড়ে শরাবশালা, সরাইখানা, কোথাও পাওয়া যায় খেজুর ছায়ায় কালো পশমিনা চুলে নার্গিস ফুল গাঁথা নারীর, অথবা পাতালপুরীর প্রবালপালঙ্কে মীনকন্যার পরিচর্যা। এক কবিতাতে কবি নিজের ক্রমান্বয় জন্মান্তর ঘটিয়েছেন আসিরীয় রাজা, প্রভঁসের কবি-ক্রুবাদুর, স্পেন সিয়েরার দস্যু ঘোড়সোয়ার এবং বাংলাদেশের কদমতলার শিখীচূড়াধারী বাঁশিবাজানো প্রেমিকের ভূমিকায়—এই আবেগটুকুই বোধ করি পরে সিদ্ধ রচনা হয়ে উঠেছে 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি...' কবিতায়। বুদ্ধদেব বসু উল্লিখিত 'ঝরা পালকে'র একটি মাত্র কবিতা 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলালে'র পুনর্বয়ন দেখতে পাওয়া যায় 'পরস্পর' কবিতায়, দ্বিতীয় কাব্যে। এ বইয়ের সমুদ্র আর 'জলধি-পাখি' বহমান প্রতীক হয়ে আছে পরের লেখাতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র-যুবনাশ্বের শহর নিয়েও জীবনানন্দ লিখতে পারতেন হয়তো ঘনঘটা উপন্যাস, কবিতায় তার ভাঙা-টুকরো দাগ ছাপ রয়ে গেছে কিছু। হয়তো সে এই শেষ ছাত্রদিন বা প্রথম চাকুরি দিনের শহর, হয়তো তখনই লেখা পরে অনুলেখা; হয়তো অদূর স্মৃতি টেনে লেখা,১৯৩১এ ৩২এ ১৯৩৩এর পাণ্ডুলিপি খাতা খুঁজলে পাওয়া যায়।'বনলতা সেন' ২য় সংস্করণে 'পথ হাঁটা' কবিতার কয়েক ছত্রে সে শহর সত্ত্ব লক্ষণ পেয়ে উঠছে, পূর্ব পাণ্ডুলিপি-পাঠটি আরেকটু জীবনতলপ্রত্যক্ষ (দ্র' এই বই পৃ. ৭০৭-৭০৮), সেখানে 'গলির ঘুঁজির ফাঁকে ডাস্টবিন ইঁদুরের বিড়ালের অস্পষ্ট জগৎ', নেড়ি কুকুরের ক্ষুধিত মুখ চূর্ণ হয়ে ট্যাক্সির নীচে প'ড়ে, হাইড্রেন্ট খুলে দিয়ে গা ধুতে বসেছে কুষ্ঠরোগী— এই সব লাইন যেন উঠে এসেছে ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ থেকে:

'গ্রে স্ট্রীটে অন্ধকারের ভিতর সারি সারি যে রূপহীনা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে একটা খোঁচা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না। কলেজ স্ট্রীটে হাঁটতে হাঁটতে দেখি ফুটপাথে ন্যাকড়া জড়ানো পায়ে পা ছড়িয়ে

কুষ্ঠরোগীরা বসে আছে সব। নুলো হাত তুলে অবিশ্রাম সেলাম ঠুকছে...'।

'ধুসর পাণ্ডুলিপি' শহরের দিকে পিঠ ফেরানো লেখা। 'বনলতা সেনে'র 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' কলকাতা, 'মহাপৃথিবী'র 'শহর' আর 'ফুটপাথে'র লেখাও অতিগ হয়ে আছে বদ্ধ শহরের। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের, কলের, মানুষমমতারিক্ত শহরের টুকরো টুকরো না ছাপা বহুতর ছবি জমে আছে পাণ্ডুলিপিতে—রচনাবিন্যাস পড়ে নি, কিন্তু অভিজ্ঞতার টুকবো হয়ে আছে। গরমি দুপুরের স্ট্র্যাণ্ড রোড যেখানে 'গঙ্গা এত কাছে তবুও গঙ্গা কত দূরে, (দ্র. পৃ. ৭৩৯-৭৪০), হয়তো কলকাতা মেসবাড়িরই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে—

সারা দিন ট্রাম বাস—ফেরিঅলাদের ডাক—কুষ্ঠরুগি পথের উপর—

হাড়ভাঙ্গা মহিষের গাড়িগুলো—বাজারের রুক্ষ শব্দ—বস্তির চিৎকার—

—গ্রে স্ট্রীটের রাস্তায় 'রাত থেকে রাতে জীবনের নর্দমার ক্লেদ ক্লান্তি সব/ফুটপাথে ইহাদের পাশে এসে জড়ো হয—মেথর, ডকেব কুলি, মুটে, এক জন দুই জন কুঠে'—এসে জড়ো হয নিঃসাড়ে—'যেই মাংস পাবে নাকো শুধু তার ছবি দেখে',

—ঘ্রাণে, আরক্ত আশ্বাসে তৃপ্তি পেয়ে, ফিরে যায তারপর,

কারণ এ পৃথিবীতে মাংস শুধু কথা কয-কথা কয- আর সব নীরব।

ট্রামের লাইন ধরে হাঁটছেন কবি, গভীর রাত: 'তুমি যেন বড ভাঙ্গা ট্রাম এক—ডিপো নাই—মজুবিব প্রযোজন নাই'—নিজেকে তাঁর মনে হচ্ছে, কিংবা আরেক রাতে দাঁড়িয়ে দেখছেন

শহর নীরব আর হয নাকো।
কারা যেন জীবনেবে ফুরাতে পাবে না আব,
কথা কাজ রগড় লালসা ঘৃণা উত্তেজনা নিয়ে
ঘুমাতে পারে না আর,
সারা বাত তাহাদের হিংস্র চিৎকার—

বিশের দশকে দেখা। হরিপদ ঘোষ পোস্ট অফিসের কেরানিকেও দেখেছিলেন তখন। পাণ্ডুলিপির 'কেবানিরা' নামে লেখায কবি দেখেছেন শীতের দুপুরে অফিসের অন্ধকারে বসে ফাইল নাড়ছে কেরানিযা—'মৃত পাখিদেব পালকের মতো ফাইলগুলো, কিংবা এই ফাইলেব কেবানিরা।' পুরো তুলে দি আব—একটি লেখা:

কলকাতার মযদানে
বৈশাখের রাতে— বিশাল নক্ষত্রেব বাতে
　　বিস্তৃত বাতাসে
দুজন লোক চাব হাজাব ছাপ্পান্ন টাকাব কথা বলছিল,
পরেব দল সাড়ে-ছ হাজার সাড়ে-ছ হাজাব কবছিল...
সাড়ে-ছ হাজাব কী? নক্ষত্র? সাবা বাত? চুমো? সমুদ্রেব ঢেউ?
সাড়ে-ছ হাজাব টাকা।
তাবপবেব লোকটি চাব টাকা পাঁচ আনাব হিসেব দিয়ে চলেছে,
পরের লোকটি রুপেয়ার কথা বলছে,
আমিও ভাবছিলাম একটা ঘষা সিকি দিয়ে কে আমাকে ঠকাল?
এই সিকিটা দিয়ে কী হবে?
বৈশাখের বিশাল নক্ষত্রের রাতে
　　　　বিস্তৃত বাতাসে।

শহর তাঁর গ্রামকল্পও হয়ে উঠেছে কখনও: 'ট্রাম বাস— নিঃশব্দে নদীর জলে হাঁসের মতন... আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলো সাপের মতন—যেন কোন্ এক পাড়াগাঁর, বিন্দু বিন্দু আলোগুলো গ্যাসের? না জোনাকীর?' শহর বদলে গ্রাম হয়ে ওঠে ফের পরের সংস্কারে: 'এখানে লেকের পাশে এসো বসি—এই বুঝি— ধাকুড়িয়া লেক এর নাম'—১৯৩৪ এর এই লেখা ১৯৫৩ র ছাপায় হয়ে উঠল: 'এখানে জলের পাশে বসবে কি? জলঝিরি এ নদীর নাম' (দ্র' পৃ. ৬১১-৬১২)। ১৯২৩এর চাল কড়ি নুন বাড়ন্ত ভাড়া বাকি বৌবাজারের বস্তির ঘরে শহরিণী বিভারানী বোসের সঙ্গে দুই অকৃতার্থ কবি ও চিত্রীর ঘর বাঁধার ক স্তবক স্বপ্ন লিখেছেন কবি ১৯৩৪এর পাণ্ডুলিপি খাতায় (দ্র. 'মনে পড়ে সেই কলকাতা—সেই তেরোশো তিরিশ', ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারির খাতায় লেখা 'বিভা' গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়। গল্পের বিভা বিদুষী ধনীদুলালী, মাদ্রাজি

মেয়েদের মতো দেখতে তাকে, শীত রাত জেগে বসে বই পড়ে— 'আনা কারেনিনা'? চাকর তার গরম কফি কেক বিস্কুট রেখে যায়, এক পেয়ালা ফুরোলে সে আরেক পেয়ালা ঢেলে নেয় পট থেকে—কী আরাম শীতের রাতে বই পড়তে পড়তে গরম কফি খেতে! পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে দেখে সেই আরাম গায়ে এসে লাগে যেন। ইংরেজি বুলি পড়া কাকাতুয়া কেনে বিভা দামের পরোয়া না করে, তারপর ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেয়ার আগে ভাবে চিড়িয়াখানায় দিয়ে দেবে যেখানে ঢের সঙ্গী আছে তার। তাতে কি বেদনা কমবে পাখির? শান্তি পাবে? বিভার এক আলাপি বলে, 'এই শহর ভর্তি তো আমরা সঙ্গী পেয়েছি, পথে নামলেই হাজার হাজার সঙ্গী, কিন্তু আশ্বাস কোথায়?'

অন্তত তিন পাণিপ্রার্থী আসে বিভার, একজন তার ধনী পারসী, সে টফি চকোলেট বাইনোনুকলার বায়োস্কোপের রেকর্ড ভেট দিয়ে, সম্পত্তি লিখে দিয়ে, তাকে চায়। বাকি দুজন বিলেতফেরত, তারা সামান্য দিশি লোক নয়, পোশাকে কথায় দুয়েতেই জলুস তাদের। তার সঙ্গে এক নিশ্বাসে টুর্গেনেভ আর মরিস হিন্ডাসের বই নিয়ে কথা বলে, নারীপুরুষের সম্পর্ক, সেক্স, ফেমিনিজ্‌মের সব কথা বলে। বিভা বেড়াতে যায় তাদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে সোফার উপরে— মেসবাড়ির জানলা দিয়ে লেখক দেখেন, শোনেন, অগোচরে পিছু নিয়ে যান ঘটনা যায় যত দূর। জীবনানন্দের অনেক গল্পের নায়িকাই এমনি বিদুষী ধনী শহরিণী, লেখক চুরি করে দেখেছেন সব তাদের ভাঁজ অথবা পূরণ করে নিয়েছেন মনে মনে 'স্বপ্ন দেখেছেন: 'আমরা দুজনে বেগুনি আকাশে সোনালি ডানার শঙ্খচিল'। এই স্বপ্ন আর নিরাশ্রয় এক হয়ে হয়তো তাঁকে ঠেলে দিয়েছে প্রত্ন শহরের রাজ্ঞী রূপসীদের অনাহত নিকেতনে। পরের কবিতা পড়ে মনে হয়।

৫

প্রসন্নকুমারীর জীবনাবসান হয় ৫ই আষাঢ় ১৩৩৭, মৃত্যুকালে তাঁর ছিয়াশি বছর বয়স হয়েছিল। জীবনানন্দ বিবাহ করেন ২৬শে বৈশাখ ১৩৩৭, ঢাকা ব্রাহ্ম মন্দিরে বিবাহ রেজিস্ট্রি হয়। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, 'প্রগতি'র অন্যান্য বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের জন্য দিল্লি কলেজ থেকে তিনি ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। 'ব্রহ্মবাদী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সংখ্যায় দুটি সংবাদ বেরিয়েছিল এই উপলক্ষ্যে:

'বিবাহ। বিগত ২৬শে বৈশাখ শুক্রবার সায়ংকালে ঢাকা ব্রাহ্ম মন্দিরে, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি. এ. মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জীবনানন্দ দাস এম. এ. র. সহিত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং স্বর্গীয় রোহিণীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা কুমারী লাবণ্য গুপ্তের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী আচার্যের কার্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেস্টারি করা হইয়াছে। প্রেমদাতা দেবতা নব দম্পত্তির জীবনপথের সহায় হউন।'

'নববধূ সম্বর্ধনা। বিগত ৩১শে বৈশাখ বুধবার সায়ংকালে সর্বানন্দ-ভবনে নববধূর সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে (বউভাতে) বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্যের কার্য, এবং পুত্র জীবনানন্দ ও নববধূকে উপদেশ প্রদান করেন। উপাসনান্তে অনেক নরনারী প্রীতিভোজনে প্রীতি লাভ করেন। এই অনুষ্ঠানে গৃহকর্তা বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের বিবিধ বিভাগে ১০৲ টাকা দান করেন।'

জীবনানন্দের পত্নী লাবণ্য চার ভাইবোনের মেজো বোন, তাঁর সাত বছর বয়সের সময় একই বছরে বাবা ও মাকে হারান, বিবাহের সময় তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সবে ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছেন, হোস্টেলে থাকেন। জীবনানন্দের প্রথম কন্যার জন্ম হয় ফাল্গুন ১৩৩৮-এ, পরের পুত্রের জন্ম ২৯শে নভেম্বর ১৯৩৬, তার জাতকর্মানুষ্ঠানে সত্যানন্দ আচার্যের কাজ করেছিলেন, সুখলতা রাও গান গেয়েছিলেন। পুত্র জন্মের আগেই লাবণ্য বি. এ. পাশ করেন।

বিবাহের পর দিল্লী ফিরে যাওয়ার কথা ছিল জীবনানন্দের, তাঁর সহকর্মীরা কয়েক মাসের ছুটির কথা বলেছিলেন অধ্যক্ষকে। কিন্তু জীবনানন্দ ফিরে যান নি। হয়তো কাছাকাছি চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, হয়তো কলকাতার কলেজে বা অন্য কোথাও কোনো বৃত্তির চেষ্টা করেছিলেন, হয়তো ব্যবসার কথা ভেবেছিলেন, হয়তো আসামে বা মাদ্রাজে গিয়েছিলেন সে জন্য, এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আরো দু-চার রকম কাজ করেছি ফাঁকে ফাঁকে'— কী কাজ, কোন্ ফাঁকে, তার কোনো তথ্য জানা যায় না, কিছু পরোক্ষ সূত্র হয়তো অনুমান হয় তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকে। যেখানে দেশে থেকে অবিরল চাকরির দরখাস্ত পাঠাচ্ছে নায়ক, ভাবছে, 'বারোটা মাস কলকাতায় থেকে চাকরির চেষ্টা করলে মন্দ হত না', কলকাতায় থেকে চাকরির চেষ্টা দেখতে একটানা রয়ে গেছে মেসবাড়িতে— আধপেটা ছেলে পড়ানো বা নিরম্বু যাপনের সব

দিন, 'ছ বছর ধরে নানা রকম চেষ্টা ও ব্যর্থতার পর অভিজ্ঞতা জমে গিয়েছে ঢের', অপার দারিদ্র্যের ভেতরে যক্ষার, মৃত্যুর সঞ্চার সে টের পাচ্ছে। জীবনানন্দের গল্প উপন্যাসের অনেকটাই অপরোক্ষ আত্মজীবনের উপাদান দিয়ে লেখা। এ সব লেখার পাণ্ডুলিপি খাতাতেও রচনাস্থান বলে কোথাও কোথাও হ্যারিসন রোড প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউসের ঠিকানা দেখতে পাওয়া যায়।

সে হল অর্থনৈতিক মন্দার সব বছর। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে আগের রাজনীতি-আর্থনীতি সংস্থান ও বিন্যাসের, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপায়-পদ্ধতিব রদবদল হয়ে গিয়েছিল, বিশ্ব বাণিজ্যের প্রভুত্ব ইয়োরোপ ছেড়ে গিয়েছিল উত্তর আমেরিকা জাপানের হাতে। পণ্য, সঞ্চয়, মূলধন ও শ্রমিক বিনিময় ব্যাহত হয়েছিল ইয়োরোপের দেশে, উপনিবেশে, অর্থনীতি প্রভাবিত রাজ্যসমূহে। নানা স্থানে আর্থিক জাতীয়তা, স্বয়ম্ভরতা ও আমদানি হ্রাস নীতির ফলে তার পণ্যের চাহিদাও সঙ্কোচ হয়ে পড়েছিল। গ্রেট ব্রিটেনের ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্যমুখ্যতাও হাতবদল হয়েছিল মার্কিনে যার বিপুল ঋণ লগ্নি মূলধন ইয়োরোপের অর্থনীতি পুনর্বন্ধনের সহায় হযেছিল। শান্তি চুক্তির পর আমেরিকা সামরিক কূটনীতিক স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্নতা যেচে নিযেও ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্যিক প্রসারে নিবত হয়, তার অর্থবলে ইয়োরোপ কত দূর দ্রাবিত হয়েছে বোঝা গেল ১৯২৯এ 'গ্রেট ক্র্যাশ' বলে প্রসিদ্ধ মার্কিন স্টক মার্কেটে বিপুলভাবে ভাঙন ধরার পর—তার নিজ দেশেই তখন উৎপাদন, কাজ, আয় কিছু নেই, লগ্নিকারীরা নেই, ব্যাঙ্ক সঞ্চয় নেই, ছোটো ব্যবসা বন্ধকী ব্যবসা উঠে যাচ্ছে; সাগরের এপারের ইয়োরোপে, ইয়োরোপের উপনিবেশ দেশের চার ধাবে তীব্র হয়ে পড়েছে তাব ফলে বেকারি অর্থকৃচ্ছ্র নিরাশা। ব্রিটেনের আর্থিক বিপন্নতা ও প্রকট হয়ে পড়েছিল যুদ্ধের পরে থেকেই— রপ্তানিকারী দেশ হিসেবে ভূমিকার বিলয়ে আর গণকর্মহীনতার চাপে। বহির্বাণিজ্যের আর মার্কিনি ঋণেব উপরে একান্ত নির্ভরের ফলে তার পণ্যোৎপাদন কর্মীব্যযববাদ্দও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হয়, পীস কনফাবেন্সে রাজনীতির পরে আর্থনীতিব ব্যবস্থাপত্রে উইলসন ইয়োরোপীয আত্মোদ্ধারে মার্কিনি ঋণ বলতে সরকারি দায় প্রত্যাহার করে নিযেছিলেন, এব পরে মার্কিনি ঋণ হল কবদাতাদেব অর্থের বদলে বেসরকারি লগ্নিকারী-রপ্তানিকারীদের দেওয়া ঋণ। ফলে ক্রমান্বিত হযে উঠেছে ভিয়েনা বার্লিন লণ্ডনের নিযোগ সঙ্কোচ কর্মচ্যুতি অর্থ সঙ্কটে ওযাশিংটনের অভযের বদলে ওযাল স্ট্রীটের ক্র্যাশের গাঢ় ছাযা। রুগ্ন কয়লা ও বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের বেতন হ্রাস উদ্যোগের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রিটেনে কযলা খনির স্ট্রাইক-লক আউট শুরু হয়ে যায়, অন্য শিল্পক্ষেত্রেও তা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ১৯২৬এর মে মাসে ন দিন ব্যাপী লাগাতার সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেল সাবা দেশে। লযেড জর্জেব লিবারেল দল *We Can Conquer Unemployment* প্রচার-সূচী নিযেও উনত্রিশ সালে সবকার গড়তে পাবলেন না, ক্ষমতায এলেন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে লেবার পার্টি। অন্য অন্য বিকাশমুখী শিল্পের সাহায্য নিয়ে তিরিশ দশকের মাঝামাঝি গ্রেট ডিপ্রেশন সামলে নিযেছিল ব্রিটেন, কিন্তু ভারতে তখন মুক্তিযুদ্ধ ঘন হয়ে উঠেছে, তার আঁচ পাওযা আর সহজ নয়।

ইতিমধ্যে এখানে দেখি 'টিনেব স্যুটকেস, রঙচটা শতরঞ্জিতে মোড়া একটা বিছানা এবং মনিব্যাগে তিন টাকা সাড়ে ন-আনা পযসা' নিযে জীবনানন্দেব গল্পেব নাযক বারবার যাওয়া আসা করছে শহর আর দেশে। 'মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভেতরে থেকে যে কোনো একটা চাকরির জন্য সাবা দিন ঘুরে ঘুবে তার 'মর্মান্তিক চেষ্টা'। 'ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইন্‌কাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ইনসিওরেন্স অফিসগুলো—এক-একটা জায়গায পনেরো-বিশ বার করেও, ধরনা দিতে যাওযা। 'শ্রাবণ ভাদ্রেব বৃষ্টি ও রোদ। মেসের যাচ্ছেতাই খাওযা। ...বয়স হয়ে গেছে, চাকরি নেই, শরীরের ধাত চিরকালই খারাপ; টিকটিক করে মনটা ছিল, সেও গেছে যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে।' কোনো একটা ইস্কুলে পঁচিশ টাকার মাস্টারি, নইলে ইন্‌সিওবেন্সের দালালি, ক্যানভাসারি, স্টেনোগ্রাফার হয়ে, শেযার বিক্রেতা হয়ে, এমন-কি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া, স্বদেশি করে জেল খাটার কথাও মনে হয় তার, দেখছে 'সামান্য একটা টিউশন পাবার জন্য কাঠপিঁপড়ের মতো মানুষের দঙ্গল', 'কলকাতায একটা চামার মরলেও দুশো গ্রাজুয়েট দরখাস্ত নিয়ে ছুটে আসে', দেশের বাড়িতে একটা মনিহারি দোকান খোলার কথাও ভাবে তখন, মেসের ঘরে বসেই ভাবে, তারপর 'কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুযে থেকে প্রতি দিন রাতের বেলা তার মনে হয়েছে, এই অন্ধকার যেন শেষ না হয আর, এ বিছানার থেকে কোনো দিন যেন আর তাকে উঠতে না হয়।' কিংবা দিন না যেতে 'সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানার থেকে উঠতে ইচ্ছা

করে না, মনে হয়... ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনো দিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয় না, ঘুম কোনো দিনও ফুরোয় না যেন আর।' অথবা 'জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে' 'সংসারের পথ থেকে ভয় পেয়ে ফিরে এসে... চার দিকের আম কাঁঠাল লেবুর বন, জঙ্গল মাঠ নিস্তব্ধতা, আষাঢ় শ্রাবণ রাতের মায়ার ভেতর খড়ের আটচালা ঘরখানা' যেন হয়ে ওঠে পরিণাম, আশ্রয়। ফিরে এসেও মনে হয়

১ বারোটা মাস কলকাতায় থেকে চাকরির চেষ্টা করলে মন্দ হত না।...

কলকাতায় আজ-কালই চলে যাব আমি। না-হলে ভবিষ্যৎটা মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু রাতের বেলা টেবিলের পাশে বসে চুরুট টানতে টানতে মনে হয় কলকাতায় গেলেই—

কত বার তো গেলাম আমি।

২ কলকাতায় যেতে দেরি করে ফেলছি। কিন্তু দেরি আব কী? দশ দিন আগে গেলেও যা, পিছে গেলেও তাই। কেউ আমার জন্য চাকরি হাতে করে বসে নেই।

ব্যক্তি এক্ষণের চেয়েও এ সব হল সময়তথ্য, সমাজতথ্য। ১৯৩১এর ১৯৩২এর মার্চের, অগস্টের গল্পের সব পৌনঃপুনিক তথ্য। ১৯৩১এর একটি পাণ্ডুলিপি কবিতা এইরকম:

চারি দিকে রিট্রেঞ্চমেন্ট— বিজিনেস ডিপ্রেসন—
আমি বেকার,
অনেক বছর ধরে কোনো কাজ নেই
কোথাও কাজ পাবার আশা নেই
একটা পয়সা খুঁজে বার করবার জন্য আমাব সমস্ত শক্তির অবসান [?]
হয়ে পড়েছে
পৃথিবী যেন বলছে: তোমার এই শক্তি, বরং তা কবিতা লিখুক গিয়ে
আমি বলি আমিও কবিতা লিখতে চাই
কিন্তু পেটে কিছু পাব না কি?..

১৯৩৪এ লেখা 'কবিকে দেখে এলাম' (দ্র॰ এই বই পৃ. ৫৭৭) কবিতাতেও এইটাই পরিস্থিতি: 'আনন্দের কবিতা একাধিক্রমে লিখে চলেছে তবুও পয়সা বোজগার করবার দবকার আছে তাব,

কেউ উইল কবে কিছু রেখে যায় নি,
চাকবি নেই,
ব্যবসার মারপ্যাঁচ সে বোঝে না,
'শেযার মার্কেটে নামলে কেমন হয?' জিজ্ঞেস করলে আমাকে,
হায়, আমাকে।

১৯৩৩এর গল্পের কবি বলছে সামাজিক সার্জনিক দুই প্রবল চাপের কথা:

'নিজের জবাবদিহি দেবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এমনই প্রবল, এমনই রুচি তার যে সে মনে কবে ইনকাম ট্যাক্সের একজন কেরানি হলেও জবাবদিহি দেওয়া হয়, কিন্তু দুটো কবিতার বই বের করলে হয় না। এই চার বছর যদি আমি একমনে শিল্পসৃষ্টি কবতাম, তা হলে অনেকগুলো মূল্যবান রচনা বের করতে পারতাম।'

চার বছর কি ১৯২৮ থেকে ৩৩এর চার বছর? ১৯৩৬এ লেখা 'অন্ধকার' কবিতায় (প্রকাশ: 'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৬, দ্র॰ এই বই পৃ. ১৭৭-১৭৮) তীব্র গদ্যছন্দে দেখি 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে' আর 'হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিযে ফেলে... অন্ধকারেব স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চাইছেন কবি— 'ধানসিড়ি নদীর কিনারে—পউষের রাতে—কোনো দিন জাগব না জেনে।' এই পরিণাম-কবিতায়নের পেছনে ক্ষুব্ধ সমাজনেপথ্যও অবারিত হয়ে আছে। জীবনানন্দের কোনো গল্পে যে দেখি কারুবাসনা কবিকে নিরস্ত করে রেখেছে দুর্নিবার জীবিকার আশ্বাস থেকে, দেখতে হয় সে তাঁকে অনন্যমনা করে রাখতে পারে নি।

১৯৩৫এর অগস্ট মাসে জীবনানন্দ আবার নিযুক্তি পেলেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে- প্রথম টিউটর, পরের বছর লেকচারার হয়ে। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুনরায় ব্রজমোহন কলেজে এসেছেন তখন অধ্যক্ষ হয়ে। ১৯৩৮এ তাঁর মৃত্যুর পর অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন বিদেশে ভারতের বিপ্লব চেষ্টার

যশস্বী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। জীবনানন্দের ঢোকার কালে বাংলা বিভাগে ছিলেন হেরম্বকুমার চক্রবর্তী, ১৯৩৭এ এসে যোগ দেন সুধাংশুভূষণ চৌধুরী। হেরম্ব চক্রবর্তী বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে তাঁর নৌকা ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন একবার। সুধাংশু চৌধুরী বরিশাল থেকে 'সাত সতেরো' বলে একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেছিলেন ১৯৪৫এ, 'কবিতা', পৌষ ১৩৫৩য় তার বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল 'জীবনানন্দীয় রোম্যান্টিকতার আবহাওয়াতেই এ কবিগোষ্ঠীর অনেকে পরিপুষ্ট' বলে। রসায়ন বিভাগে ছিলেন রমেশচন্দ্র সেন, সজনীকান্ত দাসের বন্ধু, সজনীকান্ত এঁর বিবাহে বরিশালে এসেছিলেন দ্রে' 'আত্মস্মৃতি' ১৩৮৪ পৃ. ৯৬)। হেরম্ব চক্রবর্তী রমেশ সেন দুজনেই রঙ্গব্যঙ্গ করতেন জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে। ১৯৩৭এ গণিতের অধ্যাপিকা হয়ে এলেন শান্তিসুধা ঘোস। তাঁর বাবা ক্ষেত্রনাথ ঘোষও এখানে অধ্যাপক ছিলেন, ঘনিষ্ঠ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজেও। চৌদ্দ বছর আগে শান্তিসুধাও ছাত্রী ছিলেন এই কলেজেই, লিখেছেন: 'আজ যাঁরা আমার সতীর্থ তাঁদের মধ্যে অনেকেই চৌদ্দ বছর আগে আমার অধ্যাপক ছিলেন, গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। হেরম্বনাথ চক্রবর্তী, কমলাক্ষ মিত্র, প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী, সুধাংশু চৌধুরী, জীবনানন্দ দাশ, ভবরঞ্জন দে প্রমুখ গুটিকয়েক নবাগতকেও পেলাম। মহিলা অধ্যাপক আমি ছাড়া আর কেউ নেই।' আরো লিখেছেন, 'বাংলাদেশের কলেজে সহশিক্ষার প্রবর্তন এবং পুরুষ কলেজে মহিলা অধ্যাপিকা নিয়োগ—এই দুটি ক্ষেত্রেই বরিশাল বি.এম. কলেজকে পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করা চলে।' তাঁব উল্লিখিত নবাগত অধ্যাপকদের মধ্যে প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী 'বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী এবং পুলিশের চিহ্নিত ও পূর্বলাঞ্ছিত'। বিয়াল্লিশেব 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রাক্কালে শান্তিসুধার মতো তিনিও 'অধীর হয়ে উঠেছিলেন। কলেজের অধ্যাপকদের কক্ষে আমবা দুজনে আলোচনায় রত হলাম, কোন্ পন্থায় কাজ আরম্ভ করা যায়। কলেজেব ছাত্রগণ কলেজে ও বাড়িতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল পথনির্দেশেব জন্য।' পরে তিনি স্মৃতিকথা লেখাব সময স্মরণ করেছেন, ববিশালের 'বিশিষ্ট পবিবার হিসেবে উল্লেখ করা যায় সর্বানন্দ দাসকে। তাঁব জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যানন্দ দাস এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হচ্ছেন জীবনানন্দ দাস যিনি পরবর্তী যুগে বাংলার কাব্য গগনে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বিরাজ কবছেন।' জীবনানন্দেব সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয়েছিল কি না জানা যায না।

জীবনানন্দ খুব সংযুক্ত হয়ে ওঠেন নি স্বস্থানে ফিরেও। তাঁর সহকর্মী লিখেছেন:

'কবি মিশুক প্রকৃতিব লোক ছিলেন না। বরিশাল শহবে কারও সঙ্গেই তাঁকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখি নি।... মাঠেব পাশেব বাঁকা পথ ধবে কলেজের পিছন দিক দিয়ে কলেজে যেতেন; ক্লাসে শান্ত গম্ভীব ভঙ্গিতে পড়াতেন, অবসরকালে কষ্টিপাথরেব মূর্তিটিব মতো বিশ্রামকক্ষেব কোণে বসে থাকতেন। তারপর সেই নিরালা পথটি ধরে ফিরতেন নিজেব নির্জন গৃহে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভুরাণ্ড ঘেরা দূর্বাশ্যামল প্রাঙ্গণে আনতদৃষ্টিতে দ্রুত পরিক্রমা ছিল তাঁর নিত্যকর্ম।'

ছাত্রেব চোখেও তিনি 'আত্মকেন্দ্রিক, অর্থাৎ ভদ্রতাহীন ভাষায অসামাজিক বলেই' প্রতিভাত: 'কলেজে তাঁর প্রখর গাম্ভীর্যের জন্য কাছে এগোতো না কেউ।... আমি আর আমার আরেক বন্ধু... তাঁকে অবাক হয়ে দেখতুম; কখনও ক্লাসের অবকাশে মাঠের ধারে শুয়ে শুয়ে পড়তুম তাঁব কবিতা। তখনও পর্যন্ত তার শেষতম কাব্যগ্রন্থ "ধূসর পাণ্ডুলিপি"।'

বি. এম.কলেজে কাজ পাবার পরেই '১৩৩৬ সাল থেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা আকাঙ্খা উদ্‌বেগ' ক্ষান্তি করে জীবনানন্দের দ্বিতীয় বই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বোরালো, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩এ। 'অনিন্দনীয় ছাপা, রবীন্দ্রচিত্রানুকরণে রচিত সুন্দর প্রচ্ছদপটে' শোভিত সতেরোটি কবিতার রয়াল ৮+১০২ পৃষ্ঠার এই বইয়ের 'ক্যাম্পে' 'শকুন' ও 'মৃত্যুব আগে' এই তিনটি বাদে সব কযটিই কলকাতা চাকরি পর্বে লেখা, অধিকাংশ 'প্রগতি'তে ছাপা। তার ছাপা ও প্রকাশ শ্রমেরও এতটাই বুদ্ধদেব বসুর স্বীকৃত যে উত্তরকালেও বইখানিকে তাঁব নিজের জীবনেরই অংশ বলে বুদ্ধদেব মনে রেখেছিলেন। বই বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গেই 'আমাদেব মূল্যজ্ঞানহীন সমাজে মূঢ়তাকে নাড়া দিয়ে বইয়ের এবং কবির তিনি যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন 'প্রকৃতির কবি' সমালোচনা-প্রবন্ধে (কবিতা, চৈত্র ১৩৪৩) তার দ্বারা বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের অনপনেয় স্থানটুকুও নির্ণীত হয়ে যায়।

বুদ্ধদেব জীবনানন্দের পরিচয় দিয়েছিলেন 'প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি' বলে। তাঁব লেখার মোহকারী সুরের সম্মোহন, রূপাত্মক অনুভূতিপ্রসূত রূপক রচনার অজস্রতা, নাম শব্দ ও বিদেশি শব্দের কৃতী ব্যবহার এই সব গুণবাদের পরে বুদ্ধদেব লেখেন, তাঁর লেখায় তত্ত্ব চিন্তাশীলতা কৃত্রিমতা ও অনুকরণ নেই, 'বলাকা'র ছন্দে লেখা হয়েও তার ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য নতুনতর; স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ সহজ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার সে সৃষ্টি। আরো চোখে পড়ে সে সব লেখার 'আদিম অপূর্বতা, মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন; 'অর্থাৎ সময়ছাপহীন। আরো : সে যেন আধো আলো, আধো ঘুম, আবছায়া, অলসতা; সে যেন অপার্থিব, পলাতক, সুদূর নির্জন। ক বছর পর 'বনলতা সেন' আলোচনাতেও এই মতই ফের সূত্রোপম হয়ে উঠেছেঃ 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সব চেয়ে নির্জন, সব চেয়ে স্বতন্ত্র।' এবং "বনলতা সেন" বইটিতে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই- যার দেশ নেই, কাল নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখ দুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থান পতন পার হয়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্তপ্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে ঘা দেয়, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত—ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়...' (কবিতা, চৈত্র ১৩৪৯)।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আরেক উল্লেখযোগ্য আলোচনা সমর সেনের। প্রশংসা স্থলে বুদ্ধদেবের সে প্রতিধ্বনি। তবু, 'সাম্প্রতিক কবিদের প্রথম সারিতে' জীবনানন্দের স্থান দিয়েও সমর সেন লিখেছেন 'পৃথিবীর ক্লান্তিহীন সংগ্রাম তাঁকে স্পর্শ করে না' আর 'কবিতা সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাস কাব্যিক বিচারে যাঁদের আস্থা নেই, বইয়ের শেষ ও আরো নানা পলায়নী বিধানে তাঁরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন', কারণ 'today we are all bound upon a wheel of fire, and there is stronger temper in the air. We cannot possibly step aside, and retreat to an ivory tower' ('অমৃতবাজার পত্রিকা' ৪ঠা জুলাই ১৯৩৭, দ্র. 'সংকলিত সমর সেন' ১৯৯০ পৃ. ১৬১-১৬২)। Today দ্বিতীয় যুদ্ধের আসন্ন দিন, ১৩৪৪, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষ লেখা প্রকাশ ১৩৩৫এ।

দুই বিচারেই সময়ছাপহীনতার প্রশংসায় আর অভিযোগে নির্ণীত হয়েছেন জীবনানন্দ। চির অমরীর জন্য প্রেম আব গান দিযে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আরম্ভ। সে কবিতা লয়ক্ষয়হারা দীপ্ত আকাশেব মতো, আদ্যা চিরাযুবতীর বন্দনার মতো। অনিবার্ণ হয়ে আছে আপন আলোয়, বাইরের শীত ক্ষয় মৃত্যুব তার অনুভব নেই। অনন্তবহতা জীবনের এই কারণ ও প্রতিমা, শাশ্বতী, চিরদিনই কবির উদ্দিষ্টা। তাব সমযস্পর্শ নেই। কবি-অনুভবের? সে নিশ্চয় দলিত খণ্ডিত কালে কালে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেকটাই রূপকথার মতো করে লেখা। কিন্তু পলাযনী কিনা, সময়ব্যবহিত বলা যাবে কিনা, ভাবতে হয। রাজ যুবরাজ জেতা যোদ্ধাদের হাড়ের পাহাড়ের মাঝখানে সোনার কাঠি রুপোর কাঠি পাশে বাখা পরীর মতো ঘুমোনো মেয়ের যে সে অপরোক্ষ রূপকথা, যেমন ধরা যাক 'পরস্পরে' কবিতাটি : সে তেপান্তরে গল্পও কবি তখনই এনে ফেলেছেন দেখি আটপৌরে, একেলে চৌহদ্দিতে যেখানে রূপসী আব স্থির রূপসী নয; শরীরেব ঘুণ, হৃদয়ের অসাধ অসুখ সে ত্রস্ত হযে ঢেকে রাখতে যায, গ্রস্ত প্রেমিক তারপর তার থুতনি তুলে ধরে দেখতে পায় তার 'চোখ দুটো চুন-চুন, মুখ খড়ি-খড়ি'। কেবল বযসের, ব্যবহার-অব্যবহারের ক্ষয নয। 'কাসের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস' যখন, 'যক্ষার রোগীব মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন', আর কী তখন হবে? পাণ্ডুলিপির খসড়া কবিতাতে দেখতে পাই কার্যকারণ। দেখি, কবি জানতে পেবেছেন 'প্রেম যেন ডাইনীর আযনার মতো', যে প্রেমের দেশে আবেগ-অন্ধ মিলনলিপ্সুর অভিসার— সেও স্বপ্নের, ম্যাজিকের দেশ। যুগে যুগে 'অসংখ্য বিষণ্ন (অকৃতার্থ ব'লে?) বার্ড-ব্যালাডের জন্ম দিয়েছিল সে রূপসী অপরূপা তার সে রূপও অপ্রকৃত, জাদুর সৃষ্টি, 'মানুষ ঘুমায় বলে এই পৃথিবীতে তখন জাদুর সৃষ্টি হয়/ তোমার মুখের মতো রূপ শুধু জন্ম লয় সে সময়ে।' সে জাদু নানা স্তর চৈতন্যেরই এক স্তর, কিন্তু তাকে কবি কঠিন বিশ্বনিয়মে পর্যবসিত করে দেখেছেন। কবিতার পরিণামে রূপ যৌবন ছিঁড়ে-ফেঁড়ে যাওযা ক্ষয আর ঘুণেব ভেতরে জমে উঠেছে যে হাহাকার, সে পুরানো নয়, রূপকথারও নয। 'ছিড়ে গেছি, ফেঁড়ে গেছি পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে' বলে সদ্য '১৩৩৩'এর যে কবি আক্ষেপ করেছেন তার সঙ্গেও তার দূরত্ব নেই। মনে হয যুক্তি আর জাদুর দোটানা যে আধুনিক সংস্কারেব এক মুখ্য লক্ষণ, শতকের পূর্বাহ্ন থেকেই শিল্পে কবিতায় সংক্রামিত হতে শুরু করেছে, তারই যেন ছায়া এ লেখাতে। বোবা, বিস্মৃতিপর, দেশ আর দিকের দেবতাকে সাক্ষ্য রেখে কৌম ধর্মাচারের মতো মড়া জাগানোর যে শব-সাধনায় সূচনা হয়েছে বইয়ের, আর 'আমি সেই পুরোহিত— সেই পুরোহিত' বলে যে আত্মবিশ্বাস— ধান আর মাছের দেশের চাষা মেছোর মতো মাটি আঁষ মেখে, ভাঁড়ের রগড়ে চুর হয়ে, ক্ষেত চেষে চলে যাওযা চাষার পেছনে আর ফসল কাটার পরে শিশিরের জল পড়া খড় নাড়া মাঠের ফাটলের মধ্যে, কাস্তের মতো বাঁকা 'মেঠো চাঁদ, আর মেঠো তারাদের সাথে' কবি এসে দাঁড়িয়েছেন যেভাবে তাতে আরোই তা মনে হয। চেনা, আবার অচেনা এখানে চারি ধার, কবি বলছেন: 'পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয।' মায়া নয়, দেখা যায আদি মানুষের কৃষি

দেশের ভেতরে বসানো সে দেশ, কিন্তু কবি সেখানে পৌছেছেন 'শহর বন্দর বস্তি কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে' তারপর। দেখেছেন ফসলের মতো ফলে ওঠা মানুষসংহতি, জ্যোৎস্নার অপার ধানক্ষেত, ইঁদুর পেঁচার ঘুরে ঘুরে ধান খেয়ে যাওয়া, নক্ষত্র আর পাখিপাখালির নিরবধি বিস্তার, পাড়াগাঁর ভাঁড় আর আইবুড়ো মেয়েদের জড়ো করে হেমন্তের নরম উৎসব, 'শস্যোৎসব'। কিন্তু সে জন্মদেশ নয়। শয়তানের সুন্দর কপালের পাপ ছাপ, অনেক মাটির নীচে ঢাকা মদের শীতলতা, জমাট ফেনার মতো ঘুমোনো, বা ফেনার শেমিজে পিছল সলীল রূপসী শরীর, আইবুড়ো মেয়েদের নিয়ে মাঠের নিস্তেজ রোদে 'হাতে হাত ধরে ধরে দূরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে' নাচ, এমন কি মদ গান গেঁয়ো কবি ভাঁড় আর নৃত্যপরাদের নিয়ে শস্যোৎসব- এর কোনোটাই কবির আপন নয়, 'রূপসী বাংলা'র নয়, প্রত্ন ইতিহাসেরও নয়। এ হল আহৃত এথনোলজি। একই সঙ্গে আদি, এবং অব্যাহত। মহাযুদ্ধপর ধ্বস্ত ভ্রষ্ট ইয়োরোপের নব্য শিল্পৈষা আদি মানুষের, আফ্রিকি ইণ্ডিয়ান মেলানেশিয় পলিনেশিয় দ্বীপজগতের নাচ গান ছবি চর্চার বিকল্প জুড়ে-গেঁথে গড়তে বসেছিল আধুনিক লেখা ছবি গান—খৃষ্টীয় বা ধ্রুপদীর বাইরেকার লোকবিশ্বাস— যেমন ইয়েট্সের কবিতাতে, এলিয়টের পুণ্য গ্রেল খোঁজা লোকায়ত পুরাণের রূপকে, ফরাসি কবিশিল্পীদের *l' art ne'gre*র অনুগতিতে- ne'gre কেবল আফ্রিকি নয়, যাবতীয় অবচয়িত প্রিমিটিভ লোককলার আঁশ অংশ গ্রথিত করে পাওয়া (সম্প্রতি এডোয়ার্ড সেইড একে গত শতকের ওরিয়েন্টালিজ্‌মর লক্ষণাক্রান্ত বলে নির্ণয় করতে চেয়েছেন), হয়তো এও সেই ধারা। হয়তো 'ঝরা পালকে'ও ছিল, সূত্রাকারে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সেদিন এ ধরণীর" কবি যেন আদিম মানবগোষ্ঠীর কবি যাঁর কল্পনায় "কত পূর্ব জাতকের পিতামহ পিতা" জড়িয়ে আছে।' আসিরিয়া মিশরের (নিজ ইতিহাসের তত নয়) আদিমও বহুতর হয়ে আছে সেখানে বইয়ে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতে, সে হল 'কবির মানসিকতায় অতীতের উজ্জীবন' বা 'অতীতের বিস্মৃতি নিয়ে বেদনা'। এক কথায় ইতিহাসচেতনা—' তাঁর প্রসিদ্ধ পাবিভাষা-শব্দ। সে চেতনায় জড়িত হয়ে আছে আচ্ছন্ন প্রকৃতিমণ্ডল, 'অবসাদের গানে'র honeyed indolence, সুরতি-মাদক। জীবনানন্দের প্রথম দুই বইয়ে কোনো কোনো স্থানে ভাষা-আতুবতা প্রায় ব্রাউনিং-সুইনবর্ন দ্রাবিত, প্রথম বয়সে কবির ব্যক্ত পক্ষপাত ছিল এই দুই কবির উপরে (ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁর লেখাতে তাঁব উপর্যুপরি আকর্ষণেরও এক কারণ বোধ হয় সুইনবর্ন প্রশংসিত-অনূদিত বলে)। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আলোচনার বৎসরকালমধ্যে সমর সেন 'বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে (কবিতা, বৈশাখ ১৩৪৫) লিখেছিলেন, 'আমাদেব কাব্য প্রকৃত ঐতিহ্যহীন। এক হিসেবে ভারতের বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য ববীন্দ্রনাথে শেষ বারেব জন্য স্বধর্মে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। যে স্বতন্ত্র দেশীয় ঐতিহ্যেব গৌরব আমরা করি আসলে তা স্বাবলম্বী নয়, বর্তমানে তার নিজস্ব মেরুদণ্ড নেই।' স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের সোচ্চারে গৌরব করেন জাতীয় নেতারা। এখন মনে হয় সেই স্বদেশি ঐতিহ্যের বিকল্প খুঁজেছেন অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁব স্কুলের শিল্পী, হয়তো জীবনানন্দের লেখাতেও তার একটা আগ্রহ। যে বাস্তববাদ মানববাদ দেহবাদেব ফতোয়া তখন 'কল্লোল'-'প্রগতি'তে বা আধুনিক বলে পরিচায়িত লেখায়, তার চেয়ে সূক্ষ্ম বা গভীর নব্যতায় হয়তো চোখ পড়েছিল তাঁর। তাঁর কবিতায় অতীতের বেদনা বা পুনরাগ্রহ যদি স্বপ্নের, সুদূরের, *exotic*এর রোম্যান্টিক পলায়নী বলেও ধরতে হয় তাতেও স্থানিকের চেয়ে কালগত সে লেখা—ইতিহাসবেষ্টিত নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, একাধারে বিগত ও বর্তমানে মেলা কাম্য কাল—যেমন প্রুস্তিয় পুনরায়ত্ত গত কাল, বা তার চেয়েও বের্গসনীয় *duree*. কারণ প্রুস্তের *le temps perdu* ভাগ্যে, হঠাতে ফিরে পাওয়া যায়, বের্গসনের ক্ষেত্রে যা সযত্ন সমাহৃতি—আসন্ন বা অব্যবহিত বিকাশের উদ্‌বেজনা। এখানে কবি তাকে মন্ত্রেতন্ত্রে জীইয়ে তুলতে বসেছেন, বা নিজেই ক্ষুধিত প্রেত হয়ে ফিরে চলেছেন কঙ্কালের কাছে। 'যে আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মতো প্রাণ আছে জেগে'— গূঢ় হয়ে জেগে আছে এখনও, তাঁর বিশ্বাস। প্রুস্ত দেখিয়েছেন, মেধায় নয় সে হারিয়ে আছে কোনো বস্তুবিষয়ের মধ্যে। লেবুগন্ধী চায়ে মদ্‌লিন ভিজিয়ে খেতে গিয়ে মার্সেলের মনে পড়ল হঠাৎ বাল্য প্রেমের হাবা সুখ, সোয়ানের মনে পড়েছিল গানের সুর শুনে। পুনঃস্বাদ পেতে সময় টুঁড়তে গিয়ে মার্সেল প্রবল অবিশ্রান্ত কালগতির বাইরে গিয়ে পড়ল মুক্তির মতো। সে হল অতিনির্ধারিত সময়ের বাইরের নিঃসময়। স্টিফেন ডিডেলাসের বিখ্যাত সেই কথাটি: ইতিহাসের দুঃস্বপ্ন থেকে সে জেগে উঠতে চাইছে, যে ইতিহাস পুরা যুদ্ধ থেকে সদ্য বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কেবলই নিনাদ সংঘর্ষেব ক্রমানুপুঙ্খিত ঘটনাধাবা। জীবনানন্দের কবিতায়

আমার চোখের পাশে আনিয়ো না সৈন্যদের মশালের রঙ
দামামা থামায়ে ফেল...

এই যে আকৃতি, রাজ্য জয় সাম্রাজ্যের কথা ভুলে গিয়ে 'যে প্রেম চলিয়া গেছে তারই হাত ধ'রে' যে মুক্তির সাধ, যোদ্ধার মতো সেনাপতির মতো উচ্চ মুখর জীবনের নেপথ্যে নিরন্ত অবসরের, ফলন্ত মাঠের মায়াদেশের যে লেখা সেও যেন সে হারা কালের স্পন্দ বয়ে আছে। জীবনানন্দ ইতিহাসচেতনার বদলে বলেছেন সময়চেতনার কথা: 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা', বেবিলন মিশর অসুর গ্রীস কার্থেজ রোম ক্রবেদুর-যুগ পার হয়ে, প্রথম ও আবহমান পল্লী ও সীমান্তের প্রকৃতিবিস্তার পার হয়ে সেও উত্তীর্ণ হয়েছে মহাপৃথিবীর নিঃসময়ে। জীবনানন্দ ইতিহাস সন্ধান করেছিলেন বিদেশ দূরদেশ থেকে, ব্রাউনিঙ বা আরো প্রত্যক্ষের এজরা পাউণ্ডের মতো, সেই প্রবণতা চোখে পড়তে পারে 'ঝরা পালকে'ও। শ্মশান ঘুরছেন কবি—'কত লক্ষ সভ্যতার স্মৃতি', তার 'শৌর্য সাম্রাজ্য প্রেম পুণ্য গরিমা'র খোঁজে। 'চাঁদের আলোয় স্মৃতির কবর' সফবে বেড়ায় মন' ব'লে যুগান্তরের, আদি মধ্য পৃথিবীর যত মাটি চাপা ধন খুঁড়ে আনতে চাইছেন, পাউন্ডের আদি লেখার অনুরব যেন সেখানে: 'I, who have laboured long in the tombs,/Am, come back therefrom with riches./Behold my spices and robes, my nation,/my gifts of Tyre' (Epilogue ১৯১২ *Collected Early poems* ১৯৭৬ পৃ. ২০৯)। 'ধূসব পাণ্ডুলিপি'তেও যে জমানো ফেনার জলকন্যা-রূপকথার, ধ্রুপদী পুরাণেরও সে : যেমন ভেনাস, বা আরো পূর্বতনী আফ্রোদিতে—হেসিয়োদের লেখায়: 'a white foam grew from the immortal flesh, and it is a girl... Gods and men call her Aphrodite, because she was born in foam'. ('থেয়োগোনি', এম. এল. ওয়েস্ট অনূদিত ১৯৮৮ পঙ্‌ক্তি ১৯০-১৯৯)। সদ্য পাউণ্ডের কবিতায় এই কন্যা 'waves taking form', 'waves taking form as a crystal' হয়ে এসেছেন (দ্র' *Cantos*, সর্গ ২৩, ২৫,), জীবনানন্দেরও অদূরবর্তিনী হয়ে। 'মহাপৃথিবী'র কবিতাতেও কবি লিখছেন: কবেকাব নীল চাঁদ যে এক দিন দেখেছিল, এ ধূসর পাণ্ডুলিপি যে এক দিন দেখেছিল, সে কাব মুখ? পৃথিবীব সব আলোর নিবে গেলে, সব গল্প ফুরোবার পব যখন মানুষের বদলে মানুষেব স্বপ্ন থাকবে শুধু (কেননা 'উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,/মানুষেরও আয়ু শেষ হয়!/পৃথিবীর পুরানো সে পথ/মুছে ফেলে বেখা তার—/কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ/চিবদিন বয়!' 'স্বপ্নের হাতে' দ্র' এই বই পৃ.১৩৮-১৪০),'সেই মুখ আব আমি বব সেই স্বপ্নের ভিতরে।' পৃথিবীর রাত আর দিনের','ব্যথা বিরোধ ও বাস্তবের' আঘাতের বাইবে সেই স্বপ্নোপম সময়ের খানিকটা আস্বাদ কবি লিখতে চেয়েছেন হয়তো 'ধূসব পাণ্ডুলিপি'তে।

মূল কবিতাপর্যায়ের পববর্তী তিনটি লেখা জোড়া, আবার পৃথক্ হয়ে আছে বইয়ে। তার মধ্যে 'শকুন'—বিষয়ের আগে চোখে পড়ে তাব চতুর্দশপদী মিতাযতন, জীবনানন্দেব প্রথম গ্রন্থিত চতুর্দশপদী। 'মৃত্যুর আগে'— যে কবিতার রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'চিত্ররূপময়' আখ্যা জীবনানন্দেব যাবতীয কবিতাব পরিচয় হয়ে উঠেছেন অতঃপব। এই লেখাতেই বোধ হয প্রথম স্পষ্ট হযে উঠেছে কবির বিশিষ্ট উপমাকারু, ইন্দ্রিযবিনিময়ের প্রতিষঙ্গ, *Synaesthesia:* ঘুমেব ঘ্রাণ, নবম জলেব গন্ধ মাখা নদীপাড়, হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলির খেলা, কুযাশাফুল ছড়িয়ে চলা নারীর মতো মাঠপারের নরম নদীটি ।'ক্যাম্পে' তারপর—যার প্রথমাবধি ব্যাপকতা হযেছিল বিশিষ্ট কাগজে রবীন্দ্রনাথের পিঠোপিঠি ছাপা হয়ে, (পরিচয়, মাঘ ১৩৩৮), প্রকাশ মাত্রে তার 'হৃদযের বোন' সম্বন্ধ আব 'ঘাইহরিণী'র ভ্রাতৃপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করে 'শনিবারের চিঠি' লেখেন ('সংবাদ সাহিত্য', মাঘ ১৩৩৮), 'রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে কী প্রকার জঘন্য অশ্লীল লেখা বাহির হইতে পারে ও হয তাহার একাধিক পবিচয "পরিচয়" দিয়াছেন। "ক্যাম্পে" তাহার চূড়ান্ত নমুনা।' জীবনানন্দ তাব প্রতিবাদ লেখেন (দ্র' এই বই পৃ. ৭২৫-৭২৬): "ক্যাম্পে" কবিতাটির মানে অনেকেব কাছে এতই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে যে এ কবিতাটিকে তাঁবা নির্বিবাদে অশ্লীল বলে মনে করেছেন। কিন্তু তবুও "ক্যাম্পে" অশ্লীল নয়। যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুব এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের—মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তাব সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়—"ক্যাম্পে" কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এই মাত্র।... শিকারী, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিযে যে হিংসা সফল... "ক্যাম্পে" কবিতাটির এই পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয়তার সুর।' জীবনানন্দের এই প্রতিবাদ সে সময়ে ছাপা হয়েছিল কি না জানি না (পরে শতভিষা, ভাদ্র ১৩৮১তে বেরোয়), কিন্তু এই কবিতার অশ্লীলতা নিয়ে যে কিংবদন্তি গড়ে ওঠে তার প্রসার হয়েছিল অনেক দূর।

কবিতাটি সূত্রে কবির জীবনতথ্যেরও কিছু প্রসার হয়েছে। বনে ক্যাম্প করে থাকা, বনপ্রকৃতি ও বনজীবন, অসহায় শিকার আর সৌখিন শিকারীর মেল নিয়ে দুটি কবিতা কবি গ্রন্থিত করেছেন, দ্বিতীয়টি 'বনলতা সেনে'র 'শিকার', (পরোক্ষ সূত্র নিয়ে 'মহাপৃথিবী'তেও একটি কবিতা আছে: 'মুহূর্ত'), হরিণীকে ঘাই করে পুরুষ হরিণদের নিয়তিমুখে টেনে আনার বদলে সে কবিতাতে কেবলই অসতর্ক নিশান্ত মুহূর্তে শিকারীর লক্ষ্যভেদ খেলা আর সরস-ভোজ্যের আয়োজন। 'শিকার' কবিতায় মেহগনির মতো অন্ধকার সারা রাত সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে বাঘিনী হরিণের লুকোচুরির পরেকার ভোরবেলার কথা প্রধান, মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি থেকে যে 'সুন্দরবনের গল্প' ছাপা হয়েছিল সেও কেবলই বাঘিনী আর হরিণের লুকোচুরি— সমস্ত জ্যোৎস্নারাত ধরে, লুকোচুরি চাঁদেরও সঙ্গে, 'চাঁদকে একবার খুঁজে পেয়েছে এরা/ একবার হারিয়ে ফেলেছে।' 'ক্যাম্পে' হয়তো আসাম জঙ্গলের ক্যাম্প: আরো যে সব লেখায় এই স্থাননিশানা অনুমান হয়, তার একটি আমরা ছেপেছি জীবনতথ্যের সূত্রে (দ্র' এই বই পৃ. ৬৯০–৬৯৩): 'সে এক শীতের বাতে— জ্যেৎস্নার রাতে/প্রথম যৌবনে আমি কোনো এক শিকারীর সাথে/ ক্যাম্পে ছিলাম শুয়ে আসামের জোকাই জঙ্গলে...'। ১৯৩৪এর পাণ্ডুলিপি খাতায় পাশাপাশি আরো কয়েকটি লেখা পাওয়া যায় বনপ্রসঙ্গের, তার একটি শিরোনাম দেওয়া: 'বন ও জীবনের গল্প', সেখানে ' বনের কিনারে নদী —খানিকটা পাহাড়ের অন্ধকারে ঢাকা', তারপর

নাহয়ের শাখা থেকে নাহরের শাখার ভিতবে
দেহ নয়, ছায়া শুধু...

পাখির, বানরেব, রূপালি সূতাব ফাঁসের মতো অবণ্যের, চাঁদের ছায়া— 'জ্যোৎস্নায ঘুম নাই আজ রাতে তাহাদেব চোখে'। খাতায দু পাতা আগে:

মনে হল গভীরতম বনের ভিতর ঢুকে পড়েছি
অসংখ্য গাছেব ছাযা সেখানে— একনলা দীর্ঘ গাছ সব
নক্ষত্রের আকাশ ছুঁযে দাঁড়িয়ে আছে...
একনলা দীর্ঘ বিরাট অন্ধকাব গন্ধের গাছ সব
এক–একজন এশিরিয রাজা যেন মেঘের মতো দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে...

বন হয়ে উঠেছে সদ্য জাত, সদ্য ইতিহাসেব বন। পবেও ১৯৩৭এব খাতায় দেখা যায: 'এই তো সেদিন। ডিব্রু নদীব পারে আমবা ঘুবছিলাম...'। 'ক্যাম্পে' যে আসাম জঙ্গলেব ক্যাম্প 'ঘাইহরিণী' শব্দটিতেও তা মনে হয। 'ঘাই অসমীযা শব্দ, অপব পাখি বা প্রাণীকে ফাঁদে ফেলে আকর্ষণ করে আনার জন্য শিকারী সজাতীযেব ঘাই পাতে, ঘাইযের ডাক শুনে অপর বনরীযা তাকে খুঁজতে এসে ফাঁদে পড়ে, যে ঘাই পাতে সে হল 'ঘাই পতিযা মানুহ'। এখানে জীবনানন্দেব কবিতায স্বযং সে নিযতি প্রকৃতি, হযতো বন কনজার্ভেটর কাকাব সূত্রে, হযতো অপর কারও সঙ্গে এক বা একাধিবার তিনি গেছেন, রাত্রিবাস করেছেন, শিকাবের অভিজ্ঞতা—জঙ্গল ভাঙা শিকার নয়, হরিণ বা পাখি শিকারের কখনও হযতো ভাগ পেযেছেন— প্রথম যৌবনে, তিরিশেব দশকেও এমন টুকরো অভিজ্ঞতা হযতো তাঁর হযেছে।

৬

দিল্লি কলেজে ফিবে না গিযে, অন্যত্র যুক্ত না হযে জীবনানন্দ পরিপূর্ণভাবে লেখায মনোনিযোগ করলেন। দেশের অর্থসঙ্কট চাকরিসঙ্কোচের ভেতরে লেখার দুর্নিবাব প্রবর্তনা দেখতে পাওয়া যায তাঁব গল্পে, আগে উল্লেখ করেছি। ১৯৩৩এ লেখা গল্পে বলছে নাযক: 'আমার বয়স চৌত্রিশ, বারো বছর আগে এম. এ. পাশ করেছিলাম বটে, বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি— আরো অনেক কাজ করেছি', কিন্তু সংসারী মানুষদেব সঙ্গে কোথাও একটা তফাত হযে আছে, 'কাজেই এম. এ. ডিগ্রী ও স্ত্রী-সন্তান সত্তেও এই চৌত্রিশ বছব বযসে আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না...'

তার পর সে বলছে:

'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিযেছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা... কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে।.. কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের যক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায নি, কেউ যেতে পারে নি...'

দুপুরবেলা হরিণেব ছাল পেতে, অন্ধকার রাতে প্রদীপের আলোব কাছে মাদুর বিছিয়ে ঘন হয়ে সে

বসতে চায়। কোথাও দেখি: 'পুবের জানলার কাছে জারুল কাঠের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকি। লিখতে ইচ্ছা করে। কী লিখব? গল্প? তা লিখতে পারা যায়... নিস্তব্ধ রৌদ্র গনগন দুপুর। কাকা নাক ডাকাচ্ছেন। পিসিমা হয়তো শিরিষগাছের পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে, কিংবা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়তো। ঝিঁঝি ডাকছে, ঝুঁটি মাথায় একটা কাঠঠোকরা উড়ে এসে কৃষ্ণচূড়ার ছাল ঠোকরাচ্ছে। সোঁদালগাছের ডালে একটা কৃষ্ণগোকুলি। এইরকম করে আরম্ভ করা যাক...'।

১৯৩১–১৯৩৬ ছ বছরে ৫১টি এক্সাইজ খাতায় তাঁর মোট ৯৬টি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে, সে লেখার একটিও ছাপা হয় নি সমগ্র জীবনকালে। মৃত্যুর পর 'অনুক্ত' পত্রিকায় 'বিলাস' (কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র ১৩৬১ দু সংখ্যায়), তার পর 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' নামে (প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৯) তিনটি গল্প বেরিয়ে ছিল, প্রথম 'বিলাস' গল্পটির ক্ষেত্রে 'লেখক কর্তৃক অপরিমার্জিত রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৬' বলে উল্লেখ ছিল পত্রিকায়, বইয়ের ভূমিকা করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'জীবনানন্দের মতো আকাশচারীর দুঃসাহসী স্থলবিহার' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। অপর ভূমিকাতে অমলেন্দ বসু লিখেছিলেন, 'গল্পগুলিকে নেহাৎই তাঁর কাব্যভাবনার পরিপূরক বলা উচিত হবে না... জীবনানন্দ যে মানুষের স্বরূপ জানার জন্য এবং সেই জ্ঞান ভাষা মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য প্রচণ্ড আলোড়ন বোধ করেছিলেন আপন চিত্তে, সে আলোড়নের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ অবশ্যই তাঁর কাব্যে, তবুও তাঁর গদ্যকাহিনীগুলি একই দুর্দম আলোড়ন থেকেই উদ্ভূত।' প্রথম ছ বছরের গল্প অবশ্য অনেকটাই মফস্বল–গ্রাম ঘেরতার ভেতর একান্নবর্তী ঘরে নবোঢ়া মেয়ে ও সঙ্গতিহীন স্বামীর, পরিবারের নানা জটিলতার, সুসম্পন্ন পরিজনের উঁকিঝুঁকি চাপের, কলকাতা মেসে আর দেশের বাড়িতে যাওয়া আসা করা রুজি সন্ধানী নায়কের আর তার দৃষ্টিতে দেখা অনাহত প্রকৃতির কথা। সম্প্রতি প্রতিক্ষণ প্রকাশন-সংস্থা একে একে এই গল্পগলি ছাপতে শুরু করেছেন।

এই সব উপর্যুপরি গল্প কি 'কবিতা লেখার ওপর আগেরকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা'র ফল? গল্পের নায়ক বলছে, নানা রকম অভিজ্ঞতার স্থূলতা অবসাদ কাটিয়ে উঠে সে প্রস্তুত হচ্ছে 'নব পর্যায়ের কবিতা লেখা'র জন্য। ১৯৩৬–৩৭ সালে কিছুবেশি এক বছরে পৌষ ১৩৪২–চৈত্র ১৩৪৩এর মধ্যে 'কবিতা' পত্রিকার ছটি সংখ্যায় এবই নতুন বারোটি কবিতা ছাপা হল, তৃতীয় বই 'বনলতা সেন'এর কবিতা (গ্রন্থাকারে প্রকাশ পৌষ ১৩৪৯)। বইয়ের সব চেয়ে পুরোনো লেখা 'কুড়ি বছর পরে' ১৯৩১এর শেষে সব শেষ লেখা 'বেড়াল' ১৯৩৬এর মাঝামাঝি লেখা ১২ নম্বর পাণ্ডুলিপি খাতার লেখা, এই খাতাতেই 'মহাপৃথিবী'রও আরো নটি লেখা আছে, ৭ ৮ ৯ ১০ ১২ নম্বর খাতায় মার্চ ১৯৩৪ এপ্রিল ১৯৩৬এর মধ্যে 'বনলতা সেন' 'মহাপৃথিবী'র অধিকাংশ লেখা, 'সাতটি তারার তিমিরে'রও অন্তত চারটি লেখা ('সমারূঢ়', 'যেই সব শেয়ালেরা', 'সপ্তক', 'একটি কবিতা') আছে পাণ্ডুলিপিতে।

'বনলতা সেন'র নবপর্যায় কোন্ লক্ষণে? লক্ষণ স্থির করার আগেই চোখে পড়ে লেখার জীবনী-সূত্র। 'জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার'— কুড়ি বছর পর ফিরে মনে হয় প্রকৃতি তেমনই রয়ে গেছে আজও কুড়ি বছর আগের আপূর্ণ প্রকৃতি, সে প্রকৃতির ভেতর ফিরে পাওয়া যায় যদি কুড়ি বছর আগের সে দিন! 'বনলতা সেন' প্রেমের কাব্য, কবি খুঁজছেন—পূর্ব কাব্যের তাত্ত্বিক 'স্মৃতি' নয়, বাল্য প্রেম, কুড়ি বছর আগের প্রথমবয়সী সেই ভালোবাসা—সন্ধ্যাবেলার সে মেঠো পথ, কার্তিকের ধানক্ষেত, সরু সরু কালো ডালপালা মুখে নিয়ে মাঝরাত্রির চাঁদ—তেমনি আয়োজন হয়ে আছে একই ধারা। সেই ভিজে মেঘের দুপুর, সোনালি ডানার চিল উড়ে উড়ে কাঁদছে ধানসিড়ি নদীটির পাশে, সে কান্নার সুরে 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে', কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে যে এক দিন ডেকে নিয়ে নিবেদন করেছিল নিজেকে, হারিয়ে গেল তারপর। কোথায়? এবারে ফিরে এসে এখন 'বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তার দুটি চোখ' খুঁজছেন কবি নক্ষত্রে, নদীজলে বিচ্ছুরিত জোনাকীর আলোয়, অঘ্রাণের অন্ধকারে ধানসিড়ি নদীপাড়ের সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে। যে মধু পৌগণ্ডের দিন কবি ফেলে গিয়েছিলেন সব খুঁজেছেন ফের পুরোনো পথ ঘুরে। বুনো হাঁসদল উড়ে যাওয়ার পর পড়ে থাকা নক্ষত্রের বিশাল আকাশে, হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে সেদিনের আরো মেয়েদের মুখ মনে পড়ছে—তারা আজ হীরের দীপ জ্বেলে ব'সে রূপকথার বিলুপ্ত ধূসর কোন্ পৃথিবীর অমরী কন্যা হয়ে গেছে। কিন্তু তারা সেদিনের 'হারাণী মরণী সব পাড়াগাঁর মেয়েগুলো'রই মতো, হয়তো স্মৃতি হয়ে আছে তাদের ভিতরে।

ধানসিঁড়ি নদীর ধারে পাড়ে অচেতন হয়ে আছে সে সব স্মৃতি । সে নদীও মজে গেছে বাধা

পেয়ে, শ্মশানের পাশে আর নেই (দ্র' রূপসী বাংলা ১৯ সংখ্যক)। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন লিখেছিলেন, উত্তর আসামের 'সিরি' পদান্ত নদী, যেমন সুবনসিরি নদীর (সুবনসিরি নেফা-র সুবনসিরি জেলার নদী) নামসাদৃশ্যে তৈরি ধানসিড়ি: "ধান" ও "শ্রী" শব্দের ব্যঞ্জনা এবং "সিঁড়ি" শব্দের উচ্চাবচতা ও বক্রতা ইত্যাদি মিলাইয়া বোধ করি শব্দটির সৃষ্টি।' ধানসিড়ি নদী কবির চিত্ররচনা নয়, সে প্রকৃত নদীনাম। বেভারিজ সাহেব বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাসে (১৮৭৬) তার বিবরণ দিয়েছে: 'The Barisal river flows west of Nalchiti and Jhalukatti. Part of its waters then go down by the Dhansiddhi into the Kaukhali and Kacha rivers'. সিরাজউদ্দিন আহমেদ 'বরিশালের ইতিহাস'এ (১৯৮২) লিখেছেন: 'ঝালকাঠী থেকে রাজাপুর পর্যন্ত ধানসিড়ি নদী এখন ভরাট হয়ে খালে পরিণত হয়েছে। পূর্বে এ নদী দিয়ে স্টিমার যাতায়াত করত। বরিশালের বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাস এ ধানসিঁড়ি নদী নিয়ে কবিতা লিখেছেন।'

'বনলতা সেন'র মূল অনতিমূল প্রেমিকারাও সবাই পুরো নামে চিহ্নিত: বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস। মাত্র এক-আধ স্থলে কেবলই রহস্যময়ী, আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো রহস্যময়ী, নারীর নগ্ন নির্জন হাতের তবমুজ-মদ তুলে ধরা পরিচর্যাটুকু—রূপকথার শঙ্খমালা কন্যা, কিন্তু স্পর্শ তাপ দুঃখ নিয়ে অদূর, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

এই বনলতারই একটু তথ্য কি কবি লিখেছেন ১৯৩৩এর গল্পে? বাবার বন্ধু কেদারবাবুর মেয়ে বনলতা। বাবা জিগেস করেন,'বনলতা? মনে হয তাব কথা তোমার?' 'সেই বনলতা- আমাদের পাশেব বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরেব আগেব সে এক পৃথিবীতে...'। কুড়ি বছব পব ফিবে আজ দেখছেন, 'কত শীতেব ভোরের কুয়াশা ও রোদেব সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ। বছর পনেরো আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলাব বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালেব উপব হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলবব করে...'। কেদাববাবু বাস উঠিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বনলতা কি স্বামীর ঘব করতে চলে গিয়েছিল কোনো দূর দেশে? সে কি মরে গিয়েছিল এখানে থাকতেই? গল্পের নায়ক বলছেঃ ঘোর একটানা বৃষ্টিব বিকেলবেলা চালেব খড়েব উপর ঝমঝম শব্দ আর মৌসুমিব কাজল ঢালা ছাযার ভেতরে শীত-শীত করে, গাযে কাঁটা দিতে থাকে কেযা—কদমেব মতো, মনে হয়, 'কিশোরবেলায যে কালো মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনাব নিকটবর্তিনী ছিল, বহু দিন যাকে হারিয়েছি—আজ সেই যেন পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশে দিগঙ্গনা সেজে এসেছে।' তাব রূপ ছিল 'নক্ষত্র মাখা রাত্রিব কালো দিঘিব জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো।... মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রু মাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকেব হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনাব সেই পুরোনো পল্লীর দিনগুলো সমর্পণ করে কোন্ দূব নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশে তার যাত্রা!' এখানেও পল্লীবালিকা হয়ে উঠেছে নিঃসময়ের অমরী নাযিকা। তার আগে অনেকগুলি ইতিহাসেব ঘাট পার হয়েছে সে। জ্বলন্ত দুপুরবেলা নদীঘাটে (ধানসিড়ি?) নেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেগুনের ফুলের মতো রঙিন আকাশের পর আকাশ পিছু হটে 'বেবিলনেব বিবর্ণ প্রাসাদ'-অলিন্দে, 'রৌদ্রপ্লাবিত ভূমধ্যসাগারেব মতো জ্বলন্ত রৌদ্রে' গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে,'বেবিলনেব সিংহেব মূর্তির কাছে/কখনও বা পিরামিডের নিস্তব্ধতায়' ফের সে মুখোমুখি হয়েছে প্রেমিকের, কাঁখে তখন মাদকতাময মিশরীয কলসী,' দ্বারকার চূর্ণ থামের মতো দেবদারুছায়া আঁকা জ্যোৎস্নাব বেলাতটে দাঁড়িয়ে প্রেমিককে শুধোচ্ছে: 'মনে আছে?' কবি বলেছেন: 'তিন হাজার বছর ধোঁযায মিলিয়ে যায তোমাব মুখেব দিকে তাকালে'। তারপর খণ্ডিত সমস্ত সময়-লহমারও অতিগ হয়ে যায সে। যদিও এই মুহূর্তের প্রত্যক্ষ জীবনী-সূত্রের সে শরীরিণী।

শঙ্খমালাকেও ফিরে দেখেছেন কবি—সন্ধ্যার আঁধারে নীড়ে ফেরা বিমর্ষ পাখির রঙ ধরে আছে গায়ে, তার মাথার উপর শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ, মনে হয় দাহ হবার পরের প্রেতিনী সে, তেমনই অপ্রাকৃত তার রূপ, আর দেখা-দেওয়ার ক্ষণ—প্রতিবেশ:

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে...

এখনও মনে হয় দক্ষিণ শিয়রে শুয়ে পুড়ছে সে দাহের আগুনে, তবু করুণ শঙ্খের মতো তার স্তন দুধে আর্দ্র হয়ে আছে, অপূর্ণ কামনাতে। কবি কি ছিলেন তার সে দাহ দলে? পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি কবিতায় পাই শ্মশান পুড়িয়ে ফেরার পথে পাড়াগাঁর মদের দোকানে আশ্রয় নিয়েছেন, 'মদ, না তাড়ির আড্ডা?' অত রাতে কেউ তখন সেখানে নেই। মদ কোনো দিন খান নি তিনি। প্রশ্ন করেছেন, 'শ্মশানে কাকে পুড়িয়ে এসেছি?' গভীর রাতের অরণ্য রোমশ বাতাসের হাতে তাঁর 'মাথার চুল যেন পৃথিবীর অরণ্য' হয়ে যাচ্ছে, চারি ধারে 'কড়ির মতো ধূসর জ্যোৎস্নার রাত।'

কাকে পুড়িয়ে এসেছিলেন? সে কি কিশোরী প্রেমিকা কেউ? যার কথা লিখেছেন, 'আমার হৃদয়ে যে গো শঙ্খমালা কিশোরীটি বাঁধিতে আসিয়াছিল ঘর', যে ঘর বাঁধা হয় নি তার। সে কি বধূ কারও? পরস্ত্রী? একটি খসড়াতে আছে এই বিবরণ:

এই চরে—এই নদীটির পাশে—অই আম হিজলের বনে
তখন ছিল না ডোম বস্তিটা—পাড়াগাঁর আমরা কজনে
এক দিন জ্যোৎস্নায়— অঘ্রাণের জ্যোৎস্নায়-আজও পড়ে মনে

মাস্টারের সেই মৃতা স্বর্ণলতা, আহা সেই আলোকলতারে
সোনার চিতার মতো, চিতল মৃগীর মতো রূপসীরে নদীটির পারে
পোড়ায়েছি: এত ব্যথা পাই নাই কোনো দিন শবের সৎকারে...

তবু জানি সেই রূপ কোনো দিন ভস্ম হয় নাকো।
কাকের ডানার গন্ধ মাখা কোনো সন্ধ্যায় যদি তারে ডাকো
রূপসী প্রেতিনী সেই আসিবেই—দেখা পাবে...

দেখিবে ডাহুকী উড়ে গেল তার নীড় থেকে ভয়ে,
মাছরাঙা ডেকে কেঁদে উঠেছে বিস্ময়ে,
নলখাগড়ার বনের হু হু হাওয়া—হাওয়া নহে নহে—

ওই শোনো, থেমেছে ঝিঁঝির ডাক— দম আটকায়ে চুপ করেছে বাতাস
লক্‌লক্ করে শর— খস্‌খস্ করে ওঠে কাশ—
শেওড়া দুলিয়া পড়ে— দমকায় মর্‌মর্ করে ওঠে বাঁশ—

বিবর্ণ বিস্ময়ে আমি ঢুল খাই— বিবর্ণ বিস্ময়ে
কাদাখোঁচা মাছরাঙা কেঁদে ওঠে ভয়ে,
নলখাগড়ার বনে হু হু হাওয়া—হাওয়া নহে নহে—

বিবর্ণ বিস্ময়।
দাঁড়কাক মগডালের উড়ে গিয়ে চোখ বুজে রয়
শরের বনের পাশে মানুষ ও প্রেতিনীতে মিলে কথা কয়—

আজও ঘর ভিড় কাজ ফেলে 'অঘ্রানের পাড়াগাঁর ম্লান তেপান্তরে'— কবি ঘুরছেন, মনে মনে তার দেখা চেয়ে—ভর সন্ধ্যাবেলা, যত পাখি উড়ে চলে গেছে, ঘরে, তাঁর বিশ্বাস: 'এক তারা ফুটিলেই রূপসী প্রেতিনী সেই দেখা দেয় মাঠের বাতাসে'। —'প্রান্তরের পথে ঠুঁটো তালগাছ- মরা নদীটির বাঁক—আর হাঁসশিকারীর গুলির আওয়াজ'—আবার নিস্তব্ধতা গ্রামপ্রান্তরের, 'সন্ধ্যার শালিখ তার খুঁজিতেছে নীড়', পাটনীর নৌকোয় শেষ দল চলে গেল পার হয়ে পাটনীও চলে গেল তারপর, কবি দাঁড়িয়ে আছেন—অপার নির্জন চারি ধারে, ভাবছেন: 'পাটনী চলিয়া যায়—আমি দেখা চাই প্রেতিনীর'।

ছিন্ন অনুষঙ্গ চোখে পড়ে আরো কাছে, 'ঝরা পালকে' : 'রূপ-পিপাসায় জ্বলি মৃত্যুর

পাথারে/স্পন্দহীন প্রেতপুরদ্বারে' গিয়ে করাঘাত করার, 'ক্ষুধিত প্রেতের মতো' কঙ্কাল রূপকে চুম্বন করার লেখা। 'আলেয়ার লাল মাঠ, শ্মশানের খেয়া ঘাট', ভাদরের ভিজা মাঠে আলেয়ার শিখা জ্বলা দেখে যখন মনে হয় 'কোন্ দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া/চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া', কিংবা 'কবি' কবিতার প্রান্তিক অণুচ্ছেদে, চোখ বুজে পুবের বাতাসের কান্নার ভেতরে কবি যখন শুনতে পান 'শ্মশানশবের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস', মনে হয়

তারই লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা— হিম চিতা জ্বেলে দেয় শিখা,
তারই মাঝে জ্বলে যায় বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা।

ব্যক্তি থেকে ব্যাপ্তি গড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। এক থেকে শত লক্ষ চিতাবহ্নি, শত শত প্রেতবধূব নিখিল বিরহীরা, আ-দেশ গর্ভিণীর ক্ষোভ—'মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন তার বারবার ভিজা বসে উঠিযাছে ভরি'— যেন সব 'শঙ্খমালা'র উপান্ত্য ছত্রের তথ্যের উপরে নির্মিত।

'শঙ্খমালা'র অনেক উল্লেখ ইঙ্গিত আছে 'রূপসী বাংলা'র কবিতায় (মার্চ ১৯৩৪এ লেখা পাণ্ডুলিপি) দ্র° ৫ ১৩ ২৮ ৩২ ৩৬ ৩৯ ৪৪ ও ৫৪ সংখ্যক কবিতা। দুটি লেখায় প্রত্যক্ষ এই দাহ সূত্র (৫ ও ১৩ সংখ্যক):

১ ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে...
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে...
২ কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি—কবে যেন রাখিয়াছি হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশানচিতায় তার হাত
ঝরে গেছে, কবে যেন...

একটি লেখায় দেখি তার 'করুণ শঙ্খের মতো স্তন' (৩৯ সংখ্যক), একটি কবিতায় কঠোর উপেক্ষা: 'হয়তো সে কন্যার হৃদয়/শঙ্খের মতন রুক্ষ' (৫৪ সংখ্যক)। আর-একটিতে কলকাতা দূরত্বে বসে কবি লিখেছেন '১৩২৬এর কতকগুলো দিনের স্মরণে'।

আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোয় কাঁটায়
চলে গেছি বহু দূরে—দেখ নিকো, বোঝো নিকো, কর নিকো মানা,
রূপসী শঙ্খের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন—পানের বাটায়।

১৯৩৪এর অপর একটি পাণ্ডুলিপি কবিতায় শহরবাসী, গ্রামে ফেরা কবির এই আবেগটুকু অন্বিত হয়েছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পঁচিশ বছর পরে' অংশের সঙ্গে:

সারা দিন পথ থেকে পথে শুধু—পথ থেকে পথে পথে হল ঢের হাঁটা
তবুও সে নারীটির কোথাও তো পাই নিকো টের-
'নারী নয়, প্রেতিনী সে—'মর্মরি উঠিল বট—'মুখে অগ্নি দাও' নি কি তুমি সে শবের? পঁচিশ বছর পরে আবার এসেছ কেন পাড়াগাঁয়— শহরের কলরবে চলে যাও ফের, সেখানে রয়েছে নারী ঢের...'।

তাদের যোগ কবি পান নি। কিংবা ফিরে এসেছেন তাদের অতিক্রম করে, মুহূর্তেসাজ খুলে ফের হয়ে উঠতে চাইছেন সাবেকি, অভ্যস্ত, 'প্রেত হয়ে প্রতিনীর খোঁজ' করার সাবলীলতায়।

এ গেল জীবন-সূত্রের, অনুমান। 'বনলতা সেনে'র নবপর্যায়ের গোচরতর কারুলক্ষণ কোন্খানে? 'ঝরা পালকে'র সোচ্ছ্বাস বিস্তার, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অবারিত দৈর্ঘ্যের পাশে প্রথমেই চোখে পড়ে তার সংক্ষেপ আয়তন। 'বনলতা সেন' নাম-কবিতা সূত্রে এডগার অ্যালান পো-র হেলেনের hyacinth hairs ও classic face. সে কবিতার desperate seas এবং weary, way-worn wandererএর সঞ্চারের কথা বলা হয়, কিন্তু 'বনলতা সেনে'র হাল ভাঙা দিশাহারা ক্লান্ত নাবিকের লক্ষ্যে native shoreএর স্থলে ভেসে উঠছে যে 'সবুজ ঘাসের দেশ... দারুচিনি দ্বীপের ভিতর' সে যুক্ত হয়ে আছে 'ঝরা পালকে'র কোন্ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ/করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে'র নাবিকের সঙ্গে। দেশে ফেরার নয়, সিন্ধু পাড়ি দিয়ে সে হল দ্বিতীয় স্বদেশে পৌঁছোনোর কবিতা। কিন্তু অ্যালান পো-র গূঢ়, গাঢ় প্রভাব অনিবার্যতই স্বীকার করেছে এ বইয়ের কবিতামালা তাঁর কাব্যতত্ত্বের, কবিতা-দৈর্ঘ্য-বিরুদ্ধতার অনুজ্ঞা মান্য করে। পো-র অনুশাসন নিছক দৈর্ঘ্যের বিরুদ্ধ নয়, ভাষা ব্যবহারে সে তথ্যবিবরণ ও কাব্যপ্রকরণের দ্বৈধ জাগিয়ে দিয়েছিল আধুনিক কবির চিত্তে।

সিম্বলিস্ট-উত্তরসিম্বলিস্টদের কবিতা, বোদলের মালার্মে র‍্যাঁবোর, পরের শুদ্ধ আধুনিকদের কবিতা ব্যক্তিজীবনের সমাজ জীবনের তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতার বিবরণ (mimesis) সাগ্রহে ছেড়ে দিয়ে গেছে যে গল্পোপন্যাসের এলাকাতে তার আরম্ভে অ্যালান পো-র বা, বোদলের-মালার্মে উপস্থাপিত অ্যালান পো-র প্রবর্তনা আছে। কবির জীবন-সূত্রের প্রণোদনা সংগ্রহের আমরা প্রয়াস করেছি, কিন্তু জগৎ-জীবনের যাবতীয় স্রস্ত অসংবদ্ধ উপকরণ আধুনিক কবি অনেক দিন থেকেই পুনর্বয়ন করে তুলতে চাইছেন আপন সুমিতিতে, গভীরতায়। জীবনানন্দের পরেকার ব্যাখ্যা, বা সাধারণভাবে দর্শনের পরিভাষা দিয়ে বলতে হয়— সে ঠিক অভিজ্ঞতা বা অবভাসের বর্ণনা নয়, ভাবনাপ্রতিভার নির্মাণ, *phenomenal* নয় *nounmenal*। 'এডগার পো-র 'সমাধি' কবিতায় মালার্মে জাতির ভাষাকে শুদ্ধতর অর্থ দান করার দৈবী ক্রিয়ার কথা বলেছেন (jadis l'ange/Donner un sens plus pur aux mots de la tribu)। হায়েরোগ্লিফের মতো সংকেতময় তাঁর লেখার শব্দ, শুদ্ধ কবিতায়তন রচনা করতে চান তিনি কবিতাকে সারাৎসার করে তুলে। জীবনানন্দের নবপর্যায়ের কবিতাতেও সেই মিতায়ত মিনিয়েচার ফ্রেম। যদিও সুধীন্দ্রনাথের যুক্তিসিদ্ধ যাথার্থ্যের সংক্ষেপ তাঁর নয়, মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই তাঁর অন্বিষ্ট এমন কথাও বলা যায় না। তবু 'নাবিক', 'বেদিয়া', 'অস্তচাঁদে', 'চাঁদিনীতে', মিশরপ্রত্নের লেখা, আরো আরো প্রথম লেখার তথ্য ও আবেগ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পাখিরা' কবিতার দুস্পার সমুদ্র পার হয়ে এসে পাখিদলের নবতর নীড় বাঁধার লগ্ন এক যোগে সারসংক্ষেপ হয়ে উঠেছে 'বনলতা সেন' নাম—কবিতার তিন অণুচ্ছেদে, আগের দুই কাব্যের উপর্যুপরি পঙ্‌ক্তি ঘনীভূত হয়ে এখানে হয়ে উঠেছে বহু অর্থ স্তব। নিশ্চয় তার প্রক্রিয়া আরেক ধারা। আগের কাব্যের জীবনবোধও সংস্কার হয়ে উঠেছে এখানে। ব্রিজার্ডের তাড়া খেয়ে লক্ষ লক্ষ মাইল মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ার বদলে এখানে উদ্‌বেজনাময় হয়ে উঠছে 'চারি দিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির, ইতিহাসপর্বের, অভিযাত্রাশেষের দিনান্ত আশ্রয় হয়ে আছে এখানে কবিতার নায়িকা। হয়তো তট-বন্দর পাওয়া দিশাহারা নাবিকের সে রাত্রির পরিচর্যা, হয়তো রণবক্লক্লান্ত জয়াশী সন্তানের পরিণাম শুশ্রূষা।

তথ্যের একটা সহজ বিস্তার, বা জন্মান্তর ঘটিয়ে তোলার প্রক্রিয়া আছে জীবনানন্দের কবিতায়। তাইতে দেখি 'নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর' অবারিত প্রকৃতি হয়ে উঠেছে অকালমৃতা শঙ্খমালা, কবি বলছেন: 'বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর, সেই বরে (দ্র॰ 'রূপসী বাংলা' ২৮ সংখ্যক)। তাইতে দেখি গ্রামের প্রতিবেশিনী মেয়ে হয়ে ওঠে মিশর বালিকা, বেবিলনের রানী, কখনও অনিকেত নৌযাত্রী নাবিকের বন্দর-সরাইয়ের দু দণ্ডের শান্তি। এই স্থিতি-বদলের *(Phantasmagoria)* একটু গোচর প্রণালী পাই তাঁর এক গল্পে: সেখানে গৃহবধূ অঞ্জলি অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় বাতাসে ডালপালার ভিতর সহসা হয়ে যাচ্ছে নারী আর তার অনুরক্ত সিংহ, 'জানলার বাইরে ফুটে ওঠে অবিরাম খেজুরের সারি—তাদের দীর্ঘ নীলাভ ছড়ির ফাঁকের ভিতর থেকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে, চাঁদ, হাতির দাঁতের মতো নীল জ্যোৎস্না, দূরে পিরামিড, মর্মস্পর্শী অপরূপ বাতাস...', দীর্ঘ শতাব্দী পার হয়ে সে মামলুকের স্ত্রী সেজে বসেছে। কবি বলছেন, 'সমস্ত গভীরে কেমন বিচিত্র আস্বাদ।' বনলতা বাল্যপ্রেমিকাও উত্তরোত্তর স্থিতি-বদল হয়ে গেছে বহমান ইতিহাসভূমিকায়, তারপর ভাব বা তত্ত্বরূপে; 'বনলতা সেন'—কাব্যবিষয়ও নির্যাসোপম, আবার ব্যাপক অর্থান্বিত হয়ে উঠেছে ক্রমান্বয়ে— এ বইয়েরই দ্বিতীয় সংযোজন সংস্করণে সুদর্শনা শ্যামলী সুরঞ্জনা সবিতা সুচেতনা একাধিক অনাম্নী 'তুমি'র লেখাতে, 'মিতভাষণ' বা আরো দু-একটি লেখায় প্রেয়তরের দুর্বার টানে ব্যক্তি ও মানবসভ্যতার উত্তাল সিন্ধু পাড়ি দিয়ে আরেক আয়তনের দ্বিতীয় স্বভূমিতে নীড় নগর রাজ্য গড়ার কাহিনী কবি লিখেছেন ক্রমশর্নিবিড় কাব্যবন্ধে। 'সুদর্শনা'তে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে' ও অতিগ আহ্বান শুনতে পেয়েছে সে, 'আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে/দেখেছে সে তোমার বলয়।' 'শ্যামলী'কে দেখে মনে হয় সে যেন সে কালের সেই শক্তি যার 'মুখের দিকে তাকালে এখনও, সে দিনের সেই 'দূর সাগরের শব্দ', 'দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা', দিনান্ত উপকণ্ঠের সিন্ধুচিল আর অভিযান জাহাজ নিয়ে ফেরা লিপ্সু যুবাদলের আতুরতা ক্রন্দন— সব তাঁর অনুভবে জেগে ওঠে। 'অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল-' লোভব্যাকুলিত, আজও 'মানুষকে স্থির-স্থিরতর হতে দেবে না সময়।' 'পৃথিবীর বয়সিনী... এক মেয়ের মতন' সুরঞ্জনা-প্রত্নতম ইতিহাসের তবু স্থিরযৌবনা সে, গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় আকুলতা সে শুনেছে অধ্যায়ে অধ্যায়ে; কাম্যতরের, পরমতমের যা চক্র শুনেছে মানুষের। কী সে পরমতম? সে কি

পরম ঈশ্বর? কবি বলছেন সে নিশ্চয় 'তার সেই নিহত উজ্জ্বল/ ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।' তা না হলে ধর্ম লাভেই তো নির্বাণ হত কামনা। কবি বলছেন, সে 'আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়ে'র মতো অবর্ণ্য জ্যোতির্মণ্ডলের আলো। সেই না—পাওয়া পাবার আশায়

যেন সব অন্ধকাব সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে—

দেখা গেছে, বিপুল অগাধ ঋদ্ধি লাভ করার পরেও 'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে; /বড়ো বড়ো নগরীর বুক ভরা ব্যথা'। কবি বলছেন:

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি—

মনে হয় বনলতাই স্থিতি-বদল করে হয়ে উঠেছে পরমা সুচেতনা, তার চাক্ষুষ যোগ দেখতে পাই 'সুচেতনা' কবিতার আরম্ভেই

সুচেতনা তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে
সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে

এখানেও দারুচিনি দ্বীপের ভিতরে পুরোনো সবুজ দেশটিই দেখা যায় যেখানে ক্লান্ত নাবিকের দিনান্তে আশ্রয়, কিন্তু এ কবিতায় নায়িকার নবজন্মোত্তব হয়েছে সুচেতনা রূপে তার দারুচিনি দ্বীপটি এখন নিশান্তের উদয়বিন্দুতে। সুচেতনা এখন নব সূর্যারুণপ্রতিমা, সবিতারূপিণী, 'সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে মানুষের স্থিরতর মর্যাদার মতো' তার মূর্তি, ক্রমে অপরোক্ষেই তার অভিধা হয়ে উঠেছে 'সূর্যদেবী', 'নারীসবিতা', 'নারীসূর্য'—ইনফের্নো প্রথম সর্গে অন্ধ বনপ্রান্তের পুণ্যাচলচূড়ায় দিব্য প্রেমাস্পদার দিশারী উদয়সূর্য, আবার নতুন ইতিহাসে অভ্যুদয় পাওয়া জাপানের পুরাণী সূর্যদেবী অমতেরাসু-র আদর্শ মিলিয়ে হয়তো সে গড়া, অতীতের দান আর আগামীর সম্ভাবনা মিলিয়ে। কবি দেখছেন 'পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন', দেখছেন, 'তবুও নারীরা আজ ইতিহাসভণিতার থেকে/ক্লান্তি নিয়ে কাছে আসে, দূরে যায়—কৃতী ইতিহাস প্রতিভার/নিকটে কাহারও ঋণ নেই আজ, নারীসূর্য নেই, তবু তাঁর বিশ্বাস অগণিত জীবনের 'রণরক্তসফলতা', 'যুদ্ধ রক্ত বিধ্বংসা ভয় কলরোল' অতিক্রম করে তার সে সবুজ দ্বীপটির পথেই কি এক দিন অবিবহিত হয়ে উঠবে সে মানুষের? আমাদের মতো ক্লান্ত, ক্লান্তিহীন নাবিক তাকে পাবে এক দিন, হয়তো 'আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।'

প্রেম থেকে এই তত্ত্ব হয়ে ওঠার পিছনেও বেয়াত্রিচে-প্রকরণ মনে পড়ে। দান্তের ন বছর বয়সের বাল্যপ্রেমিকা, পোর্তিনারির কন্যা, বার্দির বধূ, শৃঙ্গার-নায়িকা আর সত্ত মরমিনীর যোগে হয়ে উঠেছিলেন 'কনভিভিয়ো'র Lady Philosophy, তারপর পুর্গাতোরিয়ো ৩০তম সর্গে দিব্যরথবাহিতা হয়ে প্রজ্ঞা মুকুট পরে হয়ে উঠলেন ত্রাণ-কল্যাণের ঈশ্বরী বেয়াত্রিচে, তাঁকে দেখে প্রভু যিশুর প্রত্যাগমনের আশ্বাস জাগে, *paradiso terrestre*-এ সে বেয়াত্রিচকে দেখে কবির মনে পড়ছে 'embers of the ancient flame'(সর্গ ৩০ ছত্র ৪৮), হয়তো সে শারীর সূত্রই, কিন্তু লোকাতিগ এখন, শুদ্ধ সুচেতনা যেমন অনেক শতাব্দীর মনীষীর পুনঃপুনঃ সাধনার নির্মাণ।

অনেক শতাব্দীর ইতিহাস, মূলত নৌবলবাহী বা নাবিকী ইতিহাসের অস্থিপঞ্জরের উপরে জীবনানন্দ তাঁর কবিতা নির্মাণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছিলেন মহাযুদ্ধের সমুদ্রপথ বাণিজ্যবায়ুর অভিঘাত তাঁর চিত্তে লেগেছিল একদা কলরোলময় তাম্রলিপ্ত বন্দরের দেশ-ইতিহাস তাঁর জানা ছিল বলে, 'ঐতিহ্যে ক্লান্ত তাঁর নাবিকী মন'। 'বনলতা সেন' থেকে 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতা পর্যন্ত 'জীবনানন্দ বিদিশার গ্রীসরোমকোত্তর যুগের ক্লান্তপ্রাণ এক নাবিক। "বনলতা সেন" কবিতায় সে প্রাণের নৈরাশ্য থেকে মুক্তির প্রয়াস কবি দেখিয়েছেন আর 'নাবিকী' কবিতায় আমরা

পাচ্ছি দার্শনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন যা গ্রীক ভাবসমৃদ্ধ।' জীবনানন্দের 'পরিশ্রুত ইতিহাসরস বা ইতিহাসচেতনা'র কথা বলেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। জীবনানন্দ ইতিহাসের ক্রমাগ্রসর প্রগতিতে অবশ্য বিশ্বাসী নন, তাঁর বিচারে সে পুনরাবৃত্তিময়, cyclical, 'চক্রচর', 'চক্রাকারে ঘোরা কাল' (দ্র' 'বিভিন্ন কোবাস'। মহাপৃথিবী), অনেকটা ইয়েট্স্ যেমন ভাবতেন। হয়তো মানুষী মেধার ক্রমোন্নতিতেও আশা নেই তাঁর। 'সময়ের শতকের মৃত্যু', 'অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা'র 'নব পৃথিবীর দিকে' যাত্রা, 'মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে/জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়' ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ আধুনিক একায়তনিক ইতিহাসবিশ্বাসের মতো। টয়েনবি বলেছেন 'illusion of progress' তিনি পশ্চিমি মানক দিয়ে নির্ণীত অসভ্য-উন্নত জাতিভেদতত্ত্বেও সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিরাশাবিদ্ধ অস্ওয়াল্ড স্পেঙ্গলর ওষধিবৃক্ষের দৃষ্টান্তে সংস্কৃতি-পর্বেরও নিষ্পাদন করেছেন উদগম-বৃদ্ধি-বিনাশের সূত্রে। জীবনানন্দ 'সময়ের শতকের মৃত্যু' আবার 'অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগা'র কথা বলেন, আবহমান নৌশক্তিবিস্তারের ইতিহাস-সূত্রে গ্রথিত করে লেখেন একই আবেগের বারংবার অনুবর্তনের কথা— আর্গোনটদের কাহিনীপুরাণ, প্রত্ন মিনোয়ান সভ্যতার কাল থেকে দ্বীপমালা অধ্যুষিত ঈজিয়ান সাগর পারাপার করা পরস্পরবিস্তারী সব স্মৃতি, ক্রিট মিশর আনাতোলিয়ার নিজ অতিক্রমী বিনিময়, হেলেস্পন্টের দক্ষিণ কূল ঘেঁষে শত হাজার তরণীজাহাজের কৃষ্ণ সাগরের দিকে নিরন্তর চলে যাওয়া— হয়তো সবই 'সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,/মহিলারই প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল/টের পেয়ে...', কিংবা মহিলাকে উদ্ধারের উপলক্ষ্য করে, একিয়ান বীরদের রাষ্ট্র বাণিজ্য বিস্তার লোভে সেই ট্রোয়ান দেশে পার হয়ে যাওয়া, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ফিনিশিয়দের টায়ার থেকে কার্থেজে নতুন নগর নির্মাণ, 'ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে/ উতরোল বড়ো সাগরের পথে' ধর্মযাত্রা ('শান্তির সঙ্ঘের দিকে— ধর্মে—নির্বাণে'—সেও সমীকরণ করেছেন কবি 'তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে' ব'লে), সেদিন থেকে আজকের ইয়োরোপের উপনিবেশবিস্তার আর dreadnought বানাবার রেষারেষিও কবি দেখেছেন অচ্যুত এক তারে বাঁধা। তারই ভেতর চেতন স্পন্দনের মতো যেন তিনি বহন করে চলেছেন আজও সেই আবহমানের প্রাণবীজ :

> সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
> মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে:
> ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
> তাহাদের সাথে
> সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন...

দিন বদলে গেছে। 'এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে' তবু চেনা যায় রহস্যমর্যার পুরোনো মুখখানি। 'তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে/ কবেকার সমুদ্রের নুন'—'কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'র মতো যার চুল সেই ব্যক্তিপ্রেমিকার সঙ্গে তার পরম্পরিত যোগ। জীবনযুদ্ধ থেকে ফেরা লোকের উপান্ত্য ঘরটি ওই কবিতাতেই কবি তুলনা করেছিলেন হাল ভাঙা দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের আশাদ্বীপ বলে। এখানে দূরান্ত প্রত্নসাগরের নুন লাগা যার চুল সে উদয়প্রতিমা, সবিতা, নারীসবিতা। জীবনানন্দের কবিতায় পুনরাবৃত্তি নক্‌শার মতো দেখা যায় আজও মানুষের সেই অচ্ছিন্ন নাবিকবৃত্তি, পরবর্তী 'সাতটি তারার তিমিরে'ও

> হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু?
> বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরসী থেকে ফেঁসে
> অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও—দুপুরবেলায়;
> বৈশালীর থেকে বায়ু— গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ার
> মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো;
> তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার
> প্রয়োজন রয়ে গেছে...

আদিমধ্যান্তগ্রথিত ধারাবাহিকতা নেই জীবনানন্দের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর গোড়ার লেখাতেই লক্ষ্য করেছিলেন, 'তাঁর অনেক কবিতাই সুসমঞ্জস সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, কতকগুলো টুকরো টুকরো ছবিকে জুড়ে দেওয়া হয়' তাতে। টুকরো জুড়ে লেখার এই প্রণালী বাইবের আধুনিক লেখার প্রসিদ্ধ লক্ষণ। শশিভূষণ দাশগুপ্ত একসময় লিখেছিলেন, 'মনের ভাবকে শুধু কথার

রূপে না বলিয়া টুকবো টুকরো চিত্রের ভিতর দিয়া তাহাকে নানাভাবে চিত্তের সামনে ধরিয়া দেওয়াই আধুনিক কাব্যরীতি; জীবনানন্দকে স্থানে স্থানে এই রীতির একটি নিপুণতম শিল্পী বলিয়া মনে হয়।' কেবল চিত্র নয়, টুকরো টুকরো অনুভব প্রসঙ্গ বাক্যাংশ, এলিযট বলেছেন 'all the particles which can unite to from a new compound...'। তার সূত্রপাত কোন্ সূত্রে? ওয়াল্টার বেঞ্জামিন লিখেছেন, লেখক ও পাঠকের ভাগাভাগি অভিজ্ঞতার সহজ ট্রাডিশনাল সংযোগপ্রবণ লেখা এখনকার শহরচেতনাসমুখ খণ্ড অংশ সংবাদবিস্ফার গেঁথে লেখার ভিতরে আধুনিক রূপান্তর লাভ করেছে। এই কালান্তর বেঞ্জামিন লক্ষ্য করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে। সুর্‌রিয়ালিস্ট কবি-শিল্পী যে আধুনিক জীবনের অংশ-টুকরোর শিল্পমূল্য, নান্দনিকতা খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন তাবও আরম্ভ এই সময়। পল ফুসেল তাঁর 'মহাযুদ্ধ ও আধুনিক স্মৃতি' বইয়েও টুকরো-অংশগত মডার্নিস্ট দুনিয়াতে এই প্রজন্মের প্রবেশ নির্ধারণ করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কাল থেকে। এই টুকরো কখনও একায়তনেব, কখনও বিষম স্থিতি বা সংবেদনার— অপ্রত্যাশিত ভূমিতে দুই দূবের, বিপ্রতীপের জোড়া দেওযা, মাক্স্ আর্নস্ট বলেছেন। পিযের রভের্দি বলেছেন, জোড়া দেয় দুই বিষমের সম্বন্ধ যত দূরের হবে তাব দ্বারা রচিত ইমেজ হবে তত বলিষ্ঠ, তাব আবেগশক্তি, কাব্যসত্যও হবে তত বেশি। সুব্‌রিয়ালিস্টরা নিত্য অভ্যস্ত বস্তুবিষয়ের বিস্ময সৌন্দর্যে রূপান্তর করতে গিয়ে স্বপ্ন আর সত্যের দুই আপাতবিপরীতের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন পবমা বাস্তবে, বা পরা বাস্তবে। জীবনানন্দের আরো সামনেই ছিল এলিয়টের কবিতা: 'প্রুফ্রক' থেকে অংশ তথ্য উদ্ধৃতি গাঁথা 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড', জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাস যেখানে টুকবো টুকরো সমান্তবাল ক্রিয়াকাহিনী জুড়ে জুড়ে ডাবলিন শহবেব পুরো গল্প লেখা। ছিল এজবা পাউণ্ডেব বিদগ্ধ সংকব কবিতা। প্রসঙ্গত, পাউণ্ড 'দি রেনাসাঁস' লেখাতে অন্য কালের,অন্য দেশের, বিশেষ বিদেশি সাহিত্যেব লেখা ও প্রক্রিয়াব 'শুদ্ধ বঙ' অবচয করে এনে বিশ্বজনের উপযোগী আঞ্চলিক সাহিত্য লেখার পরামর্শ দিয়েছেন লেখককে।

'বনলতা সেনে'র লেখাযও এই সংকব ধাবাটুকু বেশ চোখে পড়ে। সেখানে বাঙালি কবিব হৃদয ভবে উঠেছে ভেল্টেব তৃণগন্ধে, বাংলা গ্রামঘবেব জানলায ঝাপট দিয়ে আসা বাতাস সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তবের অজস্র জেব্রার মতো'। উষার শেষ তারাটি একই সঙ্গে পাড়াগাঁর বাসরঘবেব গোধূলি-মদির মেয়ের মতো, আবাব মদেব গেলাসে বাখা মিশবের মানুষীব বুকেব মুক্তোটিব মতো। স্পষ্টই নতুন একটা মিশ্র ব্যাপ্ত বাস্তবেব বচনা। সংযোজনের 'অবশেষে' কবিতায অতিকায হরিণের মতো শান্ত উঁচু উঁচু গাছ, দূরের অস্পষ্ট বাতাস 'বাঘের ঘ্রাণেব মতো' তাদেব বুকে ত্রাস জাগিযে যায, তাদেব যৌথ ত্বরিত পলাযন উন্মুখতা হয়ে ওঠে 'একজোটে কাজ করে মানুষেবা যে বকম ভোটেব ব্যালটে', তখন প্রকট হযে ওঠে প্রাকৃতিক প্যাস্টোবাল আর ভোটতন্ত্রী আধুনিক রাষ্ট্রের বিষম গ্রন্থনা। জীবনানন্দেব 'পাখির নীড়েব মতো' নারীচক্ষু, 'বিবাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে নাবী'র মতো রাত্রির মাথা নাড়া, 'উটেব গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা', 'চিনেবাদামেব মতো বিশুষ্ক বাতাস' এই সব 'অপরিমেয়েরূপে অ-সদৃশ দুই বস্তুর এক সূত্রে বেঁধে দেওযাব বিবাট কল্পনাশক্তি'ব কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব, সে হযতো দুই অতি দূব বিষমকে মেলানো সুরব্যাশনাল বা পরা যুক্তিতে। হযতো এলিযটের প্রসিদ্ধ 'জে. আলফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগীতি'তে যেমন 'When the evening is spread out against the sky /Like a patient etherized upon the table' বা 'Streets that follow like a tedious argument/ of insidious intent' বা 'The yellow fog that rubs its back upon the window-panes' ইত্যাদি লাইনে সন্ধ্যা আব রোগশয্যা, বাইরে পথ আব ন্যায-তর্কের একঘেয়েমি, কুয়াশার প্রাণী-আচরণের বিষমাচার— যেন এই রকমেরও অনুযাযী। উত্তরপর্বে জটিলতাব বুনোট পড়েছে এই বচনাপদ্ধতিতে।

৭

'মহাপৃথিবী' (প্রকাশ ১৩৫১) কাব্যের পূর্ব ভাগ রূপে পরিকল্পিত হয়েছিল এক পযসার একটি সিরিজ 'বনলতা সেনে'র ১২টি কবিতা। তার কিছু সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'জীবনানন্দ দাশ' নামে দীর্ঘ অবধারণ ছাপেন 'নিরুক্ত' আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায়, 'ঝরা পালক' থেকে 'মহাপৃথিবী'র শেষ দিকের লেখা পর্যন্ত তার বিষয়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের কবিতায প্রেম লক্ষণ, সিম্বলিস্ট-ইমেজিস্ট সব সূত্র, বের্গসনীয

প্রাণপ্রেরণা ও বহিঃশায়ী দৃশ্যবিষয় থেকে অন্তশ্চৈতন্যে মোড় ফেরার রীতিমতো পর্যালোচনা করেন, শেষে লেখেন, মন থেকে মননের পথে বিংশ শতাব্দীর জটিল বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে এখন, বিশেষত 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় কবি 'একটি জগৎ (অনুভূতির জগৎ) ভেঙে দিয়ে আরেকটি জগতে (বাস্তব জগৎ) প্রবেশ করতে হয়েছে বলেই দ্বিতীয় জগতের স্থিরতা সম্বন্ধে মনে আশ্বাস পাচ্ছেন না। এই সংকট তাঁর মনকে, ভাষাকে অনবরতই জটিল করে তুলছে।'

বুদ্ধদেব বসু 'মহাপৃথিবী' পড়ে খুশি হন নি, লিখেছিলেন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর জীবনানন্দ যে সব কবিতা লিখেছেন ও সাময়িকপত্রে ছাপিয়েছেন তার মধ্যে বিশিষ্টতম কবিতাগুলি নিয়েই "বনলতা সেন" গ্রথিত হয়েছিল। "মহাপৃথিবী"তে কোনো নতুন সুর লাগে নি' (দ্র° কবিতা, চৈত্র ১৩৫১)। 'মহাপৃথিবী'র এই শেষ দিক থেকে 'সাতটি তারার তিমির'এ ব্যাপমান কবিতা সম্বন্ধে তিনি ব্যক্ত বিরূপতা জানিয়েছিলেন: 'ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত করে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি "পেছিয়ে" পড়েন নি। করুণ দৃশ্য, এবং শোচনীয়। এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চক্ষেও তাঁর কবিতার সম্মুখিন হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ্য বলে আপত্তি নয়: নিঃসুর বলে আপত্তি, নিঃস্বাদ বলে।' বুদ্ধদেব পরে মুগ্ধতা জানিয়েছেন 'লাসকাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটির যার নাম দেওয়া হয়েছিল "আট বছর আগের এক দিন", 'সোনার পিত্তল মূর্তি' অথবা অজর অক্ষর অধ্যাপকের উদ্দেশে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলির, 'স্বপ্নগোচর অতি–বাস্তবের মায়ালোক' রচনাকারী 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'যেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতার, 'আকাশলীনা' ও 'সাতটি তারার তিমির'এ 'যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হয়ে উঠল, এই রকম একটা আভাস' যে সব কবিতায়, তার উল্লেখ করে। তাঁর মৃত্যুর পরে।

সে শোকরচনার সিদ্ধান্ত স্থলে বুদ্ধদেব কবিকে 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রোম্যান্টিক', রোম্যান্টিক হয়েও বিদ্রোহের বদলে সমর্পণের, শান্তির কবি বলে শেষ করেছেন। 'তিনি যে আমাদের "নির্জনতম" কবি এই কথাটার অত্যধিক পুনরুক্তিবশত ধার ক্ষয়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না', বুদ্ধদেব লিখেছেন। এখন মনে হয়, তার মার্চ ১৯৩৪এর একখানি খাতা 'রূপসী বাংলা' নাম দিয়ে মৃত্যুর পরে যে প্রকাশ হল যাতে তাঁর খ্যাতি কবিতামণ্ডল ছাপিয়ে গেল বাহ্জগতে, অনুপ্রাণিত পাঠকমহাদেশে, কবি নিজে কেন তা ছাপলেন না যথাসময়ে—'বনলতা সেনে'র পূর্বাহ্নেই, অথবা পিঠো পিঠি? কেন আকারণ অপযশ, পাঠকের বিরাগ যেচে নিলেন জটিলতর কবিতায় ব্যাপৃত হয়ে? বইয়ের 'রূপসী বাংলা' নাম কবির দেওয়া নয়। ২১ সংখ্যক কবিতা থেকে আহৃত, যেখানে মৃত্যু প্রার্থনা করতে গিয়ে কবি লিখছেন, যখন মরণ 'যেন মরি এই মাঠঘাটের ভিতর—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর জেগে থাকে...'। সমকালীন এক গল্পে শহর বৃত্তি ব্যস্ততা ছেড়ে রূপসী বাংলায় ফেরার কথা আছে (দ্র° 'জীবনানন্দ সমগ্র' ৪ পৃ ১৪৪), এখানেও সে ফিরে আসার ভূমিকা আছে এক জায়গাতে

পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর
কোনখানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট উঠিতেছে জেগে,
কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে
জানি নাকো; আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর...

এর পর অবিরল ষাট পৃষ্ঠা ব্যাপী বাংলার নদী মাঠ ঝোপ কাঁটা গাছ ফুল পোকা পাখি প্রাণী উদ্ভিদের জগৎ— বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল, বাংলার ধানী মাঠ, বাংলার ঘাস, বাংলার নীল বন, বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ, বাংলার নক্ষত্র, বাংলার ভাসানের পালা, মাধুরের গান পাঁচালির নরম নিবিড় ছন্দ, শঙ্খমালা চন্দ্রমালা কাঞ্চনমালা রাজকন্যার রূপকথা, পুরাণের ধনপতি শ্রীমন্ত বেহুলা লহনার কাহিনী, রামপ্রসাদের শ্যামা, জাগ্রত বিশালাক্ষী দেবী, জ্যোৎস্না রাতে রায়বাবানের ঘোড়ার শব্দ, গৌড় বাংলা বল্লালের বাংলার ছিন্নাংশ ইতিহাস, সে সব ইতিহাসের কত পাটরানীদের গায়ে এলো চুল—সেই দূর বাংলা থেকে আজকের দেশবন্ধুর বাংলা অবধি জন্মান্তরের বন্ধন তাঁর বাংলার সঙ্গে— তিনশো বছর, পাঁচ শো বছর, সাত শো বছর কেটে গেছে—'ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কত বার কুড়োলাম খড়/ বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশে ভালোবেসে', কবি লিখছেন, এখানেই থেকে যাবেন তিনি, তাঁর 'চারি দিকে বাঙালির ভিড়', বাঙালি নারীর কাছে মন বিকিয়ে দিয়েছেন তিনি যার চাল

ধোয়া সিক্ত হাত, ধান মাখা চুল, হাতে শাড়ির কস্তা পাড়া, ডাঁশা আম কামরাঙা কুল, লিখছেন:

১ তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব…

২ বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর
৫৪ সংখ্যক কবিতায় ওতপ্রোত বাংলার এই আবেদন
এক দিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার
জেগেছিল; বাঙালি নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিল দেহ এক দিন,
বাংলা পথে পথে হেঁটেছিল গাঙচিল শালিখের মতন স্বাধীন
বাংলার জল দিয়ে ধুয়েছিল ঘাসের মতন স্ফুট দেহখানি তার

ইত্যাদি। নব্য লেখকদের শহর বাস্তব সমাজতন্ত্রের অপর দিকে হল বোহেমিয়ানা, আদিবাসী জীবন ও প্রকৃতি, তার পর আঞ্চলিক গ্রাম, তিতাস পদ্মা ইছামতী এই সব নদীজীবন, আবার পড়ন্ত জমিদারির পর্বে গ্রামীণ মানুষ ও মূল্যবোধের সংকট—জীবনানন্দের এ লেখা কি সেই গ্রামগত নব্য লেখার আরেকটা নমুনা? সর্বগ্রাসী বিলিতিয়ানার বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক সচেতনতার প্রতিক্রিয়ায় কি এই বাঙালি অভিমান? ন্যাশনালিজম্ আন্দোলনের আরেকটা আয়ুধ? তখনকার কাঁথা পট লোকাচার সংগ্রহের নৃতত্ত্বচর্চার পরিপূরক? অথবা idyllic বাংলা স্কুলের ছবির রকমফের শব্দশিল্প? না কি নেগ্রিচ্যুডের মতো একটা বাংলা সংজ্ঞার অভিঘাত তৈরি করার চেষ্টা? নেগ্রিচ্যুডের দুই নেতৃ কবি লেওপোল্দ সঁগর আর আইমে সেজার একজন ঔপনিবেশ কৃষ্টির বিরুদ্ধে পুরা আদর্শে জাতিজাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন, একজন জাতি সংজ্ঞার মিনার গড়ে তোলার বিরোধী। প্রশ্ন হয় জীবনানন্দের রচনাধারায় এর স্থান কোন্‌খানে প্রথমাবধি যিনি বাইরের, দূরের, বিষম বিজাতীয়ের বস্তু তুলে এনে তৈরি করে তুলতে প্রয়াস করেছেন বিশ্বজনীন বাংলা কবিতা? যাঁরা জীবনানন্দের লেখায় অভিনিবেশ করেছেন, যাঁরা পাণ্ডুলিপিতে তাঁর লেখবার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন তাঁর খসড়া প্রাথমিক লেখা অনেক স্থানেই ইংরেজি শব্দ উপমা প্রসঙ্গ দৃষ্টান্তে আকীর্ণ, পরে পরে, বদলে সাবলীল হয়ে উঠেছে বাংলায় (প্রসঙ্গত, তাঁর বহু পরিচিত 'শিঙের মতন বাঁকা চাঁদ'টিও বিলিতি কবিপ্রসিদ্ধি থেকে নেওয়া: শেকসপীয়র-মিলটনের co.ner of the moon' *corner* লাতিন *cornu* বা শিঙ থেকে, শেলির 'The dim and horned moon hung low', এডগার পাউন্ডের 'I hang from the horns of the crescent moon' ইত্যাদি)। পূর্বাপর আন্তর্জাতিক নানা তথ্য সূত্র ধারণ করতে গিয়েও তার ভাষায় জটিলতা এসেছে। আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র জীবনানন্দই যে ক্রিয়া-সর্বনাম-বাক্যগঠনের সাধুভাষালক্ষণ শেষ পর্যন্ত পরিহার করতে পারেন নি। (দেখতে হয় সুধীন্দ্রনাথের তৎসমসঙ্কুল রচনাও চলিতভাষাশ্রয়ী। তার কারণও বোধ হয় তাঁর দুর্মর ইংরেজিপ্রবণতা।

জীবনানন্দের কোনো সুপ্রণীত লেখার নেপথ্য আকর বলে 'রূপসী বাংলা'র পঙ্‌ক্তি ও প্রসঙ্গের সূত্র আমরা আগে একবার উদ্‌ধৃতি করেছি, 'বনলতা সেনে'র আর-একটি প্রসিদ্ধ লেখারও একটু নেপথ্য এ বই থেকে উল্লেখ করি:

শ্মশানপাশের মজা নদী (ধানসিড়ি নদী) এখন আর শ্মশান অবধি বয়ে আসে না—কাঞ্চনমালা, গৌড়ের পাট রানীরা, হাজার মহাল মৃত সব রূপসীদের স্মৃতি ধরে আছে, পাড়ে কিন্তু 'একবার ঘুমালে কে উঠে আসে আর/ যদিও ডুকারি যায় শঙ্খচিল…'।
'অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে/ ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে', সেখানে চন্দন চিতায় চড়ে এক সুন্দরীর শব, যেখানে শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার, রূপকথার রাজকন্যাদের, কাকন বাজত এক দিন…।
'দেখিয়াছি নদীটিরে—মজিতেছে চালু অন্ধকারে': দু ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি ঝরে শাদা ধুলো জলে ভিজে মলিন হয়ে গেল।
'ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর— চিল একা নদীটির পাশে/ জারুলগাছের ডালে বসে বসে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে', তবু যে চলে গেছে সে আর আসে না, 'হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে না কি প্রাণ?'
সেই শ্মশানের দেশে এসেছ তুমি কবি, 'বহু কাল গেয়ে গেছ গান/ সোনালী চিলের মতো উড়ে উড়ে

আকাশেব রৌদ্র আর মেঘে...'।

'পৃথিবীর এই মাঠখানি/ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছু দিন'; আশ্চর্য বিস্ময়ে কবি চেযে আছেন 'আব সে সোনালী চিল ডানা মেলে আজও কি মাঠের কুয়াশায়/ ভেসে আসে?

১৯৩৩এর এক গল্পেও চোখে পড়ে এই দু-এক লাইন

'আর সেই কারলিউ পাখি, ইযেটস্-এর এক-একটা ছোটো কবিতায় যার বিষণ্ন আস্বাদ পাওয়া যায়—বাতাসে হয়তো সেই কারলিউ-এর নিরালা মর্মান্তিক গান ভেসে আসছে—আমাদের বিলদিঘির জলপিপির মতো হয়তো অনেকটা...'

ইযেট্সের জীবনানন্দের দুটি কবিতা তুলে দি পর পব:

He reproves the Curlew

O curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in the west:
Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast:
There is enough evil in the crying of wind.

হা য়, চি ল

হায় চিল, সোনালি ডানাব চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটিব পাশে!
তোমার কান্নার সুবে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীব রাঙা রাজকন্যাদেব মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিযে দূবে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায হৃদয খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘেব দুপুরে
তুমি আব উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

long heavy hairএর, গাঢ় এলো চুলেব পাটবানীদেব বদলে এখানে কেবলই পবিচিতাব রূপকন্যা হযে দূবে যাওযাব, বেদনা হযে ফিরে আসাব কথা, তবু ইযেটসেব শেষ নীতিপ্রতিম ছত্রে কবিতার যে ঘেব পড়ে গেছে সে স্থলে এখানে ৩ ৪ ও ৫ প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ক্রমাগত প্রসাব এবং লক্ষ্যান্তব বচিত হযে উঠেছে বলে মনে হয। 'বেড়াল' কবিতাব পিছনে হযতো 'সিনেমাব দেশেব বেড়ালটি (দ্র' এই বই পৃ ৭০৬-৭০৭): ' গোপন সোনালি চুল তুলে দিযে একবাব দেখে/ অই চাঁদ অই বন...', সেও হযতো ইযেসেব মিনালুশে বেড়ালের 'lifts to he changing moon/ His changing eyes'এর রেশ লুকিযে বেখেছে। সংযোজন 'বনলতা সেনে'র 'দুজন' কবিতাতেও দেখা যায *Crossways* কাব্যের Ephemera কবিতাব ছকটুকু, যেমন 'সাতটি তাবাব তিমিবে'র 'সমারূঢ়' ইযেটসের 'The Scholar' এবং পাউন্ডেব *Cantos*এ যে অধ্যাপকেবা 'sitting on piles of stone books/obscuring the texts with philology'—তাঁদেব মিলিযে লেখা (যদিও 'আধুনিক কান্টোজ-মহাকাব্যেব অর্থ ও ইঙ্গিত বুঝবার ক্ষমতা আমাদের তো দূরেব কথা', জানিযেছেন, জীবনানন্দ) এবং সর্বত্রস্থানেই চোখ পড়ে বাংলা কবিতাটিব স্বাতন্ত্র্য।

সহজ সনেটবন্ধ এবং বিষযোপকবণ মিলে, কখন বলবাব ভঙ্গিতেও, 'রূপসী বাংলা' বইখানি মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র একবকম প্রতিরূপ বলে মনে হয, 'দূরে ও অব্যবধানে লেখা হয়েও একই আন্তরিকতা ও নস্‌টালজিয়া (গ্রীক nosos= স্বদেশে, ঘরে, ফেরা +algos= দুঃখ, যন্ত্রণা) সহকারে লেখা, জীবনানন্দের লেখায এক প্রসঙ্গের, শব্দগুচ্ছের ব্যবহাব কখনও নেশার মতোও কাজ করে। কিন্তু অনেক স্থলেই সে যে আ-কৃত, অর্ধকৃত, বা পুনর্বযনের জন্য রাখা—অন্তত পুনর্লেখা দৃষ্টান্ত কটিতেও তা দেখতে পাওয়া যায। মধুসূদনের যে কাব্য তাঁর কালে যুগান্তর এনেছিল, তিন-চার প্রজন্ম পরে তার সফলতম অনুবৃত্তিও নব্যার্থী কবির সহায়ক হতে পারে কি না বলা কঠিন। হয়তো সে কারণেও কবিশিক্ষা বা অনুশীলন বলে সবিযে বেখেছিলেন কবি খাতাখানি, বহু আমন্ত্রিত হওয়াব

অধ্যায়েও পত্রিকাতেও ছাপেন নি জীবনী অনুধাবন করলে দেখা যায়, চাকুরি পেয়ে স্থিত হবার পর মুহূর্ত থেকে এই দেশ বাংলা ছেড়ে কলকাতায় অন্য কোন কলেজে, কর্মান্তরে চলে যাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন, সাহায্য চেয়েছেন, নিজে চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। জীবনানন্দের পরের লেখায় ইতিহাসক্ষুভিত ভ্রষ্ট মুহূর্তের পাশে গ্রাম, কৃষি গ্রাম একটা অলৌকিক চিরন্তনীর মতো প্রতীকনিবদ্ধ, সেখানে শোচনীয় কালের বিপাকে' বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেও 'সারা দিন ধানেব বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়' ('মহাপৃথিবী'), উনিশশো বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশের তিমির পৃথিবীতে, 'রিরংসা অন্যায় রক্ত', 'কলরব কাড়াকাড়ি অপমৃত্যু ভ্রাতৃবিরোধ', যখন চারি ধারে 'একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে/তবুও আতঙ্কে হিম'— কবি তখনও শুনছেন:

কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

এইভাবে রয়ে গেছে সে গ্রাম। 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতা বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ,তারও পরের, তিমিব পৃথিবীর সমাচ্ছন্ন দুর্বিপাকে ভারাক্রান্ত, আর তার সূত্রপাত 'মহাপৃথিবী'র শেষ দুটি-তিনটি কবিতাতেই। কিন্তু 'মহাপৃথিবী'রও মুখ জীবন বা মৃত্যু সীমা থেকে অনন্তের দিকে।

ফড়িঙের দোয়েলের যে জীবন, নাবী শিশু গৃহ অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার বাইরে যে পৃথিবী, যেন তারই দেখা পাওযার আবেগে আট বছর আগে চাঁদ ডোবা অশ্বত্থের অন্ধকারে একগাছা দড়ি হাতে মরতে গিয়েছিল একটা লোক। শেষ নয়, সে হল পৃথিবীরও পর 'মহাপৃথিবী'র—জীবন বা মৃত্যুর বিন্দুতে বিশ্ব আর চরাচরের দোটানায় বাঁধা, মাটির শেষ তরঙ্গ স্পর্শ করে ছড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ রাত্রিতে। অতীত ঋষিদেব সঙ্গে যজ্ঞাশ্ববাহিত হয়ে সেই আকাশে নক্ষত্রে চলে যাওয়ার একটা সহজ প্রসাব করে দিয়েছেন কবি এখানে। যেমন সিন্ধুপাখিদল এখানে ধানবসে ভেজা অঘ্রান, শঙ্খমালা নারী আর তার প্রেমিককে ফেলে কলরব কবে উড়ে গেছে শাশ্বত সূর্যেব উদ্দেশে। জীবনেব, বা মরণের এই ক্রান্তি বিন্দু—সময়ের একান্ত সৈকতে যূথবদ্ধ একা হয়ে কবি ভাবছেন—'এই দূরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার?' বনলতা সেন'এ ফাল্গুনের অন্ধকাবে ভেসে ওঠা 'সমুদ্রপাবের কাহিনী, অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় বেখা, কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আবো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরেব ক্ষণিক আভাস— আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়,' আব বহস্যময়ীব নগ্ন নির্জন হাতখানি 'মহাপৃথিবী'র শেষ দিকে 'জীব আব নক্ষত্রেব অনাদি বিবরণে' সরল হয়ে উঠেছে যেন। 'বিকেলেব নক্ষত্রেব কাছে'ব দারুচিনি দ্বীপেব রহস্যময়ীর জন্য আকৃতি জ্বলছে আজও— পিবামিড যুগ থেকে লক্ষ যুগের রতিবিহারেব পবেও— মরপৃথিবীর নয, যে মহাপৃথিবীব। কবির প্রশ্ন 'মরি নাকি মোবা মহাপৃথিবীব তবে?' কবি এত দিনে কি বুঝেছেন, সে রূপ পেযেছে আদিম দেবতাদের পরিহাসে? সেই পরিহাসেই কি কবিও পেযেছেন স্বপ্নেব, শিল্পেব আবেগ? আজ তাঁব মনে হয:

লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ
বিদূষক বামনের মতো হেসে একবাব চায শুধু হৃদয জুড়াতে।

'মহাপৃথিবী'র শেষ দিকেব এই আত্মপবিহাস বা আযরনি-লক্ষণটুকু পবের কবিতায কালো শ্লেষের একটা নতুন ভাষাজগৎ সূত্রপাত করে দিয়েছে।

৮

ববিশালের পত্রিকা বিবরণ থেকে দেখা যায ১৯৩০এব পব ক্রমাগত অশ্বযান গোযান মোটর ও সাইকেলের আধিক্যে, অসংখ্য ফিবিওযালা, অসংখ্য ভিখিরিব ভিড়ে উপদ্রুত হয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র শহরটি।'পাঁচ মিনিট অন্তর ফিবিওযালার ডাক চিৎকাব অথবা করুণ বিজ্ঞাপন ধ্বনি' শোনা যায, বর্ষাকালে ভিখিরির সংখ্যা বেড়ে ওঠে, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরেব বিল অঞ্চল থেকে 'দলে দলে ভিখারি শহরে নানা স্থানে বাসা' করে ভিক্ষেয় বেবোয। একসময দেখা যায 'মোটর লরি বাস ঘোড়ার গাড়ি বাইসিকেলের সংখ্যা করা অসম্ভব', নিযমিত বাস সার্ভিস চালু হয়েছে বরিশাল থেকে উত্তরে ভুরঘাটা, পশ্চিমে মাধবপাশা, দক্ষিণে ঝালকাটি, 'রাস্তার ধূলি মানুষকে অতিষ্ঠ করিযা তুলিযাছে, বিশেষভাবে পশ্চিম বগুড়া রোডে মোটর এবং মোটরবাসের দ্রুত গমনে লোকসকল বড়োই ক্লেশ পাইতেছে।' এবই ভেতর 'দেশের নানা সমস্যা, সঙ্কট ও দারুণ অর্থদৈন্যের দিনেও বরিশালে দুইটি বায়োস্কোপ

কোম্পানির কর্ম মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতেছে' বলে লক্ষ্য করা যায়। লোকের মধ্যে 'অভিনয়বাহুল্য'ও বিশেষ প্রকট হয়েছে, দেখা যায় ' বালক যুবক এবং বালিকা ও বয়স্থা কন্যাগণও অভিনয়ের ভিতর খুবই মাতিয়া উঠিয়াছে।' প্রতিরোধে মহিলা সভাব মহিলারা থিয়েটার এবং বায়োস্কোপ দেখব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, বি. এম. স্কুলের ছাত্ররাও ছাত্রজীবনে থিয়েটার না দেখার শ্লোগান তুলে শোভাযাত্রা করেন। ব্রহ্মবাদী থেকে দুটি 'স্থানীয় প্রসঙ্গ ও সংবাদ' উল্লেখ করি :

'অনেক দিন হইতে টাউন হলে সিনেমা প্রদর্শিত হইতেছিল, অনেক প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি সিনেমা কোম্পানি টাউন হল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইযাছেন। সর্বপ্রকারেই এই কার্য সন্তোষজনক হইয়াছে।' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭।

'সংপ্রতি এক দল লোকের চেষ্টায় বরিশালে কলিকাতা হইতে মিনার্ভা এবং মনোমোহন থিয়েটার পার্টি উপস্থিত হইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলে বরিশালস্থ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এই থিযেটারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত কবিয়া নৈতিক শক্তির আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।... কযেক দিন পরে বাধ্য হইযা একে একে দুইটি থিযেটাবই ববিশাল ছাড়িযা যাইতে বাধ্য হইযাছে।' ফাল্গুন ১৩৩৭।

জীবনানন্দের ১৯৩৩এর গল্পে মফস্বল শহরের এই সিনেমা থিযেটাব নিযে অশান্তিব কথা এসেছে:

'এখানে কিছু দিন আগে একটা থিয়েটার এসেছিল জানেন?

হ্যাঁ, কলকাতা থেকে। শুনেছি কয়েকজন আর্টিস্ট এসেছিলেন— যোগেশদা আব আবো দশজন মাস্টার দিন রাত সত্যাগ্রহ করে সেই থিযেটাবের সিটেব সামনে শুযে থাকতেন...

কাজেই সেই কলকাতাব দলটাকে ফিরে যেতে হল...'।

থিযেটার সিনেমা দেখার চেষ্টা ক'রে, বা দেখে মাস্টাব ও ছাত্রদের কর্তৃপক্ষের কাছে দণ্ডিত হওয়াব আশঙ্কাও আছে বইযে, এবং তার উপরে লেখকেব কটাক্ষ। কিন্তু বেগবান নব্যতায় তাঁব সায় নেই: 'ঘাস যে বুটের নীচে ঘাস শুধু মোটর যে সব সব চেযে বড়ো এই মানবজীবনে'— এমন উন্নতি প্রগতির দুঃখই তাঁর বড়ো। 'কলকাতা এক দিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'। হোক। 'তবুও তোমাব কাছে আমাব হৃদয'। 'তুমি' সেই 'সুচেতনা', তাব পাশে কল্লোলিত রূপৈশ্বর্যযৌবনের পুরাণী তিলোত্তমা মৃত্যুবীজ মাত্র। অল্পবযস থেকে আগে তুলে দেখিয়েছি গ্রামপথের বিস্ময বাইসকেলটিও কত বাহুল্য তাঁর জীবনে। পবে দেখি মোটবকাবও তাঁব কাছে খটকাব মতো অন্ধকার জিনিস একটা, তাব কাবণ তাড়াতাড়ি কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই তাঁব: 'আমাব জীবন যা চায সেখানে হেঁটে হেঁটে পৌছুবার সময আছে' (দ্র' এই বই পৃ ৬৪৫–৬৪৬)।

১৯৩০ এপ্রিলে বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতি হয়ে বামানন্দ চট্টোপাধ্যায এসেছিলেন ববিশালে। ১৯৩১এ ছাত্র সমাজেব ববীন্দ্রনাথেব সপ্ততি জন্মদিন পালন সভায সত্যানন্দ মনোমোহন চক্রবর্তী ভাষণ দেন, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওযার সুবাদে গৈলার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সংবর্ধিত হন ধর্মবক্ষিণী সভাগৃহে, মাঘোৎসবের পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স সাহেবেব হত্যাব প্রতিবাদ ও শোক সভা হয সদর বালিকা বিদ্যালয়ে, প্রধানা শিক্ষাযিত্রী স্নেহলতা দাসেব সভানেতৃত্বে। ১৯৩৩এ কামিনী রায স্মবণসভায কুসুমকুমাবী পড়েন কবিপরিচাযিকা (১৮ই কার্তিক ১৩৪০)। এ বছবেই শহরেব অনেকগুলি বাস্তা সিমেন্ট বাঁধাই হয, অনেক বাস্তায ইলেকট্রিক আলো বসে শারদীয পুজোব পরে। জুনে বি. এম. স্কুলের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি জুবিলি উৎসবে প্রফুল্লচন্দ্র রায সভাপতি হযে আসেন। সুকুমাব দত্ত ছিলেন উৎসবেব অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৩৫এ 'পাঁচ বৎসরের শিশুকন্যাব মা' হয়ে লাবণ্য বি. এ. পাশ করেন। ১২ই শ্রাবণ মহাকবি কালিদাস জযন্তী উদ্‌যাপন করেন বরিশাল সাহিত্য পরিষৎ শাখা, সেখানে হিরণ্ময বন্দ্যোপাধ্যায প্রবন্ধ এবং বি.এম. কলেজেব অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। ১৪ই মাঘ মঙ্গলবার স্থানীয 'ব্রহ্ম মন্দিরে সরকারি নির্দেশমতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হয,' আচার্যের কার্য করেন মনোমোহন চক্রবর্তী। ১৯৩৬এ ১লা নভেম্বর 'স্বাস্থ্যলাভার্থে স্টিমাব ভ্রমণের পথে এলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ২৯শে নভেম্বব পুত্র জন্ম হল জীবনানন্দের। ১৯৩৭এ গ্রীষ্মেব ছুটিতে জীবনানন্দ কলকাতায, মে মাসের শেষে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তিনি ব্রাইট স্ট্রিটে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে কযেক মাস আগে প্রকাশিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বই উপহার দেন, হয়তো তখনই বইযের একটি আলোচনাও প্রার্থনা করেছিলেন। জুন ও জুলাইয়ে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা দুটি

চিঠিতে আলোচনার কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ২রা জুলাইয়ের চিঠিতে রিপন কলেজে চাকুরির জন্য কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ভবশঙ্কর ব্যানার্জিকে অনুরোধ করার কথাও আছে, রিপন কলেজের অধ্যাপনায় বুদ্ধদেব বসুর নিয়োগে তাঁর হাত ছিল। ১৯৩৮এ ৪ঠা মাঘ সাযংকালে টাউন হলে স্থানীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখা 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যযের লোকান্তর গমনে মহতী শোক সভার অধিবেশন' করেন (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যযের মৃত্যু ১৬ই জানুযারি ১৯৩৮), সেখানে 'অধ্যাপক জীবনানন্দ দাস শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় সাহিত্যরসের ব্যাখ্যা করিয়া একটি উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধ পাঠ করেন।' ১৯৩৮এ ৩০শে ফাল্গুন সোমবার স্নেহলতা দাসের নব প্রতিষ্ঠিত 'বালিকা বিদ্যালযের নূতন গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন' করতে আসেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাবেট সাহেব ও তাঁব পত্নী। এ বছরেই অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের মৃত্যু (২২শে জুন ১৯৩৮), বি. এম. কলেজেব নতুন অধ্যক্ষ হযে শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের যোগদান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শৈলেন্দ্রনাথের পত্র ব্যবহার ছিল।

ফেব্রুযারি ১৯৩৮এ হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ভারত যুদ্ধে অংশ নেবে না এবং ব্রিটিশ স্বার্থে ভাবতের জনবল ও সম্পদ কাজে লাগাতে দেবে না এই মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হয। পর বছর ১৯৩৯এর ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র পুনরায সভাপতি নির্বাচিত হন কিন্তু গান্ধি ও গান্ধিপন্থীদের বিরোধিতায অচিরে পদত্যাগ করতে হয তাঁকে। কংগ্রেসের পবিবর্তনকামী প্রগতিশীল একটা অংশ নিযে তিনি ফবওয়ার্ড ব্লক গঠন কবেন মে মাসে। ১৯৩৬এব শেষ দিকে ফৈজপুর অধিবেশনের প্রাক্কালে প্রবাস প্রত্যাগত মানবেন্দ্রনাথ রাযও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হযেছিলেন, ত্রিপুরীতে বিপ্লবপন্থী কংগ্রেসীদের পরাজযে তিনিও বিকল্প সংগঠন করলেন লীগ অফ র‍্যাডিকাল কংগ্রেসমেন্ নাম দিয়ে, জুনের শেষে পুণেতে তার উদ্‌বোধনী অধিবেশন হয। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণে ছ বছব ব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হযে গেল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে পরস্পর সাহায্য চুক্তি বশে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানির বিরুদ্ধে। ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা কবলে ভারতও জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে। ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটির বৈঠকে ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সমালোচনা করে স্বাধীনতার দাবি জানানো হল সরাসরি, কমিটির নির্দেশে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাসমূহ থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। মার্চ ১৯৪০এ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের পৃথক্ রাষ্ট্রভূমি প্রস্তাব অনুমোদিত হল, ভারতের মধ্যে এই স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ডের দাবি ধূমাযিত হয়ে ছিল অন্তত দশ বছর ধরে। ৮ই অগস্টের ভারতের যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদে যুক্ত হওযার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস কর্মসূচী নিল ছোটো ছোটো সত্যাগ্রহের, সরকারও নতুন করে পাশ করলেন বিপ্লব দমন অর্ডিন্যান্স। সুভাষচন্দ্র গ্রেফতার হযেছিলেন জুলাইযের শুরুতেই, অসুস্থতার কারণে তাঁকে নিজ গৃহে অন্তরীণ রাখা হয। ১৭ই জানুয়ারি ১৯৪১এ মধ্যরাতে ছদ্মবেশে গৃহ ত্যাগ করে কাবুল থেকে ইতালির পাসপোর্টে তিনি মস্কো হযে বার্লিনে পৌছোন মার্চের শেষে। সেখানে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রোপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয। নাৎসি সরকারের সহযোগিতায ইযোরোপবাসী ভারতীযদের নিয়ে ফ্রি ইন্ডিযা সেন্টার, তারপর যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে *Wehrmacht* প্রশিক্ষণে তিনি ইণ্ডিয়ান লিজিযন গঠন করেন। ১৯৪১এর শেষ দিকে সুভাষ বোস শত্রুপক্ষে অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগ দিযেছেন এবং কমিউনিজমের বদলে ফ্যাসিপন্থার পক্ষপাতী হযেছেন বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেরোয়।

ইযোরোপে জার্মানি, এশিয়ায জাপান তখন বিশ্ব প্রভুত্বের প্রবল চেষ্টায লিপ্ত হযেছে। ১৯৩৯ অগস্টে সোভিয়েত-জার্মানি এবং ১৯৪০ সেপ্টেম্বরে জাপান-জার্মানি সামরিক চুক্তি হযেছে। উনিশ শতকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দীপ্তি ব্যাপ্তি ম্লান করে জাতীয বাস ভূমি *(Lebensraum)* বিস্তারী বিপুল জার্মান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন রূপাযণ শুরু করেছেন হিটলার, জাপান ইংরেজ-ফরাসি-ওলন্দাজের উপনিবেশশাসনমুক্ত পূর্ব এশিয়ার নতুন বিন্যাস করে বৃহত্তর পূর্ব এশিযা কো-প্রস্পেরিটি স্ফিয়ার গড়ে তুলতে সক্রিয। হিটলারের ব্লিৎস্‌ক্রিগ অভিযানমুখে ডেনামার্ক নরওযে বেলজিযাম হল্যাণ্ডের পর পতন হল ফরাসি দেশের (২২শে জুন ১৯৪০), প্রত্যক্ষ সম্মুখে তখন সে ব্রিটেনের, ঠিক এক বছরের মাথায (২২শে জুন ১৯৪১) জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করল এবং মস্কোর উপকণ্ঠে গিযে পৌছল অনতিদিনে। এমনি মুহূর্তে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে ইযোরোপীয যুদ্ধে এসে ঢুকল আমেরিকা, ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিযেতের গ্র্যাণ্ড অ্যালাযেন্স বিরুদ্ধ হযে দাঁড়াল জার্মানির। এই নতুন পরিস্থিতিতে এ দেশের দেশীয রাজনীতিতেও যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নীতির বদল শুরু হযেছে দেখা যায নানা দলে।

এদিকে জাপানের জয়যাত্রা মাঞ্চুরিয়া থেকে চীন হযে ইন্দোচীনে এসে পৌছেছে তত দিনে।

মার্কিন বন্ধু চিয়াং কাইশেকের (জিয়াং জিয়েশি) জাতীয়তাবাদী গুয়োমিন্দণ্ড সরকার অপসরণ করে আছে চুঙ্‌কিঙের পার্বত্য অঞ্চলে, মাও জেদঙের চীন সোভিয়েত রিপাব্লিক শক্তি বৃদ্ধি করছে ইয়েনানে। হঙকঙ কুয়ালালুমপুরের পর ব্রিটেনের দুর্ভেদ্য নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুর দখল করে নিল জাপান, পার্ল হারবার অধিকার করে পশ্চিম প্যাসিফিকে মার্কিন নৌশক্তির অবশেষ নিশ্চিহ্ন করে দিল। বিয়াল্লিশের মাঝামাঝি গিয়েই পশ্চিমের প্রধান উপনিবেশগুলি— ফিলিপিন-মালয়-ডাচ ঈস্ট ইন্ডিজের অধিকাংশ— বর্মা— খাদ্য যুদ্ধোপকরণ পেট্রোলিয়ম সমৃদ্ধ শত কোটি জন অধ্যুষিত এলাকা— জাপানের অধিকারভুক্ত হয়ে গেল, ভারত অস্ট্রেলিয়া আলাস্কার দিকে তখন তার মুখ। ইয়োরোপীয় অর্থনীতি ব্যবস্থার বিকল্প পূর্ব এশীয় অর্থনীতি ব্লকের আশা নিরঙ্কুশ হয়ে এল। জাপান সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে জার্মানি ছেড়ে পূর্ব এশিয়া থেকে যুদ্ধাভিযান শুরু করার উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র তোকিয়ো হয়ে সিঙ্গাপুরে আসেন ২রা জুলাই ১৯৪৩এ। ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে তাঁর অধিনায়কত্বে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্‌ সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৪এর গোড়া থেকেই বর্মার পথে ভারত অভিযান শুরু করে আজাদ হিন্দ্‌ সেনা। কিন্তু জাপান ও জার্মানির ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে তার আগেই।

১৯৪২ ফেব্রুয়ারিতে চিয়াং কাইশেক সস্ত্রীক এসেছিলেন ভারতে, শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলেন তাঁরা, ফিরে গিয়ে ভারতের রাজনীতি পরিস্থিতির যে তথ্য জানান রুজভেল্টকে তাতে জাপানি আতঙ্কের কথা ছিল প্রধান, মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্বন্ধে চার্চিল যুদ্ধ চলাকালীন স্থিতাবস্থা এবং তারপর শর্ত সাপেক্ষ পূর্ণ ডোমিনিয়ন মর্যাদার প্রস্তাব দিয়ে ক্রিপ্‌স্ মিশন পাঠান ভারতে। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ দিল্লী এসে পৌছলেন ২৩শে মার্চ। এর আগেই দুজনে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের অদূর সাগরে বসে উপনিবেশ বিরোধিতা সূচক যুদ্ধান্ত শান্তি পরিকল্পনার আটলান্টিক চার্টার (রচনা ১১.৮.৪১ লণ্ডনে মিত্র শক্তি অধিবেশনে অনুমোদন ৪.৯.৪১) তৈরি করেছিলেন যুগ্ম হয়ে, সে সময়ে ভারতের স্বাধীনতার কথাও উঠেছিল। কিন্তু ক্রিপ্‌সের দৌত্য সফল হল না। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধি লিখলেন ভারত যুদ্ধে সমুচিত অংশ নিতে পারছে না বলে লজ্জিত হতে হয়, 'বিদেশি জোয়াল' তুলে নিলে তবেই সে বিহিত প্রয়োজনযোগ্য ভূমিকা নিতে পারবে। গান্ধি জাপানি অনুপ্রবেশ সূত্রে জাপানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতেও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটি বৈঠকে 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব নেওয়া হল বিয়াল্লিশের ৮ই অগস্ট রাত্রে, নেতারা গ্রেফতার হলেন বাতারাতি, কিন্তু আন্দোলন বহ্নিমান হয়ে উঠল সারা দেশে। সংগ্রাম ও দমনের এতখানি ব্যাপকতা তীব্রতার নজিব এদেশে আর নেই।

সাইরেন এ. আর. পি. ব্ল্যাক আউট, মিত্র শক্তি মিত্র সেনার চলাফেরায় কলকাতা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল একচল্লিশের গোড়া থেকেই, জাপানি বিমান হানা দিল বিয়াল্লিশ ডিসেম্ববেব শেষে। আব-এক প্রবল উপদ্রব তখন অগণিত ভিখিরির স্রোত— পাগল, সংক্রামক রোগবাহী, ক্রমাগত অব্যাহত শহর ছড়ানো ভিখিরি। পিঠোপিঠি হয়ে এল বাংলাব পঞ্চাশেব দুর্ভিক্ষ-নথিভুক্ত হিসেবেই তাতে পনেবো লক্ষ মৃতের সংখ্যা, সেও নজিরহীন, ছিয়াত্তরেব বিশ্রুত মন্বন্তরও তার তুলনা নয় কেন না সে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফল নয়, স্টেটস্‌ম্যান কাগজ লিখেছেন, 'This sickening catastrophe is man-made'. বুভুক্ষায় গ্রস্ত মৃতদের ছবি ছেপে তাঁরা লিখেছেন, 'They are terrible photographs. We publish them with reluctance and after anxious thought, believing that to do so is unavoidably our duty'. অভাবেব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়তে লাগল খাদ্য বস্ত্র জ্বালানির অভূত কালোবাজারি। ফজলুল হক নিজামউদ্দিন সুরাওয়র্দির মন্ত্রীসভা কালে বাংলাদেশেব সামাজিক দুর্গতি উঠল চরমে, তার চূড়ান্ত স্ফূর্তি বোধ করি ছেচল্লিশ ১৬ই অগস্টের 'ডিরেক্ট অ্যাকশনে'র কালে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন থেকে মুসলমানদের তফাত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন জিন্না, তাঁর মতে সে হল বেয়নেটের মুখে কংগ্রেসের হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তেতাল্লিশের শেষে তিনি সারা ভারত মুসলিমদের পাকিস্তান দাবির সংগ্রামে জোটবদ্ধ ক'রে কমিটি অফ অ্যাক্‌শন গঠন করেন। ছেচল্লিশের উপকণ্ঠে পাকিস্তান প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে। 'ডিরেক্ট অ্যাক্‌শনে'র কালে তদানীন্তন কলকাতা মেয়রের লেখা মুসলিম লীগ প্যামফ্লেট উদ্‌ধৃত করেছেন শীলা সেন যেখানে পুণ্য রমজান মাসে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভের ডাক দিয়ে প্রতিপক্ষকে সাবধান করে লেখা হয়েছে: '*Oh Kafir!* your doom is not far and the general massacre will come'. (*Muslim Politics in Bengal* 1937-1947 ১৯৭৬ পৃ ২১৩)। ১৬ই অগস্টের এক দিনে সরকারি

হিসেবেই নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ সহস্র। 'জলপাইহাটি', 'বাসমতীর উপ্যাখ্যান' নাম দেওয়া সম্প্রতি প্রকাশিত দুখানি উপন্যাসে লীগ মন্ত্রীসভার এই সব দিনের, ক্ষমতা হস্তান্তর পূর্বাহ্নের কলকাতা বরিশালের খণ্ড ছিন্ন কোনো কোনো ভাবনা ও ছবি জীবনানন্দ রক্ষা করেছেন।

হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের পর ঈঙ্গ-মার্কিন মিত্র শক্তি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, পার্ল হারবার পতনের পর দিনই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ফের জাপানের বিরুদ্ধে। এর পর এশিয়া ইয়োরোপের দুই বিচ্ছিন্ন লড়াই প্রকৃতই হয়ে উঠল ভূমণ্ডলব্যাপী বিশ্বযুদ্ধ, আর সে যেন অশুভের বিরুদ্ধে মানবতার সংগ্রাম (জাপান বর্বরতার, হিটলার দানবিকতার প্রতীক হয়ে উঠলেন লোকচিত্তে, প্রসঙ্গত পার্ল বাকের 'দি গুড আর্থ' উপন্যাস/ফিল্‌মের ধর্মিষ্ঠ চীনা চাষি, চ্যাপলিনের 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' ছবির প্রহাসিকা এই সব প্রসিদ্ধ আবেদন ছাড়াও কলকাতা গ্লোব সিনেমায় ১৯৪০এ প্রায় যুদ্ধের প্রচার চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'অল্ কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' ছবির উল্লেখ করতে হয় যার বিজ্ঞাপনে ছাপা হত হিটলারের দানবোপম কার্টুন। পরিণামে কেবল জার্মানি নয়, ইয়োরোপ দু ভাগ হয়ে গেল। প্রথম যুদ্ধান্তে লেখা স্পেঙ্গলারের 'পশ্চিমের অবসানে'র *(Der Untergang des Abendlandes)* আধ্যাত্মিক নৈরাশ্য মাত্র নয়, প্রকৃতই বিশ্ব শক্তির কেন্দ্র মূল ইয়োরোপ ছেড়ে ভাগাভাগি হয়ে গেল রুশ-মার্কিন দুই অতিশক্তির (superpower) অধিকারে। হিটলার আত্মহত্যা করলেন। জার্মান সেনা একবার রাইম্‌সে মার্কিন শিবিরে একবার বার্লিনে রুশ সেনা দফতরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল। ৮ই মে ১৯৪৫ ইয়োরোপে বিজয়দিবস বা ভি. ই. ডে পালিত হল। তিন মাসের ব্যবধানে ৬ ও ৯ই অগস্ট হিরোশিমা নাগাসাকি ধ্বংস হল আণব বোমায়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। লীগ অফ নেশন্‌সেব আয়ু অতিক্রান্ত হয়েছিল। যুদ্ধান্ত বিশ্বের শুভৈষায় এবারে নতুন সূচনা হল ইউনাইটেড নেশন্‌সের— নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের নব যুগে অস্ত্র শাসন ছাড়াও তার করণীয় হল বৃহৎ মানবপরিবারে সকলেব মর্যাদা সমানাধিকার ও উন্নতিব সজাগ সাহায্যের ব্যবস্থা করা। ১৯৪৬এর শেষে ইউ.এন.এ. ব স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হল নিউইয়র্ক শহরে।

এপ্রিল ১৯৩৬ থেকে মে ১৯৪৫ পর্যন্ত লেখা নিয়ে 'সাতটি তারার তিমিরে'র রচনাকাল, কিন্তু তার কেন্দ্রীয় প্রসরটুকু, প'ড়ে মনে হয় দ্বিতীয় যুদ্ধেব পরিস্থিতি অনুসরণ করে, এদেশে তার সংক্রাম লক্ষ্য করে লেখা। বাণিজ্যবায়ূর গল্পে শতাব্দীশেষে এক দিন যুদ্ধ আর বাণিজ্যেব বক্তে মেতে ওঠা দেশ আর বিদেশেব পুরুষদের যে সংঘর্ষ অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল পূর্ব/ দক্ষিণ-পূর্ব এশিযায সেই পূর্বসূত্র থেকে শুরু। তাবপর নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কন্‌ভয, আর রাত্রি ভরা নক্ষত্রের অনন্ত স্প্লিন্টারেব আকাশপাতাল ব্যাপী অমানুষী যুদ্ধেব পবিমাপ করতে বসেছেন কবি, তার ভেতর দেখেছেন 'চারি দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন', 'ভিন্ন ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূ'দের। উদীচির দিকে ভেসে গিযে হনলুলু সাগরেব জল ম্যানিলা-হাওযাই-তাহিতি-বোর্নিযো-বোর্নিয়ো সাগরের শেষে ম্লান আলাস্কার তটবেখা অবধি ছড়িযে চলেছে এশীয যুদ্ধের সংক্রাম, দেখেছেন 'কামানের স্থবিব গর্জনে/বিনষ্ট হতেছে সাংহাই'—প্রাক্ যুদ্ধ পর্ব থেকেই দেখেছেন, তার দিগন্তে 'নবকের নির্বচন মেঘ'। কিন্তু জাপানের হুংকৃত উৎকটদর্শন যোদ্ধৃদলের বুদ্ধদেবতার কাছে হিংসার সিদ্ধিবর চাইতে যেভাবে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'কবিতায় সেই উত্তেজনা (চীনের সাহায্যকল্পেও পাঁচশো টাকা দিতে স্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: 'আরো দিতুম যদি আরো সামর্থ্য থাকত।') কিংবা ফুলঝুরি ঝরা জাপ পুষ্পকে হ্যাংকাও জ্বলে ওঠাব পর জাপানের বিরুদ্ধে ন্যাশন্যালিস্ট-কমিউনিস্টের ফ্রন্টকে অভিবাদন কবে যেভাবে অনুজ কবি লিখেছেন 'লাল নিশানের নীচে উল্লাসী মুক্তির ডাক', সেই আবেগের লেখা নেই তাঁর কবিতায (প্রসঙ্গত, ফ্রন্টের শর্ত অনুসারে কমিউনিস্ট পক্ষের লাল সরকার এবং লাল সেনা 'লাল' আখ্যা ত্যাগ কবে তখন গণতন্ত্রী সরকাব এবং জাতীয বিপ্লবী বাহিনী রূপে পরিচয গ্রহণ করেছিল, জাপানকে তত দূর প্রতিহত কবতেও সক্ষম হয নি: 'মাওৎ সেতুং প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট নেতা দেশরক্ষার কাজে আত্মনিযোগ করেছেন, সাম্যবাদ প্রচার আপাতত বন্ধ আছে...' দ্র. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'চীনের প্রতিরোধ', পরিচয়, মাঘ ১৩৪৪)। রামনাথ বিশ্বাস চীনে গিয়েছিলেন ১৯৩১-৩২ সালে। সেখানে তিনি শিক্ষা ও প্রগতির বিস্তার, সর্ব দেশি অধ্যুষিত বড়ো শহরগুলিতে কমিউনিস্ট ভীতি, হ্যাংকাওয়ে মানবেন্দ্রনাথ ও বোরোদিনকে নিয়ে লোকশ্রুতি, 'নির্দোষ চীনের ইয়াংসি নদের বুকে দুষ্ট ব্রণের মতো জাপানি যুদ্ধজাহাজ', জাপানিদের বিরুদ্ধে চীনাদের ব্যাপক ঘৃণা, চিয়াং কাইশেকেব

কমিউনিস্ট নিধন ও তাঁর সম্বন্ধে সর্বজনীন বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ দেখে এসেছিলেন। ১৯৪১এ বই প্রকাশের কালে পাদটীকা করে তিনি লেখেন, 'সে সময়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে ওরূপ করতে হয়েছে। সবাই জানেন আজ জাপানিদের অভিভাবকত্ব বর্জন করে জেনারেল চিয়াং কাইশেক জা তী য় তা বা দী ক মি উ নি স্ট গ ণে র সহযোগে জাপানের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত।' ১৯৩৬এর জুলাইয়ে মাওয়ের সঙ্গে উত্তর শেন্‌সিতে গিয়ে দেখা করে এডগার স্নো 'রেড স্টার ওভার চায়না' লেখেন। প্রকাশ মাত্রে ১৯৩৭ এই এখানে পাঠকের হাতে সে বই পৌঁছেছিল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন (বৈশাখ ১৯৪৬এ 'নতুন পত্র' ১ম সংখ্যায় সমালোচিত)। ১৯৩৯এ 'অগ্রণী' পত্রিকায় মাও জেদঙ, রেড আর্মির সেনাধ্যক্ষ ঝু দে-র লেখা বাংলা অনুবাদে সবিশদে উদ্‌ধৃত হয়েছে। জীবনানন্দও নিপ্পনের ভীষণ লিপির পাশে দেখতে পেয়েছেন 'সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়', কিন্তু কামানের ক্রোড়ে চূর্ণ হয়েও 'কারু কারু মণিবন্ধে ঘড়ি/ সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে ধীরে ঘুরাতেছে' এইটুকু মাত্র তাঁর বলবার। সুন্‌ ইয়াৎসেনের 'জনগণের তিন নীতি' বা মাও জেদঙের *Rectification Campaign* সময়ের এই কাঁটা ঘোরানোর নীচে আছে, বলা যায় না, যদিও 'নবতম শতাব্দীর চীন'ও তাঁর দৃষ্টির অন্তর্গত। বরং সূর্যসাগরতীরের মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাস জানতে গিয়ে বঙ্গোপসাগর, চীন সাগর, দ্বীপপুঞ্জের সাগরে, সঞ্চরমান তাদের সূর্য লাঞ্ছন নিশান উড়তে দেখে তাঁর মনে হয়েছে সে সূর্য তাদের নিজের মৎসর দিয়ে লেখা, নিতান্তই প্যারডি সে নীলিমার সূর্যের, তার কারণ হয়তো 'অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিল তারা'। জাপানি কো-প্রস্পেরিটি নীতিও আটলান্টিক চার্টারের মতোই স্বার্থসর্বস্ব বলে তিনি বুঝেছেন, যেমন 'আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি', তেমনিই সংশয় হয়: 'এশিয়া কি এশিয়াবাসীর/ কো-প্রস্পোরিটির/সূর্যদেবীব নিজ প্রতীতির তরে?' যুদ্ধারম্ভ পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চৈত্রের ছড়ানো নেশার ভেতরে ঘা দিয়ে উঠেছিল সহসা অপঘাত: 'ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে'। প্রান্ত বছরে, যুদ্ধের মধ্য পর্বে যে 'সভ্যতার সংকট' তিনি লক্ষ্য করে গেছেন তাব একটি ইয়োবোপের নখদন্তবিকাশী বর্বরতা থেকে, আরেকটি ভাবতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস এবং তুলনারহিত হিন্দু-মুসলমানেব আত্মবিচ্ছেদ থেকে উপজাত; তিনি আশা করে গিয়েছিলেন ভারত ও জাপান এই দুই দেশের উপব, 'জাপানেব সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তাব সভ্য শাসনের রূপ', আর 'ভারতও জাপানের চেয়ে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে ন্যূন নয়, কেবল ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত হয়ে আছে, তাঁব আশা পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে ফের নির্মল নব যুগ আত্মপ্রকাশ করবে। বিষ্ণু দে 'নবীন সভ্যতা, অজেয় প্রাণের অগ্নি'ব অভ্যুদয় দেখতে পেয়েছেন সাম্যবাদী সোভিয়েত ভূমিতে, হিটলার সোভিযেত আক্রমণ কবলে ২২শে জুন ১৯৪১' নামে দুটি সনেটে তিনি স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন ইতিহাস, 'দূর হিন্দুস্তানে'রও সংযোগ করে দিয়েছেন সেই নতুন উদয়ের সঙ্গে। যুদ্ধের মাঝখানে, যুদ্ধ শেষে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিশদ বিশ্বরাজনীতি পাঠ, 'সংবর্তে'র নাম কবিতা, '১৯৪৫', 'প্রত্যাবর্তন': গ্যোটে হ্যোল্ডার্লিন রিল্কে টমাস মানের, বাখেব পৃথিবীতে 'স্বস্তিক লাঞ্ছন/ বালখিল্য নাৎসীদের সমস্বর নামসংকীর্তন', 'স্ট্রেসেমান-ব্রিয়াঁর সংবাদ', 'রুশের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,/ হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,/ মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,/ কবন্ধ ফরাসি দেশ'—১৯৪০এ, 'স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর,/জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে' কিংবা 'কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,/মেদিনী মুখব একনায়কেব স্তবে'—১৯৪৫এ। অগ্রন্থি, রচনাব ভেতরে এমনি তথ্য আছে জীবনানন্দেও ('জার্মানির রাত্রিপথে' কবিতা, টমাস মানের উপন্যাস আলোচনা)। এতখানি নিরূপিত রাজনীতি পাঠ হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু 'সাতটি তারার তিমির'এ লেখা যুদ্ধের উত্তর পর্বের এই বিশ্বরূপ

> পশ্চিমে প্রেতের মতন ইয়োরোপ;
> পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
> আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
> ইয়াঙ্কির লেনদেন ডলারে প্রত্যয়—

কলকাতার যুদ্ধকালীন চিত্রও আছে এ কাব্যে, এইরকম: 'চারি দিকে সরবরাহের সুর সারা দিনমান', মাঝরাতে অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে ছুটে যায় একটা একটা গাড়ি, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ফিরিঙ্গি যুবকদের ছিমছাম চলাফেরার পাশে ভিখিরি দলের মৌরুসি, শ্বাস নিতে হয় 'চীনেবাদামের মতো। বিশুষ্ক বাতাসে',

তারপর পঞ্চাশ সাল স্পর্শ করতে দেখা গেল
আরো বেশি কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে--
ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।

খণ্ডিত ইতিহাসের মলিন, কখনও তীব্র বিবরণে আচ্ছন্ন 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতাবলয়, মুহূর্তে মুহূর্তে টলে যায় শুভ আশা তবু এই 'নক্ষত্রের জ্যোৎস্না'র মতো একটা স্থিরতর পশ্চাৎভূমিরও নিশানা আছে দেখা যায়। যেন স্থির শুভ্র নৈসর্গিক কথা বলার অবসর আছে এখনও, প্রাগৈতিহাসিক কৃষক তার বলদ তার লাঙলের ছায়া প'ড়ে আছে কোথাও, কামানের উর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল অন্য সমুদ্রের দিকে উড়ে যায়, সময়ের প্রাশান্তির ফুঁয়ে নিবে যায় সময়ের আস্ফোট, নিরন্ত প্রকৃতির ভেতরে উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখির পুনরুদয়ের ভোরের স্বপ্ন জেগে ওঠে— এর পর, চোখে পড়ে, পৌনঃপুনিকভাবে সময়মুহূর্তের আত্মনাশা তথ্যপুঞ্জ আর শান্তিকল্যাণের অন্তিক কবিপ্রত্যৈষার ছাঁচে যেন বাঁধা হয়ে গেছে জীবনানন্দের কবিতা। তার যুদ্ধ–যুদ্ধান্ত পর্বের কয়েকটি লেখা তিনি নিজে নির্বাচন করে গিয়েছিলেন পরের বইয়ের জন্য ('সাতটি তারার তিমির' আর 'বেলা অবেলা কালবেলা'র অনেক লেখা পিঠোপিঠি লেখাও বটে, দ্র 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী' পৃ ৭৪৩–৭৬১) কিন্তু তার বাইরে অগণিত অগ্রন্থিত অমুদ্রিত লেখা এই উপর্যুপরি নকশার পুনরাবৃত্তিতে অনেকসময় ভার হয়ে আছে— শেষ কাব্য নিয়ে এলিয়টের দীর্ঘ দ্বিধা ও বারংবাব সংশোধনের দৃষ্টান্ত মনে হয়, লেখার 'একটা নমুনা গ্রথিত করা' এবং 'কবিতাটিকে পরবর্তী প্রকৃত সিদ্ধির স্তরে' পৌছিয়ে দিতে হলে যে তার পরেও 'অনেকখানি সময়ের প্রয়োজন' তাঁর এই নিজের কথাও (দ্র' লেখার কথা'। ময়ূখ, আষাঢ়–শ্রাবণ ১৯৬৫ পৃ ৩১–৩৮) মনে হয়। অনেক লেখার সমবায়ে বা বহু বার করে লেখার শ্রমে এর কোনো কোনোটি হয়তো তিনি উত্তীর্ণ করতেন বইয়ের কবিতায়, কবি তার সুযোগ পান নি, কিন্তু কৃতী কবির তথ্য মাত্রে উৎসুক পাঠকের কাছ থেকে এই সব আশু রচনা কবি নিজে ছাড়া আর কেই বা সংবরণ করে রাখতে পারেন। অতএব 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পরেব কখানি বই কবিতার চেয়ে তথ্যের বই হিসেবে পড়াই ভালো, আমাদের এই বইয়ের 'অগ্রন্থিত কবিতা' সম্বন্ধেও সেই কথা।

'সাতটি তাবাব তিমির'এ ক্ষুভিত আবিশ্ব তথ্য জীবনানন্দ বয়ন করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর পুরোনো নকশায়। যুদ্ধ বিপ্লব শত শত নিরাশা মৃত্যু পার হয়ে এও ফের নাবিকীর আরেক অধ্যায়, 'আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার/ প্রয়োজন রয়ে গেছে' বোধ ক'রে স্থিতি ভেঙে দুর্বিপাক সাগরে ফের বেরিয়ে পড়েছে নাবিক, কেবল তার তরণী এখন আর তার বশ নয়। বইয়ের মুখ্যস্থানীয় কবিতা বলেই বোধ হয় কবি স্বযং তার অনুবাদ কবে ছাপতে দিয়েছিলেন প্রতিনিধি সংকলনে (দ্র এই বই প, ৭৩৮)। 'সাতটি তারার তিমিরে'র সাত তারা শিশুমার বা লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত তারা, যে মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারাটি নাবিকের স্থির দিশারী ধ্রুবতারা। মনে হয় নামটি কবি নিয়েছেন পুর্গাতোরিয়া ত্রিংশৎ সর্গে বেয়াত্রিচে-আবির্ভাব--নিশানী সপ্তদীপা *Septentrion*এর উদয় সূত্র থেকে, খৃষ্টীয় সপ্তবিভা দৈবতেব চিহ্ন সাত মোমদীপের প্রতীক রূপে দান্তে ব্যবহার করেছেন এই তারামণ্ডলের নিশানা, জীবনানন্দের কবিতায় তিমির বিকিরণ করছে তারামণ্ডল, লক্ষ্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দান্তে তাঁর 'কোমেদিয়া' তিন পর্বেই পরমেস্সিতের উদ্দেশে তীর্থযাত্রার রূপক রূপে ব্যবহার করেছেন ইউলিসিসের নাবিকী পুরাণ। ইনফের্নো ২৬ সর্গে ইউলিসিস্ বলছেন: 'উষা লক্ষ্যে হাল ঘুরিয়ে দাঁড়গুলোকে/ আমরা করে তুললাম উন্মাদ উড়ে চলার ডানা', 'জলধি–পাখি' লেখা থেকেই দান্তের এই ইউলিসিস্‌কে দেখতে পাই জীবনানন্দের কবিতায়। দান্তের ইউলিসিসের সমুদ্রযাত্রার পরিণাম দিব্যা পেনিলোপির বাহুবন্ধে নয়, নিশ্চয় নৌডুবিতে, ঈশ্বরহীন যাত্রার ফল হল ব্যর্থতা, বারংবার ব্যর্থতা, 'সাতটি তারার তিমির'এ সাইরেন, শেষ সাগরের জাহাজডুবির পরেও, ক্ষতবিক্ষত হযেও, 'যত যুগ কেটে যায় চেয়ে দেখে সাগরের নীল মরুভূমি/ মিশে আছে নীলিমার সীমাহীন ভ্রান্তিবিলাসে'। জীবনের পুনর্বসন্তের কল্যাণ, 'সূর্যালোকিত সব সিন্ধুপাখিদের শব্দ' ফের শুনতে পান কবি, বারবার না- যাওয়া না–পাওয়ার পরেও তাঁর মনে হয়

হে নাবিক, হে নাবিক কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু?...
অণুচ্ছেদটি এইভাবে সরলার্থ করেছেন কবি তর্জমায়:

Man will not rest content
Purged of follies, sin and tragic mistakes
His sailor soul will fare forward
To move into a better discovery of life on this planet.

*The Dry Salvage*এর তৃতীয় পরিচ্ছেদশেষে এলিয়ট কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করে লিখেছেন প্রায় এই কথাই:

Fare forward.
O voyagers, O seamen,
You who come to port, and you whose bodies
Will suffer the trial and judgment of the sea,
Or whatever event, this is your real destination...
Not fare well,
But fare forward, voyagers.

৯

১৯৩৬এ লখনৌ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে জওযাহরলাল নেহরু বলেন, তিনি কমিউনিস্ট, তিনি সোশিয়ালিস্ট, ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজিবাদের তিনি উচ্ছেদ ঘটাতে চান। কংগ্রেস মণ্ডপের পাশেই বসে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন (১০ই এপ্রিল ১৯৩৬), সেখানে সভাপতি মুনশি প্রেমচন্দ বলেন,'অন্য বস্তুর মতো শিল্পকলাকেও আমি কেবলমাত্র চিত্ত বিনোদন ও বিলাসিতার বস্তু মনে করি না, বরং উপযোগিতাব তুলাদণ্ডে বিচাব কবি।' হিরণকুমাব সান্যাল ১৭ই এপ্রিল ১৯৩৬এর 'পরিচযে'র স্মৃতিকথায উল্লেখ করেছেন, 'হীরেন মুখুজ্জে লখনৌ কংগ্রেসের নানা মুখরোচক গল্প বললেন। তাবপর তিনি মন্তব্য করলেন যে ভারতবর্ষে কমিউনিজম্ প্রসাবেব যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' ৮ই মে ১৯৩৬এর কথাতে হিরণকুমার লিখেছেন, 'পরিচয–সভায গিযে দেখি হীরেন মুখুজ্জে একটি ইস্তাহার পড়ছেন: সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ফ্যাসিজম্ এব আক্রমণেব প্রতিবাদ। ভাবতবর্ষেব প্রত্যেক প্রদেশের দশজন সেরা সাহিত্যিকের দস্তখত যোগাড় করে এই ইস্তাহাবটি প্রচাবেব প্রস্তাব হযেছে।... শোনা গেল, আরো একটি প্রস্তাব হযেছে যে নাম করা সাহিত্যিকদেব জিজ্ঞাসা করা হবে তাঁরা কেন ও কাব জন্য লেখেন এবং তাঁদের জবাব একত্র জড়ো করে একটি জুতসই ভূমিকা জুড়ে ছাপা হবে। ফ্রান্সে কমিউনিস্টরা নাকি ইতিপূর্বেই এই জাতীয় প্রচাবকাজে হাত দিযেছেন।' বইখানি সম্ভবত ১৯৩৭এ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সুবেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায সম্পাদিত 'প্রগতি'। সেখানে লেখকদেব রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে পরস্পর মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁবা সকলেই ফ্যাশিজ্‌মের বিরোধী—ফ্যাশিজ্‌ম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতিব পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব করছে ব'লে।' উপবন্তু তাঁবা বিশ্বাস করেন না যে 'সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টিব পবিপন্থী।' ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয ১৯৪২এ। সঙ্ঘের পক্ষে হিরণকুমার স্যান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায সম্পাদিত 'কেন লিখি' প্রকাশ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্তত সাত বছব পব, ১৯৪৪এ। সেখানেও সামাজিক পবিবেশ গোচরে অগোচরে 'লেখকদের সাহিত্য নিযন্ত্রিত কবছে' যে অনিবার্য শক্তিতে' সেই শক্তি যাতে প্রগতির শক্তি হয, যাতে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রশস্ততর পবিণতিব দিকে নিযে যেতে সাহায্য করে তাব জন্য সচেষ্ট হওযাব' আহ্বান জানানো হযেছে মুখবন্ধে। 'কেন লিখি'তে জীবনানন্দেবও একটি 'জবানবন্দি' ছাপা হয়েছিল।

কেন লেখেন জীবনানন্দ? প্রচলিত 'সুলিপি' লেখার জন্যও নিশ্চয লেখেন। আজকেব দুর্দিনে (ফ্যাসি বা পীত ভীতির দিনে) মানুষের নিঃসহাযতাব রূপ কী রকম, কী করে তা কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থ বোধ করতে পারা যায়, এ সব নিয়ে যে কোনো প্রধান, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার লিপিময প্রকাশ মূল্যবান জিনিস বলেও তিনি মনে করেন। তবু তাঁর আস্থা কবিতার নিজস্ব চরিত্রবলেব উপরে। তাঁরা বিশ্বাস, 'শোষিত মানবজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের, ও সেই বিপ্লবেব শেষে আশাভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিযেই কবিতা মহৎ হযে ওঠে। কল্যাণ বা শুভ সমাচার মাত্র

নয়, 'আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে স র্ব তো ভা বে স ব ক থা সে জানিয়ে দিতে চেষ্টা করে।' কেবলই সে সুলিপি নয়, সুসমাচার নয়, সমীচীন গদ্য বা সৎ,ভূয়োদর্শী সম্পাদকীয় উক্তির তুল্য নয়, দিব্য স্পর্শ ব্যবহিতও নয়। বইয়ের সম্পাদকেরা লিখেছিলেন, 'সামাজিক চৈতন্যের শক্তি প্রগতির শক্তি হয়ে যাতে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রশস্ততর পরিণতির পথে নিয়ে যেতে পারে' সেই তাঁদের চেষ্টা। জীবনানন্দ লিখেছেন, কবিতার দ্বারা প্রগতির শক্তি লাভ করা সন্দেহস্থল। 'যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত করে চলেছে তা হলে সে ধারণা ঠিক হবে না।' এই মাত্র নয়। জীবনানন্দ লিখেছেন, 'কবিতার উপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারু নির্দেশ পালন করবার রীতিও নেই কবিমানসের ভিতর।'

জীবনানন্দের ১৯৪৪এর এই জবানবন্দি ১৯৩৮এ 'কবিতা' পত্রিকা বিশেষ সংখ্যাব 'কবিতার কথা' লেখাব পূর্বানুবৃত্তি বলে মনে হয়। উপলক্ষ্যের নির্বন্ধ না থাকতে আরো অবাধিত মনে হয় সেখানে মতামত। সে লেখায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন কবি কেউ কেউ, বাকি সব উপকবি। সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদ প্রাচুর্যের লেখা সব চেয়ে আগে এবং সব চেয়ে বেশি করে খোঁচা দিলেও পাঠকচিত্তে অগভীর, ক্ষণস্থায়ী, আনন্দহীন তার প্রভাব, তাতে আছে নিম্নস্তরের তৃপ্তি। অপবদিকে শ্রেষ্ঠ কবিতা মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয়, এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন ভাঙছে এবং নতুন করে গড়তে চাইছে; এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনো একটা সুসীম আনন্দের দিকে গভীর বিরাট সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত। কবির ধর্ম ও সিদ্ধি তাব এই সৃজন শিল্পেব জগতে, কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ জিনিস খুঁজতে হয এখানে। বুদ্ধিব সমীচীনতা দিয়ে তাব বিচাব নয়। সে 'বিলোল ভিড়ের' 'গণ–পাঠকের' প্রয়োজন সাধনের জিনিস নয়, জনতার হাজার হাজার বর্গমাইলের দিকে তাকিয়ে পাদরিদের বাইবেল বিতরণও নয়, 'মুষ্টিমেয পাঠকের জন্য শুধু'। মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বাঙ্গীণ ও সুখেব করে গড়বাব সংগ্রামে কবিতাকে কাজে লাগাতে চাইতে পারেন 'হিতসাধমণ্ডলীর কর্মসচিবেরা'। 'আর যদি সভ্যতাব মোড় ঘুরে না যায তা হলে কমরেডেব দল এবং সাহিত্যের হবগব্লিনেরা কাব্যেব জন্য একটা কিছু করবেনই নিশ্চয।' তাঁরা তা করুন। কবিকে 'তার নিজেব প্রতিভাব কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে কতিপয়ের হাতে তাব কবিতার দান অর্পণ করে।'

বিলোল ভিড়ের জনতার হাজাব হাজার বর্গমাইলেব বদলে কেবল মুষ্টিমেয, কতিপয় বোদ্ধার জন্য যে সাবাৎসাব শিল্প, আধুনিক শুদ্ধ শিল্পের তাবৎ শিল্পীরই সে কথা। কিন্তু বিলোল ভিড়ের যে প্রভাব গণপণ্য গণআন্দোলনেব যুগে সে পূর্বদৃষ্টান্তহীন। আধুনিক স্পেনীয তত্ত্ববিৎ হোসে ওর্তেগা ঈ গাসেৎ প্রশ্ন করেছেন 'জনতাব বিদ্রোহ' বইযে 'What is he like, this mass-man who today dominates life,political and non-political?' শিল্পেব নির্মাণ বিকৃতি' (*La deshumanizacion del arte* ১৯২৫) আর 'জনতার বিদ্রোহ' (*La rebelion de las masas*১৯২৯) নামে দুখানি বইয়ে বিলোল ভিড় আব বিশিষ্ট সংখ্যালঘু, *mass man* এবং *specially gifted minority*ব দুটি পৃথক্ শ্রেণী ভাগ করে ওর্তেগা দেখিয়েছিলেন আধুনিক শিল্প সর্বতোভাবেই সংখ্যালঘুর শিল্প, the art of a privileged aristrocracy of finer senses'. কেবল আধুনিক কেন, সর্বকালেব শ্রেষ্ঠ শিল্পই কয়েকজন মাত্র সমঝদারের অনুগম্য। ধনতন্ত্রী দেশে শিল্পের আপামবভোগ্য বাণিজ্যীকরণের সামনেও সচেতন শিল্পী আরো আত্মবৃত হয়েছেন। টি.এস. এলিযট বলেছেন mass-culture উদ্ভূত বিকল্প সংস্কৃতির কথা which operates silently... for the *depression of standards*'. কিন্তু যে গণপাঠক ও কমরেডদের কথা জীবনানন্দ লিখেছেন তীব্র ভাষায তার পিছনে আরো প্রত্যক্ষের কাবণ আছে, বোঝা যায।

১৯৩৬এ প্রথম প্রগতি সাহিত্য সম্মিলনে মুনশি প্রেমচন্দ্ বলেছিলেন, নীতিশাস্ত্র ও সাহিত্যশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য একই। দলিত উৎপীড়িত বঞ্চিতের পক্ষ নিয়ে সমাজের আদালতে সওয়াল কবা সাহিত্যেব কর্তব্য। অবক্ষযের কালে যখন সে জগতের নশ্বরতা বা কালেব প্রতিকূলতার কান্নায় কাতব হয় অথবা শৃঙ্গারিক ভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তখন বুঝতে হয় জড়তা ও পতনের ফাঁদে সে পা দিয়েছে, জীবনের উদ্যোগ ও সংঘর্ষেব শক্তি তার আর নেই, জগৎকে অনুভব করাব ক্ষমতাও তার লোপ পেয়েছে। অহংবাদ অবলম্বন করলে ওই জড়তা অবক্ষয ও দায়িত্বহীনতাব দিকেই আমরা চলে যাব, সে আর্ট ব্যক্তি বা সমষ্টি কারোই উপযোগী নয়।

১৯৩৮এ ডিসেম্বরে কলকাতা প্রগতি সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্যতম সভাপতি মূল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্ সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট আদর্শ,লেনিনের চিন্তা ও গোর্কির জবানি ব্যবহার

করে পারিভাষিক করে তোলেন তাঁর বক্তব্য। গোর্কির উদ্‌ধৃতিটি এই: ব্যক্তি মালিকানা থেকে উদ্ভূত হয়েছে অহংবাদ, যুগ যুগ শ্রমে গঠিত সামবায়িক সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তি তার অনন্য অগম্য মিস্টিকাল দেবতা গ'ড়ে স্বৈরতন্ত্রের যে পথ তৈরি করে যুক্তিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। মূল্‌করাজ বলেন জনগণের কথা এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা থাকতে হবে সাহিত্যে। বলবার বিষয় এবং ভাষা-রীতি শেখার জন্য লেখককে সা ং বা দি কে র শি ক্ষা নিতে হবে। সংস্কৃতির জনপ্রিয়করণের ভারও তাঁর। আরো বলেন, লেখককে আজ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পুরোভাগে এবং সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের তীব্রতম সংগ্রামে লিপ্ত সারা বিশ্বের লেখকদের পাশে স্থান নিতে হবে। প্রগতি সাহিত্যের ১৯৩৮এর সংশোধিত ম্যানিফেস্টোয় এই দুটি সূত্র আছে:

১ It is the duty of Indian writers... to assist spirit of progerss in the country by introducing scientific rationalism in literature.

২ It is the object of our Association to rescue literature and other arts from the conservative classes in whose hands they have been degenerating so long, to bring arts into the closest touch with the people and to make them the vital organs which will register the actualities of life, as well as lead us to the future we envisage'.

আরম্ভের পর অল্প দিনেই প্রগতি সাহিত্যের কর্মকাণ্ড যে বিপুল ব্যাপকতা লাভ করেছে তার নজিরও অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা তুলে ধরেন (সুধী প্রধান স. *Marxist Cultural Movement in India., Chronicles and Documents 1936-1947* ১৯৭৯ গ্রন্থে সংকলিত)। তার প্রভাবও নিশ্চয় সঞ্চার হয়েছিল। ১৯৩৭এব 'প্রগতি' সংকলনে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভারতে অর্থনৈতিক কারণে গণ আন্দোলন চলিতেছে বটে কিন্তু তাহার একটা সাহিত্য এখনও গড়িয়া উঠিতেছে না' এই 'কাল-ব্যতিক্রম' লক্ষ্য করেছিলেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযও লিখেছেন, 'সকলে এখনও ব্যক্তিবাদী', তখনও তিনি প্রগতিবাদী লেখকেব সন্ধান পান নি। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেখেন, প্রগতি সাহিত্য হল 'সার্বজনীন ভূমির উর্বর প্রাচুর্যে পরিপুষ্ট সাহিত্য' অবাস্তব বিকৃত কল্পনার বদলে সর্বজনীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কাল্পনিক দৃষ্টিকোণকে ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে তিনি সাহিত্যিককে 'সামাজিক অগ্রগতির কাজে সহাযতা করতে' আহবান কবেন। ১৯৩৭-১৯৩৯এ 'পবিচয' পত্রিকার বিবিধ পুস্তক আলোচনায় সমর সেন লেখেন, তিনি 'সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাহীন', এবং 'ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুন যুগের সাহিত্যের ভিত্তি।' প্রগতি সাহিত্যেব দ্বিতীয অধিবেশনে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য নিয়েও প্রগতি লেখক মহলে উত্তাপ সঞ্চাব হয। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, গণসংযোগ, বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে সংযোগ হলে আমাদের সাহিত্যে নতুন প্রাণশক্তি আসবে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে দেশে বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আবহমান ব্যবধান তৈরি হয়ে আছে সেখানে প্রকৃত অভিজ্ঞতা আর তত্ত্বপ্রাণিত সহানুভূতির (idelolgical sympathy) তফাতটাও আমাদের বুঝে নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে 'The fact that Bengali Literature is produced by the bourgeoisie and for the bourgeoise need not depress us; for a piece of genuine literary work must be above all honest. Even if he has no more than a dozen readers, the writer cannot but write as he feels'. বুদ্ধদেবের এই ভাষণের প্রতিবাদে সদ্য প্রকাশিত 'অগ্রণী' পত্রিকায (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ পৃ ৮৩) সরোজকুমাব দত্ত লেখেন, 'আমবা আশা করিয়াছিলাম বুদ্ধদেববাবু আপনাদের অপূর্ণতা ভ্রান্তি ও অক্ষমতা আনন্দের সহিত স্বীকার করিযা নূতন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবেন— নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের declassed দুর্গতদেব ideological clarityর জন্য লেখনী ধারণ কবিবেন, কিম্বা বর্তমান কালেব প্রগতি সাহিত্য রচনায আপনাদেব অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া সাহিত্যমঞ্চ হইতে অবসব গ্রহণ করিবেন।' 'অগ্রণী' আরম্ভ সংখ্যাতেই (১/১পৃ ৫) 'প্রগতিকামী সাহিত্যিক সম্মেলন' শিবোনামে ডিসেম্বর ১৯৩৮ সম্মেলনের সংবাদে ছাপা হয়েছিল: 'প্রতিক্রিযাশীলতা যে রকম গভীর বিস্তৃত ও বিচিত্রভাবে আমাদের সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িত আছে তাতে সংস্কৃতি-বিপ্লবের জন্য প্রগতিকামী সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত চেষ্টাই যথেষ্ট নয়— ঐকিত্রিকতারও প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রগতিকামী সাহিত্য সম্মেলনের জন্ম।'

'অগ্রণী' প্রথম সংখ্যার গোড়ার দুটি প্রবন্ধের একটি 'মানুষের জীবনে আর্টের স্থান' প্রসঙ্গে

মনোরঞ্জন রায় লেখেন, 'আজকের আর্টের প্রবৃত্তিমূলক অহং হচ্ছে সাধারণ মানুষ' (কডওয়েল কথিত social ego?) এবং 'আর্টের উদ্দেশ্য মানুষের মনের পরিবর্তন'; আর—একটি 'ফ্যাসিজম্ ও বুদ্ধিদ্রোহ' প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেখেন, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের, উচ্চশিক্ষিতদের 'মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে অপরিচিত থাকবার নিশ্চিন্ত আনন্দে অভ্যস্ত হয়ে কাল যাপন করা'র কথা। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পিঠোপিঠি চিঠি সে সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, সেখানে তিনি লেখেন 'পাশ্চাত্যে ডিক্টেটররা কেবল রাষ্ট্রিক ব্যাপারে নয়, সামাজিক বিধান নয়, সাহিত্যে আর্টেও আপন শাসন রুদ্ররীতিতে প্রচার করছে। মানুষের এই বিভাগটা ছিল বিশেষভাবে গুণীদের হাতেই... সেদিন কোনো এক বাংলা কাগজে দেখা গেল, আমরা এখানকার কবিরা যদিও রাশিয়ান নই, তবুও আমাদের কবিতারও শ্রেণীবিচার হচ্ছে সোভিয়েট আদর্শে; ভাবের দিকে সে রচনা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে নয়, জাতের দিকে সে বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট এই নিয়ে।'

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়েছিলেন collectivizationএর (রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন 'ঐত্রিকতা') পর্বে। সে হল NEPএর উদার অর্থনীতির পরেকার প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়ণেব অধ্যায়। শিল্প কৃষি ও যন্ত্রের (হেভি ইঞ্জিনীযারিং) বিপুল উন্নতির কর্মকাণ্ড চলেছে তখন, নেপম্যানদের স্ফূর্তি নেই কিন্তু গ্রেট ডিপ্রেশন কবলিত পশ্চিম ইযোরোপেব দেশ থেকে লোক আসছে কর্মসংস্থানের, নতুন সমাজব্যবস্থার আকর্ষণে। এ দেশের সঙ্গে তুলনা করে সেখানকার ' লোকশিক্ষা লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন, সাধাবণের জন্য নানা হিতানুষ্ঠানেব' আযোজন দেখে রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সমবায চাষের জববদস্তিব কথাও তাঁর গোচবে এসেছিল। 'নিষ্ঠুর শাসন', 'ব্যষ্টি বর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা'র কথাও তিনি উল্লেখ কবেছেন। নতুন সংস্কৃতি-বিপ্লবেরও শুরু হযেছে তখন। ট্রটস্কি নির্বাসিত হযেছেন। লেনিনের আমলের প্রথম শিক্ষা কমিসার আনাতোলি লুনাচারাস্কি-র (ইনি বার্লিনে রবীন্দ্রনাথকে রাশিযা আসাব আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন) কর্মকাল শেষ হযে গেছে (১৯১৭-১৯২৯) । শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে উদাবনীতি বহিত হযেছে। RAPP বা 'প্রোলেতারিযান লেখকদের রুশীয় সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা হযেছে। মাযাকভস্কি RAPP এ যোগ দেওযাব পরেও আত্মহত্যা করেছেন। গোর্কি তাঁব বার্লিন উপকণ্ঠেব প্রবাস ছেড়ে বাকি জীবন কাটাতে এসেছেন দেশে। মস্কোয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী হয তাঁব আসার প্রাক্কালে, এক চিত্রসমালোচক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন: What is the idea of this picture? Tagore. No idea. It is a picture.

এক সমালোচক বলেন তাঁর ছবির সাদৃশ্য আছে ভ্রুবেলের সঙ্গে। সোভিয়েত বিপ্লব- পূর্ববর্তী শিল্পী মিখাযিল ভ্রুবেল (১৮৫৬-১৯১০) কিয়েভেব বিভিন্ন গির্জায অলংকরণের কাজ কবে প্রসিদ্ধ হযেছিলেন। গণসাহিত্য সংস্থার (র্যাপ-এর?) এক প্রতিনিধি জানতে চান, 'Are there in India any institutions for training workers for literary activity?' রবীন্দ্রনাথ বলেন, না, 'We do not have any organized effort to help the working men to stimulate their creative activites.'

প্রশ্নের কাবণ হয়তো রবীন্দ্রনাথের রাশিযা ত্যাগেব পরে-পরেই ৬-১৫ই নভেম্বর ১৯৩০এ আসন্ন খার্কভের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সাহিত্য সঙ্ঘেব বিশ্ব প্লেনাম, তাতে কুড়িটি দেশের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। মার্কিন প্রতিনিধি ম্যাকস্ ঈস্টম্যান কৌতুক করে লিখেছেন, অধিবেশনে র্যাপের এক নেতা লেওপোল্দ আবেববাখ প্রস্তাব নেন প্রত্যেক প্রোলেতারিয়ান শিল্পীকে ডায়লেক্টিক্ মেটিরিয়ালিস্ট হতে হবে যেখানে কথাটির মানে বোঝেন সাকুল্যে এমন ছ জন মিলবে কিনা সন্দেহ। ১৯৩২এ ডায়লেক্টিক্ মেটিরিযালিজ্‌মেব বদলে তার সাহিত্যবাচক সমার্থশব্দ হিসেবে 'সোশিয়ালিস্ট বিযালিজম' পবিভাষা গৃহীত হয। ১৯৩৪এ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী ও ঐকত্রিকতা প্রকল্পেব সাফল্য উদ্‌যাপন ক'রে সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেস বসে। অগস্ট ১৯৩৪এ 'সোশিযালিস্ট রিযালিজমে'র ব্যানারে প্রথম সোভিয়েত অল ইউনিযন রাইটার্স কংগ্রেসের ভাষণে সেন্ট্রাল কমিটির সেক্রেটারি আন্দ্রেই রুদানভ (A. A. Zhdanov) বলেন, শ্রেণী সংগ্রামের যুগে সাহিত্যকে উদ্দেশ্যমূলক রাজনীতিমূলক শ্রেণীসাহিত্যই হতে হবে, তাকে হতে হবে আশাবাদী, আগামীমুখী, শ্রমিক ও ঐকত্রিক চাষিদের মুখপত্র । আরো: 'The great body of Soviet authors is now fused with Soviet power and the Party, having the aid of Party guidance and the care and daily assistance of the Central Committee and the unceasing support of Comrade Stalin'—সোভিয়েত সাহিত্যই যে বিশ্বের

মহত্তম সাহিত্য, একমাত্র সৃষ্টিশীল ও বিকাশমুখী সাহিত্য সে কথাও তিনি বলেন। ১৯৩৫এ সপ্তম কমিন্‌টার্ন কংগ্রেসে সোশিয়ালিস্ট, লিবেরাল এমন কি রক্ষণশীল দলের যাবতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্র করে ফ্যাসি ত্রাসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে 'পপ্যুলার ফ্রন্ট' গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯৩৫এ জুনে পারিতে ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রগতিপন্থী লেখক সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন আরাগাঁ মালরো আঁদ্রে জীদ ছিলেন ফরাসি প্রতিনিধি, বিলেতের প্রতিনিধি ছিলেন ই. এম. ফর্স্টর অলডাস হাক্সলি, বাংলা 'প্রগতি' সংকলনে জীদ ও ফর্স্টরের ভাষণদুটির অনুবাদ ছাপা হয়। মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্ জানিয়েছেন এই আন্তর্জাতিক প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল লণ্ডনে, জুন ১৯৩৬এ, লখনৌয়ের প্রগতি লেখক সম্মেলনের দু মাস পর। সেখানে ভারতের প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কার্যক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছিলেন। গোর্কির মৃত্যুতে ১১ই জুলাই ১৯৩৬এ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আহূত শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর দু লাইন নিস্পৃহ শ্রদ্ধা লিখে পাঠান, গোর্কি সম্বন্ধে 'অপ্রসন্ন বিরূপতা' প্রকাশ করেছিলেন ইতিপূর্বে তাঁর 'টলস্টয় স্মৃতি' পড়ে। গোর্কির এই শোকসভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন থেকে ১৯৩৭এ বেরোয় 'প্রগতি' সংকলনখানি, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরণীয়েষু' উৎসর্গিত। এই ১৯৩৭এই ট্রট্‌স্কি বের করেন নরওয়েতে বসে লেখা সম্ভবত তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বই *The Revolution Betrayed*. তাতে তিনি সবিস্তারে লেখেন সোভিয়েত সম্ভাবনা এবং ব্যর্থতার কথা, স্টালিনের আমলাতান্ত্রিক একাধিপত্য উচ্ছেদের আবেদন। স্টালিন–নীতিকে যথার্থ বলশেভিকবাদ বা লেনিনবাদের বিরোধী মনে করতেন ট্রট্‌স্কি। (সম্প্রতি নির্ণেতারা অবশ্য অনেকে ট্রট্‌স্কিনীতিকে স্টালিনিজ্‌মের বিকল্প নয়, বরং উদগাতা বলে ব্যাখ্যা করেন) কেবল জাতীয় স্তরে নয়, দেশ ও বিশ্বের পারস্পরিক যোগে যে চিরায়ত বিপ্লব, শ্রেণীহীন দেশভাগহীন ভূমণ্ডলব্যাপী যে সোশিযালিস্ট সমাজে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, নতুন বলশেভিক রাষ্ট্রশাসনপ্রক্রিয়ায় তার সম্ভাবনা নেই বলেও তাঁর মনে হযেছিল। নির্বাসিত হওয়ার পরেই তিনি 'বিরোধী পক্ষের বুলেটিন' বের করেছিলেন, ১৯৩২এ এগাবো দফা সূত্র তৈরি করেছিলেন আন্তর্জাতিক বামপন্থী বিরোধিতার, যদিও সোভিযেতেব অভ্যন্তরেও বাম বিরোধ (ডাহিনা বিরোধও) দানা বেঁধে উঠতে পারে নি বরং স্টালিনেব ট্রট্‌স্কি নাশ চেষ্টা ক্রমে প্রবলতর হযে উঠেছে। এ দেশেও বিদগ্ধজনের মহলে যে টট্‌স্কীয় বিচ্যুতি বিকৃতি কুযুক্তি প্রতিক্রিয়াশীলতা ষড়যন্ত্রের উপর্যুপরি মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়, হযতো তাবই প্রভাবে। ১৯৩৭এ 'পরিচয়' পত্রিকায সুশোভন সরকার লিখেছেন, 'ট্রট্‌স্কিব ব্যাখ্যা নিশ্চযই মার্কসবাদেব বিকৃতি', 'বলশেভিকদের দেশের মধ্যে নিশ্চেষ্টতা এবং বিদেশে গণ্ডগোল সৃষ্টির ব্যর্থ প্রযাসে শক্তিক্ষয–ট্রট্‌স্কির থিওরির ন্যায্য পরিণাম তো এই দাঁড়ায', এবং 'ট্রট্‌স্কিপন্থা বস্তুত অনেকখানি কথার আস্ফালন' ('সাম্যবাদের সংকট', পরিচয, চৈত্র ১৩৪৪)। ট্রট্‌স্কি নিহত হওযার পবেও নীরেন্দ্রনাথ রায লিখছেন, 'ট্রট্‌স্কি কোনো দিনই মার্কসবাদী বা প্রকৃত লেনিনবাদী ছিলেন না।... তাঁহার মতানুযায়ী সোভিযেট রাষ্ট্র পবিচালিত হইলে আজ হিটলারের জয়ধ্বনিতে বেসুরা বাজাইবাব কেহ থাকিত না পূর্ব ইউরোপে, আর আন্তর্জাতিক শ্রমিক কৃষকের একমাত্র আশ্রয়স্থল অনেক পূর্বেই ধরণী হইতে বিদূবিত হইত ধনিকতন্ত্রের সুব্যবস্থায' (দ্র॰ পরিচয়, ভাদ্র ১৩৪৯)। তিবিশেব মধ্য–দশক থেকে মস্কোর বিশ্রুত অন্তঃশত্রু বিচারসমূহে (treason trials) পুবোনো প্রতিষ্ঠাপন্ন বলশেভিক নেতারা—স্টালিনের শক্তিমান সহযোগীরা, রাষ্ট্রপরিচালকেরা, বুখারিনের মতো মার্কসীয় শাস্ত্রী নিয়ামকেরা ষড়যন্ত্রকারী বলে একে একে গ্রেফতার বিচার স্বীকার এবং তাতে অপব নেতাকে দাযবদ্ধ করে মৃত্যু দণ্ড লাভ করেন। এঁদের অনেকেই অভিযুক্ত ট্রট্‌স্কীয ষড়যন্ত্রের অংশী বলে। সুশোভন সরকার তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সম্প্রতি রুষ দেশে যাদের গুরু দণ্ড হযেছে...। তাদের শাস্তির আসল কারণ নাকি স্টালিনের সঙ্গে মতভেদ মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের কথা যে এ ক্ষেত্রে মিথ্যা নয় এই মত মেনে নেবার পক্ষেই বা বাধা কী?... মস্কোতে বিচারের সময় বেশির ভাগ বন্দী অপরাধ স্বীকার করেছিলেন', যদি স্বীকারের কারণ উৎপীড়ন হয়, 'অসমসাহসী বন্দীদের মধ্যে একজনও কেন তা হলে সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ্য বিচারসভায় ফাঁস করে দেন নি?' মস্কো বিচারের কালে NKVD বা অন্তর্দেশীয় পুলিশের ক্ষমতা, বা গ্রেফতার ও শাস্তির ব্যাপ্তির কথা প্রকাশ হয় নি।

ট্রট্‌স্কি একাধিক বার বলেছেন তাঁকে নির্বাসন দিয়ে স্টালিন পরে আক্ষেপ করেছেন, অতগুলো মস্কো বিচার আসলে তাঁকে যাতে সোভিয়েত পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে। ১৯৩৮এ

ট্রট্স্কি চতুর্থ আন্তর্জাতিক পত্তন করলেন। আন্তর্জাতিক বামপন্থী বিরোধিতার মতো সেও ফলপ্রসূ হয় নি। তাতে যুক্ত হয়েছিলেন চেন-দুখিউর মতো রুশ আনুগত্য প্রতিবাদী চীন কমিউনিস্ট পার্টির বহিষ্কৃত নেতা, নানা দেশের শিল্পী লেখক বুদ্ধিজীবী। ট্রট্স্কির বহিষ্কারের ফলে কমিউনিজ্‌মে দীক্ষিত সুররিয়ালিস্ট বিপ্লবীরা অনেকে দল ত্যাগ করেছিলেন, সুররিয়ালিজ্‌ম্ একাধারে কমিউনিস্ট ও রোম্যান্টিক বিপ্লব, চিরায়ত বিপ্লব, রোম্যান্টিক বলতে ভাববিলাস নয়, অভ্যস্ত বাস্তবের বদলে পরমা বাস্তবের লক্ষ্যবদ্ধ। স্টালিন লিখেছেন, ট্রট্স্কিইজ্‌ম্ কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন নিবপেক্ষ বুর্জোয়াবাদ। তবু আদ্রে ব্রেতঁ, ১৯৩৮এ মেক্সিকোয় গিয়ে ট্রট্স্কির সঙ্গে দেখা করে ফের 'স্বাধীন বিপ্লবী শিল্পের ম্যানিফেস্টো' প্রস্তুত করেন স্থানীয় শিল্পী দিয়েগো রিবেবার সঙ্গে মিলে (ফ্রেঙ্কলিন রোজমন্ট স. আঁদ্রে ব্রেতঁ-ব নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ What is Surrealism?-এ অন্তর্ভুক্ত, লণ্ডন ১৯৭৪) শিল্পী হলেন বিপ্লবের স্বভাববন্ধু, ব্রেতঁ বলেছেন। ১৯৩৯এ '১৩৪৫এর শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সম্পাদক কবিতা নির্বাচন সূত্রে 'ট্রট্স্কির মত' উদ্‌ধৃতি করেছেন। ১৯৪০এ 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র প্রথম ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুবকেও 'এংস্কিব উক্তি স্মরণ করতে' দেখি শ্রেণীসংগ্রাম আর বিশুদ্ধ শিল্পানুগতি নিয়ে কাব্যবিবাদের প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে। ১৯৪০এ প্রেমেন্দ্র মিত্র সঞ্জয় ভট্টাচার্য মিলে 'নিরুক্ত' কবিতা পত্রিকা বের করেন তথাকথিত 'বামপন্থী কবিতার একাধিপত্য খর্ব করা'র জন্য তার প্রথম সংখ্যাতেই 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংগ্রহের সমালোচনায় লেখা হয়, 'সাম্যবাদী কবিদের কথা। সবিস্তারে সম্পাদকীয় ভূমিকায় লেখা হয়েছে এবং কয়েকটি সাম্যবাদী কবিতাব নমুনাও দেখলাম। অথচ সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে যিনি অগ্রণী (সঞ্জয় ভট্টাচার্যেব কথা বলছি) তাঁর কোনো কবিতা এ বইয়ে দেখলাম না।' প্রেমেন্দ্র মিত্রও সাম্যবাদী, কিন্তু সে হল অরাজনৈতিক হুইটম্যানীয় সাম্যবাদ: 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারিব আর ছুতোরের মুটে মজুবেব— আমি কবি যত ইতরের।' সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজের পরিচয় দিয়েছেন ট্রট্স্কিপন্থী বলে। ১৯৩৯এ 'নতুন পত্র' মাসিক পত্রিকায় 'প্রগতি সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, সম্প্রতি প্রগতি সাহিত্য নামে প্রচারিত সাহিত্য আসলে 'সমাজানুগত সাহিত্য' 'অতীতাশ্রয়ী শান্তির ঈপ্সা'বান রবীন্দ্রসাহিত্যেব সঙ্গে তাব পার্থক্য কেবল 'মধ্যবিত্তের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত' হয়ে, যেখানে'প্রগতিতে আছে বিপ্লব', 'ফলপ্রসূ সমাজের উদ্দেশ্যে অভিযান' (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৪৬)। 'নিরুক্ত' এবং 'পূর্বাশা' পত্রিকায় জীবনানন্দকে তাঁরা আমন্ত্রণ করেছিলেন 'বাস্তবভিত্তিক রোম্যান্টিক জেনে'। বাস্তব ভিত্তি হল সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম অথবা হিস্টরিকাল মেটিরিয়ালিজ্‌মেব ভিত্তি, আর বোম্যান্টিসিজ্‌ম্ 'বৈজ্ঞানিক জড়বাদেব কাব্যরূপ'— 'বৈজ্ঞানিক জড়বাদ যা নাকি মানুষের ক্রমোন্নতির ইঙ্গিত বহন করে।' 'নিরুক্তে'র প্রথম সংখ্যাতেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য লেখেন, 'কবি বস্তুগত কল্পনার আশ্রয়ে... আর-একটি স্বর্ণযুগে উপস্থিত হতে চান', 'ভবিষ্যৎ থেকে এ স্বর্ণযুগেব রশ্মি আজ অনেকের মনের উপরেই এসে পড়েছে', এবং তা নিয়ে বোম্যান্টিসিজ্‌ম বৈজ্ঞানিক জড়বাদেব অনুমোদিত (দ্র. নিরুক্ত, আশ্বিন ১৩৪৭)। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী লিখেছিলেন 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কাল্পনিক দৃষ্টিকোণকে সংযুক্ত করে... সামাজিক অগ্রগতিব কাজে সহাযতা কবা'র কথা। সমর সেন লিখেছিলেন, 'ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুন যুগের সাহিত্যের ভিত্তি', সরোজকুমাব দত্ত লিখেছিলেন, বুদ্ধদেববাবুব 'অবৈজ্ঞানিক আত্মপ্রতারণা' এবং 'ঐতিহাসক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে'র কথা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের সব অনুজ্ঞা। প্লেখানভের নয় ততখানি, যা স্বভাববাদী বস্তুবাদ বা প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের বদলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তির স্তরপরম্পরা অনুসারে ঐতিহাসিক বিকাশকে মানুষের চিত্ত ও চিন্তার নিযামক জ্ঞান করেও সমাজাদর্শেব স্থানে শিল্পের পৃথক ও নিজস্ব নিয়ম স্বীকার করে। প্লেখানভ বিষয়বস্তুব মূল্যেই শিল্পসাহিত্যের বিচার এমন কথা বলেও, বা পরের দিনের সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিজ্‌মের ভূমি রচনা কবেও 'আগম্যমান' বা সমুচিতেব বদলে পরিচিত সমাজকেই শিল্পের বিষয় বলে মেনেছেন, এবং সাহিত্যকে পপ্যুলিস্ট মার্কসিস্ট প্রচারমাধ্যম করে তোলার জন্য নাউমভের, গোর্কির 'মা' উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন। এ হল দ্বান্দ্বিক জড়বাদের যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-বুখারিনের ধারাস্রোতে। নিকোলাই বুখারিন এভগেনি প্রেয়োব্রাঝেনস্কি-র সঙ্গে যুগ্মভাবে 'প্রথম পাঠ কমিউনিজ্‌ম' (The ABC of Communism. ইংরেজি অনুবাদ ১৯২৪) লিখেছিলেন, অতঃপর বিস্তার করে মার্কস্ এঙ্গেলস প্লেখানভকে এবং লেনিনকে সমন্বিত করে লেখেন পার্টির দর্শন ও সমাজনীতি: *The Theory of Historical Materialism: a popular manual of Marxist Sociology*

(ইংরেজি অনুবাদ ১৯২৮, নতুন অ্যান আর্বর সংস্করন ১৯৬৯)—সে হল পরের দিনে 'শর্ট কোর্স' (স্টালিনের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৮ এ সংকলিত *The Short course on The History of CPSU)* প্রচলিত হবার আগে পার্টি অনুমোদিত মার্কসীয় শাস্ত্র—কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক, সমাজবোধের একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যার দ্বারা আগামী দিনের ইতিহাসক্রিয়াও সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া যায় (পুরোনো সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার তফাত হল সমাজস্থিতির নয়, সমাজবদলের, বা ভবিষ্যতের, দিকে তার মুখ)। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী যে পরবর্তী 'আগমমান' সমাজ পরিবর্তনের কাল্পনিক সমাধানকে ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে বলেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদও যে বলেছেন প্রগতিশীল সাহিত্যিকের কালাতিপাতের বোধ (এক ঘটনার বেগভারে প্রবর্তিত অন্য ঘটনাব ক্রাইসিস্) থাকা দরকার, তাতেও বুখারিনের ছায়া আছে। জিনোভিয়েভ কামেনেভের পতনের পর বুখারিন ছিলেন স্টালিনের সব চেয়ে কাছের জন। 'প্রাভদা'র স্টালিনের বিরাগভাজন হবার পরেও 'ইজভেস্তিয়া'র ক্ষমতাপন্ন সম্পাদক। ১৯২৫এ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে কল্পনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পার্টির নীতি' নামে গৃহীত সরকারি শিল্প নীতিও তাঁর প্রণীত। ১৯৩৯এও সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'অগ্রণী' কাগজে বুখারিনের অনুসরণে কবি আলেকজান্দর ব্লক সের্গেই এসেনিনের নিগ্রহ করেছেন (প্রসঙ্গত, ব্লকের 'বাবো' কবিতাব সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত তর্জমা 'প্রগতি' ১৯৩৭ সংকলনে গ্রন্থিত হয়েছিল)।

১৯২৫এর সোভিয়েত নীতিতে গণতন্ত্রী শিল্পীকে প্রত্যক্ষ নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য দেবার কথা ছিল, এই সরকারী নীতিই কালক্রমে র‍্যাপ-এ, তারপর কঠোরতর বিধিবদ্ধ হয়ে ওঠে। লেনিনের আমলে বহু ধাবা আভাঁ গার্দ লেখার পাশাপাশি চর্চা হয়েছে, বরং প্রোলেৎকুলৎ-এর সাহিত্যশ্রমিক তৈরি করার দেশ ব্যাপী কর্মকাণ্ডই হৃতবল হয়ে গেছে ক্রমশ। লেনিন ট্রট্স্কি লুনাচারাস্কি শিল্প সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণ বসান নি। সৃজনশৈলিব একতম নিয়ম বা নতুন গণতন্ত্রী আচারবিধির বাধ্যতা জারি করেন নি, আঙ্গিক নিরীক্ষাও বিলাস বলে ধার্য করেন নি। প্রকরণপ্রবণ খ্লেবনিকভের শব্দক্রীড়ায় না হোক, তাঁব শিষ্যোপম মায়াকভস্কির বিস্ফার রচনাব বারণ ছিল না। যদিও লেনিন তাঁব কোনো লেখাকে বলেছেন 'হুলিগান কমিউনিজম,' '১৫০,০০০,০০০' নামে ধনতন্ত্রী উইলসনের মুখোমুখি দাঁড়ানো সামান্য ও সমূহ মানুষেব (ইভান) কবিতায় ট্রট্স্কি দেখতে পেয়েছেন অতিকৃত অহংয়ের অভিব্যক্তি ('সমস্ত মানুষকেই কবি করে তুলেছেন মায়াকভস্কি, গ্রীকেরা ছিলেন অ্যানথ্রোপোমর্ফিক, আমাদেব কবি মায়াকমর্ফিক' (দ্র: Literature and Revolution. রোজ স্ট্রান্স্কি অনূদিত অ্যান আর্বব সং ১৯৬০ পৃ ১৪৯)। 'কারখানা ল্যাবরেটবিব গর্জনেব মধ্যে জ্বলন্ত জনস্তব' সৃষ্টি করতে চেয়েছেন মায়াকভস্কি, বিশ্বব্যাপী সমাজবদলের পরেও স্বপ্ন দেখেছেন স্থিতি কাঁপানো 'ফিফ্থ্ ইণ্টারন্যাশনালে'র। অতঃপব কবিদেব একমাত্র স্পৃহনীয় হল সমাজবাদ, গণসাহিত্য, ভাষাসারল্য (বা ভাষার অনান্দনিকীকরণ)। এখানেও। অহংবাদ আর সমাজচেতনা, শ্রেণীসংগ্রাম আর শুদ্ধ শিল্প, আশাবাদ আব নৈরাশ্য, বুর্জোয়া অবক্ষয় আব প্রগতিসাধনা, সর্বজনীন ভাষা আর আঙ্গিকবিলাস —তিরিশ দশকের উত্তরার্ধ ক্ষুভিত হয়ে আছে এই নিয়ে। ১৯৩৭এ সমব সেন লিখেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কবি।' ১৯৩৮এ লিখেছেন, 'বিশুদ্ধ কবিতাব কবিরা পূর্ব যুগের ক্রিশ্চানদেব মতো, যাঁবা কুমারী মেরিব বিশুদ্ধ গর্ভধারণে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন।... ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে কাব্যে মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, এবং মূলসূত্রহীন কাব্য এক ধরনের মস্তিস্ক বিকৃতির নামান্তব।' তারও পর সুধীন্দ্রনাথেব 'উত্তরফাল্গুনী'তে চক্রচর কালেব কল্পনা ও প্রগতিবিমুখতার 'বিপজ্জনক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে' বলে অভিযোগ করেন। হিরণকুমার সান্যালও সুধীন্দ্রনাথের কোনো গদ্য আলোচনা সূত্রে সুধীন্দ্রনাথ 'যে মনোবৃত্তি থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি' বলে লক্ষ্য করেছিলেন। (১৯৩৭এ সুধীন্দ্রনাথ 'ফ্যাশিজ্‌ম আর কম্যুনিজ্‌মের উভয় সঙ্কটে... দুটো মন্দেব মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য' বলে উল্লেখ করেন)। ১৯৩৮এর প্রগতি লেখক সম্মেলনের ভাষণে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'The writers and artists who are on the side of the worker and peasant will, of necessity, driving the revolutionary and near-revolutionary periods, find that they must forge of this art a sword for use in the struggle which they cannot avoid' (এই ভাষণটিই ঈষৎ বিস্তার ও সংস্কাব করে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র দ্বিতীয় ভূমিকা রূপে গৃহীত হয়)। ঝ্দানভ বলেছিলেন 'poetry be forged into

weapons for the proletariat'। প্রগতি সম্মেলন উপলক্ষ্য করে সরোজমুকার দত্ত 'অসী ও মসী' কবিতায় লেখেন 'অসি মসী এক হয়ে মেশে, (অগ্রণী, ১৯৩৯)। ১৯৩৯এ 'অগ্রণী' পত্রিকা লিখেছেন:

১ 'বর্তমান যুগে, সাহিত্যিক প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার করিয়া সৎসাহিত্য রচনা করিতে হইলে সাহিত্যিককে সর্বাগ্রে ব্যবহারিক জীবনে সমাজতন্ত্রী হইয়া শ্রেণীসংঘর্ষের প্রগতিশীল পক্ষে যোগ দিতে হইবে।... দৈনন্দিন জীবনে শ্রমিকদিগের পক্ষভুক্ত না হইলে প্রতিভার প্রাচুর্য সত্ত্বেও সদ্‌গ্রন্থ রচনায় সম্ভবপর কোনোমতেই হইবেন না, সত্যপ্রচারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইবেন।'

২ 'আমাদের বর্তমান সাহিত্যে অন্তর্মুখীকরণ প্রবৃত্তি এত প্রবল যে এখান সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা বা সামজিক চেতনার কোনো স্থান নেই বললেই চলে। আমাদের অতি আধুনিক কাব্যসাহিত্য এ বিষয়ে সকলের অগ্রগামী।'

প্রথম নির্বন্ধটি অনুবাদ, দ্বিতীযটিব রচনাস্থলে অতঃপর আছে, প্রগতি সম্মেলনে 'যাঁরা ভয়ানকভাবে সমাজতন্ত্রেব আদর্শেব দিকে ঝুঁকেছিলেন' তাঁরাও 'কষ্টকল্পিত দুরধিগম্যতা', এবং 'সাহিত্যিক পদ্ধতির বা বিষয়বস্তুর পবিবর্তন করা প্রয়োজন বোধ কবেছেন না', এই আক্ষেপ। বিষযবস্তু সুগ্রহণীয় হযেও অবাঞ্ছিত ভাঁজ পড়তে পারে লেখাতে

আমাব কবিতা কভু কহিবে না আমার কাহিনী

এই অবিসংবাদী সংকল্প অপব দুই অনুগামী কবি লিখতে পারেন এই দুভাবে

১ আপন চর্চায শুধু শূন্য ফানুস ফাঁসে
সারা দিন আপন মনে মনের উকুন বাছা
লোকালযেব খেযাঘাটে অর্থহীন এ আত্মস্তবী গান

২ মৈত্রী সেজেছে পেশোযাজ ছেড়ে
অহংকাবেই কর্মক্ষয।
স্বর্গখেলনা গড়েছি কল্পনা
যে গড়া মবিযা ভাঙাব ভয।

'মবিযা' ক্রিয়া, না বিশেষণ এই দ্বার্থও বক্র কবে তুলতে পাবে বক্তব্য। কিংবা দুজনে এই দুভাবে লিখতে পারেন শ্রমিক সংশ্লেষ

১ আমবা শ্রমিক– আমাদেব গীতি–কান্তের সংঘাত
অগ্নি ছিটোয উজ্জ্বলন্ত অগ্নিব অক্ষরে।

২ সূর্য হেনেছে পক্ষপাতেব লাখো কৃপাণ–
চলে বীব নয, হাজাবো মজুব লাখো কৃষাণ।

১৯৪০এব ভূমিকায হীরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে–ব ভাষাপ্রকবণে 'অর্থঘনত্বেব প্রযাস আর সংযমের আতিশয্য' সত্ত্বেও আশ্বস্ত হযেছেন: "ঘোড়সওযাব" ও "পদধ্বনি"র লেখক একক অতৃপ্তিব দৃষ্টিকোণ ছেড়ে' এসে 'সম্প্রতি যে অবিকল্প ভঙ্গি ও প্রসঙ্গে'র আশ্রয নিয়েছেন তাতে 'ভবসা হয যে মাত্র কযেকজনের জন্য ইঙ্গিতবহুল ভাষা বর্জন কবতে তাঁব কবিবিবেক আব বাধা দেবে না।' সমব সেন সম্বন্ধেও তাঁর অভিযোগ: তাঁব লেখায এক–একসময সত্যই নৈরাশ্যের একটা বিকৃত সুব বেজে ওঠে, আব তাঁর অনুরাগীদেব মনে সন্দেহ হয যে হযতো তিনি প্রায আড়চোখে আর্তসমাজের দিকে তাকিয়ে শুধু বহুজনের বিপত্তির ভিত্তিতে কাব্য রচনা করছেন, মার্কস্‌পন্থীর পক্ষে যা অকর্তব্য।' সাম্যবাদী কবিতাব এঁবা আশাস্থল। তবু, হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিষ্ণু দে–র লেখা 'সমাজব্যাধি উন্মূল কবা সম্বন্ধে মনস্থির করে নি'; সমব সেন, বা সুভাষ মুখোপাধ্যাযের লেখাতেও 'পৃথিবীকে গণশক্তিবলে ধ্বংস করাব ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি যেন পাওযা যায না' (যদিও সুভাষ মুখোপাধ্যায সনিশ্চযেই লিখেছেন: 'এত দিন ইতিহাস লেখাই হযেছে কমরেড, আমাদেব কাজ ইতিহাসকে তৈবি কবা')। লেনিন নিজেই অকপট ও উদ্দেশ্যমূলক আর ব্যক্তিক ও তির্যক্ মার্কসিজ্‌মেব তফাত কবে লিখেছিলেন গণতন্ত্রী লেখক আব ধনতন্ত্রের বুর্জোয়া apologistএব পার্থক্য এই উদ্দেশ্যপ্রাণিত হওযাব সূত্রে, সাম্যবাদী লেখকেব মূল লক্ষণ তাঁর tendentiousness (দ্র° ভালেন্তিন আস্‌মুস্ এব প্রবন্ধ *Realism and Naturalism.* সোভিয়েট লিট্‌রেচার, মার্চ ১৯৪৮)।

১৯৪০এ 'অগ্রণী' সরাসরি আক্রমণ কবেন সমর সেনের সুবিধাবাদী textbook

Marxism'কে। তাঁর লেখা যে 'intellectual cliqueএর জন্য লেখা, আমার আপনার জন্য নহে', সে কথাও লেখেন। ১৯৪০এ বিনয় ঘোষ 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধেও বিষ্ণু দে ও সমর সেন সূত্রে লেখেন, আমরা মনে করি সাম্যবাদের স্ফূর্তি ও বিকাশের জন্য এরকম "নিঃসন্দিগ্ধ সাম্যবাদী কবি"র উচ্ছেদ প্রয়োজন। আরো লেখেন, 'তাঁদের বাইরের "সমাজতন্ত্র", "সাম্যবাদ', "মার্কস্" প্রভৃতি শব্দে আভরণ খসিয়ে ভিতরে দার্শনিক ক্রোচের স্বাবলম্বী শিল্পের বাণী– "শিল্পের খাতিরে শিল্প"... এই বহু পুরাতন অর্থহীন বাণীটি বেরিয়ে পড়বে।' প্রসঙ্গত 'অর্থঘন শব্দ' 'অন্তশ্চন্দের গাম্ভীর্য'— 'অন্তঃপ্রবাহের সংহত গতির ধ্বনি' ইত্যাদি যে সব পরিচয়–শব্দ সহকারে বিনয় ঘোষ অরুণকুমার মিত্রের কবিতাকে আদর্শোপম বলে নির্ণয় করেছিলেন সেও কত দূর সরল প্রত্যক্ষ গণসাহিত্যের ভাষা ভেবে দেখতে হয়। বোধ হয় তার চেয়ে এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দৃষ্টান্তজনক সাম্যবাদী কবিরাও শিল্পের নির্বন্ধ প্রত্যাহার করতে পারেন নি, এই তথ্য।

১৯৩৮এ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' বেরিয়েছিল। ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'বর্তমান যুগের বিরাট বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল থেকে আমরা দূরে আছি।... নব নব বিপ্লবক্ষুব্ধ পরীক্ষার ও সৃষ্টিতৎপর দ্বন্দ্বপরায়ণ অধ্যবসায়ের নির্ঘোষ দূরের থেকে শুনে আমাদের মনে আকৃষ্ট হয়, তার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করবারও চেষ্টা করি... কিন্তু সমাজে বা রাষ্ট্রে সে আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয় নয়। এই জন্যে বিচিত্র বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের বাণীর প্রেরণা দুর্বল।'

১৯৪০এর পূর্বোক্ত ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ লেখেন: 'বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রেব মুমূর্ষু অবস্থায় পুবোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই... পুরোনো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ার আগে সে পৃথিবীকে গণশক্তিবলে ধ্বংস করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি' নিয়ে 'আধুনিক বাঙালি কবিবা যদি সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, জগতের মৌলিক পরিস্থিতির বহু পর্যায় থেকে অনুভূতি সংগ্রহ করে কবিলিপিতে প্রকাশ করতে পারেন, তা হলেই তাঁদের চেষ্টা সার্থক হবে। বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জন যে তাঁদেব উদ্দেশ্য হতে পাবে না, তা তাঁরা বুঝেছেন।' এ সত্ত্বেও হীরেন্দ্রনাথ শুদ্ধ কবিতাকে একেবারে অমান্য করতে পারেন নি, বুদ্ধদেব বসু 'এবং পাঠকসমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কয়েকজন কবিও এখনও এমন আত্ম–অচেতন খেয়ালি কবিতা লিখতে পারছেন যাকে সমাজবুদ্ধ আধুনিক মনও অস্বীকার কবতে পারে না', আর সে কারণেই তাঁর মনে হয়েছে, 'নিষ্কপট ভাববিলাসকে অশ্রদ্ধেয বলার লোভ সম্বরণ কবাই উচিত।' এই অল্প পরিচিত কয়েকজনের মধ্যে কি উহ্য আছেন জীবনানন্দ দাশ? দুই ভূমিকাতেই অনুল্লেখ থাকলেও সংকলনে তাঁর চারটি কবিতা: 'পাখিরা' 'শকুন', 'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জন হাত' অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রথম দুটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'ব, পরের দুটি তখনও অগ্রন্থিত ১৯৩৫–৩৬এর 'কবিতা' পত্রিকার কবিতা।

'কবিতা'র এই আদ্য দু বছরেব বারোটি কবিতা নিয়ে'বনলতা সেন' প্রকাশিত হলে (পৌষ ১৩৪৯) পরের সংখ্যা 'কবিতা'তেই (চৈত্র ১৩৪৯) বুদ্ধদেব তার আলোচনা কবে লেখেন, 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সব চেয়ে নির্জন, সব চেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেল দশ বছরে যে–সব আন্দোলনের ভাঙ্গা–গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেন নি।' আরো দশ বছব পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হলে (শ্রাবণ ১৩৫৯) প্রায় তখনই নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচনে সে বই ১৩৫৯এর শ্রেষ্ঠ কাব্য রূপে পুরস্কৃত হয়।১৯৫১ জুন মাসে অন্নদাশঙ্কর বায তাঁকে আখ্যা দেন 'শুদ্ধতম কবি'। পুরস্কারের আগে ১৩৫৯এব শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায পাঁচ বছরের কবিতার বিবরণ দিতে গিযে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিপরীত করে বলেন এই শুদ্ধতারই কথা: 'প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত, আকার থেকে নিরাকারে জীবনানন্দের যাত্রা। সময়ের কণ্ঠরোধ কবে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্রা।' পুরস্কৃত হলে পরে লেখেন, "খাঁটি রসবোদ্ধা"দের এই স্বীকৃতি ও সম্মানকে কি আমরা জীবনবিদ্বেষ ও শূন্য–সাধনার গুরুদক্ষিণা বলেই মনে করব? তাব কারণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'আসমুদ্রহিমাচল সংগ্রামের আগুনে যখন জাতীয় মুক্তি এক বিশাল অর্থ পায়, জনতা দাবি করে সমৃদ্ধ জীবন, ইতিহাসের সেই শৃঙ্খল মুক্তির যুগপর্বে সময়ের সম্মুখগতিকে ছোটো ছোটো আবর্তে বেঁধে ঘুরে ঘুরে একই সুরে কথা বলেন "বনলতা সেনে"র কবি। সময়হীনতার শাদা কাপড় দিয়ে সময়ের আপাদমস্তক তিনি ঢেকে দেন। কালের কাছ থেকে হবণ করে নেন গতি। মানুষের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষে, পৃথিবীর প্রতি উদ্ধত অবজ্ঞায় তিনি পলায়ন করেন প্রকৃতির নির্জন বানপ্রস্থে... ('নির্জনতম কবি'। পরিচয়,

শ্রাবণ ১৩৬০)। তাঁর মৃত্যুর পরেও বুদ্ধদেব বসু লেখেন, 'তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি এই কথাটার অত্যধিক পুনরুক্তিবশত ধার ক্ষয়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না।' ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৪র চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেবকে জানান, 'প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল বড়োই নতুন এবং নিজস্ব তাঁর লেখা: জর্মন কবি রিল্‌কের কথা মনে করিয়া দেয়...'। আলোক সরকার লেখেন, 'বস্তুত ব্যক্তিগত বোধ এবং বিশ্বাস জীবনানন্দর কবিতার মৌল প্রেরণা'। ১৯৫৫য় জীবনান্তিক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পরেও মণীন্দ্র রায় এ কথাই লেখেন, অভিযোগ ক্রমে। কবিতা যে ব্যক্তিমনের মন্ত্রগুপ্তি নয়, কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বক্তব্যকে কাব্যরূপ দেওয়ার দক্ষতায় নিহিত, জীবনানন্দ তা বোঝেন নি। 'বনলতা সেন', তারপর 'মহাপৃথিবী' পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় প্রবল কবিত্বশক্তিকে কোনো মূল বিশ্বাসে গ্রথিত করার তাঁর অক্ষমতা। এমন কি চল্লিশের যুগে, অবশেষে 'সচেতন হয়ে' যখন আত্মকেন্দ্রিক কবিতার দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসে আত্মনিয়োগ করেছেন উজ্জ্বল বক্তব্যের রচনায় তারও কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দার্শনিক ভিত্তি নেই।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জানতে পাওয়া জীবনানন্দের 'বাস্তবভিত্তিক রোম্যান্টিকতা' তা হলে কোন্‌খানে? 'নিরুক্তে'র চার বছরের লেখার হিসেব নিতে গেলে দেখা যায় সেখানে মুখট হয়ে আছে বটে অব্যবহিত সময় সমাজ শহর রাজনীতি। ভিড়, ভিখিরি, ফাটকা বাজার, দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান— তারপর পথে পথে গ্যাসলাইট, অনেক নির্জন রিক্‌শা তারপর এক্‌স্‌টেনশন লেকচারের আলো, কমিটি মিটিং, পাওয়ার ও পার্টি পোলিক্‌স্' আমাদের কবি ও বুদ্ধিজীবীরা, ভবেনের চায়ের দোকানে উত্তেজিত আলোচনা— তারপর বিশ্বরাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত-এই সমস্ত আলম্বন হয়ে উঠেছে কবিতাতে। মনে হয় 'মহাপৃথিবী'র প্রসর শেষ হয়ে এসেছে তবে লোকপৃথিবী। ভিড় চারি দিকে। কিন্তু শহরের সব পাড়া ঘোরা ভিখিরিরাও এসে দেখছে, হ্যারিসন রোডের 'ভিড়ের ভিতরে আরো গভীর অসুখ'—বিলোল অজাগর ভিড় নয়, 'অজস্র গলির পথে একটি মানুষ/ যুগপৎ রয়েছে দাঁড়ায়ে'—ব্যক্তিহারা জনতা নয়,সমূহের ব্যক্তি সত্তা,তার অসহায়তা: 'আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী'। ভিখিরি: সেও শ্রেণী মাত্র নয়, তিনজন আইবুড়ো ভিখিরির সোঁদা ফুটপাথে তিন মগ চা নিয়ে বসে রাজা-উজির কপচানো লঘু মুহূর্ত। তামাসার সুর বাজা লেখা। কবি দেখছেন ইতিহাসের একটা ক্রান্তি, যেন মানুষের বংশ এসে সময়ের একটা কিনারে হঠাৎ থেমে গেছে—স্বাভাবিক ইতিহাসগতিতে নয়, 'শোচনীয় কালের বিপাকে'। অনুবর্ত'ময় কাল সহসা খিঁচড়ে উঠেছে 'অন্য কোনো জ্যামিতি-রেখায়': 'অন্য কোনো মত-বিপ্লবে।' খিঁচড়ে ওঠা'র অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে সময়—মুখভাব, তাদেরও ছায়া—সেই মাঠে-ময়দানে কথা ব'লে যারা আজ জীবনের বিষ ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় (বিষ ঝাড়ে যারা বিষবৈদ্য, ওঝা), যারা এখনও প্রাণের হিতাহিত না জেনে এগিয়ে যেতে চেয়ে তবু পিছু হটে গিয়ে হেসে ওঠে গৌড়জনোচিত, যখন শ্রেয়সী সুচেতনারও পরিণাম কামপণ্য হয়ে

কখনও সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে নারীর রাং দেখে হো হো ক'রে হাসে।

করভোরু হয়েছে রাং, কবি দেখছেন 'আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে'- এমনই অবক্ষয় স্খলায়ন দেশমানুষের। আবার তারই পাশে 'চৈত্য ক্রুশ নাইন্‌টি থ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি প্রতিশ্রুতি/ যুগান্তের ইতিহাস'—আচ্ছন্ন সময়ের মধ্যেও চালচিত্রের আঁচটুকু টের পান তিনি। তাইতেই সন্দেহ হয়: চারি দিকে উনিশশো বেয়াল্লিশ বলে মনে হয়/ তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল?' 'প্রাগৈতিহাসিক লাঙলের ফাল আর পোযাটাক মাইলের মতন জগৎ'—তার স্মৃতি, 'কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে'—তার প্রতিশ্রুতি অনুভব করেন কবি,এখনও 'কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে/ সে আর সপ্তমী তিথি: চাঁদ।'

যেন সময় আর আবহমানের বিনিময়—এই হল জীবনানন্দের 'বাস্তবভিত্তিক রোম্যান্টিকতা', মনে হয়। 'নিরুক্ত', আষাঢ় ১৩৫০এর বিস্তৃত সমীক্ষায় সঞ্জয় ভট্টচার্য লক্ষ্য করেছিলেন এই দ্বিধা, প্রকৃতিগত সহজ জীবন আর বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ জীবনের দোটানায় অস্থির হয়ে আছেন কবি, আর 'এই সঙ্কট তাঁর মনকে, ভাষাকে অনবরতই জটিল করে তুলছে।' তারপর আষাঢ় ১৩৫১ নিরুক্তে'র অন্ত্য সংখ্যায় তিনিই লিখছেন, 'আবেগের বর্ণনায় জীবনানন্দ দাশ আধুনিক যুগের জনসাধারণের হৃদয়ের স্তর ছুঁয়ে গেছেন', তাঁর কবিতার ভাষা গদ্যের আটপৌরে ভাষার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছে... জনসাধারণের

মনকে ছুঁয়ে যেতে।' চৈত্র ১৩৫০ 'নিরুক্ত'য় জীবনানন্দের শেষ লেখা এবং আশ্বিন ১৩৫০ 'পূর্বাশা' নবপর্যায়ে প্রথম লেখার দুটি অংশ উদ্‌ধৃত করি:

অগণন অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান, সার্চলাইট ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখা যায়।
বুদ্ধ খৃষ্ট, এঞ্জেলোর মোম
মহৎ বস্তুর মতো, নিভে, তবু ব্যাপ্ত হয়ে আছে—সব জেনে, আধো জেনে-
চুংকিং,কলকাতা,দিল্লী, মস্কৌ, রোম
অধিক প্রাণের দিকে চলে যায়— নিপট, কপট, শঠ, কর্মী মর্মগ্রাহী
মানব নিঃশেষ হবে জেনে তবু ভালো
মানবিক কলরবে অন্নপূর্ণ মরীচিকা খোঁজ ক'রে চলেছে- চলেছে-
'শ্রুতি স্মৃতি'। অগ্রন্থিত।

যারা বড়ো, মহীয়ান— কোনো এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হয়ে চলে গেছে;
এক দিন নচিকেতা বলে মনে হত তাহাদের;
এক দিন আত্তিলার মতো তবু;
আজ তারা জনতার মতো
'অনুসূর্যের গান'। সাতটি তারার তিমির।

বড়ো, মহীয়ান এক দিন যারা ছিল প্রবুদ্ধ বা সমরনায়ক আর কাজ জনতার মতো, মানবিক কলরবে যারা চলেছে অন্নপূর্ণা মরীচিকার খোঁজ করে তাদের লক্ষ্য, পথ, পরিচয় যতই সহজ প্রত্যক্ষ হোক, তাদের কবিতাও কি তেমন? আর এই কবিতা জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'নিরুক্ত'র আগে থেকেই, 'পরিচয়'এ, ১৯৩৮এ 'চতুরঙ্গ' বেরোতে শুরু হলে সেখানেও। 'কবিতা' আশ্বিন ১৩৫৩র বিশ্রুত সম্পাদকীয় লেখায় বুদ্ধদেব ক্ষোভ করে লিখেছিলেন, 'জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল?' আমাদের এই নির্জনতম স্বভাবের কবি, 'প্রকৃতির কবি তিনি, তা ছাড়া কিছুই নন—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই... কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট কুখ্যাত আইভরি টাওয়ারের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেই জন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত ক'রে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন যে তিনি "পেছিয়ে" পড়েন নি। করুণ দৃশ্য,এবং শোচনীয়।... হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। মনের অচেতনে তাঁর এই কথাই কাজ করছে যে আমি যদি এখনও মাকড়শার জাল, ঘাস আর শিশিরের কথা লিখি, তবে আর কি তার পাঠক জুটবে? তবু কবিতার মাঝে-মাঝে রোম-বার্লিন দেখলে লোকে এ কথা অন্তত ভাববে যে লোকটা নিতান্তই মরে যায় নি।'

পরের মাসে, পূর্বাশাতেই (কার্তিক ১৩৫৩) 'কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লেখেন, 'মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয় কেন না 'কবিজগতে নতুন করে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় ইহজগৎ'— নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে ফলিয়ে দেখতে চায় কবিজগৎ, যেখানে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না। মাঘ ১৩৫০এর 'কেন লিখি' লেখাতে 'কবিতার ভাষা ও অর্থে কোনো দিব্য ইঙ্গিত বা দিব্যতার স্পর্শ থাকবে না', জীবনানন্দ ভাবতে পারেন নি। তারও চেয়ে জরুরি বিবেচনা করেছেন, সচেতন জীবনস্পর্শী মনের সঙ্গে কবিতার নিজের চরিত্রবলের, যাকে বলে ভাবনাপ্রতিভা— তার সংযোগ। ১৩৫১র অপর একটি লেখায় আমাদের আগামীকালের কবিতা 'একটা সুরসাম্য এবং ভাষার প্রসাদ লাভ করতে পারবে' বলে তিনি আশা করেছেন, 'যার অভাবে আধুনিক অনেক কবিতা ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে।' তার চেয়েও বড়ো বলে মেনেছেন, যে সময়ে, যে সমাজে সে আছে এবং যেখানে সে নেই দুয়ের সেই সামবায়িক পটভূমির কাছে কবির ঋণের কথা। ১৩৫২র 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে বলেছেন, স্মরণীয় অবিস্মরণীয় কবিতার এই দু ভাগের কথা : 'যা স্মরণীয় তা সব সময়ে মনে নাও থাকতে পারে, যা স্মরণীয় তা থেকে যায়।' অবিস্মরণীয় কোন্ গুণে হয়? নিশ্চয় 'লোকসমাজে সাধারণ স্পষ্ট কথায়' মাত্র নয়, যাতে 'একজন আধুনিক কবির "উটপাখি" ও অপর একজনের "নাগরিক পড়ে মনে হয়... প্রথমটিতে পাওয়া যাবে স্মরণীয়তর বাণী এবং দ্বিতীয় কবিতার লাইন কটি স্মরণযোগ্য বাক্যের

সমষ্টিমাত্র... সাংবাদিকতার দেয়াল টপকে গেছে' কেবল, তার বেশি নয়। কিন্তু তার পরেও দীর্ঘতম সময়ানুভূতির ভিতরে' কবিতাকে সাময়িকতার সংস্কার মুক্ত করে নেওয়ার ব্যাপারটুকু থাকে। কার্তিক ১৩৫৩ 'পূর্বাশা'র জবানবন্দিটিতেও 'কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে'ই কবিতা পাঠকমনের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে বলে প্রত্যয় আছে। কিন্তু প্রকৃতি সমাজ ও সময়-অনুধ্যান এই তিনের রসায়নে রচিত হয়ে উঠছে সে কবিতাটি। প্রসঙ্গত বিষ্ণু দে সমব সেনের মতো পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের ধ্বংসে সংকল্পিত বস্তুবাদী সাম্যবাদী কবিও যে এলিয়টের পক্ষাবলম্বনের জন্য কৈফিয়ত দিয়েছেন (সমর সেন বলেছেন 'অডেন প্রমুখ সাম্যবাদী কবিরা এলিয়টের প্রভাব এবং ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে কখনও কার্পণ্য করেন নি', আর বিষ্ণু দে বলেছেন objective correlativeএর অহংমুক্তির, বস্তুমুখী দৃষ্টির প্রবর্তনার কথা) সেও সূক্ষ্ম তির্যক রচনাপ্রবণতার বশে, কেবল সভ্যতার জলিটলতা-বৈচিত্র্যের ফল বলে নয় (দ্র এলিয়ট: *The Metaphysical Poets* ১৯২১), কবিতার ওই ভাবনাপ্রতিভাগত স্বভাবলক্ষণের কারণেই। যত বড়ো গণতন্ত্রী আগামীপন্থী হোন, জনসভা-ভাষণের বাইরে, জনসাধারণের ভাষা ব্যবহারের সহজ স্বচ্ছতারও বাইরে রয়েছে যে কবিতার অস্বচ্ছ ভাষাবলয়, কবির পক্ষে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। জীবনানন্দ অবশ্য অদ্ব্যর্থেই সামাজিক কুশল ভাবনার উপরে রেখেছেন আপন 'ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর' দেওয়ার, বা সে সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অনুভবের কথা। যত পুরো করে ভালো করেই বলতে চাওয়া যাক, অনুভবসামগ্রীর অনিবদ্ধতা অনির্দিষ্টতাবশেও তার প্রকাশে ভাঁজ পড়ে, দুর্বোধ্যতা জমে ওঠে, অবিস্মরণীয়তারও সূচনা হয়।

১০

১৯৩৯ অগস্টে নাট্‌সি সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি হলে পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশসমূহে পপ্যুলার ফ্রন্ট সাময়িকভাবে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্রিয় হন। ১৯৩৯এই এখানে অগ্রণী বুক ক্লাব প্রকাশিত প্রথম বই বেরোয় আবদুল হালিমের 'বলশেভিকবাদের ইতিহাস'। ১৯৪০এ মরিস হিন্ডাস অঁদ্রে জীদ আরো নানা প্রত্যক্ষদর্শীর কথা জুড়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিয়েতের নতুন বিকাশ নিয়ে লেখেন তাঁর কথকতাব পাঠ: 'বিশ্বমানবেব লক্ষ্মীলাভ'। সেখানে দেখি জীদ তাঁব প্রসন্নতার পর্বে সেখানকাব কবিভাইদেরও শ্রমিকদেব দলেই ধরেছিলেন, তাদের দলে মিশেও 'তাঁর অন্তরে অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ উঠেছে।'

১৯৩১এব জুলাই মাসে স্পেণ্ডর ও ফর্স্টরের দুখানি চটি বই পড়ে অর্থনীতি ধর্মনীতির দলাদলি দিয়ে 'সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে' গড়ে তোলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অমত প্রকাশ করেছিলেন: 'মার্কসিজ্‌মের ছোঁয়াচ যদি কারও কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত রেখে লাগে তা হলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তা হলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়?' ১৯৪০এর অগস্টে হীরেন্দ্রনাথ-আইয়ুবের 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংগ্রহেব প্রাপ্তি জানিয়ে লেখেন, 'তার অনেক কবিতাই আমাদের কালেব হাট থেকে এসেছে', আবার 'অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কালশিল্পী বিকৃতিকে নতুনত্ব বলে স্পর্ধা করেছে।' রবীন্দ্রনাথ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কালের বড়ো কেউ নেই এ সংগ্রহে, আর বিকৃতি নিশ্চয় আঙ্গিকের। ১৯৪০এ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তরফে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ক্রান্তি' সংকলনে নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী 'সাহিত্যে সৌন্দর্যবাদ' বলে যে নতুন সৌন্দর্যবাদের ঘোষণা করলেন সে আঙ্গিকের নতুনত্ব নয়, তিনি লিখলেন, 'আমরা এমন সাহিত্য চাই যা আমাদের হাতুড়ি পিটিয়ে মানুষ করতে পারে।' ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪০এ ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অ্যাসেম্বলি হলে বুদ্ধদেব বসুর সভানেতৃত্বে বার্ষিক প্রীতি সম্মিলনী হল ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের।

১৯৪১এ হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে সোভিযেত সুহৃৎ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয কলকাতায়, অচিরেই সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সোভিযেত দেশ', তাতে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গোপাল হালদাব বিনয় ঘোষ মন্মথ সান্যাল বিষ্ণু দে প্রমুখ লেখক 'সোভিয়েত সম্বন্ধে যথাযথ তথ্যে'র সংকলন করে দেন। ১৯৪১এ শরতে বেরোয় 'অরণি' পত্রিকা, মাত্র দেড় বছর চ'লে 'অগ্রণী' বন্ধ হযে যাবার পর 'অরণি'ই হযে ওঠে প্রধান বামপন্থী লেখকদের মুখপত্র। ইতিমধ্যে বীরেন দাস লেখেন সাধারণের পাঠ্য একখানি 'যোসেফ স্তালিন' জীবনী। ভাদ্র ১৩৪৯ সংখ্যা 'পরিচয়'এ নীরেন্দ্রনাথ রায় বিলিতি একখানি স্টালিন জীবনীর সূত্রে পশ্চিম দেশে স্টালিনের কার্যক্রিয়ার

অপব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। ৮ই মার্চ ১৯৪২এ তরুণ লেখক ও কমিউনিস্ট কর্মী সোমেন চন্দ নিহত হন ঢাকায়, সে সংবাদ দিয়ে 'পরিচয়' লেখেন, সে 'মার্কস্‌বাদের প্রেরণাতেই ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ দিতে হল এই বর্বরতাই যুপকাষ্ঠে।' তার সে হত্যারই সূত্র ধরে ২৮শে মার্চ 'ফ্যাশেস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র পত্তন হয় কলকাতা ২৪৯ নম্বর বহুবাজার স্ট্রিটে। সোমেনের মৃত্যুতে দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন 'প্রাচীর' নামে কবিতাসংগ্রহ উৎসর্গ করেন তাঁর নামে, বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন কবিদের মধ্যে। ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ বুদ্ধদেব বসুর 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজ্‌ম', বিষ্ণু দে'র '২২শে জুন' কবিতাপুস্তিকা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত একসূত্রে কবিতা সংগ্রহ, সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' এবং অতঃপর জানুয়ারি ১৯৪৪এ বের করেন হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেন লিখি' নামে 'বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দী'।

বুদ্ধদেব বসুর পুস্তিকাটি সম্বন্ধে 'পরিচয়' মন্তব্য করেন, 'সব চেয়ে যা আশ্বাস ও আনন্দের বিষয় তা হচ্ছে এই যে যুগধর্মের খাতিরে বুদ্ধদেববাবুর মানবপ্রেমও শেষ পর্যন্ত বিগত যুগের আকৃতিহীন আবেগের গন্তব্যহীনতা এড়িয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হয় নি।' 'কেন লিখি' সংগ্রহে বিষ্ণু দে লেখেন, 'লেখকদের বাধা অনেক, তারা নিছক বিশেষজ্ঞ শ্রমিক নয়, চৈতন্য বা মন নিয়ে তাদের কারবার যেখানে অনেক কিছু ধরাছোঁয়ার বাইরে।... তবু বিশ্বব্যাপী জাতীয় বিপদের মুখে তো আমাদের সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। এই সঙ্ঘই যে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন হবে না, কেন মানব? একমাত্র যে রাজনীতিক পার্টি লেখক শিল্পী সম্বন্ধে অবহিত তার সহায়ে আমাদের নিশ্চয়ই সঙ্ঘবদ্ধ প্রগতি সম্ভব।' ১৯৪৪এই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'পরিচয়ে'র মালিকানা হস্তান্তর করে দেন মার্কস্‌বাদী বন্ধুদের হাতে। তাঁর লেখাও কমে আসে। বুদ্ধদেব প্রমুখ শুদ্ধতাবাদীরা ফ্যাসি-বিরোধিতা থেকে সরে আসেন। ১৯৪৪এ গণনাট্য শাখার 'জবানবন্দী' নাটক দেখে ধূর্জটিপ্রসাদ লেখেন, 'আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে socialist realism এত দিন আমার কাছে ধরতাই বুলি ছিল, আজ আর নেই।'

'কেন লিখি' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, নিশ্চয় কবির 'কাছ থেকে জীবনের উন্নতিশীল ভাঙাগড়ার কাজে শুভ ও সার্থক আত্মনিয়োগ দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কবিতা ও শিল্প সৃষ্টির ভিতরেই তিনি ঢের বেশি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়।' পাশাপাশি আরেক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'কবিতাটি যাতে সার্থক হয় সেই দিকেই কবির দৃষ্টি', তিনি চান 'মাত্রাচেতনা'য় পৌছতে- জীবনে ও কবিতায়। কবিতা পড়ে লোকের মূল্যচেতনা বাড়ে, কবি 'সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে চান 'নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায়- এ দায়িত্ব কবির!' কিন্তু নগরে বাজারে লোকসমাজে সাধারণ স্পষ্ট কথায় কথায় মাত্র- এ দায়িত্ব পূর্ণ করতে গেলে তাকে ব্যাহত হতে হবে। কারণ সে সাংবাদিক নয়, আর্থ রাজনীতিক ও নয়।' (দ্র. 'মাত্রাচেতনা' ১৯৪৪ কবিতার কথায় সংকলিত)। তবু যে কবিতা জীবনানন্দ লিখেছেন এ সময়ে, আসন্ন বইয়ে গ্রথিত হবে বলে তাব কোনো কোনো লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। আবহমানের পুরোভাগে সেখানে সময় সমাজ সভ্যতার সংকট, কেবল তাই নয়, এ লেখায় অহং নেই, বরং আছে ' ভোট দিয়ে মিশে যাওয়া জনমতামতে'— কোলাহলে ভিড়ে গেছে যে জনসাধাবণ, 'মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃ পতনের সীমা' পার হয়ে যে 'জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে', কবি নিজেকে বোধ করছেন সেই ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ'— হয়তো অজস্র গলির পথে যুগপৎ দাঁড়িয়ে থাকা একটি মানুষের মতো। বরিশাল কলেজের এক প্রগতিশীল ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন?' বলে সে বলতে লাগল, 'আমরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে বাদলাতে চাই, কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজব্যবস্থা মার্কসবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে...'। কথায় মাঝখানে জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার্ল মার্কস পড়েছ?' তারপর 'অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন জীবনানন্দ।' ১৯৪৬এ 'ধানক্ষেত' এর কবির একটি লাইন সূত্রে জীবনানন্দের আশাবাদী মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের যে অভিযোগ করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তার প্রতিবাদে লাইনটি পুনরুল্লেখ করে জীবনানন্দ লেখেনঃ 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়'- বালভাষিত, কিন্তু কবিতা নয়; শস্য প্রচুর হলেই যে 'মরণের ভয়' কেটে যায় না আজকের এই জটিল শতাব্দীতে শিশুকে এ কথা বোঝাবে? নীরেনবাবু হয়তো মনে করেন এ রকম কতকগুলো লাইন লিখতে পারলেই কবিতা হয়, আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আত্মঘাতী ক্লান্তির থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও উদয় হয়।

কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি এত সোজা নয়।' এরকম আশাবাদ ব্যক্ত না করেও তিনি লিখেছেন:

তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে; তৃতীয়, চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

সুধীন্দ্রনাথের মতো নিরীশ্বর, নিরাশাকরোজ্জ্বল' নন তিনি। পরম বিপ্লব বলে যাকে স্থির করা হয়েছিল, তত দূর তাকে আস্থা করতে না পেরেও (১৯৩৭এই সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন , 'আমার জানতে বাকি নেই যে সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্যায়ে'), তাকে 'আকাশকুসুম' জ্ঞান করেও ('আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হল; আকমকুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে') অনুভব করতে পেরেছেন

নচিকেতা জরাথুষ্ট্র লাওৎ'-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
পুনরপি
রাত
এখনও রাতের স্রোতে মিশে থেকে মাঝে মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যেল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায়...

সিগনেট পেস ইংরেজিতে আধুনিক বাংলা কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করার উদ্যোগ করলে তার সম্পাদকের কাছে লেখা ১৯৪২-১৯৪৪এর কখানি চিঠিতে দেখা যায় আগের কবিতা-সংস্কার নিয়েও তাঁর ব্যক্ত অস্বস্তি— 'বনলতা সেন' ইত্যাদি আগের কবিতাগুলি তাঁর 'representative' নয়, তাঁর 'কাব্যজীবনের এক বিলুপ্ত পর্যায়ের', আবেদন করেছেন, 'তাঁদের পছন্দমতো আমার আধুনিকতর সমাজচেতন কয়েকটি কবিতাব' যেন সংস্থান হয় বইয়ে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং প্রধানত মার্টিন কার্কম্যান অনুবাদিত Modern Bengali Poems ডিসেম্বর ১৯৪৫এ প্রকাশিত হয়। বইয়ে পৃ ১৯-২৩ এ জীবনানন্দের 'আমি যদি হতাম', 'হায়, চিল', 'বনলতা সেন' এবং 'মনোবীজ' কবিতার কার্কম্যান কৃত অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়। জীবনানন্দ লেখেন, 'আমার "বনলতা সেনে"র পরের কাব্যপ্রকৃতির কোনোই পরিচয় নেই এই সংকলনের ভিতর।'

১৯৪৫এর এক পত্রে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'আজও আমি লিরিক কবি... কিন্তু তবুও সময় প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনেব সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।' ১৯৪৬এব পত্রে লেখেন, "নিরুক্ত" ও "পূর্বাশা"র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার শেষের দিকেব কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে। সমাজ ও সাম্প্রতে বিজড়িত হয়েও কবিতাকে অবশ্য যৌথ সমাজকৃত্য বলে তিনি গ্রহণ করেন নি। ১৯৪০এব কবিতাসংগ্রহে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সকলে মিলে যখন গান করেছে, নৃত্য কবেছে, উৎসব করেছে তখনই কবিতার সৃষ্টি—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নয়, সহযোগিতার ক্ষেত্রে। ১৯৪৪এ জীবনানন্দ লেখেন, 'কবিতা তার নিজেকে—ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তি সত্তাকে প্রকাশ করবার একটা দিক—মহৎ দিক।... আদিম মানুষ যেদিন নিজেকে বোঝাবার তাগিদ বোধ করেছিল সেই অস্পষ্টতার সময় থেকে...'। 'অজস্র গলির মুখে যুগপৎ একটি মানুষ' কিংবা 'ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ' কিংবা তাঁব যাবতীয় সংবৃত ও দ্যোতনাময় সমাজালেখ্য—সবই বোধ করি এই ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তির সামবাযিক আত্মোপলব্ধি।

১৯৪৩এর 'লণ্ডম্যান্‌স্ মিসিলেনি'র প্রবন্ধে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন বাংলার চিন্তাজগৎ অভূতপূর্বভাবে জড়িয়ে গেছে ইংলণ্ড তথা ইয়োরোপের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে এবং 'art and literature today are as global as peace and war.' আরো বলেন, চল্লিশের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতা প্রবেশ করেছে কমিউনিজ্‌ম বা near—কমিউনিজ্‌ম অধ্যায়ে, 'leftism has become the literary fashion of the day' এবং সর্বোপরি: 'an event of no little importance to the contemporary poerty of Bengal is the recent emergence of Bishnu De as a Communist poet'. ১৯৪০এর ভূমিকা প্রবন্ধে আইয়ুব বিষ্ণু দে-র এই emergenceএর কথা

বলেন নি, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কেবল আশা করেছেন তাঁর উপরে। ১৯৪২এর শেষে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত তাঁর কবিতাপুস্তিকা পড়ে মণীন্দ্র রায় লেখেন, 'ইতিমধ্যে কালধর্মের খর দাহে তাঁর মানসে—পৃথিবীর আদিম নীহারিকাময় রূপহীনতা সংহত হয়ে প্রাণের সহজ বিশ্বাসে সবুজ হিল্লোলে ভরা একটি মাটির ধরণীর আবির্ভাব ঘটেছে... বলিষ্ঠ বিশ্বাসের অস্থিতে কবিতা যেন রক্তমাংসের প্রতিমার মতো মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।' 'অরণি' ১৬ই মার্চ ১৯৪৫ সংখ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে স্বয়ং আরো প্রত্যক্ষভাবে লেখেন, 'কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়। কাব্য সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য।' তারও পর তিনি লিখছেন, চোখে পড়ে: 'বিষয়ের বা বস্তুসত্তার অনুরাগে অন্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি আসে, যাতে জীবনের বহু-ব্যাপ্তি সমগ্রতার আভাস পায়, যাতে শিল্পরূপ ও শিল্পবস্তু একটি সক্রিয়তার দুটি দিক বলে বুঝি। ইংরেজি সাহিত্যে, এলিয়ট প্রায় পেয়েছিলেন এই বিষয়সমাধি কিন্তু তাঁব আশ্চর্য পরিণতি তির্যক হয়ে রইল বর্তমানে অবাস্তব এক ধর্মসমাজঘটিত দর্শনের হস্তক্ষেপে'। এলিযটের 'ফাঁপা মানুষ' অনুবাদ দিয়ে বিষ্ণু দে প্রগতি সঙ্ঘের প্রবেশ করেছিলেন, 'বিষ্ণু দে অনূদিত এলিযটেব কবিতা' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেতে এব পর আরো প্রায় এক দশক সময় লেগে গেল।

দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষে রাশিযা অতিশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা পাবার পর ভাবচর্চার ক্ষেত্রেও যুদ্ধ সময়েব শিথিলতা পরিহার করে স্টালিন কঠোরতর নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিরিশ দশকের গোড়া থেকে দানা বেঁধে ওঠা মার্কসিজ্‌ম-লেনিনিজ্‌মের এখন থেকেই পূর্ণাযতি পর্ব, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অবিচলিত পার্টি লাইনের অধ্যায, 'স্বাশ্রয়ী শিল্পে'র কঠোর বিবোধী আন্দ্রেই ঝ্দানভ দাযিত্ব নেন এর নিয়মনিয়ন্ত্রণের। এর পর সোভিযেত লেখকশিল্পী রাষ্ট্র ও পার্টির লেখকশিল্পী, পার্টির নিযত সাহায্য নির্দেশ এবং কমরেড স্টালিনের ক্ষান্তিহীন সমর্থন লাভ করে আগামী সমাজের লক্ষ্যে আশাবাদী লেখা লিখতে আর বিচ্যুত হবে না, বিচ্যুত হওযাব ফলে অগস্ট ১৯৪৬এ কবি আনা আখ্‌মাতোভা এবং রসসাহিত্যিক জশ্‌চেঙ্কো দণ্ডিত হন, ফাদেইযেভ নির্দেশ অনুসাবে লেখা সংস্কার কবে নিতে স্বীকার করেন। ১৯৪৭ জুনে জি. এফ. আলেকজান্দ্রভ তাঁর 'ইযোরোপীয দর্শনের ইতিহাস'এ প্রগতিবাদী মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট দর্শনের বিজযসংগ্রামের স্থলে অপক্ষপাতে বুর্জোয়া দার্শনিকদের ধাবাবাহিক মতামত লিপিবদ্ধ কবার ভুলের জন্য আত্মসমালোচনা কবে পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্য পুনঃপ্রত্যযিত করেন। ঝ্দানভের ১৯৪৬এর লেনিনগ্রাদ বক্তৃতা সূত্রে ধনঞ্জয দাশ জানিয়েছেন, 'সোভিযেত লেখক জশ্‌চেঙ্কো ও মহিলা কবি আনা আখ্‌মাতোভাকে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে সোভিযেত সমাজজীবনকে বিকৃতভাবে পরিবেশনের জন্য দাযী করা হয, ইউবোপীয সাহিত্যের অবক্ষযী চিন্তা-ভাবনাব পরিপোষক রূপে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয এবং অবশেষে এই অপরাধেব জন্য তাঁবা সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘ থেকেও বিতাড়িত হন।... প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বৈঠকে ঝ্দানভ-এর বক্তৃতার যাথার্থই সকলে স্বীকার করে নেন।' এর পরে এখানে বিতর্ক বিস্তার হয় রজের গরোদি ও লুই আরাগ ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিব দুই লেখকের বিরোধী দুই সূত্র নিয়ে—গবোদি শিল্পের স্বাতন্ত্র্য, আবাগঁ পার্টি লাইনের পক্ষে। বিষ্ণু দে ইতিপূর্বে মাযাকভ্‌স্কির 'সিম্বলিস্ট' থেকে রিভলিউশ্যনারি এবং আরাগঁর সুররিযালজ্‌ম থেকে সোভিয়েতসঙ্গীত রচনাকে 'the only logical step forward' বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। এই বিতর্কের অধ্যায়ে তিনি পার্টি লাইন স্বীকার না করে সমর্থন করলেন গরোদিকে। অরুণ মিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বিষ্ণু দে-র পক্ষ নিলেন। প্রসঙ্গত ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি নিজ দেশকেই বিপ্লবের পীঠভূমি জ্ঞান করতেন, সোভিযেত অনুশাসনের বাইরে স্বতন্ত্রভাবেও তাঁরা মার্কসিজ্‌মের অনুশীলন করেছেন। ইয়েরোপের অন্যত্র দেশেও শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় দমনসঙ্কোচের প্রতিপক্ষতা দেখা গেছে আগাগোড়া তিবিশ দশকে। গ্রাম্‌সি, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বা আডোর্নোর কথা বলতে হয় এই সূত্রে। গ্রাম্‌সির *Prison Notebooks*এ মিশ্র হয়ে আছে শিল্প প্রসঙ্গ, তার যোগ্য অনুধান শুরু হয়েছে পরে। বেঞ্জামিনের বোদলের পাঠ বা *The Author as Producer*এ সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিস্ট ব্লকের শ্রেণীশাসিত শিল্পনিয়ম ভাঙার চেষ্টা আছে। আডোর্নো মুমূর্ষু পণ্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরাসরি পক্ষাবলম্বন করেছেন 'উচ্চ শিল্পে'র। এখন এঁরা এখানে সুপরিচিত নাম।

কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ থেকে এখানেও বামপন্থী লেখকদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ, ক্রমে দল—ভাঙাগড়া প্রকট হয়ে উঠল। পার্টি লাইন অথবা নিরপেক্ষ বামপন্থা, সমাজমনস্ক শিল্পনিয়ম অথবা

দলমত—বিরোধের মূল কারণ প্রধানত এই। ১৯৪৬এর গোড়ায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সমর সেনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ভাববাদী রাজনীতির অভিযোগ করে লিখলেন, 'তাঁর দৃষ্টি শোচনীয়ভাবে খণ্ডিত।' শারদীয় ১৩৫৪ 'পরিচয়'এ বিষ্ণু দে লিখলেন, 'নঞর্থক সমালোচনায় রুশ সাহিত্যের তুলনায় সবই নস্যাৎ করা সাহিত্য তথা রাজনীতি দু দিক দিয়েই ভুল।' সে লেখার প্রতিবাদ বেরোলে ফের তার উত্তরে লিখলেন ওই প্রতিবাদে আছে 'সংস্কৃতির লাল রাস্তা বানাবার' চেষ্টা। ১৩৫৪ ফাল্গুনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন বিষ্ণু দে-র 'অমার্কসীয়' এবং 'বিকৃত-মার্কসীয় দৃষ্টি'র কথা। এই ফাল্গুনেই বিষ্ণু দে 'পরিচয়ে'র সম্বন্ধ ত্যাগ করলেন। ১৯৪৮এ জুনে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় 'সাহিত্যপত্র' বেরোলে তার প্রথম সংখ্যাতেই বুদ্ধদেব বসুর An Acre of Green Grass বইয়ের আলোচনা উপলক্ষ্য করে লিখলেন ('রাজায় রাজায়', শ্রাবণ ১৩৫৫), 'কিছু কাল আগে অসামান্য কুশলী শিল্পী মানিক বন্দোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যে তাঁদের সঙ্গে যোগ না দিলে নাকি প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা অসম্ভব।' অসম্ভব যে নয়, বোধ কবি তারই প্রমাণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখলেন, 'দলীয়তা ও রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে তাঁর "শুদ্ধ সাহিত্যবাদ" ও যে কী রকম ভারাক্রান্ত, তার লক্ষণাভাস দেওয়া যে সাহিত্যিক কর্তব্য, সেই বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।' সে মাসের 'পূর্বাশা'য় নারাযণ গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখিছিলেন একই কথা ('ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যবোধ', শ্রাবণ ১৩৫৫), 'সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা, রাজনীতিক জলাতঙ্ক এবং নিরঞ্জন নির্ভেজাল শিল্পের নৈষ্ঠিক পূজারী বুদ্ধদেব এ সাহিত্যকে বুঝতে পাববেন না।' এর আগে তিনিই 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' প্রবন্ধে (নতুন সাহিত্য, বৈশাখ ১৩৫৫) লিখেছিলেন, 'প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আমরা... পা দিচ্ছি না তো অতিবিপ্লবের চোরবালিতে?' পরের সংখ্যায় মঙ্গলাচবণ তাতে লেখেন, 'নারায়ণবাবুর যা যুক্তি, তা উল্টো দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিবই পরিচাযক।'

বিষ্ণু দে 'পরিচয'এ তাঁর লেখার সমালোচনাকে 'বামপন্থী বিধর্মে ট্রট্স্কি মার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা' বলে অভিহিত করেছিলেন। 'মার্কস্‌বাদী' প্রথম সংকলনে (অক্টোবর ১৯৪৮) বিষ্ণু দে-র লেখাকেই পাল্টা চিহ্নিত করা হয ট্রট্স্কীয লক্ষণাক্রান্ত বলে। ১৯৪৮ জানুয়ারিতে সঙ্গীতরচযিতা মুদারোলি ও শস্তাকোভিচ তিরস্কৃত হয়েছিলেন সাঙ্গীতিক সত্য ও সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম্ থেকে দূরে সরে গিযে formalismএর ফাঁদে পা দেবার জন্য, সেই তথ্য সহকারে 'মার্কস্‌বাদী'র সমালোচক বিষ্ণু দে-র সদ্য প্রকাশিত 'গুওনিযা' কবিতা উদ্ধৃত করে লেখেন, ' এ কবিতার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তা নৈরাশ্য। পাছে জনসাধারণ বিষ্ণুবাবুর এ নাকী কান্না গ্রহণ করতে না পারে এই জন্য বিষ্ণুবাবু ফর্মের দেযাল তুলে আত্মরক্ষা করবার প্রযাস পেযেছেন। এই ফর্ম হচ্ছে জনতাকে কাব্য থেকে বঞ্চিত করে রাখার ফর্ম। এই ফর্ম অগণতান্ত্রিক।... বিষ্ণুবাবু প্রগতির জন্য যতই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুন না কেন "অগণতান্ত্রিক" ফর্মের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বক্তব্য উপস্থিত করা যায় না।' ফর্মের গণতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে বামপন্থী মহলেই ভিন্ন মতও ছিল। ১৯৪৮এর গোড়ায় 'নতুন সাহিত্য' নিযে বিতর্কে অনিলা গোস্বামী ছদ্মনামে নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী লিখেছিলেন, 'সাহিত্যালোচনার মাপকাঠিকে প্রগতিশীল করতে গিয়ে এমন একটি সঙ্কীর্ণ ছকে রূপান্তরিত করে ফেলা উচিত নয় যা অনুসরণ করতে গিযে... ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হযে যায়' (পরিচয, পৌষ ১৩৫৪)। ১৯৪৭ মে-র লেখাতে গোপাল হালদার আরো প্রত্যক্ষভাবে লিখেছিলেন, 'আমাদের যে সব শিল্প বা সাহিত্য আমরা কমিউনিস্টরা সৃষ্টি করছি তা প্রাযই নিষ্প্রাণ হয।... আমাদের কাজ হল শিল্পী ও সাহিত্যিককে তথ্য যোগানো; শিল্পী ও সাহিত্যিকই ভালো জানেন কী করে সে তথ্যকে রূপ দিতে হবে। তথ্যের তাগিতেই তাঁর মনে শিল্প রূপ গ্রহণ করবে শিল্পের নিয়মে' ('কালচার ও কমিউনিস্ট সাহিত্য', বাঙালী সংস্কৃতির রূপ ১৯৪৭)।

১৯৪৮এর গোড়া থেকে 'পরিচয'এ মার্কসীয নন্দনতত্ত্ব নিয়ে ধারাবাহিক একটা আলোচনা-বিতর্কের শুরু হয। আবু সযীদ আইয়ুবের 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল' প্রবন্ধে উত্থাপিত বিতর্কে যোগ দেন অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র শীতাংশু মৈত্র, পরে এ নিযে পৃথক্ প্রবন্ধ লেখেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। আইয়ুব তাঁর বিতর্কের সূচনা করেছিলেন ১৯৪০এর বাংলা কবিতা সংকলনের ভূমিকায়।১৯৪৩এর 'লণ্ডম্যান্‌স্ মিসিলেনি'তে ধূমাযিত করে তুলেছিলেন বিষয়টি: 'Can a contemporary poet with all the sophistication and scepticism that is not only in his brain but has gone deep into his blood, adopt a detailed, all embracing— far too all-embracing— sys-

tem of thought like Marxism, and make great poety out of it, as Dante did out of Thomist philosophy?' 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' প্রবন্ধে আইয়ুব ডিমিট্রিয়েফের ১৯২৫এর শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির হাতে গল্প-কবিতারূপ সংগ্রামের ধারালো অস্ত্র তুলে দেওয়ার আবেদন উদ্বৃত করে লেখেন: 'সত্য-শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বিকিরণই যখন সামাজিক উন্নতির আদর্শ, তখন রাষ্ট্রিক বিপ্লব বা আর্থনীতিক ব্যবস্থান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টায় ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়াকেই শিল্প-সাহিত্যের চরম সার্থকতা বলে নির্দেশ করা, non-Party লেখকদের ধ্বংস কামনা করা, ঘোষণা করা যে সাহিত্যকে সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ বিপ্লবী দলের অংশবিশেষ হতেই হবে—এ সব কি চরম উদ্দেশ্যকে উপস্থিত উপায়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলার মতো উলটোবুদ্ধির লক্ষণ নয়?'

আয়ুবের কথার উত্তরে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র লেখেন (মাঘ ১৩৫৪) 'বেশ বোঝা যাচ্ছে আইয়ুব সাহেবের যুক্তিমৃগয়ার আসল শিকার সোভিয়েত রাশিয়া...', সে ক্ষেত্রে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। সোভিয়েত রাশিয়ার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাই হল কাল্‌চারের অভাবনীয় অভিব্যক্তি প্রগতি ও ব্যাপ্তি।' শীতাংশু মৈত্র লেখেন (ফাল্গুন ১৩৫৪), সত্য-শিব-সুন্দরের ওই পরম ত্রয়ী কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে এই এত হাজার বছর ধরে মানুষের মনে জেঁকে বসে?... খেতে না পাওযার জন্যে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রভাবান্বিত দেশে—আমেরিকায় ইংলণ্ডে ধর্মঘট চলেছে; কই সোভিয়েতে তো নেই? নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর প্রবন্ধে লেখেন (বৈশাখ -আষাঢ় ১৩৫৫): 'ভবিষ্যতে বাংলা কবিতার ধারা কোন্ খাতে বহিবে সুকান্তের কবিতা তাহারই পূর্বাভাস, যেমন বলা যাইতে পারে বিহারীলালের কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের।'

'পরিচয়ে'র জবাবি প্রবন্ধে আইয়ুব লেখেন ('বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য', চৈত্র ১৩৫৪): মার্কস্‌পন্থীরা যখন বর্তমান সমাজকে ভেঙেচুরে এক নতুন সমাজের ভিৎ গড়তে চান তখন সে সমাজকে তাঁবা নিশ্চযই বর্তমান সমাজের চেয়ে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করেন। সামাজিক উৎকর্ষের প্রতিমান সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা কী? নিশ্চয়ই সেটা কেবল অর্থনৈতিক নয়। সাহিত্যের স্বাশ্রযী মূল্য কি তাতে স্বীকৃত হয়েছে? (মার্কস্‌বাদী সাহিত্য বিতর্কের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য লেখা ধনঞ্জয় দাশ তাঁব চাব খণ্ড বইযে সংকলন করে দিযেছেন।)

'পরিচয়ে'র পর আইযুব লেখেন 'সাহিত্যিকের সমাজচেতনা' (পূর্বাশা, পৌষ ১৩৫৬), 'সমকালীন সাহিত্যের পথ' (দেশ, ২রা পৌষ ১৩৫৬), দুই এক লেখা, তাতে লেখেন, 'মার্কস্‌বাদী সাহিত্য-আলোচনা সাহিত্য বিষযেব সীমানা প্রসারিত করেছে—এ কথা মানতেই হবে।' তবু 'সাম্যবাদী একনায়কত্ব সৎ উদ্দেশ্য সাধনের অসৎ উপায মাত্র।' আবো লেখেন, 'সাহিত্যিকের সমাজচেতনা যেন তাঁর "স্বদেশ" থেকে তাঁকে নির্বাসিত না করে।' 'স্বদেশ' ভৌগোলিক স্বদেশ, আবার সৌন্দর্যের, বা সত্য-শিব-সুন্দরের স্বদেশ।

'পূর্বাশা' পত্রিকাতেও এ সময়ে এই বিতর্কের একটু বিস্তাব দেখতে পাওয়া যায় এ বাবদে ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধদেব অমিয চক্রবর্তীর দিনেশ দাসেব প্রবন্ধে। ১৩৫৬য জীবনানন্দও পর পর পাঁচটি লেখা লেখেন 'পূর্বাশা'য, পবোক্ষে-অপারোক্ষে এই যার বিষয। তার শেষ লেখায আছে ('সত্য বিশ্বাস ও কবিতা', মাঘ ১৩৫৬):

'আজকাল "বিপ্লবমাতৃক: সোভিযেট একটা নতুন বিশ্বাসের সূর্যজ্বালায এত বেশি আলোকিত যে ঠিক সেই বলযের বাইরে আর সমস্ত সাহিত্যকেই দুর্বোধ্য সান্ধ্যভাষা মনে হয তার: "যদি হাযনারা আব নেকড়েরা কলম নিয়ে লিখতে পারত" মনে হয়। এ রকম অত্যুচ্ছ্বাসে বড়ো জোড় সুসাহিত্য দল বেঁধে তৈরি হলে পারে, কিন্তু বৃহৎ মহান্ সাহিত্য তৈরি হওযা কঠিন। নিজেদের প্রাণালী ও সিদ্ধান্তে সোভিয়েটের অতি বেশি জোব বিশ্বাসেব পালটা অবিশ্বাসেব অসীম ঝাঁঝ, আমার মনে হয পশ্চিম ইউরোপে এখনও দেখা দেয় নি। দেখা দেবে কি শিগগিরই?'

মনে হয় কডওয়েল র‍্যাল্‌ফ ফক্স হাওযার্ড ফাস্টের ইঙ্গমার্কিনি বলযের বাইরে অরুশীয় অবিশ্বাসীর নয়, অনুপন্থীর মার্কসীয় নন্দনচর্চা এখানে তখনও, ১৩৫০এর গোড়াতেও (গরোদি-আরাগঁ বিতর্ক সত্ত্বেও) অত প্রবেশ করে নি।

যেমন, গরোদিও বলেছিলেন, বাস্তবের কোনো সীমাবেখা নেই, প্রতিচিত্র বা representational ছবি আর রিয়ালিজম্ এক নয়, শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে রূপ নতুন রিযালিটির জন্ম দেয়। কিংবা, যেমন ওয়ান্টার বেঞ্জামিন—গ্যেটে বোদলের প্রুস্তের গুণমুগ্ধ, পুরাতনী আর শিশুসাহিত্যেব প্রিয়,

যন্ত্রগত শহরের একাকী বিচ্ছিন্ন কবিকে নির্ণয় করেন মার্কসীয় 'বিচ্ছিন্নতা' আর এঙ্গেল্সের শ্রমিক শ্রেণীর বিবরণ দিয়ে, প্রগতি শিল্পী বলতে বোঝেন আধুনিকতম শিল্পকৌশল যিনি বিনিয়োগ করতে সক্ষম, কেন না আধুনিক উন্নত যন্ত্রব্যবহারদক্ষ শ্রমিকের সঙ্গে সেইখানে তাঁর একসূত্র, এবং সঙ্ঘবদ্ধতা (দ্র· *Charles Baudelaire : A Lyric poet in the Era of High Capitalism* নতুন সং লণ্ডন, নিউ লেফ্‌ট্ বুক্‌স্ ১৯৭৩)। কিংবা গেয়র্গ লুকাচ্— গ্যেটে বালজাক টলস্টয় টমাস মান কাফকা, পুরোনো বুর্জোয়া লেখকদের নিয়ে লেখেন, সোভিয়েত দেশে থেকেও সোভিয়েত লেখকদের সম্বন্ধে যাঁর অনাগ্রহ। ১৯৫০এ হুঙ্গারি পার্টির নীতি-নিয়ামক জোসেফ রেভাই অভিযোগ করেছেন, বালজাক বা গ্যোটের উপরে লুকাচের টান বিপজ্জনকভাবে অচলিত মানসিকতা; ভাবাদর্শ আর বিষয়ের, তাঁর উপজীব্য লেখার বাস্তবচিত্রণ আর মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট নিয়মের অমিল কোনো মতেই অনুমোদন করা যায় না, পার্টি ও শ্রেণীচেতনার উপরে বিশুদ্ধ বা প্রাকরণিক সাহিত্যনিয়মে তাঁর আস্থাও মেনে নেওয়া যায় না। উত্তর দিনে লুকাচ্ সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিজ্‌মের সংজ্ঞা শুধরে তুলতে চেয়েছেন নতুন করে— তাঁর মতে ঝদাদনভীয় বা স্টালিনি ব্যাখাতে যা হয়ে উঠেছিল রিয়ালিজ্‌মের অস্বভাবীকরণ, বা সোশিয়ালিস্ট আইডিয়ালিজ্‌ম। দৃষ্টান্ত: শলোকভের উপন্যাস, সামাজিক বাস্তবকে যেখানে দেখা যায় গোলাপি পরকলার ভেতর দিয়ে, সে সোশিয়ালিস্টও নয়, রিয়ালিজ্‌মও নয়।

ইতিমধ্যে ১৯৪৩এ কমিন্‌টার্ন ভেঙে দেওয়া হল। ১৯৪৭ সেপ্টেম্বরে গঠিত হল কমিন্‌ফর্ম বা কমিউনিস্ট ইন্‌ফর্মেশন ব্যুরো, মূলত পূর্ব ইয়োরোপ এবং অন্যত্র দেশ সমূহের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিনিধিদেব নিয়ে সোভিযেত নীতির সঙ্গে তাঁদের একসূত্রে গ্রথিত করার, বিভিন্ন দেশের সদলীয়দের সঠিক মন্ত্রণা জানানোরও উদ্দেশ্যে । কমিন্‌ফর্মেরও মুখ্য সঞ্চালক ঝ্দানভ', এদেশে তাঁর পরিচয়: 'সোভিযেটের দার্শনিক, যোদ্ধা ও নেতা কমরেড ঝদানভ',সংস্থার প্রধান কৃত্য একটি পত্রিকা প্রকাশ। প্রসঙ্গত, ধনঞ্জয় দাশ ১৯৫০ জানুযারিতে রন্‌দিভেব 'হঠকারী নীতির ফলে এখানে পার্টির অভ্যন্তরে যখন রাজনৈতিক সংকট চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে তখন কমিন্‌ফর্মের পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সঠিক পথনির্দেশেব উল্লেখ করেছেন। ১৪.২.১৯৫০ ডাযরিতে মানিক বন্দোপাধ্যায লিখেছেন: 'কমিন্‌ফর্ম। আলোড়ন। দিক পবিবর্তনেব সূচনা।'

১৯৪৮এ কমিউনিস্ট পার্টিব দ্বিতীয কংগ্রেস বসল কলকাতায। সেখানে গৃহীত 'অতিবামপন্থী রণকৌশল' মার্কস্‌বাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের উপবে প্রভাব ফেলল। ১৯৪৮ অক্টোবরে ভবানী সেন অতিবামপন্থায নতুন তাত্ত্বিক পত্রিকা, 'মার্কস্‌বাদী' বের করলেন, তাঁব প্রথম বইযেব সম্পাদকীয ভূমিকায রাজনীতিব পাশে সাহিত্যপ্রসঙ্গও ছিল, তাতে ছিল শ্রমিকেব অস্ত্র হিসাবে সাহিত্যকে ভোঁতা কবে দেবার জন্য যাঁরা "পবিত্র আর্টে"র ধুযো তুলে বলছেন —আর্টেব ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদের নিযমকানুন খাটে না' তাঁদেব জবাব তাঁবা দিযেছেন এ বইযেরই এক প্রবন্ধে। 'তথাকথিত "পবিত্র আর্টে"র উদ্দেশ্যটা অপবিত্র।' ৪ নম্বব 'মার্কস্‌বাদী'তে প্রকাশিত 'বাংলা' প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায এক অনুবন্ধ ছাপেন 'পরিচয'এ (পৌষ ১৩৫৬), তাতে লিখেছেন 'পরিচয়ে'র বিষ্ণুবাবুদের বিভ্রান্তিকারী মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ চর্চার কথা, সে স্থলে' নম্বব 'মার্কস্‌বাদী'তেই 'সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বাস্তবতাব দূরত্ব ঘুচিযে দেবার প্রথম সার্থক চেষ্টা হয।' দু বছবে আটটি সংকলন বের করে 'মার্কস্‌বাদী' বন্ধ হযে যায, শেষ সংকলনে 'প্রকাশকের বক্তব্যে' মার্কসবাদী' তাব সম্পাদকমণ্ডলীর অনুসৃত ও প্রচারিত ভুল রাজনীতির কথা. সংকলনে বহু অ-মার্কসীয লেখা বের হওযাব কথাও স্বীকাব করে নেয।

কমিউনিস্ট চীনেব অভ্যুদযের সঙ্গে সঙ্গে মার্কস্‌বাদের এশীয় ধারাও প্রসার হচ্ছিল ধীরে ধীবে, তিরিশ দশকের শেষ দিযেই নানা বাংলা কাগজে তাব নজির আছে। চল্লিশ দশকের শেষ দিকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'পরিচয'এ ধারাবাহিক লিখেছিলেন, 'মহাচীনের জযযাত্রা', স্টাডিজ থেকে 'মহাচীন' কবিতা সংকলন বেরিযেছিল ধনঞ্জয় দাশের সম্পাদনায়, মাওয়ের কবিতা ও ভাষণের অনুবাদ, মার্কস্‌বাদী সাহিত্যালোচনায মাওয়েব উদ্‌ধৃতি অবিরল হয়ে উঠেছিল। অক্টোবর ১৯৪৯এ বিজিংয়ের তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের জনসভায নতুন চীন পীপল্‌স্ রিপাব্লিক গঠিত হল। মাও জেদঙ তার প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন।

চীনভাষাভাষীর সাহায্য নিযে মাওযের কবিতা তর্জমা করেছেন বিষ্ণু দে, সেখানে লিখেছেন, 'মাও

ৎসে তুঙের রীতিতেই ইওরোপের প্রতীকী কবিদের উন্মার্গ সাধনা ঐতিহ্যসিদ্ধ।' কবিপথ ও বামপন্থার একটা সহজ একায়ন করে তোলা তাঁর প্রবণতা। আর ১৯৪৮ থেকে সমাজ-আবর্তে ওঠা-পড়া বৃহৎ বৃহৎ উপন্যাস লিখতে বসেছেন জীবনানন্দ। 'সুতীর্থ'য় দেখি কারখানা ধর্মঘট ট্রেড ইউনিয়নের পাশে টুকরো টুকরো ক্যাপিটালিস্ট সমাজ, 'দূর কৃষ্ণচূড়া দেবদারু কলকাতার রাস্তার বড়ো ধোঁয়াটে চক্ষুস্থির গাছগাছালির' মধ্যে নানা রকম রাজনীতি বিপ্লবের চেষ্টার কথা। সুতীর্থ ভাবছে:

'বিপ্লবটা শান্তিতে শান্তভাবে পরিচালিত হতে পারে, পারে না কি? সে রকম হলেই বুদ্ধি স্বপ্ন সংকল্পের একটা স্বাভাবিক ভূমিকা মিলত সুতীর্থের, নিতান্তই দর্শনপ্রস্থানের একটু বেসামাজিক উচ্চভূমি থেকে নেমে শান্ত অথচ অনবনমনীয় সামজবিপ্লবের স্বাভাবিক কাজে সোজাসুজি হাত দিতে পাবত সে; কবি নয় দার্শনিক নয় শুধু আর— অক্লান্ত অপবিমেয় কর্মী হয়ে উঠতে পারত সে।'

'জলপাইহাটি'তে মফস্বল কলেজে পড়ানো নিশীথ সেন কলকাতায় এসেছে, সেখানে তাকে ভাগাভাগি দেখা যায় ডাস্ কাপিটাল আর ভিয়োঁর লেখাতে, কংগ্রেস কমিউনিস্ট সোশিয়ালিস্ট কংগ্রেস-সোশিয়ালিস্ট এমনি হাজার বাজনীতির বিপ্লবেব ভাষার ভেতর। সে বইয়ে জীবনানন্দ এঁকেছেন জলজিনী জলদেয়াসিনী সিফিলিস্ বীজময়ী নগ্নিকার ছবি—অবক্ষয় ধনতন্ত্রেব পরমা প্রতীকেব মতো। ৬ই নভেম্বর ১৯৪৯এ *স্টেট্‌স্‌ম্যান* কাগজে *Bengali Poetry Today* প্রবন্ধে জীবনানন্দ প্রশ্ন তুলেছেন, কেবলমাত্র প্রচলিত সদ্যতন যুক্তিদর্শন বা মার্কসিজ্‌মের পবিচাবিণী হয়েই কি মুক্তি হবে কবিতার? ১৯৫০এও অরুণ ভট্টাচার্যকে তৃপ্তি জানিয়েছেন, তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলোকে দুরূহ বা দুর্বোধ্য ভেবে তাঁর আলোচনা থেকে ছেড়ে দেন নি বলে।

তখনও অবিচলিত তা হলে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে পাঠকেব পূর্বসংস্কাব? ১৯৫২তেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখেছেন তাঁকে ভাবান্তরহীন কবি বলে: 'তাঁব কল্পনার স্বাধীনতা মানুষেব হাতেব শৃঙ্খলকে চিবস্থায়ী করে।' ননী ভৌমিক লিখেছেন, 'জীবন ও সমাজেব... অস্বীকৃতিরই আব- একটি আধুনিক মুখোশ' হলেন জীবনানন্দ। মৃত্যুব পব মণীন্দ্র বায লেখেন, 'যদি তিনি নিজেব ভাবনাচিন্তাকে আরো সচেতনভাবে সংগঠিত কবতে পাবতেন', তা হলেই হতে পাবতেন 'ববীন্দ্রোত্তর যুগেব একজন মহৎ কবি। তার অভাবে তিনি হয়ে আছেন... এক মহৎ সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি।'

'পরিচয়ে'ব এক পাঠক মণীন্দ্র বাযের প্রবন্ধেব প্রতিবাদ কবে লেখেন, 'মনে হয মণীন্দ্রবাবু তাঁব আলোচনার বহু পূর্বেই মনে মনে 'জীবনানন্দকে সেই one reactionary massএব দলে কল্পনা করেছেন, নইলে জীবনানন্দের শেষ জীবনের কবিতা আলোচনাযও তাঁর অসাফল্যের কাবণ কী? পত্রলেখক 'সাতটি তারাব তিমির'এ দেখেছেন 'জীবনানন্দেব প্রতিভাব সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ পবিণতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর—জীবনানন্দেব এই সর্বশেষ গ্রন্থ জীবনরস-উপলব্ধিব ঔজ্জ্বল্যে জীবনানন্দ বিরোধীদেরও বিস্মিত করেছে।... দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের... অবক্ষয়ী পরিবেশেব মধ্যেই তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার পুনরুদ্ধার করলেন এবং সেই জন্যই মনে হল

> ভোরবেলা পাখিদের গানে ভ্রান্তি নেই,
> নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকেব পতঙ্গের গানে,

এই সুস্থ সবল প্রাণব্যঞ্জনাই চিরকালীন সত্য, নইলে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেই সভ্যতার অবসান ঘটত..., ববীন্দ্রনাথেব সার্থক উত্তরাধিকারিত্ব অর্জনে জীবনানন্দ অসাফল্য যে অর্জন করেন নি তার প্রমাণ উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের জীবননিষ্ঠা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উচ্চারণেও তিনি প্রগতিশীল শিবিবের অন্তর্ভুক্ত... সার্থক, সৎ জীবননিষ্ঠ শিল্পীর মতোই আত্মসমলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি নির্দ্বিধ। অতীত জীবনের শূন্যচারী উদ্দেশ্যবিহীন কল্পনালোকে পদচারণের নিষ্ফলতা আজ নিঃসংশযে প্রমাণিত । তখন,

> ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই
> দেখা গেল পথ আছে— ভোরবেলা ছড়াযে রয়েছে,
> দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব উত্তরের দিক
> একটি কৃষাণ এসে বারবার আমাকে চেনায।

সাধারণ মানুষ যে আগামীকালের পথপ্রদর্শনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এ ধারণা উল্লিখিত অংশে পবিস্ফুট, কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধাগ্রস্ততায 'আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক'। এ তথ্য নির্ভুল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের সর্বশেষে অংশগ্রহণ করে...।'

মণীন্দ্র রায় পত্রের উত্তর দেন। লেখেন, অগ্র-পশ্চাৎ নানা রকম ধ্যান ধারণা তালগোল পাকিয়ে

থাকে আমাদের বিমিশ্র সামাজিক অবস্থায়, কাজেই লেখকের, 'মূল্যবোধ' এবং 'ব্যক্তিমানসের প্রস্তুতি'র প্রশ্ন থাকে, 'এটা যদি না থাকত তা হলে আত্মশুদ্ধির কোনো স্থানই থাকত না সাহিত্যে—কী লিখব, কেন লিখব, এসব কথাও উঠত না। ইতিহাসের অগ্রগতিতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ দর্শক নয়, সচেতন অংশগ্রহণকারী, এটা মনে রাখা দরকার।' ১৯৫৬র গোড়ায়, 'পরিচয়' মাঘ ১৩৬২তে এই পত্র এবং 'লেখকের বক্তব্য' পাশাপাশি ছাপা হয়।

১৯৫৩ মার্চ মাসে স্টালিনের মৃত্যু হয়। ১৯৫৫র সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে শলোকভ সরকারি mediocrity প্রত্যাহার করে লেখকদের আবার যোগ্য উত্তরাধিকার তুলে নেযার কথা বলেন। ১৯৫৬য় বিংশতি পার্টি কংগ্রেসেব রুদ্ধদ্বার ভাষণে নিকিতা খ্রুশ্চেভ স্টালিননীতি সম্বন্ধে গুরুতব প্রশ্ন তোলেন। দুর্নীতিগ্রস্ত NKVD প্রধানেবা স্টালিনেব সহযোগে দেশেব যে ক্ষতি করেছেন সে কথাও বলেন, সেই সঙ্গে বলেন পার্টির নৈতিক বল এখনও অক্ষুণ্ন আছে, এখনও সে লেনিনেব পার্টি।

১৯৬১র দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে খ্রুশ্চেভ বিশদভাবে স্টালিন আমলের ত্রাস নিগ্রহ একনাযকতন্ত্রের (cult of personality) অভিযোগ পুনরুত্থাপন করেন। এবারের ভাষণ বেতারে পত্রিকায প্রচারিত হয এবং লেনিনের পাশে শায়িত স্টালিনের মরদেহ রাতারাতি সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৬২তে জেল খেটে আসা রীযাজানবাসী হাই স্কুল শিক্ষক আলেকজান্দাব সলঝেনিৎসিনের 'ইভান দেনিসোভিচের জীবনেব এক দিন' নামে একটি গল্পেব পাণ্ডুলিপি 'নোভি মির' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক খ্রুশ্চেভকে দেখতে দেন এবং খ্রুশ্চেভ তার প্রকাশ অনুমোদন করেন। সলঝেনিৎসিন তাবপর একে একে প্রকাশ করেন 'মাত্রিযোনার বাড়ি' থেকে 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ' তাঁব রচনামালা যাব কোথাও সোশিযালিস্ট ভাবাদর্শেব ছায়া নেই।

Gulag হল কেন্দ্রীয বন্দীশিবির মন্ত্রকেব আদ্যক্ষবসংক্ষেপ। স্টালিন আমলেব বন্দীশিবিরের প্রথম খবব পাওযা গেল দেনিসোভিচেব গল্পে। চিত্রও পাওযা গেল:

'বুইন্ভ্স্কি আবাব বলল, তোমবা সোভিযেত দেশেব মানুষ নাও! তোমরা কমিউনিস্ট নও!... ভলকোভাই রাগে ফেটে পড়ে বলে উঠল, দশ দিনেব সেল হাজত... আজই সন্ধ্যে থেকে... বন্দী আর প্রহবীব সংলাপ, সুভাষ মুখোপাধ্যায অনুবাদে। এই হল বন্দী শিবিব যেখানে প্রহবীদের ধর্ষকাম চরিতার্থ কবাব উপকরণ দণ্ডিতেবা, তাদেব অনেকেই জানে না কী তাদেব অপরাধ, তাদের দিগন্তে কোনো আশাও নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায স্মবণীয কবিতা লিখেছিলেন স্টালিনেব মৃত্যুতে

কমরেড স্তালিন, তুমি
সুখে নিদ্রা যাও।
বাত শেষ হযে এল:
দাও
এবাব আমবা বাত জাগি

১৯৬৫তে তিনিই অনুবাদ করে ছাপলেন 'ইভান দেনিসোভিচেব জীবনের এক দিন'। দেনিসোভিচের গল্পে কোনো আশাবাদী মনোভাব নেই। কিন্তু সে গল্প লেখা পুবোনো লোকেদের রূপকথা বলার ঢঙে বা *skaz* প্রকবণে। আর লুকাচ্ সলঝেনিৎসিনেব লেখাতে দেখতে পেযেছেন সোশিযালিস্ট রিযালিজ্মের অবিকৃত মূল ধাবা, উনিশ শো বিশেব আগের রুশ লেখক যার চর্চা কবেছিলেন।

স্টালিনের মৃত্যুব পর নতুন কবে নির্ণয শুরু হযেছিল মার্ক্সবাদের। সুসমাজেব পুবোনো সুস্থিতি-সৌষম্যের আদর্শ আর কমিউনিজমের দেশব্যাপী টেকনোলজি যন্ত্রোন্নতিব নিশ্ছিদ্র আধুনিকাযনের প্রগতি—কোনটি স্পৃহনীয? কমিউনিস্ট রাষ্ট্রনিযম সমাজপ্রকল্প শিল্পদৃষ্টি, এবং কতখানি তা মার্ক্সীয, তা নিযেও নতুন বিচার শুরু হযেছিল। পুবোনো আনুগত্যেব, আচবণবিধিব সঙ্কীর্ণ দিগন্ত ভেঙে—যা আছে, যা জানি তাব বিলয করে যে সাংস্কৃতিক আধুনিকতাব প্রতিশ্রুতি আছে মার্ক্সের ম্যানিফেস্টোয, তাতে প্রতি মুহূর্তেব যাচাই-বিচাব, এবং মুক্ত কল্পনারও আমন্ত্রণ আছে। সার্ত্র দেখালেন মানুষ কেবল ইতিহাস ও সমাজ-প্রতিবেশের সৃষ্টি নয এবং মার্ক্সতত্ত্বে ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্তিরও স্থান আছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকেরা বস্তুবাদের উপরে স্থান দিলেন মার্ক্সেব মানবতাবাদী দৃষ্টিব। এবিখ ফ্রোম লিখলেন, কমিউনিস্ট পর্বের টোটালিটাবিযান নীতিব সঙ্গে মার্ক্সেব মানবতাবাদী দৃষ্টির—মানুষেব স্বেচ্ছা সংহতি, সৃষ্টিক্ষমতাবিস্তার, অযৌক্তিক শাসন-প্রভুত্ব থেকে মুক্তিপ্রয়াসেব কোনো মিল নেই। জার্মান মানবতাবাদ, এমনকি জৈন্ ধর্মের সঙ্গেও তিনি সাধর্ম্য দেখলেন মার্ক্সবাদেব (দ্র' *Marx's concept of Man*

১৯৬১)। হার্বার্ট মার্কিউজ লিখলেন, বিজ্ঞানবাদী সমাজতন্ত্রে বর্তমান এবং তার ভবিষ্যতের মধ্যে ফাঁক ভরানোর কোনো সূত্র নেই। শিল্পীর বিচ্ছিন্নতাও মার্ক্সীয় প্রোলেতারিয়ানের বিচ্ছিন্নতা-বোধের থেকে উচ্চস্তরীয়: 'meditated alienation' (*One-dimensional Man* ১৯৬৪) ১৯৬৩তে রজের গরোদি সাহিত্যের রিয়ালিজ্‌মের যে প্রসর স্থির করে দেন তাতে প্রুস্ত ও কাফকারও স্থান হয়ে যায়। ১৯৬৪তে লুকাচ্ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সমস্ত মহৎ শিল্পই রিয়ালিস্ট কেননা বাস্তবই তার উপকরণ, প্রকাশভঙ্গিতে যতই বৈচিত্র্য থাক। ১৯৬৪র প্রাগ সম্মেলনে আর্নস্ট ফিশার বললেন, 'We must not abandon Proust. Joyce. or Beckett, and even less Kafka, to the bourgeoisie.'

তত দিনে অবশ্য এ প্রসঙ্গের আবশ্যক এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মধ্য তিরিশ থেকে সদ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত রাজনীতি বা মতাদর্শের যে চাপ পড়েছে এখানে কবিতায়, উত্তরোত্তর পঞ্চাশের দিনে সে স্মৃতি মাত্র হয়ে গেছে। মৃত্যু পূর্বাহ্নের গদ্য লেখায় 'পৃথিবীর আধুনিক কালের মহত্তম তাৎপর্যগুলোব সঙ্গে অনেকখানি যোগ রেখে' বাংলা কবিতা যে প্রসার পেয়েছে বলে জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছেন সে নিছক কাব্য কৌশলেব যোগ।' কবিতার কথা'র অসমাপ্ত আলোচনায় (১৯৫৩) লিখেছেন, 'মালার্মে বা র‍্যাঁবো বা রিল্‌কের মতন প্রতীকী কবিতা রচনা করবার তাগিদ তিন চার দশক আগে বাংলা কবিতায় ছিল না।' এখন এসেছে কি? মৃত্যুর পর যে কবিতা তাঁর বীজ বিস্তার করেছে, যে কবিরা তাঁকে সাগ্রহ বিস্তার করে নিয়ে গেছেন প্রতিষ্ঠা থেকে প্রতিষ্ঠায়, মতন্তত্র নেই তাঁদেব। উত্তরসূরি বামপন্থী কবিও এখানে লিবেবাল মানবতাবাদী মাত্র। আব দু-তরফেই অবিবোধ ঐক্যমত হয়েছে কবিতার দিগ্বিজয়ে বা পাঠকবিজয়ে, আব সে জন্য সাধনীয় সাংবাদিকতায়। অন্ত্য কলকাতার দিনে নতুন কবিতাব 'আবো কবিতা পড়ুন' স্ফূর্তি পর্বে জীবনানন্দের বৃতি সহসা গণতন্ত্রী কবিকে ছাপিয়ে যেতে শুরু হয়েছে, এবং সে তিনি আস্বাদও করে গেছেন।

ইতিমধ্যে রাজনীতির নতুন পটবদল শুরু হয়েছে ফের দেশেবিদেশে। ১৯৬৭র নকশালবাড়ি, মে ১৯৬৮ব ইয়োরোপের ছাত্র আন্দোলন, এশিয়া ও লাতিনামেবিকা, পবে অ্যাফ্রো-মার্কস্‌বাদেব ধূমায়মান বিকল্প নতুন করে সাজতে শুরু হয়েছে। ১৯৭২এ রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'জীবনানন্দ দাশ যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন এটা তাঁব কাব্যের বিপ্লবাত্মক উপদান হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষভাবে বিবেচিত হবে।'

এ প্রসঙ্গ এই পর্যন্ত। জীবনানন্দেব কবিতা সূত্রে এই পরিপার্শ্বটুকু আবশ্যক বলেই মনে হয়, কেননা তাঁর কবিতাকে স্থান কবে নিতে হয়েছে এই অভূত মনন-বিপ্লবেব দিনে। তা ছাড়াও, কবিতা যে গড়ে ওঠে চাবি পাশেব হাওয়াবাতাসের চাপে, বিনিময়ে, তারই দু-একটা আঁশ রেখা সে যে চিবাযত কবে রাখে, সেও মনে রাখতে হয়।

১১

১৯৪০এব গোড়ায় জগদীশ ভট্টাচার্যকে তাঁর পত্রিকা 'বৈজযন্তী'ব প্রাপ্তি জানিয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'আজকালকার হৃদযহীন দলাদলির দিনে আপনারা নিজেব বুকের উপব হাত রেখে সাহিত্য বিচার করতে সচেষ্ট দেখে আমি প্রীত হয়েছি।' সে বছরে অশোকানন্দ কলকাতায় নিযুক্ত ছিলেন চাকুরি সূত্রে, তাঁর নানা স্থানের বাসায় মাঝে মাঝে এসে তিনি কাটিয়ে গেছেন। হয়তো এমনই কোনো বাসায় কখনও তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিলেন সঞ্জয় ভট্টচার্য।

২২শে নভেম্বর ১৯৪২ রবিবাবে প্রায আশি বছর বযসে বরিশালের বাড়িতে সত্যানন্দের জীবনাবসান হয়। ৬ই ডিসেম্বর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে 'ভ্রাতা যোগানন্দ দাস আচার্যেব কার্য, জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনানন্দ পিতাব জীবনী পাঠ কবেন।' ১৯৪২ ডিসেম্বরে কবিতাভবনের এক পযসায একটি সিরিজে বেরোয 'বনলতা সেন', প্রকাশক: জীবনানন্দ দাশ, বরিশাল। ১৯৪৩এর গোড়ায় অশোকানন্দ বিবাহ করেন অরুণনাথ-পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কন্যা নলিনীকে। ১৯৪৩এর 'সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি' জীবনানন্দ কলকাতায অশোকানন্দ-নলিনী দাশেব বাড়িতে কাটান। ফিরে গিযে লেখেন, 'কলকাতায় গিয়ে এবার নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হল; সাহিত্যিক ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইসারা পাওয়া গেল।... বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা। এবার সে ইচ্ছা আরো জোর পেয়েছে' (৪.৭.১৯৪৩এর পত্র)। পুজোর ছুটিতেও তিনি দিন কয়েক কলকাতায় কাটিয়েছেন, ফিরে গিয়ে বিষ্ণু দে-কে লেখেন, 'নানা কাজের ভিড়ে বিশেষ কারু সঙ্গেই দেখা করতে পারি নি।' আবো লেখেন,

'সুভাষ তিন– চার পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ অবিলম্বেই পাঠাতে লিখেছিল। আমি আজকেই খুব তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা তিনেক লিখে দিলাম' (১৯.১২.১৯৪৩এর পত্র)। প্রবন্ধটি 'কেন লিখি' সংকলনের জন্য তাঁর লেখা।

১৯৪৪এ পূর্বাশা লিমিটেড থেকে 'মহাপৃথিবী' প্রকাশিত হয়। ২৬.১২.১৯৪৫এ অজ্ঞাত পত্রপ্রাপককে জীবনানন্দ লিখে জানান তাঁর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, সেই সঙ্গে লেখেন, 'আমার কবিতার বই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি বিস্তৃত সমালোচনার জন্য, অবশ্য এই বইগুলোতে আমার শেষের দিকের প্রায় কোনো কবিতাই নেই।' ২১.১.১৯৪৬এ পুনরায় তাঁকে লেখেন, 'আমার কবিতা সম্পর্কে আলোচনা আপনি সহজ বোধেই শুরু করুন। আপনার সহজ বোধ তা অরসিকের নয় ... এক–একটি কবিতা ধরে রিচার্ডসীয় বিশ্লেষণপন্থা মন্দ নয়।' ২.৭.১৯৪৬এ ফের তাঁকে লিখে পাঠান তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী, সেখানে লেখেন, 'কোন্ কবি তার কবিতায় সেই অমোঘ "বিজ্ঞানদৃষ্টি"র প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে— কবি লক্ষিত যেই পথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পেয়েছে? সে দৃষ্টি–দিব্যতার দিক থেকে তা হলে কি অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই বিফল?' এই চিঠিতে জীবনানন্দ তাঁর মনের বাসনাও লিখে জানান :

'ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচে নি। শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও অবসরের অভাবে দানা বাঁধতে পারছে না। না পারছি মহৎ নাট্য–সমালোচকের নেতিবাচক নিরাশা ভঙ্গ করে তেমন কিছু নাটক লিখতে।'

১৯৪৬এর জুলাইয়ে সোয়া দু–মাসের সবেতন ছুটি মঞ্জুর হয় তাঁর কলেজে। কলকাতায় এসে উঠেছিলেন অশোকানন্দের ল্যান্সডাউনের বাসায়। মুসলিম লীগের Direct Actionএর কালে তিনি কলকাতায়। লাবণ্য দাশের লেখা থেকে জানা যায় গোলমালের সময়ে তিনি পুলিশের হাতে পড়েছিলেন, থানার ও.সি. তাঁর বি. এম. কলেজের পুরোনো ছাত্র নিরাপদ দূরত্বে তাঁকে পার করে দিয়ে যান। ১৯৪৬ নভেম্বর থেকে ১৯৪৭ গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত অবেতন ছুটি মঞ্জুর হয় কলেজে, তিনি আর ফিরে যান নি। দেশভাগের কিছু আগে মা ও স্ত্রীপুত্রকন্যা এসে ওঠেন তাঁর কাছে ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের বাসায়।

২৬শে জানুয়ারি ১৯৪৭এ ক্রীক্ রো থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'স্বরাজ' দৈনিকপত্রের প্রকাশারম্ভ হয়, জীবনানন্দ তার রবিবাসরীয় বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি 'মনমর্মর' নামে একটা কলমের সূত্রপাত করেছিলেন, নিজেও লিখেছিলেন সে কলমে। 'রবীন্দ্রনাথ'কে নিয়ে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন ২৪শে শ্রাবণ ১৩৬৪ তারিখের সাময়িকীতে। পুজো সংখ্যার প্রস্তুতি পর্বেও তিনি যুক্ত ছিলেন কাগজে, পুজোর গল্প চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে, উপন্যাস চেয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। ৩০.৭.১৯৪৭এ তখন মুর্শিদাবাদে কর্মরত অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছেন, 'স্বরাজে'র কাজ তাঁর কোনো কারণে ভালো লাগছে না, তবে বরিশালে আর তিনি ফিরতে চান না। পুজোর আগেই তাঁর 'স্বরাজে'র কাজ যায়। সেখানে তাঁর সহকর্মী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'জীবনানন্দ দাশ ছিলেন রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক। বরিশালে অধ্যাপনা করতেন, দেশ–বিভাগের আগে বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে আসেন।... শান্ত তন্ময় মগ্ন প্রকৃতির মানুষ— খবরের কাগজে কাজ করবার জন্যে যে চটপটে প্রস্তুতি না থাকলেই, নয়, জীবনানন্দের সেটা একেবারেই ছিল না' ('সঞ্জয়দা'। দেশ, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)।

১৯৪৭এর শেষ দিকে কোনো সময় অশোকানন্দ দিল্লীতে বদলি হয়ে চলে গেলে জীবনানন্দ ওই বাড়ির একতলায় স্বতন্ত্রভাবে থাকতে শুরু করেন। এখানেই ১৯৪৮এ তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ডিসেম্বর ১৯৪৮এ চল্লিশটি কবিতা, প্রধানত পরের দিকের কবিতা নিয়ে বেরোয় 'সাতটি তারার তিমির', গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত প্রকাশসংস্থা থেকে। বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে অশোক মিত্র লেখেন, 'বনলতা সেন' এবং তার আগে বা পরেও যে অর্থনির্মলতা ছিল জীবনানন্দের কবিতায় তার বদলে এখানে এসেছে 'বিপজ্জনক দুরূহতা', এ কাব্যে 'বিশুদ্ধ হৃদযোচ্চারণ স্তব্ধপ্রায়'। হুমায়ুন কবিরকে উৎসর্গিত বইখানি। এ বইয়ের জন্য অগ্রিম রয়ালটি বাবদে একশত টাকা পান কবি, বই লিখে সম্ভবত এই তাঁর প্রথম অর্থপ্রাপ্তি। 'স্বরাজে'র পর জীবনানন্দের আর্থিক সংস্থান তেমন কিছু ছিল না, ১৯৪৮–১৯৪৯এ এক বছর লাবণ্য দাশ শিক্ষিকা হয়েছিলেন কমলা গার্লস স্কুলে, তারপর বি.টি. পাশ করে নভেম্বর ১৯৫২য় তিনি শিশু বিদ্যাপীঠে যোগ দেন। বোধ করি এরই মধ্যে কখনও আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ল্যান্সডাউনের বাসাবাড়ির একখানি ঘর সাব–লেট করেছিলেন, জীবনবীমা সংস্থার এক মহিলাকে, পরের দিনে তাঁর আর–এক অশান্তি হয়ে ওঠেন এই মহিলা। ১৩.৬.১৯৪৯এর চিঠিতে অচিন্ত্যকুমারকে তিনি লিখছেন,

'আমি বিশেষ কোনো কাজ করছি না আজকাল। লিখে, পড়িয়ে, অল্পস্বল্প রোজগারে চলে যাচ্ছে। একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, reference চেয়েছিল—তার ভেতরে তোমার নামও দিয়েছি; ও সব চাকরি হবে না। সব ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হত। সেটা অনেক দিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না।' ১৯৫০এ মে-জুন মাসে 'বেশি ঠেকে পড়ে', 'বিপদগ্রস্ত' হয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে 'আজ-কালের মধ্যেই' চার-পাঁচশো টাকা ঋণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে চিঠি লেখেন, পাঁচটি কবিতা পাঠান সেই সঙ্গে, এবং প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি ও ছদ্মনামে উপন্যাস লেখার প্রস্তাব।

১৩৫৫-১৩৫৭ তিন বছরে চারটি কবিতা লিখেছিলেন জীবনানন্দ 'পূর্বাশা'য় ১৩৫৬ এক বছরেই লেখেন পাঁচটি প্রবন্ধ : 'কবিতা, তার আলোচনা'— বৈশাখে, 'কবিতা পাঠ'— আষাঢ়ে, 'দেশ কাল ও কবিতা'— আশ্বিনে , 'সত্য বিশ্বাস ও কবিতা'— মাঘে এবং 'রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা'-চৈত্রে । এই সময় থেকে নানা কাগজে সময় সাহিত্য শিক্ষা নিয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকালোচনার আরেকটা প্রসারও গড়ে ওঠে তাঁর লেখার। 'শিক্ষাদীক্ষা—শিক্ষকতা', 'শিক্ষা ও ইংরাজি' (মাসিক বসুমতী কার্তিক ১৩৫৫ ও শারদীয় ১৩৬০) শিক্ষার কথা, শিক্ষাদীক্ষা' (দেশ ১৪ ভাদ্র ১৩৫৯ ও ২১ ভাদ্র ১৩৫৯) অন্তত এই চারটি পাওয়া গেছে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ, ইংরেজি শিক্ষার পদ্ধতি ও মান, শিক্ষা ক্ষেত্রের নানা অব্যবস্থা, সর্বোপরি শিক্ষকের উপরে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপেক্ষা এই সব প্রবন্ধের উপজীব্য। পুস্তকালোচনার মধ্যে পাওয়া যায় এলিয়ট, অঁদ্রে জীদ, টমাস, মান, অলডাস্, হাক্সলির বইয়েব আলোচনা, আগে কবিতা পত্রিকায় লেখা 'কঙ্কাবতী'র বিস্তার নিবিষ্টতা অবশ্য নেই এ সব লেখায়। হয়তো তাঁর লেখক-বৃত্তির প্রস্তুতি এ সব লেখা। মূল রচনার উপচয় লেখা। নাটক লিখেছিলেন কি না জানা যায় না, ১৯৪৮এ লেখা চারখানি উপন্যাস, 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'জলপাইহাটি', 'বাসমতীর উপাখ্যান' বেরিয়েছে তাঁর মৃত্যুর বহু দীর্ঘ দিন যথাক্রমে উনিশ একুশ সাতাশ চৌত্রিশ বছর পর যদিও ১৯৭৩এ 'মাল্যবান' উপন্যাসের 'সংহত জীবনচক্র' এবং 'সীমিত চিত্রের মধ্যে আশ্চর্য শিল্পশক্তির প্রমাণ পেয়েছিলেন অমলেন্দু বসু, সে সময়েই অশোকানন্দ দাশ জানিয়েছিলেন, "মাল্যবান"এর প্রচ্ছদ আঁকার সময় "মাল্যবানে"র প্রুফ পড়ে শ্রী সত্যজিৎ রায় এত মুগ্ধ হন যে জীবনানন্দের সমস্ত অপ্রকাশিত উপন্যাস প্রকাশের জন্য বারংবার আমায় অনুরোধ করেন' এবং 'সুতীর্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে সঞ্জয় ভট্টচার্যও সেখানি প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করেন। জীবনস্মৃতি লেখার ইচ্ছার কথা জীবনানন্দ বলেছেন মৃত্যুর কাছাকাছি দিনেও। আর বলেছেন মোহিতলালকে নিয়ে পুরো একখানি বই লেখার ইচ্ছার কথা। এত বহুধা ইচ্ছার ফলেই কি কবিতায় গ্রস্ততা কমে এল তাঁর উত্তর-অধ্যায়ে?

১৯৫০এ ফের তাঁর নতুন কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ হল। সুহৃদ রুদ্র ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদকতায় শুরু হয়েছিল 'দ্বন্দ্ব', পরে সে সোশিয়ালিস্ট পার্টির সংস্কৃতি সংস্থা সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের মুখপত্র হয়, তার চতুর্থ বছরে (আষাঢ় ১৩৫৭) আবু সয়ীদ আইয়ুব ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে অন্যতম সম্পাদক হন জীবনানন্দ। 'দ্বন্দ্বে' তাঁর প্রবন্ধ কবিতা বেরিয়েছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয় নি, বেশি দিন সংযোগও থাকে নি তার সঙ্গে। সুহৃদ রুদ্র 'সমকালীন বাংলা কবিতা' (পৌষ ১৩৫৭) নামে চল্লিশ দশকের কবিদের যে কাব্যসংকলন প্রকাশ করেছিলেন তার ভূমিকায় অবশ্য স্বীকার করেছেন অমিয় চক্রবর্তী ও জীবনানন্দের কাছে চল্লিশের কবিদের ঋণ।

১৯৫০এ কোনো সময় অশোকানন্দ দিল্লী মিলিটারি ট্রেনিং কলেজে জীবনানন্দের চাকুরি ঠিক করেন, জীবনানন্দ যান নি। সেপ্টেম্বরে জীবনানন্দ খড়গপুর কলেজে যোগ দেন, একা থাকতেন কলেজ বোর্ডিংয়ের একটি ঘরে, ১৯৫১ জানুয়ারির শেষে স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি বরখাস্তের চিঠি যায় কলেজ থেকে। অতঃপর এই ১৯৫১য় এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট পদের জন্য, আসানসোল কলেজে, জঙ্গীপুর কলেজে, চারুচন্দ্র কলেজে লেকচারার চাওয়ার বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেন। যুগ্ম ব্যবসায়ে নেমে পারমিট সংগ্রহের চেষ্টা করেন মহাকরণের উচ্চপদস্থ সহপাঠীর কাছে দরবার করে। কুমিল্লা ব্যাঙ্কে চাকুরির চেষ্টা করেন। সিনেমায় তাঁর কোনো উপন্যাসের চিত্ররূপ গৃহীত হতে পারে কি না যাচিয়ে দেখতে অনুরোধ করেন অমল দত্তকে।

সিগনেট প্রেসকে পুরোনো অবিক্রীত বই দিয়েছিলেন বিক্রয়ার্থ, বিক্রির টাকা পেয়ে প্রাপ্তিস্বীকারও করেছিলেন। ১৭.৩.১৯৫১র ওই চিঠিতে কবিতা সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করার জন্য, কবিতার বই সম্বন্ধে উৎসাহ ও আন্তরিকতার কারণে কৃতজ্ঞতাও জানান দিলীপকুমার গুপ্তকে, সেই সঙ্গে লেখেন, 'অনেক

দিন থেকেই ভেবেছি সিগ্নেট প্রেস আমার একটি নতুন কবিতার বই করলে ভালো হয়।' সিগনেট প্রেসের বিজ্ঞাপনপত্রী 'টুকরো কথা' ৪ ৫ ও ৬এ সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য বইয়ের মধ্যে পুরোনো 'বনলতা সেন' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নাম ছিল। ১৩৫৯ পুজার পূর্বে 'টুকরো কথা' ১৮, তারপর ১৯এ: 'নতুন বই,নতুন সংস্করণ মিলিয়ে সিগনেট প্রেস থেকে এবার পুজোয় আটখানা বই প্রকাশিত হচ্ছে' বলে যে বিজ্ঞপ্তি বেরোয়, তার শেষ দিকে সাতখানা গ্রন্থনামের পর দেখা যায় পরিবর্ধিত 'বনলতা সেন' বইয়ের বিবরণ

'...এবং শেষ বই: জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ "বনলতা সেন"। আধুনিক বিখ্যাতদের মধ্যে নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশ, এবং "বনলতা সেন"ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। প্রায় দশ বছর আগে বারোটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এই বই বৃহত্তর পাঠকমহলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাঁকে। এখন তিরিশটি কবিতা নিয়ে বর্ধিত কলেবরে সিগনেট সংস্করণ ছাপা হল।'

মুদ্রণ-বিবরণ স্থলে শ্রাবণ ১৩৫৯ ছাপা হলেও 'বনলতা সেন' বোধ হয় পুজোর কাছাকাছি প্রকাশিত হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২য় জীবনানন্দ দিলীপকুমার গুপ্তকে বই পেয়ে ধন্যবাদ জানান। ১৩৫৯এই নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সে বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে পুরস্কৃত করেন বইখানিকে। সে. বছর সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন অরুণকুমার সরকার। ১৩৬০ বৈশাখে মহাজাতি সদনের রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী সভায় কবিসংবর্ধনার উত্তরে 'কুণ্ঠিতবাক্ কবি দু হাজার লোকের সংবর্ধনার উত্তর' দেন।

১৯৫১র গ্রীষ্মে কলকাতার গরম এড়িয়ে জলপাইগুড়ির নদী ঝিল জঙ্গল হিমালয় চা বাগান দেখে আসার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন জলপাইগুড়িবাসী সুরজিৎ দাশগুপ্তকে তাঁর আমন্ত্রণের উত্তরে। ১৯৫২য় জানুয়ারিতেও লেখেন, 'জলপাইগুড়ি ও ওদিককার অঞ্চল, পাহাড় নদী জঙ্গলে— বেশ দেখবার মতো, ঘুরে বেড়াবার মতো, আমার খুব যেতে ইচ্ছা করে।' মে মাসে লেখেন, 'আমার এখন জলপাইগুড়ি যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেতে পারলে অবশ্য আনন্দিত হতাম। পরে কখনও যাবার চেষ্টা করব।' সিগনেট প্রেস 'বনলতা সেন' বের হবার পর লেখেন 'আমার "বনলতা সেন" দেখে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি।... এর পরে কবিতার বই বার করলে আমি নিজে আগাগোড়া সব দেখেশুনে ঠিক করব। সুরজিৎ জীবনানন্দের একখানি কবিতার বই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তার উত্তরে লেখেন, 'তুমি আমার একটি চটি কবিতার বই ছাপাতে চাচ্ছ; কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে এখন এ ধরনের বই ছাপিয়ে কোনো লাভ নেই। ও কাজে তুমি এখন আর হাত দিয়ো না।' (৬.১০.১৯৫২র চিঠি)। তার পরেও 'সীমান্ত' পত্রিকায় সমালোচনা সূত্রে দুখানি চিঠিতে লেখেন সে সমালোচনার প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। সুরজিৎ প্রতিবাদের একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন।

নভেম্বর ১৯৫২ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ পর্যন্ত বড়িষা কলেজে লীভ ভ্যাকান্সিতে কাজ করেছিলেন জীবনানন্দ চার মাস, পুনর্নিয়োগ পান নি। তারপর তদানীন্তন ডি.পি. আই. পরিমল রায়ের সাহায্যে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে চাকুরির ব্যবস্থা হয় তাঁর। ১৯৫৩ মার্চে গোপালচন্দ্র রায়ের মধ্যস্থতায় ডায়মণ্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজেও তাঁর কাজ হয়। কলকাতা থেকে দূরত্বের কারণে কোনো স্থানেই যোগ দেন নি। ১৯৫৩ এপ্রিলে রঙ্গপুরে কায়সুল হককে লেখেন, 'পূর্ব পাকিস্তান আমার নিজের জন্মস্থান, সেখানে যেতে আমি অনেক দিন থেকেই ব্যাকুল, কিন্তু পাসপোর্ট ইত্যাদি করে যোগাড় করে উঠতে পারব বলতে পারছি না।' ১৯৫৩র মাঝামাঝি গোপালচন্দ্রের চেষ্টায় হাওড়া গার্লস কলেজে তিনি যোগ দেন। ছাত্রীরা তাঁর পড়ানোয় খুশি হয়েছিলেন। কর্তৃস্থানীয়েরা তাকে সহকারী অধ্যক্ষ হবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি রাজি হন নি। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন এই কলেজেই। মৃত্যুর পর হাওড়া গার্লস কলেজ পত্রিকা যে জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশ করেন তাঁর তখনকার সহকর্মী অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, নানা দিকেই অতি মূল্যবান সে বইখানি।

১৯৫৩ মে মাসে দুখানি পর পর চিঠিতে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখেন, এ দেশে 'বড়ো সমালোচক আজকাল নেইই একরকম।' 'আমার কবিতা সম্বন্ধে চার দিকে এত অস্পষ্ট ধারণা যে আমি নিজে এ বিষয়ে একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখব ভাবছিলুম।' ১৯৫৪মে-তে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় লেখেন, 'আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার, কারও মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অচেতনার, সুররিয়ালিস্ট। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য— কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা

হিসেবে নয়।' যেমন আত্মজীবনী তেমনি তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যাও জীবনানন্দ লিখে যেতে পারেন নি।

১৯৫৩র ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিবাদে গণআন্দোলনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন জীবনানন্দ, 'পরিচয়'এ তাঁর নাম ছাপা হয় ১৭ নম্বরে। পুজোর ছুটিতে সপরিজনে গিয়েছিলেন অশোকানন্দের দিল্লীর বাড়িতে। বছরের শেষ দিকে বড়িষায় ক্ষেতুসুধা বসুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে মোহিতলালের বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন কৃষ্ণপক্ষ শীতের রাতে। ১৯৫৪ রবিবার ২৪শে জানুয়ারি অজিতকুমার ঘোষকে নিয়ে কল্যাণী যান কংগ্রেস প্রদর্শনী দেখতে। সুবোধ রায়কে নিয়ে গিয়েছিলেন এক দিন চিড়িয়াখানা। ২৮-২৯শে জানুয়ারির দু-দিন ব্যাপী সেনেট হল কবিতা সম্মেলনের প্রথম দিনের শেষ কবি তিনি। গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন 'বনলতা সেন' সহ পাঁচ-ছটি কবিতা পড়েছিলেন সেখানে, তার 'প্রথম তিনটি কবিতা আশ্চর্য সুন্দর পড়েছিলেন' লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। ১১ই এপ্রিল রবিবারে যান গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে নন্দলাল বসুর চিত্রপ্রর্শনী দেখতে, সেখানে দেখা হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ১৯৫৪র ২২শে শ্রাবণ হাওড়া কলেজের ছাত্রীদের রবীন্দ্রস্মরণসভায় আবৃত্তি করে শোনান 'বলাকা' আর 'তপোভঙ্গ' কবিতা। কিন্তু শেষ দীর্ঘ দিন পীড়িত বিব্রত হয়েছিলেন বাসাবাড়ি নিয়ে, পাশের উপভাড়াটিয়া মহিলার ঘরে সন্ধ্যায় রাত্রে 'জটিল জনসমাগম' এবং 'হৃদযহীন চীৎকাবে'র নির্যাতনে। তাঁকে তোলার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র সঞ্জয় ভট্টাচার্য, তাঁর মারফত হুমায়ুন কবির ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাযের সাহায্য চেয়েছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায অমল দত্ত সমর চক্রবর্তীর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। গোপালচন্দ্র রায় তাঁকে নিয়ে উকিলের কাছে গেছেন, হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানির সাবত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যাযের সাহায্য চেযেছেন। নিজেই বাড়ি পালটাতে চেষ্টা করেছেন শেষ পর্যন্ত। সুচরিতা দাশ লিখেছেন, 'শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে উঠল যে লেখাই তাঁর প্রায় বন্ধ হবাব মতো। এই বাড়িতে থাকা যখন দুরূহ হযে উঠল কেবলই বাড়ি খুঁজছেন তিনি।' বাণী বায লিখেছেন এক দিন 'সতৃষ্ণভাবে' তাঁকে বলেছিলেন জীবনানন্দ, 'লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কী লিখবার আছে। আপনার ঘরটি যদি পেতাম!'

১৯৫১য ব্যবসার পারমিট সংগ্রহের চেষ্টায গিযে মহাকরণে অচৈতন্য হযে পড়েন জীবনানন্দ। ১৯৫২-৫৩য বড়িষা কলেজের সহকর্মী শান্তিপ্রিয চট্টোপাধ্যায লক্ষ্য করেছেন তাঁর ক্ষুণ্ন স্বাস্থ্য। দৃষ্টিক্ষীণতা, 'রক্তচাপজনিত একটা মানসিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন' কবি। ১৯৫৩ মে মাসে সুবজিৎ দাশগুপ্তকে লিখেছেন, 'শরীর বড়ো অসুস্থ কোনো কাজই করতে পারছি না।' ৪.৯.১৯৫৪য সঞ্জয ভট্টাচার্যকে লিখেছেন, 'অনেক দিন থেকে আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ।' সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে এই তাঁর শেষ চিঠি। সঞ্জয ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'মৃত্যুর পূর্বাভাস ছিল সে চিঠিতে।' কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কবিসভায় ১৩ই অক্টোবর শেষ বার দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। 'তখন তিনি কাযমনে অসুস্থ। কিন্তু সভায গিয়েছিলেন সম্ভবত শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা হবে বলে।... বাববার শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন "প্রেমেন্দ্র এল না কেন?"

১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যার একটু পরে দেশপ্রিয পার্কের কাছে বালিগঞ্জমুখী এক ট্রামেব ধাক্কায জীবনানন্দ আহত হন। অচৈতন্য অবস্থায তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয। তাবপর দীর্ঘ আট দিন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছেন। 'ময়ূখ' পত্রিকার তরুণ কবিরা তাঁর পরিচর্যার ভার নিয়েছিলেন। সতীর্থ কবি-লেখকেরা উৎকণ্ঠিত হযেছিলেন। ২২শে অক্টোবর ৫ই কার্তিক শুক্রবার রাত ১১টা ৩৫এ তাঁর মৃত্যু হয। সে রাতেই ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউযে নলিনী দাশের পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়া হয মৃতদেহ। নরেশ গুহ লিখেছেন, 'পর দিন সকালে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে নীরবে তাঁর দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে গেলাম আমরা। তাঁকে যাঁরা জানতেন, ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন তাঁরা এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ একটি শোকযাত্রীর দল।' তরুণ কবিরা ছিলেন। নারাযণ গঙ্গোপাধ্যায গিয়েছিলেন শ্মশানে। 'সুদূব বজবজ থেকে ছুটে এসেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায।' সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'সজনীকান্ত জীবনানন্দের শেষকৃত্য পর্যন্ত যে আন্তরিক সহযোগিতা দেখিযেছেন এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে বিমূঢ় ভাব দেখেছি শেষ দু দিন তা আমার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

মৃত্যুকে কিভাবে দেখেছেন কবি? তার চেয়ে অপরিমেয়রূপে দেখেছেন জীবনকে—নিশান্ত পাখি ওড়ার, নাবিকীর সূত্রে উপর্যুপরি গ্রথিত করে দেখেছেন, বারংবার। পৃথিবীর আয়ু দিয়ে তাঁর মানুষের জীবনের পরিমাপ, মৃত্যু আছে তার বাইরে। হয়তো ইতিহাসের অবক্ষয় ক্রিয়াভাবনায তাব ছায়া পড়ে,

কিন্তু জীবনগণ্ডির বাইরে সে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল কোনোভাবে? তাঁর এক উপন্যাসে দেখি এই দু লাইন সংলাপ: "ঈশ্বর আছেন?" প্রভাসবাবু বললেন।... সিদ্ধার্থ একটু হেসে বললে, "তিনি থাকুন।" তিনি থাকুন, এই পর্যন্ত। অরবিন্দ গুহকে একবার বলেছিলেন, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, আমি মানুষের নীতিবোধে বিশ্বাস করি।' বাণী রায় উল্লেখ করেছেন, 'এক দিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হল এবং অবশেষে বেলা দুটো বেজে গেলে অগত্যা সভাভঙ্গ করতে আমরা বাধ্য হলাম। সেই Mighty Atom আমাদের মানবিক যুক্তিতর্কজালে ধরা দিলেন না।' 'বাসমতীর উপাখ্যান'এ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রায় অর্ধেক উপন্যাস বিস্তার হয়ে আছে একখানা লুক্রেশিয়সের বই আহরণ করা ইচ্ছা চেষ্টা উদ্‌বেগ অশান্তি। ঈশ্বর থাকুন, মানুষও খুঁজুক শ্রেয় সুখ, মৃত্যু থাক তার অনুবন্ধ আয়তনের বাইরে এবং বিশ্বব্যাপার চলুক দৈবাপত্যনিরপেক্ষ হয়ে প্রাকৃতিক কারণক্রিয়ায়, হয়তো কাব্যের চেয়েও এই বাস্তব বোধের জন্য পুরোনো অ্যাটমিস্টদের আশ্বাস পাবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ভারত রাষ্ট্রের বাংলা-ভাষাসাহিত্যের জন্য প্রথম অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। 'ময়ূখ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'পাঠকসাধারণ তৃপ্ত হয়েছেন... তাঁর মৃত্যুর পরে হলেও তাঁর নামের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের বঙ্গভাষার প্রথম পুরস্কারের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রইল বলে।'

১২.

জীবনকালে সাতখানি কাব্যগ্রন্থে সাকুল্যে ১৬২টি কবিতা জীবনানন্দ গ্রন্থবদ্ধ করে গিয়েছিলেন, তার ১৮টি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংযোজিত লেখা, সে ১৮টির ৪টি সদ্য লেখা, পত্রিকাতেও প্রকাশ হয় নি। জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা 'কবিতা' ও 'ময়ূখ' পত্রিকা কবির প্রকাশিত লেখার দুটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাতে 'কবিতা'র ১৩৪২-১৩৬০ এই উনিশ বছরের এবং 'বৈশাখী'র ১৩৪৮-১৩৫২ বার্ষিকী কয়টির যথাক্রমে ৭৬টি ও ৫টি কবিতার সূত্র ছিল (তার ২টি ইংরেজি অনুবাদ, ২৬টি অগ্রন্থিত লেখা, অনুবাদের ১টি কবি-কৃত নয়)। 'ময়ূখ'-এ মূলত কর্তিকা সংগ্রহ অবলম্বনে সুচরিতা দাশ ও ভূমেন্দ্র গুহ 'জীবনানন্দেব প্রকাশিত ও অগ্রন্থিত বচনাব পঞ্জী'তে ১৯০টি কবিতা ছাড়াও ১৭টি গদ্য রচনার (তার ৮টি ইংরেজি) তালিকা প্রস্তুত করেন, তাতে 'কবিতা'র লেখা কযটিও আছে, অনেক 'কাটিংযে পত্রিকার নাম বা সালের উল্লেখ যথাযথ ছিল না' বলে প্রকাশক্রমের যাবতীয় সন্ধান তাঁরা দিতে পাবেন নি। 'কবিতা' ও'ময়ূখ'এব সংখ্যা দুটি যথাক্রমে পৌষ ১৩৬১ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২তে বেরোয়, দুই কাগজে কবির পাণ্ডুলিপি থেকে আরো ১১টি কবিতা ছাপা হয়, 'কবিতা'র কোনো কোনো লেখা অবশ্য অপর পত্রিকাব ঈষৎ ভিন্ন পাঠে পূর্বমুদ্রিত লেখা।

পঞ্জির অগ্রন্থিত কবিতা সদ্য সদ্য সংকলিত হযে উঠলে নিশ্চয় সুখের কারণ হত। তার বদলে ১৯৫৭য 'রূপসী বাংলা' নামে নতুন একখানি, বই এবং পিঠোপিঠি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন সিগনেট প্রেস। প্রথমখানি পঁচিশ বছর আগের 'প্রথম বারে যেমন লেখা হযেছিল ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ... সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত' কবিতার সংকলন, ভূমিকায় অশোকানন্দ দাশ লেখেন, 'এ সব কবিতা "ধূসর পাণ্ডুলিপি" পর্যাযেব শেষের দিকের ফসল দ্বিতীযটিতে পুরোনো সমকালীন দুখানি কীটদষ্ট খাতা থেকে সতেরোটি 'ধূসরতর' অপ্রকাশিত কবিতা সংযোজন করে দেন অশোকানন্দ, সেই সূত্রে লেখেন, কবির যে পুনঃপুনঃ পরিমার্জনার স্বভাব ছিল, 'সে রকম পরিমার্জনা করা এখন আব সম্ভবপর নয়, তাই সংযোজিত কবিতাগুচ্ছ যে স্রষ্টার প্রখর অভিভাবকতা লাভের সৌভাগ্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত সহৃদয় পাঠককে এই কথাটি স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি।' রূপসী বাংলা'র কবিতা ১৩৪০-১৩৪১/ মার্চ ১৯৩৪এর একখানি খাতার লেখা, এর কয়েকটি লেখা কবির মৃত্যুর পর কোনো কোনো কাগজে ছাপতে দেওয়াও হয়েছিল। ১৯৮৪তে প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স থেকে সমস্ত খাতাখানির পাণ্ডুলিপিচিত্র সংস্করণ বেরোবার পর সিগনেট সংস্করণে মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে তার নানা ব্যতিক্রম পাঠক লক্ষ্য করেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সংযোজন কবিতা পৌষ-মাঘ ১৩৩৮ ও অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৩৮ (জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত খাতার ক্রম সংখ্যা ৩ ও ৫) থেকে গৃহীত, এখানেও সিগনেট সংস্করণ পাঠের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে; 'মোট পনেরোটি কবিতা সংযোজিত হল' বলে অশোকানন্দের গণনাও তিনটি পৃথক লেখাকে একটি শিরোনামে নিবদ্ধ করার ফলে, সংযোজনের

কবিতানামগুলিও পাণ্ডুলিপিতে নেই, অতএব পাঠবদল ও নামকরণ দুই সম্পাদক–কৃত বলে মনে করতে হয়। দুই বইয়ের ক্ষেত্রেই কবি–লিখিত পাণ্ডুলিপির পাঠই আমরা এ বইয়ে গ্রহণ করেছি। কবিতায় এক শব্দের পর পর আরো বিকল্প লেখা থাকলে শেষ বিকল্প শব্দটিকে মূল এবং অপরগুলিকে বিকল্প পাঠ বলে সেই পৃষ্ঠার নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৬১তে জীবনানন্দের নতুন-বই বেরোয় : 'বেলা অবেলা কালবেলা'। তার মুখপাতে অশোকানন্দ লেখেন ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০এর কবিতা নিয়ে এই বইখানি প্রকাশের জন্য কবি নিজেই প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন এবং গ্রন্থনামটিও কবির দেওয়া। আগের বা মধ্যকালের লেখা থাকলেও পরেকার লেখাই এখানে প্রধান এবং 'সাতটি তারার তিমিরে'র উত্তরপর্বের, জীবনানন্দের পরিণাম–লেখার কাব্য এ বই। তা হলে, প্রশ্ন জাগে, প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও প্রকাশের ক্ষেত্রে বইখানি অগ্রাধিকার পেল না কেন?

আরো আট বছর পর ১৯৬৯এ সিগনেট প্রেস মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মহাপৃথিবী' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এ বইয়েও একটি সংযোজন ভাগ আছে, তার একটি নামও সম্পাদক দিয়েছেন জীবনানন্দের একটি কবিতা–নাম ব্যবহার করে : 'আমিষাশী তরবার', এবং বইয়ের শেষে আছে ২৪শে আশ্বিন ১৩৭৫ তারিখ দেওয়া চার পৃষ্ঠা 'সম্পাদকের নিবেদন'। এ বইযে অবশ্য প্রশ্নের চেয়ে তৈরি হয়েছে প্রহেলিকা, দু–একটি উল্লেখ করি :

১. 'মহাপৃথিবী' বেরিয়েছিল পূর্বাশা প্রেস থেকে, 'নিরুক্ত' পত্রিকার শেষে। জীবনানন্দ 'নিরুক্তে'র দুই সম্পাদক, তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নামে বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত জানা যায়, এই দুই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সৌহৃদ্য ছিল। নতুন সংস্করণের উৎসর্গপত্রী বদলে হয়েছে 'শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীকে বাবার আশীর্বাদ'। তা হলে সম্পাদকের কাছে পাঠকের জানার থাকে, মৃত্যুর আগে লিখিত বা মৌখিক কোনোভাবে কারও কাছে বাবা তাঁর এই ইচ্ছা বলে গিয়েছিলেন কি না।

২. নতুন সংযোজনে 'আবহমান' নামে দীর্ঘ একটি কবিতা ১৯৫৪র 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য কবি স্বযং 'বনলতা সেনে'র সংযোজন কবিতা রূপে মুদ্রিত করেছিলেন। তা হলে এই কবিতাটি সূত্রেও কবির মতবদলের লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিপ্রায ছিল কি না বলে দিতে হয।

৩. প্রসঙ্গত 'মহাপৃথিবী' প্রথম সংস্করণ (শ্রাবণ ১৩৫১) বই শুরু হয়েছিল এক পযসায একটি সিবিজ 'বনলতা সেনে'র ১২টি কবিতা দিয়ে। 'কবিতা' পত্রিকায বইখানি আলোচনা করতে গিযে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন 'বস্তুত এ বই ভিন্ন নামে 'বনলতা সেনে'বই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।' তৎসত্ত্বেও 'বনলতা সেন' সিগনেট সংস্করণে (শ্রাবণ ১৩৫৯) 'মহাপৃথিবী'তে গ্রন্থিত পুরাতন 'বনলতা সেনে'র ১২টি কবিতা পুনরায গৃহীত হয সেই সঙ্গে 'সুবসঙ্গতি বক্ষা ক'বে আরো আঠারোটি কবিতা'। মূল ১২টি কবিতা ১৯৩৪–১৯৩৫এ লেখা, সংযোজনের লেখা মুখ্যত ১৯৪৬–১৯৪৭ সালেব। যুগ ও যুগান্তর আগে–পরে লেখার মধ্যে বিষয়বীজের ক্রমবিকাশ ঘটতে পাবে, তাকে কি সুরসঙ্গতি বলতে পারা যাবে? সংযোগ কবি করেন নি (দ্র. এই বই)। এখানে শেষ নয। ১৯৫৪য 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় দেখা যায় প্রথম 'বনলতা সেনে'ব 'হায়, চিল', 'কুড়ি বছব পর', 'ঘাস', 'হাওযার রাত', 'বুনো হাঁস', 'শঙ্খমালা', 'বিড়াল', 'নগ্ন নির্জন হাত', এই আটটি কবিতা গৃহীত হযেছে 'মহাপৃথিবী' বইযেব অন্তর্গত বলে, 'বনলতা সেন' পর্যাযে কবি রেখেছেন প্রথম সংস্করণের একমাত্র 'বনলতা সেন' নাম–কবিতাটি, সেই সঙ্গে নতুন সিগনেট সংস্করণের ৮টি সংযোজন কবিতা। রচনাকাল হিসেবে 'আবহমান'ও তার সঙ্গে মানিযে যায। আমরা এর আগে একখানি বইযে বলেছিলাম, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় জীবনানন্দ বইযের প্রকাশক বিরাম মুখোপাধ্যাযের 'নির্বাচনের বিশেষ শুদ্ধতা'র যে প্রশংসা কবেছিলেন সে প্রশংসাই বটে তবে সৌজন্য, সত্য নয, কেন না কোনো বইয়ের ভিতরে এত বড়ো গুরুতর রদবদলের দাযিত্ব একমাত্র লেখকের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। এবং সে ক্ষেত্রে যদি তিনি কোনো গূঢ় রচনা কবতে চান, বিশেষ কারণবশেই তা করবেন। নতুন 'মহাপৃথিবী' বইয়ের সম্পাদকের কাছে এইটুকু সমস্যাভেদের প্রত্যাশা ছিল পাঠকের।

৪. সংযোজন কবিতা সূত্রে সম্পাদক লিখেছেন : 'এর পিছনে আমাদের বিনীত অভিপ্রায় ছিলো এই যে, 'মহাপৃথিবী' থেকে যে চোদ্দটি কবিতা অন্যত্র সরানো হয়েছে, অন্তত সেই সংখ্যক নতুন কবিতা যোগ ক'রে তাকে প্রায় একটি পূর্ববৎ আকারে দেয়া। জীবনানন্দের অনেক স্মরণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক কবিতা লুপ্ত হয়ে যাবার আগেই, অন্তত তার কয়েকটিকে, আমরা তাঁর অনুরাগীদেব কাছে তুলে দিতে

চাচ্ছিলুম।' আরো লিখেছেন, সংযোজনের এই 'দুষ্প্রাপ্য ও বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করার সময় তিনি [বুদ্ধদেব বসু] তাঁর ব্যক্তিগত দুর্লভ সংগ্রহকে অবারিতভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন' সম্পাদককে।এই দুর্লভ সংগ্রহ অবশ্য বুদ্ধদেবের নিজ সম্পাদিত কয় সংখ্যা 'কবিতা' ও 'বৈশাখী' (দ্র. এ বইয়ের 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী')। তার বাইরে যে একটি মাত্র কবিতা সম্পাদক সংযোজনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩৪৭ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'আবহমান' কবিতা, কবিতাটি জীবনানন্দ নিজেই ১৯৫৪ সালে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় মুদ্রিত করে গিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, 'কবিতা' ও 'ময়ূখে'র পঞ্জিতে উল্লিখিত জীবনানন্দের অগ্রন্থিত কবিতাগুলি তখনই সংকলিত হলে ভালো হত। পরে এই সব লেখা, তালিকার বাইরের আরো বহু লেখা (মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডুলিপি খাতার কবিতা অবিরলভাবে সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে) সংগ্রহ করে গ্রন্থবদ্ধ করতে প্রভূত শ্রম করতে হয়েছে অনুরাগী গবেষকদের, এঁদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ, গোপালচন্দ্র রায়, সুব্রত রুদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ অনেক অগ্রন্থিত লেখা পত্রিকান্তরাল থেকে উদ্ধার করেছেন এবং সে সব লেখা জীবনানন্দের কবিতা ব্যাখ্যা স্থলে ব্যবহার করেছেন। গোপালচন্দ্র রায় 'জীবনানন্দ' সম্বন্ধে বহু তথ্যময় বই লিখেছেন, 'সুদর্শনা' নাম দিয়ে তাঁর নতুন একখানি কাব্যও সংগ্রহ করেছেন। পরে পরে 'মনবিহঙ্গম' ও 'আলোপৃথিবী' নামেও আরো দুখানি বইয়ে জীবনানন্দের বহু বিক্ষিপ্ত কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকের কাছে এই বইগুলির মূল্য অনেক। আমাদের এই বইয়ে অবশ্য কবি স্বয়ং গ্রন্থবদ্ধ করে যান নি সাময়িক পত্রে বা সংকলনে প্রকাশিত এমন সব লেখাই, অধিকাংশ স্থলে, আমরা 'অগ্রন্থিত কবিতা' পর্যায়ে পত্রিকায় তাদেব প্রকাশক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছি।

জাতীয় গ্রন্থাগাবে জীবনানন্দের ১৯৩১ থেকে মে-জুন ১৯৫৪ পর্যন্ত কবিতার ৪৮ খানি পাণ্ডুলিপি খাতা রক্ষিত হয়েছে (১ থেকে ৪৭ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া, ৩৫ নম্বরটি ৩৫ক ও ৩৫খ দুখানি খাতা, খাতা অবশ্য দেখতে হয়েছে মাইক্রোফিল্‌ম্‌ থেকে)। রুল টানা এক্‌সারসাইজ খাতা, আরম্ভে কবির স্বাক্ষব ও মাস/ সাল লেখা। মাস বা সাল হয়তো রচনাকাল নয়, অনুলিপি করে তোলার তারিখ। বিস্তর কাটাকুটি আছে অনেক কবিতায়। অনেক কবিতাব খসড়া, সংশোধন ও চূড়ান্ত পাঠ কখনও এক কখনও একাধিক পৃষ্ঠায় ও অনুলেখায় দেখতে পাওয়া যায়। পরের দিকে এক কবিতা কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায় দুই খাতাকে। দীর্ঘ কবিতা স্থলে অনেক সময় এক বা বিভিন্ন খাতার একাধিক অংশ গ্রথিত করেও সে লেখাব চূড়ান্ত রূপ পবে স্থির হয়েছে। 'ঝবা পালকে'র লেখা নেই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র তিনটি কবিতা আছে ৩ ৪ ও ৯ নম্বর খাতায়। 'বনলতা সেন' থেকে অধিকাংশ কবিতাই রক্ষিত আছে ক্রমান্বয় পাণ্ডুলিপিতে। যাবতীয় মুদ্রিত কবিতার একটা রচনাক্রম আমরা প্রস্তুত কবে দিতে চেষ্টা কবেছি 'পাণ্ডুলিপি' পর্যাযে (পৃ ৭৬২--৭৬৭), পাণ্ডুলিপি খাতাব সাহায্যে। পরিচিত লেখার খসড়া বা প্রাথমিক পাঠ, বর্জিতাংশ এবং সমান্তরপ্রতিম দ্বিতীয় লেখাও কিছু কিছু সন্নিবেশ কবে দিয়েছি পরিশেষে: 'খসড়া, পাঠান্তর, আনুষঙ্গিক কবিতা' (পৃ ৬৮৭-৬২৭) পর্যাযে।

পাণ্ডুলিপি খাতা দেখবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারেব অধ্যক্ষ শ্রীমতী কল্পনা দাশগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। খাতা ও ছাপাব পাঠ মেলানোব কালে গ্রন্থাগারের রেয়ার ডিভিশনের শ্রীমতী সুপ্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায় বহু সাহায্য করেছেন। বইপত্র সংগ্রহ করে দিয়ে, কপি প্রস্তুত করে দিয়ে, আরো নানাভাবে সহাযতা করেছেন শ্রী সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য শ্রী অনুপ চক্রবর্তী শ্রী সুবিমল লাহিড়ী শ্রী অসীম বিশ্বাস শ্রীমতী বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক দূর পর্যন্ত প্রুফ শোধনের দাযিত্ব নিয়েছিলেন শ্রী সুবিমল লাহিড়ী । বইযের 'প্রথম ছত্রের সূচীপত্র' প্রস্তুত করে দিযেছেন শ্রীমতী রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণবদ্ধ। চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক ভুলচুক রযে গেল বইযেব নানা স্থানে, সে বিষযে সহৃদয পাঠকমহাশযগণের অনুকম্পা প্রার্থনা করি।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ

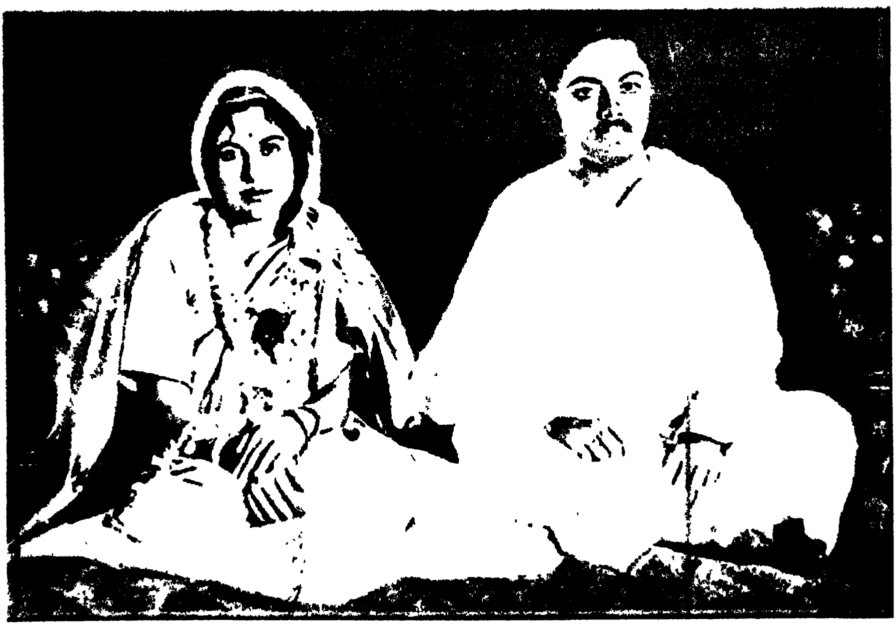
'শ্রেষ্ঠ কবিতায় গৃহীত পাঁচখানি কাব্যের ৫৪টি কবিতা কিছু কিছু সংস্কার করে কবি ছেপেছিলেন। ওই কবিতা কয়টির ক্ষেত্রে এ বইয়ে কবি-কৃত সেই পরিণাম-সংস্কার অবধারণ করে পাঠ নিরূপণ করা হয়েছে। কবিতা বিন্যাসের প্রথম সংস্করণ বইয়ের ক্রমই মানা হয়েছে আগাগোড়া।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়





বর বেশে জীবনানন্দ



কবির বিবাহ-বাসর, ঢাকা ১৯৩০



ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির ভিতরের উঠোনে। ছবি : সুরজিৎ দাশগুপ্ত



ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে ছবি : সুরজিৎ দাশগুপ্ত



ছবির উপর দিক থেকে নীচে প্রথম সারি ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ ছোটো কাকা, [illegible] দাশ। সেজকাকা, অতুলানন্দ দাশ। অতুলানন্দের কোলে ঃ বড়, জীবনানন্দের জ্যাঠতুতো বোন। সুন্দর কাকা, যোগানন্দ দাশ। বাবা, সত্যানন্দ দাশ। [illegible]কাকা, ব্রহ্মানন্দ দাশ। পিসেমশাই, মনমোহন চক্রবর্তী। ভগ্নীপতি, ব্রজসুন্দর রায়।

ছবির উপর দিক থেকে নীচে দ্বিতীয় সারি ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ ছোটো কাকিমা, প্রভা দাশ। মেজো কাকিমা, সরযূ দাশ। সুন্দর কাকিমা, প্রফুল্ল দাশ। মা, কুসুমকুমারী দাশ। বড় জ্যোঠিমা, সুশীলা দাশ। বড় পিসিমা, প্রিয়ংবদা সেন। মেজ পিসিমা, প্রমদা চক্রবর্তী। ছোটো পিসিমা, স্নেহলতা দাশ। মেনকা পিসিমা (সত্যানন্দের সম্পর্কিত বোন)।

ছবির উপর দিক থেকে নীচে তৃতীয় সারি ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ খুড়তুতো বোন, বুলু। ছোটো বোন, সুচরিতা দাশ। খুড়তুতো বোন, বেবি (শোভনা)। জ্যাঠতুতো দিদি, সুষমা। জ্যাঠতুতো দিদি, অমিয়া। পিসতুতো দিদি, টুলুদি। স্ত্রী, লাবণ্য দাশ। বড় পিসিমার নাতনি, সুতু। খুড়তুতো বোন, বেলা।

ছবির উপর দিক থেকে নীচে চতুর্থ সারি ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ বোঝা যাচ্ছে না। জ্যাঠতুতো দিদি অমিয়ার ছেলে, অমিতসুন্দর। খুড়তুতো ভাই, বিমলানন্দ। জীবনানন্দ। পিসতুতো ভাই, কল্যাণ চক্রবর্তী। খুড়তুতো ভাই, অরুণানন্দ। বোঝা যাচ্ছে না।

ছবির সব চেয়ে নিচের সারি ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ খুড়তুতো বোন, কমলা (নীলু)। খুড়তুতো বোন, সুপ্রিয়া। খুড়তুতো বোন, নন্দিতা। (বাণু)। খুড়তুতো ভাই, অজয়ানন্দ। খুড়তুতো বোন, কল্যাণী (কল্লু)। জ্যাঠতুতো দিদি সুষমার ছেলে, বাদল। জ্যাঠতুতো দিদি অমিয়ার ছেলে, বেণু। খুড়তুতো বোন, চিত্রা (মিনু)। জ্যাঠতুতো দিদি অমিয়ার মেয়ে, ইন্দিরা, (পুতুল)।

জীবনানন্দের বিয়ের ঠিক পরে-পরেই তোলা ছবি। তাঁদের বেশির ভাগ সদস্যের এ-রকম মহামিলন এর পরে আর কখনো ঘটে নি।



দাঁড়িয়ে ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত, অশোকানন্দ দাশ, সুচরিতা দাশ
চেয়ারে ব'সে ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ নলিনী দাশ, কুসুমকুমারী দাশ, লাবণ্য দাশ,
ব'সে ঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ মঞ্জুশ্রী দাশ, অমিতানন্দ দাশ, সমরানন্দ দাশ



মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর আগে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে নয়া দিল্লীর রাজঘাটে তোলা হয়েছিল এই চিত্রটি। কবি তখন দিল্লী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কবির সংগে কবিপত্নী, কন্যা, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র।



অন্তিম শয়ানে কবি-মাতা কুসুমকুমারী দাশ ঃ বাঁদিক থেকে ডাইনে ঃ মাসিমা-হেমন্তকুমারী সেন, ছোট পিসীমা-স্নেহলতা দাশ, ভ্রাতৃবধূ-নলিনী দাশ, কবিকন্যা-মঞ্জুশ্রী দাশ, (পেছনে) কবিপত্নী-লাবণ্য দাশ, পুত্র-সমরানন্দ দাশ, (পেছনে) কবিভগ্নী-সুচরিতা দাশ, (পেছনে) নলিনী দাশের পিতা অরুণনাথ চক্রবর্তী, অশোকানন্দ দাশ, (সামনে) পিসতুতো ভাইয়ের পুত্র আশিস চক্রবর্তী, (পেছনে) সেজকাকা অতুলানন্দ দাশ, নিজে জীবনানন্দ দাশ ও পরিবারের আরো কয়েকজন



রাসবিহারী এ্যাভিন্যু ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলের কাছে এই চিহ্নিত স্থানে ট্রাম দুর্ঘটনা হয়েছিল



অন্তিম শয়ানে কবি জীবনানন্দ



কবি জীবনানন্দের মরদেহের চারিপাশে আত্মীয় পরিজন। দেখা যাচ্ছে ভাই অশোকানন্দ দাশ, কন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ, বোন সুচরিতা দাশ, পুত্র সমরানন্দ দাশ, পত্নী লাবন্য দাশকে



বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয় : এই স্কুলে কবি পড়তেন



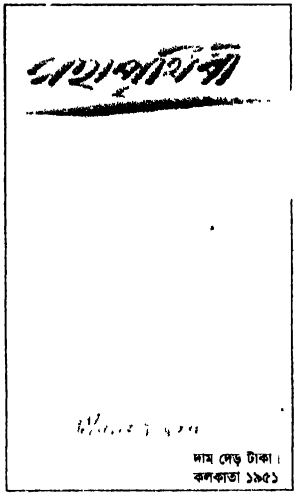
বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ : এখানে অধ্যাপনা করতেন কবি।

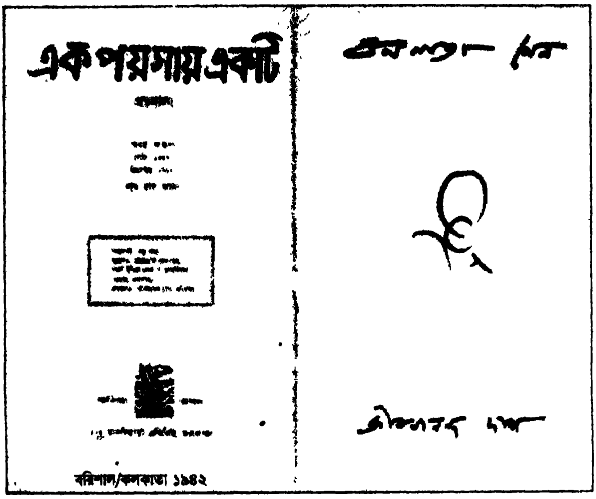


বরিশালে জীবনানন্দ এই ঘরেই থাকতেন। এই ঘরেই তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতার জন্ম। একেবারে বাঁদিকের জানলার পাশে ছিল লেখার টেবিল। মূল ঘরটি ১৯৬৫ সালের তুমুল ঝরে পড়ে যায়। গোলপাতার ছাউনি ছিল ওপরে। দেয়ালের খানিকটা ছিল মাটির। পরে টিনের চাল হয়েছে।





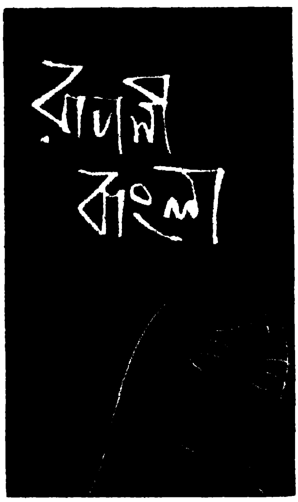

মহাপৃথিবী
দাম দেড় টাকা।
কলকাতা ১৯৫১


এক পয়সায় একটি
বরিশাল/কলকাতা ১৯৪২
বনলতা সেন
জীবনানন্দ দাশ



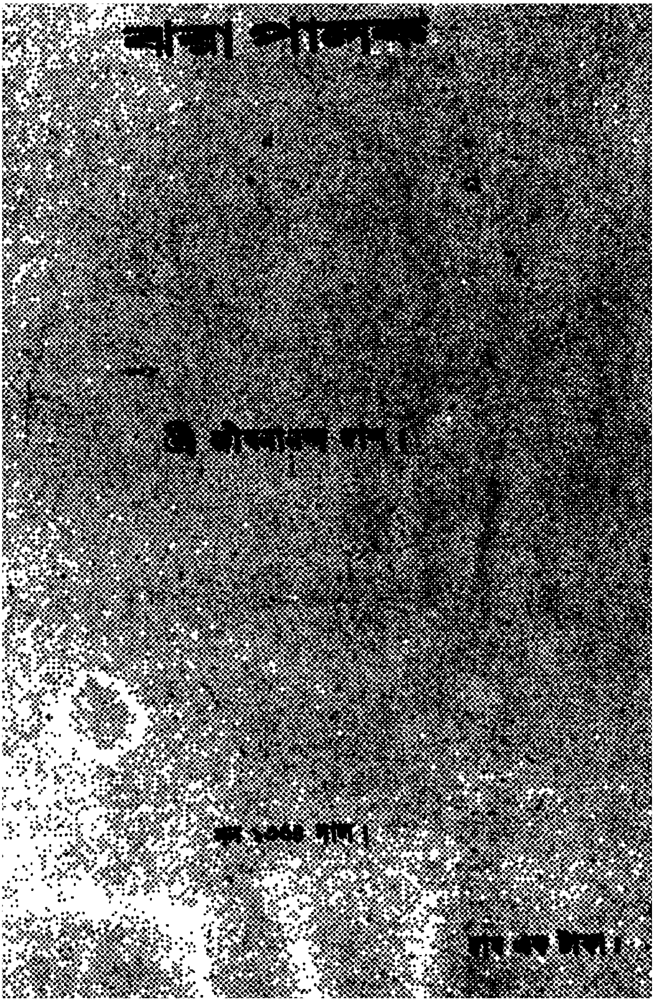

সাতটি তারার তিমির




রূপসী বাংলা

ঝরা পালক

১৯২৭



'ঝরা পালক' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র। কলকাতা ১৯:

প্রকাশক,
শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার,
৯০।২এ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

এ, চৌধুরী,
ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২১এ১ কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা।

'ঝবা পালক প্রথম সংস্কবণেব মুদ্রণ-বিববণপত্র।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়াসু

ভূমিকা

ঝরা পালকের কতকগুলি কবিতা প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকিগুলি নূতন।

শ্রী জীবনানন্দ দাশ।

কলিকাতা,
১০ই আশ্বিন ১৩৩৪।

আমি কবি—সেই কবি

আমি কবি—সেই কবি—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি!
আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে!
মৌন নীলের ইশারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে!
বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে!
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি!

স্বপন-সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা ক'রে।
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হল না আমার সাধা—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়, পথে পথে ধায় ধাঁধা!
—নিমেষে পাসরি এই বসুধার নিয়তি-মানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভ'রে!

ভুঁয়ের চাঁপাটি চুমি
শিশুর মতন, শিরীষের বুকে নীরবে পড়ি গো নুমি!
ঝাউয়েব কাননে মিঠা মাঠে মাঠে মটব-ক্ষেতেব শেষে
তোতার মতন চকিতে কখন আমি আসিয়াছি ভেসে!
—ভাটিযাল সুর সাঁঝের আঁধাবে দবিয়ার পারে মেশে,—
বালুর ফরাশে ঢালু নদীটির জলে ধোঁযা ওঠে ধূমি!

বিজন তারার সাঁঝে
আমাব প্রিয়ের গজল-গানের বেওযাজ বুঝি বা বাজে!
পড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখিব নষ্ট নীড়!
হেথায় বেদনা মা-হারা শিশুর, শুধু বিধবার ভিড়!
কোন্ যেন এক সুদূর আকাশ গোধূলিলোকের তীর
কাজের বেলায ডাকিছে আমারে, ডাকে অকাজের মাঝে!

নীলিমা

রৌদ্র ঝিল্‌মিল,
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথেব নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারেবারে
নিঃসহায় নগরীর কাবাগার-প্রাচীরের পারে!
—উদ্‌বলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুন্ডলী,
উগ্র চুল্লিবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,
আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা!
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার, পায় নাকো পথের সন্ধান

চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল;
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধিবিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী।
জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবি
কোন্ দূর জাদুপুর–রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধিরলিপিকা
জ্বলে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!
বসুধার অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কাবাগার,
এই ধুলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়,—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

নব নবীনের লাগি

—নব নবীনের লাগি
প্রদীপ ধরিযা আঁধারের বুকে আমরা রয়েছি জাগি!
ব্যর্থ পঙ্গু খর্ব প্রাণের-বিকল শাসন ভেঙে,
নব আকাঙ্ক্ষা আশার স্বপনে হৃদয় মোদের রেঙে,
দেবতার দ্বারে নবীন বিধান—নতুন ভিক্ষা মেগে
দাঁড়ায়েছি মোরা তরুণ প্রাণের অরুণের অনুরাগী!

ঝড়ের বাতাস চাই!
—চারি দিক ঘিরে শীতের কুহেলি, শ্মশানপথের ছাই,
ছড়ায়ে রয়েছে পাহাড়প্রমাণ মৃতের অস্থি খুলি,
কে সাজাবে ঘর–দেউলের পর কঙ্কাল তুলি তুলি?
সূর্যচন্দ্র নিভায়ে কে নেবে জরার চোখের ঠুলি!
—মরার ধরায় জ্যান্ত কখনও মাগিতে যাবে কি ঠাঁই!

—ঘুমায়ে কে আছে ঘরে!
মৃতশিশু–বুকে কল্যাণী পুরকামিনী কি আজ মরে!
কে আছে বসিয়া হতাশ উদাস অলস অন্যমনা?
দোদুল আকাশে দুলিয়া উঠিছে রাঙা অশনির ফণা,
বাজে বাদলের রঙ্গমল্লী, ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা!
ফিরিছে বালক ঘর–পলাতক ঝরা পালকের ঝড়ে!

আমরা অশ্বারোহী!—

যাযাবর যুবা, বন্দিনীদের ব্যথা মোরা বুকে বহি,
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি,
মোদের প্রাণের পূজার দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি,
চুয়া-চন্দন-গন্ধ বিলায়ে আমরা ঝরিয়া পড়ি,
সুবাস ছড়াই উশীরের মতো, ধুপের মতন দহি!

গাহি মানবের জয়!
—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয়!
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি বুকে কোটি দেউটি জ্বলিছে—কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানবদেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয়!
—জয় মানবের জয়!

কিশোরের প্রতি

যৌবনের সুরাপাত্র গরল-মদির
ঢালোনি অধরে তব, ধরা-মোহিনীর
উর্দ্ধফণা মায়া-ভুজঙ্গিনী
আসেনি তোমার কাম্য উরসের পথটুকু চিনি,
চুমিয়া চুমিয়া তব হৃদয়ের মধু
বিষবহ্নি ঢালে নিকো বাসনার বধূ
অন্তরের পানপাত্রে তব;
অম্লান আনন্দ তব, আপ্লুত উৎসব,
অশ্রুহীন হাসি,
কামনার পিছে ঘুরে সাজোনি উদাসী।
ধবল কাশের দলে, আশ্বিনের গগনের তলে
তোর তরে রে কিশোর, মৃগতৃষ্ণা কভু নাহি জ্বলে!
নয়নে ফোটে না তব মিথ্যা মরূদ্যান।
অপরূপ রূপ-পরীস্থান
দিগন্তের আগে
তোমার নির্মেঘ চক্ষে কভু নাহি জাগে!
আকাশকুসুমবীথি দিয়া
মাল্য তুমি আনো না রচিয়া,
উধাও হও না তুমি আলেয়ার পিছে
ছলাময় গগনের নিচে!
—রূপ-পিপাসায় জ্বলি মৃত্যুর পাথারে
স্পন্দহীন প্রেতপুরদ্বারে
করো নিকো করাঘাত তুমি
সুধার সন্ধানে লক্ষ বিষপাত্র চুমি
সাজো নিকো নীলকণ্ঠ ব্যাকুল বাউল!
অধরে নাহিকো তৃষ্ণা, চক্ষে নাহি ভুল,

রক্তে তব অলক্ত যে পরে নাই আজো রানী,
রুধির নিঙাড়ি তব আজো দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন!
কারাগার নাহি তব, নাহিক বন্ধন;
দীঘল পতাকা, বর্শা তন্দ্রাহারা প্রহরীর লওনি তুলিয়া,
—সুকুমার কিশোরের হিয়া!
—জীবনসৈকতে তব দুলে যায় লীলায়িত লঘুনৃত্য নদী,
বক্ষে তব নাচে নিকো যৌবনের দুরন্ত জলধি;
শূল-তোলা শম্ভুর মতন
আস্ফালিয়া উঠে নাই মন
মিথ্যা বাধাবিধানের ধ্বংসের উল্লাসে!
তোমার আকাশে
দ্বাদশ সূর্যের বহ্নি ওঠে নিকো জ্বলি
কক্ষচ্যুত উল্কাসম পড়ে নিকো স্খলি,
কুজ্ঝটিকা-আবর্তের মাঝে
অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গের সাজে!
সব বিঘ্ন সকল আগল
ভাঙিয়া জাগোনি তুমি স্পন্দন-পাগল
অনাগত স্বপ্নের সন্ধানে
দুরন্ত দুরাশা তুমি জাগাও নি প্রাণে।
নিঃস্ব দুটি অঞ্জলির আকিঞ্চন মাগি
সাজো নিকো দিক্‌ভোলা দিওয়ানা বৈরাগী!
পথে পথে ভিক্ষা মেগে কাম্য কল্পতরু
বাজাওনি শ্মশান-ডমরু!
জ্যোৎস্নাময়ী নিশি তব, জীবনের অমানিশা ঘোর
চক্ষে তব জাগে নি কিশোর!
আঁধারের নির্বিকল্প রূপ,
স্পন্দহীন বেদনার কূপ
রুদ্ধ তব বুকে;
তোমার সম্মুখে
ধরিত্রী জাগিছে ফুল্ল সুন্দরীর বেশে,
নিত্য বেলাশেষে
যেই পুষ্প ঝরে,
যে বিরহ জাগে চরাচরে
গোধূলির অবসানে শোকম্লান সাঁঝে,
তাহার বেদনা তব বক্ষে নাহি বাজে;
আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া জ্বাল নাই চিতা,
ব্যথার সংহিতা
গাহ নাই তুমি!
দরিয়ার তীর ছাড়ি দেখ নাই দাব-মরুভূমি
জ্বলন্ত নিষ্ঠুর!
নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে যেই মৃত্যুপ্রেতপুর,
ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি
ছন্দ তার মর্মে তব ওঠে না প্রকাশি!
সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী
মলিন করেনি তব মানসের ছবি,

ফেনিল করেনি তব নভোনীল, প্রভাতের আলো,
এ উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের বক্ষে তার রশ্মি আজ ঢালো, বন্ধু, ঢালো!

মরীচিকার পিছে —

ধূম্র তপ্ত আঁধির কুয়াশা তরবারি দিয়ে চিরে
সুন্দর দূর মরীচিকাতটে ছলনামায়ার তীরে
ছুটে যায় দুটি আঁখি!
—কত দূর হায় বাকি!
উধাও অশ্ব বল্গাবিহীন অগাধ মরুভূ ঘিরে,
পথে পথে তার বাধা জ'মে যায়,—তবু সে আসে না ফিরে!

দূরে—দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে,
অসীম মরুর পারাবার-পারে আকাশ-সীমানা জুড়ে
ভাসিয়াছে মরুতৃষা!
—হিয়া হারায়েছে দিশা!
কে যেন ডাকিছে আকুল অলস উদাস বাঁশির সুরে
কোন্ দিগন্তে নির্জন কোন্ মৌন মায়াবী-পুরে!

কোন্-এক সুনীল দরিয়া সেথায় উথলিছে অনিবার!
—কান পেতে একা শুনেছে সে তার অপরূপ ঝঙ্কার,
ছোটে অঞ্জলি পেতে,
তৃষার নেশায় মেতে,
ঊষর ধূসর মরুর মাঝারে এমন খেয়াল কার!
খুলিয়া দিয়াছে মাতাল ঝর্ণা না জানি কে দিলদার!

কে যেন রেখেছে সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা পাতি!
যত খুন যত খাবাবীর ঘোরে পরান আছিল মাতি,
নিমেষে গিয়েছে ভেঙে
স্বপন-আবেশে রেঙে
আঁখি দু'টি তার জৌলস্-রাঙা হ'য়ে গেছে রাতারাতি!
কোন্ যেন এক জীন-সর্দার সেজেছে তাহার সাথী।

কোন্ যেন পরী চেয়ে আছে দু'টি চঞ্চল চোখ তুলে!
পাগ্‌লা হাওয়ায় অনিবার তার ওড়না যেতেছে দুলে!
গেঁথে গোলাপের মালা
তাকায়ে রয়েছে বালা,
বিলায়ে দিয়েছে রাঙা নার্গিস্ কালো পশমিনা চুলে!
বসেছে বালিকা খর্জুরছায়ে নীল দরিয়ার কূলে।

ছুটিছে ক্লিষ্ট ক্লান্ত অশ্ব কশাঘাত-জর্জর,
চারিদিকে তার বালুর পাথার,—মরুর হাওয়ার ঝড়;
নাহি শ্রান্তির লেশ,

সুদূর নিরুদ্দেশ—
অসীম কুহক পাতিয়া রেখেছে তাহার বুকের পর!
পথের তালাশে পাগল সোযার হারাযে ফেলেছে ঘর!

আঁখির পলকে পাহাড়ের পারে কোথা সে ছুটিয়া যায়!
চকিত আকাশ পায না তাহার নাগাল খুঁজিয়া হায!
ঝড়ের বাতাস মিছে
ছুটিছে তাহার পিছে!
মরুভূর প্রেত চমকিযা তার চক্ষের পানে চায়—
সুরার তালাশে চুমুক দিল কে গরলের পেয়ালায়!

জীবন-মরণ দুয়ারে আমার

সরাইখানার গোলমাল আসে কানে,
ঘরের সার্সি বাজে তাহাদের গানে,
পর্দা যে উড়ে যায
তাদের হাসির ঝড়ের আঘাতে হায়!
—মদের পাত্র গিয়েছে কবে যে ভেঙে!
আজও মন ওঠে রেঙে
দিলদাবদের দরাজ গলার রবে,
সরায়ের উৎসবে!
কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হায
পেযালা তাদের থেকে থেকে বেজে যায
বেহুঁশ হাওযার বুকে!
সারা জনমের শুষে-নেওয়া খুন নেচে ওঠে মোর মুখে!
পাণ্ডুর দু'টি ঠোঁটে
ডালিম ফুলের রক্তিম আভা চকিতে আবাব ফোটে!
মনের ফলকে জ্বলিছে তাদের হাসিভরা লাল গাল,
ভুলে গেছে তারা এই জীবনের যত কিছু জঞ্জাল!
আখেরের ভয ভুলে
দিলওয়ার প্রাণ খুলে
জীবন-রবাবে টানিছে ক্ষিপ্ত ছড়ি!
অদূরে আকাশে মধুমালতীর পাপড়ি পড়িছে ঝরি—
নিভিছে দিনের আলো;
—জীবন-মরণ দুযারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো
একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন!
পূর্ণ হয়নি পিপাসী প্রাণের একটি আকিঞ্চন,
খুলি নি একটি দল,—
যৌবন শতদলে মোর হায় ফোটে নাই পরিমল!
উৎসব-লোভী অলি
আসে নি হেথায—
কীটের আঘাতে শুকাযে গিয়েছে কবে কামনার কলি!

—সারাটি জীবন বাতায়নখানি খুলে
তাকায়ে দেখেছি নগরী-মরুতে ক্যারাভেন্ যায় দুলে
আশা-নিরাশার বালু-পারাবার বেয়ে,
সুদূর মরূদ্যানের পানেতে চেয়ে!
সুখদুঃখের দোদুল ঢেউয়ের তালে
নেচেছে তাহারা—মায়াবীর জাদুজালে
মাতিয়া গিয়েছে খেয়ালী মেজাজ খুলি,
মৃগতৃষ্ণার মদের নেশায় ভুলি!
মস্তানা সেজে ভেঙে গেছে ঘরদোর,
লোহার শিকের আড়ালে জীবন লুটায়ে কেঁদেছে মোর!
কাবার ধূলায় লুণ্ঠিত হ'য়ে বান্দার মতো হায়
কেঁদেছে বুকের বেদুঈন মোর দুরাশার পিপাসায়!
জীবনপথের তাতার দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলি উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি
মোর গবাক্ষে কবে!
কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্তব্ধ নভে!
আতুর নিদ্রা চকিতে গিয়েছে ভেঙে,
সারাটি নিশীথ খুন রোশনাই প্রদীপে মনটি রেঙে
একাকী রয়েছি বসি,
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাই নি যে তাহা টের!
—দূর দিগন্তে চ'লে গেছে কোথা খুশবোজী মুসাফের!
কোন্ সুদূরের তুবাণী-প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে!
দীর্ঘ দিবস ব'য়ে গেছে যারা হাসি-অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের 'রোজা';
আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয় নি যে হায় দেখা,
পরানে কখনও জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা!
কি যে মিঠা এই সুখের দুখের ফেনিল জীবনখানা!
এই যে নিষেধ, এই যে বিধান,—আইন কানুন, এই যে শাসন মানা,
ঘরদোর ভাঙা তুমুল প্রলয়ধ্বনি
নিত্য গগনে এই যে উঠিছে রণি
যুবানবীনের নটনর্তন তালে,
ভাঙনের গান এই যে বাজিছে দেশে দেশে কালে কালে,
এই যে তৃষ্ণা-দৈন্য-দুরাশা-জয়-সংগ্রাম-ভুল
সফেন সুরার ঝাঁঝের মতন ক'রে দেয় মশগুল
দিওয়ানা প্রাণের নেশা!
ভগবান, ভগবান, তুমি যুগ যুগ থেকে ধ'রেছ শুঁড়ির পেশা!
—লাখো জীবনের শূন্য পেয়ালা ভরি দিয়া বারবার
জীবন-পান্থশালার দেয়ালে তুলিতেছে ঝঙ্কার—
মাতালের চীৎকার!
অনাদি কালের থেকে;
মরণশিয়রে মাথা পেতে তার দস্তুর যাই দেখে!

হেরিলাম দূরে বালুকার পরে রূপার তাবিজ প্রায়
জীবনের নদী কল্লোলে ব'য়ে যায়!
কোটি শুঁড় দিয়ে দুখের মরুভূ নিতেছে তাহারে শুষে,
ছলা-মরীচিকা জ্বলিতেছে তার প্রাণের খেয়াল-খুশে!
মরণ-সাহারা আসি
নিতে চায় তারে গ্রাসি—
তবু সে হয় না হারা
ব্যথার রুধিরধারা
জীবনমদের পাত্র জুড়িয়া তার
যুগ যুগ ধরি অপরূপ সুরা গড়িছে মশলাদার!

বেদিয়া

চুলিচালা সব ফেলেছে সে ভেঙে, পিঞ্জরহারা পাখি!
পিছু ডাকে কভু আসে না ফিরিযা, কে তারে আনিবে ডাকি?
উদাস উধাও হাওযার মতন চকিতে যায সে উড়ে,
গলাটি তাহার সেধেছে অবাধ নদী-ঝর্ণার সুরে;
নয সে বান্দা রংমহলের, মোতিমহলের বাঁদী,
ঝোড়ো হাওযা সে যে, গৃহ প্রাঙ্গনে কে তাবে রাখিবে বাঁধি।
কোন্ সুদূরের বেনামী পথের নিশানা নেছে সে চিনে,
ব্যর্থ ব্যথিত প্রান্তব তার চবণচিহ্ন বিনে!
যুগযুগান্ত কত কান্তার তার পানে আছে চেযে,
কবে সে আসিবে ঊষর ধূসর বালুকা-পথটি বেযে
তাবি প্রতীক্ষা মেগে ব'সে আছে ব্যাকুল বিজন মরু!
দিকে দিকে কত নদী-নির্ঝর কত গিরি চূড়া-তরু
ঐ বাঞ্ছিত বন্ধুর তবে আসন রেখেছে পেতে
কালো মৃত্তিকা ঝরা কুসুমের বন্দনা-মালা গেঁথে
ছড়াযে পড়িছে দিক্‌দিগন্তে ক্ষ্যাপা পথিকের লাগি!
বাবলা বনের মৃদুল গন্ধে বন্ধুর দেখা মাগি
লুটাযে রযেছে কোথা সীমান্তে শরৎ উষার শ্বাস!
ঘুঘু-হবিযাল-ডাহুক-শালিক-গাঙচিল-বুনোহাঁস
নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিবে ফিরে
বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে!
তারি লাগি ভায় ইন্দ্রধনুক নিবিড় মেঘের কূলে,
তাবি লাগি আসে জোনাকি নামিযা গিরিকন্দরমূলে!
ঝিনুক-নুড়িব অঞ্জলি ল'যে কলরব ক'রে ছুটে
নাচিযা আসিছে অগাধ সিন্ধু তারি দু'টি করপুটে।
তারি লাগি কোথা বালুপথে দেখা দেয হীরকের কোণা,
তাহারি লাগিযা উজানী নদীর ঢেউযে ভেসে আসে সোনা!
চকিতে পরশপাথর কুড়াযে বালকের মতো হেসে
ছুঁড়ে ফেলে দেয় উদাসী বেদিযা কোন্ সে নিরুদ্দেশে!
যত্ন করিয়া পালক কুড়ায়, কানে গোঁজে বনফুল,
চাহে না রতন-মণিমঞ্জুষা হীরে-মানিকের দুল,

—তার চেয়ে ভালো অমল উষার কনক-রোদের সীথি,
তার চেয়ে ভালো আলো-ঝল্‌মল্‌ শীতল শিশিরবীথি,
তার চেয়ে ভালো সুদূর গিরির গোধূলি-রঙিন জটা,
তার চেয়ে ভালো বেদিয়া বালার ক্ষিপ্র হাসির ছটা!
কি ভাষা বলে সে, কি বাণী জানায়, কিসের বারতা বহে!
মনে হয় যেন তারি তরে তবু দুটি কান পেতে রহে
আকাশ-বাতাস-আলোক-আঁধার মৌন স্বপ্নভরে,
মনে হয় যেন নিখিল বিশ্ব কোল পেতে তার তরে!

নাবিক

কবে তব হৃদয়ের নদী
বরি নিল অসম্বৃত সুনীল জলধি!
সাগর-শকুন্ত-সম উল্লাসের রবে
দূর সিন্ধু-ঝটিকার নভে
বাজিয়া উঠিল তব দুরন্ত যৌবন!
পৃথ্বীব বেলায় বসি কেঁদে মরে আমাদেব শৃঙ্খলিত মন!
কারাগার-মর্মরের তলে
নিরাশ্রয় বন্দীদের খেদ-কোলাহলে
ভ'রে যায় বসুধার আহত আকাশ!
অবনত শিরে মোরা ফিরিতেছি ঘৃণ্য বিধিবিধানেব দাস!
—সহস্রের অঙ্গুলিতর্জন
নিত্য সহিতেছি মোরা—বাবিধির বিপ্লব-গর্জন
বরিয়া লযেছ তুমি, তারে তুমি বাসিয়াছ ভালো;
তোমার পঞ্জরতলে টগবগ্‌ করে খুন—দুবন্ত, ঝাঁঝালো—
তাই তুমি পদাঘাতে ভেঙে গেলে অচেতন বসুধার দ্বার,
অবগুণ্ঠিতাব
হিমকৃষ্ণ অঙ্গুলির কঙ্কাল-পবশ
পবিহরি গেলে তুমি—মৃত্তিকার মদ্যহীন রস
তুহিন নির্বিষ নিঃস্ব পানপাত্রখানা
চকিতে চূর্ণিযা গেলে—সীমাহাবা আকাশের নীল শামিযানা
বাড়ব-আরক্ত স্ফীত বারিধিব তট,
তরঙ্গের তুঙ্গ গিরি, দুর্গম সঙ্কট
তোমারে ডাকিয়া নিল মাযাবীর রাঙা মুখ তুলি!
নিমেষে ফেলিয়া গেলে ধরণীর শূন্য ভিক্ষাঝুলি!
প্রিযার পাণ্ডুব আঁখি অশ্রু-কুহেলিকা-মাখা গেলে তুমি ভুলি!
ভুলে গেলে ভীরু হৃদয়ের ভিক্ষা, আতুরের লজ্জা অবসাদ,—
অগাধের সাধ
তোমারে সাজাযে দেছে ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা সিন্দবাদ্‌!
মণিময় তোরণের তীরে
মৃত্তিকার প্রমোদ-মন্দিরে
নৃত্য-গীত-হাসি-অশ্রু-উৎসবের ফাঁদে

হে দুরন্ত দুর্নিবার—প্রাণ তব কাঁদে!
ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর—শের!
টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের
হে জলধি—পাখি!
পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী-বৈশাখী!
ললাটে জ্বলিছে তব উদযাস্ত আকাশের বত্নচূড় ময়ূখের টিপ,
কোন্ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে!
বিচিত্র বিহঙ্গ কোন্ মণিময় তোরণের দ্বারে
সহর্ষ নয়ন মেলি হেরিয়াছ কবে!
কোথা দূরে মায়াবনে পরীদল মেতেছে উৎসবে—
স্তম্ভিত নয়নে
নীল বাতায়নে
তাকায়েছ তুমি!
অতি দূর আকাশের সন্ধ্যারাগ-প্রতিবিম্বে প্রস্ফুটিত সমুদ্রের
আচম্বিত ইন্দ্রজাল চুমি
সাজিয়াছ বিচিত্র মায়াবী!
সৃজনের জাদুঘর-রহস্যের চাবি
আনিয়াছ কবে উন্মোচিয়া
হে জল-বেদিয়া!
অলক্ষ্য বন্দর পানে ছুটিতেছ তুমি নিশিদিন
সিন্ধু বেদুইন!
নাহি গৃহ, নাহি পান্থশালা—
লক্ষ লক্ষ ঊর্মি-নাগবালা
তোমারে নিতেছে ডেকে রহস্যপাতালে—
বারুণী যেথায় তাব মণিদীপ জ্বালে!
প্রবাল-পালঙ্ক-পাশে মীননারী ঢুলায় চামর!
সেই দুরাশার মোহে ভুলে গেছ পিছু-ডাকা স্বব
ভুলেছ নোঙর!
কোন্ দূর কুহকেব কূল
লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকেব হৃদয়-মাস্তুল
কে বা তাহা জানে!
অচিন আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে কানে!

বনের চাতক—মনের চাতক

বনের চাতক বাঁধল বাসা মেঘের কিনারায়—
মনের চাতক হারিয়ে গেল দূরের দুরাশায়!
ফুঁপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার ক্ষোভে—
সে কোন্ বোঁটের ফুলের ঠোঁটের মিঠা মদের লোভে

বনের চাতক—মনের চাতক কাঁদছে অবেলায়!

পুবের হাওয়ায় হাপর জ্বলে, আগুনদানা ফাটে!
কোন্ ডাকিনীর বুকের চিতায় পচিম আকাশ টাটে!
বাদল-বৌয়ের চুমার মৌয়েব সোয়াদ চেয়ে চেয়ে
বনের চাতক—মনের চাতক চলছে আকাশ বেয়ে,
ঘাটের ভরা কলসী ও-কার কাঁদছে মাঠে মাঠে!

ওরে চাতক, বনের চাতক, আয় বে নেমে ধীরে
নিঝুম ছায়া-বৌরা যেথা ঘুমায় দীঘি ঘিরে,
'দে জল!' বলে ফোঁপাস কেন? মাটির কোলে জল
খবর-খোঁজা সোজা চোখের সোহাগে ছল্‌ছল্!
মজিস নে রে আকাশ-মরুর মরীচিকাব তীবে!

বনের চাতক, হতাশ উদাস পাখায় দিয়ে পাড়ি
কোথায় গেলি ঘবেব কোণেব কানাকানি ছাড়ি?
ননীর কলস আছে রে তার কাঁচা বুকের কাছে,
আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে!
আয় রে ফিরে দানোয-পাওয়া, আয় রে তাড়াতাড়ি!

বনেব চাতক, মনের চাতক আসে না আর ফিরে,
কপোত-ব্যথা বাজায় মেঘেব শকুনপাখা ঘিরে!
সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে!
চিনিমাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠোঁটেব মাঝে
লুকিয়ে আছে সে-কোন্ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে!

সাগর-বলাকা

ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁশ হাওয়া ঠেলে
পাতলা পাখা দিলি বে তোব দূর-দুরাশায় মেলে!
ফেনার বৌয়ের নোন্‌তা মৌয়েব মদেব গেলাস লুটে,
ভোর-সাগরের শরাবখানায়—মুসল্লাতে জুটে
হিমের ঘুণে বেড়াস খুনের আগুনদানা জ্বেলে!

ওরে কিশোর, অস্তরাগেব মেঘের চুমায় রেঙে
নীল নহরেব স্বপন দেখে চৈতি চাঁদে জেগে,
ছুটছ তুমি ছলচ্ছল জলেব কোলাহলের সাথে কই!
উছলে ওঠে বুকে তোমার আল্‌তো ফেনা-সই!
ঢেউযেব ছিটার মিঠা আঙুল যাচ্ছে ঠোঁটে লেগে!

রে মুসাফের, পাতাল-প্রেতপুরের মরীচিকা
সাগর জলেব তলে বুঝি জ্বালিয়ে দেছে শিখা!

তাই কি গেলে ভেঙে হেথার বালিয়াড়ির বাড়ি!
দিচ্ছ যাযাবরের মতো সাগর-মরু পাড়ি—
ডাইনে তোমার ডাইনীমায়া, পিছের আকাশ ফিকা!

বাসা তোমার সাত সাগরের ঘূর্ণি হাওয়ার বুকে!
ফুটছে ভাষা কেউটে-ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে!
প্রয়াণ তোমার প্রবালদ্বীপে, পলার মালা গলে
বরুণরাণী ফিরছে যেথা, মুক্তাপ্রদীপ জ্বলে!
যেথায় মৌন মীনকুমারীর শঙ্খ ওঠে ফুঁকে।

যেইখানে মূক মায়াবিনীর কাঁকন শুধু বাজে
সাঁজসকালে, ঢেউয়ের তালে, মাঝসাগরের মাঝে!
যায় না জাহাজ যেথায়—নাবিক পায় না নাগাল যার,
লঘু উদাস পাখায় ভেসে আঁখির তলে তার
ঘুরছে অবুঝ, সে কোন্ সবুজ স্বপন-খোঁজার কাজে!

ওরে কিশোর, দূর-সোহাগী ঘর-বিরাগী সুখ!
—টুকটুকে কোন্ মেঘের পারে ফুট্‌ফুটে কার মুখ
ডাকছে তোদের ডাগর কাঁচা চোখের কাছে তার!
—শাদা শকুন-পাখায় যে তাই তুলছে হাহাকার
ফাঁপা ঢেউয়ের চাপা কাঁদন—ফাঁপর-ফাটা বুক!

চলছি উধাও

চলছি উধাও, বল্গাহারা—ঝড়ের বেগে ছুটি!
শিকল কে সে বাঁধছে পায়ে!
কোন্ সে ডাকাত ধরছে চেপে টুঁটি!
—আঁধার আলোর সাগরশেষে
প্রেতের মতো আসছে ভেসে!
আমার দেহের ছায়ার মতো, জড়িয়ে আছে মনের সনে,
যেদিন আমি জেগেছিলাম, সেও জেগেছে আমার মনে!
আমার মনের অন্ধকারে
ত্রিশূলমূলে, দেউলদ্বারে
কাটিয়েছে সে দুরন্ত কাল ব্যর্থ পূজার পুষ্প ঢেলে!
স্বপন তাহার সফল হবে আমায় পেলে, আমায় পেলে!
রাত্রিদিবার জোয়ারস্রোতে
নোঙরছেঁড়া হৃদয় হ'তে
জেগেছে সে হালের নাবিক,—
চোখের ধাঁধায়, ঝড়ের ঝাঁঝে—
মনের মাঝে—মনের মাঝে!
আমার চুমোর অন্বেষণে
প্রিয়ার মতো আমার মনে

অশ্রুহারা কাল ঘুরেছে কাতর দুটি নয়ন তুলে,
চোখের পাতা ভিজিয়ে তাহার আমার অশ্রুপাথার-কূলে!
ভিজে মাঠের অন্ধকারে কেঁদেছে মোর সাথে
হাতটি রেখে হাতে!
দেখিনি তার মুখখানি তো,
পাই নি তারে টের,
জানি নি হায় আমার বুকে আশেক, —অসীমের
জেগে আছে জনমভোরের সূতিকাগার থেকে!
কত নতুন শরাবশালায় নাবনু একে একে!
সরাইখানার দিল্‌পিয়ালায় মাতি
কাটিয়ে দিলাম কত খুশির রাতি!
জীবন-বীণার তারে তারে আগুন-ছড়ি টানি
গুঞ্জরিয়া এল গেল কত গানের বাণী,—
নাসপাতি-গাল গালে রাখি কানে কানে করলে কানাকানি
শরাব-নেশায় রাঙিয়ে দিল আঁখি!
—ফুলের ফাগে বেহুঁশ্ হোল নাকি!
হঠাৎ কখন স্বপন-ফানুস কোথায় গেল উড়ে!
—জীবন-মরু-মরীচিকার পিছে ঘুরে ঘুরে
ঘায়েল হ'য়ে ফিরল আমার বুকের ক্যারাভেন—
আকাশ-চরা শ্যেন!
মরু-ঝড়ের হাহাকারে মৃগতৃষ্ণার লাগি
প্রাণ যে তাহার রইল তবু জাগি
ইবলিশেরই সঙ্গে তাহার লড়াই হল শুরু!
দরাজ বুকে দিল্ যে উড়ু-উড়ু !
—ধূসর ধূ ধূ দিগন্তরে হারিয়ে-যাওয়া নার্গিসেরই শোভা
থরে থরে উঠলো ফুটে রঙিন—মনোলোভা!
অলীক আশার, দূর-দুরাশার দুয়ার ভাঙার তরে
যৌবন মোর উঠল নেচে রক্তমুঠি, ঝড়ের ঝুঁটির পরে!
পিছে ফেলে টিকে থাকার ফাটক-কারাগার,
ভেঙে শিকল, ধ্বসিয়ে ফাঁড়ির দ্বার
চলল সে যে ছুটে!
শৃঙ্খল কে বাঁধল তাহার পায়ে,—
চুলের ঝুঁটি ধরল কে তার মুঠে!
বর্শা আমার উঠল ক্ষেপে খুনে,
হুম্‌কি আমার উঠল বুকে রুখে!
দুশমন কে পথের সুমুখে!
—কোথায় কে বা!
এ কোন্ মায়া!
মোহ এমন কার!
বুকে আমার বাঘের মতো গর্জাল হুঙ্কার!
মনের মাঝের পিছুডাকা উঠল বুঝি হেঁকে—
সে কোন্ সুদূর তারার আলোর থেকে
মাথার পরের খাঁ খাঁ মেঘের পাথারপুরী ছেড়ে

নেমে এল রাত্রিদিবার যাত্রাপথে কে রে!
কী তৃষা তার! ...
কী নিবেদন!...
মাগছে কিসের ভিখ!...
উদ্যত পথিক
হঠাৎ কেন যাচ্ছে থেমে—
আজকে হঠাৎ থামতে কেন হয়!
—এই বিজয়ী কার কাছে আজ মাগছে পরাজয়!
পথ-আলেয়ার খেযায ধোঁয়ায় ধ্রুবতারার মতন কাহার আঁখি
আজকে নিল ডাকি
হালভাঙা এই ভূতের জাহাজটারে!
মড়ার খুলি—পাহাড়প্রমাণ হাড়ে
বুকে তাহার জ'মে গেছে কত শ্মশান-বোঝা!
আক্রোশে হা ছুটছিল সে একরোখা, একসোজা
চুম্বকেবি ধ্বংসগিবির পানে,
নোঙরহারা মাস্তুলেরই টানে!
প্রেতের দলে ঘুরেছিল প্রেমের আসন পাতি,
জানে কি সে বুকের মাঝে আছে তাহার সাথী!
জানে কি সে ভোরের আকাশ, লক্ষ তারার আলো
তাহার মনের দুয়ারপথেই নিরিখ হারালো!
জানেনি সে তাহার ঠোঁটের একটি চুমোর তরে
কোন্ দিওয়ানার সারেং কাঁদে
নয়নে নীর ঝরে!
কপোত-ব্যথা ফাটে রে কার অপার গগন ভেদি!
তাহার বুকের সীমার মাঝেই কাঁদছে কয়েদী
কোন্ সে অসীম আসি!
লক্ষ সাকীব প্রিয় তাহার বুকের পাশাপাশি
প্রেমের খবর পুছে
কবের থেকে কাঁদতে আছে—
'পেযালা দে বে মুঝে!'

একদিন খুঁজেছিনু যারে—

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
মালতীলতার বনে, কদমের তলে,
নিঝুম ঘুমের ঘাটে—কেয়াফুল, শেফালিব দলে!
—যাহারে খুঁজিযাছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিম ঘাসে যাহারে খুঁজিযাছিনু ঝরঝর
কামিনীব ব্যথাব শিযরে,
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দয় মসুদ চীনা তাতারের দলে,

আর্ত কোলাহলে
তুলিযাছি দিকে দিকে বাধা বিঘ্ন ভয়—
আজ মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনোদিন জ্বলে নাই শিখা!
—শুধু শেষনিশীথের ছায়া-কুহেলিকা,
শুধু মেরু-আকাশের নীহারিকা, তারা
দিয়ে যায় যেন সেই পলাতকা চকিতার সাড়া!
মাঠে ঘাটে কিশোরীর কাঁকনের রাগিণীতে তার সুর
শোনে নাই কেউ,
গাগরীর কোলে তার উথলিযা ওঠে নাই আমাদের
গাঙিনীর ঢেউ!
নামে নাই সাবধানী পাড়াগাঁর বাঁকা পথে চুপে চুপে
ঘোমটার ঘুমটুকু চুমি!
মনে হয় শুধু আমি, আর শুধু তুমি
আর ঐ আকাশের পউষ-নীরবতা
রাত্রির নির্জনযাত্রী তারকার কানে কানে কত কাল
কহিযাছি আধো-আধো কথা।
—আজ বুঝি ভুলে গেছ প্রিয়া!
পাতাঝরা আঁধারের মুসাফের-হিয়া
একদিন ছিল তব গোধূলির সহচর, ভুলে গেছ তুমি!
এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনিবার চুমি
আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ, শুধু অবসাদ!
মহুযার, ধুতুরার স্বাদ
জীবনের পেযালায ফোঁটা ফোঁটা ধরি
দুরন্ত শোণিতে মোর বারবার নিযেছি যে ভরি!
মসজেদ-সরাই-শরাব
ফুরায না তৃষা মোর,—জুড়ায না কলেজার তাপ!
দিকে দিকে ভাদরের ভিজা মাঠ—আলেযার শিখা!
পদে পদে নাচে ফণা,
পথে পথে কালো যবনিকা!
কাতর ক্রন্দন,—
কামনার কবর-বন্ধন!
কাফনের অভিযান, অঙ্গার সমাধি!
মৃত্যুর সুমেরু সিন্ধু অন্ধকারে বারবার উঠিতেছে কাঁদি!
মরমর্ কেঁদে ওঠে ঝরাপাতাভরা ভোররাতের পবন—
আধো আঁধারের দেশে
বারবার আসে ভেসে
কার সুর!—
কোন্ সুদূরের তরে হৃদয়ের প্রেতপুরে ডাকিনীর মতো
মোর কেঁদে মরে মন!

আলেয়া

প্রান্তরের পারে তব তিমিরের খেয়া
নীরবে যেতেছে দুলে নিদালি আলেয়া!
—হেথা, গৃহবাতায়নে নিভে গেছে প্রদীপের শিখা,
ঘোমটায় আঁখি ঘেরি রাত্রি-কুমারিকা
চুপে চুপে চলিতেছে বনপথ ধরি!
আকাশের বুকে বুকে কাহাদের মেঘের গাগরী
ডুবে যায় ধীরে ধীরে আঁধার সাগরে!
ঢুলু-ঢুলু তারকাব নয়নের পবে
নিশি নেমে আসে গাঢ়—স্বপনসঙ্কুল!
শেহালায় ঢাকা শ্যাম বালুকার কূল
বনমরালীব সাথে ঘুমায়েছে কবে!
বেণুবনশাখে কোন্ পেঁচকের রবে
চমকিছে নিরালা যামিনী!
পাতাল-নিলয় ছাড়ি কে নাগকামিনী
আঁকাবাঁকা গিরিপথে চলিয়াছে চিত্রা অভিসারিকাব প্রায়!
শ্মশানশয্যায়
নেভ-নেভ কোন্ চিতা-স্ফুলিঙ্গেরে ঘিরে
ক্ষুধিত আঁধার আসি জমিতেছে ধীরে!
নিদ্রার দেউলমূলে চোখ দুটি মুদে
স্বপ্নের বুদ্‌বুদে
বিলসিছে যবে ক্লান্ত ঘুমন্তেব দল—
হে অনল—উন্মুখ, চঞ্চল
উন্নমিত আঁখিদুটি মেলি
সন্তরি চলিছ তুমি রাত্রিব কুহেলি
কোন্ দূর কামনার পানে!
ঝলমল দিবা অবসানে
বধির আঁধারে
কান্তারের দ্বারে
এ কি তব মৌন নিবেদন!
—দিক্‌ভ্রান্ত—দরদী,-উন্মন!
পল্লীপসারিণী যবে পণ্যরত্ন হেঁকে গেছে চ'লে
তোমার পিঙ্গল আঁখি ওঠেনি তো জ্ব'লে
আকাঙ্খাব উলঙ্গ উল্লাসে!
—জনতায়—নগরীর তোরণের পাশে,
অন্তঃপুরিকার বুকে, মণিসৌধসোপানের তীরে,
মরকত-ইন্দ্রনীল-অয়স্কান্ত খনির তিমিরে
যাও নি তো কভু তুমি পাথেয়-সন্ধানে!
ভাঙা হাটে—ভিজা মাঠে—মরণের পানে
শীত প্রেতপুরে
একা একা মরিতেছ ঘুরে
না জানি কী পিপাসাব ক্ষোভে!

আমাদের ব্যর্থতায়, আমাদের সকাতর কামনায় লোভে
মাগিতে আসনি তুমি নিমেষের ঠাঁই!
—অন্ধকার জলাভূমি—কঙ্কালের ছাই,
পল্লীকান্তারের ছায়া—তেপান্তর পথের বিস্ময়
নিশীথের দীর্ঘশ্বাসময়
করিয়াছে বিমনা তোমারে!
রাত্রি-পারাবারে
ফিরিতেছ বারম্বার একাকী বিচরি!
হেমন্তের হিম পথ ধরি,
পউষ-আকাশতলে দহি দহি দহি
—ছুটিতেছ বিহ্বল বিরহী
কত শত যুগজন্ম বহি!
কারে কবে বেসেছিলে ভালো
হে ফকির, আলেয়ার আলো!
কোন্ দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া
চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া!
সে কোন্ রাত্রির হিমে হয়ে গেছে হারা!
নিয়েছে ভুলায়ে তারে মায়াবী ও নিশিমরু,
আঁধার সাহারা!
আজও তব লোহিত কপোলে
চুম্বন-শোণিমা তার উঠিতেছে জ্ব'লে
অনল-ব্যথায়!
—চ'লে যায়—মিলনের লগ্ন চ'লে যায়!
দিকে দিকে ধূমাবাহু যায় তব ছুটি
অন্ধকারে লুটি-লুটি-লুটি!
ছলাময় আকাশের নীচে
লক্ষ প্রেতবধূদের পিছে
ছুটিয়া চলিছে তব প্রেম-পিপাসার
অগ্নি-অভিসার!
বহ্নি-ফেনা নিঙাড়িয়া পাত্র ভরি ভরি,
অনন্ত অঙ্গার দিয়া হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি গড়ি,
উষার বাতাস ভুলি, পলাতকা রাত্রির পিছনে
যুগ যুগ ছুটিতেছ কার অন্বেষণে!

অস্তচাঁদে

ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ, ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী!
—অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে যবে কালো নদী—ঢেউয়ের কলসী,
নিঝ্‌ঝুম বিছানার পরে
মেঘ-বৌর খোঁপাখসা জ্যোৎস্নাফুল চুপে চুপে ঝরে—
চেয়ে থাকি চোখ তুলে—যেন মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত-চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া!
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে ফিরে ফিরে

মাঠে ঘাটে একা একা—বুনোহাঁস—জোনাকির ভিড়ে!
দুশ্চর দেউলে কোন্— কোন্ যক্ষ প্রাসাদের তটে,
দূর উর-ব্যাবিলোন-মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিডতলে, ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মতো নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে,
কোন মনভুলানিয়া পথচাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না—চোর চোখে—অলস নয়নে!
আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
প্রাসাদ অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে—
হাতে তার হাত, পায়ে হাতিয়ার রাখি
কুমারীর পানে আমি তুলিয়াছি আনন্দের আরক্তিম আঁখি!
ভোরগেলাসের সুরা—তহুরা, ক'রেছি মোরা চুপে চুপে পান,
চকোরজুড়ির মতো কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান!
পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা!
নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে, ঘুমে রাজবধূ—
চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
কৃষ্ণাতিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
লভেছিনু উল্লাস—উতরোল!—আজ পড়ে মনে
সাধ-বিষাদের খেদ কত জন্মজন্মান্তের, রাতের নির্জনে!

আমি ছিনু 'ক্রবেদুর্' কোন্ দূর 'প্রভেন্স্'-প্রান্তরে!
—দেউলিয়া পায়দল্—অগোচর মনচোর-মানিনীর তরে
সারেঙের সুর মোর এমনি উদাস রাত্রে উঠিত ঝঙ্কারি!
আঙুরলতায় ঘেরা ঘুমঘোর ঘরখানা ছাড়ি
ঘুঘুর পাখনা মেলি মোর পানে আসিল পিয়ারা;
মেঘের ময়ূরপাখে জেগেছিল এলোমেলো তারা!
—'অলিভ্' পাতার ফাঁকে চুন চোখে চেয়েছিল চাঁদ,
মিলননিশার শেষে—বৃশ্চিক, গোক্ষুরাফণা, বিষের বিস্বাদ!

স্পেইনের 'সিয়েরা'য় ছিনু আমি দস্যু—অশ্বারোহী—
নির্মম-কৃতান্ত-কাল—তবু কি যে কাতর, বিরহী!
কোন্ রাজনন্দিনীর ঠোঁটে আমি এঁকেছিনু বর্বর চুম্বন!
অন্দরে পশিয়াছিনু অবেলার ঝড়ের মতন!
তখন রতনশেজে গিয়েছিল নিভে মধুরাতি,
নীল জানালার পাশে—ভাঙা হাটে—চাঁদের বেসাতি!
চুপে চুপে মুখে কার পড়েছিনু ঝুঁকে!
ব্যাধের মতন আমি টেনেছিনু বুকে
কোন্ ভীরু কপোতীর উড়ু-উড়ু ডানা!
—কালো মেঘে কেঁদেছিল অস্তচাঁদ—আলোর মোহানা!

বাংলার মাঠে ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা,

গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিল দেখা!
'ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনই রূপালি রাতে
কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে!
অপরাজিতার ঝাড়ে—নদীপারে কিশোরী লুকায়ে বুঝি!—
মদনমোহন নয়ন আমার পেয়েছিল তারে খুঁজি!
তারি লাগি বেঁধেছিনু বাঁকা চুলে ময়ূরপাখার চূড়া,
তাহারি লাগিয়া শুঁড়ি সেজেছিনু—ঢেলে দিয়েছিনু সুরা!
তাহারি নধর অধর নিঙাড়ি উথলিল বুকে মধু,
জোনাকির সাথে ভেসে শেষরাতে দাঁড়াতাম দোরে বঁধু!
মনে পড়ে কি তা!—চাঁদ জানে যাহা, জানে যা কৃষ্ণাতিথির শশী,
বুকের আগুনে খুন চড়ে—মুখ চুন হয়ে যায় একেলা বসি!

ছায়া-প্রিয়া

দুপুর রাতে ও কার আওযাজ!
গান কে গাহে, গান না!
কপোত—বধূ ঘুমিয়ে আছে
নিঝুম ঝিঁঝির বুকের কাছে;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
এ কার তবে কান্না!
গান কে গাহে, গান না!

সার্সি ঘরের উঠছে বেজে,
উঠছে কেঁপে পর্দা!
বাতাস আজি ঘুমিয়ে আছে
জল-ডাহুকের বুকের কাছে;
এ কোন্ বাঁশি সার্সি বাজায়
এ কোন হাওয়া ফর্দা
দেয় কাঁপিয়ে পর্দা!

নূপুর কাহার বাজল রে ঐ!
কাঁকন কাহার কাঁদল!
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে;
ঘরে আমার ছাযা-প্রিয়া
মাযার মিলন ফাঁদল!
কাঁকন যে তার কাঁদল!

খস্‌খসাল শাড়ি কাহার!
উস্‌খুসাল চুল গো!
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে;

জুল্‌পি কাহার উঠল দুলে!
—দুলল কাহার দুল গো!
উস্‌খুসাল চুল গো!

আজকে রাতে কে ঐ এল
কালের সাগর সাঁত্‌রি!
জীবনভোরের সঙ্গিনী সেই,—
মাঠে-ঘাটে আজকে সে নেই!
কোন্‌ তিয়াষায় এল রে হায়
মরণপারের যাত্রী!
—কালের সাগর সাঁত্‌রি!

কাঁদছে পাখি পউষনিশির
তেপান্তরের বক্ষে!
ওর বিধবা বুকের মাঝে
যেন গো কার কাঁদন বাজে!
ঘুম নাহি আজ চাঁদের চোখে,
নিদ্‌ নাহি মোর চক্ষে!
তেপান্তরের বক্ষে!

এল আমার ছায়া-প্রিয়া,
কিশোরবেলার সই গো!
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে;
মনেব মধু—মনোরমা—
কই গো সে মোর—কই গো!
কিশোরবেলার সই গো!

ও কার আওয়াজ হাওযায বাজে!
গান কে গাহে, গান না!
কপোতবধূ ঘুমিয়ে আছে
বনের ছাযায—মাঠের কাছে;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
এ কার তবে কান্না!
গান কে গাহে, গান না!

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজাব দুলাল,—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যাব শাঙনের মেঘ, আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী বঙিন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে—কত দিন!
মোর জানালাব পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে,—

তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পানে উড়ে উড়ে!
মেঘের বুরুজ ভেঙে অস্তচাঁদ দিয়েছিল উঁকি,
সে কোন্ বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী!
পাথারের পারে মোর প্রাসাদের আঙিনার পরে
দাঁড়াল সে—বাসরবাত্রির বধূ—মোর তরে, যেন মোর তরে!
তখন নিভিয়া গেছে মণিদীপ,—চাঁদ শুধু খেলে লুকোচুরি,—
ঘুমের শিয়রে শুধু ফুটিতেছে ঝরিতেছে ফুলঝুরি, স্বপনের কুঁড়ি!
অলস আতুল হাওয়া জানালায় থেকে থেকে ফুঁপায় উদাসী!
কাতর নয়ন কার হাহাকারে চাঁদিনীতে জাগে গো উপাসী!
কিংখাবে-গালিচা-খাটে বাজবধূ-ঝিয়াবীর বেশে
কভু সে দেযনি দেখা—মোর তোরণেব তলে দাঁড়াল সে এসে!
দাঁড়াল সে হেঁটমুখে—চোখ তাব ভ'রে গেছে নীল অশ্রুজলে!
মীনকুমাবীর মতো কোন্ দূর সিন্ধুব অতলে
ঘুবেছে সে মোব লাগি!—উড়েছে সে অসীমের সীমা!
অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল, নরম লালিমা
জ্বলে গেছে—নগ্ন হাত, নাই শাঁখা, হাবাযেছে রুলি,
এলোমেলো কালো চুলে খ'সে গেছে খোঁপা তার, বেণী গেছে খুলি!
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, হিম স্তন, হিম রোমকূপ!
আমি দেখিযাছি তারে, ক্ষুধিত প্রেতেব মতো চুমিযেছি আমি
তারি পেযালায হায!—পৃথিবীর উষা ছেড়ে আসিযাছি নামি
কান্তারে;—ঘুমেব ভিড়ে বাঁধিযাছি দেউলিযা বাউলের ঘব,
আমি দেখিয়াছি ছাযা, শুনিযাছি একাকিনী কুহকীব স্বব!
বুকে মোর, কোলে মোব—কঙ্কালেব কাঁকালের চুমা!
—গঙ্গার তরঙ্গ কানে গায,—'ঘুমা'—ঘুমা!
ডাকিযা কহিল মোরে রাজাব দুলাল,—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যাব, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনেব মেঘ, আব আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন;
আমি দেখিযাছি তাবে ঘুমপথে, স্বপ্নে—কত দিন!

কবি

ভ্রমরীব মতো চুপে সৃজনেব ছাযাধূপে ঘুবে মবে মন
আমি নিদালির আঁখি, নেশাখোর চোখের স্বপন!
নিবালায সুর সাধি, বাঁধি মোব মানসীর বেণী,
মানুষ দেখেনি মোবে কোনোদিন, আমাবে চেনেনি!
কোনো ভিড় কোনোদিন দাঁড়াযনি মোর চারিপাশে,—
শুধাযনি কেহ কভু—'আসে কি রে,—সে কি আসে—আসে।'
আসেনি সে ভরাহাটে-খেয়াঘাটে—পৃথিবীব পসরার মাঝে,
পাটনী দেখেনি তাবে কোনো দিন, মাঝি তাবে ডাকোনিকো সাঁঝে!
পারাপার করেনি সে মণিরত্ন-বেসাতির সিন্ধুর সীমানা,—
চেনা-চেনা মুখ সবই,—সে যে শুধু সুদূব—অজানা!

করবীকুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে আছে চুপে,
রূপসাগরের মাঝে কোন্ দূর গোধূলির সে যে আছে ডুবে!
সে যেন ঘাসের বুকে, ঝিলমিল শিশিরের জলে;
খুঁজে তারে পাওয়া যাবে এলোমেলো বেদিয়ার দলে,
বাবলার ফুলে ফুলে ওড়ে তার প্রজাপতি-পাখা,
ননীর আঙুল তার কেঁপে ওঠে কচি নোনাশাখা!

হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মতো কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে!
হয়তো শুনেছ তারে—তার সুর, দুপুর আকাশে
ঝরাপাতাভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে, জল-ডাহুকীর বুকে পউষনিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পুবালি হাওয়ায়!

হয়তো দেখেছ তারে ভূতুড়ে দীপের চোখে মাঝরাতে দেয়ালের 'পরে
নিভে যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে!
শুক্লা একাদশী রাতে বিধবার বিছানায় যেই জ্যোৎস্না ভাসে
তারি বুকে চুপে চুপে কবি আসে—সুর তার আসে।
উস্‌খুস্ এলোচুলে ভ'রে আছে কিশোরীব নগ্ন মুখখানি,—
তারি পাশে সুব ভাসে—অলখিতে উড়ে যায় কবির উড়ানি।

বালুঘড়িটির বুকে ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝিরি গান যবে বাজে
রাতবিরেতের মাঠে হাঁটে সে যে আলসে, অকাজে!
ঘুমকুমারীর মুখে চুমো খায় যখন আকাশ,
যখন ঘুমায়ে থাকে টুনটুনি, মধুমাছি, ঘাস,
হাওয়ার কাতর শ্বাস থেমে যায় আমলকি সাড়ে,
বাঁকা চাঁদ ডুবে যায় বাদলের মেঘের আঁধারে,
তেঁতুলের শাখে শাখে বাদুড়েব কালো ডানা ভাসে,
মনের হরিণী তার ঘুরে মবে হাহাকারে বনের বাতাসে!

জোনাকির মতো সে যে দূরে দূরে যায় উড়ে উড়ে—
আপনার মুখ দেখে ফেরে সে যে নদীব মুকুরে!
জ্ব'লে ওঠে আলেযার মতো তার লাল আঁখিখানি।
আঁধারে ভাসায় খেযা সে কোন্ পাষাণী!

জানে না তো কি যে চায়-কবে হায় কি গেছে হাবায়ে।
চোখ বুজে খোঁজে একা—হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে
কারে আহা।—কাঁদে হা হা পুবের বাতাস,
শ্মশানশবের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস!
তারই লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা—হিম চিতা জ্বেলে দেয় শিখা,
তার মাঝে যায় দহি বিরহীর ছায়াপুত্তলিকা!

সিন্ধু

বুকে তব সুরপরী বিরহবিধুর
গেযে যায়, হে জলধি, মায়ার মুকুব!
কোন্ দূর আকাশের মযূব–নীলিমা
তোমারে উতলা করে! বালুচরসীমা
উল্লঙ্ঘি তুলিছ তাই শিরোপা তোমার,—
উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি—তরঙ্গের বাঁকা তলোয়ার!
গলে মৃগতৃষ্ণাবিষ, মারীর আগল
তোমার সুরার স্পর্শে আশেক–পাগল!
উদ্যত ঊর্মির বুকে অরূপের ছবি
নিত্যকাল বহিছ হে মরমিয়া কবি
হে দুন্দুভি দুর্জযের, দুরন্ত, অগাধ।
পেয়েছি শক্তির তৃপ্তি, বিজযের স্বাদ
তোমার উলঙ্গনীল তবঙ্গেব গানে!
কালে কালে দেশে দেশে মানুষসন্তানে
তুমি শিখাযেছ বন্ধু দুর্মদ–দুরাশা!
আমাদের বুকে তুমি জাগালে পিপাসা
দুশ্চব তটেব লাগি—সুদূরের তরে।
বহস্যের মাযাসৌধ বক্ষের উপরে
ধরেছ দুস্তরকাল;—তুচ্ছ অভিলাষ,
দুদিনের আশা, শান্তি, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস,
পলকের দৈন্য–জ্বালা–জয়–পরাজয়,
ত্রাস–ব্যথা–হাসি–অশ্রু–তপস্যা–সঞ্চয়—
পিনাকশিখায তব হল ছাবখাব।
ইচ্ছার বাড়বকুন্ডে, উগ্র পিপাসার
ধু ধু ধু ধু বেদীতটে আপনারে দিতেছ আহুতি।
মোব ক্ষুধা–দেবতাবে তুমি করো স্তুতি!
নিত্য নব বাসনাব হলাহলে রাঙি
'পারীযা'র প্রাণ লযে আছি মোরা জাগি
বসুধার বাঞ্ছাকূপে, উঞ্ছের অঙ্গনে!
নিমেষের খেদ–হর্ষ–বিষাদের সনে
বীভৎস খঞ্জেব মতো করি মাতামাতি!
চুরমার হয়ে যায বেলোয়ারি বাতি!
ক্ষুরধার আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া চিতা
গড়ি তবু বারবার—বারবার ধুতুরার তিতা
নিঃস্ব নীল ওষ্ঠে তুলি নিতেছি চুমিয়া।
মোব বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়, ঝরা পাতা, পূবালির হা হা!
কাঁদে বুকে মরা নদী, শীতের কুয়াশা!
ওহে সিন্ধু, আসিযাছি আমি সর্বনাশা
ভূখারী ভিখারী একা, আসন্ন–বিবশ!

—চাহি না পলার মালা, শুক্তির কলস,
মুক্তাতোরণের তট মীনকুমারীর,
চাহি না নিতল নীড় বারুণীরাণীর।
মোর ক্ষুধা উগ্র আরো, অলঙ্ঘ্য অপার!
একদিন কুকুরের মতো হাহাকার
তুলেছিনু ফোঁটা ফোঁটা রুধিরের লাগি!
একদিন মুখখানা উঠেছিল রাঙি
ক্লেদবসাপিণ্ড চুমি রিক্ত বাসনার!
মোরে ঘিরে কেঁদেছিল কুহেলি আঁধার,—
শ্মশানফেরুর পাল, শিশিরের নিশা,
আলেয়ার ভিজা মাঠে ভুলেছিনু দিশা!
আমার হৃদযপীঠে মোব ভগবান
বেদনার পিরামিড পাহাড়প্রমাণ
গেঁথে গেছে গরলের পাত্র চুমুকিযা;
রুদ্র তরবার তব উঠুক নাচিয়া
উচ্ছিষ্টের কলেজায়, অশিব-স্বপনে,
হে জলধি, শব্দভেদী উগ্র আস্ফালনে!
—পূজাথালা হাতে ল'য়ে আসিযাছে কত পান্থ, কত পথবালা
সহর্ষে সমুদ্রতীরে; বুকে যার বিষমাখা শাযকের জ্বালা
সে শুধু এসেছে বন্ধু চুপে চুপে একা।
অন্ধকারে একবার দুজনার দেখা!
বৈশাখের বেলাতটে সমুদ্রের স্বর,—
অনন্ত, অভঙ্গ, উষ্ণ, আনন্দসুন্দব!
তারপর, দূরপথে অভিযান বাহি
চলে যাব জীবনের জযগান গাহি।

দেশবন্ধু

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশেব রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো, বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদীমাতা।
কালবৈশাখীর দোলা অনিবাব দুলাইত রক্তপুঞ্জে তব
উত্তাল উর্মির তালে—বক্ষে তব লক্ষ কোটি পন্নগ-উৎসব
উদ্যত ফণাব নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি,
ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শত্রু অক্ষৌহিণী।
স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিত সঞ্চারি,
এসেছিলে বিষ্ণুচক্র মর্মন্তুদ—ক্লৈব্যেব সংহারী।
ভেঙেছিলে বাঙালির সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধূলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতেব শৃঙ্খলের ডোব,
ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভাণ্ড তীব্র দর্পে, বৈরাগেব রাগে,
দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে—পৃথ্বী-পুরোভাগে।
নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কাম্য পরিহরি
ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাবগঙ্গোত্তরী
আর্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি;

বাদলের মন্দ্র সম মন্ত্র তব দিকে দিকে তুলিলে বৈরাগী।
এনেছিলে সঙ্গে করি অবিশ্রাম প্লাবনের দুন্দুভিনিনাদ,
শান্তিপ্রিয় মুমূর্ষুর শ্মশানেতে এনেছিলে আহব-সংবাদ,
গাণ্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে, 'আছি, আমি আছি!
কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।'
ছিলে তুমি দধীচির অস্থিময় বাসবের দম্ভোলির সম,
অলঙ্ঘ্য, অজেয়, ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।
ছিলে তুমি রুদ্রের ডম্বরুরূপে, বৈষ্ণবের গুপীযন্ত্র মাঝে,
অহিংসার তপোবনে তুমি ছিলে চক্রবর্তী ক্ষত্রিয়ের সাজে—
অক্ষয় কবচধারী শালপ্রাংশু রক্ষকের বেশে।
ফেরুকুল-সঙ্কুলিত উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের দেশে
ছিলে তুমি সিংহশিশু, যোজনান্ত বিহরী একাকী
স্তব্ধ শিলাসন্ধিতলে ঘন ঘন গর্জনের প্রতিধ্বনি মাখি।
ছিলে তুমি নীরবতা-নিষ্পেষিত নির্জীবের নিদ্রিত শিয়রে
উন্মত্ত ঝটিকাসম, বহ্নিমান বিপ্লবের ঘোরে;
শক্তিশেল অপঘাতে দেশবক্ষে রোমাঞ্চিত বেদনার ধ্বনি
ঘুচাতে আসিয়াছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী।
ছিলে তুমি ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে
শবসাধকের বেশে—সঞ্জীবনী অমৃত সন্ধানে।
রণনে রঞ্জনে তব হে বাউল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারত, ভারতী;
কলাবিৎ সম হায় তুমি শুধু দগ্ধ হলে দেশ-অধিপতি।
বিধিবশে দূরগত বন্ধু আজ, ভেঙে গেছে বসুধা-নির্মোক,
অন্ধকার দিবাভাগে বাজে তাই কাজরীর শ্লোক।
মল্লারে কাঁদিছে আজ বিমানের বৃন্তহারা মেঘছত্রীদল,
গিরিতটে, ভূমিগর্ভ ছায়াচ্ছন্ন—উচ্ছ্বাসউচ্ছল।
যৌবনের জলরঙ্গ এসেছিল ঘনস্বনে দরিয়ার দেশে,
তৃষ্ণাপাংশু অধরেতে এসেছিল ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।
অর্চনার হোমকুণ্ডে হবি সম প্রাণবিন্দু বারংবার ঢালি,
বামদেবতার পদে অকাতরে দিয়ে গেল মেধ্য হিয়া ডালি।
গৌরকান্তি শঙ্করের অম্বিকার বেদীতলে একা
চুপে চুপে রেখে এল পুঞ্জীভূত রক্তস্রোত-রেখা।

বিবেকানন্দ

জয়, তরুণের জয়!
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক, জয়, জয় চিন্ময়!
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল, উষা উঠেছিল জেগে
পূর্ব তোরণে, বাংলা-আকাশে, অরুণ-রঙিন মেঘে;
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া—জগৎ গেছিল রেঙে!

হে যুবক মুসাফের,
স্থবিরের বুকে ধ্বনিলে শঙ্খ জাগরণপর্বের।

জিঞ্জির-বাঁধা ভীত চকিতেরে অভয় দানিলে আসি,
সুপ্তের বুকে বাজালে তোমার বিষাণ হে সন্ন্যাসী,
রুক্ষের বুকে বাজালে তোমার কালীয়দমন বাঁশি!

আসিলে সব্যসাচী,
কোদণ্ডে তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিল প্রাচী!
টঙ্কারে তব দিকে দিকে শুধু রণিয়া উঠিল জয়,
ডঙ্কা তোমার উঠিল বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময়:
শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক, নাহিক তোমার ক্ষয়!

তৃতীয় নয়ন তব
ম্লান বাসনার মনসিজ নাশি জ্বালাইত উৎসব!
কলুষ-পাতকে, ধূর্জটি, তব পিনাক উঠিত রুখে,
হানিতে আঘাত দিবানিশি তুমি ক্লেদ-কামনার বুকে,
অসুর-আলয়ে শিব-সন্ন্যাসী বেড়াতে শঙ্খ ফুঁকে!

কৃষ্ণচক্র সম
ক্লৈব্যের হৃদে এসেছিলে তুমি ওগো পুরুষোত্তম,
এসেছিলে তুমি ভিখারীর দেশে ভিখারীর ধন মাগি
নেমেছিলে তুমি বাউলের দলে, হে তরুণ বৈরাগী!
মর্মে তোমার বাজিত বেদনা আর্ত জীবের লাগি।

হে প্রেমিক মহাজন,
তোমার পানেতে তাকাইল কোটি দরিদ্রনারায়ণ;
অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণতলে
বারবার যবে কেঁদে কেঁদে গেল কাতর আঁখির জলে,
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুমদলে।

কোথা পাপী? তাপী কোথা?
—ওগো ধ্যানী, তুমি পতিতপাবন যজ্ঞে সাজিলে হোতা!
শিব-সুন্দর-সত্যের লাগি শুরু করে দিলে হোম,
কোটি পঞ্চমা আতুরের তরে কাঁপায়ে তুলিলে ব্যোম,
মন্ত্রে তোমার বাজিল বিপুল শান্তি স্বস্তি ওঁ!

সোনার মুকুট ভেঙে
ললাট তোমার কাঁটার মুকুটে রাখিলে সাধক রেঙে!
স্বার্থ লালসা পাসরি ধরিলে আত্মাহুতির ডালি,
যজ্ঞের যূপে বুকের রুধির অনিবার দিলে ঢালি,
বিভাতি তোমার তাই তো অটুট রহিল অংশুমালী!

দরিয়ার দেশে নদী!
—বোধিসত্ত্বের আলয়ে তুমি গো নবীন শ্যামল বোধি!
হিংসার রণে আসিলে পথিক প্রেম-খঞ্জর হাতে,

আসিলে করুণাপ্রদীপ হস্তে হিংসার অমারাতে,
ব্যাধি মন্বন্তরে এলে তুমি সুধাজলধির সংঘাতে!

মহামারী ক্রন্দন
ঘুচাইলে তুমি শীতল পরশে, ওগো সুকোমল চন্দন!
বজ্রকঠোর, কুসুমমৃদুল, আসিলে লোকোত্তর;
হানিলে কুলিশ কখনও,—ঢালিলে নির্মল নির্ঝর,
নাশিলে পাতক, পাতকীরে তুমি অর্পিলে নির্ভর।

চক্র গদার সাথে
এনেছিলে তুমি শঙ্খ পদ্ম, হে ঋষি, তোমার হাতে;
এনেছিলে তুমি ঝড় বিদ্যুৎ, পেয়েছিলে তুমি সাম,
এনেছিলে তুমি রণ-বিপ্লব—শান্তি-কুসুমদাম;
মাভৈঃ শঙ্খে জাগিছে তোমার নরনারায়ন-নাম!

জয়, তরুণের জয়।
আত্মাহুতির রক্ত কখনও আঁধারে হয না লয়!
তাপসের হাড় বজ্রের মতো বেজে উঠে বারবার!
নাহি রে মরণে বিনাশ, শ্মশানে নাহি তার সংহার,
দেশে দেশে তার বীণা বাজে—বাজে কালে কালে ঝঙ্কার!

হিন্দু-মুসলমান

মহামৈত্রীব ববদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘন্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে-সুরে!
আহ্নিক হেথা শুরু হয়ে যায আজান বেলার মাঝে,
মুযাজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-উষায় বেদবাণী যায মিশে কোবানের স্বরে;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির!

কে বলে হিন্দু বসিয়া রযেছে একাকী ভারত জাঁকি?
—মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন-রাখী;
আরব মিশর তাতাব তুর্কি ইরানের চেযে মোরা
ওগো ভারতের মোসলেমদল, তোমাদের বুক-জোড়া!
ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা, আর্যাবর্ত ভাঙি
গড়েছি নিখিল নতুন ভাবত নতুন স্বপনে রাঙি!
—নবীন প্রাণের সাড়া
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্তবেণীর ধারা!

রুমের চেযেও ভারত তোমার আপন, তোমার প্রাণ!

—হেথায় তোমার ধর্ম অর্থ, হেথায় তোমার ত্রাণ;
হেথায় তোমার আশান ভাই গো, হেথায় তোমার আশা;
যুগ যুগ ধরি এই ধূলিতলে বাঁধিয়াছ তুমি বাসা,
গড়িয়াছ ভাষা কল্পে-কল্পে দরিয়ার তীরে বসি,
চক্ষে তোমার ভারতের আলো—ভারতের রবি, শশী,
হে ভাই মুসলমান
তোমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান!

এ ভারতভূমি নহেকো তোমার, নহেকো আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ—মুসলমানের রেখা;
হিন্দু মনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে,
ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে!
পাটলীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রচিছে কীর্তিলীলা!
—ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণা!

এই ভারতের তখ্‌তে চড়িয়া শাহানশাহার দল
স্বপ্নের মণিপ্রদীপে গিয়েছে উজলি আকাশতল!
—গিয়েছে তাহারা কল্পলোকের মুক্তার মালা গাঁথি,
পরশে তাদের জেগেছে আরব-উপন্যাসের রাতি!
জেগেছে নবীন মোগল-দিল্লী—লাহোর—ফতেহ্‌পুর,
যমুনাজলের পুরানো বাঁশিতে বেজেছে নবীন সুর!
নতুন প্রেমের বাগে
তাজমহলের তরুণিমা আজও উষার অরুণে জাগে!

জেগেছে হেথায় আকবরী আইন—কালের নিকষ কোলে
বারবার যার উজল সোনার পরশ উঠিছে জ্বলে।
সেলিম, শাজাহাঁ—চোখের জলেতে এক্‌শা করিয়া তারা
গড়েছে মিনার মহলা স্তম্ভ কবর ও শাহ্‌দারা!
—ছড়ায়ে রয়েছে মোগল ভারত—কোটি সমাধির স্তূপ
তাকায়ে রয়েছে তন্দ্রাবিহীন—অপলক, অপরূপ।
—যেন মায়াবীর তুড়ি
স্বপনের ঘোরে স্তব্ধ করিয়া রেখেছে কনকপুরী!

মোতিমহলের অযুত বাত্রি, লক্ষ দীপের ভাতি
আজিও বুকের মেহেরাবে যেন জ্বালায়ে যেতেছে বাতি!
—আজিও অযুত বেগম-বাঁদীর শষ্পশয্যা ঘিরে
অতীত রাতের চঞ্চল চোখ চকিতে যেতেছে ফিরে!
দিকে দিকে আজও বেজে ওঠে কোন্ গজল-ইলাহী গান!
পথহারা কোন্ ফকিরের তানে কেঁদে ওঠে সারা প্রাণ!
—নিখিল ভারতময়
মুসলমানের স্বপন-প্রেমের গরিমা জাগিয়া রয়!

এসেছিল যারা ঊষর ধূসর মরুগিরিপথ বেয়ে,
একদা যাদের শিবিরে-সৈন্যে ভারত গেছিল ছেয়ে,
আজিকে তাহারা পড়শি মোদের, মোদের বহিন-ভাই;
—আমাদের বুকে বক্ষ তাদের, আমাদের কোলে ঠাঁই।
'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে, ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোস্‌লেম্‌ বিনা ভারত বিকল, বিফল হিন্দু বিনা;
—মহামৈত্রীর গান
বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান!

নিখিল আমার ভাই

নিখিল আমার ভাই,
—কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই;
যে প্রাণ গুমরি কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি;
কোন ফণী যেন আকাশ বাতাসে তোলে বিষ গরজনি!
কি যেন যাতনা মাটির বুকেতে অনিবার ওঠে রণি,
আমার শস্য-স্বর্ণপসরা নিমেষে হয় যে ছাই!
—সবার বুকের বেদনা আমার, নিখিল আমার ভাই।

আকাশ হতেছে কালো,
কাহাদের যেন ছায়াপাতে হায়, নিভে যায় রাঙা আলো!
বাতায়নে মোর ভেসে আসে যেন কাদের তপ্ত শ্বাস,
অন্তরে মোর জড়ায়ে কাদের বেদনার নাগপাশ,
বক্ষে আমার জাগিছে কাদের নিরাশা গ্লানিমা ত্রাস,
—মনে মনে আমি কাহাদের হায় বেসেছিনু এত ভালো।
তাদের ব্যথার কুহেলি-পাথারে আকাশ হতেছে কালো।

লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন-ভাই!
আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনা-পীড়ার দান,
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,
আমার হৃদযযূপেতে তাহারা করিছে রক্তস্নান,
আমার মনের চিতানলে জ্ব'লে লুটায়ে যেতেছে ছাই!
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে লভিয়াছে তারা ঠাঁই।

পতিতা

আগার তাহার বিভীষিকাভরা, জীবন মরণময়!
সমাজের বুকে অভিশাপ সে যে—সে যে ব্যাধি, সে যে ক্ষয়;
প্রেমের পসরা ভেঙে ফেলে দিয়ে ছলনায় কারাগার
রচিয়াছে সে যে, দিনের আলোয় রুদ্ধ ক'রেছে দ্বার!
সূর্যকিরণ চকিতে নিভায়ে সাজিয়াছে নিশাচর,

কালনাগিনীর ফণার মতন নাচে সে বুকের পর!
চক্ষে তাহার কালকূট ঝরে, বিষপঙ্কিল শ্বাস,
সারাটি জীবন মরীচিকা তার—প্রহসন-পরিহাস!
ছোঁয়াচে তাহার ম্লান হ'য়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা!
সে যে মন্বন্তর, মৃত্যুর দূত, অপঘাত, মহামারী,—
মানুষ তবু সে, তার চেয়ে বড়ো—সে যে নারী, সে যে নারী।

ডাহুকী

মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী—
নিদাঘের রৌদ্রতাপে একা সে ডাহুকী
বিজন তরুর শাখে ডাকে ধীরে ধীরে
বনচ্ছায়া-অন্তরালে তরল তিমিরে!
—আকাশে মন্থর মেঘ, নিরালা দুপুর!
—নিস্তব্ধ পল্লীর পথে কুহকের সুর
বাজিয়া উঠিছে আজ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে!
সে কোন্ পিপাসা কোন্ ব্যথা তার মনে!
হারায়েছে প্রিয়ারে কি?—অসীম আকাশে
ঘুরেছে অনন্ত কাল মরীচিকা-আশে?
বাঞ্ছিত দেয়নি দেখা নিমেষের তরে!—
কবে কোন্ রুক্ষ কালবৈশাখীর ঝড়ে
ভেঙে গেছে নীড়, গেছে নিরুদ্দেশে ভাসি!
—নিঝুম বনের তটে বিমনা উদাসী
গেয়ে যায়; সুপ্ত পল্লীতটিনীর তীরে
ডাহুকীর প্রতিধ্বনি-ব্যথা যায় ফিরে।
—পল্লবে নিস্তব্ধ পিক, নীরব পাপিয়া,
গাহে একা নিদ্রাহারা বিরহিণী হিয়া!
আকাশে গোধূলি এল—দিক্ হ'ল ম্লান,
ফুরায় না তবু হায় হুতাশীর গান!
—স্তিমিত পল্লীর তটে কাঁদে বারবার,
কোন্ যেন সুনিভৃত রহস্যের দ্বার
উন্মুক্ত হ'ল না আর কোন্ সে গোপন
নিল না হৃদয়ে তুলি তার নিবেদন!

শ্মশান

কুহেলির হিমশয্যা অপসারি ধীরে
রূপময়ী তন্বী মাধবীরে
ধরণী বরিয়া লয় বারে-বারে-বারে!
—আমাদের অশ্রুর পাথারে
ফুটে ওঠে সচকিতে উৎসবের হাসি,—

অপরূপ বিলাসের বাঁশি!
ভগ্ন প্রতিমারে মোরা জীবনের বেদীতটে আরবার গড়ি,
ফেনাময় সুরাপাত্র ধরি
ভুলে যাই বিষের আস্বাদ!
মোহময় যৌবনের সাধ
আতপ্ত করিয়া তোলে স্থবিরের তুহিন অধর!
চিরমৃত্যুচর
হে মৌন শ্মশান,
ধূম–অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে আবরি বয়ান
হেরিতেছ কিসের স্বপন!
ক্ষণে ক্ষণে রক্তবহ্নি করি নির্বাপন
স্তব্ধ করি রাখিতেছ বিরহীর ক্রন্দনের ধ্বনি!
তব মুখপানে চেয়ে কবে বৈতরণী
হ'য়ে গেছে কলহীন!
বক্ষে তব হিম হ'য়ে আছে কত উগ্রশিখা চিতা
হে অনাদি পিতা!
ভস্মগর্ভে, মরণের অকূল শিয়রে
জন্মযুগ দিতেছ প্রহরা—
কবে বসুন্ধরা
মৃত্যুগাঢ় মদিরার শেষ পাত্রখানি
তুলে দেবে হস্তে তব, কবে লবে টানি
কঙ্কাল অঙুলি তুলি শ্যামা ধরণীরে
শ্মশান-তিমিরে,
লোলুপ নয়ন মেলি হেরিবে তাহার
বিবসনা শোভা
দিব্য মনোলোভা!
কোটি কোটি চিতা–ফণা দিযা
রূপসীর অঙ্গ আলিঙ্গিযা
শুষে নেবে সৌন্দর্যের তামরস–মধু!
এ বসুধা–বধূ
আপনারে ডারি দেবে উরসে তোমার
ধ্বক্-ধ্বক্—দারুণ তৃষ্ণার
রসনা মেলিযা
অপেক্ষায জেগে আছে শ্মশানের হিয়া!
আলোকে আঁধারে
অগণন চিতার দুযারে
যেতেছে সে ছুটে,
তৃপ্তিহীন তিক্ত বক্ষপুটে
আনিতেছে নব মৃত্যুপথিকেরে ডাকি,
তুলিতেছে রক্ত–ধূম্র আঁখি!
—নিরাশার দীর্ঘশ্বাস শুধু
বৈতরণীমরু ঘেরি জ্বলে যায় ধু ধু,
আসে না প্রেয়সী!

—নিদ্রাহীন শশী,
আকাশের অনাদি তারকা
রহিয়াছে জেগে তার সনে;
শ্মশানের হিম বাতায়নে
শত শত প্রেতবধূ দিয়ে যায় দেখা,—
তবু সে যে প'ড়ে আছে একা,
বিমনা–বিরহী!
বক্ষে তার কত লক্ষ সভ্যতার স্মৃতি গেছে দহি,
কত শৌর্য–সাম্রাজ্যের সীমা
প্রেম–পুণ্য–পূজার গরিমা
অকলঙ্ক সৌন্দর্যের বিভা
গৌরবের দিবা!
—তবু তার মেটে নাই তৃষা;
বিচ্ছেদের নিশা
আজও তার হয় নাই শেষ!
অশ্রান্ত অঙুলি সে যে করিছে নির্দেশ
অবনীর পক্ববিম্ব অধরের পর!
পাতাঝরা হেমন্তের স্বর
ক'রে দেয় সচকিত তারে,
হিমানী–পাথারে
কুয়াশাপুরীর মৌন জালায়ন তুলে
চেয়ে থাকে আঁধারে অকূলে
সুদূরের পানে!
বৈতরণীখেয়াঘাটে মরণ–সন্ধানে
এল কি রে জাহ্নবীর শেষ উর্মিধারা!
অপার শ্মশান জুড়ি জ্বলে লক্ষ চিতাবহ্নি—কামনা–সাহারা!

মিশর

'মমী'র দেহ বালুর তিমির জাদুর ঘরে লীন—
'স্ফীঙ্কস–দানবীর অরাল ঠোঁটের আলাপ আজি চুপ!
ঝাঁ ঝাঁ মরুর 'লু'য়ের 'ফুঁ'য়ে হচ্চে বিলীন-ক্ষীণ
মিশর দেশের কাফন্ পাহাড়—পিরামিডের স্তূপ!

নিভে গেছে ঈশিশে'রই বেদীর থেকে ধূমা,
জুড়িয়ে গেছে লক্‌লকে সেই রক্তজিভার চুমা!
এদ্দিনেতে ফুরিয়ে গেছে কুমীরপূজার ঘটা,
দুলছে মরুশ্মশান–শিরে মহাকালের জটা!
ঘুমন্তদের কানে কানে কয় সে—'ঘুমা, ঘুমা'!

ঘুমিয়ে গেছে বালুর তলে ফ্যারাও, ফ্যারাও ছেলে—
তাদের বুকে যাচ্ছে আকাশ বর্শা ঠেলে ঠেলে!

হাওয়ার সেতার দেয় ফুঁপিয়ে মেন্ননে'রই বুক,
ডুবে গেছে মিশররবি,—বিরাট 'বেলে'র ভুখ
জিহ্বা দিয়ে জঠর দিয়ে গেছে তোমায় জ্বেলে!

পিরামিডের পাশাপাশি লাল্‌চে বালুর কাছে
স্থবির মরণ-ঘুমের ঘোরে মিশর শুয়ে আছে!
সোনার কাঠি নেই কি তাহার? জাগবে না কি আর!
মৃত্যু—সে কি শেষের কথা?—শেষ কি শবাধার!
সবাই কি গো ঢালাই হবে চিতার কালির ছাঁচে!

নীলার ঘোলা জলের দোলায় লাফায় কালো সাপ।
কুমীরগুলোর খুলির খিলান, করাত দাঁতের খাপ
উর্দ্ধমুখে রৌদ্র পোহায়;—ঘুমপাড়ানির ঘুম
হানছে আঘাত—আকাশ বাতাস হচ্ছে যেন গুম্‌!
ঘুমের থেকে উপচে পড়ে মৃতের মনস্তাপ!

নীলা, নীলা—ধুক্‌ধুকিয়ে মিশরকবর-পারে
রইলে জেগে বোবা বুকের বিকল হাহাকারে!
লাল আলেয়ায় খেয়া ভাসায় 'রামেসেসে'র দেশ!
অতীত অভিশাপের নিশা এলিয়ে এলোকেশ
নিভিয়ে দেছে দেউটি তোমার দেউল-কিনারে!

কলসী কোলে নীলনদেতে যেতেছে ঐ নারী,
ঐ পথেতে চলতে আছে নিগ্রো সারি সারি:
ইয়াঙ্কী ঐ—ঐ য়ুরোপী—চীনে-তাতার-মুর্‌
তোমার বুকের পাঁজর দ'লে টলতেছে হুড়মুড়,—
ফেনিয়ে তুলে খুন্‌খারাবী, খেলাপ, খবরদারী!

দিনের আলো ঝিমিয়ে গেল—আকাশে ঐ চাঁদ!
—চপল হাওয়ায় কাঁকন কাঁদায় নীলনদেরই বাঁধ!
মিশর-ছুঁড়ি গাইছে মিঠা শুঁড়িখানার সুরে
বালুর খাতে, প্রিয়ো'র সাথে,—খেজুরবনে দূরে!
আফ্রিকা এই, এই যে মিশর—যাদুর এ যে ফাঁদ!

'ওয়েসিসে'র ঠাণ্ডা ছায়ায় চৈতি চাঁদের তলে
মিশরবালার বাঁশির গলা কিসের কথা বলে!
চলছে বালুর চড়াই ভেঙে উটের পরে উট—
এই যে মিশর—আফ্রিকার এই কুহকপাখাপুট!
—কি এক মোহ এই হাওয়াতে—এই দরিয়ার জলে!

শীতল পিরামিডের মাথা—'গীজে'র মুরতি
অঙ্কবিহীন যুগসমাধির মূক মমতা মথি

আবার যেন তাকায় অদূর উদয়গিরির পানে!
'মেম্ননে'র ঐ কণ্ঠ ভরে চারণ-বীণার গানে!
আবার জাগে ঝান্ডাঝালর,—জ্যান্ত আলোর জ্যোতি!

পিরামিড

বেলা বয়ে যায়,
গোধূলির মেঘ-সীমানায়
ধূম্রমৌন সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘন্টা বাজে,
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে!
পান্থ ম্লান চিতার কবলে
একে একে ডুবে যায় দেশ জাতি সংসার সমাজ;
কার লাগি, হে সমাধি, তুমি একা বসে আছো আজ
কী এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন!
অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে পাও নাই টের!
কোন্ দিবাঅবসানে গৌরবের লক্ষ মুসাফের
দেউটি নিভায়ে গেছে—চলে গেছে দেউল ত্যজিয়া,
চলে গেছে প্রিয়তম—চলে গেছে প্রিয়া!
যুগান্তের মণিময় গেহবাস ছাড়ি
চকিতে চলিয়া গেছে বাসনা-পসারী,
কবে কোন্ বেলাশেষে হায়
দূর অস্তশেখরের গায়!
তোমারে যায় নি তারা শেষ অভিনন্দনের অর্ঘ্য সমর্পিযা,
সাঁঝের নীহারনীল সমুদ্র মথিয়া
মরমে পশে নি তব তাহাদের বিদায়ের বাণী!
তোরণে আসে নি তব লক্ষ লক্ষ মরণ-সন্ধানী
অশ্রু-ছলছল চোখে পান্ডুর বদনে!
কৃষ্ণ যবনিকা কবে ফেলে তারা গেল দূর দ্বারে বাতায়নে
জানো নাই তুমি!
জানে না তো মিশরের মূক মরুভূমি
তাদের সন্ধান!
হে নির্বাক পিরামিড,— অতীতের স্তব্ধ প্রেতপ্রাণ
অবিচল স্মৃতির মন্দির!
আকাশের পানে চেয়ে আজও তুমি বসে আছো স্থির;
নিস্পলক যুগাভ্রু তুলে
চেয়ে আছো অনাগত উদধির কূলে
মেঘরক্ত ময়ূখের পানে!
জ্বলিয়া যেতেছে নিত্য নিশি-অবসানে
নূতন ভাস্কর!
বেজে ওঠে অনাহত মেম্ননের স্বর

নবোদিত অরুণের সনে—
কোন্ আশা-দুরাশার ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলি-তাড়নে!
পিরামিড-পাষাণের মর্ম ঘেরি নেচে যায় দু দণ্ডের রুধিরফোয়ারা
কি এক প্রগল্ভ উষ্ণ উল্লাসের সাড়া!
থেমে যায় পান্থবীণা মুহূর্তে কখন!
শতাব্দীর বিরহীর মন
নিটল নিথর
সন্তরি ফিরিযা মরে গগনের রক্ত পীত সাগরের 'পর!
বালুকার স্ফীত পারাবারে
লোল মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারে
মিশরের অপহৃত অন্তরের লাগি
মৌন ভিক্ষা মাগি!—
খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুযার!
মুখরিত প্রাণের সঞ্চার
ধ্বনিত হইবে কবে কলহীন নীলাব বেলায!—
বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজও তাই বসে আছে পিরামিড হায়!
কত আগন্তুক কাল, অতিথি-সভ্যতা
তোমার দুয়ারে এসে কযে যায অসম্বৃত অন্তরের কথা!
তুলে যায উচ্ছৃঙ্খল রুদ্র কোলাহল!
তুমি রহ নিরুত্তর—নির্বেদী—নিশ্চল—
মৌন, অন্যমনা!
প্রিযার বক্ষের 'পরে বসি একা নীরবে করিছ তুমি
শবের সাধনা—
হে প্রেমিক—স্বতন্ত্র স্বরাট্!
কবে সুপ্ত উৎসবের স্তব্ধ ভাঙা হাট
উঠিবে জাগিযা!
সস্মিত নযন তুলি কবে তব প্রিযা
আঁকিবে চুম্বন তব স্বেদকৃষ্ণ,পাণ্ডু, চূর্ণ, ব্যথিত কপোলে!
মিশরঅলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্ব'লে!
বসে আছো অশ্রুহীন স্পন্দহীন তাই!
ওলটপালটি যুগ-যুগান্তের শ্মশানের ছাই
জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি,—প্রেমের প্রহরা।
মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা-ঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি,
অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোবা স্মৃতির শ্মশান
দু দিনের তরে শুধু; নবোৎফুল্ল মাধবীর গান
মোদের ভুলাযে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে;
অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে!

মরুবালু

হাড়ের মালা গলায় গেঁথে—অট্টহাসি হেসে
উল্লাসেতে টলছে তারা,—জ্বলছে তারা খালি!
ঘুরছে তারা লাল মশানে কপাল-কবর চেষে,
বুকের বোমাবারুদ দিয়ে আকাশটারে জ্বালি
পাঁয়জোরে কাল মহাকালের পাঁজর ফেঁড়ে ফেঁড়ে
মড়ার বুকে চাবুক মেরে ফিরছে মরুর বালি!

সর্বনাশের সঙ্গে তোরা দম্ভে খেলিস পাশা!
হেথায় কোন্-এক সৃষ্টিপ্রাতের সুত্রপাতের ভূমি,
—শিশুমানব গড়েছিল ঐ সাহারায় বাসা;
—সে সব গেছে কবে ঘুমের চুমার ধোঁযায় ধূমি!
অটল আকাশ যাচ্ছে জবির ফিতার মতো ফেঁড়ে,
জবান তোদের জ্বলছে যমের চিতার গেলাস চুমি!

তোদের সনে 'ডাইনোসুরে'র লড়াই হলো কত—
আলুথালু লুটিয়ে বালুর ডাইনী ছায়ার তলে
আজকে তারা ঘুমিয়ে আছে—চুল্লি শত শত
উঠল জ্বলে তাদের হাড়ে—তাদের নাড়েব বলে;
কাঁদছে খাঁ খাঁ কাফন-ঢাকা বালুর চাকার নিচে
মুন্ড তাদের—মড়ার কপাল ভৈববেরই গলে!

তোদের বুকে জাগছে মৃগতৃষ্ণা—জাগে ঝড়!
নিস উড়িয়ে শিকার-সোয়ার ধোঁয়ার পিছে পিছে,—
মেঘে মেঘে চড়াও—বাজের বুক চিরে চক্কর!
নাচতে আছিস আকাশখানার গোখরাফণার নীচে,
আরব মিশর চীন ভারতের হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হাপর খিঁচে খিঁচে!

তোদের ভাষা আস্ফালিছে শেখসেনানীর বুকে!
—লাল সাহারার শেরের সোয়ার—বালুর ঘায়ে ঘেয়ো,
ধমক মেরে আঁধির বুকে ছুটছে রুখে রুখে!
—তোদের মতন নেইকো তাদের সোদর-সাথী কেহ,
নেইকো তাদের মোদের মতন পিছুডাকের মায়া,
নেইকো তাদের মোদের মতন আর্ত মোহ-স্নেহ।

দানোয-পাওয়া আগুনদানা—দারুণ পথের মুখে!
ঘায়েল করি মেঘের বুরুজ বল্লমেরই ঘর,
উড়িয়ে হাজার 'কেরাভেন' ও তাম্বুশিবির বুকে,
উজিয়ে মরীচিকাব শিখা—কালফণা জর্জর
—টলতে আছিস—দলতে আছিস,—জ্বলতে আছিস ধু ধু!
সঙ্গে স্যাঙাত—মসুদ্ ডাকাত—তাতার যাযাবর!

গাড়তে যাবে যারা তোদের বুকের মাঝে বাসা
হাড্ডি তাদের ফোঁফরা হ'য়ে ঝরবে বালুর মাঝে,
এইখানেতে নেইকো দরদ, নেইকো ভালোবাসা,
বর্শা লাফায়—উটের গলার ঘুন্টি শুধু বাজে!
ফুরিয়ে গেছে আশা যাদের, জুড়িয়ে গেছে জ্বালা,
আয় রে বালুর 'কারবালা'তে, অন্ধকারের ঝাঁঝে!

চাঁদিনীতে

বেবিলোন্ কোথা হারায়ে গিয়েছে—মিশর-'অসুর' কুয়াশাকালো;
চাঁদ জেগে আছে আজও অপলক, মেঘের পালকে ঢালিছে আলো!
সে যে জানে কত পাথারের কথা, কত ভাঙা হাট মাঠের স্মৃতি!
কত যুগ কত যুগান্তরের সে ছিল জ্যোৎস্না, শুক্লা তিথি!
হয়তো সেদিনও আমাদেরই মতো পিলুবারোঁয়ার বাঁশিটি নিয়া
ঘাসের ফরাশে বসিত এমনি দূর পরদেশী প্রিয় ও প্রিয়া!
হয়তো তাহারা আমাদেরই মতো মধু-উৎসবে উঠিত মেতে
চাঁদের আলোয় চাঁদমারী জুড়ে, সবুজ চরায়, সব্জী ক্ষেতে!
হয়তো তাহারা দুপুর-যামিনী বালুর জাজিমে সাগরতীরে
চাঁদের আলোয় দিগ্‌দিগন্তে চকোরের মতো চরিত ফিরে!
হয়তো তাহারা মদঘূর্ণনে নাচিত কাঞ্চীবাঁধন খুলে
এমনি কোন্-এক চাঁদের আলোয়—মরু 'ওয়েসিসে' তরুর মূলে!
বীর যুবাদল শত্রুর সনে বহুদিনব্যাপী রণের শেষে
এমনি কোন্-এক চাঁদিনীবেলায় দাঁড়াত নগরীতোরণে এসে!
কুমারীর ভিড় আসিত ছুটিয়া, প্রণয়ীর গ্রীবা জড়ায়ে নিয়া
হেঁটে যেত তারা জোড়ায়-জোড়ায় ছায়াবীথিকার পথটি দিয়া!
তাদের পায়ের আঙুলের ঘায়ে খড়্-খড়্ পাতা উঠিত বাজি,
তাদের শিয়রে দুলিত জ্যোৎস্না-চাঁচর-চিকণ পত্ররাজি!
দখিনা উঠিত মর্মরি মধুবনানীর লতা-পল্লব ঘিরে,
চপল মেয়েরা উঠিত হাসিয়া—'এল বল্লভ,—এল রে ফিরে!'
—তুমি ঢুলে যেতে, দশমীর চাঁদ তাহাদের শিরে সারাটি নিশি!
নয়নে তাদের দুলে যেতে তুমি—চাঁদনী-শরাব, সুরার শিশি!
সেদিনও এমনি মেঘের আসরে জ্বলেছে পরীর বাসরবাতি,
হয়তো সেদিনও ফুটেছে মোতিয়া—ঝরেছে চন্দ্রমল্লীপাঁতি!
হয়তো সেদিনও নেশাখোর মাছি গুমরিয়া গেছে আঙুরবনে,
হয়তো সেদিনও আপেলের ফুল কেঁপেছে আঢুল হাওয়ার সনে!
হয়তো সেদিনও এলাচির বন আতরের শিশি দিয়েছে ঢেলে
হয়তো আলেয়া গেছে ভিজা মাঠে এমনি ভূতুড়ে প্রদীপ জ্বেলে!
হয়তো সেদিনও ডেকেছে পাপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া 'সরো'র শাখে,
হয়তো সেদিনও পাড়ার নাগরী ফিরেছে এমনি গাগরি কাঁখে!
হয়তো সেদিনও পানসী দুলায়ে গেছে মাঝি বাঁকা ঢেউটি বেয়ে,
হয়তো সেদিনও মেঘের শকুনডানায় গেছিল আকাশ ছেয়ে!
হয়তো সেদিনও মানিকজোড়ের মরা পাখাটির ঠিকানা মেগে

অসীম আকাশে ঘুরেছে পাখিনী ছট্‌ফট্‌ দুটি পাখার বেগে!
হয়তো সেদিনও খুর্‌ খুর্‌ ক'রে খরগোশছানা গিয়েছে ঘুরে
ঘন মেহগিনি-টার্পিন-তলে—বালির জর্দা বিছানা ফুঁড়ে!
হয়তো সেদিনও জানালার নীল জাফরির পাশে একেলা বসি
মনের হরিণী হেরেছে তোমারে—বনের পারের ডাগর-শশী!
শুক্লা একাদশীর নিশীথে মণিহর্মের তোরণে গিয়া
পারাবত-দূত পাঠায়ে দিয়েছে প্রিয়ের তরেতে হয়তো প্রিয়া!
অলিভকুঞ্জে হা হা ক'রে হাওয়া কেঁদেছে কাতর যামিনী ভরি!
ঘাসের শাটিনে আলোর ঝালরে 'মার্টিল্‌' পাতা প'ড়েছে 'ঝরি'!
'উইলো'র বন উঠেছে ফুঁপায়ে—'ইউ'তরুশাখা গিয়েছে ভেঙে,
তরুণীর দুধ-ধব্‌ধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে!
কোন্‌ গ্রীস—কোন্‌ কার্থেজ, রোম, 'ত্রুবেদুর'-যুগ কোন,—
চাঁদের আলোয় স্মৃতির কবর-শফরে বেড়ায় মন!
জানি না তো কিছু—মনে হয় শুধু এমনি তুহিন চাঁদের নীচে
কত দিকে দিকে—কত কালে কালে হয়ে গেছে কত কী যে!
কত যে শ্মশান—মশান কত যে—কত যে কামনা-পিপাসা-আশা
অস্তচাঁদের আকাশে বেঁধেছে আরব-উপন্যাসের বাসা!

দক্ষিণা

প্রিয়ার গালেতে চুমো খেয়ে যায় চকিতে পিয়াল রেণু!—
এল দক্ষিণা—কাননের বীণা, বনানীপথের বেণু!
তাই মৃগী আজ মৃগের চোখেতে বুলায়ে নিতেছে আঁখি,
বনের কিনারে কপোত আজিকে মেয কপোতীরে ডাকি!
ঘুঘুর পাখায় ঘুঙুর বাজায় আজিকে আকাশখানা,—
আজ দখিনার ফর্দা হাওয়ায় পর্দা মানে না মানা!
শিশিরশীর্ণা বালার কপোলে কুহেলির কালো জাল
উষ্ণ চুমোর আঘাতে হয়েছে ডালিমের ম'তো লাল!
দাড়িমের বীজ ফাটিয়া পড়িছে অধরের চারি পাশে
আজ মাধবীর প্রথম উষায়, দখিনা হাওয়ার শ্বাসে!
মদের পেয়ালা শুকায়ে গেছিল, উড়ে গিয়েছিল মাছি,
দখিনা-পরশে ভরা পেয়ালায় বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে নাচি!
বেয়ালার সুরে বাজিযা উঠিছে শিরা-উপশিরাগুলি!
শ্মশানের পথে করোটি হাসিছে—হেসে খুন হল খুলি!
এস্রাজ বাজে আজ মলয়ের—চিতার রৌদ্রাতপ
সুরের সুঠামে নিভে যায় যেন, হেসে ওঠে যেন শব!
নিভে যায় রাঙা অঙ্গারমালা বৈতরণীর জলে
সুর-জাহ্নবী ফুটে ওঠে আজ মলয়ের কোলাহলে!
আকাশ-শিথানে মধু পরিণয়,—মিলন-বাসর পাতি
হিমানীশীর্ণ বিধবা তারারা জ্বলে ওঠে রাতারাতি!
ফাগুয়ার রাগে—চাঁদের কপোল চকিতে হয়েছে রাঙা!
—হিমের ঘোমটা চিরে দেয কে গো মরনম্লায়ুতে দাঙা!

লালসে কাহার আজ নীলিমার আনন রুধির-লাল—
নিখিলের গালে গাল পাতে কার কুঙ্কুম-ভাঙা গাল!
নারাঙ্গি-ফাটা অধর কাহার আকাশ বাতাসে ঝরে!
কাহার বাঁশিটি খুন উথলায়—পরান উদাস করে!
কাহার পানেতে ছুটিছে উধাও শিশু পিয়ালের শাখা!
ঠোঁটে ঠোঁট ডলে—পরাগ চোঁয়ায় অশোক ফুলের ঝাঁকা!
কাহার পরশে পলাশবধূর আঁখির কেশরগুলি
মুদে-মুদে আসে—আর বার করে কুঁদে কুঁদে কোলাকুলি!
পাতার বাজারে বাজে হল্লোড়—পায়েলার রুণ্ রুণ্,
কিশলয়দের ডাঁশা পেষে কে গো—চোখ করে ঘুমঘুম!
এসেছে দখিনা—ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন্-এক হীরের ছুরি!—
তার লাগি তবু ক্ষ্যাপা শাল নিম, তমাল-বকুলে হুড়াহুড়ি!
আমের কুঁড়িতে বাউল বোল্‌তা খুনসুড়ি দিয়ে খসে যায়,
অঘ্রানে যার ঘ্রাণ পেয়েছিল, পেযেছিল যারে 'পোষলা'য়,
সাতাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ—
নিছক হাওয়ায় ঝরিয়া পড়িছে আজ মউলেব কষগুণ!
ঠেলে ফেলে দিয়ে নীলমাছি আর প্রজাপতিদের ভিড়
দখিনার মুখে রসের বাগান বিকায়ে দিতেছে ক্ষীর!
এসেছে নাগর,—যামিনীব আজ জাগর রঙিন আঁখি,—
কুযাশাব দিনে কাঁচুলি বাঁধিযা কুচ রেখেছিল ঢাকি—
আজিকে কাঞ্চী যেতেছে খুলিযা, মদঘূর্ণনে হায!
নিশীথের স্বেদসীধুধারা আজ ক্ষরিছে দক্ষিণায!
রূপসী ধরণী বাসকসজ্জা, রূপালি চাঁদের তলে
বালুর ফবাশে বাঙা উল্লাসে ঢেউয়ের আগুন জ্বলে!
রোল উতরোল শোণিতে শিরায—হোরীর হা রা রা চিৎকাব—
মুখে মুখে মধু—সুধাসীধু শুধু, তিত্ কোথা আজ—তিত্ কার!
শীতের বাস্তুভিত ভেঙে আজ এল দক্ষিণা—মিষ্টি-মধু,
মদনের হুলে ঢুলে ঢুলে ঢুলে হুঁশহারা হল সৃষ্টি-বধূ!

যে কামনা নিয়ে

যে কামনা নিযে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর সেই তৃষা!
খুঁজে মরি রূপ, ছাযাধূপ জুড়ি,
রঙের মাঝারে হেরি রঙডুরি!
পরাগের ঠোঁটে পরিমলগুঁড়ি,—
হারাযে ফেলি গো দিশা!

আমি প্রজাপতি—মিঠা মাঠে মাঠে সোঁদালে সর্ষেক্ষেতে;
—রোদেব সফরে খুঁজি নাকো ঘর,
বাঁধি নাকো বাসা—কাঁপি থরথর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর

শুঁড়ির গেলাসে মেতে!

আমি দক্ষিণা—দুলালীর বীণা, পউষপরশহারা!
ফুল-আঙিয়ার আমি ঘুমভাঙা
পিয়াল চুমিয়া পিলাই গো রাঙা
পিয়ালার মধু, তুলি রাতজাগা
হোরীর হা রা রা-সাড়া!

আমি গো লালিমা—গোধূলির সীমা, বাতাসের 'লালা' ফুল।
দুই নিমেষের তরে আমি জ্বালি
নীল আকাশের গোলাপী দেয়ালী!
আমি খুশ্‌রোজী, আমি গো খেয়ালি,
চঞ্চল, চুল্‌বুল্‌!

বুকে জ্বলে মোর বাসর দেউটি—মধুপরিণয়রাতি!
তুলিছে ধ্বণী বিধবা-নয়ন
—মনের মাঝারে মদনমোহন
মিলননদীর নিধুর কানন
রেখেছে রে মোর পাতি!

স্মৃতি

থমথমে রাত, আমাব পাশে বসল অতিথি—
বললে, আমি অতীত ক্ষুধা—তোমার অতীত স্মৃতি!
—যে দিনগুলো সাঙ্গ হল ঝড়বাদলের জলে,
শুষে গেল মেরুর হিমে, মরুব অনলে,
ছায়ার মতো মিশেছিলাম আমি তাদের সনে;
তারা কোথায়?—বন্দী স্মৃতিই কাঁদছে তোমাব মনে!
কাঁদছে তোমার মনের খাকে, চাপা ছাইয়ের তলে,
কাঁদছে তোমাব স্যাঁত্‌সেঁতে শ্বাস—ভিজা চোখের জলে,
কাঁদছে তোমার মূক মমতাব রিক্ত পাথাব ব্যেপে,
তোমার বুকের খাড়ার কোপে, খুনের বিষে ক্ষেপে!
আজকে রাতে কোন্‌ সে সুদূর ডাক দিয়েছে তারে,—
থাকবে না সে ত্রিশূলমূলে, শিবের দেউলদ্বারে!
মুক্তি আমি দিলেম তারে—উল্লাসেতে দুলে
স্মৃতি আমার পালিয়ে গেল বুকের কপাট খুলে
নবালোকে—নবীন উষার নহবতেব মাঝে।
ঘুমিযেছিলাম, দোরে আমার কার করাঘাত বাজে!
—আবার আমায় ডাকলে কেন স্বপনঘোরের থেকে!
অই লোকালোক-শৈলচূড়ায় চরণখানা রেখে
রয়েছিলাম মেঘের রাঙা মুখের পানে চেয়ে,

কোথার থেকে এলে তুমি হিম সরণি বেয়ে!
ঝিম্‌ঝিমে চোখ, জটা তোমার ভাসছে হাওয়ার ঝড়ে,
শ্মশানশিঙা বাজল তোমার প্রেতের গলার স্বরে!
আমার চোখের তাবার সনে তোমার আঁখির তারা
মিলে গেল, তোমার মাঝে আবার হলেম হারা!
—হারিয়ে গেলাম ত্রিশূলমূলে, শিবের দেউলদ্বারে;
কাঁদছে স্মৃতি—কে দেবে গো—মুক্তি দেবে তারে!

সেদিন এ ধরণীর

সেদিন এ ধরণীর
সবুজ দ্বীপের ছায়া—উতরোল তরঙ্গের ভিড়
মোব চোখে জেগে জেগে ধীরে ধীরে হল অপহত
কুয়াশায ঝ'রে পড়া আতশের মতো।
দিকে দিকে ডুবে গেল কোলাহল,
সহসা উজানজলে ভাঁটা গেল ভাসি!
অতিদূর আকাশেব মুখখানা আসি
বুকে মোর তুলে গেল যেন হাহাকার।
সেই দিন মোব অভিসাব
মৃত্তিকার শূন্য-পেযালার ব্যথা একাকারে ভেঙে
বকেব পাখাব মতো শাদা লঘু মেঘে
ভেসেছিল আতুব উদাসী;
বনেব ছাযার নীচে ভাসে কার ভিজে চোখ
কাঁদে কার বারোয়াঁর বাঁশি
সেদিন শুনি নি তাহা;
ক্ষুধাতুব দুটি আঁখি তুলে
অতিদূর তারকার কামনায় তরী মোব দিয়েছিনু খুলে!

আমার এ শিবা-উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধবণীর নাড়ীব বন্ধন,
শুনেছিনু কান পেতে জননীব স্থবির ক্রন্দন,—
মোব তবে পিছু ডাক মাটি-মা—তোমার;
ডেকেছিল ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস,— জোনাকির ঝাড়,
আমারে ডাকিযাছিল আলেযার লাল মাঠ—শ্মশানের খেযাঘাট আসি,
কঙ্কালের রাশি,
দাউদাউ চিতা,—
কত পূর্বজাতকের পিতামহ-পিতা,
সর্বনাশ ব্যসন বাসনা,
কত মৃত গোক্ষুরার ফণা,
কত তিথি—কত যে অতিথি,
কত শত যোনিচক্রস্মৃতি
করেছিল উতলা আমাবে।

আধো আলো—আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এল তারা ছুটে!
মাটির বাঁটের চুমা শিহরি উঠিল মোর ঠোঁটে, রোমপুটে!
ধু ধু মাঠ—ধানক্ষেত—কাশফুল—বুনো হাঁস—বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া;
মাঝপথে থেমে গেল তারা সব;
শকুনের মতো শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে—দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা—অনন্তের শুক্র অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে!
স্ফীত সমুদ্রের মতো আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে,
দূর ছায়াপথে।
পৃথিবীর প্রেতচোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি তারকাদর্পণে মোর অপহৃত আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি;
ভ্রূণভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এল বুকফাটা মিনতির ভরে—
সঙ্গে নিয়ে বোবা শিশু—বৃদ্ধ মৃত পিতা,
সূতিকা-আলয় আর শ্মশানের চিতা,
মোর পাশে দাঁড়াল সে গর্ভিণীর ক্ষোভে;
মোর দুটি শিশু আঁখি-তারকার লোভে
কাঁদিয়া উঠিল তার পীনস্তন—জননীর প্রাণ।
জরায়ুর ডিম্বে তার জন্মিয়াছে যে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত সন্তান
তার তরে কালে কালে পেতেছে সে শৈবালবিছানা শালতমালের ছায়া,
এনেছে সে নব নব ঋতুরাগ—পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া;
তার তরে বৈতরণীতীরে সে যে ঢালিযাছে গঙ্গার গাগরী,
মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন তার বারবার ভিজা রসে উঠিযাছে ভরি!
উঠিয়াছে দূর্বাধানে শোভি,
মানবের তরে সে যে এনেছে মানবী!
মশলাদরাজ এই মাটিটার ঝাঁঝ যে রে—
কেন তবে দুদণ্ডের অশ্রু অমানিশা
দূর আকাশের তরে বুকে তার তুলে যায় নেশাখোর মক্ষিকার তৃষা!
নয়ন মুদিনু ধীরে—শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য-প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে!

ওগো দরদিয়া

—ওগো দরদিয়া,
তোমারে ভুলিবে সবে, যাবে সবে তোমারে ত্যজিযা;
ধরণীর পসরায় তোমারে পাবে না কেহ দিনান্তেও খুঁজে
কে জানে রহিবে কোথা নিশিভোরে নেশাখোব আঁখি তব বুজে!

—হয়তো সিন্ধুর পারে শ্বেতশঙ্খ ঝিনুকের পাশে
তোমার কঙ্কালখানা শুয়ে রবে নিদ্রাহারা ঊর্মির নিশ্বাসে!
চেয়ে রবে নিষ্পলক অতি দূর লহরীর পানে,
গীতিহারা প্রাণ তব হয়তো বা তৃপ্তি পাবে তরঙ্গের গানে!
হয়তো বনচ্ছায়া লতাগুল্ম পল্লবের তলে
ঘুমায়ে রহিবে তুমি নীল শষ্পে শিশিরের দলে;
হয়তো বা প্রান্তরের পারে তুমি র'বে শুয়ে প্রতিধ্বনিহারা,—
তোমারে হেরিবে শুধু হিমানীর শীর্ণাকাশ—নীহারিকা—তারা,
তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত জ্যোৎস্না—বধির জোনাকি!
তোমারে চিনিবে শুধু আঁধারের আলেয়ার আঁখি!
তোমারে চিনিবে শুধু আকাশের কালো মেঘ—মৌন—আলোহারা,
তোমারে চিনিয়া নেবে তমিস্রার তরঙ্গের ধারা!
কিংবা কেহ চিনিবে না, হয়তো বা জানিবে না কেহ
কোথায় লুটায়ে আছে হেমন্তের দিবাশেষে ঘুমন্তের দেহ!
—হয়েছিল পরিচয় ধরণীর পান্থশালে যাহাদের সনে,
তোমার বিষাদ-হর্ষ গেঁথেছিলে একদিন যাহাদের মনে,
যাহাদের বাতায়নে একদিন গিয়েছিলে পথিক-অতিথি,
তোমারে ভুলিবে তারা—ভুলে যাবে সব কথা, সবটুকু স্মৃতি!
নাম তব মুছে যাবে মুসাফের—অঙ্গারের পাণ্ডুলিপিখানি
নোনাধরা দেয়ালের বুক থেকে খ'সে যাবে কখন না জানি!
তোমারে পানের পাত্রে নিঃশেষে শুকায়ে যাবে শেষের তলানি,
দণ্ড দুই মাছিগুলো ক'রে যাবে মিছে কানাকানি!
তারপর উড়ে যাবে দূরে দূরে জীবনের সুরার তল্লাশে,
মৃত এক অলি শুধু পড়ে রবে মাতালের বিছানার পাশে!
পেয়ালা উপুড় করে হয়তো বা রেখে যাবে কোনো একজন,
কোথা গেছে ইয়োসোফ্ জানে না সে, জানে না সে গিয়েছে কখন।
জানে না যে, অজানা সে, আরবার দাবি নিয়ে আসিবে না ফিরে—
জানে না যে চাপা পড়ে গেছে সে যে কবেকার কোথাকার ভিড়ে!
—জানিতে চাহে না কিছু—ঘাড় নিচু ক'রে কে বা রাখে আঁখি বুজে
অতীত স্মৃতির ধ্যানে, অন্ধকার গৃহকোণে একখানা শূন্য পাত্র খুঁজে!
—যৌবনের কোন্ এক নিশীথে সে কবে
তুমি যে আসিয়াছিলে বনরাণী। জীবনের বাসন্তী-উৎসবে
তুমি যে ঢালিয়াছিলে ফাগরাগ—আপনার হাতে মোর সুরাপাত্রখানি
তুমি যে ভরিয়াছিলে—জুড়ায়েছে আজ তার ঝাঁঝ, গেছে ফুরায়ে তলানি!
তবু তুমি আসিলে না, বারেকের তরে দেখা দিলে নাকো হায়!
চুপে চুপে কবে আমি বসুধার বুক থেকে নিয়েছি বিদায়—
তুমি তাহা জানিলে না—চলে গেছে মুসাফের,
কবে ফের দেখা হবে আহা
কে বা জানে! কবরের পরে তার পাতা ঝরে, হাওয়া কাঁদে হা হা!

সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়।

চোখ দুটো ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে!
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন—স্বপন ক'দিন রয়!
এসেছে গোধূলি গোলাপীবরন—এ তবু গোধূলি নয়!
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়,
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে!

কেটেছে যে নিশি ঢের—
এত দিন তবু অন্ধকারের পাইনি তো কোনো টের!
দিনের বেলায় যাদের দেখিনি—এসেছে তাহারা সাঁঝে;
যাদের পাই নি ধূলায় পথের—ধোঁয়ায়—ভিড়ের মাঝে,—
শুনেছি স্বপনে তাদের কলসী ছলকে, কাঁকন বাজে।
আকাশের নীচে—তারার আলোয পেয়েছি যে তাহাদের!

চোখদুটো ছিল জেগে
কত দিন যেন সন্ধ্যা-ভোরের নট্‌কান্‌-রাঙা মেঘে।
কত দিন আমি ফিরেছি একেলা মেঘলা গাঁয়ের ক্ষেতে!
ছায়াধূপে চুপে ফিরিয়াছি প্রজাপতিটির মতো মেতে
কত দিন হায়!—কবে অবেলায় এলোমেলো পথে যেতে
ঘোর ভেঙে গেল, খেয়ালের খেলাঘরটি গেল যে ভেঙে!

দুটো চোখ ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে!
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন—স্বপন ক'দিন রয়!
এসেছে গোধূলি গোলাপীবরণ,—এ তবু গোধূলি নয!
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়—
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে!

ধূসর পাণ্ডুলিপি
১৯৩৬

ধূসর পাণ্ডুলিপি

জীবনানন্দ দাশ
প্রণীত

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র। কলকাতা ১৯৩৬।

প্রথম সংস্করণ:
ডিসেম্বর, ১৯৩৬
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

দাম দুই টাকা

প্রকাশক: শ্রীজীবনানন্দ দাশ
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণপত্র।

উৎসর্গ

বুদ্ধদেব বসুকে

ভূমিকা

আমার প্রথম কবিতা বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালে। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন হয় আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে : আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে।

১৩৩৬ সালে আর একখানা বই বার করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বারবার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে রকম কষ্ট হয় সেইরকম কেমন একটা উদ্বেগ—খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়— এই ক-বছর ধরে বোধ করে এসেছি আমি।

আজ ন'বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হল। এর নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে ১৩৩২ সালে লেখা কবিতা, ১৩৩৬ সালের লেখা কবিতা— প্রায় এগারো বছর আগের, প্রায় সাত বছর আগের রচনা সব আজ ১৩৪৩ সালে এই বইয়ের ভিতর ধরা দিল। আজ যে সব মাসিক পত্রিকা আর নেই—প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল—এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেই সব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন।

সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইল।

আশ্বিন ১৩৪৩ জীবনানন্দ দাশ

নির্জন স্বাক্ষর

তুমি তা জানো না কিছু— না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে!
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতাব মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?
অনেক ঘুমেব ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমাব এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমাব বুকের 'পবে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই!—
শুধু তাব স্বাদ
তোমাবে কি শান্তি দেবে!—
আমি ঝবে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে বাখিবে ধ'বে সেইদিন পৃথিবীব 'পবে,—
আমাব সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে!

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে;
জীবনেব রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে;—সে এক বিস্ময়,
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রেব জল!
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীব মনে
কোনো এক মানুষেব তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়েব গভীর গহ্বরে!
নক্ষত্রেব চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষেব তরে এক মানুষীব মনে!

একবাব কথা ক'য়ে দেশ আর দিকেব দেবতা
বোবা হ'য়ে প'ড়ে থাকে—ভুলে যায় কথা!
যে-আগুন উঠেছিল তাদের চোখেব তলে জ্ব'লে
নিভে যায়—ডুবে যায়—তারা যায় স্খ'লে।
নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চ'লে আসে নতুন সময়—
পুরানো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে;
আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্খ'লে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তাব বুকেব উপরে।

আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত—
যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে,—
যেই তারা জেগে আছে,তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে—
যে-আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
জেগে আছো;—
জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছ নিশ্চয়।
হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো—কত আগুনের ক্ষয়;
কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে-নক্ষত্র ঝ'রে যায তার!
যে-পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস—আকাশ তোমার!
জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছো—তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পারো তুমি;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হযে আছো, তবু—
বাহিরের আকাশেব শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ ক'রে।
জানো নাকো তুমি তার স্বাদ,
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ!

.

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন.
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে? অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমার আকাশ—আলো—জীবনের ধার
ক্ষযে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই! শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!
আমি চ'লে যাব—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেই দিন পৃথিবীর 'পরে;
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

মাঠের গল্প

মেঠো চাঁদ

মেটো চাঁদ রয়েছে তাকাযে
আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে

পোড়ো জমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল!
মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে; এমনি সে তাকায়েছে কত রাত—নাই লেখাজোখা।
মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে, ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে—চ'লে গেছে কবে!—
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা! ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া—পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল—
শিশিরের জল!
আমি তারে বলি:
ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কত,—
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো!
ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার—কতবার ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে—চ'লে গেছে কবে!—
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছে দাঁড়ায়ে
একা-একা! ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়-নাড়া—মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল!'

পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে—
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা!
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা;
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী—
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ!

হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রানের রাতে
সেই পাখি;—

আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনি গেছে ঘরে
প্রথম ফসল;
মাঠে-মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর,—
কার্তিক কি অঘ্রানের রাত্রির দুপুর;—
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে,
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রানের রাতে
এই পাখি।
নদীটির শ্বাসে
সে-রাতেও হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা,
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা
ধানক্ষেতে মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা;
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ!

পঁচিশ বছর পরে

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম : 'একদিন এমন সময়
আবার আসিও তুমি: আসিবার ইচ্ছা যদি হয়—
পঁচিশ বছর পরে।'
এই বলে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে;
তারপর, কতবার চাঁদ আর তারা,
মাঠে-মাঠে মরে গেল, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত খুঁজে
এল গেল; চোখ বুজে

কতবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কত-কেউ! রহিলাম জেগে
আমি একা; নক্ষত্র যে বেগে
ছুটিছে আকাশে,
তার চেয়ে আগে চ'লে আসে
যদিও সময়,—
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয়!

তারপর—এক দিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে—
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়কড়!
শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুকনো মাকড়সা
লতায়—পাতায়;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজও মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে!

কার্তিক মাঠের চাঁদ

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ—
পাহাড়ের মতো ওই মেঘ
সঙ্গে লয়ে আসে
মাঝরাতে কিংবা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে
—মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে!
ছেঁড়া-ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মতো— আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়—
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে—চাঁদ;
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা—তারপর হাতছাড়া হয়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে,—আজও তুমি তার স্বাদ লয়ে
আর-একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে!
নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারদিকে,
শস্যের ক্ষেত চষে-চষে

গেছে চাষা চ'লে;
তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হ'লে
অনেক তবুও থাকে বাকি—
তুমি জানো—এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি!

সহজ

আমার এ-গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে—
তবুও হৃদয়ে গান আসে।
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে;
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান;
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

তুমি জল, তুমি ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ—তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে!
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে;—কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে;—রাত্রির সিন্ধুর জল,
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক; তোমারে কে ভালোবাসে;—তোমার কি কেউ
বুকে ক'রে রাখে!
জলের আবেগে তুমি চ'লে যাও,—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু ধু জল তোমারে যে ডাকে!

তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর;
মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে—কত দূরে!
কোন্ সমুদ্রের পারে, বনে—মাঠে—কিংবা যে-আকাশ জুড়ে

উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে—
কিংবা যে আকাশে
কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে—ডুবে যায়— তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে;
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান!—
তুমি সেইখানে!
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
এক দিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত!

কয়েকটি লাইন

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি—আমার মতন
আর নাই কেউ!
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছে নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো।
উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো দুর্দশার গান,
যে কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভরে,—
সেই কবি—সে-ও যাবে স'রে;
যে কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,
যে বুঝেছে,—প্রলাপের ঘোরে

যে বকেছে,—সেও যাবে স'রে;
একে-একে সবি
ডুবে যাবে;—উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবে না কেউ আরো?
যেই দিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমাব বইয়ের পাতা খুলে?
কিংবা যদি গায,—পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা ছিল সত্য তার?
আনন্দের আবর্তনে আজিকে আবার
সেদিনের পুরোনো আঘাত
ভুলিবে সে? ব্যথা যাবা স'য়ে গেছে রাত্রি-দিন
তাহাদের আর্ত ডান হাত
ঘুম ভেঙে জানাবে নিষেধ;
সব ক্লেশ আনন্দের ভেদ
ভুল মনে হবে;
সৃষ্টির বুকের 'পরে ব্যথা লেগে রবে,
শয়তানের সুন্দর কপালে
পাপের ছাপের মতো সেই দিনও!
মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে,
রোগা পাযে করে পাইচারি,
দেযালে যাদের ছাযা পড়ে সারি সারি
সৃষ্টির দেযালে,—
আহলাদ কি পায় নাই তারা কোনোকালে?
যেই উড়ো উৎসাহের উৎসবের রব
ভেসে আসে—তাই শুনে জাগে নি উৎসব?
তবে কেন বিহ্বলের গান
গায তারা!—বলে কেন, আমাদের প্রাণ
পথের আহত
মাছিদের মতো!

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো ব্যর্থতাব গান;
শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান,—
তাই আসি,
নানা কাজ তার
আমরা মিটাযে যাই,—
জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবাব;—
এই সচ্ছলতা
আমাদের;—আকাশ কহিছে কোন্ কথা
নক্ষত্রের কানে?—
আনন্দের? দুর্দশার?—পড়ি নাকো।—সৃষ্টিব আহ্বানে
আসিযাছি।

সময় সিন্ধুর মতো:
তুমিও আমার মতো সমুদ্রের পানে, জানি, রয়েছ তাকায়ে
ঢেউয়ের হুঁচোট্ লাগে গায়ে,—
ঘুম ভেঙে যায় বারবার
তোমার—আমার!
জানি না তো কোন্ কথা কও তুমি ফেনার কাপড়ে বুক ঢেকে,
ওপারের থেকে;
সমুদ্রের কানে
কোন্ কথা কই আমি এই পারে—সে কি কিছু জানে?
আমিও তোমার মতো রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট্ লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার আমার।

কোথাও রয়েছ, জানি,—তোমারে তবুও আমি ফেলেছি হারায়ে;
পথ চলি—ঢেউ ভেজে পায়ে;
রাতের বাতাস ভেসে আসে,
আকাশে আকাশে
নক্ষত্রের 'পরে
এই হাওয়া যেন হা-হা করে!
হু-হু ক'রে ওঠে অন্ধকার!
কোন্ রাত্রি—আঁধারের পার
আজ সে খুঁজিছে!
কত রাত ঝ'রে গেছে,—নীচে—তারও নীচে
কোন্ রাত—কোন্ অন্ধকার
একবার এসেছিল,—আসিবে না আর।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু-ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর!
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা,
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন—
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে
যেখানে সমস্ত রাত ভ'রে,
নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে
যেইখানে,
পৃথিবীর কানে
শস্য গায় গান,
সোনার মতন ধান
ফ'লে ওঠে যেইখানে—
একদিন—হয়তো—কে জানে
তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মতো চুপে থামি
সেইখানে রব প'ড়ে!—
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
গান গায সিন্ধু তার জলের উল্লাসে।

ঘুমাতে চাও কি তুমি?
অন্ধকারে ঘুমাতে কি চাই?—
ঢেউয়ের গানের শব্দ
সেখানে ফেনার গন্ধ নাই?
কেহ নাই—আঙুলের হাতেব পরশ
সেইখানে নাই আব—
রূপ যেই স্বপ্ন আনে, স্বপ্নে বুকে জাগায় যে রস
সেইখানে নাই তাহা কিছু;
ঢেউয়ের গানের শব্দ
যেখানে ফেনার গন্ধ নাই—
ঘুমাতে চাও কি তুমি?
সেই অন্ধকারে আমি ঘুমাতে কি চাই!
তোমারে পাব কি আমি কোনোদিন?—নক্ষত্রের তলে
অনেক চলার পথ—সমুদ্রের জলে
গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুর বাজে—
ফুরাবে এ-সব, তবু—তুমি যেই কাজে
ব্যস্ত আজ—ফুরাবে না, জানি;
একদিন তবু তুমি তোমার আঁচলখানি
টেনে লবে;যেটুকু করার ছিল সেই দিন হয়ে গেছে শেষ,
আমার এ সমুদ্রের দেশ
হয়তো হয়েছে স্তব্ধ সেইদিন,—আমার এ নক্ষত্রের রাত
হয়তো সরিয়া গেছে—তবু তুমি আসিবে হঠাৎ;
গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুর সমুদ্রের জলে,
অনেক চলার পথ নক্ষত্রের তলে!

আমার নিকট থেকে

তোমারে নিয়েছে কেটে কখন সময়!
চাঁদ জেগে রয়
তারা ভরা আকাশের তলে,
জীবন সবুজ হয়ে ফলে,
শিশিরের শব্দে গান গায়
অন্ধকার, আবেগ জানায়
রাতের বাতাস!
মাটি ধুলো কাজ করে—মাঠে মাঠে ঘাস
নিবিড়—গভীর হয়ে ফলে!
তারা ভরা আকাশের তলে
চাঁদ তার আকাঙ্ক্ষার স্থল খুঁজে লয়—
আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।
একদিন দিয়েছিলে যেই ভালোবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা!
জানি আমি, তাই
আমিও ভুলিয়া যেতে চাই
একদিন পেয়েছি যে ভালোবাসা
তার স্মৃতি—আর তার ভাষা;
পৃথিবীতে যত ক্লান্তি আছে,
একবার কাছে এসে আসিতে চায় না আর কাছে
যে-মুহূর্ত;—
একবার হয়ে গেছে, তাই যাহা গিয়েছে ফুরায়ে
একবার হেঁটেছে যে, তাই যার পায়ে
চলিবার শক্তি আর নাই;
সব চেয়ে শীত, তৃপ্ত তাই।
কেন আমি গান গাই?
কেন এই ভাষা
বলি আমি!—এমন পিপাসা
বারবার কেন জাগে!
প'ড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়।

অনেক আকাশ

গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে—সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়—সেখানে সে কারে ভালোবাসে!—
পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম চোখ বুজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কত দিকে গিয়েছে সে ভেসে—
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে, তবু—ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে—

তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিল হেসে!

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
ক'মে যায়; তাই নীল আকাশের স্বাদ—সচ্ছলতা—
পূর্ণ করে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর;
মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায়—নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে—
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন যে এক অধীরতা,
তাই লয়ে সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মতো র'ব নক্ষত্রের সাথে!

আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি, তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা!
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার!
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায়!
একাকী মেঘের মতো ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয—সন্ধ্যায়!

সে এসে পাখির মতো স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড়,—
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর—অস্থিরতা!
অধীর অন্তর তারে করিয়াছে অস্থির—অধীর!
তাহারই হৃদয় তারে দিয়েছে ব্যাধের-মতো ব্যথা!
একবার তাই নীল আকাশের আলোর গাঢ়তা
তাহারে করেছে মুগ্ধ—অন্ধকার নক্ষত্র আবার
তাহারে নিয়েছে ডেকে—জেনেছে সে এই চঞ্চলতা
জীবনের; উড়ে উড়ে দেখেছে সে মরণের পার
এই উদ্বেলতা লয়ে নিশীথের সমুদ্রের মতো চমৎকার!

গোধূলির আলো লয়ে দুপুরে সে করিয়াছে খেলা,
স্বপ্ন দিয়ে দুই চোখ একা একা রেখেছে সে ঢাকি;
আকাশে আঁধার কেটে গিয়েছে যখন ভোরবেলা
সবাই এসেছে পথে, আসে নাই তবু সেই পাখি!—
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,
ছায়ার উপরে তার নিজের পাখার ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপনের 'পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি!
সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে!

কেউ তারে দেখে নাই; মানুষের পথ ছেড়ে দূরে

হাড়ের মতন শাখা ছায়ার মতন পাতা ল'য়ে
যেইখানে পৃথিবীর মানুষের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে
কথা কয়, আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে
হেমন্তের নদী, ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে
হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিশ্বাস—
তাহাদের মতো হয়ে তাহাদের সাথে গেছি রয়ে;
দূরে প'ড়ে পৃথিবীর ধুলা–মাটি–নদী–মাঠ–ঘাস—
পৃথিবীর সিন্ধু দূরে—আরো দূরে পৃথিবীর মেঘের আকাশ!

এখানে দেখেছি আমি জাগিযাছ হে তুমি ক্ষমতা,
সুন্দর মুখের চেয়ে তুমি আরো ভীষণ, সুন্দর!
ঝড়ের হাওযার চেয়ে আরো শক্তি, আরো ভীষণতা
আমারে দিয়েছে ভয়! এইখানে পাহাড়ের 'পর
তুমি এসে বসিযাছ—এইখানে অশান্ত সাগর
তোমারে এনেছে ডেকে—হে ক্ষমতা, তোমার বেদনা
পাহাড়ের বনে বনে তুলিতেছে উত্তরের ঝড়
আকাশের চোখে–মুখে তুলিতেছে বিদ্যুতের ফণা
তোমার স্ফুলিঙ্গ আমি, ওগো শক্তি—উল্লাসের মতন যন্ত্রণা!

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন
প্রেমিকের হৃদয়েব গানের মতন কেঁপে উঠে
তোমার প্রাণের কাছে একদিন পেযেছে কখন!
সন্ধ্যার আলোর মতো পশ্চিম মেঘের বুকে ফুটে,
আঁধাব রাতের মতো তারার আলোর দিকে ছুটে,
সিন্ধুর ঢেউযের মতো ঝড়ের হাওযাব কোলে জেগে
সব আকাঙ্ক্ষাব বাঁধ একবার গেছে তার টুটে!
বিদ্যুতের পিছে পিছে ছুটে গেছি বিদ্যুতেব বেগে!
নক্ষত্রের মতো আমি আকাশেব নক্ষত্রেব বুকে গেছি লেগে!

যে মুহূর্ত চলে গেছে—জীবনের যেই দিনগুলি
ফুরাযে গিয়েছে সব, একবার আসে তারা ফিরে;
তোমার পাযের চাপে তাদেব করেছ তুমি ধূলি!
তোমার আঘাত দিযে তাদের গিয়েছ তুমি ছিঁড়ে!
হে ক্ষমতা, মনের ব্যথার মতো তাদের শরীরে
নিমেষে নিমেষে তুমি কতবার উঠেছিলে জেগে!
তারা সব ছ'লে গেছে—ভূতুড়ে পাতার মতো ভিড়ে
উত্তর–হাওযার মতো তুমি আজও রহিয়াছ লেগে!
যে সময় চলে গেছে তাও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে—আবেগে!

তুমি কাজ করে যাও, ওগো শক্তি, তোমার মতন!
আমারে তোমার হাতে একাকী দিযেছি আমি ছেড়ে;
বেদনা–উল্লাসে তাই সমুদ্রের মতো ভরে মন!—
তাই কৌতূহল—তাই ক্ষুধা এসে হৃদযেরে ঘেরে,—

জোনাকির পথ ধরে তাই আকাশের নক্ষত্রেরে
দেখিতে চেয়েছি আমি, নিরাশার কোলে বসে একা
চেয়েছি আশারে আমি, বাঁধনের হাতে হেরে হেরে
চাহিয়াছি আকাশের মতো এক অগাধের দেখা!—
ভোরের মেঘের ঢেউয়ে মুছে দিয়ে-রাতের মেঘের কালো রেখা!

আমি প্রণয়িনী, তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী!
আমার সকল প্রেম উঠেছে চোখের জলে ভেসে!—
প্রতিধ্বনির মতো হে ধ্বনি, তোমার কথা কহি
কেঁপে উঠে—হৃদয়ের সে যে কত আবেগে আবেশে!
সব ছেড়ে দিয়ে আমি তোমারে একাকী ভালোবেসে
তোমার ছায়ার মতো ফিরিয়াছি তোমার পিছনে!
তবুও হারায়ে গেছ, হঠাৎ কখন কাছে এসে
প্রেমিকের মতো তুমি মিশেছ আমার মনে মনে
বিদ্যুৎ জ্বালায়ে গেছ, আগুন নিভায়ে গেছ হঠাৎ গোপনে!

কেন তুমি আস যাও?—হে অস্থির, হবে না কি ধীর!
কোনোদিন?—রৌদ্রের মতন তুমি সাগরের 'পরে
একবার—দুইবার জ্বলে উঠে হতেছ অস্থির!—
তারপর, চলে যাও কোন্ দূরে পশ্চিমে—উত্তরে—
সেখানে মেঘের মুখে চুমো খাও ঘুমের ভিতরে
ইন্দ্রধনুকের মতো তুমি সেইখানে উঠিতেছ জ্বলে,
চাঁদের আলোর মতো একবার রাত্রির সাগরে
খেলা কর—জ্যোৎস্না চলে যায়, তবু তুমি যাও চলে
তার আগে; যা বলেছ একবার, যাবে নাকি আবার তা বলে!

যা পেয়েছি একবার, পাব নাকি আবার তা খুঁজে!
যেই রাত্রি যেই দিন একবার কয়ে গেল কথা
আমি চোখ বুজিবার আগে তারা গেল চোখ বুজে,
ক্ষীণ হয়ে নিভে গেল সলিতার আলোর স্পষ্টতা!
ব্যথার বুকের 'পরে আর এক ব্যথা-বিহ্বলতা
নেমে এল—উল্লাস ফুরায়ে গেল নতুন উৎসবে;
আলো-অন্ধকার দিয়ে বুনিতেছি শুধু এই ব্যথা,
দুলিতেছি এই ব্যথা- উল্লাসের সিন্ধুর বিপ্লবে!
সব শেষ হবে—তবু আলোড়ন, তা কি শেষ হবে!

সকল যেতেছে চলে—সব যায় নিভে—মুছে—ভেসে-
যে সুর থেমেছে তার স্মৃতি তবু বুকে জেগে রয়!
যে নদী হারায়ে যায় অন্ধকারে—রাতে—নিরুদ্দেশে,
তাহার চঞ্চল জল স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয়!
যে মুখ মিলায়ে যায় আবার ফিরিতে তারে হয়
গোপনে চোখের 'পরে—ব্যথিতের স্বপ্নের মতন!
ঘুমন্তের এই অশ্রু—কোন্ পীড়া—সে কোন্ বিস্ময়

জানায়ে দিতেছে এসে!—রাত্রি-দিন আমাদের মন
বর্তমান অতীতের গুহা ধরে একা একা ফিরিছে এমন!

আমরা মেঘের মতো হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে—একবার পৃথিবীর পানে
চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মতো চুপে চুপে ভেসে
চলে যাই এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোন্ দিকে পথ বেয়ে!—আমাদের কেউ কি তা জানে।
ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চলে যাই; কোন্ এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে?
পাখির মায়ের মতো আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে—অন্ধকারে, অন্য কারো আকাশের থেকে!

এক দিন বুজিবে কি চারি দিকে রাত্রিব গহ্বর!—
নিবন্ত বাতির বুকে চুপে চুপে যেমন আঁধাব
চলে আসে, ভালোবেসে—নুয়ে তার চোখের উপর
চুমো খায়,—তারপর তারে কোলে টেনে লয় তার—
মাথাব সকল স্বপ্ন, হৃদয়ের সকল সঞ্চার
একদিন সেই শূন্য সেই শীত-নদীর উপরে
ফুরাবে কি?—দুলে দুলে অন্ধকারে তবুও আবার
আমার রক্তের ক্ষুধা নদীর ঢেউয়ের মতো স্বরে
গান গাবে, আকাশ উঠিবে কেঁপে আবার সে সংগীতের ঝড়ে!

পৃথিবীব—আকাশের পুরানো কে আত্মাব মতন
জেগে আছি; বাতাসের সাথে সাথে আমি চলি ভেসে,
পাহাড়ে হাওযাব মতো ফিরিতেছে একা একা মন,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো দুপুরের সমুদ্রের শেষে
চলিতেছে; কোন্ এক দূর দেশ—কোন্ নিরুদ্দেশে
জন্ম তার হয়েছিল—সেইখানে উঠেছে সে বেড়ে;
দেহের ছায়ার মতো আমার মনের সাথে মেশে
কোন্ স্বপ্ন!—এ আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে
খুঁজে ফিরি!—গুহার হাওয়ার মতো বন্দী হয়ে মন তব ফেরে!

গাছের শাখার জালে এলোমেলো আঁধাবের মতো
হৃদয় খুঁজিছে পথ, ভেসে ভেসে—সে যে কারে চায়!
হিমের হাওয়ার হাত তার হাড় করিছে আহত,
সেও কি শাখার মতো—পাতাব মতন ঝরে যায়!
বনের বুকের গান তার মতো শব্দ করে গায়!
হৃদয়ের সুর ত [illegible] ফেলেছে হারায়ে!
অন্তরের আকাঙ্ক্ষারে—স্বপনেরে বিদায় জানায়
জীবন-মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে একাকী দাঁড়ায়ে;
ঢেউয়ের ফেনার মতো ক্লান্ত হয়ে মিশিবে কি সে-ঢেউয়ের গায়ে!

হয়তো সে মিশে গেছে—তারে খুঁজে পাবে নাকো কেউ!

কেন যে সে এসেছিল পৃথিবীর কেহ কি তা জানে!
শীতের নদীর বুকে অস্থির হয়েছে যেই ঢেউ
শুনেছে সে উষ্ণ গান সমুদ্রের জলের আহ্বানে!
বিদ্যুতের মতো অল্প আয়ু তবু ছিল তার প্রাণে,
যে ঝড় ফুরায়ে যায় তাহার মতন বেগ লয়ে
যে প্রেম হয়েছে ক্ষুব্ধ সেই ব্যর্থ প্রেমিকের গানে
মিলায়েছে গান তার, তারপর চলে গেছে বয়ে।
সন্ধ্যার মেঘের রঙ কখন গিয়েছে তার অন্ধকার হয়ে!

তবুও নক্ষত্র এক জেগে আছে, সে যে তারে ডাকে!
পৃথিবী চায় নি যারে, মানুষ করেছে যারে ভয়
অনেক গভীর রাতে তারায় তারায় মুখ ঢাকে
তবুও সে!—কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়
তাহার মানুষ-চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয়!
মানুষীর মতো? কিম্বা আকাশের তারাটির মতো—
সেই দূর-প্রণয়িনী আমাদের পৃথিবীর নয়!
তার দৃষ্টি-তাড়নায় করেছে যে আমারে ব্যাহত—
ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মতো বিষম সে ক্ষত!

আলো আর অন্ধকারে তার ব্যথা-বিহ্বলতা লেগে,
তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল! —
মেঘের চিলের মতো—দুরন্ত চিতার মতো বেগে
ছুটে যাই—পিছে ছুটে আসিতেছে বৈকাল-সকাল
পৃথিবীর—যেন কোন্ মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল
কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে! কেঁপে কেঁপে পড়িতেছে ঝ'রে!
আরো কাছে আসিয়াছি তবু আজ—আরো কাছে কাল
আসিব তবুও আমি,—দিন-রাত্রি রয় পিছে পড়ে—
তারপর একদিন কুয়াশার মতো সব বাধা যাবে সরে!

সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বার-বার!
কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা, বুঝেছে তা মন—
চারি দিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার!
একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে!— অধীর ঢেউয়ের মতো ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে অই দূর নক্ষত্রের পার!
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে!

পরস্পর

মনে পড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম, শোনো তবে—
শুনিতে লাগিল সবে,

শুনিল কুমার;
কহিলাম, দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমোনো সে এক মেয়ে—নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে;
সেইখানে আর নাই কেহ—
এক ঘরে পালঙ্কের 'পরে শুধু একখানা দেহ
পড়ে আছে—পৃথিবীর পথে পথে রূপ খুঁজে খুঁজে
তারপর,—তারে আমি দেখেছি গো—সেও চোখ বুজে
পড়ে ছিল—মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাত দুটি
বুকের উপরে তার রয়েছিল উঠি!
আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দু 'পায়ে,
পাথরের মতো শাদা গায়ে
এর যেন কোনোদিন ছিল না হৃদয়—
কিংবা ছিল—আমার জন্য তা নয়!
আমি গিয়ে তাই তারে পারি নি জাগাতে,
পাষাণের মতো হাত পাষাণের হাতে
রয়েছে আড়ষ্ট হয়ে লেগে;
তবুও, হয়তো তবু উঠিবে সে জেগে
তুমি যদি হাত দুটি ধরো গিয়ে তার!—
ফুরালাম রূপকথা, শুনিল কুমার।
তারপর, কহিল কুমার,
আমিও দেখেছি তারে—বসন্তসেনার
মতো সেইজন নয়, কিংবা হবে তাই—
ঘুমন্ত দেশের সেও বসন্তসেনাই!
মনে পড়ে, শোনো, মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে—
(পদ্মা—ভাগীরথী—মেঘ্না—কোন্ নদী যে সে—
সে সব জানি কি আমি! —হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই,
আমি তবু তার পারে আজও তো দাঁড়াই!)
সেদিন তারার আলো—আর নিবু-নিবু জ্যোৎস্নায়
পথ দেখে, যেইখানে নদী ভেসে যায়
কান দিয়ে তার শব্দ শুনে,
দাঁড়ায়েছিলাম গিয়ে মাঘরাতে, কিংবা ফাল্গুনে।
দেশ ছেড়ে শীত যায় চ'লে
সে সময়, প্রথম দখিনে এসে পড়িতেছে বলে
রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায়,
আমারো চোখের ঘুম খসেছিল হায়—
'বসন্তের দেশে
জীবনের—যৌবনের! আমি জেগে, ঘুমন্ত শুয়ে সে!
জমানো ফেনার মতো দেখা গেল তারে
নদীর কিনারে!
হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন
শুয়ে আছে—শুয়ে আছে—শাদা হাতে ধব্‌ধবে স্তন

রেখেছে সে ঢেকে!
বাকিটুকু—থাক্—আহা, একজনে দেখে শুধু—দেখে না অনেকে
এই ছবি!
দিনের আলোয় তার মুছে যায় সবই!—
আজও তবু খুঁজি
কোথায় ঘুমন্ত তুমি চোখ আছ বুজি!
কুমারের শেষ হলে পরে—
আর-এক দেশের এক রূপকথা বলিল আর এক জন,
কহিল সে, উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনিচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন!
ফেনার মতন তারা ঠান্ডা-শাদা—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে!
সেই জলমেয়েদের স্তন
ঠান্ডা, শাদা, বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!
কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
পায়ে-চলা পথ ছেড়ে ভাসে তারা সাগরের গায়ে—
কাঁকরের রক্ত কই তাহাদের পাযে!
রূপার মতন চুল তাহাদের ঝিক্‌মিক্ করে
উত্তর সাগরে!
বরফের কুঁচির মতন
সেই জলমেয়েদের স্তন!
মুখ বুক ভিজে,
ফেনার শেমিজে
শরীর পিছল!
কাচেব গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
উত্তর সাগরে!

সবাই থামিলে পরে মনে হল—এক দিন আমি যাব চলে
কল্পনার গল্প সব বলে;
তারপর, শীত-হেমন্তের শেষে বসন্তের দিন

আবার তো এসে যাবে;
এক কবি—তন্ময়, শৌখিন,
আবার তো জন্ম নেবে তোমাদের দেশে!
আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা—পরীর মতন এক ঘুমোনো মেয়ে সে
হীরের ছুরির মতো গায়ে
আরো ধার লবে সে শানায়ে!
সেই দিনও তার কাছে হয়তো রবে না আর কেউ—
মেঘের মতন চুল—তার সে চুলের ঢেউ
এমনি পড়িয়া রবে পালঙ্কের 'পর—
ধূপের ধোঁয়ার মতো ধলা সেই পুরীর ভিতর।
চার পাশে তার
রাজ—যুবরাজ—জেতা—যোদ্ধাদের হাড়
গড়েছে পাহাড়!
এ রূপকথার এই রূপসীর ছবি
তুমিও দেখিবে এসে,
তুমিও দেখিবে এসে কবি!
পাথরের হাতে তার রাখিবে তো হাত—
শরীরে ননীর ছিরি—ছুঁয়ে দেখো—চোখা ছুরি—ধারালো হাতির দাঁত!
হাড়েরই কাঠামো শুধু—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা
ছিল কই!—তবু, সে কি জেগে যাবে? কবে সে কি কথা
তোমার রক্তের তাপ পেয়ে?—
আমার কথার এই মেয়ে, এই মেয়ে!
কে যেন উঠিল ব'লে, তোমরা তো বলো রূপকথা—
তেপান্তরে গল্প সব, ওর কিছু আছে নিশ্চয়তা!
হয়তো অমনি হবে, দেখিনিকো তাহা;
কিন্তু, শোনো—স্বপ্ন নয়—আমাদেরই দেশে কবে, আহা!—
যেখানে মায়াবী নাই—জাদু নাই কোনো—
এ দেশের—গাল নয়, গল্প নয়, দু-একটা শাদা কথা শোনো!
সেও এক রোদে লাল দিন,
রোদে লাল—সবুজীর গানে গানে সহজ স্বাধীন
একদিন, সেই একদিন!
ঘুম ভেঙে গিয়েছিল চোখে,
ছেঁড়া করবীর মত মেঘের আলোকে
চেয়ে দেখি রূপসী কে পড়ে আছে খাটের উপরে!
মায়াবীর ঘরে
ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে চেয়ে
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর—মানুষের দেশের মতন;
রূপ ঝরে যায়—তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন—
যে যৌবন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে!—
শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে

ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে, অসুখে!—
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা—ভিতরে অসুখ!
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে!—
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর—ফোঁপ্‌রার মতো ক'রে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে!...
সবাই উঠিল বলে—ঠিক—ঠিক—ঠিক!
আবার বলিল সেই সৌন্দর্যতান্ত্রিক,
আমায বলেছে সে কি শোনো—
আর এক জন এই—
পরী নয়, মানুষও সে হয় নি এখনও;
বলেছে সে, কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে?—আসিবে তো?—তুমি আসিবে তো!
দেখা যদি পেত!
নিকটে বসায়ে
কালো খোঁপা ফেলিত খসাযে—
কি কথা বলিতে গিয়ে থেমে যেত শেষে
ফিক্ করে হেসে!
তবু, আরো কথা
বলিতে আসিত—তবু, সব প্রগল্‌ভতা
থেমে যেত!
খোঁপা বেঁধে, ফের খোঁপা ফেলিত খসায়ে—
সরে যেত, দেয়ালেব গায়ে
রহিত দাঁড়াযে!
রাত ঢের—বাড়িবে আরো কি
এই রাত!—বেড়ে যায, তবু চোখাচোখি
হয় নাই দেখা
আমাদের দুজনার!—দুইজন, একা!—
বারবার চোখ তবু কেন ওর ভরে আসে জলে!
কেন বা এমন করে বলে,
কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে?—আসিবে তো?—তুমি আসিবে তো।—
আমি না কাঁদিতে কাঁদে... দেখা যদি পেত!....
দেখা দিয়ে বলিলাম, 'কে গো তুমি?'—বলিল সে, 'তোমার বকুল,
মনে আছে?'—'এগুলি কি? বাসি চাঁপাফুল?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে'—'ভালোবাসো?'—হাসি পেল;—হাসি!
'ফুলগুলো বাসি নয়, আমি শুধু বাসি!
আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে
নিবানো মাটির বাতি জ্বেলে

চলে এল কাছে—
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে—
আজও এত চুল!
চেয়ে দেখি—দুটো হাত, ক-খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি;
চোখ দুটো চূণ-চূণ—মুখ খড়ি-খড়ি!
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি—
সব বাি, সব বাসি—একেবারে মেকি!

বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময
শূন্য মনে হয,
শূন্য মনে হয!

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয আঁধারে
সহজ লোকের মতো! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর; কোনো নিশ্চযতা
কে জানিতে পারে আর? শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর? প্রাণেব আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবাব!
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই; ফসলের আকাঙ্ক্ষায থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে?
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন্ একা বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে!

পথে চ'লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে

আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে;
আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে।

আমি থামি—
সেও থেমে যায়;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
        আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
        আমার পথেই শুধু বাধা?

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
        সন্তানের মতো হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
        যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
        যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
        জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে
        তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
        আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
        আমার মনের মতো না কি?—
        —তবু কেন এমন একাকী?
        তবু আমি এমন একাকী!

হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌টিতে টানি নি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাই নি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁষটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
—এসব স্বাদ;
—এইসব পেয়েছি আমি; বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
এক দিন;
এই সব সাধ
জানিয়াছি এক দিন—অবাধ—অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিল এক দিন,—এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা করে গেছি; যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা—।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম-নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিযাছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।

অবসরের গান

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;—
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়!
চারিদিকে এখন সকাল,—
রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল!
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ,—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান!

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—ক্ষুদ—কুঁড়ো—কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হ'তেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি ধান ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে!
আজও তবু ফুরায় নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস!

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলার রৌদ্রেঃ কুঁড়েমির আজিকে সময়!

গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিল ছড়া!
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;
ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা,
ডেকে লব আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব;
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে,—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধ'রে ধ'রে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;

ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ;
রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়,—ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়;
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়—তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা—অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে—রোদ গেছে প'ড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধ'রে;
তখন গিয়েছে থেমে ওই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়;
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালির বিছানার 'পর;
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ মাঠের মাটির ভিতর!
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চ'লে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল!

২

পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের 'পরে;
সবুজ ধানের নীচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চ'লে গেছে—আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা;
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!

ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!
ফসল—ধানের ফলে যাহাদের মন
ভ'রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা ক'রে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন—
আমাদের পাড়াগাঁর সেইসব ভাঁড়—
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে!
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায় নি তাদের সময়;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয়!
প্রণয়ীর মতো তারা ছেঁড়ে নি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে!—
চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘামে
কাটায় নি—কাটায় নি কাল!
অনেক মাটির নীচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে!
যোদ্ধা—জয়ী—বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—

পাশাপাশি—
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি!

অনেক রাতের আগে এসে তারা চলে গেছে—তাদের দিনের আলো হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়—
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে লয়ে জন্মিয়াছে আজ এই ক্ষেতের ফসল;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ওই ইঁদুরেরা জানে তাহা-জানে তাহা
নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল!
সে সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধ'রে যায় ডেকে ডেকে।
মাটির নীচের থেকে তারা
মৃতেব মাথার স্বপ্নে ন'ড়ে উঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা!

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে,—
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে।
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর-বন্দর-বস্তি-কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে;
শরীরের অবসাদ—হৃদযের জ্বর ভুলে যেতে।
শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধ'রে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই ম'রে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানেব রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!

জমি উপড়ায়ে ফেলে চলে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার প'ড়ে আছে—পুরানো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে:
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা ওই আমাদের তরে!
হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে,—
দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে।

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চ'লে যায় চাঁদ;
অবসর আছে তার—অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,—
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে!

৩

ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই—কোনো কৃষকের মতো দরকার নাই
দূরে মাঠে গিয়ে আর!
রোধ—অবরোধ—ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,—

জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে,—
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের রং
দামামা থামায়ে ফেল—পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ!

এখানে নাহিকো কাজ—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়!
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

এখানে চকিত হ'তে হবে নাকো—এস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,—
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষন্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে!

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে

ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষহরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে!
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে;
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নক্‌টার্ন্‌

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে ওই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায়!—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে

বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে!

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস-খাওয়া হল তবু শেষ?
...কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো?

আমার হৃদয়ে—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ওই মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে প'ড়ে সব
ওই মৃত মৃগদের মতো।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না নাকি?

দোনলার শব্দ শুনি;
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়

হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরও হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে-ভেবে।
এই ব্যথা—এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে,—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো।
আমরা সবাই।

জীবন

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
ফসল উঠিছে ফলে—রসে রসে ভরিছে শিকড়;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ!
সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে—তার সাথে সেও আছে জেগে!

২

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিষ্কার আকাশের 'পর
কখন এসেছে রাত্রি!—পশ্চিমের সাগরের জলে
তার শব্দ; উত্তর সমুদ্র তার, দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে—তাহার পায়ের কোলাহলে
ভ'রে ওঠে; এসেছে সে আকাশের নক্ষত্রের তলে
প্রথম যে এসেছিল, তারই মতো—তাহার মতন
চোখ তার, তাহার মতন চুল,—বুকের আঁচলে
প্রথম মেয়ের মতো—পৃথিবীর নদী মাঠ বন
আবার পেয়েছে তারে—সমুদ্রের পারে রাত্রি এসেছে এখন!

৩

সে এসেছে—আকাশের শেষ আলো পশ্চিমের মেঘে
সন্ধ্যার গহ্বর খুঁজে পালায়েছে!—রক্তে রক্তে লাল
হয়ে গেছে বুক তার—আহত চিতার মতো বেগে
পালায়ে গিয়েছে রোদ—সরে গেছে আলোর বৈকাল!
চলে গেছে জীবনের 'আজ' এক—আর এক 'কাল'
আসিত না যদি আর আলো লয়ে—রৌদ্র সঙ্গে লয়ে!
এই রাত্রি—নক্ষত্র সমুদ্র লয়ে এমন বিশাল

আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষ'য়
রয়ে যেত—যে গান শুনি নি আর তাহার স্মৃতির মতো হয়ে!

৪

যে পাতা সবুজ ছিল, তবুও হলুদ হতে হয়—
শীতের হাড়ের হাত আজও তারে যায় নাই ছুঁয়ে—
যে মুখ যুবার ছিল, তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়—পড়ে যায় নুয়ে—
পৃথিবীর এই ব্যথা বিহ্বলতা অন্ধকারে ধুয়ে
পূর্ব সাগরের ঢেউয়ে—জলে জলে, পশ্চিম সাগরে
তোমার বিনুনি খুলে—হেঁট হয়ে—পা তোমাব থুয়ে—
তোমার নক্ষত্র জ্বেলে—তোমার জলের স্বরে স্বরে
রয়ে যেতে যদি তুমি আকাশেব নীচে—নীল পৃথিবীব 'পরে!

৫

ভোরের সূর্যের আলো পৃথিবীর গুহায় যেমন
মেঘেব মতন চুল—অন্ধকার চোখের আস্বাদ
একবাব পেতে চায়—যে জন রয না—যেই জন
চলে যায়,তাবে পেতে আমাদেব বুকে যেই সাধ—
যে ভালোবেসেছে শুধু, হয়ে গেছে হৃদয় অবাধ
বাতাসের মতো যাব—তাহাব বুকের গান শুনে
মনে যেই ইচ্ছা জাগে—কোনোদিন দেখে নাই চাঁদ
যেই রাত্রি,—নেমে আসে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে গুনে
যেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখ, চুলে তার চুল নেব বুনে!

৬

তুমি রয়ে যাবে, তবু, অপেক্ষায বয না সময
কোনোদিন; কোনোদিন ববে না সে পথ থেকে স'রে!
সকলেই পথ চলে—সকলেই ক্লান্ত তবু হয—
তবুও দুজন কই ব'সে থাকে হাতে হাত ধরে!
তবুও দুজন কই কে কাহারে রাখে কোলে কবে!
মুখে রক্ত ওঠে—তবু কমে কই বুকের সাহস!
যেতে হবে—কে এসে চুলের ঝুঁটি টেনে লয জোরে!
শবীরের আগে কবে ঝরে যায হৃদযেব রস!—
তবু, চলে—মৃত্যুর ঠোঁটের মতো দেহ যার হযনি অবশ!

৭

হলদে পাতার মতো আমাদের পথে ওড়াউড়ি!—
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা!—
আমরাও ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুবি!
—মনেব নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা'
সন্ধ্যার অনেক আগে!—দুপুরেই হয়েছি একেলা!

আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন!
বিকালবেলার আগে ভেঙে গেছে বিকালের মেলা—
শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন!
হেমন্ত আসেনি মাঠে—হলুদ পাতার ভরে হৃদয়ের বন!

৮

শীত-রাত ঢের দূরে—অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে!
শাদা হাত দুটো শাদা হাড় হয়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে,—চোখ বুজে তবু কি ভুলিতে
পারি এই দিনগুলো!—আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মতো শীত—আগুনের মতো তবু জ্বর!
যেই গতি—সেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে—
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর—
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে!
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে!

৯

যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে—
বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন!
যে ফসল নষ্ট হবে তারই ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন!
নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি—একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল!—
এরই জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল!
দুরন্ত চিতার মতো গতি তার—বিদ্যুতের মতো সে চঞ্চল!

১০

অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে অন্তরের তলে—
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মতো বয়ে আসে,
এই শক্তি আগুনের মতো তার জিভ তুলে জ্বলে!
ভস্মের মতন তাই হয়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে!
জীবন ধোঁয়ার মতো, জীবন ছায়ার মতো ভাসে;
যে অঙ্গার জ্বলে জ্বলে নিভে যাবে, হয়ে যাবে ছাই—
সাপের মতন বিষ লয়ে সেই আগুনের ফাঁসে
জীবন পুড়িয়া যায়—আমরাও ঝরে পুড়ে যাই!
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মতো শক্তি—তবু শক্তি চাই!

১১

জানো তুমি?—শিখেছ কি আমাদের ব্যর্থতার কথা?—
হে ক্ষমতা, বুকে তুমি কাজ করো তোমার মতন!—
তুমি আছ—রবে তুমি—এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছ কি?—ওগো মন, মানুষের মন—

হে ক্ষমতা, বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর—ভীষণ!
মেঘের ঘোড়ার 'পরে আকাশের শিকারীর মতো—
সিন্ধুর সাপের মতো লক্ষ ঢেউয়ে তোলো আলোড়ন!
চমৎকৃত করো—শরীরেরে তুমি করেছ আহত!—
যতই জেগেছ—দেহ আমাদের ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে যে তত!

১২

তবু তুমি শীতরাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে
হৃদয়ের অন্ধকারে পড়ে থাকো—কুণ্ডলী পাকায়ে!—
অপেক্ষায় বসে থাকি—স্ফুলিঙ্গের মতো যাবে ছুঁয়ে
কে তোমারে!—ব্যাধের পায়ের পাড়া দিয়ে যাবে গায়ে
কে তোমারে!—কোন্ অশ্রু, কোন্ পীড়া হতাশার ঘায়ে
কখন জাগিয়া ওঠো—স্থির হয়ে বসে আছি তাই।
শীতরাত বাড়ে আরো—নক্ষত্রেরা যেতেছে হারায়ে—
ছাইয়ে যে আগুন ছিল সেই সবও হয়ে যায় ছাই!
তবুও আরেকবার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই!

১৩

অশান্ত হাওয়ার বুকে তবু আমি বনের মতন
জীবনেরে ছেড়ে দিছি!—পাতা আর পল্লবের মতো
জীবন উঠেছে বেজে শব্দে—স্বরে; যতবার মন
ছিঁড়ে গেছে, হয়েছে দেহের মতো হৃদয় আহত
যতবার—উড়ে গেছে শাখা, পাতা পড়ে গেছে যত—
পৃথিবীর বন হয়ে—ঝড়ের গতির মতো হয়ে,
বিদ্যুতের মতো হয়ে আকাশের মেঘে ইতস্তত;
একবার মৃত্যু লয়ে—একবার জীবনের লয়ে
ঘূর্ণির মতন বয়ে যে বাতাস ছেড়ে—তার মতো গেছি বয়ে!

১৪

কোথায় রয়েছে আলো আঁধারের বীণার আস্বাদ!
ছিন্ন রুগ্ন ঘুমন্তের চোখে এক সুস্থ স্বপ্ন হয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা—আকাশের মতন অবাধ
পরিচ্ছন্ন পৃথিবীতে, সিন্ধুর হাওয়ার মতো বয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা—জেগে উঠে সেই ইচ্ছা লয়ে
আড়ষ্ট তারার মতো চমকায়ে গেছি শীতে-মেঘে!
ঘুমায়ে যা দেখি নাই, জেগে উঠে তার ব্যথা সয়ে
নির্জন হতেছে ঢেউ হৃদয়ের রক্তের আবেগে!
—যে আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মতো প্রাণ আছে জেগে!

১৫

নক্ষত্র জেনেছে কবে অই অর্থ শৃঙ্খলার ভাষা!
বীণার তারের মতো উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে

তাদের গতির ছন্দ—অবিরত শক্তির পিপাসা
তাহাদের, তবু সব তৃপ্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে আসে!
আমাদের কাল চলে ইশারায়—আভাসে আভাসে!
আরম্ভ হয় না কিছু—সমস্তের তবু শেষ হয়—
কীট যে ব্যর্থতা জানে পৃথিবীর ধুলো মাটি ঘাসে
তারও বড়ো ব্যর্থতার সাথে রোজ হয় পরিচয়!
যা হয়েছে শেষ হয়—শেষ হয় কোনোদিন যা হবার নয়!

১৬

সমস্ত পৃথিবী ভরে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে! —বাসি পাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে!—কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস—
যক্ষ্মার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন!—
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!
মরণ—সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে!
বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায়—করে প্রাণপণ—
এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে—
রাত্রিরে দেখিয়া যায় একবার সমুদ্রের পারের আকাশে!—

১৭

মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো!
সব সাধ জেনেছে যে সেও চায় এই নিশ্চয়তা!
সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে—সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জেনেছে—আর এক ক্ষুধা তবু—এক বিহ্বলতা
তাহারও জানিতে হয়! এইমতো অন্ধকারে এসে!—
জেগে জেগে যা জেনেছ—জেনেছ তা—জেগে জেনেছ তা—
নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে!
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে!

১৮

কিম্বা এই জীবনেরে একবার ভালোবেসে দেখি!—
পৃথিবীর পথে নয়—এইখানে—এইখানে বসে—
মানুষ চেয়েছে কিবা? পেয়েছে কি?—কিছু পেয়েছে কি!
হয়তো পায়নি কিছু—যা পেয়েছে, তাও গেছে খসে
অবহেলা করে করে, কিম্বা তার নক্ষত্রের দোষে—
ধ্যানের সময় আসে তারপর—স্বপ্নের সময়!
শরীর ছিঁড়িয়া গেছে—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধ্বসে!—
অন্ধকার কথা কয়—আকাশের তারা কথা কয়
তারপর, সব গতি থেমে যায়—মুছে যায় শক্তির বিস্ময়!

১৯

কেউ আর ডাকিবে না—এইখানে এই নিশ্চয়তা!
তোমার দুচোখ কেউ দেখে থাকে যদি পৃথিবীতে,
কেউ যদি শুনে থাকে কবে তুমি কি কয়েছ কথা,
তোমার সহিত কেউ থেকে থাকে যদি সেই শীতে—
সেই পৃথিবীর শীতে—আসিবে কি তোমারে চিনিতে
এইখানে সে আবার!—উঠানে পাতার ভিড়ে বসে,
কিম্বা ঘরে—হয়তো দেয়ালে আলো জ্বেলে দিতে দিতে—
যখন হঠাৎ নিভে যাবে তার হাতের আলো সে—
অসুস্থ পাতার মতো দুলে তার মন থেকে পড়ে যাবে খসে!

২০

কিম্বা কেউ কোনোদিন দেখে নাই—চেনেনি আমারে!
সকালবেলার আলো ছিল যার সন্ধ্যার মতন—
চকিত ভূতের মতো নদী আর পাহাড়ের ধারে
ইশারায় ভূত ডেকে জীবনের সব আয়োজন
আরম্ভ সে করেছিল!—কোনোদিন কোনো লোকজন
তার কাছে আসে নাই—আকাঙ্ক্ষার কবরের 'পরে
পুবের হাওয়ার মতো এসেছে সে হঠাৎ কখন!—
বীজ বুনে গেছে চাষা—সে বাতাস বীজ নষ্ট করে!
ঘুমের চোখের 'পরে নেমে আসে অশ্রু আর অনিদ্রার স্বরে!

২১

যেমন বৃষ্টির পরে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ এসে
আবার আকাশ ঢাকে—মাঠে মাঠে অধীর বাতাস
ফোঁপায় শিশুর মতো—একবার চাঁদ ওঠে ভেসে—
দূরে—কাছে দেখা যায় পৃথিবীর ধান ক্ষেত ঘাস,
আবার সন্ধ্যার রঙে ভরে ওঠে সকল আকাশ—
মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে!—
যে মরে যেতেছে তার হৃদয়ের সব শেষ শ্বাস
সকল আকাশ আর পৃথিবীর থেকে পড়ে ঝ'রে!—
জীবনে চলেছি আমি সে পৃথিবী আকাশের পথ ধ'রে ধ'রে।

২২

রাত্রির ফুলের মতো—ঘুমন্তের হৃদয়ের মতো
অন্তর ঘুমায়ে গেছে—ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন!—
সারাদিন বুকে ক্ষুধা লয়ে চিতা হয়েছে আহত—
তারপর, অন্ধকার গুহা এই—ছায়াভরা বন
পেয়েছে সে!—অশান্ত হাওয়ার মতো মানুষের মন
বুজে গেছে—রাত্রি আর নক্ষত্রের মাঝখানে এসে!—
মৃত্যুর শান্তির স্বাদ এইখানে দিতেছে জীবন—
জীবনের এইখানে একবার দেখি ভালোবেসে!
শুনে দেখি—কোন্ কথা কয় রাত্রি, কোন্ কথা নক্ষত্র বলে সে!

২৩

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভরে—
শস্য ফলে গেছে মাঠে—কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা—
আবার জানায়ে যায়!—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা-হতাশা—
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন!
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন!

২৪

হলুদ পাতার মতো—আলেযার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া মেঘ আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো—রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীব সমুদ্রে পাহাড়ে—
ঢেউ ভেঙে ঝরে যায—মরে যায—কে ফেরাতে পারে!
তবুও ইশারা করে ফাল্গুন-রাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তাব সেই কবরের গহবরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে—হয নাই—গিয়েছে যা হয়ে,
মৃত্যুরেও ডাকো তুমি সেই ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে!

২৫

মৃত্যুরে বন্ধুব মতো ডেকেছি তো—প্রিয়ার মতন!
চকিত শিশুর মতো তাব কোলে লুকায়েছি মুখ;
রোগীব জ্বরেব মতো পৃথিবীর পথের জীবন;
অসুস্থ চোখেব 'পরে অনিদ্রার মতন অসুখ;
তাই আমি প্রিযতম—প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক—
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমার পাশে গিয়া!—
যে-ধূপ নিভিয়া যায তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক—
যে ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমোনো গন্ধেব মতো স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া!

২৬

মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে।
যে বালক কোনোদিন জানে নাই গহ্বরের ভয,
পুবের হাওয়ার মতো ভূত হয়ে মন তার ঘোরে!—
নদীর ধারে সে ভূত একদিন দেখেছে নিশ্চয়!
পায়ের তলের পাতা—পাপড়ির মতো মনে হয়
জীবনেরে—খসে ক্ষয়ে গিয়েছে যে, তাহার মতন

জীবন পড়িয়া থাকে—তার বিছানায খেদ—ক্ষয—
পাহাড় নদীর পারে হাওয়া হয়ে ভূত হযে মন
চকিত পাতার শব্দে বাতাসের বুকে তারে করে অন্বেষণ।

২৭

জীবন, আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছ তোমার—
একটি পাতার মতো অন্ধকারে পাতা-ঝরা গাছে—
একটি বোঁটার মতো যে ফুল ঝরিযা গেছে তার—
একাকী তাবার মতো, সব তাবা আকাশের কাছে
যখন মুছিযা গেছে—পৃথিবীতে আলো আসিযাছে—
যে ভালোবেসেছে, তাব হৃদয়ের ব্যথাব মতন—
কাল যাহা থাকিবে না—আজই যাহা স্মৃতি হযে আছে—
দিন-রাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন!
সন্ধ্যাব মেঘের মতো মুহূর্তেব বং লযে মুহূর্তে নূতন!

২৮

আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতেব মতো কেঁপে ওঠে!
বীণাব তারেব মতো কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে যায প্রাণ!
অসংখ্য পাতাব মতো লুটে তাবা পথে পথে ছোটে—
যখন ঝড়েব মতো জীবনের এসেছে আহ্বান!
অধীব ঢেউযেব মতো—অশান্ত হাওযার মতো গান
কোন্ দিকে ভেসে যায!—উড়ে যায—কয কোন্ কথা!—
ভোবেব আলোয আজ শিশিরেব বুকে যেই ঘ্রাণ,
বহিবে না কাল তার কোনো স্বাদ—কোনো নিশ্চযতা!
পাণ্ডুর পাতার রং গালে—তবু বক্তে তাব রবে অসুস্থতা!

২৯

যেখানে আসেনি চাষা কোনোদিন কাস্তে হাতে লযে,
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে,
নিরাশাব মতো কেঁপে চোখ বুজে পলাতক হযে
প্রেমেবে মৃত্যুব চোখে সেইখানে দেখিযাছি শেষে!
তোমাব চোখেব 'পবে তাহাব মুখেরে ভালোবেসে
এখানে এসেছি আমি—আর একবাব কেঁপে উঠে
অনেক ইচ্ছাব বেগে—শান্তিব মতন অবশেষে
সব ঢেউ ভেঙে নিযে ফেনাব ফুলের মতো ফুটে,
ঘুমাব বালির 'পবে—জীবনের দিকে আর যাব নাকো ছুটে!

৩০

নির্জন রাত্রির মতো শিশিরের গুহাব ভিতবে—
পৃথিবীর ভিতবেব গহ্বরের মতন নিঃসাড়
ববো আমি—অনেক গতির পর—আকাঙ্ক্ষাব পরে'
যেমন থামিতে হয, বুজে যেতে হয একবার—

পৃথিবীর পারে থেকে কবরের মৃত্যুর ওপার
যেমন নিস্তব্ধ শান্ত নিমীলিত শূন্য মনে হয়—
তেমন আস্বাদ এক কিম্বা সেই স্বাদহীনতার
সাথে একবার হবে মুখোমুখি সব পরিচয়!
শীতের নদীর বুকে মৃত জোনাকির মুখ তবু সব নয়!

৩১

আবার পিপাসা সব ভূত হয়ে পৃথিবীব মাঠে—
অথবা গ্রহের 'পরে—ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে ভাসে!—
যেমন শীতের রাতে দেখা যায় জ্যোৎস্না ধোঁয়াটে,
ফ্যাকাশে পাতার 'পরে দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাসে—
যেমন হঠাৎ দুটো কালো পাখা চাঁদের আকাশে
অনেক গভীর রাতে চমকের মতো মনে হয়;
কার পাখা?—কোন্ পাখি? পাখি সে কি! অথচ সে আসে!—
তখন অনেক রাতে কবরের মুখ কথা কয়!—
ঘুমন্ত তখন ঘুমে, জাগিতে হতেছে যার সে জাগিযা রয়!

৩২

বনের পাতার মতো কুযাশার হলুদ না হতে,
হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে পড়ে গেছি ঝরে!—
তোমার বুকের 'পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে;
তোমার দুইটি চোখ প্রিয়ার চোখের মতো করে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু, পথ থেকে ঢের দূরে সরে
প্রেমের মতন হযে!—তুমি হবে শান্তির মতন!—
তাবপর সরে যাব—তারপর তুমি যাবে মবে—
অধীর বাতাস লয়ে কাঁপুক না-পৃথিবীব বন!—
মৃত্যুব মতন তবু বুজে যাক—ঘুমাক মৃত্যুর মতো মন!

৩৩

নির্জন পাতার মতো, আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া মেঘে আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো—রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে—
ঢেউ ভেঙে ঝরে যায—মরে যায—কে ফেরাতে পারে!
তবুও ইশারা ক'রে ফাল্গুনরাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে—হয় নাই—গিয়েছে যা হয়ে—
মৃত্যুরেও ডাকো তুমি সেই স্মৃতি-আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে!

৩৪

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভ'রে—
শস্য ফলে গেছে মাঠে—কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা;

নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা—
আবার জানায়ে যায়—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা-হতাশা—
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন!—
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন!

১৩৩৩

তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার—তারপর—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই; ছিঁড়ে গেছি—ফেঁড়ে গেছি—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে!
কত দেহ এল—গেল—হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!
তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার—তারপর—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে,—ফলে গেছে কতবার,
ঝরে গেছে তৃণ!

*

আমারে চাও না তুমি আজ আর, জানি;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ!—তোমার রক্তের ভালোবাসা
দিয়েছ কাহারে!
কে বা সেই!—আমি এই সমুদ্রের পারে
বসে আছি একা আজ—ঐ দূর নক্ষত্রের কাছে
আজ আর প্রশ্ন নাই—মাঝরাতে ঘুম লেগে আছে
চক্ষে তার—এলোমেলো রয়েছে আকাশ!
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা!—তারই তলে পৃথিবীর ঘাস
ফলে ওঠে—পৃথিবীর তৃণ
ঝরে পড়ে—পৃথিবীর রাত্রি আর দিন
কেটে যায়!

উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা—তারই তলে হায়!

*

জানি আমি—আমি যাব চলে
তোমার অনেক আগে;
তারপর, সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন—
আকাশে আকাশে যাবে জ্বলে
নক্ষত্র অনেক রাত আরো,
নক্ষত্র অনেক রাত আরো!—
(যদিও তোমারও
রাত্রি আর দিন শেষ হবে
একদিন কবে!)
আমি চলে যাব, তবু, সমুদ্রের ভাষা
রয়ে যাবে—তোমার পিপাসা
ফুরাবে না—পৃথিবীর ধুলো মাটি তৃণ
রহিবে তোমার তরে—রাত্রি আর দিন
রয়ে যাবে; রয়ে যাবে তোমার শরীর,
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়।

*

আমারে খুঁজিয়াছিলে তুমি একদিন—
কখন হারায়ে যাই—এই ভয়ে নয়ন মলিন
করেছিলে তুমি!—
জানি আমি; তবু, এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ—দেহ ঝরে—ঝরে যায় মন
তার আগে!
এই বর্তমান—তার দুপায়ের দাগে
মুছে যায় পৃথিবীর 'পর
একদিন হয়েছে যা—তার রেখা, ধূলার অক্ষর!
আমারে হারায়ে আজ চোখ ম্লান করিবে না তুমি—
জানি আমি; পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ—
দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝ'রে যায় মন!

*

আমার পায়ের তলে ঝরে যায় তৃণ—
তার আগে এই রাত্রি-দিন
পড়িতেছে ঝরে!
এই রাত্রি, এই দিন রেখেছিলে ভরে
তোমার পায়ের শব্দে, শুনেছি তা আমি!
কখন গিয়েছে তবু থামি
সেই শব্দ!—গেছ তুমি চলে

সেই দিন—সেই রাত্রি ফুরায়েছে বলে!
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ—
তবু সেই রাত্রি আর দিন
পড়ে গেল ঝ'রে!—
সেই রাত্রি—সেই দিন—তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভরে!

*

জানি আমি, খুঁজিবে না আজিকে আমারে
তুমি আর; নক্ষত্রের পারে
যদি আমি চলে যাই,
পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই
যদি আমি—
আমারে খুঁজিতে তবু আসিবে না আজ;
তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি
আমার এ নক্ষত্রের তলে!—
জানি তবু, নদীর জলের মতো পা তোমার চলে—
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মতো কোনো এক ঢেউয়ের উপরে!
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে—
জানি আমি, তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে!

*

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে!
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু যদি তোমার দু'পায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথ-চলার পিপাসা!—
একবার ভালোবেসে—যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি
সেই ভালোবাসা!
আমার এখানে এসে যেতে যদি থামি!—
কিন্তু তুমি চ'লে গেছ, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে!
নক্ষত্র সরিয়া যায়—তবু কেন আমার এ-পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ-চলার পিপাসা!
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা!

*

চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
আমার এ পথে—কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।
জানি আমি, আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
তারপর, কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি!—তাই আস নাই
আমার এখানে তুমি আর!
একদিন কত কথা বলেছিলে, তবু বলিবার
সেইদিনও ছিল না তো কিছু—তবু সেইদিন

আমার এ পথে তুমি এসেছিলে—বলেছিলে কত কথা—
কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন;
আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই;
তারপর, কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি—তাই আস নাই!

*

তোমার দুচোখ দিয়ে একদিন কতবার চেয়েছ আমারে।
আলো-অন্ধকারে
তোমার পায়ের শব্দ কতবার শুনিয়াছি আমি!
নিকটে নিকটে আমি ছিলাম তোমার তবু সেইদিন—
আজ রাত্রে আসিয়াছি নামি
এই দূর সমুদ্রের জলে!
যে নক্ষত্র দেখ নাই কোনোদিন, দাঁড়ায়েছি আজ তার তলে!
সারাদিন হাঁটিয়াছি আমি পায়ে পায়ে
বালকের মতো এক—তারপর, গিয়েছি হারায়ে
সমুদ্রের জলে,
নক্ষত্রের তলে!
রাত্রে, অন্ধকারে!
—তোমার পায়ের শব্দ শুনিব না তবু আজ—জানি আমি,
আজ তবু আসিবে না খুঁজিতে আমারে!

*

তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার—তারপর, মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে জানি নি তা—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই—ছিঁড়ে গেছি—ফেঁড়ে গেছি—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন-রাত্রি গেছে কেটে!
কত দেহ এল, গেল—হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!

প্রেম

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো—
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত
একা-হরিণের মতো আমাদের হৃদয় যখন!
জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হলে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মতো শিশিরে শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি!—ছুটি লয়ে চলে যায় মন!—

পায়ের পথের মতো ঘুমন্তেরা পড়ে আছে কত—
তাদের চোখের ঘুম ভেঙে যাবে আবার কখন!—
জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হয়ে রয়েছে হৃদয়—
অনেক জাগার পর এইমতো ঘুমাইতে হয়।

অনেক জেনেছে বলে আর কিছু হয় না জানিতে;
অনেক মেনেছে বলে আর কিছু হয না মানিতে;
দিন-রাত্রি-গ্রহ-তাবা-পৃথিবী-আকাশ ধরে-ধরে
অনেক উড়েছে যারা অধীর পাখির মতো করে—
পৃথিবীর বুক থেকে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখির মতো—প্রবল হাওয়ার মতো জোরে
মৃত্যুও উড়িয়া যায!—অসাড় হতেছে পাতা শীতে,
হৃদযে কুযাশা আসে—জীবন যেতেছে তাই ঝরে!—
পাখির মতন উড়ে পায় নি যা পৃথিবীর কোলে—
মৃত্যুব চোখের 'পরে চুমো দেয তাই পাবে বলে!

কারণ, সাম্রাজ্য—রাজ্য—সিংহাসন—জয়—
মৃত্যুর মতন নয—মৃত্যুর শান্তির মতো নয!
কারণ,অনেক অশ্রু—রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমবা রাখিতে আছি জীবনের এই আলো জ্বেলে!
তবুও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মতো জেগে বয!—
তাহার মতন আলো হৃদযেব অন্ধকাবে পেলে
মানুষের মতো নয—নক্ষত্রের মতো হতে হয়!
মানুষের মতো হয়ে মানুষের মতো চোখ মেলে
মানুষেব মতো পায়ে চলিতেছি যত দিন—তাই,
ক্লান্তির পরে ঘুম, মৃত্যুর মতন শান্তি চাই!

কারণ, যোদ্ধার মতো—আর সেনাপতির মতন
জীবন যদিও চলে—কোলাহল ক'রে চলে মন
যদিও সিন্ধুর মতো দল বেঁধে জীবনের সাথে,
সবুজ বনের মতো উত্তরের বাতাসের হাতে
যদিও বীণার মতো বেজে ওঠে হৃদযের বন
একবার—দুইবার—জীবনের অধীর আঘাতে—
তবু, প্রেম—তবু তারে ছিঁড়েফেঁড়ে গিয়েছে কখন!
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু!—অঘ্রানেব রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চলে গেছে ছিঁড়ে!
পাতার মতন করে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে!

তবু পাতা—তবুও পাখির মতো ব্যথা বুকে লয়ে,
বনের শাখার মতো—শাখার পাখির মতো হযে
হিমের হাওয়ার হাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে—অসুস্থ ডানার কোলাহলে,

ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মতো বয়ে,
আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মতো তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন!—জীবনের বিহ্বলতা সয়ে
আমাদের দিন চলে—আমাদের রাত্রি তবু চলে;
তার ছিঁড়ে গেছে—তবু তাহারে বীণার মতো করে
বাজাই, যে প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধরে!

কারণ, সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি; তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুক!
সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ!—
পাখির শিশুর মতো যখন প্রেমেরে ডেকে ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছি মুখ—
ভোরের আলোর মতো চোখের তারায় তারে দেখে!—
প্রেম কি আসেনি তবু?—তবে তার ইশারা আসুক!
প্রেম কি চলিযা যায প্রাণেরে জলের ঢেউযে ছিঁড়ে!
ঢেউযের মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে ফিরে!

যত দিন বেঁচে আছি আলেযার মতো আলো নিয়ে—
তুমি চলে আস প্রেম—তুমি চলে আস কাছে প্রিয়ে!
নক্ষত্রেব বেশি তুমি—নক্ষত্রের আকাশের মতো!
আমরা ফুরায়ে যাই—প্রেম, তুমি হও না আহত!
বিদ্যুতের মতো মোরা মেঘেব গুহাব পথ দিয়ে
চলে আসি—চলে যাই—আকাশের পারে ইতস্তত!—
ভেঙে যাই—নিভে যাই—আমরা চলিতে গিয়ে গিযে!
আকাশের মতো তুমি—আকাশে নক্ষত্র আছে যত—
তাদের সকল আলো একদিন নিভে গেলে পরে
তুমিও কি ডুবে যাবে, ওগো প্রেম, পশ্চিম সাগরে!

জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিনও রবে জেগে, জানি!
জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি—
ঘুমন্ত ফুলের মতো নিবন্ত বাতির মতো ঢেলে
মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায়—তুমি তারে জ্বেলে
চোখের তারাব 'পরে তুলে লবে সেই আলোখানি!
সময় ভাসিয়া যাবে—দেবতা মরিবে অবহেলে—
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুমো খাবে!—মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি লয়ে
পূর্বের সমুদ্র অই পশ্চিম সাগরে যাবে বয়ে!

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায ভরে মন!
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি, তোমার আসন

সকল স্থলের 'পরে, সকল জলের 'পরে আছে!
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম, তোমার!—যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিযাছ! —অঙ্কুরের মতো তুমি—যাহা ঝরিয়াছে
আবাব ফুটাও তারে!—তুমি ঢেউ—হাওযার মতন!
আগুনের মতো তুমি আসিযাছ অন্তরের কাছে!
আশার ঠোঁটের মতো নিবাশার ভিজে চোখ চুমি
আমার বুকের 'পরে মুখ রেখে ঘুমাযেছ তুমি!

জীবন হযেছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ বলে প্রেম, গানেব ছন্দেব মতো মন
আলো আর অন্ধকাবে দুলে ওঠে তুমি আছ বলে!
হৃদয গন্ধেব মতো—হৃদয ধূপের মতো জ্ব'লে
ধোঁযার চামর তুলে তোমারে যে কবিছে ব্যজন!
ওগো প্রেম, বাতাসেব মতো যেই দিকে যাও চলে
আমারে উড়াযে লও আগুনেব মতন তখন!
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে!
তুমি যদি বেঁচে থাকো—জেগে ববো আমি এই পৃথিবীর 'পব—
যদিও বুকেব 'পরে ববে মৃত্যু—মৃত্যুব কবব!

তবুও, সিন্ধুব জল—সিন্ধুর ঢেউযেব মতো বযে
তুমি চলে যাও প্রেম—একবাব বর্তমান হযে—
তাবপর, আমাদেব ফেলে যাও পিছনে—অতীতে —
স্মৃতিব হাড়ের মাঠে—কার্তিকের শীতে!
অগ্রসব হযে তুমি চলিতেছ ভবিষ্যৎ লযে—
আজও যাবে দেখ নাই তাহাবে তোমাব চুমো দিতে
চলে যাও!—দেহেব ছাযাব মতো তুমি যাও বযে—
আমবা ধবেছি ছাযা—প্রেমেরে তো পাবিনি ধবিতে!
ধ্বনি চলে গেছে দূবে—প্রতিধ্বনি পিছে পড়ে আছে—
আমরা এসেছি সব—আমবা এসেছি তাব কাছে!

একদিন—একরাত কবেছি প্রেমেব সাথে খেলা!
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুবে অবহেলা
একদিন—একবাত—তারপর প্রেম গেছে চলে—
সবাই চলিযা যায—সকলের যেতে হয বলে
তাহারও ফুরাল রাত!—তাড়াতাড়ি পড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে!—একবাত আব একদিন সাঙ্গ হলে
পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হযেছে সোনেলা!
আকাশে পুবের মেঘে রামধনু গিয়েছিল জ্বলে
একদিন—রয না কিছুই তবু—সব শেষ হয—
সমযের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময!

একদিন—একবাত প্রেমেরে পেযেছি তবু কাছে!—

আকাশ চলেছে—তার আগে আগে প্রেম চলিয়াছে!
সকলের ঘুম আছে—ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে
সকলের; নক্ষত্রও ঝরে যায় মনের অসুখে—
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে!
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম তোমারে!—মৃতেরা আবার জাগিয়াছে!—
যে ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে—
ওগো প্রেম, সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে!

পিপাসার গান

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইব চলে—আরবার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা লয়ে এ মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে!
কে আমারে ব্যথা দেছে—কে বা ভালোবাসে—
সব ভুলে, শুধু মোর দেহের তালাশে
শুধু মোর স্নায়ু শিরা রক্তের তরে
এ মাটির 'পরে
আসিব কি নেমে!
পথে পথে—থেমে—থেমে—থেমে
খুঁজিব কি তারে—
এখানের আলোয় আঁধারে
যেইজন বেঁধেছিল বাসা!
মাটির শরীরে তার ছিল যে পিপাসা,
আর যেই ব্যথা ছিল—যেই ঠোঁট, চুল,
যেই চোখ, যেই হাত, আর যে আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা—
যেই দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিল—আর তার ধানী সুরা করেছিল পান,
একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান,
দেখেছে যে ঐ নীল আকাশের ছবি
মানুষ-নারীর মুখ—পুরুষ—স্ত্রীর দেহ সবই
যার হাত ছুঁয়ে আজও উষ্ণ হয়ে আছে—
ফিরিয়া আসিবে সে কি তাহাদের কাছে!
প্রণয়ীর মতো ভালোবেসে
খুঁজিবে কি এসে
একখানা দেহ শুধু!—
হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে কাঁকরে
এ মাটির 'পরে!
অন্ধকারে সাগরের জল

ছেনেছে আমার দেহ, হয়েছে শীতল
চোখ—ঠোঁট—নাসিকা—আঙুল
তাহার ছোঁয়াচে; ভিজে গেছে চুল
শাদা শাদা ফেনাফুলে;
কত বার দূর উপকূলে
তারাভরা আকাশের তলে
বালকের মতো এক—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
জেনেছি দেহের স্বাদ—গেছে বুক—মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ—নারীর মতন
এ দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে!
প্রথম প্রণয়ী সে যে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে!
চোখ দুটো ফের ঘুমে ভরে
যেন তার চুমো খেয়ে!
এ দেহ—অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ!—
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখপাখালীর পালে
উঠানের; পেতে থাকে কান—
শোনো ঝরা শিশিরের গান
অঘ্রানের মাঝরাতে;
হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এ দেহেরে এসে ধরে—
ব্যথা দেয়! নারীর অধরে—
চুলে—চোখে—জুঁয়ের নিশ্বাসে
ঝুমকো-লতার মতো তার দেহ-ফাঁসে
ভরা ফসলের মতো পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ—ব্যথা পায় ফিরে!...
তবু এই শস্যক্ষেতে পিপাসার ভাষা
ফুরাবে না—কে বা সেই চাষা—
কাস্তে হাতে—কঠিন, কামুক—
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা!
কে বা সেই!—জানি না তো—হয় নাই দেখা
আজও তার সনে;
আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া, শুধু পীড়া!—মুকুলে মুকুলে

শুধু কীট, আঘাত, দংশন,—
চায় আজ মন!

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল!—
অন্ধকারে শিশিরের জল
কানে কানে গাহিয়াছে গান—
ঢালিয়াছে শীতল আঘ্রাণ;
মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আতুল
কুমারী আঙুল
কুযাশার;ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগাযেছে—কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
ঢালিযাছে আলো—
প্রণযীর ঠোঁটেব ধাবালো
চুম্বনের মতো!
বেখে গেছে ক্ষত
সবজীর সবুজ রুধিরে!
শস্যের মতো মোর এ শবীর ছিঁড়ে
বারবার হযেছে আহত
আগুনের মতো
দুপুরেব রাঙা রোদ!
আমি তবু ব্যথা দেই—
ব্যথা পাই ফিবে!—
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ ব্যথার সুখ!
লাল আলো—বৌদ্রেব চুমুক,
অন্ধকার—কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয, যেন গুঁড়ি গুঁড়ি
ধুলো মোরে ধীরে লয শুষে!—
মাঠে মাঠে—আড়ষ্ট পউযে
ফসলের গন্ধ বুকে ক'রে
বারবার পড়ি যেন ঝ'রে!

আবার পাব কি আমি ফিরে
এই দেহ!—এ মাটিব নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি!
হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন

আঙুলে নিঙাড়ি
এক ক্ষেত ছাড়ি
অন্য ক্ষেতে
চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর এক বার!
শুনিব কি গান
ঢেউদের!—জলের আঘ্রাণ
লব বুকে তুলে
আমি পথ ভুলে
আসিব কি এ পথে আবার!
ধুলো-বিছানার
কীটেদের মতো
হব কি আহত
ঘাসের আঘাতে!
বেদনার সাথে
সুখ পাব!
লতার মতন মোর চুল,
আমার আঙুল
পাপড়ির মতো—
হবে কি বিক্ষত
তোমার আঙুলে—চুলে!
লাগিবে কি ফুলে
ফুলের আঘাত!
আর বার
আমার এ পিপাসার ধার
তোমাদের জাগাবে পিপাসা!
ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে করে করে
ফলিব কি!—পড়িব কি ঝরে
পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে
আর একবার আমি—
নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে।

পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে,—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;
এখন সে কত রাত!
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,

আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে!

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে ওই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয়;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে,—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময়?
সাগরের ওই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিল—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে!

কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে;
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে,আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন্ এক ক্ষেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়!

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর।

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;

ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপব,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পবস্পর।

শকুন

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিযার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে;মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়াযেছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পব
কঠিন মেঘেব থেকে; যেন দূর আলো ছেড়ে ধুম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে; প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিযার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরেব 'পর

এইসব ত্যক্ত পাখি কযেক মুহূর্ত শুধু; আবার কবিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্ গাছে—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে;
একবার পৃথিবীব শোভা দেখে, বোম্বাযেব সাগবে জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকাবে ভিড় কবে, দেখে তাই; একবাব স্নিগ্ধ মালাবাবে
উড়ে যায—কোন্ এক মিনারেব বিমর্ষ কিনাব ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীব পাখিদেব ভুলে গিযে চ'লে যায যেন কোন্ মৃত্যুর ওপ'বে;

যেন কোন্ বৈতবণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে...চেযে দেখে কখন গভীব নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যাবা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায,
দেখেছি মাঠের পাবে নবম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুযাশার;কবেকার পাড়াগাঁর মেযেদের মতো যেন হায
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহাব শিযবে
চুপে দাঁড়াযেছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলেব তরে;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত বাত্রিটিবে ভালো,
খড়েব চালের 'পরে শুনিযাছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার;
পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ; অন্ধকারে আবার সে কোথায হারালো!
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা;অশত্থের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনো হাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ,ঘাস. রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে:
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে:

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নীচে লাল লাল ফল
প'ড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;
যত নীল আকাশেরা রয়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে:
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হলে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা আছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো-এক আলো আছে: দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির:
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ; এক দিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়;—যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখালীর ডাক
শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!

স্বপ্নের হাতে

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই!
যেই সব ছায়া এসে পড়ে
দিনের—রাতের ঢেউয়ে—তাহাদের তরে
জেগে আছে আমার জীবন;
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর—
থাকিত না হৃদয়ের জরা—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা!...

আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে
সারা দিন—সারা রাত্রি অপেক্ষায় থেকে,
পৃথিবীর যত ব্যথা—বিরোধ—বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব!
চাহিয়াছে অন্তর যে-ভাষা,
যেই ইচ্ছা—যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে পারে গিয়া,—
স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া!
মরমের যত তৃষ্ণা আছে—
তারই খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া এসো—
তোমরা চলিয়া এসো সব!
ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব!
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে,—
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে পাশে,—
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম—মৃত্যু—সব—
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা!
সন্ধ্যার নদীর জল—পাথরে জলের ধারা
আয়নার মতো
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত

তাহাদের তরে।
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময়...

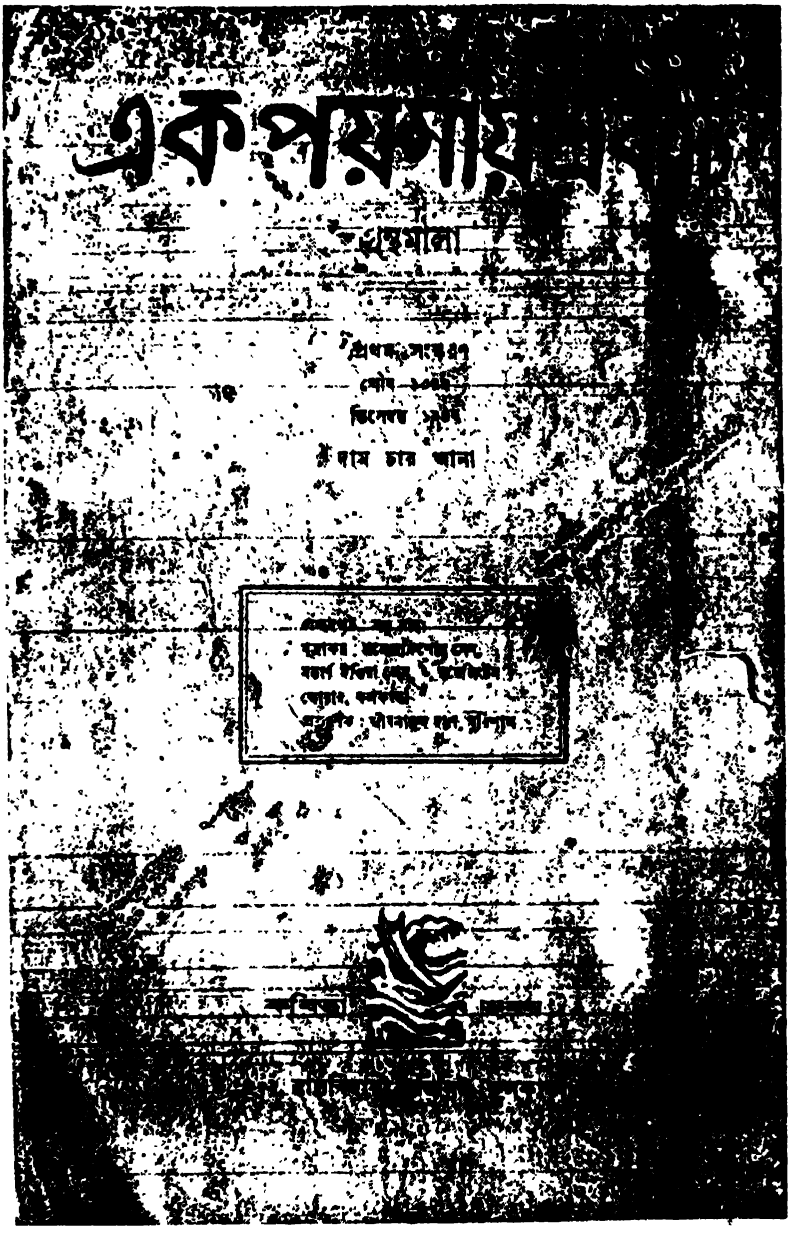
পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
আঁকাবাঁকা অসংখ্য অক্ষরে
একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা—
সে সব ব্যর্থতা
আলো আর অন্ধকারে গিয়াছে মুছিয়া!
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,
তবে ওই পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
লিখিতে যেয়ো না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা;
আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে সব ব্যর্থতা।
পৃথিবীর ওই অধীরতা
থেমে যায়—আমাদের হৃদযের ব্যথা
দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে—ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয;
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরও আয়ু শেষ হয!
পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব,—
নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয!

বনলতা সেন

১৯৪২



'বনলতা সেন' প্রথম সংস্করণের শম্ভু সাহা -অঙ্কিত প্রচ্ছদপত্র
বরিশাল/কলকাতা ১৯৪২।



'বনলতা সেন' প্রথম সংস্করণের পিছনের মলাট।

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু দন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকাব বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূব সমুদ্রেব পব
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসেব দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপেব ভিতব,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকাবে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায ছিলেন?'
পাখিব নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরেব বনলতা সেন।

সমস্ত দিনেব শেষে শিশিরের শব্দেব মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীব সব বঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তবে জোনাকিব রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘবে আসে—সব নদী—ফুরায এ-জীবনেব সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকাব, মুখোমুখি বসিবাব বনলতা সেন।

কুড়ি বছর পরে

আবাব বছব কুড়ি পবে তাব সাথে দেখা হয যদি!
আবাব বছব কুড়ি পবে—
হয়তো ধানের ছড়াব পাশে
কার্তিকের মাসে—
তখন সন্ধ্যাব কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী
নবম নরম হয শব কাশ হোগলায়—মাঠেব ভিতরে!

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখিব নীড়েব থেকে খড়
ছড়াতেছে; মনিযাব ঘবে বাত, শীত, আব শিশিবেব জল!

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরেব পাব—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমাবে আবাব!

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে

সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের—আমের;
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে!

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার!

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে!
চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে!

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনও মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনও বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে!

কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বথের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের উপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?'
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?
আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!
আব উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রাব মতো!

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমাব বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

আমি যদি হতাম

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি,
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে

ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;

তা হলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রুপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,

শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ:
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!

হয়তো গুলির শব্দ আবার:
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না,
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকুরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার, চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।

তারপর প'ড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু একটা কল্পনার হাঁস:

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই:
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

.দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা!
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,

দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে: দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে:
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।

মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল এক দিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ;
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা;
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল;
অনেক কমলা রঙের রোদ;

আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

শিকার

ভোর;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল;
চারিদিকের পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ;
একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে;
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে, তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—
মোরগফুলের মতো লাল আগুন—
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের;
সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবীলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধী ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য;
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;
এই নীল আকাশের নীচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে ওঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝ'রে যায়

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে—

বিলুপ্ত ধূসর কোন্ পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

বেড়াল

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়:
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়াব গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তেব সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

সং যো জ ন
১৯৫২

সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলাব কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপবিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নবকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো;
তবুও সময স্থির নয;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর; তুমি দান করো নি তো;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার ব'লে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন

কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগব না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি!

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগব না জেনে—

কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন:
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে ব'লে,
মহিলারই প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনও
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;

মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্তনদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে:
কাল কিছু হয়েছিল—হবে কি শাশ্বতকাল পরে।

দুজন

'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো; এক নক্ষত্রের নীচে তবু—একই আলোপৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি: পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি?' —বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে:
আজ এই মাঠ সূর্য সহমর্মী অঘ্রান কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এল—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশথের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়ে-চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল:

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে!
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরী,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে! 'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি;—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বলো;—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'

এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।

হলুদ রঙের শাড়ী, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রানের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির;—

প্রেমিকের মনে হল: 'এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর—জানিত বাসনা নিজে—বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইপ্সিতেরে তার।'

অবশেষে

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার 'পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর সকালবেলাকে।
আবার বিকেল হলে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত থাকে
এই সব গাছগুলো;—যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস;
চেয়ে দেখ—ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস
নড়ে ওঠে ত্রস্ততায়;—আধো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে
অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা বটে;
একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে;
তবুও বাঘিনী হয়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে—
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

স্বপ্নের ধ্বনিরা

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায়: স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো;
নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জ্বেলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থবিরের চোখে যেন জমে ওঠে অন্য কোন্ বিকেলের আলো।

সেই আলো চিরদিন হয়ে থাকে স্থির;
সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থবির
হয়ে যাব; সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রব বিছানায় শুয়ে;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রব।
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।

স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

আমাকে তুমি

আমাকে
তুমি দেখিয়েছিলে এক দিন:
মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পর মাইল;
দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস
দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়;
জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার;
জানালায় জানালায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে:
পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।
তারপর
দূরে
অনেক দূরে
খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীব মতো ধান ভানে—গান গায—গান গায
এই দুপুরের বাতাস।

এক একটা দুপুরে এক একটা পবিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হযে যায় যেন।

বিকেলে নরম মুহূর্ত;
নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছাযার আসা-যাওযা;
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছাযা
আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তিব মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধরে
স্থিব।

মাঝে মাঝে অনেক দূব থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতাব গন্ধ,
আগুনের—ঘিয়ের ঘ্রাণ;
বিকেলে
অসম্ভব বিষণ্ণতা।
ঝাউ হরীতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল পিযাল আমলকী দেবদারু—
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা:

শাদা শাদাছিট কালো পায়রাব ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায—ছাযায,
রাত্রি;
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিস্তব্ধতা।

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ;
বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস;
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে:
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।

'মাটির অনেক নীচে চলে গেছ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ? কোন্ কথা ভাবছ আঁধারে?
ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে:
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে
আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে—'
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

ধান কাটা হয়ে গেছে

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—খেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এই সব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়

ওইখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হত কত কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ;
শান্তি তবু: গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

শিরীষের ডালপালা

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে ঝাউবন।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে; 'শান্ত হতে হবে—
সকল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হয়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো:
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো: এশিরিয়;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজও তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো:
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন;
কালো চোখ মেলে ওই নীলিমা দেখেছ;
গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?—গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের,
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো;
তবুও সমুদ্র নীল; ঝিনুকের গায়ে আলপনা;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারি নি বোঝাতে।
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে

আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে;
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

মিতভাষণ

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রেয়তর বেলাভূমি:
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী সৌরভে।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানের স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

সবিতা

সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে:
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী।

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে

সহসা বিকেলবেলা শেষ হয়ে গেলে
চলে যেত কেমন নীরবে।
চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির করে দিতে গিয়ে ইয়োরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—
সিন্ধুর রাত্রির জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে;
কেমন অনন্যোপায় হাওয়ার আহ্বানে
আমরা অকূল হয়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে;
কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন!
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজও
মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন;
কত কাছে—তবু কত দূর।

• •

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতম দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত

ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলই জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসাবিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ
মূক করে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল:
প্রায তত দূর ভালো মানবসমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।

অঘ্রান প্রান্তরে

'জানি আমি তোমার দু'চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর পৃথিবীর 'পরে—
বলে চুপে থামলাম, কেবলই অশথ পাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া;—অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে;—কিছুক্ষণ অঘ্রাণের অস্পষ্ট জগতে
হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে—কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু-একটা সজারুর আসা-যাওয়া; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজও যেন লেগে আছে বহতা পাখায়
ঐ সব পাখিদের; ঐ সব দূর দূর ধানক্ষেতে, ছাতকুড়োমাখা ক্লান্ত জামের শাখায়;
নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা

ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকে আজ... হেঁটে চলি.... আজ কোনো কথা
নেই আর আমাদের; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,
সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেধে গিয়ে নড়ে-চড়ে
পতঙ্গ পালক জল—চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ;
আলেয়ার মতো ওই ধানগুলো নড়ে শূন্যে কী রকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায়; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সেও সনাতন;—কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে—তাই-ই ঠিক—ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

পথ হাঁটা

কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে:

সারা রাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর-কিছু দেখেছি কি: একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট ভরা কলকাতা?
চোখ নীচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড়;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজও আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।
সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হ'য়ে যেন আসে;
যদিও আকাশ সিন্ধু ভ'রে গেল অগ্নির উল্লাসে;
যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় ক্ষেতের গোধূম
চিলের কান্নার মতো শব্দ ক'রে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম

গাঢ় করে দিয়ে যায়—এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ
নদীর তরঙ্গে—ক্রমে—তুষারের স্তূপে তার ঢেউ
একবার টের পাবে—দ্বিতীয়বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা;
এখনও চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান ক'রে ফেলে জলের মতন এক ঢোকে;
অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো ক্ষেতের কাজ ক'রে যায় ধীরে;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।
পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজেব মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হ'য়ে খ'সে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে;
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হয়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হল মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিশ্বের মতন।
অভিভূত হ'য়ে আছে—চেয়ে দেখ—বেদনার নিজের নিয়ম।

নেউল-ধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয়;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা;
ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয়;
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ
অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।

পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনও মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।
তাহার পায়ের নীচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায়;
তাহার মাথার 'পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড়;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হ'য়ে থেমে ক্রমে এক দিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ?

চেয়েছে মাটির দিকে—ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার;
দূরবীনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তারা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম'রে,
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে;
চিরদিন এইসব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।
মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্রও প্রামাণিক; পরলোক রেখেছে সে জ্বেলে;
অনৃত সে আমাদের মৃত্যুকে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে ব'সে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চ'লে যাই—চেয়ে দেখি আরো কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারও বিবরে
ছায়া ফেলে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যে সব থাম সমীচীন মিস্তিরির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে,
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।
হয়তো অনেক এগিয়ে তারা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোলতার নেই অবলেশ।

তাই তারা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরও জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকারে দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়—এই জ্ঞানে
লোকসানী বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর ক'রে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।
অকৃত্রিম নীল আলো খেলা করে ঢের আগে মৃত প্রেমিকের শব থেকে।

একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে;
সে সবের দিন শেষ হ'য়ে গেছে

এখন সৃষ্টির মনে—অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।
একদিন ছিল যাহা অরণ্যের রোদে—বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হ'য়ে গেছি—বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে: 'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে; 'এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অব্‌লঙ ছবি;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে ম'রে গেছি—মনে পড়ে বটে
এইসব ছবি দেখে; বন্দীব মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদযন, চিত্রসেনী স্থাণু।
এক দরজায ঢুকে বহিষ্কৃত হ'যে গেছে অন্য এক দুযারের দিকে
অমেয় আলোয হেঁটে তারা সব।
(আমাদেব পূর্বপুরুষেবা কোন্ বাতাসেব শব্দ শুনেছিল;
তাবপর হযেছিল পাথরের মতন নীবব?)
আমাদেব মণিবন্ধে সমযের ঘড়ি
কাচেব গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী;
সমুদ্রেব দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙবের মতো;
তারপব অন্য গ্রহ-নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হযেছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচাবিত কবে।
সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত বেখে টের পাওযা যায
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ;
তবু তাবা কবে নাকো পবস্পরের ঋণশোধ।

ভিখিরী

একটি পয়সা আমি পেযে গেছি আহিরীটোলায,
একটি পয়সা আমি পেযে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পযসা যদি পাওযা যায আরো—
তবে আমি হেঁটে চলে যাব মানে মানে।
—ব'লে সে বাড়াযে দিল অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিল তাঁত;
তবুও তা নুলো শাঁখারীর হাতে হযেছে করাত।

একটি পযসা আমি পেযে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিযাঘাটা,

একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল; ভিখিরীর ভুলেঃ এক পৃথিবীর ভুলচুক।

তোমাকে

একদিন মনে হত জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়—
চেয়ে আছে—চলে যায—জলের প্রতিভা।

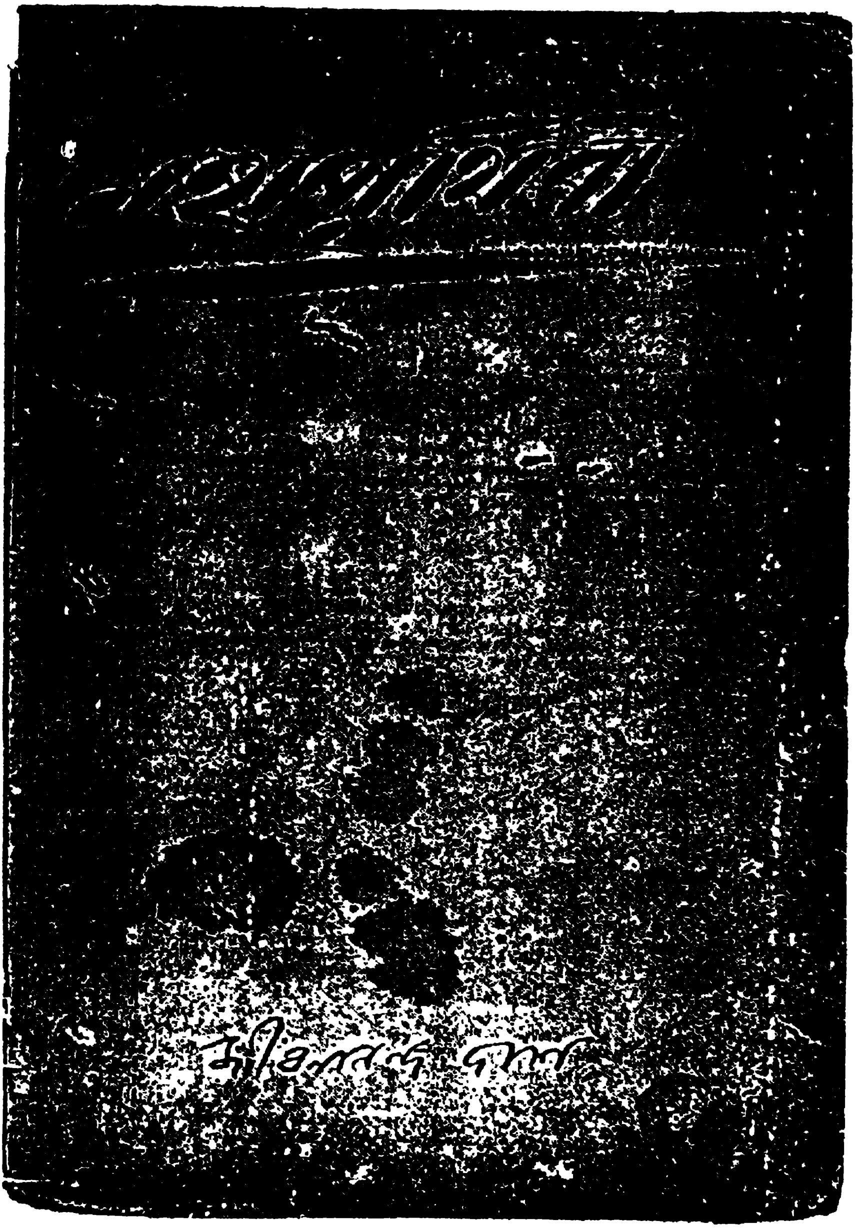
মনে হত তীরের উপর বসে থেকে।
আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল
কেউ কেউ তুলে নিয়ে চলে গেলে—নীচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

নির্জন জলের রং তাকায়ে রয়েছে;
স্থানান্তরিত হয়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে;

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হয়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নির্ভে যায় ব'লে
রঙিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয়;
অপরাহ্নে আকাশের রং ফিকে হলে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

মহাপৃথিবী
১৯৪৪



প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র, কলকাতা ১৩৫১



'মহাপৃথিবী' প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণপত্র। ১৩৫১

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫–৪৮–এর ভিতর রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বেরিয়েছে ১৩৪২ থেকে ১৩৫০–এ। 'বনলতা সেন' ও অন্য কয়েকটি কবিতা বার হয়েছিল 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকি সব কবিতা আজ প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেল।

শ্রাবণ ১৩৫১

জীবনানন্দ দাশ

নিরালোক

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের খেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে—জ্বেলে—জ্বেলে নিভে গেলে—নিভে গেলে?
ব'লে তারে জাগায় আবার;
জাগায় আবার।
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

অনেক নক্ষত্রে ভ'রে গেছে সন্ধ্যার আকাশ—এই রাতের আকাশ;
এইখানে ফাল্গুনের ছায়া-মাখা ঘাসে শুয়ে আছি;
এখন মরণ ভালো,—শরীরে লাগিয়া রবে এইসব ঘাস;
অনেক নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি।

কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি!
সারাদিন গাড়ি টানা হ'ল ঢের,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস;
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে,—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি?
'কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি?' চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।

ঝাউফলে ঘাস ভ'রে—এখানে ঝাউয়ের নিচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে;
কাশ আর চোরকাটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে কোন ঘরে যাবো!
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাবো?
রাতের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে যাবো?
'তোমারি নিজের ঘরে চ'লে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে;
অথবা তাকায়ে দ্যাখো গোরুর গাড়িটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে;
পিছে তার সাপের খোলশ, নালা, খলখল অন্ধকার— শান্তি তার রয়েছে সমুখে;
চ'লে যায় চুপে চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে;—
যদিও মরেছে ঢের গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ,—তবু তার মৃত্যু নাই মুখে।'

সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস,
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি

নাচিতেছ টারান্‌টেলা—রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহবান।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দেখনি তো—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে; যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
মাছি আর; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিকের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে;
সেখানে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনো নাকো; অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
জানো নাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

এই সব জানো নাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে;

রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা–শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে!
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে,
বিষন্ন পৃথিবী ছেড়ে দলে দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে।
শীতার্ত এ পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রান
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তাব প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিবে এসো;একদিন নীল ডিম করেছো বুনন;
আজো তারা শিশিরে নীবব;
পাখির ঝরণা হ'য়ে কবে
আমারে কবিবে অনুভব!

শ্রাবণরাত

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীবে ধীরে ঘুম ভেঙে যায়।
কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরেব শব্দ শুনে?
বর্ষণ অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে;
যত দূর চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে করে চুপ করে রয়েছে যেন;
নিস্তব্ধ হ'য়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড়ো বড়ো কপাট খুলছে,

বন্ধ করে ফেলেছে আবার;
কোন্ দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে যারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে;
কাল ভোরে জাগবার জন্য।
যেসব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিলো
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তারা;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খসিয়ে আমাকে খুঁজে বার করে।
সমস্ত বঙ্গসাগরেব উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন;
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হ'য়ে থাকে।

কে যেন বলে:
আমি যদি সেইসব কপাট স্পর্শ করতে পারতাম
তাহ'লে এরকম গভীর নিস্তব্ধ রাতে স্পর্শ করতাম গিযে।—
আমার কাঁধের উপর ঝাপসা হাত রেখে ধীরে ধীবে আমাকে জাগিযে দিয়ে

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ কবলাম:
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

মুহূর্ত

আকাশে জ্যোৎস্না—বনেব পথে চিতাবাঘের গাযের ঘ্রাণ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন:
রাত্রির এই নীরবতার ভিতব কোন্ দিকে চলেছি!
রূপালি পাতার ছায়া আমার শরীবে,
কোথাও কোনো হরিণ নেই আর;
যত দূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন;
তারপর ধীরে-ধীবে ডুবে যাচ্ছে
শত শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর।

শহর

হৃদয়, অনেক বড়ো বড়ো শহর দেখেছো তুমি;
সেইসব শহরের ইটপাথার,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হ'যে গেছে।

কিন্তু তবুও শহরের বিপুল মেঘের কিনারে সূর্য উঠতে দেখেছি;
বন্দরের নদীর ওপারে সূর্যকে দেখেছি
মেঘের কমলারঙের খেতের ভিতর প্রণয়ী চাষার মতো বোঝা রয়েছে তার;
শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু উঁচু মিনারের ওপরেও দেখেছি—নক্ষত্রেরা—
অজস্র বুনো হাঁসের মতো কোন্ দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে।

শব

যেখানে রূপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর;
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে খুঁটে খায়
সেইসব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায়;
নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হ'য়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ;
কান্তারের একপাশে যে নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী;কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ হলুদ জ্যোৎস্না; চেয়ে দেখ যদি;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন: নীল লাল রুপালি নীরব।

স্বপ্ন

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খ'সে;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি

উড়ে গেলো কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেলো বুঝি?
অন্ধকার হাৎড়ায়ে ধীরে ধীরে দেশলাই খুঁজি;
যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পারো?

কার মুখ?—আমলকি শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিলো তাহা;
এ ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিলো, আহা,

সে মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন;
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে: কোন্ দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত আছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এইসব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছো চ'লে পাই নাকো টের!
বোচকা বেঁধেছো ঢের,— ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো,—এই—তো সে দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজো, আহা, তাহাদের কথা মনে হয়!—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এইসব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিলো ঋণ;
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন!

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে?
সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর!...
যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর!'
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'ল তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল।
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।
তবুও তো প্যাঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিযাছি।
ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা

করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি; বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্ত-মাখা ঠোঁটে!
শোনো
তবু এ মৃতের গল্প;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয়: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো
কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

শীতরাত

এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা প্যাঁচার গান; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

শহর ও গ্রামের দূর মোহানায় সিংহের হুংকার শোনা যাচ্ছে—
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।

এদিকে কোকিল ডাকছে—পউষের মধ্যরাতে;
কোনো একদিন বসন্ত আসবে ব'লে?
কোনো একদিন বসন্ত ছিলো, তারই পিপাসিত প্রচার?
তুমি স্থবির কোকিল নও? কত কোকিলকে স্থবির হ'য়ে যেতে দেখেছি,
তারা কিশোর নয়,

কিশোরী নয় আর;
কোকিলের গান ব্যবহৃত হ'য়ে গেছে।

সিংহ হুংকার ক'রে উঠছে:
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।

চারদিককার আবছায়া-সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে যায় সব।

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।
কোকিলের গান

বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'সে—খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বিপাশামদির নাগপাশ,—তুমি
পাশ ফিরে শোও,
কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।

আদিম দেবতারা

আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ—
কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিলো তারা;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিলো মাছির মতো কামনা।

আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিলো লিপি রচনা করবার আবেগ:
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নিশীথ-দেবদারু-দ্বীপ;
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছাড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'যে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠলো:
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে যায়?
হো হো ক'রে হেসে উঠলাম আমি!—
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে

অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হ'য়ে উঠলো যেন;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই যাই আমি সেইসব সমুদ্রের উল্কার উল্কায়
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক!

স্থবির-যৌবন

তারপব একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে
কহিবে:তোমারে চাই—তোমারেই, নাবী;
এইসব সোনা রূপা মসলিন যুবাদের ছাড়ি
চ'লে যেতে হবে দূর আবিষ্কারে ভেসে।

বলিলাম;—শুনিল সে: তুমি তবু মৃত্যুর দূত নও—তুমি—
নগর—বন্দর ঢের খুঁজিয়াছি আমি;
তাবপর তোমার এ জানালায় থামি
ধোঁয়া সব;—তুমি যেন মরীচিকা—আমি মরুভূমি—

শীতেব বাতাস নাকে চ'লে গেলো জানালার দিকে,
পড়িল আধেক শাল বুক থেকে খ'সে:
সুন্দর জন্তুব মতো তার দেহকোষে
রক্ত শুধু? দেহ শুধু? শুধু হরিণীকে

বাঘের বিক্ষোভ নিয়ে নদীর কিনারে—নিম্নে—রাতে?
তবে তুমি ফিরে যাও ধোঁয়ায় আবার:
উজ্জ্বল মৃত্যুব দূত বিবর্ণ এবাব—
বরং নারীকে ছেড়ে কঙ্কালেব হাতে

তোমারে তুলিয়া লবে কুয়াশা -ঘোড়ায়।
তুমি এই পৃথিবীর অনাদি স্থবির;—
সোনালি মাছের মতো তবু কবে ভিড়
নীল শৈবালের নিচে জলেব মায়ায়

প্রেম—স্বপ্ন—পৃথিবীর স্বপ্ন, প্রেম তোমাব হৃদয়ে।
হে স্থবির, কী চাও বলো তো—
শাদা ডানা কোনো এক সারসের মতো?
হয়তো সে মাংস নয়—এই নারী; তবু মৃত্যু পড়ে নাই আজো তার মোহে।

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো এক বিকেলের জাফরান দেশে।

কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হ'যে গেছে কত ভেসে।
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পাবে?

আজকের এক মুহূর্ত

হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে ছেড়ে চলছো ব'লে আমি খুব গভীর খুশি?
কিন্তু আবো খানিকটা চেয়েছিলাম:
চারিদিকে তুমি হাড়ের পাহাড় বানিযে বেখেছো;—
যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি
অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
এইখানে মৃতবৎসা, মাতাল, ভিখারি ও কুকুরদের ভিড়ে
কোথায় তাকে বেখে দিলে তুমি?

এত দিন ব'সে পুরোনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ করতে-না-করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়ে গেলো;
কোন্-এক গভীর নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে;—
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে ব'লে?
সে-ই শেষ সত্য বলে?
জীবন: ভারতের, চীনেব, আফ্রিকাব নদীপাহাড়ে বিচরনের মূঢ় আনন্দ নয় আব
বরং নির্ভীক বীরদের বচিত পৃথিবীর ছিদ্রে ছিদ্রে
ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আমোদ:
তারপর চুম্বক পাহাড়ে গিযে নিস্তব্ধ হবার মতো আস্বাদ?

জীবন: নির্ভীক নারীদের সৌন্দর্যের আঘাতে
নিগ্রো সংগীতের বেদনার ধুলোরাশি?
কিন্তু এ বেদনা আত্মিক, তাই ঝাপসা;—একাকী: তাই কিছু নয়;—
কিন্তু তিলে তিলে আটকে থাকবার বেদনা:
পৃথিবীর সমস্ত কুকুর ফুটপাথে বোধ করছে আজ।

যেন এত দিনের বীজগণিত কিছু নয়,
যেন নতুন বীজগণিত নিয়ে এসেছে আকাশ!

বাংলার পাড়াগাঁযে শীতের জ্যোৎস্নায আমি কত বার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে গেলো বাঘ—জঙ্গলের অন্ধকারে;
কত বার হটেনটট-জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকাব সিংহকে লাফিযে পড়তে দেখলাম;

কিন্তু সেইসব মূঢ়তাব দিন নেই আর সিংহদের;

নীলিমার থেকে সমুদ্রের থেকে উঠে এসে
পরিস্ফুট রোদের ভিতর
উজ্জ্বল দেহ অদৃশ্য রাখে তারা;
শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের
আর কোনো শেষ বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করে।

যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
সেইসব শাদা শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন্ জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হ'য়ে অপেক্ষা করছে কোথাও;

আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ব রাত্রির গন্ধ পাই আমি।

ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায়?
তারা কি হারিয়ে গেছে?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপরে অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেলো বলে কোনো ঘুঘু তার,
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি ব'লে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা বলে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার!
প্যাঁচা তার ধূসর পাখা আমলকির ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকির শাখা থেকে নীল শিশির ঝরে পড়বে না,
তাঁর সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম ক'রে তুলবে না!
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে রয়েছে দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো মনে হবে না;

প্যাঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরের সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার।

প্রার্থনা

আমাদের প্রভু বীক্ষন দাও: মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে?
পিরামিড যারা গড়েছিলো একদিন—আর যারা ভাঙে গড়ে;—
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস্ যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচা মালে;
যে সব ভ্রমণ শুরু হ'ল শুধু মার্কোপোলোর কালে;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে সব জ্যোতি
দেশলাইকাঠি নয় শুধু আর—কালপুরুষের গতি;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হ'লে কী ক'রে চলে,—
আমাদের প্রভু বিরতি দিযো না; লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও: পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।

ইহাদেরই কানে

একবাব নক্ষত্রেব পানে চেয়ে—একবাব বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেলো যুবকের দল;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসন্মানে
শুনিল আধেক কথা;—এইসব বধিব নিশ্চল
সোনার পিত্তলমূর্তি: তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেলো যুবকেব দল;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবাব বেদনার পানে।

সূর্যসাগরতীরে

সূর্যের আলো মেটায় খোবাক কার:
সেই কথা বোঝা ভার।
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে ওদের প্রাণ
গড়িয়া উঠিল কাফ্রির মতো সূর্যসাগরতীরে
কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাশবুনুনিটি ঘিরে।

চারিদিকে স্থির-ধূম্র-নিবিড় পিরামিড যদি থাকে—
অনদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান,—
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে?

গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্যসাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলেরা বুনুনি ঘিরে।

মনোবীজ

জামিরের ঘন বন ওইখানে রচেছিলো কারা?
এইখানে লাগে নাই মানুষের হাত।
দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত
ইস্পাতের আশা গড়ে—সেইসব সমুজ্জ্বল বিবরণ ছাড়া

যেন আর নেই কিছু পৃথিবীতে: এই কথা ভেবে
যাহারা রয়েছে ঘুমে তুলোব বালিশে মাথা গুঁজে;—
তাহারা মৃত্যুর পর জামিরেব বনে জ্যোৎস্না পাবে নাকো খুঁজে;
বধির ইস্পাত-খড়গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে।

সেইমুখ এখনো দিনের আলো কোলে নিয়ে করিতেছে খেলা:
যেন কোনো অসংগতি নেই—সব হালভাঙা জাহাজের মতো সমন্বয়
সাগবে অনেক রৌদ্র আছে ব'লে;—পরিব্যস্ত বন্দরেব মতো মনে হয
যেন এই পৃথিবীকে;—যেখানে অঙ্কুশ নেই তাকে অবহেলা
করিবে সে আজো জানি;—দিনশেষে বাদুড়েব-মতন-সঞ্চারে
তাবে আমি পাবো নাকো;—এই বাতে পেয়ারাব ছায়ার ভিতরে
তারে নয—স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী প্যাঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।
মৃত্যু এক শান্ত ক্ষেত—সেইখানে পাবো নাকো তারে।
...
পৃথিবীব অলিগলি বেয়ে আমি কত দিন চলিলাম।
        ঘুমালাম অন্ধকারে যখন বালিশে:
নোনা ধরে নাকো যেই দেযালের
        ধূসর পালিশে
চন্দ্রমল্লিকার বন দেখিলাম
        রহিযাছে জ্যোৎস্নায মিশে।
যেই সব বালিহাঁস ম'রে গেছে পৃথিবীতে
        শিকারীর গুলির আঘাতে:
বিবর্ণ গম্বুজে এসে জড়ো হয
        আকাশের চেয়ে বড়ো রাতে;
প্রেমের খাবার নিযে ডাকিলাম তাবে আমি
        তবুও সে নামিল না হাতে।

পৃথিবীর বেদনার মতো ম্লান দাঁড়ালাম;
        হাতে মৃত সূর্যের শিখা;
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম;

অঘ্রানের মাঠের মৃত্তিকা
হ'য়ে গেলো;
নাই জ্যোৎস্না—নাই কো মল্লিকা।
....

সেই সব পাখি আর ফুল।
পৃথিবীর সেইসব মধ্যস্থতা
আমার ও সৌন্দর্যের শরীরের সাথে
ম্যমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আব;
সেই সব শীর্ণ দীর্ঘ মোমবাতি ফুরায়েছে
আছে শুধু চিন্তাব আভার ব্যবহার।
সন্ধ্যা না—আসিতে তাই
হৃদয প্রবেশ কবে প্যাগোডার ছাযার ভিতরে
অনেক ধূসর বই নিয়ে।

চেযে দেখি কোনো এক আননের গভীব উদয:
সে আনন পৃথিবীর নয।
দু-চোখ নিমীল তার কিসেব সন্ধানে?
'সোনা—নারী—তিশি—আর ধানে'—
বলিল সে: 'কেবল মাটির জন্ম হয।'
বলিলাম: 'তুমিও তো পৃথিবীব নারী,
কেমন কুৎসিত যেন,—প্যাগোডার অন্ধকাব ছাড়ি
শাদা মেঘ-খবশান বাহিরে নদীব পাবে দাঁড়াবে কি?

শানিত নির্জন নদী—বলিল সে—তোমাবি হৃদয,
যদিও তা পৃথিবীর নারী—নদী নয:
তোমারি চোখেব স্বাদে ফুল আব পাতা
জাগে না কি? তোমারি পাযেব নিচে মাথা
রাখে না কি? বিশুষ্ক—ধূসর—
ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদেব স্তব
যেন তাবা:—অপ্সরা—উর্বশী
তোমাব আকৃষ্ট মেঘে ছিলো না কি বসি?
ডাইনিব মাংসেব মতন
আজ তার জঙ্ঘা আব স্তন;
বাদুড়ের খাদ্যেব মতন
একদিন হ'যে যাবে;
যে সব মাছিরা কালো মাংস খায—তারে ছিঁড়ে খাবে।

কান্তারেব পথে যেন সৌন্দর্যেব ভূতের মতন
তাহারে চকিত আমি করিলাম;—রোমাঞ্চিত হ'যে তাব মন
ব'লে গেলো: তক্ষিত সৌন্দর্য সব পৃথিবীব

উপনীত জাহাজের মাস্তুলের সুদীর্ঘ শরীর
নিযে আসে একদিন, হে হৃদয়,—একদিন
দার্শনিকও হিম হয়—প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন?
কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদ্‌গীরণ থেকে
আসিল সে হৃদযের। হাতে হাত রেখে
বলিল সে। মনে হ'লো পাণ্ডুলিপি মোমের পিছনে
রয়েছে সে। একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে;
ল্যাম্পের আলো হাতে সেদিন দাঁড়াবে
অনেক মেধাবী মুখ স্বপনের বন্দরের তীরে,
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে।

প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে?
হয়তো জ্বালায়ে গিয়েছে অনেক—অনেক বিগত কাল,
বায়ুর ঘোড়ার খুরে যে পরায় অগ্নির মতো নাল
জানে না সে কিছু—তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে।
চীনের প্রাচীর ভেঙে যেতে—যেতে —
চীনের প্রাচীর বলে:
অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে;
যা—কিছু নিভৃত—ধূসর—মেধাবী—তাহারে রক্ষা করে;
পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।
অথবা চীনের প্রাচীরের ভুল—চৌকোনি নিজের হাল;
কিংবা জ্বালায়ে গিয়েছে হয়তো অনেক বিগত কাল;
অগ্নিঘোড়ার খুরে যে পরায় জলের মতন নাল
জানে না সে কিছু...তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে;—
রবিনে জড়ানো মিশরের মমি কালো বিড়ালকে বলে।

পরিচায়ক

মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবন হংসীর মতন —
হয়তো বা কোনো এক কৃপণের ঘরে;
প্রভাতে সোনার ডিম রেখে যায় খড়ের ভিতরে;
পরিচিত বিস্ময়ের অনুভবে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হয় গৃহস্থের মন
তাই সে হংসীরে আব চায় নাকো দুপুরে নদীব ঢালু জলে
নিজেকে বিস্মিত ক'রে;—ক্রমে দূরে—দূরে
হয়তো বা মিশে যাবে অশিষ্ট মুকুরে:
ছবির বইয়ের দেশে চিবকাল—ক্রূর মাযাবীর জাদুবলে।

তবুও হংসীই আভা;—হয়তো বা পতঞ্জলি জানে।
সোনায়-নিটোল-করা ডিম তার বিমর্ষ প্রসব।
দুপুরে সূর্যের পানে বজ্রের মতন কলরব
কণ্ঠে তুলে ভেসে যায় অমেয় জলের অভিযানে।
কেয়াফুলস্নিগ্ধ হাওয়া স্থির তুলাদণ্ড প্রদক্ষিণ
ক'রে যায়;—লোকসমাগমহীন, হিম কান্তারের পার
করে নাকো ভীতি আর মরণের অর্থ প্রত্যাহার:
তবুও হংসীর পাখা তুষারের কোলাহলে আঁধারে উড্ডীন।
...

তবুও হংসীর প্রিয় অলোকসামান্য সুর, শূন্যতার থেকে আমি ফেঁশে
এইখানে প্রান্তরের অন্ধকারে দাঁড়ায়েছি এসে;
মধ্যনিশীথের এই আসন্ন তারকাদের সঙ্গ ভালোবেসে।

মরখুটে ঘোড়া ওই ঘাস খায়,—ঘাড়ে তার ঘায়ের উপরে
বিনবিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মতো শব্দ করে।
এই স্থান, হ্রদ, আর বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে
ছিলো তবু একদিন? রবে তবু একদিন? হে কালপুরুষ, ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার?—ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

ভূপৃষ্ঠের ওই দিকে—জানি আমি—আবার নতুন ব্যাবিলন
উঠেছে অনেক দূর;—শোনা যায় কর্নিশে সিংহের গর্জন।
হয়তো বা ধুলোসাৎ হ'য়ে গেছে এত রাতে ময়ূরবাহন।

এই দিকে বিকলাঙ্গ নদীটির থেকে পাঁচ-সাত ধনু দূরে
মানুষ এখনো নীল, আদিম সাপুড়ে:
রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায় নাকো তারা খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে।

এইসব শেষ হ'যে যাবে তবু একদিন;—হযতোবা ক্রান্ত ইতিহাস
শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।
ক্রমে এক বিস্তব্ধতা: নীলাভ ঘাসের ফুলে সৃষ্টির বিন্যাস

আমাদের হৃদয়কে ক্রমেই নীরব হ'তে বলে।
যে টেবিল শেষরাতে দোভাষীর—মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে
সেইসব বহু ভাষা শিখে তবু তারকার সন্তপ্ত অনলে

হাতের আয়ুর রেখা আমাদের জ্বলে আজো ভৌতিক মুখের মতন;
মাথার সকল চুল হ'য়ে যায় ধূসর—ধূসরতম শণ;
লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ

বিদূষক বামনের মতো হেসে একবার চায় শুধু হৃদয় জুড়াতে।
ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচিছাঁটা জামার মতন মুক্ত হাতে
তাহার নগ্নতা ঘিরে জ্ব'লে যায়—সে কোথাও পারে না দাঁড়াতে।
...

নীলিমাকে যতদূর শান্ত নির্মল মনে হয়
হয়তো বা সে রকম নেই তার মহানুভবতা।
মানুষ বিশেষ কিছু চায় এই পৃথিবীতে এসে
অতীব গরিমাভরে ব'লে যায় কথা;

যেন কোনো ইন্দ্রধনু পেয়ে গেলে খুশি হ'তো মন।
পৃথিবীর ছোটো-বড়ো দিনের ভিতর দিয়ে অবিরাম চ'লে
অনেক মুহূর্ত আমি এ রকম মনোভাব করেছি পোষণ।

দেখেছি সে সব দিনে নরকেব আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত;
সে আগুন নিভে গেলে সে রকম মহৎ আঁধার,
সে আঁধারে দুহিতারা গেয়ে যায নীলিমার গান;
উঠে আসে প্রভাতের গোধূলির রক্তচ্ছটা-রঞ্জিত ভাঁড়।

সে আলোকে অরণ্যের সিংহকে ফিকে মরুভূমি মনে হয;
মধ্যসমুদ্রের রোল—মনে হয—দযাপরবশ;
এরাও মহৎ—তবু মানুষের মহাপ্রতিভার মতো নয।

আজ এই শতাব্দীতে পুনরায় সেই সব ভাস্বর আগুন
কাজ ক'রে যায যদি মানুষ ও মনীষী ও বৈহাসিক নিযে—
সমযের ইশারায অগণন ছায়া-সৈনিকেবা
আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িযে,

দেয়ালের 'পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছাযাব জীবন
জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায আগুনেব রঙ আরো বিভাসিত হ'লে—
গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে-কেটে নাটকের হয তবু শ্রুতিবিশোধন।

বিভিন্ন কোরাস

এক

আমাদের হৃদযের নদীর উপর দিযে ধীরে
এখনো যেতেছে চ'লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস;
সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন—আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস;

দেখেছি সন্তানদের ময়দানে আলোর ভিতরে
স্বতই ছড়ায়ে আছে—যেমন শুনেছি টায়-টায়;
অদ্ভুত ভিড়ের দিকে চেয়ে থেকে দেখে গেছি জনতার মাথা
গৃহদেবতাকে দেখে শৃঙ্গা শিলায়।

নগরীর পিতামহদেব ছবি দেয়ালে টাঙায়ে—
টাঙায়েছি নগরীর পিতাদেব ছবি;
পরিক্রমণে গিয়ে সর্বদাই আমাদের বড়ো নগরীতে
যাহাতে অমৃত হয় সে-রকম অর্থ, বাচক্রবী,

প্রকাশে প্রয়াস পেয়ে গেছি মনে হয়;
আমাদের দেয় যাহা নিয়ে গেছি তুলে;
নাট গাছ মুড়ে গেছে ব'লে মনে হয়
আমাদের বক্তব্য ফুরুলে।

আবার সবুজ হ'য়ে জুয়ায়ে গিয়েছে
আমাদের সন্তানের— সন্তানের সন্তানের প্রয়োজনমতো।
এ-রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হ'তে পারে;
অন্য কোনো দার্শনিক মত বিপ্লব;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সংগম এড়ায়ে
স্থির হ'য়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততির সব?

যদি তারা টেঁশে যায় করাল কালের স্রোতের ধরা প'ড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন—অবশেষে
শেয়াল প্যাঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়,—
তখন স্বপ্নই সত্য; গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁশে

জীবনের বাস্তবতা সে সময়।
মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে
জীবনের বাস্তবতা?—এমন অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে
মাঝে মাঝে গিয়েছি নাগাড় কথা ভেবে।

দুই

সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।
আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হ'য়ে যাবে;
স্বতসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে;
এ-রকম ভাবনার কিছু অবশেষ

তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো বা;—মাঠে-ময়দানে
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ;
অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

সমুদ্রের রৌদ্র থেকে আমাদের দেশে
নীলাভ ঢেউয়ের মতো দীপ্তি নেমে আসে মনে হয়;
আমাদের পিতামহ পিতারাও প্রবাদের মতো জেনে গেছে;
আমাদেরো ততদূর ভাববিনিময়

একদিন ছিলো,—তবু শোচনীয় কালের বিপাকে
হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।
কারু সাথে অন্ধকার মাটিতে ঘুমায়ে,
কারু সাথে ভোরবেলা জেগে—বারো মাস

তাকেও স্মরণ ক'রে চিনে নিতে হয়
সে কি কাল? সে জীবন? জ্ঞাতিভ্রাতা? গণিকা? গৃহিণী?
মানুষের বংশ এসে সময়ের কিনারে থেমেছে,
একদিন চেনা ছিলো ব'লে আজ ইহাদেব চিনি

অন্ধকার সংস্কাব হাৎড়ায়ে, মৃদুভাবে হেসে;
তীর্থে তীর্থে বারবাব পরীক্ষিত হ'য়ে পরিচয়
বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাঁইয়ে প'ড়ে আছে;
আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়েব নয়।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে:
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির ক'বে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স;
সে সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।
পশ্চিমে অস্তের সূর্য ধূলিকণা, জীবাণুর উতরোল মহিমা রটায়ে
পৃথিবীকে বেখে যায় মানবের কাছে জনমানবের ঋণে।

তিন

সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেবা হাঁটে।
তাদের ছায়ার মতো শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে-কাটে

মাঝে মাঝে দু-চারটে প্লেন চ'লে যায়।
একভিড় হরিয়াল পাখি
উড়ে গেলে মনে হয়, দুই পায়ে হেঁটে
কত দূর যেতে পারে মানুষ একাকী।

এ সব ধারণা তবু মনের লঘুতা।
আকাশে রক্তিম হ'য়ে গেছে;
কামানের থেকে নয়, আজো এইখানে
প্রকৃতি রয়েছে।

রাত্রি তার অন্ধকার ঘুমাবার পথে
আবার কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে, ছেলে:
মানুষ ও মনীষীর রৌদ্রের দিন
হৃদয়বিহীনভাবে শূন্য হ'য়ে গেলে।

সেই রাত্রি এসে গেছে; সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে
জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে।
পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি সায়াহ্নের, সকালের নয়,
মাঝে এই বেহুলা ও কালরাত্রি বিনে।

চার

এখন অনেক দূরে ইতিহাস-স্বভাবের গতি চ'লে গেছে।
পশ্চিম সূর্যের দিকে শত্রু ও সুহৃদ তাকায়েছে।
কে তার পাগড়ি খুলে পুব দিকে ফসলের, সূর্যের তরে
অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রির ভিতরে
ডুবে যেতে চেয়েছিলো ব'লে চ'লে গেছে।

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই—তবু র'য়ে গেছি স্বভাববশত।
এই ক্রান্তি জীবন বা মরণের ব'লে মনে হয়।

আকাশের ফিকে রঙ ভোরের, কি সন্ধ্যার আঁধার?
এই দূরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার?
আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী;
বংশ লুপ্ত ক'রে দিয়ে শেষ অবশিষ্ট ডোডো পাখি
হতে গিয়ে পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি শুনি,
না কি ডোডোমির অতল ক্রেংকার।

প্রেম অপ্রেমের কবিতা

নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে;
অগ্নিপরীক্ষার মতো কেবলি সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সে-সব।
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের একতিল বেশি অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন করেছে প্রত্যক্ষ অনুভব।
পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হ'য়ে আছে;
অপরিচিতের মতো সমাজ সংসার শত্রু সবি
পরিচিত বুনোনির মতো তবু হৃদয়ের কাছে
ক্রমশই মনে হয় নিজ সজীবতা নিয়ে চমৎকার;
আবর্তিত হ'যে যায় দানবের মায়াবলে তবুও সে সব।
তোমার মৃত্যুর পরে মনিবের একতিল বেশি অধিকার
দীর্ঘ কালকেতু তুলে বাধা দিতে চেয়েছে বাসভ।

...

তোমাব প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চ'লে গেলে কবে।
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে
মাঝে-মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে উঠেছে হৃদয।
না হলে নিরুৎসাহিত হ'তে হয়।
জীবনের, মরণের, হেমন্তের এ-রকম আশ্চর্য নিয়ম;
ছায়া হ'যে গেছো ব'লে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম।

...

শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়—যদি কেউ চায;
সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চ'লে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।
তারপর অনুভব ক'রে গেছে রমণীর ছায়া বা শরীর
অথবা হৃদয,—
বেড়ালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে;
প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মতো নয়।

...

তোমার সংকল্প থেকে খ'সে গিয়ে ঢের দূরে চলে গেলে তুমি:
হলেও বা হ'যে যেতো এ জীবন: দিনরাত্রির মতো মরুভূমি;—
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা;
জীবনেও নেই কো অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর র'য়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন;
সকলের কাছ থেকে সুস্থির মনের ভাবে নিয়ে আসে ঋণ,
কাউকে দেয় না কিছু এমনই কঠিন;
সরল সে নয়, তবু ভয়াবহভাবে শাদা, সাধারণ কথা
জনমানুষীর কাছে ব'লে যায়—এমনই নিয়ত সফলতা।

মনোকণিকা

ও.কে.

একটি বিপ্লবী তার সোনা রুপো ভালোবেসেছিল;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিল পরবর্তী জীবনের লোভে;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিল;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।

বুকের উপরে হাত রেখে দিয়ে তারা
নিজেদের কাজ ক'রে গিয়েছিল সব।
অবশেষে তারা আজ মাটির ভিতরে
অপরের নিয়মে নীরব।

মাটির অন্থিক গতি সে নিয়ম নয়;
সূর্য তার স্বাভাবিক চোখে
সে নিয়ম নয়—কেউ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়;
সব দিক ও. কে.।

সাবলীল

আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না—তবু—
দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথাব উপবে।
আমবা দণ্ডিত হ'য়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
মহাপুরুষেব উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।

মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হ'লে—
(এ-রকম উত্তেজিত হয়;)
উপস্থাপযিতার মতন
আমাদেব চায়ের সময়

এসে প'ড়ে আমাদের স্থির হ'তে বলে।
সকলেই স্নিগ্ধ হ'য়ে আত্মকর্মক্ষম;
এক পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা কেটে ফেলে
চেয়ে দেখে স্তূপাকারে কেটেছে বেশম।

এক পৃথিবীর মতো বর্ণময় রেশমের স্তূপ কেটে ফেলে
পুনরায় চেয়ে দেখে এসে গেছে অপরাহ্ণকাল:
প্রতিটি রেশম থেকে সীতা তার অগ্নিপরীক্ষায়—
অথবা খৃষ্টের রক্ত করবীফুলের মতো লাল।
মানুষ সর্বদা যদি

মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিত—
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিল ভুলে),
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিত,
পরচুলা এঁটে নিত স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ সব কাজ ক'রে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হত, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হ'তো কে নিজের মুখের রগড়ে।

চার্বাক প্রভৃতি—

'কেউ দূরে নেপথ্যেব থেকে, মনে হয়,
মানুষেব বৈশিষ্ট্যের উত্থান-পতন
একটি পাখির জন্ম—কীচকের জন্মমৃত্যু সব
বিচারসাপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ কবে।'

'তবু এই অনুভূতি আমাদের মর্ত্যজীবনেব
কিংবা মরণের কোনো মূলসূত্র নয়।
তবুও শৃঙ্খলা ভালোবাসি ব'লে হেঁয়ালি ঘনালে
মৃত্তিকার অন্ধ সত্যে অবিশ্বাস হয়।'

ব'লে গেল বায়ুলোকে নাগার্জুন, কৌটিল্য, কপিল,
চার্বাক প্রভৃতি নিরীশ্বর:
অথবা তা এডিথ, মলিনা নাম্নী অগণন নার্সেব ভাষা—
অবিরাম যুদ্ধ আব বাণিজ্যের বায়ুব ভিতব।

সমুদ্রতীরে

পৃথিবীতে তামাশার সুব ক্রমে পরিচ্ছন্ন হ'যে
জন্ম নেবে এক দিন। আমোদ গভীর হলে সব
বিভিন্ন মানুষ মিলেমিশে গিযে যে-কোনো আকাশে
মনে হবে পরস্পরেব প্রিযপ্রতিষ্ঠ মানব।

এই সব বোধ হয আজ এই ভোবের আলোব পথে এসে
জুহুব সমুদ্রপারে, অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে।
এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাক, ধর্ম মরেছে:
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিবে।

সুবিনয় মুস্তফী

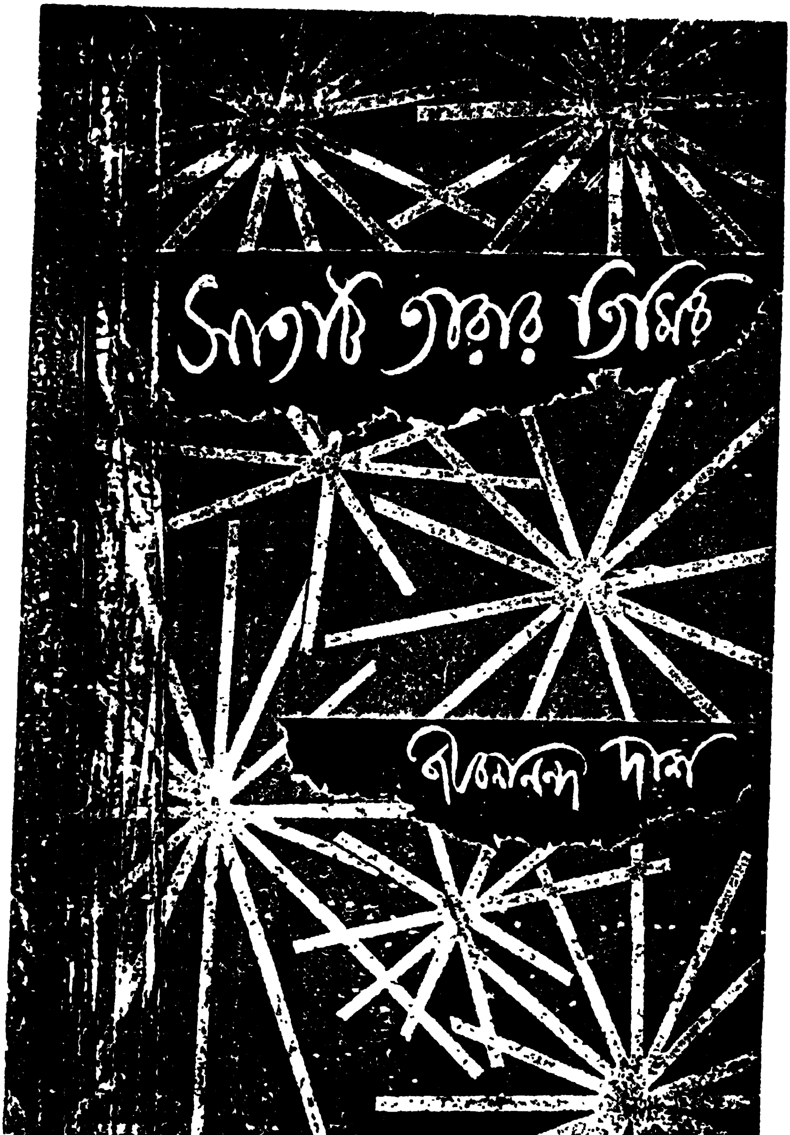
সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।
এক সাথে বেড়াল ও বেড়ালের-মুখে-ধরা ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদশী যুবার।

ইঁদুরকে খেতে খেতে শাদা বেড়ালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হ'তে হ'তে সেই ভারিক্কে ইঁদুর:
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তারা দুই জনে কতখানি দূর
ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচকা মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছুদিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা ক'রে দিতে যেত—মাটির দরের মতো রেটে;
তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেত ব'লে বেড়ালের পেটে
ইঁদুর 'হুর্‌রে' বলে হেসে খুন হত সেই খিল কেটে কেটে।

অনুপম ত্রিবেদী

এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
যদিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড়ো গোল পেটের ভিতরে
সশরীরে; টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা
এক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয় মানুষের কথা
হৃদয়ে জাগায়ে যায়;টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়
যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ নিজ চিন্তাব বিষয
পরিশেষ ক'রে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে
এখন ঘুমায়ে আছে—তাহাদের ঘুম ভেঙে দিতে
নিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে—ওই পারে মৃত্যুর তালা
ত্রিবেদী কি খোলে নাই? তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা
ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস্: তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিল; এমন সময়
দু-পকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময
জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম;
প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হ'ল একটি টোটেম:
উটের ছবির মতো—একজন নারীব হৃদযে;
মুখে-চোখে আকৃতিতে মরীচিকা জয়ে
চলেছে সে; জড়াযেছে ঘিযের রঙের মতো শাড়ি;
ভালো ক'রে দেখে নিলে মনে হয অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
দিব্য মহিলা এক; কোথায় যে আঁচলের খুঁট;
কেবলই উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট
ঘুরে যায় স্ট্যালিন, নেহেরু, ব্লক, অথবা বাযের বোঝা ব'য়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদযে?
তা হ'লে তা প্রেম নয়; ভেবে গেল ত্রিবেদীর হৃদযের জ্ঞান।
জড় ও অজড় ডায়ালেক্‌টিক মিলে আমাদের দু-দিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিল টান।

সাতটি তারার তিমির
১৯৪৮



'সাতটি তারার তিমির' প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র, কলকাতা ১৯৪৮



'সাতটি তাবাব তিমিব প্রথম সংস্কবণেব আখ্যাচত্র, কলকাতা ১৯৪৮

হুমায়ুন কবির

বন্ধুবরেষু

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা:
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আব।

কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ;
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমাব হৃদয় আজ ঘাস;
বাতাসেব ওপাবে বাতাস—
আকাশেব ওপাবে আকাশ।

ঘোড়া

আমবা যাই নি ম'বে আজও—তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়:
মহীনেব ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নাব প্রান্তবে:
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চবে
পৃথিবীব কিমাকাব ডাইনামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় বাত্রিব হাওযায:
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে:
চাযেব পেযালা ক'টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
        কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'যে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে;
প্যাবাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
        সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদেব নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তব;

বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা:
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।

নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্র পারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের :
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর,জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি—তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

শাদা শাদা ছোটো ঘর নারকেলক্ষেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরো গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গল্পে এক দিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হল এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে ;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো এক দিন,
চারিদিকে পামগাছ—ঘোলা মদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়—উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে;
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে:
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

রিষ্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হ'য়ে
আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হ'য়ে আছে দিকে দিকে।
পাহাড়ের নীচে—তাহাদের কারু কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে-ধীরে ঘুরাতেছে ;

চাঁদের আলোর নীচে এইসব অদ্ভুত প্রহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে;—
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্ক্ষার মতো ন'ড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাইপল্লবের তলে ঝরা বিন্দু বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি
দু-এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত—স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

গোধূলিসন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা—
সেইখানে উঁচু উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—

চুপে চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়!
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নীচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো:
পুরুষ তাদের: কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে: নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নীচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা

যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোযারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

যেই সব শেয়ালেরা

সেইসব শেয়ালেরা—জন্ম জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে, বাব হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে,—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেইসব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায়:
তা হলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিত;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুব আঁধারে।

সপ্তক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে—জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া—তারপর একদিন চ'লে গেছে কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকাব শেষ হ'লে যেই স্তব জেগে ওঠে আলোর আবেগে:
সরোজিনী চ'লে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা?
হযতো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ? জ্যামিতির ভূত বলে: আমি তো জানি না।
জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :
লুপ্ত বেড়ালের মতো; শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরো হয়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
এ প্রাসাদে কারা থাকে? কেউ নেই—সোনালি আগুন চুপে জলেব শরীরে
নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে আগুন জ্ব'লে যায—দহে নাকো কিছু।

সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্ব'লে যায়—দহে নাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে একভিড় হাঁস ওই—একা ;
এখানে পেল না কিছু; করুণ পাখায়
তাই তারা চ'লে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হল মুখ দেখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়—আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারও নৌকার বাতি জ্বলে;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকি পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে;
সব কেরোসিন-অগ্নি ম'রে গেছে, জ্বলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার পর;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের পরে ছুটে সারাদিন
হয়ে গেছে এখন পাথর;
যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জ'ন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে—আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চ'লে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে—
সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে;
গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি-বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিত তবু
একটি মানুষ কাছে পেলে;
যে মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকেরা যে সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে?
হয়তো নিসর্গ এসে এক দিন ব'লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

অভিভাবিকা

তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর-একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়—

মনে হবে
অনেক প্রতীক্ষা মোরা করে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ ক'রে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষিগোলকের সাথে
আঁখিতারকার সব সমাহার এক দেখে;
তবু লঘু হাস্যে—সন্তানের জন্ম দিয়ে—
তারা আমাদের মতো হবে—সেই কথা জেনে—ভুলে গিয়ে—
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গ মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব করে গেছি—ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিত হয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথ-পথান্তরে;
তবু ওই নীলিমাকে প্রিয অভিভাবিকার মতো মনে হয়;
হাতে তার তুলাদন্ড;
শান্ত—স্থির;
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্যসমুদ্রের 'পরে অনুকূল বাতাসের প্রবোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া—
বেরিলমণিব মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।
স্থির—শুভ্র—নৈসর্গিক কথা বলিবাব অবসর।

কবিতা

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে;
তা না হ'লে সকলি হারায়ে যেত ক্ষমাহীন রক্তে—নিরুদ্দেশে।
হে আকাশ, একদিন ছিলে তুমি প্রভাতের তটিনীর;
তারপর হ'যে গেছ দূর মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।
ভোরবেলা পাখিদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের প্রাণে।
বানবী ছাগল নিয়ে যে ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে—
খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।
চামচিকা বার হয় নিরালোকে ওপারের বায়ুসন্তরণে;
প্রান্তরের অমরতা জেগে ওঠে একরাশ প্রাদেশিক ঘাসের উন্মেষে;
জীর্ণতম সমাধির ভাঙা ইঁট অসম্ভব পরগাছা ঘেঁষে
সবুজ সোনালি-চোখ ঝিঁঝি-দম্পতির ক্ষুধা করে আবিষ্কার।
একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায ডেকে নিয়ে যায
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার।
হে আকাশ হে আকাশ

একদিন ছিলে তুমি মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের মতো;
তারপর হয়ে গেছ প্রভাতের নদীটির মতো প্রতিভার।

মনোসরণি

মনে হয় সমাবৃত হয়ে আছি কোন্ এক অন্ধকার ঘরে;—
দেয়ালের কর্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে:
এইসব মানুষেরা নিশ্চযতা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে;
পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপসে।

হযতো চেঙ্গিস আজও বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে।
বহু উপদেশ দিয়ে চলে গেলে কনফুশিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইট সব ক'রে ফেলে ফাঁস।

বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে—ন'ড়ে চলে ধীরে।
সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হল রক্তে—উপেক্ষায়;
বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজও আসে।
সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,
মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাসার প্রগল্ভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে
তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে সারস-দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে—হয়তো বা
ফেলেছিল সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে,
যে বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,
যে বনানী সুর পায়—

আর যারা মানবিক ভিত্তি গ'ড়ে—ভেঙে গেল বারবার—
হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে ভুল ক'রে—বধ ক'রে—প্রেমে—
সূর্যের স্ফটিক আলো স্তিমিত হবার আগে সৃষ্টির পারে
সেই সব বীজ আজও জন্ম পায় মৃত্তিকা অঙ্গারে।
পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশ-রেখায—তবে—এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হ'তে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক:
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরো—ওই দিকে—সৈকতের পিছে

বন্দরের কোলাহল—পাম সারি—তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে;
গোধূম-ক্ষেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয়;
তবু তারপরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়—

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে; নিরন্তব দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়—চেয়ে দেখে—কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু ?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুরবেলায়;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে প'ড়ে অমাযিক সংকেতের মতো;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদযে পাবাব

প্রয়োজন র'য়ে গেছে—যত দিন স্ফটিক পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায রাঙা রৌদ্রে; এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যত দিন; ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয়:
উজ্জ্বল সময-ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয।

রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিযে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয জল;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হযতো বা গিযেছিল ফেঁসে।
এখন দুপুব রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভযাবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শা ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মাযাবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিযার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেযালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে

ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক কটি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'ল মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিল মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে;
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরী মিলে গিয়ে
গোল হ'য়ে ব'সে গেল তিন মগ চায়ে;
একটি উজির, রাজা, বাকিটি কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিল বাৎলায়ে।
তবু এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেযাইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলেমিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে

জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার ক'রে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে ব'সে;
মাথা নেড়ে দুঃখ ক'রে বলে গেল: 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কী হ'তো জাঁহাবাজ?
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।'

ব'লে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিল এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নীকে।
এ-মেয়েটি হাঁস ছিল এক দিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিল তাকে আবেক গেলাস:
আমাদের সোনা রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?

এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়;
নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেন্টিক্ স্ট্রিটে
তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়;
চুলের এঁটিলি মেরে গুনে গেল অন্যায় ন্যায়;
কোথায় ব্যয়িত হয়—কারা করে ব্যয়:
কী কী দেয়া-থোয়া হয়—কারা কাকে দেয়;

কী ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে করে গেল ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দেখে—যতদিন মুখ দেখা চলে।

হাঁস

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে;
তিনবার তিন গুনে নয় হয় পৃথিবীর পথে;
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মতো জাদুবলে।

সে নদীর জল খুব গভীর—গভীর;
সেইখানে শাদা মেঘ—লঘু মেঘ এসে
দিনমানে আরো নীচে ডুবে গিয়ে তবু

যেতে পারে নাকো কোনো সময়ের শেষে।

চারি দিকে উঁচু উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা;
অনেক সময় ধ'রে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন-হয়ে গেছে যে সময়ে নীলাকাশ ব'লে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল

মিশে গেছে অপরাহ্ণে রোদের ঝিলিকে;
অথবা ঝাঁপির থেকে অমেয় খইয়ের রঙ ঝরে;
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হয়ে যায় সব;
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে।

উন্মেষ

কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে—
দাঁড়ায়ে রয়েছে আজও সাবেককালের এক স্তিমিত প্রাসাদ;
দেয়ালে একটি ছবি: বিচারসাপেক্ষভাবে নৃসিংহ উঠেছে;
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হ'য়ে যাবে অচিরাৎ।

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ— অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ ক'রে
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে।
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চ'ড়ে।

স্বাক্ষরের অক্ষরের অমেয় স্তূপের নীচে ব'সে থেকে যুগ
কোথাও সংগতি তবু পায় নাকো তার ;
ভারে কাটে—তথাপিও ধারে কাটে ব'লে
সমস্ত সমস্যা কেটে দেয় তরবার।

※

চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে;
যে দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া;
অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতন
উদীচীর দিকে ভেসে যাই;
হনলুলু সাগরের জল,
ম্যানিলা—হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চলে যায়—
দূরতর দেশে।

কী এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি;
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে
মৃদু মর্মরিত জলে মিশে গিয়ে তাকে
বোর্নিওর সাগরের শেষে—
যেখানে বোর্নিও নেই—ম্লান আলাস্কাকে
ডাকে।
যতদূর যেতে হয়
ততদূর অবাচীর অন্ধকারে গিয়ে
তিমির-শিকারী এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারিয়ে;
তিমির-পিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি;
কোথায় রয়েছি—
জীব হ'য়ে কবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
এই তো জীবন:
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে;
নিপট আঁধার;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।
সবই আজও প্রতিশ্রুতি, তাই
দোষ হ'য়ে সব
হ'য়ে গেছে গুণ।
বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির বেবুন।

চক্ষুস্থির

ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ,—চিরকাল; আমার হৃদয়ে
পৃথিবীর দণ্ডীদের মতো পরিমিত ভাষা নেই।
রাত্রিবেলা বহুক্ষণ মোমের আলোর দিকে চেয়ে,
তারপর ভোরবেলা যদি আমি হাত পেতে দিই
সূর্যের আলোর দিকে,—তবুও আমার সেই একটি ভাবনা
অতীব সহজ ভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে
হৃদয়ঙ্গম করে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতারা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস;
উত্তেজিত না হয়েই অনায়াসে ব'লে যায় তারা:
হেমন্তের ক্ষেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিল,
অথবা কোথায় কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া।
রক্তাতিপাতের দেশে ব'সেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়

দেখে যাই সোনালি ফসল, হ্রদ, সিঙাড়ার ছবি;
আমার প্রেমিক সেই জলের কিনারে ঘাসে—দক্ষ প্রজাপতি;
মানুষ-ও-ছাগমুণ্ড কেটে তাকে শুদ্ধ ক'রে দিয়ে যাবে অনাগত সবই,
একদিন হয়তো বা,—আজ সব উত্তমর্ণ দেবতাকে আমার হৃদয়
যে সব পবিত্র মদ দিয়েছিল—যে সব মদির
আলোর রঙের মতো ম্লান মদ দিয়ে গিয়েছিল,—
যখনি চুনুক দিই হ'য়ে থাকি চর্মচক্ষুস্থির!

ক্ষেতে প্রান্তরে

১

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
অবশেষে এক দিন দেখেছে দু-তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা ক্ষেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ন এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লণ্ডনের জন্ম, মৃত্যু হ'লে—
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন ব'লে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এল তার কামিনীর কাছে;—
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে পড়ে আছে।

২

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে;
একটি কৃষক শুধু ক্ষেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ ক'রে গেছে;
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হ'য়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে;
এ দিকের দিনমান—এ-যুগের মতো
শেষ হ'য়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

৩

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;

সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল ক্ষেতে;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমাযে রয়েছে।
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে নিরুৎকীর্ণ মাঠে
প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ।

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'যে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায় নি কোনো ত্রাণ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল খড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই-তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয়;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চলে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?
চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিযে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ
চিনে চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হয়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

বিভিন্ন কোরাস

১

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদযকে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;
এ-রকম একদিন মনে হযেছিল—

অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ;
আমাদের উঁচু-নিচু দেয়ালের ভিতরে খোঁড়লে
ততোধিক গুনাগার আপনার কাজ
ক'রে যায়;—ঘরের ভিতর থেকে খসে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ,নৃসিংহের আবেদন পরিপাক ক'রে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে
ফিরে আসে;—তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে এক দিন; গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি এক দিন; অন্য সব জিনিস হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন
হারায়েছে—উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি; কাজ করে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই,স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে, পাপকথা উচ্চারণ ক'রে,
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাই নি:—তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই ব'লে,
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলই যথাস্থানে
রয়ে যায়; শতাব্দীর শেষ হ'লে এ-রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে; বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে:
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে;
যতদূর চোখ যায়—অনুভব করি;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে ক'রে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।

তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,
ভীত মুখশ্রীর সাথে এ-রকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে; তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত;
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশি ব'লে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা;
তবুও বক্তৃতা শেষ হয়ে যায় বেশি করতালি শুরু হ'লে।
এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত ক্ষেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হয়ে ওঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে—রাত্রে ঘুমায
পরিচিত স্মৃতির মতন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয, নিরাশার জন্ম হয।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে;
ঈশ্বরের চেযে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হয়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছাযা ফেলে সূর্যিমামার
নাবিকেব লিবিড়োকে উদ্‌বধিত করে।

৩

ঘাসের উপব দিযে ভেসে যায় সবুজ বাতাস,
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হ'যে উঠে নদী
দেখা দেয বিকেল অবধি,
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়াযে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেযে দেখে মানুষেব দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা;
উনিশশো বেযাল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁযা, রক্ত, অন্ধ আধারের খাত বেযে;
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল;
কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—

মেঘের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ, গড়ানে;
সুবাতাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের 'পরে, নীলিমার তলে;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে?
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
মহাসাগরের জল কখনও কি সংবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিল স্থির—
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নীচে?
না হ'লে উচ্ছল সিন্ধু মিছে?
তবুও মিথ্যা নয়: সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হয়ে, পথে আলোকিত হয়ে গেলে।

স্বভাব

যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিল এক দিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
তবুও একটি নদী দেখা যেত শুধু তারপর:
কেবল একটি নারী কুয়াশা ফুরোলে
নদীর রেখার পার লক্ষ্য ক'রে চলে।
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্যাদার মতো
তার সেই মূর্তি এসে পড়ে।
সূর্যের সম্পূর্ণ বড়ো বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস।
এতদিন পরে সেইসব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ
তা হ'লে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে;
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে—
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে'
এ-রকম দু-চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হয়ে গেছে একদিন সাধারণভাবে।

প্রতীতি

বাতাবীলেবুর পাতা উড়ে যায় হাওয়ায়—প্রান্তরে—
সার্সিতে ধীরে ধীরে জলতরঙ্গের শব্দ বাজে;
একমুঠো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আস্ফোট রয়েছে;

না হ'লে কিছুই নেই লবেজান লড়ায়ে জাহাজে।
বাইরে রৌদ্রের ঋতু বছরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে;
হোক না তা; প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে অতীব প্রবীণ;
হিসেবে বিষণ্ন সত্য রয়ে গেছে তার;
এবং নির্মল ভিটামিন।
সময় উচ্ছিন্ন হ'য়ে কেটে গেলে আমাদের পুরোনো গ্রহের
জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি ক'রে ফেলে,—
জেনে নিয়ে যে যাহার স্বজনের কাজ করে না কি—
পরার্থের কথা ভেবে ভালো লেগে গেলে।
মানুষেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতার সুর পৃথিবী ঘুরায়;
মাটির তরঙ্গ তার দু-পায়ের নীচে
অধোমুখে ধ্ব'সে যায়—চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে:
এ-রকম রিপুচরিতার্থ ক'রে বেঁচে থাকা মিছে।
কোথাও নবীন আশা র'য়ে গেছে ভেবে
নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান,—
কোনো এক তনুবাত শিখরের প্রশান্তির পথে
মানুষের ভবিষ্যৎ নেই—এই জ্ঞান
পেয়ে গেছে;—চারিদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন প'ড়ে আছে,
সময় কাটায়ে গেছে মোহ ঘোচাবার
আশা নিয়ে মঞ্জুভাষা, ডোরিয়ান গ্রীস,
চীনের দেয়াল, পীঠ, পেপিরাস, কারারা-পেপার।
তাহারা মরে নি তবু—ফেনশীর্ষ সাগরের ডুবুবির মতো
চোখ বুজে অন্ধকার থেকে কথা-কাহিনীর দেশে উঠে আসে;
যত যুগ কেটে যায় চেয়ে দেখে সাগরের নীল মরুভূমি
মিশে আছে নীলিমার সীমাহীন ভ্রান্তিবিলাসে।
ক্ষতবিক্ষত জীব মর্মস্পর্শে এলে গেলে—তবুও হেঁয়ালি;
অবশেষে মানবের স্বাভাবিক সূর্যালোকে গিয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে ভেবে—উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল
'তেতাল্লিশ' পঞ্চাশের দিগন্তরে পড়েছে বিছিয়ে।
মাটির নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিল মানুষের শরীরের ধুলো:
তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হতে চায় সৎ,
ভাষা তার জ্ঞান চায়, জ্ঞান তার প্রেম—ঢের সমুদ্রের বালি
পাতালের কালি ঝেড়ে হ'য়ে পড়ে বিষণ্ন, মহৎ।

ভাষিত

আমার এ জীবনের ভোরবেলা থেকে—
সেসব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু-জনার মতো দাঁড়াবার

তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে

আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই;
একদিন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে পথ ধ'রে
ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই

দেখা গেল পথ আছে,—ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে—
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বারবার আমাকে চেনায়;
আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক।

পরিচয় নেই তার,—পরিচিত হয না কখনও;
রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে
মনে হয় সুচেতনা, তোমারও হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।

সময়ের নিরুৎসুক জিনিসের মতো—
আমার নিকট থেকে আজো বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়াযে
ডান পথ খুলে দিল ব'লে মনে হল,
যখন প্রচুরভাবে চলে গেছি বাঁযে।

এ-রকম কেন হ'যে গেল তবে সব
বুদ্ধেব মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।
একবার নির্দেশেব ভুল হ'য়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?

সমস্ত সকালবেলা এই কথা ভেবে পথ চ'লে
যখন পথের রেখা নগরীতে—দুপুরেব শেষে
আমাকে উঠায়ে দিযে মৈথুনকালেব সব সাপেদের মতো
মিলে গেল পবস্পরের কাযক্লেশে,

তাকাতেই উঁচু নিচু দেযালের অন্তরঙ্গ দেশ দেখা গেল:
কারু তরে সর্বদাই ভীত হ'য়ে আছে এক তিল:—
এ-রকম মনে হল বিদ্যুতের মতন সহসা;
সাগর—সাগর সে কি—অথবা কপিল?

এ-রকম অনুভব আমাকে ধাবণ ক'রে চুপে
স্থির ক'রে রেখে গেল পথের কিনারে;
আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হল;
আকাশকুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসাবে।

তবুও পৃথিবী নিজে অভিভূত ব'লে
ইহাদেরও নেই কোনো ত্রাণ:
সকলই মহৎ হতে চেয়ে শুধু সুবিধা হতেছে;

সকলই সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু;
আবেগ কি ক্রমেই আরেক তিল বিশোধিত হয়?
নিপ্পন ভীষণ লিপি লিখে দিল সূর্যদেবীকে;
সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।

সৃষ্টির তীরে

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে:
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে;
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর;
বিলোচন গিয়েছিল বিবাহ-ব্যাপারে:
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে;
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময়!
যুগে যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল:
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে রয়ে গেছি সবে—
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিল যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিলো স্বাভাবিকভাবে পথ দিয়ে,
কী ক'রে তা হ'লে তারা এ-রকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে?
অথবা যে-সব লোক নিজের সুনাম ভালোবেসে
দুয়ার ও পরচুলা না এঁটে জানে না কোনো লীলা,
অথবা যে সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিল: আপিলা চাপিলা;
—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেডবাস্কেট খেল শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্তু, শত্রুর খোঁজে
সাত পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে;
অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিল ব'লে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হয়ে ওঠে কী যে উচাটন!—
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন:

তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।
ঘরের ভিতর কেউ খোয়ারি ভাঙছে ব'লে কপাটের জং
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসায়ে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমেই অধিক ফিকে হ'য়ে আসে, নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে;
অথবা তা ছায়া নয়—জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি;
গর্গ্যার ছবির মতো—তবুও গর্গ্যার চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে টায়ে;
নিভে যায়—জ্বলে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।
স্বাতীতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে-মানুষ নরক বা মর্ত্যে বাহাল
হ'তে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিভে যায় কন্যা মীন মিথুনের কলে!

জুহু

সান্টা ক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্নে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিল সূর্যের নিকট থেকে সোমেন পালিত;
বাংলার থেকে এত দূরে এসে—সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিল বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল বাতাস খাবে সারাদিন; সেইখানে দিন গিয়ে বৎসরে গড়ায়—
বছর আয়ুর দিকে—নিকেল-ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায়—সেখানে শরীর তার নটকান-রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াশ খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের 'টাইমস'টাকে বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অরুণিমা ঢেলে,
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌দের! পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দেখা দিল। ঢেউ নয়, বালি নয়, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু—
সেই বলবোলে তিন-চার ধনু দূরে দূরে এয়ারোড্রোমের কলরব
লক্ষ্য পেল অচিরেই—কৌতূহলে হৃষ্ট সব সুর
দাঁড়ালো তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর:
সকলেরই ঝিঁক চোখে—কাঁধের উপরে মাথা-পিছু
কোথাও দ্বিরুক্তি নেই মাথার ব্যথার কথা ভেবে।
নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়্গের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে ক'রে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই, সকলকে সম্বোধন ক'রে!
কখন সে বজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে

অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রেছিল!
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদুইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি—সান্টা ক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর? যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে
ব'সে আছে; মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল, মহিলারা মর্মরের স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব: মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

সোনালি সিংহের গল্প

আমাদের পরিজন নিজেদের চিনেছিল না কি?
এই সেই সংকল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ ক'রে ফেলে চায়ের ভিতরে;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।
আমাদের উত্তমর্ণদের কাছে প্রতিজ্ঞার শর্ত চেয়ে তবু
তাহাদের খুঁজে পাই ছিমছাম,—কনুয়ের ভরে
বসে আছে প্রদেশের দূর বিসারিত সব ক্ষমতার লোভে।
কোথায় প্রেমিক তুমি: দীপ্তির ভিতরে!
কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আধারে।
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে-কোনো রাজার কাছে উৎসাহিত নাগরের তরে;
যে-কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে;
পৃথিবীর বারগৃহ ধ'রে তারা উঠে যেতে চায়।
নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমাদের ক্ষেতে-ভূঁয়ে অবিরাম হতমান সোনা
ফ'লে আছে বলে মনে হয়;
আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে সব ধানের আন্তরিক পরিচয়
নেই; তবু এই সব ফসলের দেশে
সূর্য নিরন্তর হিরণ্ময়;
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,
আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,
আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,
আমাদের গড়পড়তার সব পড়তি কৌতুক
তাহারা বেহাত ক'রে ফেলে সব।

রাজপথে থেকে থেকে মূঢ় নিঃশব্দতা
বেড়ে ওঠে; অকারণে এর ওর মৃত্যু হয়ে গেলে—
অনুভব ক'রে তবু বলবার মতো কোনো কথা
নেই। বিকেলে গা ঘেঁষে সব নিরুত্তেজ সরজমিনে ব'সে
বেহেড আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির লোকসানে।
তবুও ভোরের বেলা বারবার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে—
যদি না সূর্যাস্তে ফের হ'য়ে যায় সোনালি হেঁয়ালি।

অনুসূর্যের গান

কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
আমাদের ডাকে।
পিছে পিছে ঢের লোক আসে।
আমরা সবের সাথে ভিড়ে চাপা প'ড়ে—তবু—
বেঁচে নিতে গিয়ে
জেনে বা না-জেনে ঢের জনতাকে পিষে—ভিড় ক'রে,
করুণার ছোটো বড়ো উপকণ্ঠে—সাহসিক নগরে বন্দরে
সর্বদাই কোনো এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চলেছি।
সে সমুদ্র—
জীবন বা মরণের;
হয়তো বা আশার দহনে উদ্‌বেল।
যারা বড়ো, মহীয়ান—কোনো এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হয়ে চ'লে গেছে;
একদিন নচিকেতা বলে মনে হত তাহাদের;
একদিন আত্তিলার মতো তবু;
আজ তারা জনতার মতো।
জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির করে দিতে গিয়ে তবু
সময়ের অনিবার উদ্ভাবনা এসে
যে সব শিশুকে যুবা— প্রবীণ করেছে তারপর,
তাদের চোখের আলো
অনাদির উত্তরাধিকার থেকে, নিরবচ্ছিন্ন কাজ ক'রে
তাদের প্রায়ান্ধ চোখে আজ রাতে লেন্‌স্,
চেয়ে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চক্ষের ফসফোরেসেন্‌স্।
তাদের সম্মুখে আলো
দীনাত্মা তারার
জ্যোৎস্নার মতন।

জীবনের শুভ অর্থ ভালো করে জীবনধারণ
অনুভব ক'রে তবু তাহাদের কেউ কেউ আজ রাতে যদি
ওই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হয়ে যাবে মনে ভেবে—
স্মরণীয় অঙ্কে কথা ব'লে,
তা হলে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ?
আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ:

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিল।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
এক দিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজও খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্রসাধারণ
চেয়ে দেখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে;

ওরা সব ওই পথে—তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই—তবু এই জের টেনে খেলি;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

বিস্ময়

কোথাও নতুন দিন রয়ে গেছে না কি?
উঠে ব'সে সকলের সাথে কথা ব'লে
সমিতির কোলাহলে মিশে
তবুও হিসেব দিতে হয় এসে কোনো এক স্থানে:
—সেখানে উটের পিঠে সার্থবাহ দিগন্তরে মিলিয়ে গিয়েছে;
সাইরেনের কথা স্থির;
আর শেষ সাগরে জাহাজডুবি সংবাদ মিটেছে;
বন্দরের অধিকারীদের হাল, কৃচ্ছ্র, আলোড়ন,
মানুষের মরণের ভয়ের ক্ষয়ের জন্যে মানুষের সর্বস্বসাধন
হতে চায়,—হয়তো বা হয়ে গেছে সার্বজনীন কল্যাণ।

জানি এ-রকম দিন আজও আসে নি যে;
এ-রকম যুগ ঢের—হয়তো বা আরো ঢের দূরের জিনিস।
আজ, এই ভূমিকায় মুহূর্তের বিস্মৃতির, স্মৃতির ভিতরে
সারাদিন সকলের সাথে ব্যবহৃত হ'য়ে চলি,
জিতে হেরে লুকায়ে সন্ধান ভুলে; নিরুদ্দিষ্ট ভয়
খামিরের মতো এসে আমাদের সবের হৃদয়
অধিকার ক'রে রাখে।
চারি দিকে সরবরাহের সুর সারাদিনমান
কী চাহিদা কাদের মেটায়।
মানুষের জন্যে মানুষের সব সম্ভ্রমের ছায়া,ভাঙাগড়া, ভালোবাসা
এতদিন পরে এই অন্ধ পরিণতির মতন
হয়ে গিয়ে তবুও কঠিন ক্রান্তি না কি?
কোলাহলে ভিড়ে গেছে জনসাধারণ;
জীবনের রক্তের বিনিময়ে ফাঁকি

প্রাণ ভ'রে তুলে নিয়ে পরস্পরের দাবি হিংসা প্রেম উর্ণাকঙ্কালে মিলে গিয়ে
তবুও যে যার নিজ অন্ধ কাঠামোর কাছে ঠেকে—অহরহ—
সময়ের অনাবিষ্কৃত অন্তরীপ।

মনে হয় কোনো-এক সমুদ্রের মাইলের—মাইলের দূর দিগন্তর
উদ্‌বেল, নিরপরাধভাবে
জীবনের মতো নীল হয়ে তবু—মৃত্যুর মতন প্রভাবে।
অন্ধকার ঝড় থেকে অঙ্কে অগণন মেরুপাহাড়ের পাখি
সে তার নিজের বুকে টেনে নিয়ে—
ওই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়েছিল না কি?
সনাতন সত্যে অন্ধ হয়ে তবু—মিথ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে
পাখিদের ডেকে নিয়ে উড়ায়ে দিতেছে;
মৃত্তিকার মর্মে ম্লান অম্লান উপকূলে হয়তো বা— আর একবার তবু ওড়াবার মতো;
মরণ বা প্রলোভন উপচায়ে—জীবনের নির্দেশবশত।

সৌরকরোজ্জ্বল

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ;
যে-কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
তাদের সমাজ।
তবুও তাদের ধারা—ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—
কিংবা এ সব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে—ফসল ফলায়ে—তবু যুগে যুগে উড়ায়ে গিয়েছে পঙ্গপাল।
কাল তবু—হয়তো আগামী কাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে; তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

সূর্যতামসী

কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর;
কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে—তবে।
অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে—অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে;
এ কোন্ সিন্ধুর সুর:
মরণের—জীবনের?
এ কি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।

একটি রাত্রির ব্যথা সয়ে—
সময় কি অবশেষে এ-রকম ভোরবেলা হয়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে করে জেগে ওঠে?
কোথাও ডানার শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর—
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।
সৃজনের ভয়াবহ মানে—
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধু-পাখিদের শব্দ শুনি;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রিকবোজ্জ্বল
ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ—তুমি?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, ওই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি!
বিলীন হয না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শিন্;
অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষেব ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে—যা শেখে নি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্ব'লে
জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তিব কলরোলে।

রাত্রির কোরাস

এখন সে কত রাত;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগবীর গুঞ্জরন হ'তে
ঘুমের ভিতবে গিযে ছুটি চায়।
পরস্পরেব পাশে নগরীর ঘ্রাণেব মতন
নগরী ছড়াযে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুব নামান্তর।
অনেকেবই ঘুম
জেগে থাকা।
নগরীর রাত্রি কোনো হৃদযের প্রেযসীর মতো হ'তে গিযে
নটীরও মতন তবু নয়—
প্রেম নেই—প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপব থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস রয়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কন্‌ভয়—

মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।
সূর্য অনেক দিন জ্ব'লে গেছে মিশরের মতো নীলিমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুরুবর্ষের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হ'তে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্যামী যাত্রীদের মতো
জীবনের মানে বার ক'রে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হয়ে আরো চেতনার ব্যথায় চলেছে।
মাঝে মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হল তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।
হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলই ভেঙে যায়
স্প্লিন্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইয়াঙ্কীর লেনদেন ডলারের প্রতাপ;—
এই সব মৃত হাত তবে
নব নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি?—
ভোর কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই—নেই—
অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও দিৎসা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

নাবিকী

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়;
মাঠের ফসলগুলো বার বার ঘরে
তোলা হ'তে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে।
মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিভা;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক;
কিছু নেই—তবুও অপেক্ষাতুর;
হৃদয়স্পন্দন আছে—তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর;

পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায়;
কী যে চায়।
যেন কেউ দেখেছিল খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে,
যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,
আর তাদের মতো নরনারী যতবার
তেমন জীবন চেয়েছিল,
যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,
নদীর ও নগরীর
মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্ব'লে গেছে—তার
ঋণ শোধ ক'রে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।
মানবের অভিজ্ঞতা এ-রকম।
অভিজ্ঞতা বেশি ভালো হ'লে তবু ভয়
পেতে হত?
মৃত্যু তবে ব্যসনের মতো মনে হত?
এখন ব্যসন কিছু নেই।
সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন
ভালো ভালো নাবিক ও জাহাজের দিগন্তর খুঁজে
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূর মতো
পরস্পরকে বলে, 'হে নাবিক, হে নাবিক তুমি—
সমুদ্র এমন সাধু, নীল হয়ে—তবুও মহান মরুভূমি;
আমরাও কেউ নই—'
তাহাদের শ্রেণী যোনি ঋণ রক্ত রিরংসা ও ফাঁকি
উঁচু-নিচু নরনারী নিরুদ্দিষ্টনিরপেক্ষ হয়ে আজ
মানবের সমাজের মতন একাকী
নিবিড় নাবিক হলে ভালো হয়;
হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি।

সময়ের কাছে

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেই সব এক দিন হয়তো বা কোনো এক সমুদ্রের পারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড়কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা ক'রে যায় চিরদিন;
নীলিমার থেকে ঢের দূরে স'রে গিয়ে,
সূর্যের আলোর থেকে অন্তর্হিত হয়ে:
পেপিরাসে—সেদিন প্রিন্টিং প্রেসে কিছু নেই আর;

প্রাচীন চীনের শেষে নবতম শতাব্দীর চীন
সেদিন হারিয়ে গেছে।

আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল;
আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল;
আর নব—
নব নব মানবের তরে
কেবলই অপেক্ষাতুর হ'য়ে পথ চিনে নেওয়া—
চিনে নিতে চাওয়া;
আর সে-চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা;
(কেন এই ক্ষুধা—
কেনই সমাপ্তিহীন!)
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল;
আমি এই সব।

সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ
কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা
জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে—ভাবে।
ভেবে নিক—যৌবনের জীবন্ত প্রতীক: তার জয়!
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হয়ে কোন্ আলোকের পাখিকে দেখেছে?—
জয়, তার জয়, যুগে যুগে তার জয়!
ডোডো পাখি নয়।

মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।

হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলই গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে:
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?

নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!
সেই সব সুনিবিড় উদ্‌বধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;—
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়!

লোকসামান্য

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিল তারা
জীবনের সাগরে সাগরে:
বঙ্গোপসাগরে,
চীনের সমুদ্রে—দ্বীপপুঞ্জেব সাগরে।
নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের 'পরে সূর্য এঁকে
চোখ মেরেছিল তারা নীলিমার সূর্যের দিকে।
তারা সব আজ রাতে বিলোড়িত জাহাজের খোল
সাগরকীটের মৃত শরীরের আলেয়ার মতো
সময়েব দোলা খেয়ে নড়ে;
এশিয়া কি এশিয়াবাসীর
কোপ্রস্‌পেরিটির
সূর্যদেবীর নিজ প্রতীতির তরে?
ব'লে সে পুরোনো যুগ শেষ হ'য়ে যায়।
কোথাও নতুন দিন আসে;
কে জানে সেখানে সৎ নবীনতা বয়ে গেছে কিনা;
সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে
বহুকাল কেটে গেছে বহুতব শ্লোগানের পাপে।
এ-রকম ইতিহাসে উৎস রক্ত হয়ে
এই নব উত্তরাধিকারে
স্বর্গতি না হোক—তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি?
ভাবনা ব্যাহত হ'য়ে বেড়ে যায়—স্থিব হয় না কি?
হে সাগর সময়ের,
হে মানুষ,—সময়ের সাগরেব নিবঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী
হলেও সে হত, তবু পৃথিবীর বড়ো রৌদ্রে—আরো প্রিযতর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।

জনান্তিকে

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
আজও এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছ।

কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখির মতন কোনো হৃদয়ের তরে।
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল ব'লে
আজ তার মানবকে কী ক'রে চেনাতে পাবে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনেব দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলই আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়;
এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।
যে মানুষ—যেই দেশ টিকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়—বাজ্য গড়ে—সাম্রাজ্যেব মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায
গ'ড়ে ওঠে ।
এ ছাড়া অমল কোনো বাজনীতি পেতে হ'লে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চ'লে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজও এই শতাব্দীব তরে নয়।
সকলের তরে নয়।
পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে;
ঝ'রে পড়ে।
এই সব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হ'তে হয়।
নব প্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনও ভোরেব জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরো এক আভা:
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
হয়ে তুমি র'য়ে গেছ।

তোমার মাথার চুলে কেবলই রাত্রিব মতো চুল
তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল
রাতেব মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে
ধ'রে আছে।
তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক
রাত্রি নেই। আমাদেব প্রাণে এক তিল

বেশি রাত্রির মতো আমাদের মানবজীবন
প্রচারিত হ'য়ে গেছে ব'লে—
নারি,
সেই এক তিল কম
আর্ত রাত্রি তুমি।

শুধু অন্তহীন ঢল, মানব-খচিত সাঁকো, শুধু অমানব নদীদের
অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে;
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
র'য়ে গেছে।

নিজের নুড়ির 'পরে সারাদিন নদী
সূর্যের—সুরের বীথি, তবু
নিমেষে উপল নেই—জলও কোন্ অতীতে মরেছে;
তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী;
জানি আমি জানি আদিনারীশারীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি;
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বকুলের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে গ্লেশিয়ারে জলে
অসতী না হ'য়ে তবু স্মরণীর অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন ক'রে কোথায় নভের দিকে চলে।

মকরসংক্রান্তির রাতে

আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন

কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড়ো বিষয়ের হাতে
সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কী এক গভীর সুসময়!
মকরক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন:
—তবুও তা পৃথিবীর নয়;
এখন গভীর রাত, হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

শতাব্দীর যে-কোনো নটীর ঘরে
নীলিমার থেকে কিছু নীচে

বিশুদ্ধ মুহূর্ত তার মানুষীর ঘুমের মতন;
ঘুম ভালো—মানুষ সে নিজে
ঘুমাবার মতন হৃদয়
হারিয়ে ফেলেছে তবু।
অবরুদ্ধ নগরী কি? বিচূর্ণ কি? বিজয়ী কি? এখন সময়
অনেক বিচিত্র রাত মানুষের ইতিহাসে শেষ ক'রে তবু
রাতের স্বাদের মতো সপ্রতিভ বলে মনে হয়।
মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম, বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিল মনে পড়ে।
মকরক্রান্তির রাতে গভীর বাতাস।
আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ মুখ চেনাবার
মতন একান্ত ব্যাপ্ত আকাশকে পেয়ে গেছে আজ।
তেমনই জীবনপথে চ'লে যেতে হলে তবে আর
দ্বিধা নেই— পৃথিবী ভঙ্গুর হয়ে নীচে রক্তে নিভে যেতে চায়;
পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে
নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লণ্ডন
দিল্লি কলকাতার নক্‌টার্নে
অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে: গর্ভাঙ্কে তবুও লপ্ত হয়ে যাবে না কি!—
সূর্যে, আরো নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।

উত্তরপ্রবেশ

পুরোনো সময় সুর ঢের কেটে গেল।
যদি বলা যেত:
সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,
সোনার বলের মতো সূর্য ছিল পুবের আকাশে—
সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেনশীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।
পুরোনো বছর দেশ ঢের কেটে গেল
রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে;
পুকুরের জল থেকে কিশোরের মতো তৃপ্ত হাতে
ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে;
চোখের পলকে তবু যুবকের মতো
মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে
কোনো এক সূর্যের জগতে
চোখের নিমেষ পড়েছিল।

সেইখানে সূর্য তবু অস্ত যায়।
পুনরুদয়ের ভোরে আসে
মানুষের হৃদয়ের অগোচর

গম্বুজের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই;
বসন্তের অন্য সাড়া নেই।
প্লেন আছে:
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়োরোড্রোম
রয়ে গেছে।
চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড়—
হলেও বা হয়ে যেত পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর;

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময়;
সেইখানে মৃত্যু তবু;
এই শুধু—
এই;
চাঁদ আসে একলাটি;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায়;
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের—রক্তের উপরে আকাশে।
এছাড়া পাখির কোনো সুর—
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থাকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

দীপ্তি

তোমার নিকট থেকে
যত দূর দেশে
আমি চলে যাই

তত ভালো।
সময় কেবলই নিজ নিয়মের মতো—তবু কেউ
সময়স্রোতের 'পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায়;
ভেঙে যায়;
যত ভাঙে তত ভালো।
যত স্রোত ব'য়ে যায়
সময়ের
সমযের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নীপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
তুমি তত বহে যাও,
আমি তত বহে চলি,
তবুও কেহই কারু নয়।
আমার জীবন তবু।

তোমার জীবন নিয়ে তুমি
সূর্যের রশ্মির মতো অগণন চুলে
রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙ
খরতর নদী হয়ে গেলে
হয়ে যেতে।
তবুও মানুষী হয়ে
পুরুষের সন্ধান পেয়েছ;
পুরুষের চেযে বড়ো জীবনের হযতো বা।

আমিও জীবন তবু;—
কৃচিৎ তোমার কথা ভেবে
তোমার সে শরীরের থেকে ঢের দূরে চলে গিযে
কোথাও বিকেলবেলা নগরীর উৎসাবণে উচল সিঁড়ির
উপরে রৌদ্রের রঙ জ্ব'লে ওঠে—দেখে
বুদ্ধের চেযেও আরো দীন সুষমায সুজাতার
মৃত বৎসকে বাঁচাযেছে
কেউ যেন;
মনে হয়,
দেখা যায।

কেউ নেই—স্তব্ধতায; তবুও হৃদয়ে দীপ্তি আছে।

দিন শেষ হযনি এখনও।
জীবনের দিন—কাজ—
শেষ হতে আজও ঢের দেরি।
অন্ন নেই। হৃদয়বিহীনভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।
রক্তের সমুদ্র চারি দিকে;

কলকাতা থেকে দূর
গ্রীসের অলিভ বন

অন্ধকার।

অগণন লোক মরে যায়;
এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয়—
সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয়

এ ছাড়া কোথাও কোনো পাখি
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।
তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।

সূর্যপ্রতিম

আমরণ কেবলই বিপন্ন হয়ে চলে
তারপর যে বিপদ আসে
জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস;
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।
বালুচরে নদীটির জল ঝরে,
খেলে যায় সূর্যের ঝিলিক,
মাছরাঙা ঝিকমিক করে উড়ে যায়;
মৃত্যু আর করুণার দুটো তলোয়ার আড়াআড়ি
গড়ে ভেঙে নিতে চায় এই সব সাঁকো ঘর বাড়ি;
নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।

এ-রকম হয়েছে অনেক দিন—রৌদ্রে বাতাসে;
যারা সব দেখেছিল—
যারা ভালোবেসেছিল এই সব—তারা
সময়ের সুবিধায় নিলেমে বিকিয়ে গেছে আজ।
তারা নেই।
এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোথাও সূর্যের ভোর রয়ে গেছে বলে মনে হয়।
মরণকে নয় শুধু—
মরণসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়ে
যা কিছু দেখার আছে
আমরাও দেখে গেছি;
ভুলে গেছি, স্মরণে রেখেছি।

পৃথিবীর বালি রক্ত কালিমার কাছে তারপর
আমরা খারিজ হয়ে দোটানার
অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুস্থির রেখে
গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ;
প্রেমিককে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল।
শেখাই নি?

শতাব্দী আবেশে অস্তে চলে যায়;
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ করে যায়
স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোন্‌খানে জীবনের আশ্বাস রয়েছে।

আমরা অপেক্ষাতুর;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় যোগান্‌ দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
ঠাঁই ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।

পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা করে ভেসে গেছে;
সামনের অভিভূত অন্তহীন সমুদ্রের মতন এসেছে;
লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর
ঝাপ্‌টার মতো ভেঙে বিশ্বাসহন্তার মতো কেউ
সমুদ্রের অন্ধকার পথে প'ড়ে আছে।
মৃত্যু আজীবন অগণন হল, তবু
এ রকমই হবে।

'কেবলই ব্যক্তির—ব্যক্তির মৃত্যু শেষ করে দিয়ে আজ
আমরাও মরে গেছি সব—'
দলিলে না ম'রে তবু এ রকম মৃত্যু অনুভব
ক'রে তারা হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ করে দিতে চেয়ে যতদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লানায়মান হয়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের
অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

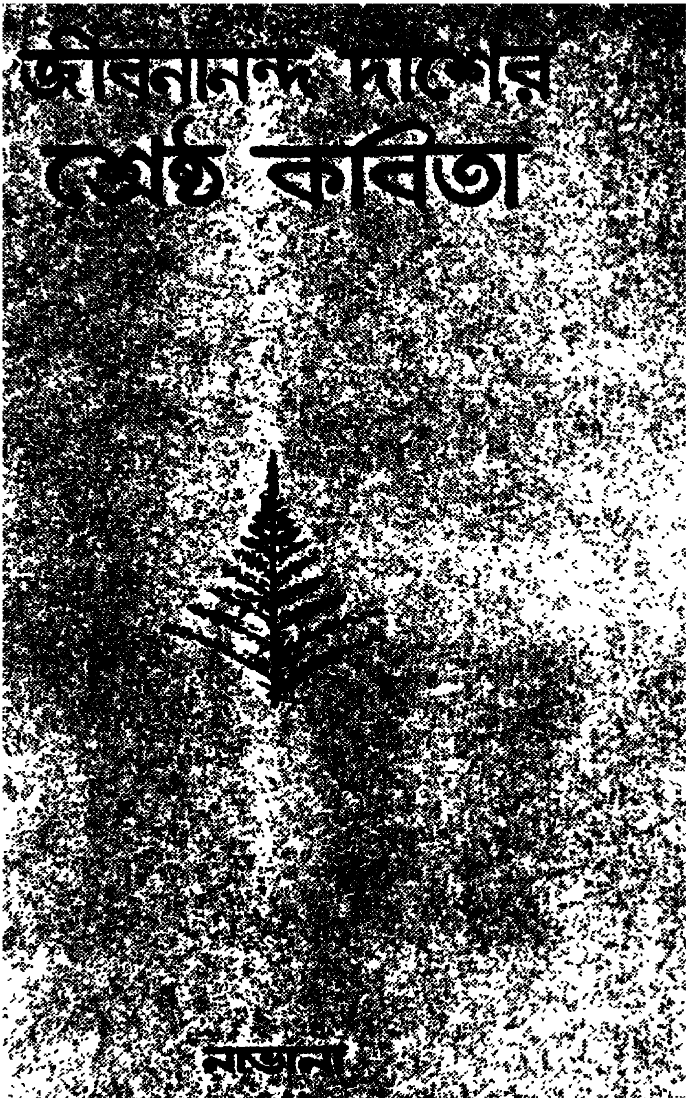
১৯৫৪

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় জীবনানন্দ সদ্য লিখিত বারোটি নতুন কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেন, তার আটটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'অনন্দা', 'স্থান থেকে', 'দিনরাত' এবং 'পৃথিবীতে এই'— এই কবিতাগুলি কোনো গ্রন্থে বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নি বলে উল্লেখ করা হয়।

— স.



'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রথম সংস্করণের ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত
প্রচ্ছদচিত্র, কলকাতা ১৯৫৪



'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, কলকাতা ১৯৫৪

কবিতা কী এ-জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম। হোমরও কবিতা লিখেছিলেন, মালার্মে র‍্যাঁবো ও রিলকেও। শেক্‌স্‌পীয়র বদ্‌লেয়র রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা রচনা করে গেছেন। কেউ কেউ কবিকে সবের ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন; কারো কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।

বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির; কবিতার সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকের কী ভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করছেন— এবং কী ভাবে তা করা উচিত সেই সব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাব্য, আমার মনে হয়, আরো স্পষ্টভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেতে পারে। কাব্য চেনবার আস্বাদ করবার ও বিচার করবার নানারকম স্বভাব ও পদ্ধতির বিচিত্র সত্যমিথ্যার পথে আধুনিক কাব্যের আধুনিক সমালোচককে প্রায়ই চলতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাব্যের মোটামুটি সত্যও অনেক সময়ই তাঁকে এড়িয়ে যায়।

আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুর রিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য— কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ তারতম্যের; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হতে হয়।

নানা দেশে অনেক দিন থেকেই কাব্যের সংগ্রহ বেরুচ্ছে। বাংলার কবিতার সঞ্চয়ন খুবই কম। নানা শতকের অক্‌স্‌ফোর্ড বুক অব ভর্সের সংকলকদের মধ্যে বড়ো কবি প্রায়ই কেউ নেই; কিন্তু সংকলনগুলো ভালো হয়েছে; ঢের পুরোনো কাব্যের বাছবিচারে বেশি সার্থকতা বেশি সহজ, নতুন কবি ও কবিতার খাঁটি বিচার বেশি কঠিন। অনেক কবির সমাবেশে একটি সংগ্রহ; একজন কবির প্রায় সমস্ত উল্লেখ্য কবিতা নিয়ে আর-এক জাতীয় সংকলন; পশ্চিমে এ ধরনের অনেক বই আছে; তাদের ভেতর কয়েকটি তাৎপর্যে— এমন-কি মাহাত্ম্যে প্রায় অক্ষুণ্ণ। আমাদের দেশে দু-একজন পূর্বজ (উনিশ-বিশ শতকের) কবির নির্বাচিত কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়েছিল; কতদূর সফল হয়েছে এখনও ঠিক বলতে পারছি না। ভালো কবিতা যাচাই করবার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদি নির্বাচন অনেক সময়ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোনো কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দেখা যায়। পাঠকদের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ স্থাপনের দিক দিয়ে এ ধরনের প্রাথমিক সংকলনের মূল্য আমাদের দেশেও লেখক পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে ক্রমেই বেশি স্বীকৃত হচ্ছে হয়তো। যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেন নি তাঁর কবিতার এ রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ কাব্যের যথেষ্ট সংগত পরিচয় পেতে পারেন; যদিও শেষ পরিচয় লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।

এই সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন, তাঁর নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রমে অনুসরণ করা হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ

কলকাতা
২০.৪.১৯৫৪

তবু

সে অনেক রাজনীতি রুগ্ন নীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে
উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছরে বয়সী আমি;
বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চলে যেতে দেখে—তবু—অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা ক'রে
এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি;
আজ ভোরে বাংলার তেরোশো চুয়ান্ন সাল এই
কোথাও নদীর জলে নিজেকে গণনা করে নিতে ভুলে গিয়ে
আগামী লোকের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়; আমি
তবুও নিজেকে রোধ করে আজ থেমে যেতে চাই
তোমার জ্যোতির কাছে; আড়াই হাজার
বছর তাহলে আজ এইখানে শেষ হয়ে গেছে।

নদীর জলের পথে মাছরাঙা ডানা বাড়াতেই
আলো ঠিকরায়ে গেছে—যারা পথে চলে যায় তাদের হৃদয়ে;
সৃষ্টির প্রথম আলোর কাছে; আহা,
অন্তিম আভার কাছে; জীবনের যতিহীন প্রগতিশীলতা
নিখিলের স্মরণীয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে; দেখ
পাখি চলে, তারা চলে, সূর্য মেঘে জ্ব'লে যায়, আমি
তবুও মধ্যম পথে দাঁড়ায়ে রয়েছি—তুমি দাঁড়াতে বলো নি।
আমাকে দেখ তুমি; দেখাবার মতো
অপব্যয়ী কল্পনার ইন্দ্রত্বের আসনে আমাকে
বসালে চকিতে হয়ে দেখে যেতে যদি—তবু, সে আসনে আমি
যুগে যুগে সাময়িক শক্রদের বসিয়েছি, নারি,
ভালোবেসে ধ্বংস হয়ে গেছে তারা সব।
এ রকম অন্তহীন পটভূমিকায়—প্রেমে—
নতুন ঈশ্বরদের বারবার লুপ্ত হতে দেখে
আমারও হৃদয় থেকে তরুণতা হারায়ে গিয়েছে;
অথচ নবীন তুমি।

নারি, তুমি সকালের জল উজ্জ্বলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো নদীকেই
বিকেলে অপর ঢেউয়ে খরশান হতে
দিতে ভুলে গিয়েছিলে; রাতের প্রখর জলে নিয়তির দিকে
বহে যেতে দিতে মনে ছিল কি তোমার?
এখনও কি মনে নেই?

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলই শিথিল হয়ে যায়; তবু তুমি
সেই শিথিলতা নও, জানি, তবু ইতিহাসরীতিপ্রতিভার

মুখোমুখি আবছায়া দেয়ালের মতো নীল আকাশের দিকে
ঊর্ধ্বে উঠে যেতে চেয়ে তুমি
আমাদের দেশে কোনো বিশ্বাসের দীর্ঘ তরু নও।

তবু
কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্বলে ওঠে রোদে!
উদয় সমাপ্ত হয়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হয়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু, নব সৃষ্টিমরালের মতো কলস্বরে
কেন কথা বলি; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশহংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।

পৃথিবীতে

শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায়
কোনো-এক কবি বসে আছে;
অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে;
তবুও সে প্রীত অবহিত হয়ে আছে

এই পৃথিবীর রোদে—এখানে রাত্রির গন্ধে—নক্ষত্রের তরে।
তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ
সুস্থ করে নিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,
সব ভবিতব্যতার অন্ধকারে দেশ

মিশে গেলে; জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হত।

এই সব দিনরাত্রি

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই;
শরীর বিবশ হলে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের
কংগ্রেসের মতো কোনো আশা-হতাশার

কোলাহল নেই।

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা তবু মৃত নয়; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।
নামগুলো কুশ্রী নয়, পৃথিবীর চেনা-জানা নাম এই সব।
আমরা অনেক দিন এ-সব নামের সাথে পরিচিত; তবু,
গৃহ নীড় নির্দেশ সকলই হারায়ে ফেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে;
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।

মেডিকেল ক্যাম্বেলের বেলগাছিয়ার
যাদবপুরের বেড কাঁচড়াপাড়ার বেড সব মিলে কতগুলো সব?
ওরা নয়—সহসা ওদের হয়ে আমি
কাউকে শুধায়ে কোনো ঠিকমতো জবাব পাই নি।
বেড আছে, বেশি নেই—সকলের প্রয়োজনে নেই।
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।
বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধ'রে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোন্ দিকে?
জানু ভেঙে পড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল
হয়ে কিছু চায়—কিছু খোঁজে;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই।

তাদের আকাশ
সর্বদাই ফুটপাতে;
মাঝে মাঝে এম্বুলেনস্ গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে
ফিরে আসে
যেন এক অসীম আকাশে।

এ-রকম ভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলই পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তবে
অনেক বেডের প্রয়োজন;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে;

বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।
হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন,
কিংবা যারা মরণের আগে মৃতদের
জাতিধর্ম নির্বিচারে সকলকে—সব তুচ্ছতম আর্তকেও
শরীরের সান্ত্বনা এনে দিতে চায়,
কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ করে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।
মানুষের অনিঃশেষ কাজ চিন্তা কথা
রক্তের নদীর মতো ভেসে গেলে, তারপর, তবু, এক অমূল্য মুগ্ধতা
অধিকার করে নিয়ে ক্রমেই নির্মল হতে পারে।

ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনও কালের কিনারায়;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন
জানে জীবনের মানে: সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারি দিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।
কেবলই আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিস্ফলতা বেড়ে যায়।

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে
শুনেছি একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারী
কেমন আশ্চর্য গান গায়;
বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায়;
গানের ঝংকারে যেন সে এক একান্ত শ্যাম দেবদারু গাছে
রাত্রির বর্ণের মতো কালো কালো শিকারী বেড়াল
প্রেম নিবেদন করে আলোর রঙের মতো অগণন পাখিদের কাছে;
ঝর্ ঝর্ ঝর্
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত ক্লেদরক্ত বৃষ্টির ভিতর
এ পৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস
শঠতা রিরংসা মৃত্যু নিয়ে
কেমন প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সংগীতে
মুখের ব্যাদান সাধ দুর্দান্ত গণিকালয়—নরক শ্মশান হল সব।
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথিবীকে এ-রকম ভাবে অনুভব

আমিও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে
বিকেলে—রাত্রির পথে হেঁটে;
দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে
আমরা অঙ্গার রক্ত: শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে।

এ আগুন এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনও?
তবুও সকল কাল শতাব্দীকে হিসেবনিকেশ করে আজ
শুভ কাজ সূচনার আগে এই পৃথিবীর মানবহৃদয়
স্নিগ্ধ হয়—বীতশোক হয়?
মানুষের সব গুণ শান্ত নীলিমার মতো ভালো?
দীনতা: অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো।

লোকেন বোসের জর্নাল

সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি—
এখনও কি ভালোবাসি?
সেটা অবসরে ভাববার কথা,
অবসর তবু নেই;
তবু একদিন হেমন্ত এলে অবকাশ পাওয়া যাবে;
এখন শেল্‌ফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভ্‌লভ্ ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা।

পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে:
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা;
ফাইল নাড়া কী যে মিহি কেরানির কাজ;
নাড়ব না আমি,
নেড়ে কার কী সে লাভ;
মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,
সুবলেরই শুধু? অবশ্য আমি তাকে
মানে এই—এই অমিতা বলছি যাকে—
কিন্তু কথাটা থাক;
কিন্তু তবুও—
আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,
নারী যদি মৃগতৃষ্ণার মতো—তবে
এখন কী করে মন কারাভান হবে।

প্রৌঢ় হৃদয়, তুমি
সেই সব মৃগতৃষ্ণিকাতালে ঈষৎ সিমুমে
হয়তো কখনো বৈতাল মরুভূমি,
হৃদয়, হৃদয় তুমি!
তারপর তুমি নিজের ভিতরে ফিরে এসে তবু চুপে
মরীচিকা জয় করেছো বিনয়ী যে ভীষণ নামরূপে—

সেখানে বালির সৎ নীরবতা ধু ধু
প্রেম নয় তবু প্রেমেরই মতন শুধু।

অমিতা সেনকে সুবল কি ভালোবাসে?
অমিতা নিজে কি তাকে?
অবসরমতো কথা ভাবা যাবে,
ঢের অবসর চাই;
দূর ব্রহ্মাণ্ডকে তিলে টেনে এনে সমাহিত হওয়া চাই;
এখুনি টেনিসে যেতে হবে তবু,
ফিরে এসে রাতে ক্লবে;
কখন সময় হবে।

হেমন্তে ঘাসে নীল ফুল ফোটে—
হৃদয় কেন যে কাঁপে,
'ভালোবাসতাম'—স্মৃতি—অঙ্গার—পাপে
তর্কিত কেন রয়েছে বর্তমান।
সে-ও কি আমায়—সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিল?
আজও ভালোবাসে না কি?
ইলেক্‌ট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হয়ে রবে;
কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে?

সুজাতা এখন ভুবনেশ্বরে;
অমিতা কি মিহিজামে?
বহুদিন থেকে ঠিকানা না জেনে ভালোই হয়েছে—সবই।
ঘাসের ভিতরে নীল শাদা ফুল ফোটে হেমন্তরাগে;
সময়ের এই স্থির এক দিক,
তবু স্থিরতর নয়;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

১৯৪৬–৪৭

দিনের আলোয় ওই চারি দিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা:
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে;
কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

অনেকেরই ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়
সে সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত ক'রে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে: সকলের জন্যে নয়।

অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।
পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
অথবা মাটির দিকে—পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে
মিশে গিয়ে। পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হয়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার করে নিতে হবে:
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হয়ে যায়।

লীন হয়ে গেলে তারা তখন তো—মৃত।
মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনও।
মৃতেরা কোথাও নেই; আছে?
কোনো কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের
হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই বলে মনে হয়;
তা হলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হত।

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?
আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন.
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায়; নিভে গেছে সব।

এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো...ও পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত;
এখন টু শব্দ নেই সেই সব কাকপাখিদেরও;
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়;
সময়ের হাতে অন্তহীন।

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হত
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি-বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে—সন্তানের জন্মাবার আগে।
সে সব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে
মৃতপ্রায়; আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।

ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়
অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল।

আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন;
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ করে নেওয়ার রেওয়াজ
রয়ে গেছে; সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা: আমাদেরই আন্তরিকতাতে
আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজও ধায়;
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে,'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির—'
কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
সৃষ্টির অপরিক্রান্ত চারণার বেগে
এই সব প্রাণকণা জেগেছিল—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এই সব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।

সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে
কথা বলে; কাকে বলে? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ-খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা বলে গিয়েছিল; তবু—
অনন্ত তো খণ্ড নয়; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।

এ যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো: মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত করে দেয়—মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না—অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর—শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে—এ জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে
কয়েকটি দেবদারুগাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ কাছে আসে—মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের—মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজও—তার হৃদয়ের

ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

মানুষের মৃত্যু হলে

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আজকের আগে যেই জীবনের ভিড় জমেছিল
তারা মরে গেছে;
প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে;
তবু তারা আজকের আলোর ভিতরে
সঞ্চারিত হয়ে উঠে আজকের মানুষের সুরে
যখন প্রেমের কথা বলে
অথবা জ্ঞানের কথা—
অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে-সময়
দীপংকর শ্রীজ্ঞানের;
চলেছে—চলেছে—

একদিন বুদ্ধকে সে চেয়েছিল বলে ভেবেছিল।
একদিন ধূসর পাতায় যেই জ্ঞান থাকে—তাকে।
একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথে বেয়ে
বিজ্ঞানে প্রবীণ হয়ে—তবু—কেন অম্বাপালীকে
চেয়েছিল প্রণয়ে নিবিড় হয়ে উঠে।

চেয়েছিল—
পেয়েছিল শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে:
সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে;
সিঁড়ি উদ্ভাসিত ক'রে রোদ;
সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার পথে আরেকরকম
বাতাস ও আলোকের আসাযাওয়া স্থির ক'রে কী অসাধারণ
প্রেমের প্রযাণ? তবু—এই শেষ অনিমেষ পথে
দেখেছে সে কোনো-এক মহীয়সী আর তার শিশু;
দু-জনেই মৃত।
অথবা কেউ কি নেই।

ওইখানে কেউ নেই ।
মৃত্যু আজ নারীনর্দামার ক্বাথে;
অন্তহীন শিশুফুটপাতে;
আর সেই শিশুদের জনিতার কিউক্লীবতায়।

সকল রৌদ্রের মতো ব্যাপ্ত আশা যদি
গোলকধাঁধায় ঘুরে আবার প্রথম জ্ঞানে ফিরে আসে
শ্রীজ্ঞান কী তবে চেয়েছিলো?

সূর্য যদি কেবলই দিনের জন্ম দিয়ে যায়,
রাত্রি যদি শুধু নক্ষত্রের,
মানুষ কেবলই যদি সমাজের জন্ম দেয়,
সমাজ অস্পষ্ট বিপ্লবের,
বিপ্লব নির্মম আবেশের,
তা হলে শ্রীজ্ঞান কিছু চেয়েছিল?

নগরীর সিঁড়ি প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে;
অথচ নগরী মৃত।
সে সিঁড়ির আশ্চর্য নির্জন
দিগন্তরে এক মহীয়সী,
আর তার শিশু;
তবু কেউ নেই।

ঢের ভারতীয় কাল—পৃথিবীর আয়ু—শেষ ক'রে
জীবনের বঙ্গাব্দ পর্বের প্রান্তে ঠেকে,
পুনরুদ্‌যাপনের মতন আরেকবার এই
তেরোশো পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু ক'রে ঢের দিন
আমারও হৃদয় এই সব কথা ভেবে
সৃষ্টির উৎস আর উৎসারিত মানুষকে তবু
ধন্যবাদ দিয়ে যায়।
কেননা সৃষ্টির নিহিত ছলনা ছেলে-ভুলোবার মতো তবু নয়;
মানুষও ঘুমের আগে কথা ভেবে সব সমাধান
ক'রে নিতে চায়;
কথা ভেবে হৃদয় শুকায় জেনে কাজ করে।

সময় এখনও শাদা জলের বদলে বোনভায়ের
নিয়ত বিপন্ন রক্ত রোজ
মানুষকে দিয়ে যায়;
ফসলের পরিবর্তে মানুষের শরীরে মানুষ
গোলাবাড়ি উঁচু ক'রে রেখে নিয়তির
অন্ধকারে অমানব;
তবুও গ্লানির মতো মানুষের মনের ভিতরে
এই সব জেগে থাকে ব'লে
শতকের আয়ু—আধো আয়ু—আজ ফুরিয়ে গেলেও এই শতাব্দীকে তারা
কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা ক'রে
আশায় উজ্জ্বল রাখে; না হলে এ ছাড়া
কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।
মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব

থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতোদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

অনন্দা

এই পৃথিবীর এ এক শতচ্ছিদ্র নগরী।
দিন ফুরুলে তারার আলো খানিক নেমে আসে।
গ্যাসের বাতি দাঁড়িয়ে থাকে রাতের বাতাসে।
দ্রুতগতি নরনারীর ক্ষণিক শরীর থেকে
উৎসারিত ছায়ার কালো ভারে
আঁধার আলোয় মনে হতে পারে
এ–সব দেয়াল যে-কোনো নগরীর;
সন্দেহ ভয় অপ্রেম দ্বেষ অবক্ষয়ের ভিড়
সূর্য–তারার আলোয় অঢেল রক্ত হতে পারে
যে-কোনো দিন; সে কতোবার আঁধার বেশি শানিত হয়েছে;
বাহক নেই—দুরন্ত কাল নিজেই বয়েছে
নিজেরই শব নিজে মানুষ,
মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে।

হৃদয় আছে বলেই মানুষ দেখ, কেমন বিচলিত হয়ে
বোনভায়েকে খুন ক'রে সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে
জেগে উঠে ইতিহাসের অধম স্থূলতাকে
ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞানপ্রতিভা আকাশ প্রেম নক্ষত্রকে ডাকে।

এই নগরী যে-কোনো দেশ; যে-কোনো পরিচয়ে
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে ট্রাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডাকে।
'তুমি কি গ্রীস পোল্যান্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক
লন্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন?
একটি মৃত্যু, এক ভূমিকা, একটি শুধু আইন।'
বলছে মেশিন। মেশিনপ্রতিম অধিনায়ক বলে:
'সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন ক'রে গ'ড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে,
নতুন সময় সীমাবলয় সবই তো আজ আমি;
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার স্বত্বাধিকারকামী;
আমি সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল;
সবুজ শাদা মেরুন অশ্লীল

নিয়মগুলো বাতিল করি; কালো কোর্তা দিয়ে
ওদের ধূসর পাটকিলে বফ্‌ কোর্তা তাড়িয়ে
আমার অনুচরের বৃন্দ অন্ধকারের বার
আলোক ক'রে কী অবিনাশ দ্বৈপ-পরিবার।

এই দ্বীপই দেশ; এ-দ্বীপ নিখিল তবে।
অন্য সকল দ্বীপের হ'তে হবে
আমার মতো—আমার অনুচরের মতো ধ্রুব।
হে রক্তবীজ, তুমি হবে আমার আঘাত পেয়ে
অনবতুল আমির মতো শুভ।'

সবাই তো আজ যে যার অন্তরঙ্গ জিনিস খুঁজে
মানবভ্রাতাবোনকে বুকে টেনে নেবার ছলে
তাদের নিকেশ ক'রে অনির্বচন রক্তে এই পৃথিবীর জলে
নানারকম নতুন নামের বৃহৎ ভীষণ নদী হয়ে গেল;
এই পৃথিবীর সব নগরী পরিক্রমা ক'রে
নতুন অভিধানের শব্দে ছন্দে জেনে সুপরিসর ভোরে
এ-সব নদী গভীরতর মানে পেতে চায়—
দিকসময়ের আতল রক্ত ক্ষালন ক'রে অননুতপ্ততায়;
বাস্তবিকই জল কি জলের নিকটতম মানে?
অথবা কি মানবরক্ত বহন করি নির্মম অজ্ঞানে?
কী আন্তরিক অর্থ কোথায় আছে?
এই পৃথিবীর গোষ্ঠীরা কি পরস্পরের কাছে
ভাইয়ের মতো: সৎ প্রকৃতির স্পস্ট উৎস থেকে
মানবসভ্যতার এই মলিন ব্যতিক্রমে জেগে উঠে?
যে যার দেহ আত্মা ভালোবেসে অমল জলকণার মতন সমুদ্রকে এক মুঠে
ধ'রে আছে?
ভালো করে বেঁচে থাকার বিশদ নির্দেশে
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে এসে
হিংসা গ্লানি মৃত্যুকে শেষ ক'রে
জেগে আছে?

জেগে উঠে সময়সাগরতীরে সূর্যস্রোতে
তবুও ক্লান্ত পতিত মলিন হতে
কী আবেদন আসছে মানুষ প্রতিদিনই—
কোথার থেকে শকুনক্রান্তি বলে:
'জলের নদী? জেগে উঠুক আপামরের রক্ত কোলাহলে!'

এ-সুর শুরু হয়েছিল কুরুবর্ষে—বেবিলনে ট্রয়ে;
মানুষ·মানী জ্ঞানী প্রধান হয়ে গেছে; তবুও হৃদযে
ভালোবাসার যৌনকুয়াশা কেটে
যে-প্রেম আসে সেটা কি তার নিজের ছায়ার প্রতি?
জলের কলরোলের পাশে এই নগরীর অন্ধকারে আজ
আঁধার আরো গভীরতর করে ফেলে সভ্যতার এই অপার আত্মরতি;
চারি দিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি

অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হয়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।

আছে

এখন চৈত্রের দিন নিভে আসে—আরো নিভে আসে;
এখানে মাঠের 'পরে শুয়ে আছি ঘাসে;
এসে শেষ হয়ে যায় মানুষের ইচ্ছা কাজ পৃথিবীর পথে,
দু-চারটে—বড়ো জোর একশো শরতে;

উর ময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর শর্তে হয়ে গেছে শেষ;
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ
পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছেদের ভূমা—মনে হয়—এক তিলের সমান;
কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি—অফুরান।

চারি দিকে বড়ো বড়ো আকাশ ও গাছের শরীরে
সময় এসেছে তার নীড়ে।
ভালো লাগে পৃথিবীর রূঢ় নষ্ট সভ্যতার দিনের ব্যত্যয়;
অন্ধকার সনাতনে মিশে যাওয়া—কিন্তু মরণের ঘুম নয়;

জেগে থাকা: নক্ষত্রের বাগীশ্বরী দ্যোতনার থেকে কিছু দূরে;
পৃথিবীর অবলুপ্ত জ্ঞানী বন্ধুরে
এই স্তব্ধ মাটিতেই মিশে যেতে হল জেনে তবু চোখ রেখে নীলাকাশে
শুয়ে থাকা পৃথিবীর মাধুরীর অন্ধকার ঘাসে।

যাত্রী

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিল কবে;
পিছে মৃতুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিল—
সেই সব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিল এখানে ভূমিষ্ট হয়ে—আলো জল আকাশের টানে;
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।

মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ পৃথিবীর দেশে;
কঙ্কাল অঙ্গার কালি—চারি দিকে রক্তের ভিতরে
অন্তহীন করুণ ইচ্ছার চিহ্ন দেখে
পথ চিনে এ ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম;
কাকে তবু?

পৃথিবীকে? আকাশকে? আঁকাশে যে-সূর্য জ্বলে তাকে?
ধুলোর কণিকা অণুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে?
নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে?

যেই কুজ্ঝটিকা ছিল জন্মসৃষ্টির আগে, আর
যে-সব কুয়াশা রবে শেষে একদিন
তার অন্ধকার আজ আলোর বলয়ে এসে পড়ে পলে পলে;
নীলিমার দিকে মন যেতে চায় প্রেমে;
সনাতন কালো মহাসাগরের দিকে যেতে বলে।

তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে করে আনে
যেই ঋতু যেই তিথি যে-জীবন যেই মৃত্যুরীতি
মহাইতিহাস এসে এখনও জানে নি যার মানে;

সেদিকে যেতেছে লোক গ্লানি প্রেম ক্ষয়
নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে করে;
নদী আর মানুষের ধাবমান ধূসর হৃদয়
রাত্রি পোহালো ভোরে—কাহিনীর কত শত ভোরে
নব সূর্য নব পাখি নব চিহ্ন নগরে নিবাসে;
নব নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়
প্রাণলোকযাত্রীদের ভিড়;
হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে, অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।

স্থান থেকে

স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে
চিহ্ন ছেড়ে অন্য চিহ্নে গিয়ে
ঘড়ির কাঁটার থেকে সময়ের স্নায়ুর স্পন্দন
খসিয়ে বিমুক্ত ক'রে তাকে
দেখা যায় অবিরল শাদা-কালো সময়ের ফাঁকে
সৈকত কেবলই দূর সৈকতে ফুরায়;
পটভূমি বার বার পটভূমিচ্ছেদ
করে ফেলে আঁধারকে আলোব বিলয়
আলোককে আঁধারের ক্ষয়
শেখায় শুক্র সূর্যে; গ্লানি রক্তসাগরের জয়
দেখায় কৃষ্ণ সূর্যে; ক্রমেই গভীর কৃষ্ণ হয়।

দিনরাত

সারা দিন মিছে কেটে গেল;
সারা রাত বড্ড খারাপ

নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে; জীবন
দিনরাত দিনগতপাপ
ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু।
ফণীমনসার কাঁটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে; একটিও পাখি শূন্যে নেই;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।

পৃথিবীতে এই

পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো;
ভূমিষ্ঠ হবার পরে যদিও ক্রমেই মনে হয়
কোনো–এক অন্ধকার স্তব্ধ সৈকতের
বিন্দুর ভেতর থেকে কোনো
অন্য দূর স্থির বলয়ের
চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে দুই শব্দহীন শেষ সাগরের
মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত এই সূর্যের আলো।

কেন আলো? মাছিদের ওড়াউড়ি?
কেবলই ভঙ্গুর চিহ্ন মুখে নিয়ে জল
সুয়েজ হেলেস্‌পন্ট প্রশান্ত লোহিতে
পরিণতি চায় এই মাছি মাছরাঙা
প্রেমিক নাবিক নষ্ট নাসপাতি মুখ
ঠোঁট চোখ নাক করোটির গন্ধ
স্পষ্ট এক নিরসনে স্থির করে রেখে দেবে ব'লে;
চলেছে—চলেছে—

শিশির কুয়াশা বৃষ্টি ঝড়ের বিহ্বল আলোড়ন,
সমুদ্রের শত মৃতুশীল ফাঁকি
ডানে-বাঁয়ে সারা দিন আবছা মরণ
ঝেড়ে ফেলে—ঝাপসায় বিপদের ঘন্টা বাজিয়ে
আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি
চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত
খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি চায়;

জলের মরণশীল ছলছল শুনে
কম্পাসের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হতে ব'লে
আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে;
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বারবার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

রূপসী বাংলা

১৯৫৭

ভূমিকা

এই কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি সংকলিত হল, তার সবগুলিই কবির জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল; তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো-কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাগুলি প্রথম বারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

কবির কাছে 'এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী, গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশপ্রসৃতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর...'।

৩১ জুলাই ১৯৫৭ অশোকানন্দ দাশ।

১

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনও দেখিবে স্বপ্ন—সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চলে যাব ব'লে চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে? লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

২

চারি দিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

৩

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে,
ধবল রোমের নীচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে: সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন্ কাহিনীর দেশে—
'পরণ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,
কল্‌মীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরেব নীড়ে—
নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চলে যায় কুয়াশায়—তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

৪

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশত্থের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—

সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

৫

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হয়ে—আরো নীল—আরো নীল হয়ে
আমি যে দেখিতে চাই—সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে,
আমি যে দেখিতে চাই— আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজও আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা;
যেইখানে সব চেয়ে বেশি রূপ— সব চেয়ে গাঢ় বিষন্নতা;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহু দিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর!

৬

একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নিচে শুয়ে রব;—পশমের মতো লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে—বাঁকা চাঁদ জেগে রবে—নদীটির জল
বাঙালি মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে ভয়ে—তারপর সেই ভাঙা ঘাটে
রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারা রাত—দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে

সাজায়ে রেখেছে চিতা: বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ
চেয়ে রবে; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে;
চারি দিকে বাংলার ধানী শাড়ি—শাদা শাঁখা—বাংলার ঘাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ—আপনার মনে
ভাঙিতেছে ধীরে ধীরে—চারিদিকে এই সব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস—

৭

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে:

আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোন পথ এ কন্যারে দেখে নিকো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে: নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা শরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস—লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরই মাঝে বাংলার প্রাণ:
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

৮

কোথাও দেখি নি, আহা, এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে—নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা—বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে—পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে—বক তাহা জানে নাকো, পায় নাকো টের
শালিখ খঞ্জনা তাহা—লক্ষ লক্ষ ঘাস এই নদীর দুধারে

নরম কান্তারে এই পাড়াগাঁর বুকে শুয়ে সে কোন্ দিনের
কথা ভাবে; তখন এ জলসিড়ি শুকায়নি, মজেনি আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া—ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হত এই পথে—আরো আগে রাজপুত্র কতদিন রাশ
টেনে টেনে এই পথে—কী যেন খুঁজেছে, আহা, হয়েছে উদাস;
আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু—নাটাফলে মিটিতেছে আশ—

৯

হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে
আষাঢ়ের দু পহরে কলরব কর নি কি এই বাংলায়!
আজ সারাদিন এই বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায
চাঁদ সদাগর: তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
কালীদহে কবে তারা পড়েছিল একদিন ঝড়ের আকাশে—

সেদিনও অসংখ্য পাখি উড়েছিল না কি কালো বাতাসের গায়,
আজ সারা দিন এই বাদলের জলে ধলেশ্বরীর চরায়
গাংশালিখের ঝাঁক, মনে হয়, যেন সেই কালীদহে ভাসে:
এই সব পাখিগুলো কিছুতেই আজিকার নয় যেন—নয়—

এ নদীও ধলেশ্বরী নয় যেন—এ আকাশ নয় আজিকার:

ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে না কি?—আছে; মনে হয়,
এ নদী কি কালীদহ নয়? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি না কি? বিষন্ন মলিন ক্লান্ত কী যে
সত্য সব—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

১০

জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস
রবে বুকে; এই ঘাস; সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজও অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙ্গে চলে যায়—
এই ঘাস : এরই নীচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস :
তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপাফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস
ঘাস আজও ঢেকে আছে; যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়
কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়
ঝ'রে পড়ে, পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় হাঁস,

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিখ নিয়েছে নিঙড়ায়ে
নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস,; এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—কাঁচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—সাদা দুধ ঝরে
করবীর : কোন্‌এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে : নরম ব্যাকুল।

১১

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চলে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা করে লয়ে যাবে—সেদিন দুদণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কী ভাবিব, হায়—
সেদিন রবে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারি দিকে বাঙালীর ভিড়
বহু দিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজও শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি; কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাই নি দিন মাস, লহনার খুল্লনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে আমি যে বিকায়ে দিয়েছি দিছি মন
বাঙালি নারীর কাছে—চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়— ডাঁশা আম, কামরাঙা, কুল।

১২

পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোন্‌খানে সফলতা শক্তির ভিতর,
কোন্‌খানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট উঠিতেছে জেগে,



'বেতার জগৎ ১৬–২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সংখ্যার প্রচ্ছদে
'রূপসী বাংলা'র কবিতার পাণ্ডুলিপি-চিত্র ,

কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে,
জানি নাকো—আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর;
সন্ধ্যায় যে দাঁড়কাক উড়ে যায় তালবনে—মুখে দুটো খড়
নিয়ে যায়—সকালে যে নিমপাখি উড়ে আসে কাতর আবেগে
নীল তেঁতুলের বনে—তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে;
বঁইচির বনে আমি জোনাকির রূপ দেখে হয়েছি কাতর;

কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান
নিশুথি জ্যোৎস্নার রাতে—টুপ্ টুপ্ টুপ্ টুপ্ সারারাত ঝরে
শুনেছি শিশিরগুলো—ম্লান মুখে গড় এসে করেছে আহ্বান
ভাঙা সোঁদা ইঁটগুলো—তারি বুকে নদী এসে কি কথা মর্মরে;
কেউ নাই কোনোদিকে—তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ: 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে রায়রায়ান—'

১৩

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
মাথায় বৈশাখ মেঘ—শাদা শাদা যেন কড়ি-শঙ্খের পাহাড়
নদীর ওপার থেকে চেয়ে রবে—কোনো এক শঙ্খবালিকার
ধূসর রূপের কথা মনে হবে—এই আম-জামের ছায়াতে
কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি—কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশান চিতায় তার হাড়
ঝরে গেছে, কবে যেন; এ জনমে নয় যেন—এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা —আমি তার সাথে

কাটায়েছি —পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা—সাতশো বছর
কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে;
ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কত বার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কত বার ঘর আর খড় গেল ভেসে,
মাথুরের পালা বেঁধে কত বার ফাঁকা হল খড় আর ঘর।

১৪

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে;
তখনও যৌবন প্রাণে লেগে আছে হয়তো বা—আমার তরুণ দিন
তখনও হয়নি শেষ—সেই ভালো—ঘুম আসে—বাংলার তৃণ
আমার বুকের নীচে চোখ বুজে—বাংলার আমের পাতাতে
কাঁচপোকা ঘুমায়েছে—আমিও ঘুমায়ে রব তাহাদের সাথে,
ঘুমাব প্রাণের সাধে এই মাঠে—এই ঘাসে—কথাভাষাহীন
আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে—অনেক নবীন
নতুন উৎসব রবে উজানের—জীবনের মধুর আঘাতে

তোমাদের ব্যস্ত মনে—তবুও কিশোর তুমি নখের আঁচড়ে
যখন এ ঘাস ছিঁড়ে চলে যাবে—যখন মানিকমালা ভোরে

লাল লাল বটফল কামরাঙা কুড়াতে আসিবে এই পথে—
যখন হলুদ বোঁটা শেফালির কোনো এক নরম শরতে
ঝরিবে ঘাসের 'পরে—শালিখ খঞ্জনা আজ কত দূর ওড়ে—
কতখানি রোদ—মেঘ—টের পাব শুয়ে শুয়ে মরণের ঘোরে।

১৫

যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রব—অন্ধকারে নক্ষত্রের নীচে
কাঁঠালগাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে—
দিনমানে কোনো মুখ হয়তো সে শ্মশানের কাছে নাহি আসে—
তবুও কাঁঠাল জাম বাংলার—তাহাদের ছায়া যে পড়িছে
আমার বুকের 'পরে—আমার মুখের 'পরে নীরবে ঝরিছে
খয়েরি অশথ পাতা—বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,
নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাইয়ে—বাংলার ঘাসে
গভীর ঘাসের গুচ্ছে রয়েছি ঘুমায়ে আমি— নক্ষত্র নড়িছে

আকাশের থেকে দূর—আরো দূর —আরো দূর—নির্জন আকাশে
বাংলার—তারপর অকারণ ঘুমে আমি পড়ে যাই ঢুলে;
আবার যখন জাগি, আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে
ভরে আছে, চেয়ে দেখি—বাসকের গন্ধ পাই—আনারস ফুলে
ভোমরা উড়িছে শুনি—গুবরে পোকার ক্ষীণ গুমরানি ভাসিছে বাতাসে
রোদের দুপুর ভরে—শুনি আমি: ইহারা আমারে ভালোবাসে—

১৬

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠালছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপ্সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক: আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

১৭

যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়;
যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে,

যখন চড়াই পাখি কাঁঠালীচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে,
যখন হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরি পাতায়,
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক-গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে—
তখন আমারে যদি পাও নাকো লালশাক-ছাওয়া মাঠে খুঁজে,
ঠেস্ দিয়ে বসে আর থাকি নাকো যদি বুনো চাল্‌তার গায়,

তা হলে জানিও তুমি আসিয়াছে অন্ধকারে মৃত্যুর আহ্বান—
যার ডাক শুনে রাঙা রৌদ্রেরও চিল আর শালিখের ভিড়
একদিন ছেড়ে যাবে আম জাম বনে নীল বাংলার তীর,
যার ডাক শুনে আজ ক্ষেতে ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরির ধান;
কবে যে আসিবে মৃত্যু: বাসমতী চালে ভেজা শাদা হাতখান
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচনারূপে আমি করিব যে স্নান—

১৮

মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর;
দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে একঝাড় জোনাকি কখন
নিভে যায়—দেখিব না আর আমি পরিচিত এই বাঁশবন,
শুকনো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে গভীর আঁধার
আমার চোখের কাছে—লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার
পেঁচা ডাকে জ্যোৎস্নায়—হিজলের বাঁকা ডাল করে গুঞ্জরণ;
সারা রাত কিশোরীর লাল পাড় চাঁদে ভাসে—হাতের কাঁকন
বেজে ওঠে: বুঝিব না—গঙ্গাজল, নারকোলনাড়ুগুলো তার

জানি না সে কারে দেবে—জানি না সে চিনি আর শাদা তালশাঁস
হাতে লয়ে পলাশের দিকে চেয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে রবে কি না
আবার কাহার সাথে ভালোবাসা হবে তার—আমি তা জানি না;
মৃত্যুরে কে মনে রাখে?... কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারো মাস
নতুন ডাঙার দিকে—পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায়—শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ?

১৯

যে শালিখ মরে যায় কুয়াশায়—সে তো আর ফিরে নাহি আসে :
কাঞ্চনমালা যে কবে ঝ'রে গেছে—বনে আজও কলমীর ফুল
ফুটে যায়—সে তবু ফেরে না, হায়—বিশালাক্ষী: সেও তো রাতুল
চরণ মুছিয়া নিয়া চলে গেছে—মাঝপথে জলের উচ্ছ্বাসে
বাধা পেয়ে নদীরা মজিয়া গেছে দিকে দিকে—শ্মশানের পাশে
আর তারা আসে নাকো—সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুলজুল
চোখ তুলে চেয়ে থাকে—কত পাটরানীদের গাঢ় এলোচুল
এই গৌড় বাংলার—পড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাসে

জানে সে কি! দেখে নাকি তারাবনে পড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল,
বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি—ফোঁপরা মহলা ঘাট, হাজার মহাল

মৃত সব রূপসীরা: বুকে আজ ভেরেন্ডার ফুলে ভীমরুল
গান গায়—পাশ দিয়ে খল্ খল্ খল্ খল বয়ে যায় খাল!
তবু ঘুম ভাঙে নাকো— একবার ঘুমালে কে উঠে আসে আর
যদিও ডুকারি যায় শঙ্খচিল—মর্মরিয়া মরে গো মাদার।

২০

কোথাও চলিয়া যাব একদিন—তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতকাল জানিব না আমি;
জানিব না কত কাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামি
পাতাগুলো—মাদারের ডুমুরের—সোঁদা গন্ধ—বাংলার শ্বাস
বুকে নিয়ে তাহাদের—জানিব না পরথুপী মধুকূপী ঘাস
কত কাল প্রান্তরে ছড়ায়ে রবে—কাঁঠালশাখার থেকে নামি
পাখনা ডলিবে পেঁচা এই ঘাসে—বাংলার সবুজ বালামী
ধানী শাল পশ্মিনা বুকে তার—শরতের রোদের বিলাস
কত কাল নিঙড়াবে—আঁচলে নাটার কথা ভুলে গিয়ে বুঝি
কিশোরের মুখে চেয়ে কিশোরী করিবে তার মৃদু মাথা নিচু;
আসন্ন সন্ধ্যার কাক—করুণ কাকের দল খোড়ো নীড় খুঁজি
উড়ে যাবে—দুপুরে ঘাসের বুকে সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু
মুখ গুঁজে প'ড়ে রবে—আমিও ঘাসের বুকে রব মুখ গুঁজি:
মৃদু কাঁকনের শব্দ—গোরোচনা জিনি রং চিনিব না কিছু—

২১

তোমার বুকেব থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চলে যাবে; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে,
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়—কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালি ধান
একদিন—হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে গাবে তার গান,
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার—তবুও তো চোখের 'পরে
নীল মৃত্যু উজাগর—বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—
কখন মরণ আসে কে বা জানে —কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো—তবু যেন মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনায় নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নীচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

২২

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায়—মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে;
পুকুরের লাল সর ক্ষীণ ঢেউয়ে বারবার চায় যে জড়াতে
বাঁশের হলুদ শাখা; চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায়;
এক-একটি ইঁট ধ্বসে—ডুবজলে ডুব দিয়ে কোথায় হারায়

ভাঙা ঘাটলায় এই—আজ আর কেউ এসে চালধোয়া হাতে
বিনুনি খসায় নাকো—শুকনো পাতা সারাদিন থাকে যে গড়াতে;
কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোক্ষুরার ফাটলে হারায়;

ডাইনীর মতো হাত তুলে তুলে ভাঁট আঁশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কী কথা কয় বুঝি নাকো—বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে;
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি হায় এমন বিজন
শাদা পথ—সোঁদা পথ—বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চ'লে গেছে—শ্মশানের পারে বুঝি—সন্ধ্যা আসে সহসা কখন,
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম—নিম—নিম কার্তিকের চাঁদে।

২৩

দেশবন্ধু : ১৩২৬-১৩৩২-এর স্মরণে

অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে
মাঠে মাঠে ফিরি একা: মনে হয় বাংলার জীবনে সঙ্কট
শেষ হয়ে গেছে আজ—চেয়ে দেখ কত শত শতাব্দীর বট
হাজার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে লয়ে শাখার ব্যজনে
আকাঙ্ক্ষার গান গায়—অশ্বত্থেরো কি যেন কামনা জাগে মনে:
সতীর শীতল শব বহু দিন কোলে লয়ে যেন অকপট
উমার প্রেমের গন্ধ পেয়েছে সে—চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে;

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে ক্ষুরধার পদ্মায় এবার,
কালীদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার :
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

২৪

ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে ব'সে ব'সে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে;
পায়রা গিয়েছে উড়ে চবুতরে, খোপে তার—শসালতাটিকে
ছেড়ে গেছে মৌমাছি—কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে,
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চ'লে যায়—দুই দণ্ড আমগাছে শালিখে শালিখে
ঝুটোপুটি, কোলাহল—বউকথাকও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন্ যেন কাঁঠালে পলাশে

হারায়েছে; বউও উঠানে নাই—প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি:
ধান কে কুটিবে বলো—কতো দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান,
রোদেও শুকুতে সে যে আসে নাকো চুল তার—করে নাকো স্নান
এ-পুকুরে—ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,

তবুও সে আসে নাকো; আজ এ দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি?
হে চিল, সোনালী চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে নাকি প্রাণ?

২৫

দাঁড়কাক

খুঁজে তারে মর মিছে—পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে নাকো আর;
রয়েছে অনেক কাক এ উঠানে—তবু সেই ক্লান্ত দাঁড়কাক
নাই আর— অনেক বছর আগে আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক
দাঁড়কাক দেখা যেত দিন রাত—সে আমার ছেলেবেলাকার
কবেকার কথা সব; আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার :
রাত না ফুরাতে সে যে কদমের ডাল থেকে দিয়ে যেত ডাক—
এখনো কাকের শব্দে অন্ধকার ভোরে আমি বিমনা, অবাক
তার কথা ভাবি শুধু এত দিনে কোথায় সে? কি যে হল তাব,

কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, ক্ষেত, মাঠ, ঘাস,
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত,
সেইসব নোনা গাছ, করমচা, শামুক,গুগ্‌লি, কচি তালশাঁস
সেই সব ভিজে ধূলো বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ ধোঁয়াভরা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব?—অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে—নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত।

২৬

পাড়াগাঁর দু'পহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে
স্বপনের;—কোন গল্প, কি কাহিনী, কি স্বপ্ন যে বাঁধিয়াছে ঘব
আমার হৃদয়ে, আহা কেউ তাহা জানে নাকো—কেবল প্রান্তর
জানে তাহা, আর ওই প্রান্তরের শঙ্খচিল;—তাহাদের কাছে
যেন এ-জনমে নয়—যেন ঢের যুগ ধ'রে কথা শিখিযাছে
এ-হৃদয়—স্বপ্নে যে বেদনা আছেঃ শুষ্ক পাতা—শালিখের স্বর,
ভাঙা মঠ—নক্‌শাপেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর
হলুদ পাতার মতো স'রে যায়, জলসিড়িটির পাশে ঘাসে

শাখাগুনো নুয়ে আছে বহু দিন ছন্দহীন বুনো চালতার :
জলে তার মুখখানা দেখা যায়—ডিঙিও ভাসিছে কার জলে,
মালিক কোথাও নাই, কোনদিন এই দিকে আসিবে না আর,
ঝাঁঝরা ফোঁপরা, আহা, ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গিয়েছে হিজলে :
পাড়াগাঁর দুপহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার
গন্ধ লেগে আছে, আহা, কেঁদে কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে।

২৭

কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল শুপুরির সারি
আঁধারে যেতেছে ডুবে—প্রান্তরের পার থেকে গরম বাতাস
ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস;
কোন্ চৈতে চলে গেছে সেই মেয়ে—আসিবে না, ক'রে গেছে আড়ি

ক্ষীরুই গাছের পাশে একাকী দাঁড়ায়ে আজ বলিতে কি পারি
কোথাও সে নাই এই পৃথিবীতে—তাহার শরীর থেকে শ্বাস
ঝরে গেছে ব'লে তারে ভুলে গেছে নক্ষত্রের অসীম আকাশ,
কোথাও সে নাই আর—পাব নাকো তারে কোনো পৃথিবী নিঙাড়ি?

এই ঘাসে—ফল্‌সা এ-ক্ষীরুয়ে যে গন্ধ লেগে আছে
আজও তার ; যখন তুলিতে যাই ঢেঁকিশাক—দুপুরের রোদে
সর্ষে ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি—অঘ্রানে যে ধান ঝরিয়াছে,
তাহার দু-এক গুচ্ছ তুলে নেই, চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে
পৃথিবীর রাঙা রোদ চড়িতেছে আকাঙ্খায় চিনিচাঁপা গাছে—
জানি সে আমার কাছে আছে আজও—আজও সে আমার কাছে আছে।

২৮

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল ;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার: এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো— বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

২৯

কত ভোরে— দু পহরে—সন্ধ্যায় দেখি নীল গুপুরির বন
বাতাসে কাঁপিছে ধীরে—খাঁচার শুকের মতো গাহিতেছে গান
কোন্ এক রাজকন্যা—পরনে ঘাসের শাড়ি—কালো চুলে ধান
বাংলার শালিধান—আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ,
হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাহিকো মরণ
তার আর কোনোদিন—পালঙ্কে সে শোয় নাকো, হয় নাকো ম্লান,
লক্ষ্মীপেঁচা শ্যামা আর শালিখের গানে তার জাগিতেছে প্রাণ
সারাদিন—সারারাত বুকে ক'রে আছে তারে গুপুরির বন ;

সকালে কাকের ডাকে আলো আসে, চেয়ে দেখি কালো দাঁড়কাক
সবুজ জঙ্গল ছেয়ে গুপুরির—শ্রীমন্তও দেখেছে এমন:
যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক,
সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার গুপুরির বন

দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল ; করুণ কাকের ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।

৩০

এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।
বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে :
ছড়ায়ে রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন আঘ্রাণে—
তাদের উপেক্ষা ক'রে কে যাবে বিদেশে বল—আমি কোনোমতে
বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে—উটির পর্বতে
যাব নাকো— দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে
কোন্ দেশে—কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে
বিনুনি খসায়ে ব'সে থাকিবার স্বপ্ন আনে; —পৃথিবীর পথে

যাব নাকো : অশ্বথের ঝরাপাতা ম্লান শাদা ধুলোর ভিতর,
যখন এ দু' পহরে কেউ নাই কোনোদিকে—পাখিটিও নাই,
অবিরল ঘাস শুধু ছড়ায়ে রয়েছে মাটি-কাঁকরের 'পর,
খড়কুটো উল্টায়ে ফিরিতেছে দু-একটা বিষণ্ন চড়াই,
অশ্বথের পাতাগুলো প'ড়ে আছে ম্লান সাদা ধুলোর ভিতর ;
এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ জীবন কোনোখানে গেল নাকো তাই।

৩১

এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন ;
আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভ'রে—বারবার রোদ তার সুচিক্কণ সোনালি চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায় —দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,

কবেকার কোকিলের, জান কি তা? যখন মুকুন্দরাম হায়
লিখিতেছিলেন ব'সে দু'পহরে সাধের সে অন্নদামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তার বাধা পায়—থেমে থেমে যায়—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

৩২

কোথাও মঠের কাছে—যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হয়ে আছে
শ্যাওলায় —অনেক গভীর ঘাস জমে গেছে বুকের ভিতর,
পাশে দীঘি মজে আছে—রূপালী মাছের কণ্ঠে স্বর
যেইখানে পাটরানী আর তার রূপসী সখীরা শুনিয়াছে
বহু—বহু দিন আগে—যেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কত শতাব্দী আগে মাছরাঙা-ঝিলমিল—এঁকেছে কড়ির ঘর ;

কোন্ যেন কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর ;
একদিন আমি যাবো দু-পহরে সেই দূর প্রান্তরের কাছে,

সেখানে মানুষ কেউ যায় নাকো—দেখা যায় বাঘিনীর ডোরা
বেতের বনের ফাঁকে—জারুল গাছের তলে রৌদ্র পোহায়,
রূপসী মৃগীর মুখ দেখা যায় —শাদা ভাঁটপুষ্পের তোড়া
আলোকলতার পাশে গন্ধ ঢালে দ্রোণফুল বাসকের গায় ;
তবুও সেখানে আমি নিয়ে যাব একদিন পাটকিলে ঘোড়া,
যার রূপ জন্মে জন্মে কাঁদায়েছে আমি তারে খুঁজিব সেথায়।

৩৩

চলে যাব শুকনো পাতা-ছাওয়া ঘাসে—জামরুল হিজলের বনে ;
তল্তা বাঁশের ছিপ হাতে রবে—মাছ আমি ধরিব না কিছু—
দীঘির জলের গন্ধে রূপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর ডাল-ছাওয়া শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে ;
আনারসঝোপে ঐ মাছরাঙা তার মাছরাঙাটির মনে
অস্পষ্ট আলোয় যেন মুছে যায়— সিঁদূরের মতো রাঙা লিচু
ঝ'রে পড়ে পাতা ঘাসে—চেয়ে দেখি কিশোরী করেছে মাথা নীচু—
এসেছে সে দুপুরের অবসরে জামরুল লিচু আহরণে—

চলে যায় ; নীলাম্বরী স'রে যায় কোকিলের পাখনার মতো
ক্ষীরুয়ের শাখা ছুঁয়ে চাল্তার ডাল ছেড়ে বাঁশের পিছনে
কোনো দূর আকাঙ্খার ক্ষেতে মাঠে চলে যায় যেন অব্যাহত,
যদি তার পিছে যাও দেখিবে সে আকন্দের করবীর বনে
ভোমরার ভয়ে ভীরু; বহু ক্ষণ পায়চারি করে আনমনে
তারপর চ'লে গেল: উড়ে গেল যেন নীল ভোমরার সনে।

৩৪

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে;
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে ;
জামের আড়ালে সেই বউকথাকওটিরে যদি ফেল দেখে
একবার—একবার দু'পহর অপরাহ্ন যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও—তাহলে অনন্তকাল থাকিতে যে হবে এই বনে ;
মৌরীর গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে রেখে
আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে
রব আমি—চকোরীর সাথে যেন চকোরেব মতন মিলনে;

উঠানে কে রূপবতী খেলা করে—ছড়ায়ে দিতেছে বুঝি ধান
শালিখেরে: ঘাস থেকে ঘাসে ঘাসে খুঁটে খুঁটে খেতেছে সে তাই ;
হলুদ নরম পায়ে খয়েরী শালিখগুলো ডলিছে উঠান ;
চেয়ে দেখ সুন্দরীরে: গোরোচনা রূপ নিয়ে এসেছে কি রাই!
নীলনদে—গাঢ় রৌদ্রে—কবে আমি দেখিয়াছি—করেছিল স্নান—

৩৫

শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে গেছ গান
সোনালি চিলের মতো উড়ে উড়ে আকাশের রৌদ্র আর মেঘে—
লক্ষ্মীর বাহন যেই স্নিগ্ধ পাখি আশ্বিনের জ্যোৎস্নার আবেগে
গান গায়—শুনিয়াছি রাখিপূর্ণিমার রাতে তোমার আহ্বান
তার মতো ; আম চাঁপা কদমের গাছ থেকে গাহে অফুরান
যেন স্নিগ্ধ ধান ঝরে...অনন্ত সবুজ শালি আছে যেন লেগে
বুকে তব ; বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে ;
পদ্মা মেঘনা ইছামতী নয় শুধু— তুমি কবি করিয়াছ স্নান

সাত সমুদ্রের জলে—ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারীদেশে
অর্জুনের মতো, আহা— আরো দূর ম্লান নীল রূপের কুয়াশা
ফুঁড়েছ সুপর্ণ তুমি—দূর রং আরো দূর রেখা ভালোবেসে ;
আমাদের কালীদহ—গাঙুড়—গাঙের চিল তবু ভালোবাসা
চায় যে তোমার কাছে—চায়, তুমি ঢেলে দাও নিজেরে নিঃশেষে
এই দহে—এই চূর্ণ মঠে মঠে— এই জীর্ণ বটে বাঁধ বাসা।

৩৬

তবু তাহা ভুল জানি... রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙ্গে কীর্তিনাশা ;
তবুও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়—
আরো ঢের প্রাণ তার, বেগ তার, আরো ঢের জল, জয় আরো ;
তোমারও পৃথিবী পথ ; নক্ষত্রের সাথে তুমি খেলিতেছ পাশা:
শঙ্খমালা নয় শুধু: অনুরাধা রোহিণীরও চাও ভালোবাসা,
না জানি সে কত আশা—কত ভালোবাসা তুমি বাসিতে গো পার!
এখানে নদীর ধারে বাসমতী ধানগুলো ঝরিছে আবারো ;
প্রান্তরেব কুয়াশায় এইখানে বাদুড়ের যাওয়া আর আসা—

এসেছে সন্ধ্যার কাক ঘরে ফিরে—দাঁড়ায়ে রয়েছে জীর্ণ মঠ ;
মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে—লালপেড়ে পুরোনো শাড়ির
ছবিটি মুছিয়া যায় ধীরে ধীরে —কে এসেছে আমার নিকট?
'কার শিশু? বলো তুমি': শুধালাম ; উত্তর দিল না কিছু বট;
কেউ নাই কোনোদিকে—মাঠে পথে কুয়াশার ভিড় ;
তোমারে শুধাই কবি: 'তুমিও কি জানো কিছু এই শিশুটির।'

৩৭

সোনার খাঁচার বুকে রহিব না আমি আর শুকের মতন ;
কি গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে—কোন্ গান, বলো,
তা হলে এ দেউলের খিলানের গল্প ছেড়ে চলো, উড়ে চলো—
যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়াছে—আছে আতাবন ;
পউষের ভিজে ভোরে, আজ হায় মন যেন করিছে কেমন—
চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, মুখ তুলে চেয়ে দেখ—শুধাই, শুন লো,
কি গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে—কোন্ গান, বলো,
আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও, আমি যে বনের হীরামন ;

রাজকন্যা শোনে নাকো— আজ ভোরে আরসীতে দেখে নাকো মুখ,
কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হয়ে আছে যেন কড়ির মতন—
সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দিনভোর ফেটে যায় রূপসীর বুক!
তবুও সে বোঝে না কি আমারও যে সাধ আছে—আছে আনমন
আমারও যে...চন্দ্রমালা রাজকন্যা, শোনো শোনো, তোলো তো চিবুক।
হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হিম হয়ে গেলে নাকি স্তন।

৩৮

কত দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে ;
আকাশপ্রদীপ জ্বেলে তখন কাহারা যেন কার্তিকের মাস
সাজায়েছে—মাঠ থেকে গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস
ভেসে আসে—ডানা তুলে সাপমাসী উড়ে যায় আপনার মনে
আকন্দ বনের দিকে—একদল দাঁড়কাক ম্লান গুঞ্জরণে
নাটার মতন রাঙা মেঘ নিঙড়ায়ে নিয়ে সন্ধ্যার আকাশ
দু মুহূর্তে ভ'রে রাখে—তারপর মৌরীর গন্ধ মাখা ঘাস
প'ড়ে থাকে ; লক্ষ্মীপেঁচা ডাল থেকে ডালে শুধু উড়ে চলে বনে

আধো-ফোটা জ্যোৎস্নায় ; তখন ঘাসের পাশে কত দিন তুমি
হলুদ শাড়িটি বুকে অন্ধকারে ফিঙ্গার পাখনার মতো
বসেছ আমার কাছে এইখানে—আসিয়াছে শটিবন চুমি
গভীর আঁধার আরো—দেখিয়াছি বাদুড়ের মৃদু অবিরত
আসা-যাওয়া আমরা দুজনে বসে—বলিয়াছি ছেঁড়াফাঁড়া কত
মাঠ ও চাঁদের কথা: ম্লান চোখে একদিন সব শুনেছ তো।

৩৯

এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা ;
চালতার পাতা থেকে টুপ্ টুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির ;
কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর ;
বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা
আকাঙ্ক্ষার ; নিভু দীপ আগলায়ে মনোরমা দিয়ে গেছে দেখা
সঙ্গে তার কবেকার মৌমাছির...কিশোরীর ভিড়
আমের বউল দিল শীতরাতে—আনিল আতার ক্ষীর ;
মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম—এ কবিতা লেখা

তাহাদের ম্লান চুল মনে ক'রে ; তাহাদের কড়ির মতন
ধূসর হাতের রূপ মনে ক'রে ; তাহাদের হৃদয়ের তরে।
সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চলে গেছে পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে:
আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।

৪০

কত দিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নীচে, অন্ধকারে—সন্ধ্যায় ধূসর সজল

মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে—বাদুড় কেবল
করিতেছে আসা-যাওয়া আকাশের মৃদু পথে ;—ছিন্ন ভিজে খড়
বুকে নিয়ে সনকার মতো যেন পড়ে আছে নরম প্রান্তর ;
বাঁকা চাঁদ চেয়ে আছে ;— কুয়াশায় গা ভাসায়ে নেয় অবিরল
নিঃশব্দ গুবরে পোকা—সাপমাসী—ধানী শ্যামাপোকাদের দল ;
দিকে দিকে চালধোয়া গন্ধ মৃদু—ধূসর শাড়ির স্বর

শোনা যায়— মানুষের হৃদয়ের পুরোনো নীরব
বেদনার গন্ধ ভাসে— খড়ের চালের নীচে তুমি আর আমি
কত দিন মলিন আলোয় বসে দেখেছি বুঝেছি এই সব ;
সময়ের হাত থেকে ছুটি পেয়ে স্বপনের গোধূলিতে নামি
খড়ের চালের নীচে মুখোমুখি বসে থেকে তুমি আর আমি
ধূসর আলোয় বসে কতদিন দেখেছি বুঝেছি এই সব।

৪১

এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়—সন্ধ্যায় ঘুমায নীরবে
মাটির ভিটের 'পরে—লেগে থাকে অন্ধকার ধুলোর আঘ্রাণ
তাহাদের চোখে-মুখে—কদমের ডালে পেঁচা গেয়ে যায গান ;
মনে হয একদিন পৃথিবীতে হয়তো এ-জ্যোৎস্না শুধু রবে,
এই শীত রবে শুধু ; রাত্রি ভ'রে এই লক্ষ্মীপেঁচা কথা কবে—
কাঁঠালেব ডাল থেকে হিজলের ডালে গিযে করিবে আহ্বান
সাপমাসী পোকাটিরে...সেই দিন আঁধারে উঠিবে ন'ড়ে ধান
ইঁদুরের ঠোঁটে চোখে—বাদুড়ের কালো ডানা করমচা-পল্লবে

কুয়াশারে নিঙড়ায়ে উড়ে যাবে আরো দূর নীল কুযাশায ;
কেউ তাহা দেখিবে না—সেদিন এ পাড়াগাঁর পথের বিস্ময
দেখিতে পাব না আর—ঘুমায়ে বহিবে সব: যেমন ঘুমায
আজ রাত্রে; যেমন ঘুমায মৃত যারা ; যেমন হতেছে ক্ষয
অশ্বথ ঝাউযের পাতা চুপে চুপে আজ রাতে হায;
যেমন ঘুমায মৃতা—তাহার বুকের শাড়ি যেমন ঘুমায।

৪২

একদিন যদি আমি কোনো দূর বিদেশের সমুদ্রেব জলে
ফেনার মতন ভাসি শীত রাতে—আসি নাকো তোমাদেব মাঝে
ফিরে আব—লিচুর পাতার 'পরে বহুদিন সাঁঝে
যেই পথে আসা-যাওযা করিয়াছি—একদিন নক্ষত্রের তলে
কয়েকটা নাটাফল তুলে নিয়ে আনারসী শাড়ির আঁচলে
ফিঙার মতন তুমি লঘু চোখে চ'লে যাও জীবনের কাজে,
এই শুধু...বেজীর পায়ের শব্দ পাতার উপরে যদি বাজে
সারা রাত...ডানার অস্পষ্ট ছায়া বাদুড়ের ক্লান্ত হযে চলে

যদি সে পাতার 'পরে—শেষ রাতে পৃথিবীর অন্ধকারে শীতে
তোমার ক্ষীরের মতো মৃদু দেহ—ধূসর চিবুক, বাম হাত

চালতা গাছের পাশে খোড়ো ঘরে স্নিগ্ধ হয়ে ঘুমায় নিভৃতে,
তবুও তোমার ঘুম ভেঙে যাবে একদিন চুপে অকস্মাৎ,
তুমি যে কড়ির মালা দিয়েছিলে— সে হার ফিরায়ে দিতে
যখন কে এক ছায়া এসেছিল… দরজায় করে নি আঘাত।

৪৩

দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালির মন
আজ রাতে ; একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে,
তবুও সে ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরির মৃদু গন্ধে ভরে রবে—কিশোরীর স্তন—
প্রথম জননী হয়ে যেমন নরম দুধে গলে
পৃথিবীর সব দেশে—সব চেয়ে ঢের দূর নক্ষত্রের তলে
সব পথে এই সব শান্তি আছে : ঘাস—চোখ—শাদা হাত—স্তন—

কোথাও আসিবে মৃত্যু—কোথাও সবুজ মৃদু ঘাস
আমারে রাখিবে ঢেকে—ভোরে, রাতে, দুপহরে পাখির হৃদয়
ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে—রাতের আকাশ
নক্ষত্রের নীল ফুলে ফুটে রবে— বাংলার নক্ষত্র কি নয়?
জানি নাকো ; তবুও তাদের বুকে স্থির শান্তি—শান্তি লেগে রয় :
আকাশের বুকে তারা যেন চোখ—শাদা হাত—যেন স্তন—ঘাস—।

৪৪

১৩২৬ এর কতকগুলো দিনের স্মরণে

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী ;
ছড়ায়েছি খইধান বহু দিন উঠানের শালিখের তরে ;
সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেক দিন—দেখিযাছি ধূপ জ্বাল, ধর সন্ধ্যাবাতি
থোড়েব মতন শাদা ভিজে হাতে—এখুনি আসিবে কিনা রাতি
বিনুনি বেঁধেছ তাই—কাঁচপোকা টিপ তুমি কপালের 'পরে
পরিযাছ…তারপর ঘুমাযেছ : জরিপাড় আঁচলটি ঝরে
পানের বাটার 'পরে ; নোনার মতন নম্র শরীরটি পাতি

নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছ—বউকথাকওটির ছানা
নীল জামরুল-নীড়ে—জ্যোৎস্নায—ঘুমায়ে রয়েছে যেন হায,
আর রাত্রি মাতা-পাখিটির মতো ছড়ায়ে রয়েছে তার ডানা।…
আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোয কাঁটায
চলে গেছি বহু দূরে—দেখ নিকো, বোঝ নিকো, কর নিকো মানা;
রূপসী শঙ্খের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন—পানের বাটায।

৪৫

ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর—
সবুজ ঘাসের থেকে ; তাই রোদ ভালো লাগে—তাই নীলাকাশ

মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয়—পথে পথে তাই এই ঘাস
জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয়—মউমাছিদের যেন নীড়
এই ঘাস—যত দূর যাই আমি আরো যত দূর পৃথিবীর
নরম পায়ের তলে যেন কত কুমারীর বুকের নিঃশ্বাস
কথা কয়—তাহাদের শান্ত হাত খেলা-করে—তাদের খোঁপার ফাঁস
খুলে যায়—ধূসর শাড়ির গন্ধে আসে তারা—অনেক নিবিড়

পুরোনো প্রাণের কথা কয়ে যায়—হৃদয়ের বেদনার কথা—
সান্ত্বনার নিভৃত নরম কথা—মাঠের চাঁদের গল্প করে—
আকাশের নক্ষত্রের কথা কয়—শিশিরের শাদা সরলতা
তাহাদের ভালো লাগে—কুয়াশারে ভালো লাগে চোখের উপরে
গরম বৃষ্টির ফোঁটা ভালো লাগে; শীত রাতে—পেঁচার নম্রতা;
ভালো লাগে এই যে অশ্বত্থ পাতা আমপাতা সারা রাত ঝরে।

৪৬

বৃষ্টির জল

এই জল ভালো লাগে—বৃষ্টির রূপালি জল কত দিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ—বুলায়ে দিয়েছে চুল—চোখের উপরে
তার শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে খেলিয়াছে—আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চ'লে গেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে;
এই জল ভালো লাগে—নীল পাতা মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশে
ফিঙ্গা যেমন তার দিনগুলো ভালোবাসে—বনের ভিতরে
বারবার উড়ে যায়—তেমনি গোপন প্রেমে এই জল ঝরে
আমাব দেহেব 'পরে আমার চোখের 'পরে ধানেব আবেশে

ঝ'রে পড়ে—যখন অঘ্রান রাতে ভরা ক্ষেত হয়েছে হলুদ,
যখন জামের ডালে পেঁচার নবম হিম গান শোনা যায়,
বনের কিনারে ঝরে যেই ধান বুকে ক'রে শান্ত শালি-ক্ষুদ,
তেমনি ঝরিছে জল আমার ঠোঁটের 'পরে—চোখের পাতায—
আমার চুলের 'পবে—অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আতায়
রেখেছে নবম হাত যেন তার—ঢালিছে বুকের থেকে দুধ।

৪৭

একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি: আমার শরীর
নরম ঘাসের পথে হাঁটিয়াছে; বসিযাছে ঘাসে,
দেখিযাছে নক্ষত্রেরা জোনাকী পোকার মতো কৌতুকেব মতন আকাশে
খেলা করে; নদীব জলের গন্ধে ভ'রে যায় ভিজে সিগ্ধ তীর
অন্ধকারে; পথে পথে শব্দ পাই কাহাদের নরম শাড়ির,
ম্লান চুল দেখা যায়; সান্ত্বনার কথা নিয়ে কারা কাছে আসে—
ধূসর কড়ির মতো হাতগুলো—নগ্ন হাত সন্ধ্যার বাতাসে
দেখা যায়; হলুদ ঘাসের কাছে মরা প্রজাপতিটির

সুন্দর করুণ পাখা প'ড়ে আছে—দেখি আমি; চুপে থেমে থাকি;

আকাশে কমলা রঙ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়—কাকগুলো নীল মনে হয়;
অনেক লোকের ভিড়ে ডুবে যাই—কথা কই—হাতে হাত রাখি:
করুণ বিষন্ন চুলে কার যেন কোথাকার গভীর বিস্ময়
লুকায়ে রয়েছে বুঝি... নক্ষত্রের নীচে আমি ঘুমাই একাকী;
পেঁচার ধূসর ডানা সারা রাত জোনাকীর সাথে কথা কয়।

৪৮

পৃথিবীর পথে আমি বহু দিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর
অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি; পৃথিবীতে আমি বহু দিন
কাটায়েছি; বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে—যেন পরী জিন্
কথা কয়; ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের 'পর
খইয়ের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর্ ঝর্
দু-ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি—শাদা ধুলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন,
ম্লান গন্ধ মাঠে ক্ষেতে—গুবরে পোকার তুচ্ছ বুক থেকে ক্ষীণ
অস্পষ্ট করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে বনের ভিতর:

এই সব দেখিয়াছি; দেখিযাছি নদীটিরে—মজিতেছে ঢালু অন্ধকারে;
সাপমাসী উড়ে যায়; দাঁড়কাক অশ্বথের নীড়ের ভিতর
পাখনার শব্দ করে অবিরাম; কুয়াশায় একাকী মাঠের ধারে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে; আরো দূরে দু'একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর
প'ড়ে আছে; নলখাগড়ার বনে ব্যাঙ ডাকে কেন যেন—থামিতে কি পারে;
'তুমি কেন এইখানে', 'তুমি কেন এইখানে— শরের বনের থেকে দেয় সে উত্তর।
(আবার পাখনা নাড়ে— কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।)

৪৯

মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ
পেয়ে গেছি; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
সূর্যের রাঙা ঘোড়া: পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে; দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসদের সাধ
উঠেছে আনন্দে জেগে—নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন অবাধ
চ'লে গেছে কলরবে; দেখেছি সবুজ ঘাস—যতদূর চোখ যেতে পারে
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ঢেকে আছে; দেখিয়াছি বাসমতী, কাশবন, আকাঙ্ক্ষার রক্ত, অপরাধ

মুছায়ে দিতেছে যেন বারবার—কোন্ এক রহস্যের কুয়াশার থেকে
যেখানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ, সেই কুহকের থেকে এসে
রাঙা রোদ, শালি ধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বারবার রাখিতেছে ঢেকে
আমাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু—আমাদের বিস্মিত নীরব
রেখে দেয়—পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের, অশ্রু গেছি রেখে
তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে এসে মুছে দেয় সব।

৫০

তুমি কেন বহু দূরে —ঢের দূরে—আরো দূরে—নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ,
তুমি কেন কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বল নাকো একটিও কথা;

আমরা মিনার গড়ি—ভেঙে পড়ে দু-দিনেই—স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা
রক্ত হয়ে ঝরে শুধু এইখানে—ক্ষুধা হয়ে ব্যথা দেয়—নীল নাভিশ্বাস
ফেনায়ে তুলিছে শুধু পৃথিবীতে পিরামিড-যুগ থেকে আজও বারোমাস;
আমাদের সত্য আহা রক্ত হয়ে ঝরে শুধু—আমাদের প্রাণের মমতা
ফড়িঙের ডানা নিয়ে ওড়ে আহা : চেয়ে দেখে অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা
ক্ষমাহীন—বারবার পথ আটকায়ে ফেলে—বারবার করে তারে গ্রাস;

তারপর চোখ তুলে দেখি অই কোন্ দূর নক্ষত্রের ক্লান্ত আয়োজন
ক্লান্তিরে ভুলিতে বলে —ঘিয়ের সোনার–দীপে লাল নীল শিখা
জ্বলিতেছে যেন দূর রহস্যের কুয়াশায়—আবার স্বপ্নের গন্ধে মন
কেঁদে ওঠে—তবু জানি আমাদের স্বপ্ন হতে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
ঝরে শুধু—স্বপ্ন কি দেখে নি বুদ্ধ—নিউসিডিয়ায় বসে দেখে নি মণিকা?
স্বপ্ন কি দেখে নি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী, বেবিলন?

৫১

আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি স'রে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ;
তোমার অনন্ত নীল সোনালি ভোমরা নিয়ে কোনো দূর শান্তির ভিতরে
ডুবে যাবে?...কত কাল কেটে গেল, তবু তার কুয়াশার পর্দা না সরে;
পিরামিড বেবিলন শেষ হল—ঝ'রে গেল কতবার প্রান্তরের ঘাসঃ
তবুও লুকায়ে আছে যেই রূপ নক্ষত্রে তা কোনোদিন হল না প্রকাশ:
যেই স্বপ্ন যেই সত্য নিয়ে আজ আমরা চলিয়া যাই ঘরে,
কোনো এক অন্ধকারে হয়তো তা আকাশের যাযাবর মরালের স্বরে
নতুন স্পন্দন পায়—নতুন আগ্রহে গন্ধে ভ'রে ওঠে পৃথিবীর শ্বাস;

তখন আমরা অই নক্ষত্রের দিকে চাই—মনে হয় সব অস্পষ্টতা
ধীরে ধীরে ঝরিতেছে,—যেই রূপ কোনোদিন দেখি নাই পৃথিবীর পথে,
যেই শান্তি মৃত জননীর মতো চেয়ে থাকে—কয় নাকো কথা,
যেই স্বপ্ন বার বার নষ্ট হয় আমাদের এই সত্য রক্তের জগতে,
আজ যাহা ক্লান্ত ক্ষীণ, আজ যাহা নগ্ন চূর্ণ—অন্ধ মৃত হিম,
একদিন নক্ষত্রের দেশে তারা হয়ে রবে গোলাপের মতন রক্তিম।

৫২

এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি—আমি হৃষ্ট কবি
আমি এক—ধুয়েছি আমার দেহ অন্ধকারে একা একা সমুদ্রেব জলে;
ভালোবাসিয়াছি আমি রাঙা রোদ, ক্ষান্ত কার্তিকের মাঠে—ঘাসের আঁচলে
ফড়িঙের মতো আমি বেড়ায়েছি;—দেখেছি কিশোরী এসে হলুদ করবী
ছিঁড়ে নেয়—বুকে তার লাল-পেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো ছবি
ফুটাতেছে—ভোরের আকাশখানা রাজহাঁস ভরে গেছে নব কোলাহলে
নব নব সূচনার; নদীর গোলাপি ঢেউ কথা বলে—তবু কথা বলে,
তবু জানি তার কথা কুয়াশায় ফুরায় না—কেউ যেন শুনিতেছে সবই

কোন্ রাঙা শাটিনের মেঘে ব'সে—অথবা শোনে না কেউ, শূন্য কুয়াশায়

মুছে যায় সব তার; একদিন বর্ণচ্ছটা মুছে যাব আমিও অমন;
তবু আজ সবুজ ঘাসের 'পরে ব'সে থাকি; ভালোবাসি; প্রেমের আশায়
পায়ের ধ্বনির দিকে কান পেতে থাকি চুপে; কাঁটাবহরের ফল করি আহরণ :
কারে যেন এইগুনো দেব আমি; মৃদু ঘাসে একা একা ব'সে থাকা যায়
এই সব সাধ নিয়ে; যখন আসিবে ঘুম তারপর, ঘুমাব তখন।

৫৩

বাতাসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি—ঝরিতেছে ধীরে ধীরে অপরাহ্ণ ভ'রে;
সোনালি রোদের রঙ দেখিয়াছি—দেহের প্রথম কোন্ প্রেমের মতন
রূপ তার—এলোচুল ছড়ায়ে রেখেছে গূঢ় রূপ —আনারস বন;
ঘাস আমি দেখিয়াছি; দেখেছি সজনে ফুল চুপে চুপে পড়িতেছে ঝ'রে
মৃদু ঘাসে; শান্তি পায়; দেখেছি হলুদ পাখি বহুক্ষণ থাকে চুপ করে,
নির্জন আমের ডালে দুলে যায়—দুলে যায়—বাতাসের সাথে বহুক্ষণ;
শুধু কথা, গান নয়—নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবের জীবন
বুঝিয়াছি: শুপুরির সারিগুনো দিনরাত হাওয়ায় উঠিতে আছে ন'ড়ে,

দিনরাত কথা কয়, ক্ষীরের মতন ফুল বুকে ধরে, তাদের উৎসব
ফুরায় না; মাছরাঙাটির সাথী মরে গেছে—দুপুরের নিঃসঙ্গ বাতাসে
তবু ঐ পাখিটির নীল লাল কমলা রঙের ডানা স্ফুট হয়ে ভাসে
আম নিম জামরুলের; প্রসন্ন প্রাণের স্রোত—অশ্রু নাই—প্রশ্ন নাই কিছু,
ঝিলমিল ডানা নিয়ে উড়ে যায় আকাশের থেকে দূর আকাশের পিছু;
চেয়ে দেখি ঘুম নাই—অশ্রু নাই— প্রশ্ন নাই বটফলগন্ধ-মাখা ঘাসে।

৫৪

একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলাব
জেগেছিল; বাঙালি নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিল দেহ একদিন,
বাংলার পথে পথে হেঁটেছিল গাংচিল শালিখের মতন স্বাধীন;
বাংলার জল দিয়ে ধুয়েছিল ঘাসের মতন স্ফুট দেহখানি তার;
একদিন দেখেছিলো ধূসর বকের সাথে ঘরে চ'লে আসে অন্ধকাব
বাংলার; কাঁচা কাঠ জ্বলে ওঠে—নীল ধোঁয়া নরম মলিন
বাতাসে ভাসিয়া যায় কুয়াশার করুণ নদীর মতো ক্ষীণ;
ফেনসা চালের গন্ধে আমমুকুলের গন্ধ মিশে যায় যেন বারবার;

এই সব দেখেছিল; রূপ যেই স্বপ্ন আনে—স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে,
শিখেছিল সেইসব একদিন বাংলার চন্দ্রমালা রূপসীর কাছে;
তারপর বেতবনে, জোনাকি ঝিঁঝির পথে হিজল আমের অন্ধকারে
ঘুরেছে সে সৌন্দর্যের নীল স্বপ্ন বুকে ক'রে—রূঢ় কোলাহলে গিয়ে তারে—
ঘুমন্ত কন্যারে সেই জাগাতে যায় নি আর—হয়তো সে কন্যার হৃদয়
শঙ্খের মতন রুক্ষ, অথবা পদ্মের মতো—ঘুম তবু ভাঙিবার নয়।

৫৫

আজ তারা কই সব? ওখানে হিজল গাছ ছিল এক—পুকুরের জলে

বহুদিন মুখ দেখে গেছে তার; তারপর কি যে তার মনে হল কবে
কখন সে ঝরে গেল, কখন ফুরাল, আহা—চ'লে গেল কবে যে নীরবে,
তাও আর জানি নাকো—ঠোঁট-ভাঙা দাঁড়কাক ওই বেলগাছটির তলে
রোজ ভোরে দেখা দিত—অন্য সব কাক আর শালিখের হৃষ্ট কোলাহলে
তারে আর দেখি নাকো—কত দিন দেখি নাই; সে আমার ছেলেবেলা হবে,
জানালার কাছে এক বোলতার চাক ছিল—হৃদয়ের গভীর উৎসবে
খেলা ক'রে গেছে তারা বহু দিন—ফড়িঙ কীটের দিন যত দিন চলে

তাহাবা নিকটে ছিল—রোদের আনন্দে মেতে—অন্ধকারে শান্ত ঘুম খুঁজে
বহুদিন কাছে ছিল—অনেক কুকুর আজ পথে ঘাটে নড়াচড়া করে
তবুও আঁধারে ঢের মৃত কুকুরের মুখ—মৃত বিড়ালের ছায়া ভাসে:
কোথায় গিয়েছে তারা? অই দূর আকাশের নীল লাল তারার ভিতরে
অথবা মাটির বুকে মাটি হয়ে আছে শুধু—ঘাস হয়ে আছে শুধু ঘাসে?
শুধালাম...উত্তর নাইকো কিছু উদাসীন অসীম আকাশে।

৫৬

হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু প'ড়ে থাকে তার,
আমরা জানি না তাহা—মনে হয় জীবনে যা আছে আজ তাই শালি ধান
রূপশালি ধান তাহা... রূপ, প্রেম... এই ভাবি... তারপর খোসার মতন ম্লান
একদিন তাহাদের অসাড়তা ধবা পড়ে—যখন সবুজ অন্ধকাব,
নরম বাত্রির দেশ, নদীর জলে গন্ধ কোন্ এক নবীনাগতার
মুখখানা নিয়ে আসে—মনে হয় কোনোদিন পৃথিবীতে প্রেমেব আহ্বান
এমন গভীর ক'রে পেয়েছি কি: প্রেম যে নক্ষত্র আর নক্ষত্রের গান,
প্রাণ যে অন্ধকারের মতো প্রান্তরের গাঢ়নীল অমাবস্যার—

চলে যায় আকাশের সেই দূর নক্ষত্রের লাল নীল শিখার সন্ধানে,
প্রাণ যে অন্ধকারের মতো আমার এ—আর তুমি স্বাতীর মতন
রূপের বিচিত্র বাতি নিয়ে এলে—তাই প্রেম ধূলায় কাঁটায় যেইখানে
মৃত হয়ে পড়ে ছিল পৃথিবীর শূন্য পথে পেল সে গভীর শিহরণ;
তুমি সখি ডুবে যাবে মুহূর্তেই রোমহর্ষে—অরুণের স্নানে
জানি আমি; প্রেম যে তবুও প্রেম : স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রবে, বাঁচিতে সে জানে।

৫৭

কোনোদিন দেখিব না তারে আমি; হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়েব রাতে
কালো মেঘ নিঙড়ায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে উচ্ছ্বাসের গান
সারারাত—তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে—বেণুবনে তাহার সন্ধান
পাব নাকো : পুকুরের পাড়ে সে যে আসিবে না কোনোদিন হাসিনের সাথে,
সে কোনো জ্যোৎস্নায় আর আসিবে না—আসিবে না কখনও প্রভাতে
যখন দুপুরে রোদে অপরাজিতার মুখ হয়ে থাকে ম্লান,
যখন মেঘের রঙে পথহারা দাঁড়কাক পেয়েছে গো ঘরের সন্ধান,
ধূসর সন্ধ্যায় সেই আসিবে না সে এখানে—এইখানে ধুন্দুল লতাতে
জোনাকী আসিবে শুধু; ঝিঁঝিঁ শুধু সারারাত কথা কবে ঘাসে আর ঘাসে;

বাদুড় উড়িবে শুধু পাখনা ভিজায়ে নিয়ে শান্ত হয়ে রাতের বাতাসে;
প্রতিটি নক্ষত্র তার স্থান খুঁজে জেগে রবে প্রতিটির পাশে
নীরব ধূলির কণা লেগে রবে তুচ্ছ অণুকণাটির শ্বাসে
অন্ধকারে—তুমি সখি চলে গেলে দূরে তবু—হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে
অশ্বত্থের শাখা ওই দুলিতেছে : আলো আসে, ভোর হয়ে আসে।

৫৮

ঘাসের ভিতরে যেই চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে—আমি ভালোবাসি
নিস্তব্ধ করুণ মুখ তার এই—কবে যেন ভেঙেছিল—ঢের ধূলো খড়
লেগে আছে বুকে তার—বহুক্ষণ চেয়ে থাকি—তারপর ঘাসের ভিতর
শাদা শাদা ধূলোগুনো পড়ে আছে দেখা যায়: খইধান দেখি একরাশি
ছড়ায়ে রয়েছে চুপে: নরম বিষণ্ন গন্ধ পুকুরের জল থেকে উঠিতেছে ভাসি;
কান পেতে থাক যদি— শোনা যায় সরপুঁটি চিতলের স্বর
মীনকন্যাদের মতো যেন : সবুজ জলের ফাঁকে তাহাদের পাতালপুরীর ঘর
দেখা যায়—রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ—রূপালি মাছের দেহ: গভীর উদাসী

চলে যায় মন্ত্রি কুমারের মতো, কোটাল-ছেলের মতো; রাজার ছেলের মতো মিলে
কোন্ এক আকাঙ্খার উদ্‌ঘাটনে কত দূরে—বহুক্ষণ চেয়ে থাকি একা;
অপরাহ্ন এল বুঝি?—রাঙা রৌদ্রে মাছরাঙা উড়ে যায়—ডানা ঝিলমিলে;
এখুনি আসিবে সন্ধ্যা—পৃথিবীতে গোধূলী নামিলে
নদীর নরম মুখ দেখা যাবে—মুখে তার দেহে তার কত মৃদু রেখা
তোমারই মুখের মতো : তবুও তোমার সাথে কোনোদিন হবে নাকো দেখা।

৫৯

(এই সব ভালো লাগে) : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়—আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল—
এই নিয়ে খেলা করে : জানে সে যে বহু দিন আগে আমি করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সব চেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে:
পউষের শেষ রাতে আজও আমি দেখি চেয়ে আবার সে আমাদের দেশে
ফিরে এল; রঙ তার কেমন তা জানে অই টস্‌টসে ভিজে জামরুল,
নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো করুণ আঙুল—
পউষের শেষ রাতে নিমপেঁচাটির সাথে আসে সে যে ভেসে

কবেকার মৃত কাক : পৃথিবীর পথে সে তো নাই আজ আর;
তবুও সে ম্লান জানালার পাশে উড়ে আসে নীরব সোহাগে,
মলিন পাখনা তার খড়ের চালের হিম শিশিরে মাখায়;
তখন এ পৃথিবীতে কোনো পাখি জেগে এসে বসে নি শাখায়;
পৃথিবীও নাই আর—দাঁড়কাক একা একা সারা রাত জাগে;
'কী বা হায় আসে যায়', বলি আমি, 'তারে যদি কোনোদিন না পাই আবার?'
নিমপেঁচা তবু হাঁকে: 'পাবে নাকো কোনোদিন, পাবে নাকো
কোনোদিন, পাবে নাকো কোনোদিন আর।'

৬০

সন্ধ্যা হয়—চারি দিকে মৃদু নীরবতা;
কুটা মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের স্তূপে;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

৬১

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি:
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হল সেই দিন—গিয়েছে যে শান্ত হিম ঘরে,
অথবা সান্ত্বনা পেতে দেরি হবে কিছুকাল—পৃথিবীর এই মাঠখানি
ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছুদিন; এ মাঠের কয়েকটা শালিখের তরে

আশ্চর্য আর বিস্ময়ে আমি চেয়ে রব কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে;
কিংবা সেই সোনালি চিলের ডানা দূর থেকে আজও কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে? সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজও চ'লে যায় সন্ধ্যা সোনার মতো হলে
ধানের নবম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজও চায়?

সন্ধ্যা হলে? মউমাছি চাক আজও বাঁধে না কি জামের নিবিড় ঘন ডালে,
মউ খাওয়া হয়ে গেলে আজও তারা উড়ে যায় কুয়াশায় সন্ধ্যার বাতাসে—
কত দূরে যায় আহা... অথবা হয়তো কেউ চালতাব ঝবাপাতা জ্বালে
মধুর চাকের নীচে—মাছিগুলো উড়ে যায়...ঝ'রে পড়ে...ম'রে থাকে ঘাসে—

ভেবে ভেবে ব্যথা পাব—মনে হবে পৃথিবীর পথে যদি থাকতাম বেঁচে
কিন্তু যাক, সেই লক্ষ্মীপেঁচাটির মুখ যারে কোনোদিন ভালো ক'রে দেখি নাই আমি—
এমনি লাজুক পাখি—ধূসর ডানা কি তার কুয়াশার ঢেউয়ে ওঠে নেচে;
যখন সাতটি তারা ফুটে ওঠে গাবের নিবিড় বুকে আসে সে কি নামি?

জিউলির বাবলার আঁধার গলির ফাঁকে জোনাকীর আলো
ঝরে না কি? ঝিঁঝির সবুজ মাংসে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে বউদের প্রাণ
ভুলে যায়; অন্ধকারে খুঁজে তাবে আকন্দবনের ভিড়ে কোথায় হারালো
মাকাল লতার তলে শিশিরের নীল জলে কেউ তার পাবে না সন্ধান।

আর সেই সোনালি চিলের ডানা—ডানা তার দূর থেকে আজও কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে?—সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজও চ'লে যায় সন্ধ্যা
সোনার মতো হলে?
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজও চায়?
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রব কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে।

'রূপসী বাংলা'র পাণ্ডুলিপি খাতার অন্যান্য কবিতা।

১

সমুদ্রের জলে আমি দেহ ধুয়ে চেয়ে থাকি নক্ষত্রের আকাশের পানে
চারি দিকে অন্ধকার: নারীর মতন হাত; কালো চোখ, ম্লান চুল ঝরে
যতদূর চোখ যায় নীল জল হৃষ্ট মরালের মতো কলরব করে
রাত্রিরে ডাকিতে চায়—বুকে তার, প্রেমমূঢ় পুরুষের মতন আহ্বানে
পৃথিবীর কত প্রেম শেষ হল —তবু এই সমুদ্রের আকাঙ্ক্ষার গানে
বাধা নাই, ভয় নাই, ক্লান্তি নাই, অশ্রু নাই—মালাবার ঢেউয়ের ভিতরে
চারি দিকে নীল নারিকেল বন সোনালি ফুলের গন্ধে, বিস্ময়ের ভরে
জানে তাহা—কত দিন থেকে ওই মলয়ালী আর তার শিশু তাহা জানে

জানি না মান্দ্রাজ নাকি এই দেশ? জানি না মলয় নাকি? কিংবা মালাবার?
জানি না এ পৃথিবীর কোন্ পথ—কোন্ ভাষা কোন্ মুখে এখানে বাতাসে
জানি না যৌবন কবে শেষ হয়ে গেছে কোন্ পৃথিবীর ধুলোতে আমার
তবুও আমার প্রাণ তামিলের কিশোরের মতো ঐ কিশোরীর পাশে
আবার নতুন জন্ম পায় আজ: কেউ নাই অন্ধকারে কবেকার ঘাসে
কত যে মউরী খই ঝরে গেছে—চারি দিকে ফুটে সব উঠিছে আবার।

২

তোমরা স্বপ্নের হাতে ধরা দাও—আকাশের রৌদ্র ধুলো ধোঁয়া থেকে স'রে
এইখানে চলে এসো; পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন তোমাদের কথা
শুনিয়াছি—তোমাদের ম্লান মুখ দেখিযাছি—তোমাদের ক্লান্ত রক্তাক্ততা
দেখিয়াছি কত দিন—ব্যথিত ধানের মতো বুক থেকে পড়িতেছে ঝরে
তোমাদের আশা শান্তি, ম্লান মেঘে সোনালী চিলের মতো কলরব ক'রে
মিছে কেন ফেরো, আহা—পৃথিবীর পথ থেকে হে বিষণ্ন, হে ক্লান্ত জনতা
তোমরা স্বপ্নের ঘরে চলে এসো—এখানে মুছিয়া যাবে হৃদয়ের ব্যথা
সন্ধ্যার বকের মতো চলে এসো নরম শাড়ির মতো শান্ত পথ ধরে।

চারি দিকে রাত্রিদিন কলরব করে যায় দাঁড়কাক বাদুড়ের মতো
পৃথিবীর পথে ঐ—সেখানে কী করে তবে শান্তি পাবে মানুষ বল তো?
এখানে গোধূলি নষ্ট হয় নাকো কোনোদিন—কয়লার মতো রং—ম্লান
পশ্চিমের মেঘে ঐ লেগে আছে চিরদিন; কড়ির মতন শাদা করুণ উঠান
পড়ে আছে চিরকাল; গোধূলি নদীর জলে রূপসীর মতো তার মুখখানা দেখে
ধীরে—ধীরে—আরো ধীরে, শান্তি ঝরে, স্বপ্ন ঝরে আকাশের থেকে।

৩

গুবরে ফড়িং শুধু উড়ে যায় আজ এই সন্ধ্যার বাতাসে,
খড়কুটা ঝরে শুধু শালিকের মুখ থেকে চুপে

বিকল্প পাঠ ॥ কবিতা ২, ছত্র ৮ : 'নরম শাড়ির' স্থানে 'ধূসর স্তনের'

আবার শালিখ, সেই খড়গুলো কুড়ায় নিশ্চুপে।
সন্ধ্যার লাল শিরা মৃদু চোখে ঘরে ফিরে আসে
ঘুঘুর নরম ডাকে—নীরব আকাশে
নক্ষত্রেরা শান্তি পায়—পউষের কুয়াশায় ধূপে
পুঁয়ের সবুজ রাঙা লতা আছে ডুবে।
এ কোমল স্নিগ্ধ হিম সান্ত্বনার মাসে
চোখে তার শান্তি শুধু—লাল লাল ফলে বুক আছে দেখ ভ'রে।
গুবরে ফড়িং কই উড়ে যায় আজ এই সন্ধ্যার বাতাসে,
খড়কুটা ঝরে শুধু শালিখের মুখ থেকে চুপে
আবার শালিখ অই খড়গুলো কুড়ায় নিশ্চুপে।
সন্ধ্যার লাল শিরা মৃদু চোখে ঘরে ফিরে আসে
তবুও তোমারে আমি কোনোদিন পাব নাকো অসীম আকাশে।

৪

অনন্ত জীবন যদি পাই আমি— তা হলে অনন্তকাল একা
পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি দেখিব সবুজ ঘাস
ফুটে ওঠে— দেখিব হলুদ ঘাস ঝরে যায়— দেখিব আকাশ
শাদা হয়ে ওঠে ভোরে— ছেঁড়া মুনিয়ার মতো রাঙা রক্তরেখা
লেগে থাকে বুকে তার সন্ধ্যায়— বারবার নক্ষত্রের দেখা
পাব আমি; দেখিব অচেনা নারী আলগা খোঁপার ফাঁস
খুলে ফেলে চলে যায়— মুখে তার নাই আহা গোধূলির নরম আভাস।

অনন্ত জীবন যদি পাই আমি— তা হলে অসীমকাল একা
পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি— ট্রাম্ বাস্ ধুলো
দেখিব অনেক আমি—দেখিব অনেকগুলো
বস্তি, হাট— এঁদো গলি, ভাঙা কল্কী হাঁড়ি,
মারামারি, গালাগালি, ট্যারা চোখ, পচা চিংড়ি— কত কী দেখিব নাহি লেখা
তবুও তোমার সাথে অনন্তকালেও আর হবে নাকো দেখা।

৫

ঘরের ভিতরে দীপ জ্বলে ওঠে—ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয় সন্ধ্যায়
যখন ঘরের দীপ জ্বলে ওঠে সন্ধ্যায়—ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয়,
ভিজে চালে ডুমুরের পাতা ঝরে—শালিখ বসিয়া থাকে মুহূর্ত সময়
জানালার কাছে এসে, ভিজে জানালার কাছে—মৌমাছি বহুক্ষণ মৃদু গুমরায়
এইসব ভালো লাগে: এইসব ম্লান গন্ধ মৃদু স্বাদ চায়
পৃথিবীর পথে ঘুরে আমার হৃদয়,
ডুমুরের পাতা ঝরে ভিজে চালে—ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয়
মলিন শাড়ির ঘ্রাণ ধূপ হাতে দুয়ারে দাঁড়ায়।
এই সব ভালোবাসি—জীবনের পথে ঘুরে এই সব ভালোবাসে আমার হৃদয়
ঘরে আলো, বৃষ্টি ক্ষান্ত হল সন্ধ্যায়,
ঘরের নরম দীপ জ্বলে ওঠে, ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয়,

বিকল্প পাঠ ॥ কবিতা ৩, ছত্র ৩ : 'সেই' 'স্থানে 'আহা'। কবিতা ৪, ছত্র ২: 'যদি ফিরি আমি' স্থানে 'আমি ফিরি যদি'।

ভিজে চালে কদমের পাতা ঝরে—শালিখ বসিয়া থাকে মুহূর্ত সময়,
মলিন শাড়ির ঘ্রাণ ধূপ হাতে দুয়ারে দাঁড়ায়,
মৃদু আরো মৃদু হয়ে জ্যোৎস্নায় বাতাসে হারায়।

৬

কতদিন ঘাসে আর মাঠে
আমার উৎসাহে প্রাণ কাটে,
খড় খুঁটি—অশ্বত্থের শুকনো পাতা চুপে উল্টাই
দু–একটা পোকা যদি পাই
আমারে চেন না নাকি: আমি যে চড়াই।

কত দিন তোমাদের ভোরের উঠানে
দু-একটা খই আর মুড়কির ঘ্রাণে
উড়ে আসি চুপে
দেখি কোনো রূপে
চাল ডাল ছোলা ক্ষুদ খুঁজে পাই কিনা
ঝুরঝুর ক'রে ফুল ঝরায় সজিনা
থুপ্ থুপ্ থুপ্ থুপ্—একাকী লাফাই
ঘুম নাই— চোখে ক্লান্তি নাই
থুপ্ থুপ্ থুপীর মতন
দেখ নি কি করি আহরণ
চিনি মিঠায়ের গুঁড়ি— মিশ্রির কণা
ছাতু আটা... কলসীর পাশে বুঝি নাচিছে খঞ্জনা!
আকাশে কতটা রোদ
তোমাদের এত কী আমোদ।
ছোটো ছোটো ছেলে আর মেয়েদের দল
উঠানে কিসের এত ভিড়
ছোট ছোটো ছেলে আর মেয়েদের দল
উঠানে কিসের এত ভিড়
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে—তোমাদের নরম শরীর
হাতে তবু পাটকেল—ঢিল?
আমারে তাড়াও কেন? আমি বুঝি দাঁড়কাক চিল!
চীনেবাদামের খোসা শূন্য ঠোঙা এই শুধু চাই
আমি যে চড়াই।
যাই উড়ে যাই
জানালার পাশে
বোলতার চাক খুব বড়ো হয়ে আসে
হলদে বোলতা পাখি, ভাই
এসেছি চড়াই
এনেছি একটা কুটো আর এক খড়
এই নিয়ে ঘরের ভিতর
আমিও বানাব এক ঘর

বিকল্প পাঠ ‖ কবিতা ৫, ছত্র ১৪: 'জ্যোৎস্নায়' স্থানে 'অবিরল'।

কী বল তোমরা
ভাটের বনের থেকে এলে কি ভোমরা
মধু পেলে খুঁজে
সারাদিন একটুও ঘুমাইনি—চোখ আসে বুজে
মাকড়সা, অন্ধকারে আছো তুমি মিশে
এখানে কর্ণিশে
আমারে ঘুমাতে দেবে ভাই
আমি যে চড়াই—
থাক ঘুম—যাই উড়ে যাই
আমি যে চড়াই।
ঘুম নাই—চোখে ক্লান্তি নাই
কাঠমল্লিকায়
কাঁঠালী শাখায়
করবীর বনে
হিজলের সনে
বেগুনের ভিড়ে
ঘাসের শরীরে
যাই—যাই—যাই
চাই—চাই—চাই
গাই—গাই—গাই
ঘুম নাই—নাই
আমি যে চড়াই।
তবু একদিন
যখন হলুদ তৃণ
ভরে আছে মাঠে
পাতায় শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দেখিলাম খানিকটা রোম
মাঠের কিনারে ঘাসে—নির্জন নরম
শিশিরে রয়েছে ডুবে—চোখ বুজে আছে
কেমন সহিষ্ণু ছায়া মুখের উপরে পড়িয়াছে
বহুক্ষণ আমারে থাকিতে বলে এইখানে।
এই স্থির নীরবতা, এই করুণতা
মৃত্যুরে নিঃশেষ করে দেয় নাকি: নক্ষত্রের সাথে গিয়ে কয় নাকি কথা?
এর চেয়ে বেশি রূপ, বেশি রেখা, বেশি করুণতা
আর কে দেখাতে পারে
আকাশের নীল বুকে—অথবা এ ধূলোর আঁধারে।

৭

১

আকাশে চাঁদের আলো— উঠানে চাঁদের আলো— নীলাভ চাঁদে আলো—
এমন চাঁদের আলো আজ
বাতাসে ঘুঘুর ডাক— অশথে ঘুঘুর ডাক— হৃদয়ে ঘুঘু যে ডাকে— নরম

ঘুঘুর ডাক আজ
তুমি যে রয়েছ কাছে— ঘাসে যে তোমার ছায়া— তোমার হাতের ছায়া—
তোমার শাড়ির ছায়া ঘাসে
আকাশে চাঁদের আলো— উঠানে চাঁদের আলো— নীলাভ চাঁদের আলো
—এমন চাঁদের আলো আজ

২

কেউ যে কোথাও নাই— সকলে গিয়েছে মরে— সকলে গিয়েছে চলে—
উঠান রয়েছে শুধু একা
শিশুরা কাঁদে না কেউ— রুগিরা হাঁপায় না তো— বুড়োরা কয় না কথা:
থুবড়ো ব্যথার কথা যত
এখানে সকাল নাই— এখানে দুপুর নাই— এখানে জনতা নাই— এখানে
সমাজ নাই— নাইকো মূর্খ ধাঁধা কিছু
আকাশে চাঁদের আলো— উঠানে চাঁদের আলো— নীলাভ চাঁদের আলো
—এমন চাঁদের আলো আজ

৩

আর তো ক্লান্তি নাই— নাইকো চেষ্টা কাজ— নাইকো রক্ত ব্যথা— বিমূঢ়
ভিড়ের থেকে নিয়েছি জীবন ভরে ছুটি
হেঁটেছি অনেক পথ— আমার ফুরালো পথ— এখানে সকল পথ তোমার
পায়ের পথে গিয়েছে নীলাভ ঘাসে মুছে
তুমি যে রয়েছ কাছে— ঘাসে যে তোমার ছায়া— তোমার হাতের ছায়া
— তোমার শাড়ি ছায়া ঘাসে
আকাশে চাঁদের আলো— উঠানে চাঁদের আলো— নীলাভ চাঁদের আলো
—এমন চাঁদের আলো আজ।

৮

কেমন বৃষ্টি ঝরে— মধুর বৃষ্টি ঝরে—' ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে— রোদে যে বৃষ্টি
ঝরে আজ
কেমন সবুজ পাতা— জামীর সবুজ আরো— ঘাস যে হাসির মতো— রোদ
যে সোনার মতো ঘাসে
সোনার রেখার মতো— সোনার রিঙের মতো— রোদ যে মেঘেব কোলে
—তোমার গালের টোলে রোদ
তোমার চুলে যে রোদ- মেঘের মতন চুলে— তোমার চোখে যে রোদ
— সেও যে মেঘের মতো চোখ
আকাশে সোনলি চিল পাখনা ছড়ায়ে কাঁদে— (এমন সোনালি চিল।
সোনালি রেণুর মতো ঝরিছে কান্না আহা, মিশরে শুনেছি যেন কবে
আকাশে এমনি ছেঁড়া মযলা মেঘব রাশ— পড়েছে তাদের ছায়া নীলের
ঘোলা জলে নিঝুম পিরামিডে
এমনই সোনালি রোদ— সোনার থামের মতো— ঘিযের শিখার মতো
রযেছে আকাশ ছিঁড়ে তবু
কেঁদেছে সোনালী চিল এমনই আকাশ ঘুরে—শুনেছি মিশবে আমি
হাজার হাজার যুগ আগে
তোমার চুলে যে রোদ— মেঘের মতন চুলে—তোমার চোখে যে রোদ

— সেও যে মেঘের মতো চোখ
কেমন বৃষ্টি ঝরে— মধুর বৃষ্টি ঝরে— ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে— রোদে যে বৃষ্টি
ঝরে আজ

সন্ধ্যা হয়ে আসে—সন্ধ্যা হয়ে আসে—
একা একা মাঠের বাতাসে
ঘুবি আমি—বসি আমি ঘাসে।

অই দূরে দেখা যায় কাব লালপাড়
প্রসাদের বউ বুঝি—পাশে বুঝি তার
প্রসাদ রয়েছে বসে—বাড়িতেছে সন্ধ্যার আঁধার

বছর চারেক হল হয়েছিল দুজনের বিয়ে,
মনে পড়ে; তারপর কুড়িয়ে-বাড়িয়ে
আজও তারা যায় নি হারিয়ে।

রোজি তারা সন্ধ্যা হলে আসে
এই মাঠে—বসে থাকে ঘাসে'
লক্ষ লক্ষ তারার আকাশে।

বসে থাকে—মনে হয়
মাঠের চাঁদের কথা কয়
দুজনার প্রাণে ঢের শান্তি ও বিস্ময়

আছে আমি জানি
এরা দুটি পৃথিবীর আঁচলের প্রাণী
মনে কোনো প্রশ্ন নাই—দ্বিধা নাই জানি

প্রাণের আশ্চর্য টান আছে
চিরদিন থাকে কাছে কাছে
বিচ্ছেদে বিনষ্ট হয় পাছে

জীবনের শান্ত গল্প—প্রসাদ কখনো তাই
বড় বেশি তীর্থে যায় নাই
যদি তারে এ কথা শুধাই

মৃত্যুরেও দেবে নাকি ফাঁকি?
কিন্তু থাক্... চেয়ে দেখ যেন দুটি পাখি
বসে আছে—পাখনায় শান্ত পাখা ঢাকি
নক্ষত্রও চেয়ে দেখে সব
এমন নিবিড় স্নিগ্ধ—এমন নীরব
ভালোবাসা: মাটিতেও নয় অসম্ভব?
এই তারা বলে
নীল লাল আলো নিয়ে জ্বলে

চেয়ে দেখে আকাশের তলে

রক্তে রক্তে ভরে আছে মানুষের মন
রোম নষ্ট হয়ে গেছে... গেছে বেবিলন
পৃথিবীর সব গল্প কীটের মতন

একদিন ভেঙে যাবে: হয়ে যাবে ধুলো আর ছাই
রোম নাই আজ আর—বেবিলন নাই
আজও তবু হৃদয়ের হৃদয়কে চাই।

১০

গল্পে আমি পড়িয়াছি কাঞ্চী কাশী বিদিশার কথা
কোনোদিন চোখে দেখি নাই
একদিন ভাবিলাম মাঠে মাঠে কুয়াশায়
যদি আমি কোনোদিন বিদিশায় যাই—

মাঠে মাঠে কুয়াশায় ভাবিলাম এই কথা
বহু দিন বহু বহু রাত ধরে আমি
যদি আমি—কোনোদিন যদি আমি
অবন্তীর পথে গিয়ে নামি—

পউষের কুয়াশায় সাপের খোলস, পাতা, ডিম
পড়ে আছে ঘাসে,
কেন যে করুণ চোখ পথ ভুলে ভেসে গেল
ময়জানি নদীটির পাশে—

এসেছে এ কার বজরা
চারি দিকে শীত নদী: যেন মরুভূমি
বজরার জানালায় কার মুখ,
এই পথে এতদিন পরে কেন তুমি?

কবেকার মাঠ—পথ—মন্দির কুয়াশার ফাঁকে দিল দেখা
হৃদয়ে তাতাল বালির মতো তৃষা
নদীর আঁধার জলে ভরে গেল
আমি যে গো দেখেছি বিদিশা।

সব কথা মনে পড়ে
জলসিড়ি নদী আর জানে না সে কথা
নীলাভ ঘাসের পথে জ্যোৎস্নায়।

১১

চিরদিন শহরেই থাকি
পড়ে থাকি পাটের আড়তে

করি কেরানির কাজ— শুভে লাভে যদি কোনোমতে
দিন যায় চ'লে
আকাশের তলে
নক্ষত্রেরা কয় কোন্ কথা
জ্যোৎস্নায় প্রাণের জড়তা·
ব্যথা কেন পায়
সে সব খবর নিয়ে কাজ কিবা হায়

বিয়ে হয়েছিল কবে—মরে গেছে বউ
যদিও মহুয়া গাছে ফুটে ওঠে মউ
একবার ঝরে গেলে তবু তারপর
মহুয়া মহুয়া তবু: কেরানির ঘর
কেরানির ঘর শুধু হায়
জীবনের গল্প শুধু হায়
জীবনের গল্প শুধু একবার আসে—শুধু একবার নীল কুয়াশায
নিঃশেষে ফুরায়

দেবতা বুঝি না আমি
তীর্থ করি নাকো
তোমরা ঠাকুর নিয়ে থাকো।
তবু আমি একবার ছুটি পেয়ে বেড়াবার তরে
গেলাম খানিকটা দূর—তারকেশ্বরে
গভীর অসাধ নিয়ে—গাঢ় অনিচ্ছায়
ট্রেনে আমি চড়িলাম হায়
কলরবে ধোঁয়ায় ধূলায়
সাধ ক'রে কে বা মিছে যায়

জানি না ঈশ্বর কে বা—জানি শুধু ভূখা ভগবান
দিনগত পাপক্ষয় ক'রে পাব ত্রাণ
তারপর একদিন নিমতলা ঘাটে
কিংবা কাশী মিত্রের তল্লাটে
পড়ে রব

তবুও যখন আমি ঢের রাতে ফিরিলাম ঘর
বুকে জাগে সেই দেশ: তারকেশ্বর।
দেবতারে কে খুঁজেছে— সারাদিন ঘুরিয়াছি পথে
অবসন্ন ধুলোর জগতে
অসংখ্য ভিড়ের মাঝে আমি
একখানা মুখ দেখে গিয়েছি যে থামি
কবে যেন সিংহের মূর্তির কাছে তারে
দেখিয়াছি, এশিরিয়া বেবিলনে তাহারে ফেলেছি দেখে আমি
দেখেছি মিশরে
ঈসিসের ঘরে

বিকল্প পাঠ ॥ কবিতা ১১, ছত্র ১৮: 'বুঝি' স্থানে 'ভজি'। ছত্র ৩৮ : 'সিংহের মূর্তির কাছে তারে' স্থানে 'দেবতার পায়ে তারে'।

সারাদিন— দিনমান আজ এই তারকেশ্বরে
আবার তাহার মুখ দেখিলাম, (আহা,)
ধানসিড়ি নদীটির বিকেলবেলার মৌন জলে
বেতের ফলের মতো যেই চোখ, যেই রূপ
ধরা দেয় পৃথিবীর নীরব আঁচলে
দেখিলাম তাহা
আবার তাহার মুখ দেখিলাম, আহা।

১২

ঘাটশীলা—ঘাটশীলা—
কলকাতা ছেড়ে বলো ঘাটশীলা কে যায় মিছাই
চিরদিন কলকাতা থাকি আমি,
ঘাটশীলা ছাই।

চিঠির উপরে তবু চিঠি
কয়েকটা দিন
এইখানে এসে তুমি থেকে যাও
চিঠিগুনো হয়ে গেল পুরোনো মলিন

তবু আমি গেলাম না
যদিও দেখেছি আমি কলকাতা থেকে
কত দিন কত বাত
ঘাটশীলা গিয়েছে অনেকে

একদিন তাবপব— বহুদিন পবে
অনেক অসাধ অনিচ্ছায
ঘাটশীলা চলিলাম
ঘাটশীলা দেখিলাম হায

আবার এসেছি ফিবে—ধোঁযায ধূলায ভিড়ে
ফুটপাথে—ট্রামেব জগতে
পথ থেকে পথে ফিরি
পথ থেকে ক্লান্ত পথে পথে।

কী হল তোমাব, আহা,
আমার হৃদয
তোমারে যে গোধূলির তেপান্তবে
মাযাবীর মতো মনে হয,

যেন এই পৃথিবীর বেলা শেষ হয়ে গেছে
ম্লান ঘোড়া নিযে একা তুমি
কড়ির পাহাড় খুঁজে ঘুবিতেছ
ঘুরিছ হাড়েব মরুভূমি।

কবিতা ১২, ছত্র ১৪ : 'অনেক' স্থানে 'গভীব'।

বেলা অবেলা কালবেলা

১৯৬১

রচনাকাল

১৯৩৪—১৯৫০

এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল: বেশির ভাগ কবির জীবিতকালে, কয়েকটি তাঁর মৃত্যুর পরে। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি কবিতাই পরে কবি—কর্তৃক কম-বেশি পরিমার্জিত হয়েছিল; সুতরাং প্রথম প্রকাশিত রূপের সঙ্গে বর্তমান রূপের অনেক প্রভেদ ঘটবে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন।

এ কবিতাগ্রন্থের নামটি কবি-কর্তৃক মনোনীত।

কবিতা বিন্যাসের ব্যাপারে সর্বথা কালানুক্রমিক ক্রমান্বয়তা রক্ষা করা যায় নি।

বৈশাখ ১৩৬৮। কলকাতা ২৯

অশোকানন্দ দাশ

মাঘসংক্রান্তির রাতে

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানবহৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্ব'লে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিস্কশিখায়:
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বল নি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

আমাকে একটি কথা দাও

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর—সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুক্‌দের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন:
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।
সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো:
সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর—পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন।

তোমাকে

মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই:
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকই রৌদ্র এখন? সত্যিকারের পাখি?
কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত করে।
রৌদ্রবরন দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে—
নারীর, তবু ভেবেছিলাম বহিঃপ্রকৃতির।
আজকে সে-সব মীনকেতনের সাড়ার মতো, তবু
অন্ধকারের মহাসনাতনের থেকে চেয়ে
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হ'লে

বলে: 'আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী?'
পাতা পাথর মৃত্যু কাজের ভূকন্দরের থেকে আমি শুনি;
নদী শিশির পাখি বাতাস কথা ব'লে ফুরিয়ে গেলে পরে
শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর প্রাণে
সফল হতে গিয়েও তবু বিষণ্নতার মতো।
যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো—
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের শেষে এসে; মানবপ্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

সময়সেতুপথে

ভোরের বেলার মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি,
দুপুরবেলার আকাশে নীল পাহাড় নীলিমা,
সারাটি দিন মীনরৌদ্রমুখর জলের স্বর—
অনবসিত বাহির-ঘরের ঘরণীর এই সীমা।

তবুও রৌদ্র সাগরে নিভে গেল;
বলে গেল: 'অনেক মানুষ মরে গেছে;' অনেক নারীরা কি
তাদের সাথে হারিয়ে গেছে?'—বলতে গেলাম আমি;
উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে চাঁদ না কি সে পাখি
বাতাস আকাশ নক্ষত্র নীড় খুঁজে
বসে আছে এই প্রকৃতির পলকে নিবিড় হয়ে;
পুরুষনারী হারিয়ে গেছে শষ্প নদীর অমনোনিবেশে,
অমেয় সুসময়ের মতো রয়েছে হৃদয়ে।

যতিহীন

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়
কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলা রঙের আলোয়
জ্বলে উঠে ঝরে গেল অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যায় ঢেউয়ে—
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি?—স্বর্গগামী সিঁড়ি

ভেঙে গিয়ে পায়ের নীচে রক্তনদীর মতো—
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারি দিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল ক'রে!
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে—তবু আরেক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে
পথে পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানাল যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন ক'রে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে।
ভাবছে একা একা ব'সে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে:
আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
যে দোর কঠিন; নেই মনে হয়—সে দ্বার খুলে দিয়ে
যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোয় ব্যসন ছাড়িয়ে।

অনেক নদীর জল

অনেক নদীর জল উবে গেছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেল;
সে-সব সময় ভেদ ক'রে ফেলে আজ
কারা তবু কাছে চলে এলো।
যে সূর্য অয়নে নেই কোনো দিন,
—মনে তাকে দেখা যেত যদি—
যে নারী দেখে নি কেউ—ছসাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।
তুমি কথা বল—আমি জীবন-মৃত্যুর শব্দ শুনি:
সকালে শিশিরকণা যে-রকম ঘাসে
অচিরে মরণশীল হয়ে তবু সূর্যে আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।
জন্মতারকার ডাকে বারবার পৃথিবীতে ফিরে এসে আমি
দেখেছি তোমার চোখে একই ছায়া পড়ে :
সে কি প্রেম? অন্ধকার?—ঘাস ঘুম মৃত্যু প্রকৃতির
অন্ধ চলাচলের ভিতরে।
স্থির হয়ে আছে মন; মনে হয় তবু
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে,
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে;
সৃষ্টির গভীর গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।

'এখানে পৃথিবী আর নেই—'

ব'লে তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই
বিদায় নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির পানে;
কল্যাণ কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।
শান্তি এই আজ;
এইখানে স্মৃতি;
এখানে বিস্মৃতি তবু; প্রেম
ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

শতাব্দী

চার দিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি;
ঐখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে ঢের
একটি-দুটি তারার সাথে—তারপরেতে অনেকগুলো তারা;
অন্নে ক্ষুধা মিটে গেলেও মনের ভিতরের
ব্যথার কোনো মীমাংসা নেই জানিয়ে দিয়ে আকাশ ভ'রে জ্বলে;
হেমন্তরাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত আধোগামী হয়ে
চলবে কি না ভাবতে আছে—ঋতুর কামচক্রে সে তো চলে;
কিন্তু আরো আশা আলো চলার আকাশ রয়েছে কি মানবহৃদয়ে।
অথবা এ মানবপ্রাণের অনুতর্ক; হেমন্ত খুব স্থির
সপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণগভীর সময় ব'লে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হলে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি;
চারিদিকে রক্তে রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছুই তবু ফল হল না; এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কী লাভ হতে পারে।
ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে;
কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক
করে দিতে পারে বুঝি মানবভাবনাকে;
অন্ধ অভিভূতের মতো যদিও আজ লোক
চলছে, তবু মানুষকে সে চিনে নিতে বলে:
কোথায় মধু—কোথায় কালের মক্ষিকারা—কোথায় আহ্বান
নীড় গঠনের সমবায়ের শান্তি-সহিষ্ণুতার—
মানুষও জ্ঞানী; তবুও ধন্য মক্ষিকাদের জ্ঞান।
কাছে-দূরে এই শতাব্দীর প্রাণনদীরা রোল
স্তব্ধ করে রাখে গিয়ে যে— ভূগোলের অসারতার পরে
সেখানে নীলকণ্ঠ পাখি ফসল সূর্য নেই,
ধূসর আকাশ—একটি শুধু মেরুন রঙের গাছের মর্মরে
আজ পৃথিবীর শূন্য পথ ও জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়
জেগে ওঠে—এ সুর ক্রমে নরম—ক্রমে হয়তো আরো কঠিন হতে পারে;
সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ ব্যর্থতা জেনেছিল; জানি;
আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।

সূর্য নক্ষত্র নারী

তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিল
সবচেয়ে আগে; জানি আমি।
সে দিনও তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ পৃথিবীতে রয়ে গেছ
আমাকে বলেনি কেউ।
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
রয়ে গেছে—
যে যার নিজের কাজে আছে, এই অনুভবে চ'লে
শিয়রে নিয়ত স্ফীত সূর্যকে চেনে তারা;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কী করে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি—
আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।

স'রে যেত; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব নব সূর্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয়? কেন দেব? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়ো
স্থিরতর প্রিয় তুমি—নিঃসূর্য নির্জন
ক'রে দিতে এলে।
মিলন ও বিদায়েব প্রযোজনে আমি যদি মিলিত হতাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মতো
বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা করে আত্মস্থ হতাম।
তুমি তা জান না, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি—
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিলো, নেই—বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়—মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায়; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়!
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি!

দুই৹

চারি দিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে, নাবি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই, যা জ্বালালে
তোমার শরীর সব আলোকিত করে দিয়ে স্পষ্ট করে দেবে কোনো কালে
শরীরে যা রয়ে গেছে।
এইসব ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে
নতুন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গ'ড়ে তবু তুমি
ব্রহ্মান্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবাব হেতু

অনুভব করেছিলে—
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে ব'লে আজ
আমাকে ইশারাপাত করে গেলে তারই—
অপার কালের স্রোত না পেলে কী ক'রে তবু, নারি,
তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে—
তোমার নিবিড় নিজ চোখ এসে নিজের বিষয় নিয়ে যাবে?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্মঅন্তরঙ্গতার দান
দেখায়ে অনন্তকাল ভেঙে গেলে পরে,
যে দেশে নক্ষত্র নেই—কোথাও সময় নেই আর—
আমারও হৃদয়ে নেই বিভা—
দেখাবে নিজের হাতে—অবশেষে—কী মকরকেতনে প্রতিভা।

তিন

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটাযেছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদযের কাছে ছিল অন্য-কোনো নাম।
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপাতীত লক্ষ্যে অবিরাম চলে যাওয়া।
শোককে স্বীকার ক'রে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।
আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ?—
ভাবি আমি—জানি আমি, তবু
সে কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই—
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।

চারিদিকে প্রকৃতির

চারিদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে রয়েছে।
সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী—
মনে হয় ইহাদের প্রেম
মনে করে নিতে গেলে, চুপে

তিমিরবিদারী রীতি হয়ে এরা আসে
আজ নয়—কোনো এক আগামী আকাশে।
অন্নের ঋণ, বিমলিন স্মৃতি সব
বন্দরবস্তির পথে কোনো এক দিন
নিমেষের রহস্যের মতো ভুলে গিয়ে
নদীর নারীর কথা—আরো প্রদীপ্তির কথা সব
সহসা চকিত হয়ে ভেবে নিতে গেলে বুঝি কেউ
হৃদয়কে ঘিরে রাখে, দিতে চায় একা আকাশের
আশেপাশে অহেতুক ভাঙা শাদা মেঘের মতন।
তবুও নারীর নাম ঢের দূরে আজ,
ঢের দূরে মেঘ;
সারা দিন নিলেমের কালিমার খারিজের কাজে মিশে থেকে
ছুটি নিতে ভালোবেসে ফেলে যদি মন
ছুটি দিতে চায় না বিবেক।
মাঝে মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রসারের থেকে
মানুষের চোখে-পড়া-না-পড়া সে কোনো স্বভাবের
সুর এসে মানবের প্রাণে
কোনো এক মানে পেতে চায়:
যে-পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।
চারিদিকে কলকাতা টোকিয়ো দিল্লী মস্কো অতলান্তিকের কলরব,
সরবরাহের ভোর,
অনুপম ভোরাইয়ের গান;
অগণন মানুষের সময় ও রক্তের যোগান
ভাঙে গড়ে ঘব বাড়ি মরুভূমি চাঁদ
রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক;
প্রীতি নেই—পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের
প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত করে তোলে মোহিনী নরক।
আমাদের এ পৃথিবী যতদূর উন্নত হয়েছে
ততদূর মানুষের বিবেক সফল।
সে চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিন্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।
শাদাসিদে মনে হয় সে সব ফসল:
পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন;—
তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত করে বারবার উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

মহিলা

এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে
ভোরের ভিতর থেকে অন্য এক পৃথিবীর মতো;
এইখানে এসে প'ড়ে—থেমে গেলে—একটি নারীকে

কোথাও দেখেছি ব'লে স্বভাববশত

মনে হয়—কেননা এমন স্থান পাথরের ভারে কেটে তবু
প্রতিভাত হয়ে থাকে নিজের মতন লঘুভারে;
এইখানে সেদিনও সে হেঁটেছিল—আজও ঘুরে যায়;
এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিতে পারে;

অনিত্য নারীর রূপ বর্ণনায় যদিও সে কুটিল কলম
নিয়োজিত হয় নাই কোনোদিন—তবুও মহিলা
না ম'রে অমর যারা তাহাদের স্বর্গীয় কাপড়
কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা

অন্তরঙ্গ করে নিয়ে বানায়েছে নিজের শরীর।
চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসম বাতাস।
দিনগত পাপক্ষয় ভুলে গিয়ে হৃদয়ের দিন
ধারণ করেছে তার শরীরের ফাঁস।

চিতাবাঘ জন্মাবার আগে এই পাহাড়ে সে ছিল;
অজগর সাপিনীর মরণের পরে।
সহসা পাহাড় ব'লে মেঘখণ্ডকে
শূন্যের ভিতরে

ভুল হলে—প্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে হয়;
(চোখ চেয়ে ভালো করে তাকালেই হত;)
কেননা কেবলই যুক্তি ভালোবেসে আমি
প্রমাণের অভাববশত

তাহাকে দেখি নি তবু আজও;
এক আচ্ছন্নতা খুলে শতাব্দী নিজের মুখের নির্থলতা
দেখাবার আগে নেমে ডুবে যায় দ্বিতীয় ব্যথায়;
আদার ব্যাপারী হয়ে এই সব জাহাজের কথা

না ভেবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু
ভয়াবহভাবে অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে নারীর রাং দেখে হো-হো ক'রে হাসে।

দুই

মহিলা তবুও নেমে আসে মনে হয়:
(বমারের কাজ সাঙ্গ হলে
নিজের এয়োরোড্রোমে—প্রশান্তির মতো?)

আছেও জেনেও জনতার কোলাহলে

তাহার মনের ভাব ঠিক কী রকম—
আপনারা স্থির করে নিন;
মনে পড়ে, সেন রায় নওয়াজ কাপুর
আয়াঙ্গার আপ্তে পেরিন—

এমনই পদবী ছিল মেয়েটির কোনো একদিন;
আজ তবু উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল;
সম্বর মৃগের বেড় জড়ায়েছে যখন পাহাড়ে
কখনও বিকেলবেলা বিরাট ময়াল,

অথবা যখন চিল শরতের ভোরে
নীলিমার আধপথে তুলে নিয়ে গেছে
রসুয়েকে ঠোনা দিয়ে অপরূপ চিতলের পেটি—
সহসা তাকায়ে তারা উৎসারিত নারীকে দেখেছে;

এক পৃথিবীর মৃত্যু প্রায় হয়ে গেলে
অন্য-এক পৃথিবীর নাম
অনুভব করে নিতে গিয়ে মহিলার
ক্রমেই জাগছে মনস্কাম;

ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দেখায়ে সমাপ্ত হলে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সঙ্কেতে
পৃথিবীকে জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিল আড়ি পেতে

তাহারা বিশেষ কেউ কিছু নয়—
এখনও প্রাণের হিতাহিত
না জেনে এগিয়ে যেতে চেয়ে তবু পিছু হটে গিয়ে
হেসে ওঠে গৌড়জনোচিত

গরম জলের কাপে ভবেনের চায়ের দোকানে;
উত্তেজিত হয়ে মনে করেছিল (কবিদের হাড়
যতদূর উদ্বোধিত হয়ে যেতে পারে—
যদিও অনেক কবি প্রেমিকের হাতে স্ফীত হয়ে গেছে রাঁঢ়):

উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে এসে উনিশশো পঁচিশের জীব—
সেই নারী আপনার হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন;
সে না হলে মহাকাল আমাদের রক্ত ছেঁকে নিয়ে
বার করে নিত না কি জনসাধারণভাবে স্যাকারিন।

আমাদের প্রাণে যেই অসন্তোষ জেগে ওঠে, সেই স্থির করে;

পুনরায় বেদনায় আমাদের সব মুখ স্থূল হয়ে গেলে
গাধার সুদীর্ঘ কান সন্দেহের চোখে দেখে তবু
শকুনের শেয়ালের চেক্‌নাই কান কেটে ফেলে।

সামান্য মানুষ

একজন সামান্য মানুষকে দেখা যেত রোজ
ছিপ হাতে চেয়ে আছে; ভোরের পুকুরে
চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে;
উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খানিকটা দূরে

আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান;
মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকালবেলায়;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে; তবুও আবার কেটে যায়।

আমার বয়স আজ চল্লিশ বছর;
সে আজ নেই এ পৃথিবীতে;
অথবা কুয়াশা ফেঁসে—ওপারে তাকালে
এ রকম অঘ্রানের শীতে

সে সব রুপোলি মাছ জ্বলে ওঠে রোদে,
ঘাসের ঘ্রাণের মতো স্নিগ্ধ সব জল;
অনেক বছর ধরে মাছের ভিতরে হেসে খেলে
তবু সে তাদের চেয়ে এক তিল অধিক সরল,
এক বীট অধিক প্রবীণ ছিল আমাদের থেকে;
ঐখানে পায়চারি করে তার ভূত—
নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত;

প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় সে সব।
আমাদের পাওয়ার ও পার্টি-পলিটিক্স
জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরেক রকম শ্রীছাঁদ।
কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে—
সে আর সপ্তমী তিথি: চাঁদ।

প্রিয়দের প্রাণে

অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে
আমি আজ দাঁড়ালাম এসে।
চোখের পলকে তবু বোঝা গেল জনতাগভীর তিথি আজ;

কোনো ব্যতিক্রম নেই মানুষবিশেষে।

এখানে রয়েছে ভোর—নদীর সমস্ত প্রীত জল—
কবের মনের ব্যবহারে তবু হাত বাড়াতেই
দেখা গেল স্বাভাবিক ধারণার মতন সকাল—
অথবা তোমার মতো নারী আর নেই।

তবুও রয়েছে সব নিজেদের আবিষ্ট নিয়মে
সময়ের কাছে সত্য হয়ে,
কেউ যেন নিকটেই রয়ে গেছে ব'লে—
এই বোধ ভোর থেকে জেগেছে হৃদয়ে।

আগাগোড়া নগরীর দিকে চেয়ে থাকি;
অতীব জটিল বলে মনে হল প্রথম আঘাতে;
সে-রীতির মতো এই স্থান যেন নয়;
সেই দেশ বহুদিন সয়েছিল ধাতে

জ্ঞান মানমন্দিরের পথে ঘুরে বই হাতে নিয়ে;
তারপর আজকের লোকসাধারণ রাতদিন চর্চা ক'রে,
মনে হয় নগরীর শিয়রের অনিরুদ্ধ ঊষা সূর্য চাঁদ
কালের চাকায় সব আর্ষপ্রয়োগের মতো ঘোরে।

কেমন উচ্ছিন্ন শব্দ বেজে ওঠে আকাশের থেকে;
মানে বুঝে নিতে গিয়ে তবুও ব্যাহত হয় মন;
একদিন হবে তবু এরোপ্লেনের—
আমাদেরও শ্রুতিবিশোধন।

দূর থেকে প্রপেলার সময়ের দৈনিক স্পন্দনে
নিজের গুরুত্ব বুঝে হতে চায় আরো সাময়িক;
রৌদ্রের ভিতরে ওই বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়ম
আকাশ মাটির মধ্যবর্তিনীর মতো যেন ঠিক।

ক্রমে শীত, স্বাভাবিক ধারণার মতো এই নিচের নগরী
আরো কাছে প্রতিভাত হয়ে আসে চোখে;
সকল দুরূহ বস্তু সময়ের অধীনতা মেনে
মানুষ ও মানুষের মৃত্যু হয়ে সহজ আলোকে

দেখা দেয়—সর্বদাই মরণের অতীব প্রসার—
জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু দু-চারটে জীবনের কথা
ব্যবহার করে নিতে গিয়ে দেখে অল্-ক্লিয়ারেরও চেয়ে বেশি
প্রত্যাশায় ব্যাপ্ত কাল ভোলে নি প্রাণের একাগ্রতা।

আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর—
প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে
স্বাভাবিক মনে হয়: উর ময় লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে
না থেমে অভিজ্ঞভাবে চলে যায় প্রিয়তর দেশে।

তার স্থির প্রেমিকের নিকট

বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই—আমি বলি না তা।
কারও লাভ আছে—সকলেরই;—হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েছি ধবল শব্দ—বাতাসতাড়িত পাখিদের।

মোমের প্রদীপ বড়ো ধীরে জ্বলে—ধীরে জ্বলে— আমার টেবিলে;
মনীষার বইগুলো আরো স্থির—শান্ত—আরাধনাশীল;
তবু তুমি রাস্তায় বার হলে—ঘরেরও কিনারে বসে টের পাবে না কি
দিকে দিকে নাচিতেছে কী ভীষণ উন্মত্ত সলিল;

তারই পাশে তোমারও রুধির কোনো বই; কোনো প্রদীপের মতো আর নয়,
হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হয়ে সৈকতের 'পরে
সেও সুর আপনার প্রতিভায়—নিসর্গের মতো:
রূঢ়—প্রিয়—প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।
তাই আমি ভীষণ ভিড়ের ক্ষোভে বিস্তীর্ণ হাওয়ার স্বাদ পাই;
না হলে মনের বনে হরিণীকে জড়ায় ময়াল:
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি সে রকম জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেন্ট পাল—
বুঝিবে আমার কথা; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস্ অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।

অবরোধ

বহুদিন আমার এ হৃদয়কে অবরোধ ক'রে রয়ে গেছে;
হেমন্তের স্তব্ধতায় পুনরায় করে অধিকার।
কোথায় বিদেশে যেন
এক তিল অধিক প্রবীণ এক নীলিমার পারে
তাহাকে দেখি নি আমি ভালো করে—তবু মহিলার
মনন-নিবিড় প্রাণ কখন আমার চোখঠারে
চোখ রেখে ব'লে গিয়েছিল:
'সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবু সময়ও তা বেঁধে দিতে পারে?'

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর;

কী করে প্রাসাদ তাকে বলি আমি?
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার;
মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর;
অথবা কিসের ছবি? কিসের ছবির হাড়গোড়?

কেবল আধেক ছায়া—
ছায়ায় আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি রয়ে গেছে।
কেউ দেখে—কেউ তাহা দেখে নাকো—আমি দেখি নাই।
তবু তার অবলগু কালো টেবিলের পাশে আধাআধি চাঁদনীর রাতে
মনে পড়ে আমিও বসেছি একদিন।
কোথাকার মহিলা সে? কবেকার?—ভারতী নর্ডিক গ্রীক মশ্লিস মার্কিন?
অথবা সময় তাকে শনাক্ত করে না আর;
সর্বদাই তাকে ঘিরে আধোঅন্ধকার;
চেয়ে থাকি—তবুও সে পৃথিবীর ভাষা ছেড়ে পরিভাষাহীন।
মনে পড়ে সেখানে উঠোনে এক দেবদারু গাছ ছিল।
তারপর সূর্যালোকে ফিরে এসে মনে হয় এই সব দেবদারু নয়।
সেইখানে তম্বুরার শব্দ ছিল।
পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে; সুর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।
একদিন রাত্রি এসে সকলের ঘুমের ভিতরে
আমাকে একাকী জেনে ডেকে নিল—অন্য এক ব্যবহারে
মাইলটাক দূরে পুরোপুরি।
সবই আছে—খুব কাছে; গোলকধাঁধার পথে ঘুরি
তবুও অনন্ত মাইল তারপর—কোথাও কিছুই নেই ব'লে।
অনেক আগের কথা এই সব—এই
সময় বৃত্তের মতো গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জানুহীন, মলিন সমাজ
সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ—একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।

পৃথিবীর রৌদ্রে

কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী—
যত দূর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে
মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই
এ রকম ভোরের ভিতরে।

যত দূর মানুষের চোখ চলে যায়
উর ময় হরপ্পা আথেন্‌স্ রোম কলকাতা রোদের সাগরে
অগণন মানুষের শরীরের ভিতরে বন্দিনী

মানবিকতার মতোঃ তবুও তো উৎসাহিত করে?

সে অনেক লোক লক্ষ্য অসম্ভবভাবে মরে গেছে।
ঢের আলোড়িত লোক বেঁচে আছে তবু।
আরো স্মরণীয় উপলব্ধি জন্মাতেছে।
যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে।
যা হল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হয়ে গেছে।

*

কঠিন অমেয় দিন রাত এই সব।
চারি দিকে থেকে থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময়সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে
চেয়ে দেখে শুধু মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।
তবু এই পৃথিবীর জীবনই গভীর।
এক—দুই—শত বছরের
পাথর নুড়ির পথে স্রোতের মতন
কোথায় যে চলে গেছে কোন্ সব মানুষের দেহ,
মানুষের মন।
আজ ভোরে সূর্যালোকিত জল তবু
ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম—
তোমরা শতকী নও;
তোমরা তো উনিশশো অনন্তের মতন সুগম।
আলো নেই? নরনারী কলরোলে আলোর আবহ
প্রকৃতির? মানুষেরও; অনাদির ইতিহাসসহ।

প্রয়াণপটভূমি

বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভছে আকাশ থেকে।
মেঘের শরীর বিভেদ ক'রে বর্শাফলার মতো
সূর্যকিরণ উঠে গেছে নেমে গেছে দিকে—দিগন্তরে;
সকলই চুপ কী এক নিবিদ প্রণয়বশত।
কমলা হলুদ রঙের আলো—আকাশ নদী নগরী পৃথিবীকে
সূর্য থেকে লুপ্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে
ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দেয়—মানবহৃদয়, দিন কি শুধু গেল?
শতাব্দী কি চলে গেল—হেমন্তের এই আঁধারের হিম লাগে;
চেনা জানা প্রেম প্রতীতি প্রতিভা সাধ নৈরাজ্য ভয় ভুল
সব-কিছুকেই ঢেকে ফেলে অধিকতর প্রয়োজনের দেশে
মানবকে সে নিয়ে গিয়ে শান্ত—আরো শান্ত হতে যদি
অনুজ্ঞা দেয় জনমানবসভ্যতার এই ভীষণ নিরুদ্দেশে—

আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনা কালজয়ী
হতে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অমেয় কথা ভাবে—
আজকে যদি দীন প্রকৃতি দাঁড়ায় যতি যবনিকার মতো
শাস্তি দিতে মৃত্যু দিতে—জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেম্‌লিনে লন্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

সূর্য রাত্রি নক্ষত্র

এইখানে মাইল মাইল ঘাস ও শালিখ রৌদ্র ছাড়া আর কিছু নেই।
সূর্যালোকিত হয়ে শরীর ফসল ভালোবাসি:
আমারি ফসল সব—মীন কন্যা এসে ফলালেই
বৃশ্চিক কর্কট তুলা মেষ সিংহ রাশি
বলয়িত হয়ে উঠে আমাকে সূর্যের মতো ঘিরে
নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।
এই নদী নীড় নারী কেউ নয়— মানুষের প্রাণের ভিতরে
এ পৃথিবী তবুও তো সব।
অধিক গভীরভাবে মানবজীবন ভালো হলে
অধিক নিবিড়তরভাবে প্রকৃতিকে অনুভব
করা যায়। কিছু নয় অন্তহীন ময়দান অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র—
তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর—
অভাবে সমাজ নষ্ট না হলে মানুষ এই সবে
হয়ে যেত এক তিল অধিক বিভোর।

জয়জয়ন্তীর সূর্য

কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠের বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে;
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হয়েও যা কিছু শুভ্র রয়ে গেছে আজ—
সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে—
সে রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।
কোথাও রৌদ্রের নাম—
অন্নের নারীর নাম ভালো করে বুঝে নিতে গেলে

নিয়মের নিগড়ের হাত এসে কেঁদে
মানুষকে যে আবেগে যত দিন বেঁধে
রেখে দেয়,
যত দিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যত দিন শূন্যতার ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে—তবে
বন্দরে সৌধের ঊর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে—
তত দিন পৃথিবীর কবি আমি—অকবির অবলেশ আমি
ভয় পেয়ে দেখি—সূর্য ওঠে;
ভয় পেয়ে দেখি—অস্তগামী।
যে সমাজ নেই তবু রয়ে গেছে, সেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গ'ড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই—প্রেম আসে নাকো।
কোথাও নিয়তিহীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্রান্তির শব্দ শোনে; পিছে টানে;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি ক'রে চলে;
কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হয়ে পড়ে থাকে জেনে নিয়ে—তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই—তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে?

সংকল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়।
তবুও তো ভোর আসে—হঠাৎ উৎসের মতো, আন্তরিকভাবে;
জীবনধারণ ছেপে নয়—তবু
জীবনের মতন প্রভাবে;
মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।
মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে—আরো এসে যেতে পারে:
মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী—
যদিও কাহারও প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চ'লে:
কাজ ক'রে ভুল হলে, রক্ত হলে মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

হেমন্ত রাতে

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে
হেমন্তলক্ষ্মীর সব শেষ অনিকেত আবছায়া তারাদের
সমাবেশ থেকে চোখ নামায়ে একটি পাখির ঘুম কাছে

পাখিনীর বুকে ডুবে আছে—
চেয়ে দেখি; তাদের উপরে এই অবিরল কালো পৃথিবীর
আলো আর ছায়া খেলে—মৃত্যু আর প্রেম আর নীড়।

এ ছাড়া অধিক কোনো নিশ্চয়তা নির্জনতা জীবনের পথে
আমাদের মানবীয় ইতিহাস চেতনায়ও নেই—(তবু আছে।)
এমনই অঘ্রান রাতে মনে পড়ে—কত সব ধূসর বাড়ির
আমলকী পল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
পৃথিবীর তীরে তীরে ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত
দাঁড়ায়ে রয়েছে কত মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো—

দেখা যেত; এক-আধ মুহূর্ত শুধু; সে-অভিনিবেশ ভেঙে ফেলে
সময়ের সমুদ্রের রক্ত ঘ্রাণ পাওয়া গেল; ভীতিশব্দ রীতিশব্দ মুক্তিশব্দ এসে
আরও ঢের পটভূমিকার দিকে-দিগন্তরে ক্রমে
মানবকে ডেকে নিয়ে চলে গেল প্রেমিকের মতো সসম্ভ্রমে;
তবুও সে প্রেম নয়, সুধা নয়—মানুষের ক্লান্ত অন্তহীন
ইতিহাস-আকূতির প্রবীণতা ক্রমায়ত ক'রে সে বিলীন?

আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হৈমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সংকল্পের তরঙ্গকঙ্কাল
দ্বীপসমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ ক'রে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে।
কেবলই কল্লোল আলো—জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানবহৃদয়
সনাতন মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে—তবু—উনিশশো অনন্তের জয়

হয়ে যেতে পারে, নারি,আমাদের শতাব্দীর দীর্ঘতর চেতনার কাছে
আমরা সজ্ঞান হয়ে বেঁচে থেকে বড়ো সময়ের
সাগরের কূলে ফিরে আমাদেব পৃথিবীকে যদি
প্রিয়তর মনে করি প্রিযতম মৃত্যু অবধি;
সকল আলোর কাজ বিষণ্ন জেনেও তবুও কাজ ক'রে—গানে
গেয়ে লোকসাধারণ করে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।

নারীসবিতা

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের বারে
প্রেমের শরীর চিনে নিতাম চারি দিকের রোদের হাহাকারে—
হাওয়ায় তুমি ভেসে যেতে দখিন দিকে—যেইখানেতে যমের দুয়ার আছে;
অভিচারী বাতাসে বুক লবণ-বিলুণ্ঠিত হলে আবার আমার কাছে
উতরে এসে জানিয়ে দিতে পাখিদেরও—শাদা পাখিদেরও স্খলন আছে;
আমরা যদি রাতের কপাট খুলে দিতাম নীল সাগরের দিকে,
বিষণ্নতার মুখের কারুকার্যে বেলা হারিয়ে যেত জ্যোতির মোজেয়িকে।

দিনের উজ্জ্বল রোদের ঢলে যতটা দূর আকাশ দেখা যায়
তোমার পালক শাদা আরো শাদা হয়ে অমেয় নীলিমায়
ওই পৃথিবীর শাটিন পরা দীর্ঘগড়ন নারীর মতো—তবুও তো এক পাখি;
সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা কি!
যা হয়েছে যা হতেছে সকল পরখ এইবারেতে নীল সাগরের নীড়ে
গুঁড়িয়ে সূর্য নারী হল, অকূলপাথার পাখির শরীরে।

গভীর রৌদ্রে সীমান্তের এই ঢেউ—অতিবেল সাগর, নারী, শাদা
হতে হতে নীলাভ হয়—প্রেমের বিসার, মহীয়সী, ঠিক এ রকম আধা
নীলের মতো, জ্যোতির মতো। মানব ইতিহাসের আধেক নিয়ন্ত্রিত পথে
আমরা বিজোড়; তাই তো দুধের-বরণ-শাদা পাখির জগতে
অন্ধকারের কপাট খুলে শুকতারাকে চোখে দেখার চেয়ে
উড়ে গেছি সৌরকরের সিঁড়ির বহিরাশ্রয়িতা পেয়ে।

অনেক নিমেষ অই পৃথিবীর কাঁটা গোলাপ শিশিরকণা মৃতের কথা ভেবে
তবু আরো অনন্তকাল বসে থাকা যেত—তবু সময় কি তা দেবে।
সময় শুধু বালির ঘড়ি সচল ক'রে বেবিলনের দুপুরবেলার পরে
হৃদয় নিয়ে শিপ্রা নদীর বিকেলবেলা হিরণ সূর্যকরে
খেলা ক'রে না ফুরোতেই কলকাতা রোম বৃহৎ নতুন নামের বিনিপাতে
উড়ে যেতে বলে আমায় তোমার প্রাণের নীল সাগরের সাথে।

না হলে এই পৃথিবীতে আলোর মুখে অপেক্ষাতুর বসে থাকা যেত
পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন—কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত
শাদা রঙের সরোজিনীর মুখের দিকে চেয়ে,
কী এক গভীর বসে থাকার বিষণ্ণতার-কিরণে ক্ষয় পেয়ে,
নারি, তোমায় ভাবা যেত।— বেবিলনে নিভে নতুন কলকাতাতে কবে
ক্রান্তি, সাগর, সূর্য জ্বলে অনাথ ইতিহাসের কলরবে।

উত্তরসামরিকী

আকাশের থেকে আলো নিভে যায় বলে মনে হয়।
আবার একটি দিন আমাদের মৃগতৃষ্ণার মতো পৃথিবীতে
শেষ হয়ে গেল তবে—শহরের ট্রাম
উত্তেজিত হয়ে উঠে সহজেই ভবিতব্যতার
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোন্-এক নিরুদ্দেশ কুড়োতে চলেছে।
এই দিকে পায়দলদের ভিড়—অই দিকে টর্চের মশালে বার বার
যে যার নিজের নামে সকলের চেয়ে আগে নিজের নিকটে
পরিচিত—ব্যক্তির মতন নিঃসহায়;
জনতাকে অবিকল অমঙ্গল সমুদ্রের মতো মনে ক'রে
যে যার নিজের কাছে নিবারিত দ্বীপের মতন

হয়ে পড়ে অভিমানে—ক্ষমাহীন কঠিন আবেগে।

সে মুহূর্ত কেটে যায়; ভালোবাসা চায় না কি মানুষ নিজের
পৃথিবীর মানুষের?—শহরে রাত্রির পথে হেঁটে যেতে যেতে
কোথাও ট্রাফিক থেকে উৎসারিত অবিরল ফাঁস
নাগপাশ খুলে ফেলে কিছুক্ষণ থেমে থেমে এ রকম কথা
মনে হয় অনেকেরই—
আত্মসমাহিতিকূট ঘুমায়ে গিয়েছে হৃদয়ের।
তবু কোনো পথ নেই এখনও অনেক দিন, নেই।
একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসে নি তো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে হোটেলে অলিগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজও সূর্যের বদলে
দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শক্তি, অর্থ, শুধু মানবীর
মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে। সারা দিন—অনেক গভীর
রাতের নক্ষত্র ক্লান্ত হয়ে থাকে তাদের বিলোল কাকলিতে।
সকল নেশন আজ এই এক বিলোড়িত মহা-নেশনের
কুয়াশায় মুখ ঢেকে যে যার দ্বীপের কাছে তবু
সত্য থেকে—শতাব্দীর রাক্ষসী বেলায়
দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশন।

শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ
দাঁড়ায়ে এ জীবনের কতগুলো পরিচিত স্বত্বশূন্য কথা—
যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্চর্য ক্রেংকার
নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই
ভালোবাসা; মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক
দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতা; যুগের নিকটে ঋণ, মনবিনিময়,
এবং নতুন জননীতিকের কথা—আরো স্মরণীয় কাজ
সকলের সুস্থতার—হৃদয়ের কিরণের দাবি করে; আর অদূরের
বিজ্ঞানের আলাদা সজীব গভীরতা;
তেমন বিজ্ঞান যাহা নিজের প্রতিভা দিয়ে জেনে সেবকের
হাত দিব্য আলোকিত করে দেয়—সকল সাধের
কারণ-কর্দম-ফেনা প্রিয়তর অভিষেকে স্নিগ্ধ করে দিতে—
এই সব অনুভব করে নিয়ে সপ্রতিভ হতে হবে না কি।
রাত্রির চলার পথে এক তিল অধিক নবীন
সম্মুখীন—অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা

জেগে আছে। কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাবস্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্দীপ্ত হয়।

বিস্ময়

কখনও বা মৃত জনমানবের দেশে
দেখা যাবে বসেছে কৃষাণ:
মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।

কখনও ফুরুনো ক্ষেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্তের কাছে;
সেও যেন বাবলার কান্ড এক
অঘ্রানের পৃথিবীর কাছে।

সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে:
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত।
চাঁদের ও-পিঠ থেকে নেমেছে এ পৃথিবীর
অন্ধকার ন্যুব্জতার মতো।

সে যেন প্রস্তরখন্ড—স্থির—
নড়িতেছে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তের সাথে;
পুরাতন ছাতকুড়ো ঘ্রাণ দিয়ে
নবীন মাটির ঢেউ মাড়াতে মাড়াতে।

তুমি কি প্রভাতে জাগ?
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে?
আস্তীর্ণ শতাব্দী ব'হে যায় নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে?

কী তারা গিয়েছে দিয়ে—
নষ্ট ধান? উজ্জীবিত ধান?
সুষুম্না নাড়ীর গতি—অজ্ঞাত;
তবু আমি আরো অজ্ঞান

যখন দেখেছি চেয়ে কৃষাণকে
বিশীর্ণ পাগড়ি বেঁধে অস্তাক্ত আলোকে
গঙ্গাফড়িঙের মতো উদ্বাহু
মুকুর উঠেছে জেগে চোখে;

যেন এই মৃত্তিকার গর্ভ থেকে

অবিরাম চিন্তারাশি—নব নব নগরীর আবাসের থাম
জেগে ওঠে একবার;
আর একবার, ঐ হৃদয়ের হিম প্রাণায়াম।

সময়ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্তি শুধু;
অবিরল গ্যাসে আলো, জোনাকীতে আলো;
কর্কট, মিথুন, কন্যা, তুলা ঘুরিতেছে;
আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়ালো।

গম্ভীর এরিয়েলে

ডুবল সূর্য; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।।
রক্ত ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে
নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ
পায় না নব; তবুও উত্তেজনাও যেন পায় না এখন আর;
চার দিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ—সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিযাবের যুগের মতন আঁধারে নীরব।

অন্ধকারের এ হাত আমি ভালোবাসি; চেনা নারীর মতো
অনেক দিনের অদর্শনার পরে আবার হাতের কাছে এসে
জ্ঞানের আলো দিনকে দিয়ে কী অভিনিবেশে
প্রেমের আলো প্রেমকে দিতে এসেছে সময়মতো:
হাত দুখানা ক্ষমাসফল; গণনাহীন ব্যক্তিগত গ্লানি
ইতিহাসের গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি—
সবের পরে মৃত্যুতে নয়—নীরবতায় আত্মবিচারের
আঘাত দেবার ছলে কি রাত এমন স্নিগ্ধ তুমি।

আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।
অনেক জীবিতেরা কঠিন সাঁকো বেয়ে মৃতুনদীর দিকে
জলের ভিতর নামছে—ব্যবহৃত পৃথিবীটিকে
সন্ততিদের চেয়েও বেশি দৈব আঁধার আকাশবাণীর কাছে
ছেড়ে দিয়ে—স্থির করে যায় ইতিহাসের গতি।
যারা গেছে যাচ্ছে—রাতে যাব সকলি তবে।
আজকে এ রাত তোমার থেকে আমায় দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে
তবুও তোমার চোখে আত্মা আত্মীয় এক রাত্রি হয়ে রবে।

তোমায় ভালোবেসে আমি পৃথিবীতে আজকে প্রেমিক, ভাবি।
তুমি তোমার নিজের জীবন ভালোবাসো;কথা

এইখানেতেই ফুরিয়ে গেছে; শুনেছি তোমার আত্মলোলুপতা
প্রেমের চেয়ে প্রাণের বৃহৎ কাহিনীদের কাছে গিয়ে দাবি
জানিয়ে নিদয় খৎ দেখিয়ে আদায় করে নেয়
ব্যাপক জীবন শোষণ ক'রে যে-সব নতুন সচল স্বর্গ মেলে;
যদিও আজ রাষ্ট্র সমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা,
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবুও তোমার গভীর এরিয়েলে।

ইতিহাসযান

সেই শৈশবের থেকে এ-সব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি;
এই সব নক্ষত্র দেখেছি।
বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার দেখা গেছে মানুষের বাড়ি
রোদের ভিতরে যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের
বিষণ্ণ শক্তির মতো আয়োজনে নির্মিত হতেছে;
কোলাহলে—কেমন নিশিত উৎসবে গড়ে ওঠে।
একদিন শূন্যতায় স্তব্ধতায় ফিরে দেখি তারা।
কেউ আর নেই।
পিতৃপুরুষেরা সব নিজ স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে অতীতের দিকে
সরে যায়—পুরোনো গাছের সাথে সহমর্মী জিনিসের মতো
হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনও শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত
দেখেছি পিপুল গাছ
আর পিতাদের ঢেউ
আর সব জিনিস: অতীত।

তারপর ঢের দিন চলে গেলে আবার জীবনোৎসব
যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান, অনেক করুণ।
তবুও আবার মৃত্যু।—তারপর একদিন মউমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে নীল
আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হয়ে ওঠে;—হেমন্তের
অপরাহ্নে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে
কোথাও শণের বনে—হলুদ রঙের খড়ে— চাষার আঙুলে
গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুপে নেমে আসে;
প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে
কী যেন কিসের সৌরব্যবহারে এসে লেগে থাকে।
অথবা কখনো সূর্য—মনে পড়ে—অবহিত হয়ে
নীলিমার মাঝপথে এসে থেমে রয়ে গেছে—বড়ো
গোল—রাহুর আভাস নেই—এমনই পবিত্র নিরুদ্‌বেল।
এই সব বিকেলের হেমন্তের সূর্যছবি—তবু

দেখাবার মতো আজ কোনো দিকে কেউ
নেই আর, অনেকেই মাটির শয়ানে ফুরাতেছে।
মানুষেরা এই সব পথে এসে চলে গেছে—ফিরে
ফিরে আসে;—তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে তারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে—দেখে;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হলে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেও ঘুমোবার জুড়োবার মতো
কিছু নেই;— হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন্
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফিরতির মতো অন্তহীন
সন্ততির সন্ততির হাতে
কাজ ক'রে চলে গেছে কত দিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেকরকম ছিল কেউ-কেউ:
ছোটো বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড়—
সেইখানে বই পড়া হত কিছু—লেখা হত;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ির আলোর মতো কী যেন কেমন এতো আশাবাদ ছিল
তাদের চোখে মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায়;
সংসারে সমাজ দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড়ো;
অথবা বিজয় পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের
এপিঠ-ওপিঠ শুধু;— সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

※

মাঝে-মাঝে প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় তারা সব জড়ো হয়ে যেত—
কোথাও সুন্দর প্রেতসত্য আছে জেনে তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে
কেমন নিবিড়ভাবে বিচলিত হয়ে উঠে, আহা।
সেখানে স্থবির যুবা কোনো-এক তন্বী তরুণীর
নিজের জিনিস হতে স্বীকার পেয়েছে ভাঙা চাঁদে
অর্ধ সত্যে অর্ধ নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে;
অনেক তরুণী যুবা—যৌবরাজ্য যাহাদের শেষ
হয়ে গেছে—তারাও সেখানে অগণন
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো
অনবলুণ্ঠিত ফিকে মৃগতৃষ্ণিকার
মতন জ্যোৎস্নায় এসে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে প্রান্তরের পথে
চাঁদকে নিখিল করে দিয়ে তবু পরিমেয় কলঙ্কে নিবিড়
করে দিতে চেয়েছিল—মনে মনে—মুখে নয়—দেহে
নয়; বাংলার মানসসাধনশীত শরীরের চেয়ে আরো বেশি
জয়ী হয়ে শুক্ল রাতে গ্রামীণ উৎসব
শেষ করে দিতে গিয়ে শরীরের কবলে তো তবুও ডুবেছে বারবার

অপরাধী ভীরুদের মতো প্রাণে।
তারা সব মৃত আজ।
তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মতন জীবিত।

'ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, হাতে খননের
অস্ত্র নেই—মনে হয়—চারি দিকে টিবি-দেয়ালের
নিরেট নিঃসত্ত অন্ধকার'—ব'লে যেন কেউ যেন কথা বলে।
হয়তো সে বাংলার জাতীয় জীবন।
সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিস
সকলের; অধিগত হলে প্রাণ জানালার ফাঁক দিয়ে চোখের মতন
অনিমেষ হয়ে থাকে নক্ষত্রের আকাশে তাকালে।
আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে?
আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধসত্য বলে গেছে
অর্ধমিথ্যার? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায়; তবু ভয়—হয়তো বা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে রয়ে গেছে—জ্যোতির্গ্রন্থে;
জীবনের জন্যে আজও নেই।
অনেক মানুষী খেলা দেখা হল, বই পড়া সাঙ্গ হল—তবু
কে বা কাকে জ্ঞান দেবে—জ্ঞান বড়ো দূর পৃথিবীর
রুক্ষ গন্ধে; আমাদের জন্যে দূর—দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই; স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
চারি দিক থেকে ঘিরে কেবলই বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
রয়ে গেছে। নিজেকে কেবলই আত্মক্রীড় করি; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়
পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই;
লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দুহাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনও লুপ্ত হই নি তো।

এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হত—হয়তো বা;
তবুও সকলই উৎসে গতি যদি—রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসবে

পাখির প্রমাথী দীপ্তি সাগরের সূর্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,
তা হলে যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে, তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনও আসে নি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বারবার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে; তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর;
সে অনেক প্রতারণাপ্রতিভার সেতুলোক পার
হল ব'লে স্থির;—হতে হবে ব'লে দীন, প্রমাণ, কঠিন;
তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে; সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয়; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে বলে,
মনে হয়; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প

আঁধারে হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই।
সে কারা কাদের এসে বলে:
এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার;
হে আকাশ, হে কালশিল্পী, তুমি আর
সূর্য জাগিয়ো না;
মহাবিশ্বকারুকার্য, শক্তি, উৎস, সাধ:
মহনীয় আগুনের কি উচ্ছ্রিত সোনা?

তবুও পৃথিবী থেকে—
আমরা সৃষ্টির থেকে নিভে যাই আজ;
আমরা সূর্যের আলো পেয়ে
তরঙ্গকম্পনে কালো নদী
আলো নদী হয়ে যেতে চেয়ে
তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
জেনে গেছি কারা ধন্য,
কাবা স্বর্ণপ্রাধান্যের সূত্রপাত করে।

তাহাদের ইতিহাসধারা
ঢের আগে শুরু হয়েছিল;
এখুনি সমাপ্ত হতে পারে;
তবুও আলেয়াশিখা আজও জ্বালাতেছে

পুরাতন আলোর আধারে।

আমাদের জানা ছিল কিছু;
কিছু ধ্যান ছিল;
আমাদের উৎস-চোখে স্বপ্নছটা প্রতিভার মতো
হয়তো-বা এসে পড়েছিল;
আমাদের আশা সাধ প্রেম ছিল;—নক্ষত্রপথের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে
তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে;
আমাদের গেছিল জাগিয়ে
পৃথিবীতে;

আমরা জেগেছি—তবু জাগাতে পারি নি;
আলো ছিল—প্রদীপের বেষ্টনী নেই;
কাজ ছিল—শুরু হ'ল না তো;
তা'হলে দিনের সিঁড়ি কী প্রয়োজনের?
নিঃস্বত্ব সূর্যকে নিয়ে কার তবে লাভ।
সচ্ছল শাণিত নদী, তীরে তার সারসদম্পতি
ওই জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে;
তাদের চোখের রং অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে;
দিনের সূর্যের বর্ণে রাতের নক্ষত্র মিশে যায়;
তবু তারা প্রণয়কে সময়কে চিনেছে কি আজও?
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কে এসে চেনায়!

আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি;
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্‌বেলিত হয়ে অনুভব করে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।
ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চলে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রী করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাসমরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে,
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়—
ডাক দেবে, তবু তার আগে

আমরা ওদের হাতে রক্ত ভুল মৃত্যু হয়ে
হারায়ে গিয়েছি?

জানি ঢের কথা কাজ স্পর্শ ছিল, তবু
নগরীর ঘন্টা-রোল যদি কেঁদে ওঠে,
বন্দরে কুয়াশা বাঁশি বাজে,
আমরা মৃত্যুর হিম ঘুম থেকে তবে
কী ক'রে আবার প্রাণকম্পনলোকের নীড়ে নভে
জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্যশিখা
বুঝে নিয়ে হে উড্ডীন ভয়াবহ বিশ্বশিল্পলোক,
মরণে ঘুমোতে বাধা পাব?—
নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে— যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে করে লবে।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন
আলোকিত হয়ে ওঠে—রাত্রি অন্ধকার
হয়ে আসে; সর্বদাই, পৃথিবীর আহ্নিক গতির
একান্ত নিয়ম, এই সব;
কোথাও লঙ্ঘন নেই তিলের মতন আজও;
অথবা তা হতে হলে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে; সে-সময় আমাদের জন্যে নয় আজ।
রাতের পরের দিন—দিনের পরের রাত নিয়ে সুশৃঙ্খল
পৃথিবীকে বলয়িত মরুভূমি ব'লে
মনে হতে পারে তবু; শহরে নদীতে মেঘে মানুষের মনে
মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
শেষ ক'রে অনুভব করা যেতে পারে কোনো কাল
শেষ হয় নিকো তবু; শিশুরা অনপনেয়ভাবে
কেবলই যুবক হল—যুবকেরা স্থবির হয়েছে,
সকলেরই মৃত্যু হবে—মরণ হতেছে।

অগণন অঙ্কে মানুষের নাম ভোরের বাতাসে
উচ্চারিত হয়েছিল শুনে নিয়ে সন্ধ্যার নদীর
জলের মুহূর্তে সেই সকল মানুষ লুপ্ত হয়ে গেছে জেনে
নিতে হয়; কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হয়ে যায়;
কঠিন নিয়মে নিরঙ্কুশভাবে ভিড়ে মানবের কাজ

অসমাপ্ত হয়ে থাকে—কোথাও হৃদয় নেই তবু।
কোথাও হৃদয় নেই মনে হয়, হৃদয়যন্ত্রের
ভয়াবহভাবে সুস্থ সুন্দরের চেয়ে এক তিল
অবান্তর আনন্দের অশোভনতায়।
ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে; চারি দিকে জীবনের শুভ্র অর্থ রয়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,
বন্ধ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে তার লোকোত্তর মাথার নিকটে
স্বর্গের সিঁড়ির মতো—হুণ্ডি হাতে অগ্রসর হয়ে যেতে হয়।

আমাদের এ শতাব্দী আজ এই পৃথিবীর সাথে
নক্ষত্রলোকের এই অবিরল সিঁড়ির পসরা
খুলে আত্মক্রীড় হল; মাঘসংক্রান্তির রাত্রি আজ
এমন নিস্প্রভ হয়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাঁটার মতন
কাকে বোনে? কেন বোনে? কোন্ দিকে কোথায় চলেছে?
এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে,—ঝাউ শিশু জারুলে হাওয়ার শব্দ থেমে
আরো থেমে-থেমে গেলে—আমাদের পৃথিবীর আহ্নিক গতির
অন্ধ কণ্ঠ শোনা যায়—শোনো, এক নারীর মতন,
জীবন ঘুমায়ে গেছে; তবু তার আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট শরীর
নিশির ডাকের শব্দ শুনে বেবিলনে পথে নেমে
উজ্জয়িনী গ্রীসে রেনেসাঁসে রুশে আধো জেগে, তবু,
হৃদয়ে বিকিয়ে গিয়ে ঘুমায়েছে আর একবার
নির্জন হ্রদের পারে জেনিভার পপলারের ভিড়ে
অন্ধ সুবাতাস পেয়ে; গভীর গভীরতর রাত্রির বাতাসে
লোকার্নো ভের্সাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে
ইউ-এন-ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ—
আরো ঘুম—রয়ে গেছে হৃদয়ের—জীবনের; নারী,
শরীরের জন্যে আরো আশ্চর্য বেদনা
বিমূঢ়তা লাঞ্ছনার অবতার রয়ে গেছে; রাত
এখনও রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায়; বেলজেনের সবচেয়ে বেশি অন্ধকার
নীচে আরো নীচে নীচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে;
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্না, রৌদ্র প্রদীপ্ত হয়, মানুষের মন
সহসা আকাশপথে বনহংসী,-পাখির বর্ণালি
কি রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে—সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে; অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি? তবু, অগণন অর্ধসত্যের

উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

পটভূমির

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ–পনেরো বছর আগে; সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের—জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ: চারি দিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিযন্তা নেই—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে;

তারা যুবা, তারা মৃত, মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজও তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছো, নারি—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারই
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারি দিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
আমরা আজও বহন ক'রে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা...প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।

অন্ধকার থেকে

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভেতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়—
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
কী ক'রে এ প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা,
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব; অনুভব করেছি সকলই।

সূর্য জ্বলে—কল্লোলে সাগরজল কোথাও দিগন্তে আছে, তাই
শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধুতীর।

এই সব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন
জেগে ব্যথা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে
সঞ্চারিত করে গেছে আশা আর আশা;
সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে,
সফল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি

সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

আমরা অনেক যুগ ইতিহাসে সচকিত চোখ মেলে থেকে
দেখেছি আসন্ন সূর্য আপনাকে বলয়িত করে নিতে জানে
নব–নব মৃত সূর্যে শীতে;
দেখেছি নির্ঝর নদী বালিয়াড়ি মরুর উঠানে
মরণেরই নামরূপ অবিরল কী যে!

তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন জেগেছে শালিধান;
ইতিহাস–ধুলো–বিষ উৎসারিত ক'রে নব নবতর মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ ক'রে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশনির্দেশী!

        হয়তো এখনও তাই—তবু
রাত্রি শেষ হলে রোজ পতঙ্গ-পালক-পাতা
                        শিশির-নিঃসৃত শুভ্র ভোরে
আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান ক'রে;
অনেক দ্বেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।

আজও তবু
আজও ঢের গ্লানি–কলঙ্কিত হয়ে ভাবি:
রক্তনদীদের পারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির
শোকাবহ অন্ধ কঙ্কালে কি মাছি তোমাদের মৌমাছির নীড়
অল্পায়ু সোনালী রৌদ্রে;
প্রেমের প্রেরণা নেই—শুধু নির্ঝরিত শ্বাস
পণ্যজাত শরীরের মৃত্যু–ম্লান পণ্য ভালোবেসে;
তবুও হয়তো আজ তোমরা উড্ডীন নব সূর্যের উদ্দেশে।

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানবজীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়— জানি; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব-প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে!
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।

একটি কবিতা

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে;
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ের ঝরা সোনার মতন

সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন; আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর করো—নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে;
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

সারাৎসার

এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর,
অমল ভোরের বেলা রয়ে গেছে শুধু;
আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট করে দিয়ে সূর্য আসে;
অনেক আবছা জল জেগে উঠে নিজ প্রয়োজনে
নদী হয়ে সমস্ত রৌদ্রের কাছে জানাতেছে দাবি;

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা;
আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কী করে মানুষ ও মানুষীর মতো করে রাখে।

তবু তার উপচার নিয়ে সেই নাবী
কোথায় গিযেছে আজ চলে;
এই তো এখানে ছিল সে অনেক দিন;
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে
তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয়:
অনুভব করে আমি অনুভব করেছি সময।

সময়ের তীরে

নীচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,
মাথার ওপর অগণন নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে,
কোনো দূর সমুদ্রের বাতাসের স্পর্শ মুখে রেখে,
আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জরণ শুনে,
কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা

মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো;
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগ্নলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন;
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর;
এক দিকে বালিপ্রলেপী মরুভূমি হু হু করছে;
আর-এক দিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে
মাইলের পর মাইল।
শুধু বাতাস উড়ে আসছে:
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন করে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।
শুধু বাতাসের প্রেতচারণ
অমৃতলোকের অপস্রিয়মান নক্ষত্রযান-আলোর সন্ধানে।
পাখি নেই—সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ;
কোনো গাছ নেই—সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে?
তুমি যে মর্তনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো;
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার করে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।

কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে;
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই;
শাদা সাধারণ নিঃসঙ্কোচ রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আজ;
অথবা ঝর্নার জলে
মিশরী শঙ্খরেখাসর্পিল গাগরীর সমুৎসুকতায়
তুমি আজ সূর্যজলস্ফুলিঙ্গের আত্মা-মুখরিত নও আর।

তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম,
কিংবা ভারতের;
অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্যশিখার কোনো স্থান আছে
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা—সকলের জন্যে!
নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতরুৎসারা নীলিমার মতো

কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন করে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে—লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে!

ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের
জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষীসূর্যের
ডানার উড্ডীন কলরোল;
আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠেছে।

যত দিন পৃথিবীতে

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর বঞ্চনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি যুক্তির
নির্দেশের পথ ধরে চ'লে
হয়তো-বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে—হৃদয়ে;
মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।

ইতিহাসে ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া; গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে;
জীবনের কালোরঙা মানে কি ফুরুবে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে।

জেগে ওঠে তবুও মানুষ রাত্রিদিনের উদয়ে;
চারি দিকে কলরোল করে পরিভাষা
দেশের জাতির স্বার্থ পৃথিবীর তীরে;
ফেনিল অস্ত্র পাবে আশা?
যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব?
কী তবে থাকবে?
আধার ও মননের আজকের এ নিস্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃতি?

ব্যর্থ উত্তরাধিকারে মাঝে-মাঝে তবু

কোথাকার স্পষ্ট সূর্য-বিন্দু এসে পড়ে:
কিছু নেই উত্তেজিত হলে ;
কিছু নেই স্বার্থের ভিতরে ;
ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবই
জানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী;
অন্ধকারে সবচেয়ে সে-শরণ ভালো:
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।

মহাত্মা গান্ধী

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে
ভালো বলে মনে হয়; সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতরভাবে
পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরই হৃদয়ের 'পরে এসে নগ্ন হাত রাখে;
আমরাও আলো পাই—প্রশান্ত অমল অন্ধকার
মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও।

একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিল—শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের।
কেমন সফল এক পর্বতের সানুদেশ থেকে
ঈশা এসে কথা বলে চলে গেল—মনে হল প্রভাতের জল
কমনীয় শুশ্রূষার মতো বেগে এসেছে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা করে আছে বলে—চায় বলে,—
নিরাময় হতে চায় বলে।

পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম উষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু ;
কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি রয়ে গেছে: মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার;
তোমাদের সে-রকম প্রেম ছিল, বহ্নি ছিল, সফলতা ছিল।
তোমাদের চারপাশে সাম্রাজ্য রাজ্যের কোটি দীন সাধারণ
পীড়িত রক্তাক্ত হয়ে টের পেত কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে

নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভ'রে ফেলে তারপর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মতো একজন মানবীয় মহানুভবকে
পাঠাতেছে—প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে—মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ করে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে;
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হয়ে গেছে;
যেই সব বড়ো-বড়ো মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তর্দান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হযেছে—
সহিষ্ণুতায় ভেবে সে-সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ করে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে—কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল
দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ বলে সম্ভাষণ করে নয়—
কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভরে ক্লান্তিহীন নিযোজনে চালাযে নিয়েছে
পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে—সকলের নীচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

আজ এই শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর সচ্ছলতা
এ-রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন এনে সকলের প্রাণ
শতকের আঁধারের মাঝখানে কোনো স্থিরতর
নির্দেশের দিকে রেখে গেছে;
রেখে চলে গেছে—বলে গেছে: শান্তি এই, সত্য এই।
হয়তো-.বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা;
হয়তো-বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায়;
হয়তো-বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন ব'লে—অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি বলে প্রচারিত করার ভিতর;

হয়তো বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা—সুখে থাকা—রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা;
হয়তো বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, এই।

চারি দিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে—মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশালী দেখ;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে—শীত;
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে সরে চলে গেছে;
প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেই সব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যিই আনন্দসৃষ্টির
সে সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর ব'লে;
আমরা অজ্ঞান নই—প্রতিদিনই শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার করি, তবু
কেমন দুরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে
যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল,
যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে,
আকাশে নক্ষত্র সূর্য নীলিমার সফলতা আছে—
আছে, তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই,
প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,
তখন তো পৃথিবীতে আবার ঈশার পুনরুদয়ের দিন
প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই;
তবুও উদয় হয়—ঈশা নয়—ঈশার মতন নয়—আজ এই নতুন দিনেব
আর-একজনের মতো;
মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় ব'লে;
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়;
হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে;
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে—সত্য আছে, আলো আছে, তবুও সত্যের আবিষ্কারে।
আমরা আজকে এই বড়ো শতকের
মানুষেরা সে আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি।
আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়
মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে ব'লে
জেগে রবে; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।

যদিও দিন

যদিও দিন কেবলই নতুন গল্পবিশ্রুতির
তারপরে রাত অন্ধকারে থেমে থাকা; লুপ্তপ্রায় নীড়
সঠিক করে নেয়ার মতো শান্ত কথা ভাবা;
যদিও গভীর রাতের তারা (মনে হয়) ঐশী শক্তির;

তবুও কোথাও এখন আর প্রতিভা আভা নেই;
অন্ধকারে কেবলই সময় হৃদয় দেশ ক্ষয়ে
যেতেছে দেখে নীলিমাকে অসীম করে তুমি
বলতে যদি মেঘনা নদীর মতন অকূল হয়ে:

'আমি তোমার মনের নারী শরীরিণী—জানি;
কেন স্তব্ধ হয়ে থাকো।
তুমি আছো বলে আমি কেবলই দূরে চলতে ভালোবাসি,
চিনি না কোনো সাঁকো।

যতটা দূর যেতেছি আমি সূর্যকরোজ্জ্বলতাময় প্রাণে
ততই তোমার স্বত্বাধিকার ক্ষয়
পাচ্ছে বলে মনে কর? তুমি আমার প্রাণের মাঝে দ্বীপ,
কিন্তু সে-দ্বীপ মেঘনা নদী নয়।'—
এ কথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি
আমাকে—তাকে—যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে
বলে যেতে—শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।

দেশ কাল সন্ততি

কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে?
এ মাঠ পুরোনো লাগে—দেয়ালে নোনার গন্ধ—পায়রা শালিখ সব চেনা?
এক ছাদ ছেড়ে দিয়ে অন্য সূর্যে যায় তারা—লক্ষ্যের উদ্দেশে
তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্ত্বনা দেবে না।

কেন লোভে উদ্‌যাপনা? মুখ ম্লান—চোখে তবু উত্তেজনা সাধ?
জীবনের ধার্য বেদনার থেকে এ নিয়মে নির্মুক্তি কোথায়।
ফড়িং অনেক দূরে উড়ে যায় রোদে ঘাসে—তবু তার কামনা অবাধ
অসীম ফড়িংটিকে খুঁজে পাবে প্রকৃতির গোলকধাঁধায়?

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে;
তবে তার দিন শেষ হয়ে গেল; একদিন হতই তো, যেন এই সব

বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার; যতবার হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাধা ছিঁড়ে যেতে চায়—পরিচিত নিরাশায় ততবার হয় সে নীরব।

অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব;
জানে তাহা কীটেরাও, পতঙ্গেরা, শান্ত শিব পাখির ছানাও;
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায়; হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও?

মহাগোধূলি

সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি—বিকেলের রোদ পড়ে আসে।
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাঁড়ারে;
শাদা পথ ধুলো মাছি—ঘুম হয়ে মিশছে আকাশে;
অস্ত-সূর্য গা এলিয়ে অড়র ক্ষেতের পারে পারে

শুয়ে থাকে; রক্তে তার এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে;
আসন্ন এ ক্ষেতটিকে ভালো লাগে—চোখে অগ্নি তার
নিভে নিভে জেগে ওঠে; স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার।
কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয় হয়;
কেন হিংসা ঈর্শা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব;
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
করে চুপ হয়েছিল—আজও সময়ের কাছে তেমনই নীরব।

মানুষ যা চেয়েছিল

গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম;
খয়েরি শালিখগুলো খেলছে বাতাবী গাছে—তাদের পেটের শাদা রোম
সবুজ পাতার নিচে ঢাকা প'ড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে-কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।
ও কার গোরুর গাড়ি রয়ে গেছে ঘাসে ওই পাখা মেলে ফড়িঙের মতো।
হরিণী রয়েছে বসে নিজের শিশুর পাশে বড়ো চোখ মেলে;
আঁকাবাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুন গোধূলির
মেঘগুলো লেগে আছে; সবুজ ঘাসের' পরে ছবির মতন যেন স্থির;
দিঘির জলের মতো ঠান্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ;
সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করবার মতন অশোক
অনুভূতি জেগে ওঠে মনে। ...
আঁধার নেপথ্য সব চারি দিকে—কূল থেকে অকূলের দিক-নিরূপণে
শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে;
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।

আজকে রাতে

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত; চারি দিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র ঘাস হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর;

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লন্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
নিবিড় নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন্ পাশার দান হাতে:
কী কাজ খুঁজে; সকল অনুশীলন ভালো নয়;
গভীরভাবে জেনেছি যে–সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে
তারই ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

হে হৃদয়

হে হৃদয়,
নিস্তব্ধতা?
চারি দিকে মৃত সব অরণ্যেরা বুঝি?
মাথায় ওপরে চাঁদ
চলছে কেবলই মেঘ কেটে পথ খুঁজে—

পেঁচার পাখায়
জোনাকির গায়ে
ঘাসের ওপরে কী যে শিশিরের মতো ধূসরতা
দীপ্ত হয় না কিছু?
ধ্বনিও হয় না আর?

হলুদ দু ঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিখের মতো যেন কথা
বলে চলে তবুও জীবন:
বয়স তোমার কত? চল্লিশ বছর হল?
প্রণয়ের পালা ঢের এল গেল—
হল না মিলন?

পর্বতের পথে পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে?
পতঞ্জলি এসে বলে দেবে

প্রভেদ কী যারা শুধু বসে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যায়?

মৃত সব অরণ্যেরা;
আমার এ জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে:
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চলে যেতে চাও মিছে;
কোথাও পাবে না কিছু;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।

আমি তবু বলি:
এখনও যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহানীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

অন্যান্য কবিতা
১৯১৯-১৯৫৪

এই কবিতাপর্যায় সম্প্রতিকাল পর্যন্ত নানা সাময়িকপত্রে ও সংকলনগ্রন্থে ছাপা হয়েছে, প্রকাশক্রম অনুসারে এখানে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হল।

—স.

বর্ষ-আবাহন

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে
দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠল জেগে
        দিব্য পরশ পেয়ে,
নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া
ভুবন ভরা মুক্ত মায়া
        মুগ্ধ—হৃদয় চেয়ে।
অতীত নিশি গেছে চলে
চিরবিদায় বার্তা ব'লে,
কোন্ আঁধারের গভীর তলে
        রেখে স্মৃতিলেখা,
এসো এসো ওগো নবীন,
চলে গেছে জীর্ণ মলিন—
আজকে তুমি মৃত্যুবিহীন
        মুক্ত সীমারেখা।

বেদুঈন

ধবল কঙ্কাল যেথা দিকে দিকে রয়েছে ছড়ায়ে
        অন্তহীন বালুকা জড়ায়ে,
দিবানিশি জ্বলিতেছে লক্ষ চুল্লিশিখা
পথে পথে দৈন্য যেথা, গ্লানি বিভীষিকা,
        নিঃসহায প্রাণ,
মরুভূ-ঝটিকা গর্জে দিকে দিকে ক্ষিপ্ত, বহ্নিমান!
কোটি কোটি বিষতীব্র ভুজঙ্গম ফণার ঘূর্ণনে
        মরীচিকা জাগে ক্ষণে ক্ষণে—
মোহের মাধুরী মাখা মৃত্যুর পাথার!
—শ্যামা বসুন্ধরা ত্যজি সেই পথে তুমি কেন যাও বারবার
        ওগো বেদুঈন!
—মোদের নগর পল্লী—আমাদের সুসজ্জিত, শান্ত রাত্রি দিন
        ঝলমল প্রাসাদ বিপণি,
লীলাকক্ষ, নৃত্যগীত, প্রমোদের ধ্বনি
        বিভ্রম, বিলাস,
মনোহরা এ ধরণী—পুষ্পকুঞ্জ, জ্যোৎস্নানিশি, সুরভিত এই মধুমাস
        এ বিচিত্র গৃহাঙ্গন, এই অন্তঃপুর,
                শান্ত সুমধুর,
        প্রেয়সীর হাসি অশ্রু মাখা;
        —যৌবনের এ জয়পতাকা,

মোদের এ বর্ষ, ঋতু, উষা, বিভাবরী
তোমারে করে না মুগ্ধ—কোন্ দূর দিগন্তের দীর্ঘ পথ ধরি,
ধু ধু ধু ধু বালুকার বিজন সঙ্কটে,
চক্রবালতটে
উঠিতেছে আস্ফালিয়া তুমি!
—তোমার চরণতলে নাচিতেছে যোজনান্ত তপ্ত মরুভূমি
উন্মাদ, উত্তাল!
বালুকার পারাবার, আকাশের আরক্ত মশাল
বক্ষে তব আসিতেছে ছুটে!
শ্যেনতীক্ষ্ণ তীব্র রক্ত তোমার ও আঁখির সম্পুটে
পলে পলে ঘুরে যায় ধূম্রাকাশ গিরি, বালিয়াড়ি।
তন্দ্রাহারা যাত্রী ওগো—শ্রান্তিহীন মরুপথচারী,
হারায়েছ দিশা
অনন্ত নৃত্যের লোভে, অফুরন্ত উল্লাসের তৃষা
চিত্তে তব নিরন্তর উঠিতেছে দহি,
হে দূর-বিরহী!
—মৌন গৃহতলে বসি নিরালা—একাকী,
শতাব্দীর সভ্যতার পিঞ্জরের পাখি
আছি মোরা আর্ত ম্লান আঁখি দুটি তুলে!
—সীমাহারা নীলিমার কূলে
যেতে চাই ছুটে,
অসংখ্য শৃঙ্খলাঘাতে বিদ্রোহীর বক্ষে শুধু রক্ত ওঠে ফুটে!
ভাঙে না এ প্রাচীরের কারা,
জেগে আছে চিরন্তন ব্যর্থ বিধিবিধানের এই মিথ্যা বিরাট পাহারা!
মনে মোর ঘুরে মরে লক্ষ্যহারা, বাধাবন্ধহীন
মরুভূর কোন্ বেদূঈন।

আঁধারের যাত্রী

চারি দিকে ধু ধু রাতি—সৃজনের অন্ধকাররাশি,
জোনাকীর মতো প্রাণ তার মাঝে চলিছে উদাসী!
পত্রগুচ্ছে যেটুকু নিশীথ,
যে খণ্ড আঁধারটুকু, যে তুষার শীত,
তারই বুকে ঢালি তাপ, জ্বালি আমি শিখা,
অনন্ত শর্বরী দূরে ছড়ায়েছে ব্যথা-বিভীষিকা!
কোন্ দূর অলক্ষ্যের পানে
স্পন্দহীন প্রেতপুরে—শোকের শ্মশানে,
মূক তরুচ্ছায়াতলে, নিঃশব্দ গহ্বরে
কলহীন তটিনীর তরঙ্গের 'পরে
ছুটিয়া যেতেছে মোর সচকিত প্রাণ,
মৌন অভিযান!

আমার এ কম্প্রবক্ষে তৃপ্তিহীন বিচ্ছুরণ জ্বলে;
দূরে দূরে দিগন্তের তলে
ছুটে যাই দিশাহারা, আকুল, চঞ্চল,
কেঁদে ওঠে বিটপীর ভগ্নশাখা, বনানীর পল্লব-অঞ্চল!
বালুকাসৈকতে বাজে তটিনীর গান
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মান!
সৃজন-পুলিনে বসি মায়াবীর বেশে
অন্তহীন ইন্দ্রজাল রচিতেছে কে সে!
কোথা তব গুপ্ত কক্ষ-রহস্যের দ্বার
ওগো অন্ধকার! \
হে অচল রুদ্ধ আয়তন,
বিজন গোপন!
তমিস্রার ঊর্মিরাশি—দুশ্চর, দুস্তর,
চির রাত্রি—তার মাঝে আমি নিশাচর!
নিষ্প্রভ এ চোখে মোর পশে নাকো নক্ষত্রের শিখা,
দীপহীন অমাতটে নাচে একা প্রাণ-খদ্যোতিকা!
প্রান্তরের পারে জ্বলে অলেক আলেয়া,
তার মাঝে মোর এই নিশীথের খেয়া
চলে একা ভেসে,
স্বপ্নাবিষ্ট মৌন অভিসরিকার বেশে!

মোর আঁখিজল

মোর আঁখিজল
কাহাদের লাগি আজি উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে আকুল, চঞ্চল!
জীবনে পায় নি যারা স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা,
যাহাদের মঙ্গলেতে ঊষাহীন অমা
জাগিতেছে দুশ্চর দুস্তর,
যাহাদের মৌন চোখ—অশ্রু সকাতর
চাহিযাছে বারবার আকাশের পানে
তুচ্ছতম আলোর সন্ধানে
—আঁধারের আবর্তের তলে
প্রেতসম যাহাদের প্রাণ ভেসে চলে
শ্মশানের শেষে!
কোন্ ক্রূর পিশাচের অবিজ্ঞেয় অঙ্গুলিনির্দেশে
যাহারা ঝরিয়া পড়ে পতঙ্গের প্রায়—
লক্ষ কোটি অন্যায়ের অনলশিখায়!
যাহাদের দ্বারে
প্রেয়সী আসে না কভু স্মিতহাস্যে মালোর সম্ভারে;
প্রেমের সন্ধানে
যাহারা ছুটিয়া গেছে প্রেতপুরে, নরকের পানে

—মেটে নাই তৃষা,
অসম্বৃত কামনার কারাগারে বারবার হারায়েছে দিশা
পৃথিবীর নিঃসহায় শৃঙ্খলিত প্রাণ,
লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত ম্লান পিষ্ট ভগবান,
আজ মোর বুকে কেঁদে ওঠে!
— নিখিলের ব্যথা আজ অশ্রু হয়ে মোর চোখে ফোটে!

ভারতবর্ষ

জাগিয়াছে শুভ্র উষা—পুণ্য বেদবতী
প্রাচীমঞ্চে, ভারতের উদয়গগনে।
কোন্ এক আদি মহাতপস্যার ক্ষণে
বাজিয়াছে আমাদের মঙ্গল আরতি!
মধুমান্ সূর্য সোম ঢালিয়াছে জ্যোতি
আমাদের নদী গিরি নির্ঝর কাননে,
অর্পিয়াছে শান্তি স্বস্তি নিখিলের মনে
আমাদের কাব্য কলা—মোদের ভারতী!
মৃত্যুর সাগর মন্থি অমৃতের তরে
যুগে যুগে ছুটে গেছে মোদের সন্তান!
অসুর-আবাসে ভস্ম শ্মশানের 'পরে
গেয়েছে তিমিরাতীত আদিত্যের গান!
বিতরি প্রেমের চরু সর্ব চরাচরে
মাগিয়াছে পরাবিদ্যা—চরম কল্যাণ।

রামদাস

যুগসন্ধিতে ভারত যখন সহসা তিমিরময়—
বীর সন্ন্যাসী গাহিয়া উঠিলে নব আলোকের জয়!
অনাগত এক আশার স্বপ্নে নিমিষে উঠিলে জাগি,
মাতিয়া উঠিলে দশের লাগিয়া, দেশ-দেবতার লাগি।
ওহে সাগ্নিক, প্রাণের অনলে জ্বালালে বিশাল শিখা,
যত মোহ মায়া ভ্রান্তি বেদনা নিরাশার কুহেলিকা
স্পর্শে তোমার, হে মহাজাতক, নিমেষে হইল ছাই!
সমাজের বুকে পাতিলে আসন, সংসারে নিলে ঠাঁই;
স্তিমিত ভীতের আড়ষ্ট গৃহ কারা-আয়তন ভেঙে
জাতির মুক্তি, দেশের সেবায় আত্ম-আহুতি মেগে
ঊর্দ্ধগ-হোম জ্বালালে একাকী নিখিল মারাঠাময়!
জরার হৃদয়ে করেছিলে তুমি যৌবন সঞ্চয়
মন্ত্রে তোমার—সংসারে তুমি আস নি উদাসী বেশে;
পাপপ্রপঞ্চ পঙ্কিল পথে নিয়তি বিধির ক্লেশে

সাজো নিকো তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসীন;
নিরাশাতিমিরে বসিয়া একাকী অরুণোদয়ের দিন
চেয়েছিলে তুমি, জেগেছিলে তুমি মোহকারাগার ভেঙে
কর্মের জয়ে, ত্যাগের পর্বে, সেবার মহিমা মেগে!
ছত্রপতির হে বিজয়ী গুরু, মারাঠার গৌরব!
চন্দনসম বুকের রক্তে বিতরিলে সৌরভ!
দেশের লাগিয়া ধূপের মতন অনলশিখায় দহি
বেদনা মথিয়া দিকে দিকে গেলে শান্তির বাণী বহি!
গরল ভখিয়া মৃত্যু মথিয়া জীবনের অবদান
তুমি সঁপে গেলে, হে বীর কর্মী, হে প্রেমিক মহীয়ান!

নিবেদন

কবিযশ চাহি না মা, তোমার দুয়ারে
আসিয়াছি মুগ্ধ প্রাণে পূজিতে তোমারে!
বিগত শৈশবে কবে অরুণের সনে
ছন্দোময়ী উদেছিলে মোর বাতায়নে!
এসেছিলে চিত্তে মোর পুলক সঞ্চারি
নিখিল কবির কাব্যে ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি
মানসে জাগলে মম অপরূপ জ্যোতি!
দিবাকর জিনি—তব গরিমা ভারতী
আমারে নিয়েছে ডেকে, কৃতাঞ্জলিপাণি
তুচ্ছ অর্ঘ্য লয়ে আমি ওগো বঙ্গবাণী,
এসেছি তোমার রাঙা চরণসমীপে!
কোটি বরপুত্র যেথা গন্ধে বর্ণে দীপে
তোমার আঙিনাখানি রেখেছে উজ্জ্বল,
আমি সেথা আনিয়াছি একফোঁটা জল,
নিঃস্ব ব্যর্থ হৃদয়ের ব্যথা-উপহার
নেবে কি মা? মোর তবে খুলিবে কি দ্বার!

কোহিনূর

তোমারে ঘেরিযা জাগে কত স্বপ্ন—স্মৃতির শ্মশান,
ভূলুণ্ঠিত লুব্ধ অভিযান;
সাম্রাজ্যের অশ্রু, রক্ত, সমাধি, পতন
হে হীরক, একে একে করেছ চুম্বন!
স্পর্শে তব অনাদি অতীত যেন নিরন্তর মর্মে ওঠে ধ্বনি।
মাধবের বক্ষে তুমি ছিলে কি গো স্যমন্তক মণি!
শ্রীহরির বনমালা চুমি
দিব্য গন্ধে অকলঙ্ক অঙ্ক তব ভরেছিলে তুমি
ওগো কোহিনূর!

হৃদে তব আজও বুঝি গাঁথা আছে গোপনীয় বাঁশরীর সুর,
যুগান্তের গাঢ় নীল পুলিনের ভাষা,
বাসনা পিপাসা!
অরুণ ময়ূখ স্পর্শে নিশান্তের স্বপ্ন যাও ভুলি!
নব নবীনের লাগি যুগে যুগে উঠিছ মুকুলি
অভিনব রূপে!
নির্মম কালের অগ্নি-অঙ্গারের স্তূপে
দেহ তব যায় না দহিয়া
হে অটুট বজ্রমণি, কোটি কোটি প্রেমিকের বরণীয়া প্রিয়া।
গিয়েছিলে কবে তুমি পাঠানের অন্তঃপুরে পশি
সুল্‌তান-প্রেয়সী।
হারামের অন্ধকারে লক্ষ বাঁদী বেগমের মাঝে
স্থিরপ্রভা দামিনীর সাজে।
মৌন শিখা স্পর্শে তব করেছিলে ইন্দুনিভা কত শত রূপসীর বদন পাণ্ডুর
ওগো কোহিনূর।
কত রতিনিন্দিতার বক্ষে তুমি বাজাইলে বেদনার কেকা
ম্লান করি দিলে কত আননের সুশ্রী শশীলেখা,
বিচ্ছুরিলে জ্যোতিঃপাত মদগর্ব মোগলের প্রমোদসভাতে;
বিভ্রমের লীলাকক্ষে—বিলাসের খুশবোজ বাতে
শাহী বেগমের আঁখি হয়েছিল অশ্রু ছলছল
তোমার সম্পদস্বপ্নে—অলখিতে ছায়াচ্ছন্ন হয়েছিল
উল্লাসের সে মোতিমহল।
নিশীথলাঞ্ছন বিভা জ্বলিয়া উঠিল কবে কাম্য মণি-ময়ূরের চোখে—
কত দীর্ঘ শতাব্দীর অশ্রু দৈন্য শোকে
কবে গেল জয়শ্রীসম্পাত
উদয়-অরুণসম, তারপর কবে অকস্মাৎ
অস্তগত সাম্রাজ্যের কবর ভেঙিয়া
অভিসারে চলে গেল, প্রিয়া-উদাসিয়া
দূর সিন্ধুপারে
ঐশ্বর্য-তোরণ-তটে তুঙ্গ সিংহদ্বারে।
নব অভিনন্দনের উন্মেষের দেশে,
আমাদের সৌভাগ্যের শোকরক্ত স্কন্ধ বেলাশেষে।

বাসে না সে অশ্রুহিম কুহেলিরে ভালো
মৃত্যুর পিঙ্গল ছায়া প্রেতপুর কালো
আলেয়ার আলো
করে নাকো বিমুগ্ধ তাহারে।
পিরামিডসম সুপ্ত সমাধির দ্বারে
দাঁড়ায় না নিস্পলক প্রহরীর বেশে।
—চেয়ে থাকে,
কবে কোন প্রেমাস্পদ এসে
অঙ্কে তার এঁকে দেয় যৌবনের অরুণ-চুম্বন
নিমেষের আঁখিপাতে কেড়ে লয় মন।

অলকা

(মেঘদূত)

ওগো জলধর, তোমারই মতো সে কাম্য অলকাপুরী,
বিদ্যুৎসম ললিত ললনা শোভে তার বুক জুড়ি!
ইন্দ্রচাপের মতো বিরাজিছে চিত্রসৌধরাশি,
মেঘবারিসম স্বচ্ছ মানিক ওঠে সেথা পরকাশি!
প্রাসাদকক্ষে সংগীতধ্বনি মেঘমৃদঙ্গসম,
আকাশচুম্বী অভ্রেরই মতো সে পুরী তুঙ্গতম!

সেথা, নারীর হস্তে লীলাউৎপল, চিকুরে কুন্দফুল,
কর্ণে তাদের শোভে নিরুপম শিরীষ-কুসুম-দুল!
আনন তাহার করিছে শুভ্র লোধ্ররেণুকা মাখি
মাধবীবনের নব কুরুবকে চূড়াপাশ দেছে ঢাকি!
সীঁথিসীমন্ত সাজায়েছে বালা হেম কদম্ব দিয়া,
প্রিয়ের সঙ্গে বিহার কবিছে সেথায় যক্ষপ্রিয়া!

তরুরাজি সদা পুষ্পফুল্ল—মদবিহ্বল অলি!
মধুগুঞ্জনে নিত্য রহিছে মুখর বনস্থলী,
সেই অলকার সরোরুহে সদা কমল রয়েছে ফুটে,
মেখলার মতো চারুচঞ্চল মরাল যেতেছে ছুটে!
মনোরম সেথা ময়ূরকলাপ—পোষা ময়ূরের কেকা—
তিমিরবিহীন যামিনী জুড়িয়া জ্যোৎস্না দিতেছে দেখা!

অশ্রু সেথায় ক্ষরে আনন্দে, নাহিকো বিষাদভার,
মদনশরেব দাহন ব্যতীত পীড়ন নাহি বে আর!
প্রণয়কলহ ব্যতীত সেথায বিরহ কভু না ঘটে,
সেই সে সুদূর কামনার পুর—কল্পলোকের তটে!
জরার প্রহারে অঙ্গ কখনও জর্জর নাহি হয়—
নরনারী সেথা প্রমোদমুখর—চিরযৌবনময!

ঝরা ফসলের গান

আঁধারে শিশির ঝরে
ঘুমোনো মাঠের পানে চেয়ে চেয়ে চোখদুটো ঘুমে ভরে।
আজিকে বাতাসে ভাসিযা আসিছে হলুদ পাতার ঘ্রাণ,
কাশের গুচ্ছ ঝরে পড়ে হায়, খসে পড়ে যায় ধান
বিদায় জানাই—গেয়ে যাই আমি ঝরা ফসলের গান—
নিভায়ে ফেলিয়ো দেয়ালি আমার খেয়ালের খেলাঘরে!

ওগো পাখি, ওগো নদী,

এতকাল ধরে দেখেছ আমারে—মোরে চিনে থাকো যদি,
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই—
জেনো আমি এক দুখজাগানিয়া—বেদনা জাগাতে চাই!
পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি, মরণেরে ঘিরে এ মোর সপ্তপদী।

ঝরা ফসলের ভাষা
কে শুনিবে হায়!—হিমের হাওয়ায় বিজন গাঁয়ের চাষা
হয়তো তাহার সুরটুকু বুকে গেঁথে, ফিরে যায় ঘরে,
হয়তো সাঁঝের সোনার বরণ গোপন মেঘের তরে
সুরটুকু তার রেখে যায় সব, বুকখানা তবু ভরে
ঘুমের নেশায়, চোখে চুমো খায় স্বপনের ভালোবাসা!

ওগো নদী, ওগো পাখি,
আমি চলে গেলে আমারে আবার ফিরিয়া ডাকিবে নাকি!
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই,
জেনো আমি এক দুখজাগানিয়া—বেদনা জাগাতে চাই!
পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি, গাহিতে গাহিতে ঘুমে বুজে আসে আঁখি!

পলাতক

কারা অশ্বারোহী কবে উষাকালে এসে
হারায়ে গিয়েছে দূর সাঁঝে—নিরুদ্দেশে
না জানি কিসের খোঁজে কত কাল ধরি!
যৌবনের রক্ত মোর উঠিছে শিহরি
তাহাদেরই মতো আজ—তাই পলাতক
আসিয়াছি চুপে চুপে—আলোর পলক
নিভে যায় যেইখানে পশ্চিমের মেঘে,
যেইখানে মায়াবীর ইশারার বেগে
এলোমেলো ঢেউগুলো হয়ে গেছে রাঙা
নারিকেল ছায়া ছুঁয়ে আধো ভাঙা ভাঙা
বাতাসের ব্যথা যায় বহি—
দক্ষিণ সমুদ্রপারে আমি অশ্বারোহী
আসিয়াছি আর-এক,—এই পথ কবে
স্বপন-বাউল যুবা-নবীনের রবে
ভরেছিল কতবার!—তাহাদের পক্ষিরাজ আসি
দিনশেষে এই পথে দাঁড়াত উদাসী!
সে কোন্ বন্দিনী যেন—শোনে আজও সিন্ধুর ধীবর
আচম্বিত কান্না তার দূর মধ্যসমুদ্রের 'পর—
তাহাদের নিয়েছিল ডাকি!

কোন্ একাকিনী যেন,—তারই পানে নির্জন একাকী
ছুটে গিয়েছিল তারা, পৃথিবীর পরাজয়-জয়
পিছে ফেলে—পথে পথে হারায়ে সঞ্চয়!
আজ তারা কোথা সব জানি না তো কিছু!
আলোয় চিনিয়া পথ—তাহাদের পিছু
আমিও এসেছি এই বালুকার 'পর
আর-এক কবি-যুবা! কাঁকর, পাথর-
এ মাটির রুক্ষ পথ—লাগে নাই ভালো,
যাহা-কিছু পাই নাই, যা কিছু হারালো
সবই খুঁজে পাব আমি সন্ধ্যার আঁধারে,
নট্‌কান্-রাঙা মেঘে সমুদ্রের পারে!

যুবা অশ্বারোহী

যুবা অশ্বারোহী,
রাঙা কঙ্করের পথে কোন্ ব্যথা বহি
ফিরিতেছ একা একা নদীতীরে—সাঁঝে!
তোমারে চিনি না মোরা, আমাদের মাঝে
তোমারে পাই নি খুঁজে, দুপুরের রূঢ় কলরবে
নগরীর পথে মোবা নামিযাছি যবে,
বন্দরের কোলাহলে—বেসাতির ফাঁদে
আধো হর্ষে—আধেক বিষাদে
বিকিকিনি কবিযাছি শুরু,
তুলিয়াছি স্থবিরের মতো দুটি ভুরু,
সঙ্কোচ সংশয ভযে উঠিযাছি দহি-
দূরে—দূরে—কে তুমি বিরহী
ফিরিয়াছ, স্বপ্নালস আঁখি
দুটি তুলি দিবালোকে একান্ত একাকী
ছুটিযাছ পাথারের বালুবেলা-পানে!
বনে বনে যখন অঘ্রানে
পাতা ঝরে—সবুজ পৃথিবী
যখন হারায়ে ফেলে শ্যাম বাস, কুসুমের নীবী
ঝাউশাখে পাখিনীর নীড়
ভেঙে যায়—কুযাশার ভিড়
পথে পথে কালো হয়ে ওঠে,
অবেলায় নেভে আলো—সুন্দরীর ঠোঁটে
ডালিম ফুলের রং' হয়ে যায় নীল,
মোরা ঘরে ফিরে যাই—কার ঝিল্‌মিল্
মায়ার মুকুরে তুমি একা দেখ ছবি!
পৃথিবীর যত গুণী আর যত কবি
তাহারে চেনে কি তারা? দিযেছে কি ধরা

বাউলের বীণাতারে সে কখনও?—তাহার পসরা
ধরণীর মধুকর-ডিঙাগুলি খুঁজে
পাব মোরা কোনো দিন!—তাই চোখ বুজে
মাটির বুকের 'পরে মুখখানা রাখি,
আমরা ঘুমায়ে পড়ি; নির্জন একাকী
পাথরের পথ দিয়া অশ্বারোহী কোন্
চলে যায়—শুনেছি কখন
বিক্ষুব্ধ ক্ষুরের শব্দ—দেয়ালের গায়
সুর তার বেজে ওঠে, বিদায় জানায়!

পলাতকা

পাড়ার মাঝারে সব চেয়ে সেই কুঁদুলি মেয়েটি কই!
কত দিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের—
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
কই কই বালা আজিকে তোমার পাই না কেন গো টের!

তোমার নখের আঁচড় আজিও লুকায়ে যায় নি বুকে,
কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে!
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারই ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে!

কই বালা কই! —প্রণাম দিলে না!—মাথায় নিলে না ধূলি!
—বহু দিন পর এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে!
কুটিরের পথে ফুটিয়া রয়েছে রাঙা রাঙা জবাগুলি—
উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে!

কবি

বীণা হাতে আমি তব সিংহাসনতলে
কালে কালে আসি কবি—কভু পরি গলে
জয়মালা, কভু হিংস্র নির্দয় বিদ্রূপ
তুলে লই অকুণ্ঠিতে, খুঁজে ফিরি রূপ
সৃজনের ছায়াধূপে, আকাশে আলোকে,
ধরণী ডুকারি ওঠে যে ব্যর্থতা-শোকে,
তারও মাঝে স্বপ্ন খুঁজি, বীণাতারে বুনি
তারও সুর,—আন্‌মনে গান গাই গুণী!
তুলিয়া লয়েছি আমি পতাকা তোমার,
হে সুন্দর,—আমি তব দৌবারিক—দক্ষিণের দ্বার
উন্মুক্ত রেখেছি নব নবীনের লাগি!

অন্ধকারে দীপ হাতে আছি আমি জাগি।
আমি হেরিয়াছি—শুভ্র তোমার গৌরব
ঘৃণ্য নগণ্যের মুখে, কালে কালে করিয়াছি স্তব
বীভৎসে কুৎসিত কুণ্ডে, পঙ্কের ভাণ্ডারে
তোমারেই; দেখিয়াছি তুমি আসি দাঁড়ায়েছ দ্বারে
অন্ধকারে—রিক্ততারে করিয়াছ জয়ী
তোমার মঞ্জীর-স্পর্শে চুপে রহি রহি!
বিকৃত তৃষ্ণার ব্যথা—বন্ধনের রক্তকৃষ্ণ রেখা
বিনাশিয়া অরুণিমা দিয়ে গেছ দেখা
রাত্রির যাত্রীর ভীত নিঃস্পন্দিত চোখে!—
অতি দূর অনাগত স্বপ্নের আলোকে
আগতের ভাবলোকে তুলেছ উৎসব।
কবি আমি, যুগে যুগে করি তব স্তব!
দিবস-নিশার রক্ত—দহনের আলো
জাগায় বিনিদ্র ব্যথা—তবু বাসি ভালো
সুর তার; যা হারাল, পাব নাকো ফিরে,
তারই খোঁজে নিত্য ঊষা গোধূলির তীরে
ফিরি আমি—অশ্রুমান, ব্যথার তাপস!
ভালোবাসি বেদনারে, ঐশ্বর্যের যশ
চাহি নাকো—মাগি নাকো প্রসাদ সম্মান
আমি কবি—পথে পথে গেয়ে যাব গান;
পদে পদে মৃত্তিকারে মঞ্জীরের মতো
বাজায়ে চলিব আমি—আমি অনাহত
আদি মানবের ছন্দে উঠিব ঝঙ্কারি
নীলিমার জয়গান—শ্যামশষ্প নিঙাড়ি নিঙাড়ি
ভরি লব শোণিতের সুরাপাত্রখানা!
যে-ছবি ফোটে নি আজও,—যেই রূপ অনামা, অজানা,
তাহারে হেরিব ঊষাসন্ধ্যারাগে শিশুর মতন!
সিন্ধুতীরে পেতে লব রৌদ্রের শয়ন;
তাম্রঅঙ্গে শঙ্খচূর্ণ ধূম্রবালু মাখি,
কলরবে পায়ে-চলা পথ যাব আঁকি
সমুদ্রফেনার মতো; যেই কথা কহে নাই কেউ
যে গান গায়নি কেহ—তারি সিন্ধু ঢেউ
তুলে যাব কূলে কূলে—পৃথিবীর প্রথম বয়স
ফিরায়ে আনিব আমি—আদি ঊষা—আদিম দিবস,
ঊর্মিস্নাত মানবের অসীম উল্লাস,
প্রথম রহস্য-ব্যথা— বিস্ময়ের ত্রাস,
প্রকাশ করিব মোর স্নায়ুর যৌবনে!
আদিম সন্তান আমি—রোম-শিহরণে
গাব গান; স্বর্ণশীর্ষ নীবারমঞ্জরী—
মধ্যাহ্ন রৌদ্রের বুকে আপনারে ছিন্ন করি করি।

পরবাসী

যাহাদের পায়ে পায়ে চলে চলে জাগিয়াছে আঁকাবাঁকা চেনা পথগুলি
দিকে দিকে পড়ে আছে যাহাদের দেহমাটি—করোটির ধূলি,
যাহারা ভেনেছে ধান গান গেয়ে—খুঁটেছে পাখির মতো মিঠে খুদকুঁড়া,
যাহাদের কামনার ইশারায় মাটি হল পানপাত্র, শষ্প হল সুরা!
ছুঁয়ে ছেনে বারবার এ ভাঁড়ার করে গেছে স্যাঁতসেঁতে ম্লান,
আনাচে-কানাচে আজও দুলিতেছে যাহাদের উড়ানি-পিরান,
যাদের দেহের ছায়া পাঁচিলের গায় গায় মেখে গেছে মায়া,
দেয়ালের শ্যাওলায় নীল হয়ে জেগে আছে যাহাদের কায়া,
যারা গেছে বীজ বুনে মাঠে মাঠে—চষে গেছে মাটি,
কেটেছে ফসল—শালি বেঁধে বেঁধে নেছে আঁটি আঁটি,
তুলিয়াছে গোলাবাড়ি—যত তিষি ধান খড় ভরা,
পেঁচা-ইঁদুরের সনে আন্‌মনে জাগিয়াছে যাদের প্রহরা,
পনির ননীর গন্ধে ভরিয়াছে যাহাদের তুষ্ট গৃহস্থালি,
ধুনুচিতে ধূপ ঢেলে—উঠানে প্রদীপ জ্বালি জ্বালি
ঘরে ঘরে ফিরিয়াছে যারা কালো ছায়ার মতন,
চরকায় সুতো কেটে তুলিয়াছে তন্ময় গুঞ্জন,
কহিয়াছে আধো আধো কত কথা—নিভায়েছে—জ্বালায়েছে আলো,
দেয়ালে তাদের ছায়া জাগিয়াছে এলোমেলো— কালো—
না জানি কোথায় তারা, কত দূরে—জানি না তো কিছু!
রাতভোর ঘোর ঘোর চোখ মোর, ঘাড়খানা নিচু
তাদের সন্ধানে যেন—যাহাদের রেণুঝরা হিম মরা প্রজাপতি-ডানা
দিকে দিকে পড়ে আছে—মনে হয় কত চেনা—কত তারা জানা!
তাহাদেরই পরীপাখা ওড়ে যেন পউষের নদীটির বুকে!
শিশির-নিবিড় মাঠ-পাথরের মুখে
তারা যেন কথা কয়!—শাঁইঝাড়ে—শালুকের দলে
জোনাকীর পাখনার তলে যেন তাহাদের দীপ আজও জ্বলে!
সঙ্গোপনে বনে বনে ফেরে তারা—জ্যোৎস্নারাতে পিয়ালের মৌ
আজও তারা পান করে, আজও তারা গান করে—বাসরের বর আর বউ!
শিশিরের জলে জলে স্নান করে—ভিজে ভিজে বালুচর দিয়া
বুনো হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী প্রিয় আর প্রিয়া!
কোরা-ডাহুকের বুকে কান পেতে শুনে যায় গান—
তারের আঙুল ছুঁয়ে চুলবুল করে ওঠে হেমন্তের মাঠভরা ধান!
তাদের দেখেছি আমি গেঁয়ো পথে,—দেখেছে রে ধাঙড়ের বধূ,
মৌচুষ্‌কির সনে তারা বনে লুটে খায় কম্‌লার মধু!
নোনার পাতায় তারা মাথা পেতে খায় তাতা ক্ষীর!
বেদের মতন তারা আসে যায়—অবেলায় ভেঙে ফেলে ভিড়!
তাদের দেখেছি আমি শাদা ভোরে—ঘুঘু ডাকা উদাস দুপুরে!
—সাঁঝের নদীর বাটে—ভাঙা হাট—ভিজা মাঠ জুড়ে;
পাড়াগাঁর পথে পথে নিঝ্‌ঝুম চাঁদিনীর রাতে
ফিরেছে রে, ভিড়েছে রে কত বার তারা মোর সাথে!

আদিম

প্রথম মানুষ কবে
এসেছিল এই সবুজ মাঠের ফসলের উৎসবে!
দেহ তাহাদের এই শস্যের মতো উঠেছিল ফলে,
এই পৃথিবীর ক্ষেতের কিনারে, সবুজীর কোলে কোলে
এসেছিল, তারা ভোরের বেলায় রৌদ্র পোহাবে ব'লে—
এসেছিল তারা পথ ধরে এই জলের গানের রবে!
এই পৃথিবীর ভাষা
ভালোবেসেছিল, ভালো লেগেছিল এ মাটির ভালোবাসা!
ভালো লেগেছিল এ বুকের ক্ষুধা, শস্যের মতো সাধ!
এই আলো আর ধুলোর পিপাসা, এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিল—বুকে তাহাদের জেগেছিল আহ্লাদ!
প্রথম মানুষ—চোখে তাহাদের প্রথম ভোরের আশা!
এসেছিল সন্তান—
দেহে তাহাদের নীল সাগরের ঢেউয়ের ফেনার ঘ্রাণ!
শঙ্খের মতো কানে তাহাদের সিন্ধু উঠিত গেয়ে।
শস্যের মতো তারা ওই নীল আকাশের পানে চেয়ে
গেয়ে গেছে গান! ধানের গন্ধে পৃথিবীর ক্ষেত ছেয়ে
আলোয় ছায়ায় ফসলের মতো করিয়া গিয়াছে স্নান!
সে কোন্ প্রথম ভোরে
প্রথম মানুষ আসিল প্রথম মানুষীর হাত ধরে!
ভালো লেগেছিল এ দেহের ক্ষুধা, শস্যের মতো সাধ!
এই আলো আর ধুলোর পিপাসা, এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিল—বুকে তাহাদের জেগেছিল আহ্লাদ!
নীল আকাশের প্রথম রৌদ্র ক্ষেতে পড়েছিল ঝরে!

আজ

আমার হাতের কাজ আজ রাত্রে গিয়াছে ফুরায়ে—
আমার এ ক্লান্ত পায়ে
নাই আর পথের পিপাসা!
যে ভালোবাসার ভাষা
মানুষ শুনিতে চায়—যেই প্রেম নিয়া
মানুষ চলিতে চায় পৃথিবীর পথে পথে প্রিয়া—
তাহার সন্ধানে
তোমারে ডেকেছি আমি বারবার!
—দূর আলো—দূর এক আঁধারের পানে
তবু তুমি চলে গেছ, আসিবে না ফিরে,
হারায়ে গিয়েছ তুমি পৃথিবীর দিন আর রাত্রির ভিড়ে!

ফসলের দিনে

কোনো এক প্রেমিকের তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে;
কোনো এক প্রণয়ীর কাছে
এক দিন দেখেছি তোমারে
যে ভালোবেসেছে, কত ভালোবাসা দেখাতে সে পারে
জেনেছি সেদিন।
তারপর, ফসল ঝরিয়া গেছে কতবার—
কতবার ঝরে গেছে তৃণ
মাটির উপরে।
—তবু জানি, কোনো এক প্রেমিকের তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে।
কোনো এক প্রণয়ীর কাছে
একদিন দেখেছি তোমারে—
যে ভালোবেসেছে, কত ভালোবাসা দেখাতে সে পারে
জেনেছি সেদিন।

যেতে হবে বলে
তুমি গেছ চলে,
দূরে গেছ সরে;
যেতে হবে। তাই আমি হাতখানা ধরে
তোমারে আনি নি ডেকে কাছে।
একদিন, তবু—মনে আছে
তুমি এসেছিলে;
আমারে বাস নি ভালো সেইদিনও, জানি আমি,
কিন্তু তুমি ভালোবেসেছিলে
তোমার ভিতরে যেই নারী আছে তারে,
জানিয়াছি—কত ভালোবাসিতে সে পারে।
আমারে বাস নি তুমি ভালো,
কিন্তু সেই নারী—আজও সেও কি ফুরালো
তোমার অন্তরে।
প্রেমিকের তরে
যেই ভালোবাসা দিতে পারে শুধু প্রণয়িনী—
পার না তা কিন্তু এক মানুষীরে চিনি,
অকাজ-কাজের মাঝে—মানুষের পাশে
বারবার আসে।
আমারে বাস নি তুমি ভালো
কিন্তু সে মানুষী আজও সেও কি হারাল।

একদিন এসেছিলে নক্ষত্রের তলে—

পৃথিবীর প্রণয়িনী যেই কথা বলে
প্রেমিকের কানে কানে, আকাশ একাকী
শোনে যাহা—বলেছিলে তা কি
সেই রাত্রে—ঢুলে ঢুলে এসে!
জানি, তুমি ভালোবেসে
সেই দিন আস নাই—
আজ তুমি চলে আস যদি—
ভালোবাসা বুকে লয়ে আসিবে না, জানি আমি—
তবু এই পৃথিবীর নদী,
আর এই নক্ষত্র আকাশ,
অন্ধকার রাত্রির নিশ্বাস
চাহিছে তোমারে!
আমারে বাস নি ভালো, তবু আজ ফসলের ভারে
নতুন ধানের গন্ধে উঠিয়াছি ফ'লে
নবীন প্রণয়ী আমি, পৃথিবীর কোলে!
চেয়ে আছি—আসিবে কখন!
ঈশানের মেঘের মতন
আসিছে সময়!
—তাহারই গম্ভীর গান শুনি আমি—
তোমার গানের শব্দ নয়!

আমরা

যেই ঘুম ভাঙে নাকো কোন দিন ঘুমাতে ঘুমাতে
সব চেয়ে সুখ আর সব চেয়ে শান্তি আছে তাতে!
আমরা সে সব জানি; তবুও দু'চোখ মেলে জেগে
আমরা চলিতে আছি আমাদের আকাঙ্ক্ষার পিছে—
নক্ষত্রগ্রহের পিছে নক্ষত্রের ছায়ার মতন
ভাসিয়া চলিতে আছে ঢেউ তুলে আমাদের মন
নদীর জলের মতো—সিন্ধুর স্রোতের মতো বেগে
পৃথিবীর আকাঙ্খার পার খুঁজে ছুটিয়া চলিছে।

কিংবা তারে খুঁজে কেউ পেয়েছে কি পৃথিবীর পারে!—
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে হৃদয়ের যেই আকাঙ্খারে
আমরা বেসেছি ভালো; খুঁজে তারে পেয়েছে কি কেউ
পৃথিবীর দিন আর পৃথিবীর রাত্রির আড়ালে!
সকল সাম্রাজ্য ছেড়ে—সকল নিশান ছেড়ে ছেড়ে
হৃদয়ের আকাঙ্খারে—আমাদের এই হৃদয়েরে
আমরা বেসেছি ভালো!—থামে যদি সমুদ্রের ঢেউ,
আমরা যাব না থেমে, যাব নাকো ডুবে কোনো কালে!

এই পার—অই পার—কোনো এক পারাপার থেকে

রাত্রিরে ডাকিছে দিন—দিনেরে যেতেছে রাত্রি ডেকে!
আমরা ডেকেছি তারে আলো-আঁধারের মতো হয়ে
আঁধার আলোর খোঁজে; আমরাও তাহার পিছনে
ছুটিতে চেয়েছি সব; আমরাও খুঁজিতেছি তারে
পৃথিবীর পারে গিয়ে, আর ঐ নক্ষত্রের পারে
ডাকিতে চেয়েছি তারে; পুবের হাওয়ার মতো বয়ে
মিশিতে চেয়েছি গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের সনে।

পশ্চিম সিন্ধুর মতো অন্ধকারে ফুলে দুলে উঠে
আমরা চলিতে চাই পুবের সিন্ধুর দিকে ছুটে!
মনের আশার মতো হৃদয়ের নিরাশারে খুঁজে,
আশার আকাশ খুঁজে অন্তরের নিরাশার মতো
আমরা ছুটিতে চাই পৃথিবীর পথ ছেড়ে দিয়ে;
পিপাসা পিছনে ফেলে তোমারে পিছনে ফেলে প্রিয়ে!
যদিও সকল ভুলে কার্তিকের মাঠে চোখ বুজে
ঘুমায়ে অনেক শান্তি, ছুটিতেছি তবু ইতস্ততঃ!

যদিও অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি পথে হেঁটে হেঁটে
বারবার জেগে জেগে অনেক সময় গেছে কেটে—
ঘুম ভালো সব চেয়ে, মৃত্যুর মতন ঘুম ভালো
যদিও সকল শক্তি সার সব ঐশ্বর্যের চেয়ে—
তবুও ঘুমের আগে আকাঙ্খার অধীরতা এসে
আমাদের সকলেরে চুমো দিয়ে গেছে ভালোবেসে!
আকাশে সূর্যের আলো আর ওই নক্ষত্রের আলো
জ্বলিতেছে আমাদের আকাঙ্খার কাছে ছন্দ পেয়ে!

কারণ শান্তির চেয়ে অস্থিরতা—বেদনা—বিস্ময়
—আকাঙ্খার পিছে যেই ব্যথা-অধীরতা জেগে রয়—
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে আমরা বেসেছি ভালো তারে!
যদিও গিয়েছি চিরে পৃথিবীর বুকের মতন
হৃদয় রয়েছে ভরে অন্ধকার গহ্বরে কবরে,
তবুও রয়েছি জেগে রাত্রিদিন জাগিবার পরে!
রাত মুছে যায় দিনে, দিন ডোবে রাতের আঁধারে;
— তাদের মতন হয়ে ভাসিয়া চলিতে আছে মন!

কোথায় সে জেগে আছে?—ঘুমায়েছে?—জেগে আছে সে কি!
তোমরা দেখেছ তারে? আমরা চকিতে যারে দেখি।
যাহার ঐশ্বর্য এই পৃথিবীর রাজ্যের মতন
নয়, তবু যে খেলেছে মানুষের ইচ্ছা ক্ষুধা লয়ে!
যার শক্তি বেশি ওই নক্ষত্রের প্রভাবের চেয়ে!—
পৃথিবীর মেয়ে সে কি? নক্ষত্রের?—তবে কার মেয়ে!

দেখেছি কোথায় তারে! তারে আমি দেখেছি কখন!
আমরা ঢেউয়ের মতো তাহার পিছনে চলি বয়ে!

তারে খুঁজে ব্যথা শুধু, তারে খুঁজে শুধু বিহ্বলতা!
আবার ফিরিয়া এসে হে প্রিয়া তুমিও কবে কথা—
কিন্তু সে কি কোনো দিন তাকায়েছে আমাদের দিকে?
পিছনে ফিরেছে সে কি?—আমরা ছুটেছি তার পিছে!
আমরা ডেকেছি তারে—শুধু ব্যথা—ব্যথা তারে ডেকে!
তবুও পাখির মতো কাঁটার উপরে বুক রেখে
আমরা ডেকেছি তারে—আমাদের কাছে গান শিখে
দিনের রাতের ঢেউ জেগে উঠে তাহারে ডাকিছে!

কোথায় গিয়েছে প্রিয়া?—কখন পিছনে পড়ে গেলে!
আমরা কাহারে খুঁজে তোমারে ভুলেছি অবহেলে!
পৃথিবীর মাঠে পথে মানুষের মতো কাজ ক'রে
যে আরাম, বীজ বুনে—মানুষের মতো শস্য তুলে
যেই সুখ, ক্লান্ত মানুষের মতো আঁধারে ঘুমায়ে
যেই শান্তি, পাতার মতন ফ'লে যেই স্বাদ গায়ে—
হিমের হাওয়ার বুকে সহজে পাতার মতো ঝ'রে
যেই স্বচ্ছলতা—সব—আমরা সকলে গেছি ভুলে!

তবু এই পথ ছেড়ে লাঙল–কাস্তে হাতে নিয়ে
আমরা যাব না হেঁটে পৃথিবীর শস্যক্ষেত দিয়ে।
—যদিও নদীর জলে, যত দিন কেটে যায়, দেখি—
আরো বেশি—আমাদের মুখ আরো বেশি ম্লান হয়!
যদিও অনেক ঘুম—আরো ঘুম নেমে আসে চোখে—
রাতের আঁধারে এই—আব এই তারার আলোকে
নিভিয়া গিয়েছে বাতি পৃথিবীতে—তবু নিভেছে কি
যে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে রয়!

সে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে রয়!—
যদিও পেয়েছে ঘুম, ঘুমের মতন কিছু নয়—
যদিও সকল সাধ অনুভূতি আস্বাদের চেয়ে
সব পিছে ফেলে রেখে—সবাই ঘুমেরে ভালোবাসে—
—কারণ, সবাই শান্তি—মৃত্যুর ঘুমের শান্তি চায—
পথ হেঁটে হেঁটে তবু চলিতেছি—যা চলিয়া যায়
তারই পিছে পিছে গিয়ে—ব্যথা পেয়ে—শুধু ব্যথা পেয়ে
জেগে আছি—যদিও আবার ঘুম—চোখে ঘুম আসে!

জ্বলিতেছে যে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে!
সমুদ্র দাঁড়াতে পারে—পারি নাকো আমরা দাঁড়াতে!

পৃথিবী ঘুমাতে পারে—আমাদের চোখে ঘুম নাই।
নক্ষত্র নিভিতে পারে—আমরা যেতেছি তবু জ্বলে।
আমরা বাতাস হয়ে চলিতেছি দিকে দিকে বয়ে।
সময়ের সাথে সাথে আমরা সময় হয়ে হয়ে
যতদিন জেগে আছি এমনি জাগিতে শুধু চাই।
আমরা চলিতে চাই আকাশ বাতাস পায়ে দ'লে।

আজ

কোথাও রয়েছে মৃত্যু—কোনো এক দূর পারাপারে
পশ্চিম সাগরে এক—যেইখানে সব শেষ তারা
অবসন্ন হয়ে যায়—ডুবে যায় ভোরের আঁধারে,
আকাশ পায় না আর যেইখানে সমুদ্রের সাড়া;
আমাদের হৃদয়ের সব আশা-হতাশা যেখানে
ররফের মতো কথা কহিতেছে ররফের কানে—
পরিশ্রান্ত পেগানেরা একদিন চিনেছিল যারে—
সবচেয়ে অবসাদ সঙ্গে করে এনেছিল যারা।

সেইখানে আছে মৃত্যু পৃথিবীর আকাশের শেষে
সকল মেঘের পরে—মেঘের রঙের আরো পিছে,
যেইখানে রঙ নাই—রক্ত নাই—সেই এক দেশে
ঘুমন্তের কানে কানে সেইখানে ঘুম কি কহিছে।
ফুরায়েছে শুনিবার জানিবার সব অবসর—
ররফের হাত শুধু ররফের হাতের উপর।
কুয়াশার ঠোঁট শুধু কুয়াশার ঠোঁটে গিয়ে মেশে,
দিনের পায়ের শব্দ মাথার স্বপ্নের মতো মিছে।

রাতের পাখার পাখি ঝরায় না পালক সেখানে,
ধরায় না বাতি আর নক্ষত্রেরা— ক্লান্ত নক্ষত্রেরা—
অবসন্ন নদী ছোটে নাকো শ্রান্ত সমুদ্রের পানে,
সন্তানের মতো জন্মে পৃথিবীতে জেগে আছে এরা।
ইহারা শিশুর মতো—পৃথিবীর শৈশবের দিন
শেষ হয়ে গেছে তবু, বৈকালও যে হয়েছে মলিন।
সকল-শেষের সুর শোনা যায় সকলের গানে—
জীবনের সব সার অগাধ মৃত্যুর ঢেউয়ে ঘেরা।

সিন্ধুর শঙ্খের কানে সমুদ্রের সুরের মতন—
রক্তের গানের মতো আমাদের দেহের ভিতরে
হে মৃত্যু, তোমার গান শুনিতেছে—শুনিতেছে মন।
ঘুমন্ত মাথার মতো কোনো এক বিছানার 'পর
বুজায়ে রাখিতে চাই যা বুঝেছি, যা জেনেছি—সব।

আকাঙ্ক্ষা চাই না আর, আঘাতের চাই না উৎসব!
অনেক জাগার পরে ঘুমাবার করি আয়োজন—
গুহার ছায়ার মতো ছায়ার গুহার মতো ঘরে!

কারণ অনেক জেগে আমরা দেখেছি রোদ, রূপ—!
দেবতা দেখে নি ভয়ে—আমরা দেখেছি জেগে জেগে;
দেখেছি সকল আলো হয়ে যায় অঙ্গারের স্তূপ
তোমার পায়ের তলে, মানুষের মতন আবেগে
নক্ষত্রেরা কেঁপে ওঠে তোমার জানুর নীচে এসে;
মোমের মতন গলে জ্বলেছি তোমারে ভালোবেসে—
আগুন হয়েছ তুমি, হয়ে গেছি আমি তার ধূপ;
বিদ্যুতের মতো তুমি জেগেছ বুকের 'পরে মেঘে!

দেবতা দেখে নি ভয়ে—সময়ের তাই সে দেবতা!
সকল ঐশ্বর্য—রাজ্য—নিশানের আগে তার জয়!
তোমারে সে দেখে নাই, শোনে নি তোমার মুখে কথা
তোমার ঠোঁটের চুমা তাহার ঠোঁটের তরে নয়।
তোমার চুলের কালো সাপ তার লাগে নি কপালে
পরিচ্ছন্ন আকাশের 'পরে তার নক্ষত্র সে জ্বালে;
একে একে শেষ হয় সকলের সকল ক্ষমতা—
ফুরায় না কোনো দিন দেবতার সীমানা, সময়!

আর অই দেবতার ছেলে এক—ক্রুশ তার বুকে;
সে শুধু জেনেছে ব্যথা— ক্রুশে শুধু যেই ব্যথা আছে!
যেই গাঢ় বেদনায় মাথা তার পড়িয়াছে ঝুঁকে,
যে ব্যথার রক্ত তার ক্রুশের উপরে ঝরিয়াছে,
পেগান্ জানিত না তো সেই ব্যথা; তবুও পেগান্
সব চেয়ে অবসাদে নষ্ট করে গেছে তার প্রাণ!
সব চেয়ে বড়ো ব্যথা বিষণ্ণতা ছিল তার মুখে,
কারণ ভিনাস, তুমি একদিন ছিলে তার কাছে!

এক দিন এক রাত তার কাছে বসিয়াছ এসে,
এক রাত—এক দিন এসেছ আমার কাছে তুমি!
সকল ভুলেছি আমি কেবল তোমারে ভালোবেসে,
ফুলের ঘ্রাণের মতো তোমার মাথার চুল চুমি!
তোমার হাতের 'পরে এক রাত এই হাত রেখে!
দুই চোখ দিয়ে আমি নিয়েছি তোমার চোখ দেখে!
আজও তুমি জেগে আছ আমাদের অবসন্ন দেশে,
সবাই ঘুমায়ে পড়ে—তবু তুমি পড় নাই ঘুমি।

ভিনাস্ আজিও তুমি মাথা তুলে রহিয়াছ জেগে—
ভরেছে দুধারে ঘাড় সাপের ফণার মতো চুলে!

ঠোঁটের উপরে ঠোঁট চুমোর মতন আছে লেগে!
ফেনার মতন রক্ত দেহে তার উঠিতেছে দুলে।
গ্রীষ্মের সিন্ধুর মতো তার অই দেহের উষ্ণতা!
বিমর্ষ ঘুঘুর মতো চোখে তার সে কী বিষণ্নতা!
হৃদয় ভরিয়া ওঠে অবসাদে—বিষাদে—আবেগে—
বিকালের সমুদ্রের মতো ক্ষুধা উঠিতেছে ফুলে।

তোমার পেগান্ রাজ্য ভেসে গেছে মেঘের মতন—
তাহার সে বজ্র ভেঙে পড়ে আছে পৃথিবীর পিছে,
চলে গেছে গ্রীক সব—হীদেন্ গ্রীকের মতো মন
তোমার মুখের পানে চেয়ে বুকে আবার জাগিছে!
কোথা আছো?—আজিকার পৃথিবীর কে তুমি দেবতা?
উৎসব তোমার বুকে—আমার এ মুখে বিহ্বলতা?
নক্ষত্রের স্বপ্ন তুমি দেখ, আমি দেখি দুঃস্বপন।
তবুও মিথ্যার মতো দেবতারে মনে হয় মিছে!

কারণ দু'হাত তুমি রাখ নাই ভিনাসের হাতে;
তোমার দু'হাত শুধু পেয়েছিল মেরী মাদালিন্—
তাহার চুলের 'পরে ফুলের মতন আশীর্বাদে,
দেবতার দুই হাত এসেছিল নেমে একদিন!
আজিকার পৃথিবীর দেবতার এই শুধু সাধ—
শুধু তৃপ্তি—শুধু তৃপ্তি—সান্ত্বনার শীত আশীর্বাদ!
পৃথিবীর ব্যথা ছাড়া আর কোন্ ব্যথা বুকে বাধে?
যে ব্যথার কাছে এই পৃথিবীর সব ব্যথা ক্ষীণ!

চোখ মেলে তারে তুমি একবাব নেরে নাকি দেখে?
তোমার দু'চোখ শুধু চেয়ে রবে নক্ষত্রের পানে?
কিংবা এই মানুষেরা যেইখানে ঝরে একে একে
তুমি শুধু চলে যাবে সেই সব মশানে-মশানে!
তোমার হৃদয় শুধু রাখিবে কি কুৎসিতের হাতে?
তোমার বুকের রক্ত ঝরাবে কি ক্রুশের আঘাতে?
তোমার ক্রুশের চিহ্ন সকল পৃথিবী দেবে ঢেকে?
এর চেয়ে বেশি কিছু আজিকার দেবতা কি জানে!

দেবতা রয়েছে বেঁচে তাই আজ—মরিবে না আর!
শেষ হবে নাকো আর মেসায়ার মুখ থেকে কথা,
পুরানো রাত্রির মতো আসিবে না নতুন আঁধার,
মুছে দেবে নাকো আর এ নতুন আলোর স্পষ্টতা!
কারণ এ রোদ-আলো শান্ত; শাদা সকাল-বিকাল,
পৃথিবীতে রৌদ্র তবু এক দিন ছিল আরো লাল!
সেই রক্তে আজ আর দেবতার নাই দরকার—
কারণ সে রক্তে জ্বালা আগুনের মতো শুধু ব্যথা!

সকলের মতো চলে আমিও হতাম ক্লান্ত যদি
আর এক অবসাদে পরিশ্রান্ত হতাম না আর—
পৃথিবীর অন্ধকারে সব চেয়ে পরিশ্রান্ত নদী
জানে এই পরিশ্রম?—আর জানে এই অন্ধকার?
পৃথিবীর অন্ধকারে সবচেয়ে গভীর সাগর
খুঁজে যায় আরো গাঢ় কোনো এক গহ্বরের ঘর—
মৃত্যু এসে এক দিন দেবে তারে সকল অবধি—
শেষ হবে খুঁজিবার জানিবার দরকার তার!

কোথায় রয়েছে মৃত্যু? কোন্ দিকে? খুঁজি আমি তারে,
কোথাও রয়েছে মৃত্যু—যেইখানে তুমি আর নাই!
যেখানে তারার আলো কিংবা কালো রাতের আঁধারে
তোমারে চিনি না আর—আমি শুধু তোমারে চিনাই!
ঘুমের—চোখের ঘুম মরণের বুকের উপরে;
প্রেমিকের মতো চুমো আমার সে ঠোঁট থেকে ঝরে
মৃত্যুর ঠোঁটের 'পরে; এক শীত-সমুদ্রের পারে
আমার জীবন পুড়ে পৃথিবীতে হয়ে গেছে ছাই!

তুমি নাই, চোখের ঘুমের মতো ঘুম হয়ে আছি;
বিছানায় মৃত্যু শুয়ে—তার পাশে আমি ঘুম—আমি!
মানুষীর মতো করে তারে আমি ভালোবাসিয়াছি!
বিবাহের খাটের উপরে তার আসিযাছি নামি!
বাহিরে শীতের রাত—জীবনের শীত আর ব্যথা;
ঘোড়ার খুরের শব্দ—খুরের পথের পিচ্ছিলতা!
এখানে গ্রীষ্মের রাত—আমাদের মুখে ঘাম, মাছি!
ঠোঁটে ঠোঁট, কপালের কালো চুল উঠিতেছে ঘামি!

যে কথা শিখি নি আমি কোনো দিন পৃথিবীর দেশে
এইখানে তার ভাষা আস্বাদের মতো মনে হয়।
যেই ভালোবাসা আমি পাই নাই ঢের ভালোবেসে
এইখানে শুরু হয প্রথম সে প্রেমেব সময়!
অই দূর পৃথিবীর সুস্থ প্রেমিকেরা শুধু জানে
যে প্রেম চেয়েছি আমি—যে প্রেম পেয়েছি আমি গানে!
অইখানে সেই প্রেম মাংস লয়ে দাঁড়ায়েছে এসে।
শরীরের রক্তে তার শরীরের রক্ত লেগে রয়!

এই মৃত্যু; একদিন পৃথিবীর পথের জীবনে
বিমর্ষ হয়েছি আমি প্রেমের অনেক গল্প শুনে;
প্রণয়ের ঢের গান বিষ হয়ে জেগেছিল মনে—
মাছির মতন পাখা পুড়ে গেছে প্রেমের আগুনে!
আগুনের মতো প্রেম, তবুও আগুন প্রেম নয়—
মোমের মতন দেহ প্রেমের আগুন শুধু সয়!

জীবনের শীত তারে জ্বালায় নি—জ্বলেছে মরণে!
পৃথিবীর শীতে কারা বসে থাকে দিন গুনে গুনে!

আমিও ঘুরেছি ঢের অই দূর পৃথিবীর শীতে;
ঘোড়ার খুরের শব্দ অনেক শুনেছি আমি কানে,
এক মুখ চিনে আর কিছু আমি চাই নি চিনিতে!
কার ভুরু খুঁজিবে যে একবার তার ভুরু জানে!
কার চোখ দেখিবে যে একবার দেখে তার চোখ!
সব মেয়েমানুষের মাঝে সেই এক মেয়েলোক!
আগুন ধরাতে জানে বরফের বুকে ব্যথা দিতে—
বরফ ছড়াতে জানে আগুনের মতো রাঙা প্রাণে!

অন্ধকারে গাঢ় শাদা সমুদ্রের মতো তার হাসি!
ক্ষুধা তার সাগরের ভিতরের গহ্বরের মতো!
আমার পিপাসা তবু তার চেয়ে গভীর পিপাসী—
ফুরায়ে গিয়েছে তবু পিপাসার সেই সমুদ্র তো!
কে ফুরাল? আহা আহা—কেন তাহা ফুরাল এমন!
জীবনের পারে বসে মরণের গন্ধে ভরে মন—
ফুটেছে বিষের ফুল—নাইট্‌শেড—তারে ভালোবাসি!
জীবনেরে কোনো দিন ভালো আমি বেসেছি কি তত!

সিন্ধুর বুকের থেকে জেগেছিলে ভিনাসের মতো
আমার হৃদয়ে যেই সিন্ধু আছে, তার বুক থেকে!
আমার ভিনাস্ তুমি—আমি জানি, তুমিও জানো তো!
তোমারে এনেছি আমি গভীর সমুদ্র থেকে ডেকে!
আমার দু'চোখ দিয়ে তোমারে এনেছি ডেকে আমি,
আমারে মায়াবী জেনে আমার নিকটে এসে থামি,
ঢেলেছে চুলের থেকে সাপের ফণার বিষ যত!
তবুও তোমার চুলে রেখেছি মাথার চুল ঢেকে!

গ্রীষ্মের সিন্ধুর ঘ্রাণ রয়েছে তোমার দেহে লেগে—
সে কোন্ সাগর দূর—কেউ তার জানে নাকো পার—
সেখানে ঘুমায়ে ছিলে পিপাসার আক্ষেপে—আবেগে!—
দরকার হল তাই জাগিবার আর জাগাবার!
পৃথিবীতে এমন জাগে নি আর কোনো দিন কেউ—
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে বানায় সে সমুদ্রের ঢেউ!
দেবতারা ঘুমায়েছে সন্ধ্যার মেঘের মতো মেঘে,
সে তবু জাগিয়া ওঠে—তার চোখে ঘুম নাই আর!

শেষের ঘুমের ঘাম কেবল কপালে লেগে আছে
অবসন্ন হয়ে চোখ একদিন ফেলেছিলে বুজে—
নতুন মেসায়া এক তখন আকাশে জাগিয়াছে,

তোমার সাম্রাজ্য তুমি সেই দিন পাও নাই খুঁজে!
তোমার অবশ চোখ সেই দিন হয়েছে মলিন—
তোমার ঘুমের পর সেদিন জেগেছে নেজারিন্!
সেই হতে জেগেছে সে—পৃথিবী গিয়েছে তার কাছে,
তাহার বুকের 'পরে সবাই রয়েছে মুখ গুঁজে!

সকল ঘোড়ার খুর গিয়েছে রোমের দিকে ছুটে—
সকল পেগান্ রোম তাদের পায়ের তলে পিষে
সকল পেগান গ্রীস্ তবুও ঘুমের থেকে উঠে
আবার ওঠে নি জেগে পুরানো পেগান্ সেই গ্রীসে!
কারণ নতুন আলো এনেছে নতুন এক ত্রাণ—
আর কেউ রহিবে না অ্যাপোলোর মতন পেগান্।
সমুদ্রের পাপ থেকে তুমি আর উঠিবে না ফুটে,
ফুটিবে না তুমি আর হৃদয়ের সাগরের বিষে!

তোমার চোখের পানে চেয়ে লোক হবে না মলিন,
আগুনের জিভে খেয়ে যাবে না মোমের মতো গলে!
এই শান্তি হাতে করে আনিয়াছি নিজে নেজারিন্,
আগুনের মতো তুমি—সেই সূর্য ওঠে তবু জ্বলে!
তোমরা পাথর আজ, তোমরা হয়েছ আজ কাঠ!
রোমের মেসাযা সে যে, পৃথিবীর সে একা সম্রাট!
আগুনের মতো সে যে, তোমরা তাহার কাছে তৃণ—
তোমরা তৃণের মতো আগুনে-আগুনে শেষ হলে!

আমি তবু মেসায়ার হাত ছেড়ে আসিয়াছি চলে—
ঘুরায়ে নিয়েছি ঘোড়া রোমের পথের থেকে আমি,
এক দিন—এক রাত সে যে এসে বসেছিল কোলে!
তোমার মুখের থেকে সেই বুক আরো গাঢ়, স্বামী!
শুনিয়াছি—মাউন্টের 'পরে তুমি কী কয়েছ কথা—
দেখেছি মেসাযা, আমি তোমার মুখের বিমর্ষতা!
তোমার পথের থেকে তবু আমি পড়িযাছি স্খলে!
কোথায চলেছি আমি কোথায় যাব যে আমি থামি!

যাহারা রোমান্ ছিল মার্চ করে তারা আজি যায
তোমার রাজ্যের দিকে—তোমার ক্রুশের 'পরে সবে—
চুমো দিয়ে চলে যায চুপে চুপে বেলা-অবেলায—
আমারও কি সেই ক্রুশে একবার চুমো দিতে হবে?
যে ঠোঁটে আগুন আছে—যেই ঠোঁটে নাই কোনো জল
তারে তুমি করিবে কি বরফের মতন শীতল!
আমার পিছনে ও কি?—নেজারিন্, তুমি নাকি হায!
তোমার বিষণ্ন চোখ কত দিন চোখে লেগে রবে!

তুমি শান্তি, আর তুমি আকাশের আশ্বাসের দূতং—

আমারে কি শান্তি দেবে? আনিবে কি সান্ত্বনার ছায়া!
যেখানে শিশুরা আর মাদালিন্, মেরী আর রুথ,
সেইখানে চলে যাও অবসন্ন আচ্ছন্ন—মেসায়া!
যেইখানে ক্রুশে বিঁধে কাঁদিতেছে মানুষের শ্বাস,
যেইখানে জন্ম লয় পাইলেট—জুড়া—ব্যারাব্বাস
ভূতের মতন ভাসে তাহাদের হৃদয়ের ভূত—
সেইখানে দয়া আন, সেইখানে আনো তুমি মায়া!

তোমার পায়ের পথ ছেড়ে তবু তুমি পলাতক,—
সবাই রেখেছে, তবু রাখি নাই মেসারার মান!
আমার পায়ের শব্দ হয়তো বা শুনিছে নরক!
বধির নরক, শোনো, আমি এক অধীর পেগান্!
পৃথিবীর পথ খুঁজে পথ আমি পাই নাই কোনো,
ঘুমন্ত হীদেন্ তুমি আমার পায়ের শব্দ শোনো!
এ হৃদযে নাই কোনো ক্রুশকাঠ ধরিবার শখ,
পাপের হাতের থেকে চাই নাকে' কোনো পরিত্রাণ!

ক্লেশে তাপ আছে, তবু, আমি চাই সেই অভিশাপ!
সব চেয়ে পতিতের মতো আমি কহিতেছি কথা,—
সিন্ধুর ফেনার মতো ভাসে যেই বিষ, যেই পাপ—
আমার হৃদযে তার অসুস্থতা; তাহার সুস্থতা!
আমি সমুদ্রের মতো আকাঙ্খায, আলোড়নে গাঢ়!
আমারে পৃথক করো, পৃথক করিতে যদি পার!
শীতল করিতে পার, ক্রুশ, তুমি আমার উত্তাপ?
নির্মল করিতে পার, নেজারিন্, এই আবিলতা?

নেজারিন, দেখেছ কি কোনো দিন চোঁখ তুলে তারে?
ফলন্ত শস্যের মত পৃথিবী গিযেছে ভরে ক্রুশে!
তাদের ছায়ায নয়,—ভিনাসের চুলের আঁধারে
হৃদযের শেষ রক্ত আমি তবু লইতেছি শুষে!
কারণ পতিত আমি, কোনো দিন চাই নাই ত্রাণ,
আমার শরীরে রক্ত গাহিতেছে সমুদ্রের গান!
গাহিবে সে যত দিন গাঢ় হযে গাহিতে সে পারে।
যতদিন মানুষীর অভিশাপ চাহিবে মানুষে!

তারে তুমি দেখিবে না, করিযাছে সে কী অপরাধ?
শান্তির ঘুঘুর মতো সাদা সে কি? লিলির মতন?
ভ্যালির লিলির মতো মাংসের পাপড়িতে স্বাদ?—
সল্ যারে জেনেছিল—বুঝেছিল যারে সলোমন!
সমুদ্রের পারে যেই ফুল ফোটে গ্রীষ্মের বিকালে,
অনেক ফেনার গন্ধ ঘাম ঘ্রাণ যাহার কপালে,
ক্ষুধা যার গরমের সমুদ্রের মতন অগাধ—

আমার ভিনাস্ তাই!—তোমার সে লিলি কি তেমন!

কে বানাল?—বুকে তার দিল এত সাগরের বিষ!
কে বানাল তারে, আহা, তুমি তাহা জান না দেবতা!
জেনেছ কাঁটার চুমা—কাঁটায় নাইকো তার কিস্
তাহার ঠোঁটের 'পরে কার ঠোঁট রয়েছে, দেখ তা!
কারণ লিলির গায় এমন থাকে কি লেগে লিলি?
শীতল লিলির স্বাদ চিনায়েছে তোমারে, গ্যালিলি!
জেনেছি কি, এক দিন জেনেছে যা গ্রীক অ্যাডনিস?
পরাজয় করেছে সে পৃথিবীর এই বর্বরতা!

এসেছে নতুন ভোর নতুন দিনের আলো লয়ে—
আজ কেউ গ্রীক নয়, খোঁড়া—খর্ব—চায় সব ত্রাণ!
এক দিন হয়েছে যা, গেছে তার সব শেষ হয়ে!
গোধূলির আলো এসে ঘিরিয়াছে তোমারে পেগান্।
অনেক শীতের রাত নামিতেছে আকাশের থেকে,
দেবতা পেতেছে ব্যথা পৃথিবীর দরিদ্রতা দেখে,
শান্তির নিশ্বাস তার অশান্তির ঢেউয়ে চলে বয়ে,
তাহার গ্যাবার্ডিনে লেগে আছে মঙ্গলের ঘ্রাণ!

নেমেছে শুভ্রের দিন—পেগানের গোধূলির আলো
ডুবে গেছে পশ্চিমের পাহাড়ের পিছনে সাগরে!
এই রাতে জানালায় নক্ষত্রের মতো বাতি জ্বালো,
শীতের উঠান ছেড়ে সবাই চলিয়া এসো ঘরে ;
পিছনে পড়িয়া থাক যেই সব রবে পড়ে পিছে,—
পৃথিবীর বালকের বিস্ময়ের বিহ্বলতা মিছে!
নেমেছে শান্তির দিন, সান্ত্বনারে বাসি সবে ভালো,
মঙ্গলের দেবতার পূজা আজ করি পরস্পরে!

চার দিকে জ্ঞান আজ—পুরানো জ্ঞানের মতো নয় ;
চারি দিকে বোধ কোন্?—আমি তার পাই নাকো আলো,
যেই সময়েরে আর আনিবে না অসীম সময়,
অগাধ অতীতে যার সমুদ্রের সীমানা হারাল,—
আমি একা বসে আছি আজ সেই সাগরের পারে ;
সব চেয়ে বেশি আলো সব চেয়ে গভীর আঁধারে
সেইখানে মিশে যায়—সেইখানে সব শেষ হয়—
তারপর, হে জিহোবা, আকাশে তোমার বজ্র জ্বালো!

আবার নতুন মাংসে তোমার পৃথিবী ফেলো ভরে,
রক্তের হাড়ের বীজ বিছায়ে দিতেছ তুমি পথে
নতুনের বিধানের অই শ্রান্ত পথ ধরে ধরে
মুশার মতন মাথা দেখা দেবে উষার পর্বতে:

তোমার কমাণ্ড্‌মেন্ট, সেই সব অবসন্ন শোভা—
আবার দেখাবে তুমি আমাদের, বিরক্ত-জিহোবা!
কবরে যাদের হাড় আজ আর ওঠে নাকো নড়ে—
সেই মৃতদের তুমি ক্লান্ত হয়ে দেবে তো ঘুমতে!

তাহারা ঘুমাক্—আহা—আমিও তাদের মতো ঢুলে
ঘুমায়ে যেতাম যদি তাদের কিনারে মাথা রেখে!
আজিকার এই জ্ঞান আর এই অজ্ঞানতা ভুলে
অবসন্ন ডান হাত দিয়ে ক্লান্ত কপালেরে ঢেকে
আমিও হতাম যদি অতীতের মতন অগাধ!
সব চেয়ে অবসন্ন! সবচেয়ে বড়ো অবসাদ!
আজিকার এই শীত পৃথিবীর কোলে থেকে তুলে
আমারে তোমার কোলে তুমি এসে নিতে যদি ডেকে!

আজ এই পৃথিবীরে করিয়াছি আমি অস্বীকার;
আর তার জ্ঞান আমি জানিব না, শুনিব না কথা,
দেখিব না আর তার আলো আমি—তার অন্ধকার;
বুঝিব না এ আলোয় আছে কোন নতুন স্বচ্ছতা!
জানিব না এ নতুন দেবতার কোন্ রূপ আছে।—
তাহারে যে চায় নাই তাদের সে ভালোবাসিয়াছে;
আমারে যে চায় নাই আমি তবু চুমো চাই তার,
যারে আমি পাই নাই তারে খুঁজে চাই আমি ব্যথা।

তারপর শান্তি চাই—তোমার মতন শান্তি নয়!
সেইখানে আলো নাই, দূত নাই, ঈশা, তুমি নাই,
সেইখানে জিহোবার মুখে চেয়ে কাটে না সময়,
সময়ের বুকে শুয়ে সেইখানে সময় কাটাই?
তোমার ড্রামের শব্দ একদিন উঠিবে কি বেজে!
ডুম্‌স্‌ডে-র ড্রাম-ট্রাম্‌পেট তারা ভুলে গিয়েছে যে!
যেই ঘুমে ক্লান্ত কপালের ঘাম ভুলে যেতে হয়,
সেই ঘুম—আমি শুধু পেগানের সেই ঘুম চাই!

মৃত মাংস

ডানা ভেঙে ঘুরে-ঘুরে পড়ে গেল ঘাসের উপরে;
কে তার ভেঙেছে ডানা জানে না সে; আকাশের ঘরে

কোনো দিন—কোনো দিন আর তার হবে না প্রবেশ?
জানে না সে; কোনো-এক অন্ধকার হিম নিরুদ্দেশ
ঘনায়ে এসেছে তার? জানে না সে, আহা,
সে যে আর পাখি নয়—রঙ নয়—খেলা নয়—তাহা

জানে না সে; ঈর্ষা নয়—হিংসা নয়—বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে।
সাধ নয়—স্বপ্ন নয়—একবার দুই ডানা ঝেড়ে

বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায়; রূপালি বৃষ্টির গান, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যায় শুধু তার, মুছে যায় বেদনারে মুছিবার সাধ।

নদী

বঁইচির ঝোপ শুধু—শাঁইবাবলার ঝাড়—আর জাম হিজলের বন—
কোথাও অর্জুন গাছ—তাহার সমস্ত ছায়া এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারা দিন কহিতেছে অই নদী?—এ নদী কে?—ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে; যেখানে মানুষ নাই—নদী শুধু—সেইখানে গিয়ে
শব্দ শুনি তাই আমি—আমি শুনি—দুপুরের জলপিপি শুনেছে এমন
এই শব্দ কত দিন; আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার পথ দিয়ে

হেঁটে যেতে—ব্যথা পেয়ে; দুপুরে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন;
মনে হয় কোন্ শিশু মরে গেছে, আমারই হৃদয় যেন ছিল শিশু সেই;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতখানি আশা করে—আমিও তেমন

একদিন করি নি কি? শুধু একদিন তবু? কারা এসে বলে গেল; 'নেই—
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার তরে নয়!'
হাজার বছর ধরে নদী তবু পায় কেন এই সব? শিশুর প্রাণেই
নদী কেন বেঁচে থাকে?—এক দিন এই নদী শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর; মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়—শেষ হয়।

সমুদ্রচিল

সমুদ্রচিলের সাথে আজ এই রৌদ্রের প্রভাতে
কথা ব'লে দেখিয়াছি আমি;
একবার পাহাড়ের কাছে আসে,
চকিতে সিন্ধুর দিকে যেতেছে সে নামি;
হামাগুড়ি দিয়ে ভাসে ফেনার উপরে,
মুছে যায় তরঙ্গের ঝড়ে।
দাঁড়ায়েছি শতাব্দীর ধুলো কাঁচ হাতে॥

তরঙ্গের তাড়া খেয়ে চলে যায় আরো দূর তরঙ্গের পানে—
ফেনার কান্তারে
বৃষ্টির প্রথম রোদ যেইখানে
তাহার সোনালি ডানা ঝাড়ে;

যেখানে আকাশ নীল কোলাহলময়,
সমুদ্র করিছে দূর সমুদ্র সঞ্চয়,
দিগন্ত হারায়ে যায় দিগন্তের প্রাণে॥

চঞ্চল ধবল বুকে নাচিতেছে ফেনার আঙুল;
ধানের শিষের মতো দু পায়ের শিরা
নাচিছে স্পানিশ টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে;
হৃদয় করিছে পান মালাবার হাওয়ার মদিরা;
ট্রম্ ট্রম্ ট্রাম্ ট্রাম্—ড্রামের মতন
শৈলে শৈলে সমুদ্রের রুক্ষ আন্দোলন :
রৌদ্রে রৌদ্রে ঝলসায় ঝিনুকের ফুল॥

বিজ্ঞান কি মস্তিষ্কের বাক্সের মতন একাকী?
তোমার শরীরে জল—দ্রাক্ষার আঘ্রাণ;
তোমার হৃদয়ে পেকে ঝরিতেছে রৌদ্রের ক্ষেত,
জাগিতেছে নব নব শস্যের সন্তান:
আমরা বন্দরে ফিরি—জনতায়—ঘূর্ণিস্রোতে কুকুরের
মুণ্ডে লোল আঁখি
পাবে নাকি লেজ তার? হো-হো—পাবে নাকি!
পাবে নাকি লেজ তাঁর? হো হো- পাবে না কি!
পাবে না কি লেজ খুঁজে কুকুরের মতো লোল আঁখি ॥

ছেড়ে দিয়ে উত্তরের বাতাসের প্রাণে
জন্মেছে তোমার ডানা—জেগেছে হৃদয়;
সহস্র শতাব্দী-গিঁট কাটায়েছি পথ আর ঘরের আঘ্রাণে—
আনন্দের পাই নিকো তবু পরিচয়;
জন্মে নি ধবল ডানা বিজ্ঞানের অগ্রসর চিরি;
ভেঙে গেছে আকাশের—নক্ষত্রের সিঁড়ি
উৎসবে খুঁজেছি রাতবিরেতের গানে।

পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়ায়েছি মনোবীজ, আহা,
আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্গ সন্তান;
অথবা ঘাসের দেহে শুয়ে শুয়ে কুয়াশায়
শুনেছি ঝরিতে আছে ধান;
অথবা সন্ধ্যার নীল জানালায়
অদৃশ্য কোকিল এসে গায়
এইসব বেদনার কর্কশ-রেডিয়ামে মারে নাকো তাহা॥

মাঝে মাঝে একবার ধরা দেই নক্ষত্রের হাতে
চ'লে আসি সমুদ্রের পাশে;
যে ক্ষেত ফুরাতে আছে—ফুরাইয়ে গেছে
তার তৃষ্ণা মিটিয়ে আকাশে;

চেয়ে দেখি সেই নীল আকাশের ছবি;
সমুদ্রের অজান্তব জানালার গল্পের সুরভি;
রৌদ্রের ডানায় ভেসে সেইখানে পৃথিবী হারাতে
চাই আমি; সমুদ্রচিলের খেলা তুলে নিয়ে হাতে॥

২

রঙিন বিস্তৃত রৌদ্রে প্রাণ তার করিছে বিলাস;
কোনোদিন ধানক্ষেতে পৃথিবীর কৃষকের প্রাণ
এই রৌদ্র পায় নাই; জলপাই পল্লবের ফল,
জ্যৈষ্ঠের দুপুরে মাছি যে উল্লাসে গেয়ে গেছে গান,
কুমারী কোমল ঘাড় নুয়ে চুপে যেই পক্ব রৌদ্রে বেণী করেছে বিন্যাস,
নীল হয়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকূপী ঘাস,
তরমুজ ক্ষেতে শুয়ে স্বপন দেখেছে চৈত্রমাস,
তার চেয়ে আরো ঘন গাঢ় মদে প্রাণ তার করিছে বিলাস॥

পৃথিবীতে যেই রূপ কোনোদিন দেখে নাই কেউ;
সিংহলের হীরা রত্ন নারী লুটে নাবিকেব দল
ভারত সমুদ্রে নেমে নক্ষত্রের রজনীতে
তাবপর ভোরবেলা দেখেছিল স্ফটিকের মতো যেই জল;
তরঙ্গের 'পরে ঘন তরঙ্গের মধু আর দুধ,
মেঘের গোলাপি মুখ—রৌদ্রের বুদ্‌বুদ;
তবু তারা দেখে নাই পুরুভুজ-বিছানায় নূপুর বাজায়ে নাচে ঢেউ
বারুণীর জানালায়; সিন্ধুচিল—মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাকো কেউ॥

ধ্বনিত ঢেউয়েব অগ্নি বয়ঃসন্ধি-দিবসের স্তন হয়ে রক্তে নেমে আসে।
তবঙ্গের উষ্ণ নীল তরমুজ ক্ষেতে
আমারে খুঁজিযা পায মৃত্যু যেন;
বিস্মৃতির পথে যেতে-যেতে
সমস্ত পৃথিবী যেন মিশে যায রৌদ্রের সাগবে;
সিন্ধুচিল আর তার বনিতা যেখানে খেলা করে;
মরণ আমাবে যেন পায় সেই দারুচিনি হাওযার আশ্বাসে॥

হঠাৎ-মৃত

অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নাব ভিতব
কাউকে মৃত্যু ফেলে দিল
নীচে—অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

রূপসী প্রথম প্রেমের আস্বাদ পেতে যাচ্ছিল:
শোনো—গলার ভিতরে তার মৃত্যুর গোঙরানি;
সে নিজেও মৃত্যু যেন,

বিবেক নেই আর তার।

কবি চোখ মেলে বলেছিল:
আমার হৃদয়ের ভিতর ইন্দ্রধনুর মতো কত বুদ্‌বুদ্‌,
হিম মৃত্যু এসে চোখ অন্ধকার করে ফেলল তার।

এই সব হঠাৎ-মৃত্যু
এই সব হঠাৎ-মৃত
আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
বিক্ষুব্ধ বাঘের মতো গর্জন করে উঠছে যেন।
গর্জন করে উঠছে আমার হৃদয়ের অরণ্যে।

রূপ—প্রেম—খ্যাতি—সুপক্ব রৌদ্রের ভিতর
দাঁতের এনামেল ঝিকমিক করে ওঠে
পবিত্র সমুদ্রের মতো—
চিরন্তন।

হায়, সোনালি বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শুয়ারের মাংস
শুয়ারের মাংস শুধু;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

বিস্ময়

নবতর ভিড় আসে—সহসা বিস্মিত হয়ে ভাবি:
এ কি সেই পরিচিত ধূসর উচ্ছ্বাস:
টাকা, কাজ, ক্ষুধা, অন্ন, বিলুপ্তির তরে?
মনের মতন করে এক দিন গড়িতে চেয়েছি যেই সময়ের ধূম্র আকৃতিরে?
—বাতাস যেমন করে চায় গড়িবারে
কোনো ক্লান্ত গরীয়সী গণিকাব
বিপন্ন বিস্ময়টিরে—মুহূর্তের;
তারপর গূঢ় তামাশায় যেন চলে যায় পাখিদের ডানার পিছনে;
সে জানে বিচ্ছিন্ন বীজ রয়েছে এ শতাব্দীতে—
চারিদিকে মননের অধিপতি সব
তাহাদের জন্ম দিল:
তাহারা উঠিছে ফুঁড়ে জলের আনন আর বাতাসের প্রতিভারে হেসে—দূরে ঠেলে—
অনেক নিরন্ন বীজ রয়েছে এ শতাব্দীতে—ছিল আর প্রস্তরের ভিত্তির থেকে
তাহারা উঠিছে স্ফুরে—তাহারা উঠিছে স্ফুরে—যেন কোনো, বিস্ফোরক তরঙ্গের ধ্বনি
পীবর দেহের গন্ধ যেন কোন্ পীতবর্ণ তটিনীর—যেন কোনো রক্তবর্ণ সমুদ্রের।

নবতর ভিড় আসে—প্রত্যূষের স্ফূর্তির মতন,

বিরাট আকাশ ভরা সমস্ত উষার মতো অদ্ভুত প্রয়াস:
বাতাস যেমন করে চায় ভাঙিবারে নব নব নাগার্জুন–কীর্তি–কিরীটেরে,
নিরঙ্কুশ–অক্লান্তির পীত দেবতারে;
তারপর গূঢ় তামাশায যেন চলে যায় পাখিদের ডানার পিছনে।

জীবনসংগীত

স্ট্রেচারের 'পরে শুয়ে কুযাশা ঘিরিছে বুঝি তোমার দুচোখ:
ভয নেই, মৃত্যু নয় কোনো এক অপদার্থ অন্যায আলোক;
তা হলে কি এত লোক ম'রে যেত মশালের লালসায—মাছির মতন?
অমৃতের সিঁড়ি ব'লে মানুষেরা গড়িত কি এত শাদা শ্লোক।

আজ মৃত্যু; এর আগে ম্যাটেডরদের মৃত্যু ছিল নাকি স্পেনে?
লড়েছে বীরের মতো রাঙা রৌদ্রে আপনারে সব চেয়ে হাম্বড়া জেনে
খেয়েছে আঁধার রাত্রি অকস্মাৎ। তবু এক হরিয়াল: বাংলার পাখি
শিকারীর-গুলি-সার-নীলাকাশ ভেবে নেয মরণকে মেনে।

তবু মোরা দিবালোক উথাপন করি রোজ শৌণ্ডিকের মতো;
গেলাস ভরিয়া দেই;—মনে হয কম্পাশ, সিন্ধু, রৌদ্র,—জীবন ফলত
ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। মরে গেছে; ভূস্তরের অন্ধকারে চূর্ণ তারা।
কিন্তু আমাদেব আযু সানস্পট্ গিলে ফেলে সূর্যেব মতন ব্যক্তিগত।

পিতৃলোক

পিতৃলোক, তোমরা কি ভস্ম হযে গেছ দূরে সিরুলির শ্মশানের পারে?
অতখানি অগ্নি আর আলোকের কোথাও রয়েছে যেন নক্ষত্রের মতো ব্যবহার।
মৃত তারকারও থেকে নীহারিকা শূন্য পিঁজে জেগে ওঠে আর-একবার;
আবার প্রসব হয বৃহস্পতি নক্ষত্রের; শেষ ভাঁড় গল্প ব'লে মিশে গেছে যখন আঁধারে।

আমি জানি তোমরা কোথাও যেন রয়ে গেছ এই উপসাগরের কাছে;
অথবা জাভার দিকে গভীর মেঘের রাতে চলিতেছে তোমাদের ক্ষোভের তবণী;
বোরোবুদুরের কোনো মন্দিরের সংযমে হয়তো পেঁচারা শোনে তোমাদেব ধ্বনি:
আমারই কানের কাছে অবিশ্বাস্য কৃচ্ছ্রকলরবে যেন কাদেব সূচনা জেগে আছে।

নির্জন রোমশ হাত তোমাদেব আজও যেন দেবদারু কাঠ নিযে ছাঁচিতেছে হাঙরের মুখ;
জীবনের ব্যাকরণ জিনে নেবে যেন তারা কিমাকাব সমাসকে ছিঁড়ে;
যেন তারা তরমুজ—বই—নারী—আত্মা সব নিযে যায় বিরুদ্ধ সমীরে:
গভীর পরানী ছিল তারা এই জীবনের—অনেক আশ্চর্য শাদা দাড়ির চিবুক

নেপথ্যে নাড়িতে আছে; মৃত শতাব্দীর থেকে আরো অন্ধ বধির শর্তকে
হাস্যের দস্তানা প'রে প্রভাতের রৌদ্রে তারা চলিতেছে সারসের পাল।

তবুও বিমুখ মোরা;—যুদ্ধ, রক্ত, জ্যামিতিক ঈশ্বর, মাকড়শা, মশার জঞ্জাল
আমাদের ঝুলি যেন ভরে দিল;—ক্লান্ত ইহুদীর মতো জ্যোতির্ময় চাঁদনীর চকে

চোরাবাজারের থেকে তবু ঠুলি চাই; না হলে চোখের শিরা পুড়ে যাবে রঙের বিদ্বেষে
একশো বছর ধরে তোমাদের স্মরণ করেছে এই পৃথিবীর শশকেরা, গাঢ় পিতৃলোক?
না না। তবু তোমাদের সসম্ভ্রম প্রাণে ছিল অপার্থিব, অন্যায় আলোক:
আমাদের চোখঠার দিয়ে তারা গৈবী পণ্য নিয়ে যায় অন্য এক সূর্যের উদ্দেশে।

অগ্নি

আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।
জানো না কি রাত্রি এসে ঘিরিতেছে আরো-এক দীর্ঘতর বৃত্তে রোজ
মানুষের জীবনকে।
যে সব সৌন্দর্য রচে গিয়েছিল একদিন মেধাবীরা
আজ এই রজনীর অবরোধে মনে হয়
তাহাদের জ্যোতি যেন বিস্ফোরক বাষ্প হয়ে জ্বলে
সহসা আকাশপথে দিক্‌হস্তিদের মতো—অদ্ভুত—অভীক্ষ্ম মদকলে;
কোনো আমলকী নাই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে।

এখানে দাঁড়ায়ে থেকে ন্যুব্জ ছবি চোখে পড়ে পৃথিবীর:
বিবর্ণ পাথরে গড়া প্রান্তরের পীঠে এক ধর্মমন্দিরের;
আশি বছরের বুড়ো শীতের কুয়াশা ঠেলে সেই দিকে চলিযাছে একা:
হযতো বাজাবে ঘন্টা, হয়তো সে সারাৎসার বিধাতাকে কাছে পাবে:
আমরা যেমন করে পাই মৃত্তিকাকে, মৃত্যুকে।

পীবর মাটির মতো নিষ্কাশিত হয়ে যেন পৃথিবীর জরায়ুর থেকে
মাঠের কিনারে ব'সে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মূল সন্তান;
তারা খাদ্য চায়; তবুও অভুক্ত পেটে তরবার হাতে নেবে
যোদ্ধার মতন নয়; নকল সৈন্যের মতো কলরবে পাঁচালিব দেশে।
কৌতুকে—গোলার সব মৃত—পবাহত—ধান থেকে মেড়ে
যদি কেউ অন্যতম আলেযার রস এনে দিযে যেত তাহাদের।
কেউ দেবে নাকো আজ এই তুগুসমীচীন পৃথিবীতে।
মাথার উপর দিযে অনেক সন্ধ্যার কাক
প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায আবির্ভূত গম্বুজের দিকে।

সেই পথে আমাদের যাত্রা নেই, হে সন্তান।
  বৃত্তের মতন সূর্য—পশ্চিমের—
  মৃত প্রলম্বিত—হাঙরের মতো—
    মেঘের ওপার থেকে
প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়,

শস্যহীন ক্ষেতে,
গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে, কবরে, আমাদের সবের হৃদয়ে।
এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।

এক দিন ভাবি নি কি

এক দিন ভাবি নি কি আকাশের অনুরাধা নক্ষত্রেরা বোন হবে—বোন
নক্ষত্রের ভাইয়ের—ধ্রুবতারা শুকতারা কোন্ তারা আছে
অই দূর হেমন্তের আকাশের কোন্ তারা জেনেছে তেমন শিহরণ
এক দিন জেনেছি যা—সোনালি মেঘের ভোরে জীবন যা সব জানিয়াছে
এক দিন।

উদয়াস্ত

সূর্যের উদয সহসা সমস্ত নদী
চমকিত করে ফেলে— অকস্মাৎ দেখা দিয়ে —
চলে যায়; হাড়ের ভিতরে মেঘেদের
অন্ধকার; স্তম্ভিত বন্ধুর মতো ভোব
এইখানে সাধু রাত্রির হাত ধ'রে
তাকে শ্রেযতর চালানির মূল জেনে
নিখিলের— মৃত মাংসের স্তূপ
চারি দিকে; তাব মাঝে ধন্বন্তরি, কালনেমি
কিছু চায:
দুস্তর চাদর গাযে অন্ধ বাতাসেব।
সূর্য তবু— সূর্য যেন জ্যোতি:
প্রতিবিম্ব রেখে গেছে তরবারে— ভাঁড়ের হৃদযে,
ধর্মাশোকেব মনে।

করজোড়ে ভাবে তারা :
ঝলিছে সারস শব ঢের
বৈতরণী তরঙ্গের দিকে ভেসে যেতে যেতে
লোকোত্তর সূর্যের আমোদে।

সুমেরীয়

ক্রমে ধুলো উড়ে যায় বিকেলের অন্তহীন পাটল আকাশে:
অস্ফুট বৃষ্টির গন্ধ:—প্রকাণ্ড মযদান জুড়ে এক পাল ভেড়া
নিরুত্তর ছবির মতন স্পষ্ট;
সূর্যের তির্যক গতি
কৃষ্ণাভ মেঘের থেকে তাহাদের শরীরের 'পরে

সুমেরীয় বল্লমের মতো যেন প্রাগৈতিহাসিক তর্কে নড়ে।

অদ্ভুত অমল আলো একবার জ্বলে ওঠে চারি দিকে
সন্ধ্যা আসিবার আগে।
য়ুনানী যুগের স্তম্ভ—মাঠের বাদামি ঘাস—নদী—
ঢের মজুরের মুখ—মনে হয়—সুমেরীয়।
ইহাদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে তবে বহু দিন।
কপিশ মাটির গর্ভ খুঁড়িলেই অখণ্ড প্রেমিক প্যারাফিন
এরা সব। এই ভৌতিক আলো চাই নাকো—আমি চাই ক্ষেম।
ইহাদের অরুন্তুদ উৎস তবু সুমেরীয় প্রেম।

মৃত্যু

হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে
মাঘ রাতে—তাহারা দুপুরে ব'সে শহরে গ্রিলে
মৃত্যু অনুভব করে আরো গাঢ়—পীন।
রূপসীও মরণকে চেনে
মুকুরের অই পিঠে—পারদের মতো যেন
নিরুত্তর হয়ে আছে। অথবা উড্ডীন
এক-আধটি দৈত্যাকৃতি দেখা যায়
জনতারে চালাতেছে বিকালের বিরাট সভায়;
নিদারুণ বিশ্বাসের মতো যেন স্থির;
মৃত্যু নাই—জানে তারা;—তবুও তাদের মুখ
চকিত আলোয় পূর্ণ ফোটোগ্রাফ থেকে
উঠে এসে ভীত হয
নিজেদর গ্লানিহীন পরিণতি দেখে।*

আমিষাশী তরবার

স্মৃতিই মৃত্যুর মতো—ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি গম্ভীর আহ্বানে
ভোরের ভিখিরি তাহা সূর্যের দিকে চেয়ে বোঝে।
উঁচু মঞ্চে বিধাতার পরিত্যক্ত সন্তানেরা জানে;
পাণ্ডুলিপি, যব আর সোনার ভিতরে তারা খোঁজে

অবহিত প্রতীককে। কে দিয়েছে স্মৃতি এই বিকীর্ণ হৃদয়ে:
কোনো কিছু অবলুপ্ত পিপাসার অন্ত্যজ ধারণা?
বৈশালীর থেকে বায়ু জাহাজের মুখে আজও বহে;
প্রাকৃত নাবিকাধমও মাস্তুলের পিঠ ঘেঁষে দুপুরের রৌদ্রে অন্যমনা

চেয়ে থাকে। চারি দিকে নবীন যদুর বংশ ধ্ব'সে
কেবলই পড়িতে আছে; সংগীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া

নষ্ট করে দিয়ে যায়;
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয় এইসব গভীর অসূয়া।

জেনেছে বরুণ, অগ্নি, নরনারী: কর্মক্ষম জীবনের শেষে
এক পাল ভেড়া লয়ে হেমন্তের মাঠে
শান্তি সারাৎসার নয়—আলো জ্বেলে শকুনিমামার সাথে হেসে
নগরীর রাত্রি চলে—আমিষাশী তরবার হয়ে তার প্রভাতকে কাটে।

দানবীয়

মেঘের কিনারে শুয়ে একবার নক্ষত্রের রাতে
আমি এক আত্মা নাকি—প্রেত নাকি শুধু?

একবার দেখে নিই জনহীন সমুদ্রের জ্যোৎস্নায়
বাতাসের শাদা অস্থি উড়িতেছে বালুকার মতো যেন ধু ধু;
একবার দেখে নিই প্রান্তরের 'পর
দৈত্য এক দাঁড়ায়েছে;
এ পৃথিবী যেন তার ক্রীড়ার গহ্বর।

তারপর তারকার থেকে দূর তারকার পানে
মুখ তুলে হৃদয়ের জ্ঞানের অজ্ঞানে
স্তব্ধ হয়ে থাকি আমি;—
হেমন্তের কোন্-এক জ্যোৎস্নাশীর্ষ রাতে
শেয়ালেরা খরগোশ শিকারে বেড়াতে
বেড়াতে বেড়াতে যদি মানুষের মতো খেদ পায়
তা হলে যেমন তারা কেঁপে ওঠে রোমকূপে
চাঁদ আর অরণ্যের অবিকল দানবীযতায়।

কালাতিপাত

সমুদ্রের প্রতিধ্বনিময় এক
আঁকাবাঁকা গুহার আঁধারে
প্রবেশ করিতে গিয়ে বোঝা গেল সুর ভাসে:
এই কুরুবর্ষ—এই কন্যাকুমারিকা
অতীতের কুয়াশার পারে।

প্রকাণ্ড ধীমান এক দেবদারু-বিবরের থেকে
প্রশান্ত বায়ুর শব্দ নড়ে;
'হে মানুষ' ব'লে সে ডাকে না কোনো জনগণদের।
আমি ক্লান্ত প্রাণ আজ প্রলাপপাণ্ডুর পৃথিবীতে;
হৃদয়ের কাছে ঢের যুক্তি ছুঁড়ে

যখন মস্তিষ্ক গেল জিতে
শরণ নিলাম আমি সূচীমুখ জ্বেলে দিয়ে——স্তব্ধতায়——
বৃশ্চিক-গ্রথিত আঁধারের।

শুনি আমি আরো শব্দ——যত দূর চলে যাই তত;
ওরা সব আমারি মতন:
দুশ্চর সমুদ্র ঘিরে বধির বদ্বীপ——ইতস্ততঃ——
নিস্পৃহ ভূখণ্ড নিয়ে
এক–এক জন।

আজ এই পৃথিবীর
স্তূপীকৃত——অন্ধ——নির্বান্ধব——
লোহার শকট ভরা আবিষ্ট মানব।
কিংবা আরো অশ্লীল তাহাদের শব:
কতখানি নেত্র আর নাসিকার তরে,
কতখানি মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অক্ষুন্ন সঞ্চয়:
ভাবিছে প্রতিভূ একা শীর্ণ জাদুঘরে
অদ্ভুত অঙ্গন তার জ্যোৎস্না আর তরুদের সঞ্চারণময়।
অদ্ভুদ অঙ্গন তার
জ্যোৎস্না আর রক্ত, বালুকার।
মোরা সব সন্তানের সন্ততি তাহার।
সময় গণনা আর করে নাকো তাহার মিশ্রিত মৃত্য বুকে নিয়ে
কখন সে আপেক্ষিক তরঙ্গে হারিয়ে
হয়ে গেছে প্লিওসিন যুগের পাহাড়।

হেমন্ত

আজ রাতে মনে হয়
সব কর্মক্লান্তি অবশেষে কোনো এক অর্থ শুষে গেছে।
আমাদের সব পাপ——যদি জীব কোনো পাপ করে থাকে পরস্পর
কিংবা দূর নক্ষত্রের গুল্ম, গ্যাস, জীবাণুর কাছে——
গিয়েছে ক্ষয়িত হয়ে।
বৃত্ত যেন শুদ্ধতায় নিরুত্তর কেন্দ্রে ফিরে এল
এই শান্ত অঘ্রাণের রাতে।

যত দূর চোখ যায় বিকোষিত প্রান্তরের কুয়াশার ব্যাস
শাদা চাদরের মতো কুয়াশার নীচে শুয়ে।
হরীতকী অরণ্যের থেকে চুপে সঞ্চারিত হয়ে
নিশীথের ছায়া যেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে
প্রতিধ্বনিহীন, হিম পৃথিবীর পিঠে।
সুষুপ্ত হরিণ——লোষ্ট্র; মৃত আজ; ব্যাঘ্র মৃত; মৃত্যুর ভিতরে অমায়িক।

জলের উপর দিয়ে চলে যায় তারা; তবু জল
স্পর্শ করে নাকো, সিংহদুয়ারের মতো জেগে উঠে ইন্দ্রধনু
তাহাদের যেতে দেয়; অদ্ভুত বধির চোখে তবু তারা
অভ্যর্থনা করে নাকো আজ আর আলোর বর্বর জননীকে।
বাংলার শস্যহীন ক্ষেতের শিয়রে
মৃত, বড়ো, গোল চাঁদ;
গভীর অঘ্রান এসে দাঁড়ায়েছে।
অনন্য যোদ্ধার মতো এসেছে সে কত বার
দিনের ওপারে সন্ধ্যা—ঋতুর ভিতরে প্লাবী হেমন্তকে
দৃষ্ট প্রত্যঙ্গের মতো এই স্ফীত পৃথিবীতে
ছুরির ফলার মতো টেনে নিয়ে।
বেবিলন থেকে বিলম্বিত এসপ্লানেডে
বিদীর্ণ চীনের থেকে এই শীর্ণ এককড়িপুরে
মানুষের অরুন্তুদ চেষ্টার ভিতরে।

নিঃসরণ

দুর্গের গৌরবে ব'সে প্রাংশু আত্মা ভাবিতেছে ঢের পূর্বপুরুষের কথা:
যারা তারে জঙ্ঘা দিল—তবু আজ তরবার পরিত্যাগ করার ক্ষমতা
যারা দিল; প্রাচীন পাথর তারা এনেছিল পর্বতের থেকে
স্থির কিছু গড়িবার প্রয়োজনে; তাবপর ধূসর কাপড়ে মুখ ঢেকে
চলে গেছে; পিছল পেঁচা যে ওড়ে জ্যোৎস্নায়— সেইখানে তাদের মমতা

ঘুরিতেছে—ঘুরিতেছে— শুক্র মঙ্গলের মতো; আমার এ শাদা শাটিনের
শেমিজ পেতেছে সেই মনস্বিনী শৃঙ্খলাকে টের।
এই দুর্গ আজও তাই—ক্রিয়াবান সপ্তমীর চাঁদের শিঙের নীচে হিম
লোল—বক্র—নিরুত্তর; আজই রাতে আমার মৃত্যুব পব নতুন রক্তিম
সূর্য এসে প্রয়োজন মেগে নেবে এইখানে লোকশ্রুত ভূমিকম্পের।

পূর্বসূরিদের ইচ্ছা অনুশাসনের মতো করিতেছে কাজ।
প্রাচীন লেখের থেকে অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ সমাজ
করতালি দিয়ে হাসে; দূরবীনে দেখা যায় যেই সব জ্যোতির্ময় কণা
অনন্ত মোমের তেজ নিয়ে নাচে—সেই সব উচ্চতর রসিক দোতনা
মৃত্যুকে বামনের করতলে হরীতকী অন্তত করে দিক আজ।

উদয়াস্ত

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে যখন হয়েছে পূর্ণ সময়ের অভিপ্রায়—
আগাগোড়া জীবনের দিক চেয়ে কে আবার আয়ু চায়?
যদিও চোখের ঘুম ভুলে গিয়ে মননের অহংকারে চর্বি জ্বালায়

অপ্রেমিক; কোনো কিছু শেষ সত্য জিনে নেবে বিষয়ের থেকে।

তবু কোনো জাদুকর পুরানো স্ফটিক তার যায় নাই রেখে।
সময় কাটাতে হয় ব্যবহৃত হস্তাক্ষরে চীবরের ছায়াপাত দেখে।

অথবা উদ্রিক্ত যারা হয় নাকো—চিরকাল থাকে সমীচীন—
তাহাদের মুণ্ড যেন কালো হাঁড়ি—মাচার উপরে সমাসীন;
মৃত্যু নাই তাহাদের—জানে সব দেবী, পরী, জিন।

আর যারা বহু দিন পৃথিবীতে মেধে—মনে—ছিল কর্মক্ষম;
তারপর বুড়ো হয়ে স্মরণ করিতে চায় অবলুপ্ত মলযাচলম্:
তাদের হৃদয়ে ঢের মেষ আছে—নাই কোনো শুভ্রঘ্রাণ গম।

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে যখন হয়েছে পূর্ণ সময়ের অভিপ্রায়—
আগাগোড়া জীবনের দিকে চেয়ে কে আবার আয়ু চায়?
কন্যা তুলা কর্কটের বৃশ্চিকের আবার ঘটুক সমবায়।

অনুভব

নিঃশব্দ পাখার আছে প্রাণ,
   রয়েছে প্রবাদ।
আমি স্পর্শ করিতেই
   হল তার উড়িবার সাধ।

তবে সে ধূসর প্রজাপতি:
এতক্ষণ রয়েছিল পাথরের কোলে;
ঘাসের তরঙ্গ বেয়ে হয়তো পাথরই ধীরে
   মাঠের ওপারে গেল চলে।

এমন ঘুমের মতো তারা,
এমন অনন্য জগতের,
পাথর কি প্রজাপতি
   মরণেও পাব না তা টের।

মৃত মানুষ

সমস্ত শরীর তার জড়ানো রয়েছে ফিট যুদ্ধের শোভায়;
যেন কেউ ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরিমায়
তাহার প্রত্যঙ্গে আছে পরিপূর্ণ হয়ে;
সঞ্চারণ করিলেই উঠিবে সে জেগে।

নীল আকাশের নীচে অনন্ত জলের নদী—প্রণয়ের চেয়ে
   দায়িত্ব বিশিষ্টতর ছিল তার?

বিলোল বায়ুর চেয়ে ছিল ঢের কৃতী শৃঙ্খলার:
   বহু শতাব্দীর পরে মানুষের মতো স্বর পেয়ে?
এই সব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার।
   এখন গিয়েছে সব অস্ফুট বায়ুর মতো হয়ে।

সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন

   কোথায় সূর্যের যেন নব নব জন্ম ঘিরে
   মরণ উড়িতে আছে শ্বেত পারাবত;
   কোথাও নক্ষত্রহীন নিরাবিল রাত্রি নিয়ে
   জীবন কি বৈতরণী-তরীর নাবিক?
পারাবত, পারাবত, তোমার হৃদয়ে শুধু রক্তবর্ণ ক্ষুধা!
যেইখানে বর্ণহীন নিস্তব্ধতা, তরঙ্গের প্রাণে কোনো অঙ্কুরের সুধা
ক্ষরিবে না কোনো দিন—সব প্রীত ভ্রমণকে শান্তি দিয়ে
   চিত্ত যার শুদ্ধ অশ্রুহীনতায় সৎ,
আমাদের জীবনের নব নব সূর্যগুলো কপোতকে দান ক'রে
আমরাও স্থির মেরুনিশীথের নাবিকের মতন মহৎ
সততার দেখা পাব—সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন।

শান্তি

জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর:
কূট ব্যবসায়ী নীল পার্শ্বচরগুলো তার মৃত্যুর উৎসব?
   মানুষের তরে তবে কোন্ পথ:
কোন্ অন্তরীক্ষে তারে নিয়ে যাবে আসন্ন সময়?
সেইখানে বালুঘড়ি, বলো, তবে স্তব্ধতার মতো:
এক দিন বাতাসের সাথে ঢের ধ্বনিবিনিময়
করেছিল; তারপর হয়ে গেছে আঁখিহীন—চুপ।
প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে যে সবুজ বাতাসের আশা
এক দিন বলেছিল 'আবার করিব আমি অমৃত সঞ্চয়'—
শত শত মেষশাবকের আঁখিতারকাও পেল যেন ভয়।
শান্তি, শান্তি—
উত্তেজিত শপথের উৎসারণ প্লীহা ঘিরে থাকে না সতত,
বালুঘড়ি হয়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মতো।

হে হৃদয়

   হে হৃদয়, এক দিন ছিলে তুমি নদী;
পারাপারহীন এক মোহনায় তরণীর ভিজে কাঠ
   খুঁজিতেছে অন্ধকার স্তব্ধ মহোদধি।

তোমার নির্জন পাল থেকে যদি মরণের জন্ম হয়,
হে তরণী,
কোনো দূর পীত পৃথিবীর বুকে ফাল্গুনিক তবে
ঝরনার জল আজও ঢালুক নীরবে;
বিশীর্ণেরা আঁজলায় ভরে নিক সলিলের মুক্তা আর মণি;
অন্ধকার সাগরের মরণকে নিষ্ঠা দিয়ে—উষালোকে মাইক্রোফোনের মতো রবে।

আমি হাত প্রসারিত করে দেই

আমি হাত প্রসারিত করে দেই বায়ুর ভিতরে,
অনেক জীবাণু এসে রোমকূপে জমে—
এই এক আলোড়ন রয়ে গেছে পৃথিবীতে।
মানুষের অন্তরেও এরকম;
কোনো এক রমণীকে দেখে প্রীতি,
কোনো জননায়কের অবয়ব দেখে বিস্ময়;
কোনো এক বিষয়ীর জানুর উপরে হাত রেখে দিয়ে আশা।

এইসব অনুভব তবু আজ কীলক লিপির 'পরে ভোরের আলোয
অতীত রাত্রির পরিভাষা।
কেননা মানুষ—বায়ু, রোমকূপ, জীবাণুর মতো নয়!
ইহাদের সরলতা শিশুর মতন।
মানুষ অনেক দিন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে
ক্রমশই হয়ে যায় বিশদ অতল।

এইসব ইতিহাসপরম্পরা বুঝে
আমার হৃদয় থেকে বিচূর্ণ কাচের খণ্ড খুঁজে
বুঝে গেছি মরণ কী। অথবা জীবন কেন অধিক বিশদ নিয়ন্ত্রণ।

সকল রঙের শিখা এক সাথে মিলে গিয়ে হয়ে যায় শাদা।
একটি জমাট ঢিলে বহুতর বিরোধের বাধা
অনেক আবহ তার বুকের ভিতরে ধরে রেখে
মানুষ ও ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু নিমীল বাতাসে
লাঙুল ঘুরায়ে নিয়ে অগ্নির অক্ষরে ফেলে এঁকে।

১৩৩৬-৩৮ স্মরণে

অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন
এখানে গঠন করে যেতেছিল কয়েকটি স্থির সমীচীন
যুবা এসে; কোথাও বিদ্যুৎ নেই—তবুও আগুন যেন ধীরে
জ্বলেছিল এই হরীতকীকুঞ্জে মাঘের তিমিরে;
ভোর এল; ভারুই পাখির মতো কেউ তবু হয় নিকো আকাশে উড্ডীন।

উড়িবার কাজ সব আগন্তুক বৃহৎ চিলের তরে রেখে
অনেক আশ্চর্য শ্লোক খোঁজা হল ভারতীয় মনীষার থেকে;
যেন সব অমেয় সুদূর বৃক্ষে বাতাসের সংগীতের মতো:
আমাদের সচেতন তাড়নায় প্রাণ পেয়ে জেগেছে ফলত;
চোখ ক্লান্ত হয় তবু নখের ভিতরে হিম, নিরুত্তর দর্পণকে দেখে।

তবু সেই অপার্থিব সুর কেউ ভুলে যেতে পারে?
দুই কানে মোম ঢেলে শুনিতে চাই নি যাহা মধ্যসমুদ্রের অন্ধকারে
আমাদের কাছে ছিল সেদিন তা জাঞ্জিবার সমুদ্রের অই পারে—কাম;
তাহারে এড়াতে গিয়ে করেছি অদ্ভুত প্রাণায়াম;
যেমন প্রবীণ তার যৌবনের প্রেম ঢেকে রাখে চোখঠারে।

এখানে হলুদ ঘাসে—কাঁকরের রাস্তায়—নোনাধরা দেয়ালের ঘরে
হৃদয়ে গঞ্জনা এক জেগেছিল বৃশ্চিকের মতন কামড়ে
এ পৃথিবী পাক খায়—তবু কেউ কনুয়ের 'পরে রাখে ভব
যেন স্পষ্ট সৌরজগতের এক সুশৃঙ্খল কেন্দ্রের ভিতর
রয়েছে সে: অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সন্ধ্যার হাঁসের মতো ফিরে আসে ঘরে।

ঘরের হরিণ পাবে অনায়াসে চলে যেতে গৃহস্থের গোধূম মাড়িয়ে।
সেই পথ থেকে তবু সরে গিয়ে অন্য-এক অহংকার নিয়ে
কয়েকটি যুবা, নারী—সমাহৃত হয়ে গিয়ে ছুরির ফলায়
এখানে বাটের দিকে চেয়েছিল;—কার যেন স্থির মুষ্টি টের পাওয়া যায়:
যেন সব নাসপাতি পৃষ্ঠব্রণ হয় তার নিটোল ব্লেডের মুখে গিয়ে।

আজ জানি সমবায়ে উদয়ন, নাগার্জুন, পুষ্পসেনী ছাড়া
কী রয়েছে এই সব নাম ছাড়া?—সুনিপুণ ভাবনার ধারা
কে বুঝেছে সব নয়?—জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায়; তাই ভেঙে ধ্বসে গেল অমোঘ সমিতি;
অন্বীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া?

আকাশরেখার পারে তবুও যাহারা এই পথে এসে আবার দাঁড়াবে—
প্রকম্পিত কম্পাসের সূচীমুখ খানিক স্থিরতা যেন পাবে
তাদের ছোঁয়াচে এসে; যদিও পাথরগুলো হয়ে গেছে আবার প্রাচীন
নিওলিথ পৃথিবীর—এই সব ঘাস, হরীতকী, সূর্য মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড়ে পড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

এই ঘর অবিকল

এই ঘর অবিকল পারম্পর্য বুঝে লয়ে তবু
স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল সারাদিন আজ
তারপর রাত্রি এল হেমন্তের নিস্তব্ধতা নিয়ে
আমিও এলাম চলে—ধূলিধূসরিত কোনো মিউজিয়মের

দারোয়ান যখন লাগাবে তালা—ক্লিক শব্দ হয়
অথবা হবার আগে যখন পিছল তালা নড়ে ওঠে
শিশিরে উজ্জ্বল কোনো অমায়িক পাখির মতন
আমি আসি; আমারে আসিতে হয় রোজ
টালিগঞ্জ থেকে ট্রাম—অথবা ট্রামের
রাঙা-নীল-আলো-ঈপ্সা
   রাত এগারোটা এলে শহরের
নিরুত্তর—নিবিড়—বিদেশী মুখ
প'ড়ে পাওয়া পথগুলো—খড়ির স্বাক্ষরহীন
সুদীর্ঘ জানালা সব—(কোনো ক্রুশচিহ্নহীন)
নিরুদ্ধ দরজাগুলো—(অননুমেয়ের মতো)
অন্ধকার গলি—
   গ্যাসের স্বর্গীয় আলো—
(অননুভূতের মতো)—আমারে তোমার দিকে ডাকে।

প্রায়ই দেখা হয়—তবু—মনে হয়
বহু দিন মরেছিলে তুমি
এই দেশ থেকে দূরে—উত্তরপশ্চিম দিকে
যেইখানে জুতো আঁটা পায়ের মতন নেমে—ভূমধ্যসাগরে
কোনো এক দেশ ছিল হয়তো বা—
   আজও তার ল্যাম্পের কাছে
ভৌগোলিক বালকেরা অক্ষুণ্ন কৌতুকে চেয়ে
   টের পায় নিমীল আলোয়
মানচিত্র ভেসে গেছে বেগুনি রঙের এক সমুদ্রের রোদে
সেই দেশে—কোনো এক নিচু আকাশের খোপে
আরো ক্ষুদ্রতর স্রোতে অদ্ভুত অসুস্থ এক মিউনিসিপালিটির
জন্মেছিল কয়েকটি ধূসর দেয়াল—রাত্রি—দরিদ্রতা
প্যারাফিন আলো—রুক্ষ ভাজা মাছ—ছবি—ঘাস—তুমি
অন্ধকার তাকে ছিল আরক ও বৃশ্চিকের মৃতদেহে মেলানো শিশির
   সমধিক নীরবতা—
তবুও জানালা দিয়ে আকাশের তুস্থ কুকুরীকে
দেখা যেত ব্রহ্মহৃদয়—বলা যেত ওই বৃষ—ওই মৃগশিরা—
আর্দ্রা—অগ্নি—সরমা—রোহিণী—বাণরাজা—
শহরে মেয়রের চেয়ে কিছু বড়ো ওরা হয়তো বা
নড়ে যায় টি-পার্টিতে—কিংবা অন্য চিক্কণ চিপ্‌টিনে
ময়দানের সমুজ্জ্বল বিমুক্তিতে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ ক্লাবে
(মুখোমুখি পুরুষ-নারীর নীল নিট্ ক্লোজ-অপে)
এসে যেত হিম হাওয়া। অস্পষ্ট দৈত্যের মতো একা
তিন বার তিন ধনু দূর থেকে পাহাড়ের চূড়া
থেমে যেত—থেমেছে হঠাৎ যেন; বরাবরই থেমে রবে ব'লে।

আমরাও থেমে গেছি—ডালমুট খেতে গিয়ে

হিম পকেটের থেকে হঠাৎ কমলালেবু
আধেক তুলিতে গিয়ে—
আমি যে শিশুর পিতা—আরো ঢের দূরে
ছোটো হেতু হেঁয়ালির মধ্য-নরকের ফাঁকে— হেত্বাভাসে থাকি
অনেক বীজাণু ধুলো কৃকলাসদের মতো এসে বিছানার 'পরে
আগাগোড়া খেয়ে ফেলে তবু যেই শিশুর মায়ের
হৃদয়যন্ত্রকে ফেলে রেখে গেছে সময়ঘড়ির মুখে, ভুলে—
তাকে নিয়ে ঘর করি—
নির্জন শীতের রাতে দম্পতির বিছানায় তাই
অনুকম্পা পা গলিয়ে বলে যায়: 'খেলনার রঙিন দোকানে
সেলুলয়েডের মতো প্রেম হত; তবু—তোমাদের—
রুধিরে জন্তুরও লিপ্সা নেই—'

সেই সব জানো তুমি? সেদিনও জানিতে তুমি? তুমি
কী ক'বে জন্ম নিলে—কী করে জন্ম দেয় জীবনকে নারী
সেই সব প্রণালীর থেকে ঢের দূরে স'রে একা
তবুও রাত্রি এলে নেউলের শরীরের মতন ধূসব
বিছানা রাখিবে পেতে—আঞ্জিরশাখার মতো অন্ধকারে তুমি।
(আগাগোড়া নগরীর ভাঁড় আর মাতালের সংঘকে
মোলায়েম ক'রে দিতে ভাঁড়ারের পনীরের মতো।)
দুইজন যুবকের জন্যে শুধু। 'তুমি একজন?'
তাই মৃত্যু হল তার হাতে (সেই) তুষেব বঙেব মতো ম্লান
বিছানায়। গাটাপার্চা পুতুলের হে চিকুর জননী, তোমার—
তোমার সে বৃশ্চিক—দেয়াল—লেবু—মাছ—প্যারাফিন—
থুতনিতে হিম হাওয়া—বিকেলেব কুয়াশায়
অকস্মাৎ আগন্তুক জেঠিমার মতো সেই পাহাড়ের
শেষ হল।
(রোজই দেখা যায়—তবু মনে হয়
ঢেব দিন বিদেশের অন্ধকাবে ম'রে ছিলে তুমি।)

সমুদ্রের ওই পারে নদী আছে—নদীর ওপারে
বাটা মাছ ভাজে তারা জলপাই তেলে
সেই ঘ্রাণ নিয়ে রাত্রি যেখানে উঠেছে জেগে
চেয়ারম্যানের মুখ—দরিদ্রতা—গোল শহরের
ম্লান আলো—ধূসর দেয়াল—
ক্বাথ—কুজ্ঝটিকা—অন্ধকার ঘিরে
তবুও তুমিও ছিলে সেইখানে—মৃত্যু হ'ল সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তবু,
অপারগ ধাত্রীর হাতে। অথবা কী করে তাব মৃত্যু হল—
ধোঁয়াটে কাহিনী এক—আজ রাতে মনে নেই কিছু;
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কারু কিছু মনে নেই।

গতিবিধি

সর্বদাই প্রবেশের পথ রয়ে গেছে;
এবং প্রবেশ ক'রে পুনরায় বাহির হবার—
অরণ্যের অন্ধকার থেকে এক প্রান্তরের আলোকের পথে;
প্রান্তরের আলো থেকে পুনরায় রাত্রির আঁধারে;
অথবা গৃহের তৃপ্তি ছেড়ে দিয়ে নারী, ভাঁড়, মক্ষিকার বারে।

এই সব শরীরের বিচরণ!
ঘুমায়ে সে যেতে পারে।
(সেচেতন যাত্রার পথ তবু আরো প্রসারিত।
আলো অন্ধকার তার কাছে কিছু নয়।)
উটপাখি সারা দিন দিবারৌদ্রে ফিরে
বালির ভিতরে মাথা রেখে দিয়ে আপনার অন্ধ পরিচয়
হয়তো বা নিয়ে যায়,—হয়তো তা, পাখির বিনয়।

কোনো এক রমণীকে ভালোবেসে,
কোনো এক মড়কের দেশে গিয়ে জোর পেয়ে,
কোনো এক গ্রন্থ প'ড়ে প্রিয় সত্য পেয়ে গেছি ভেবে,
অথবা আরেক সত্য সকলকে দিতে গিয়ে অভিভূত হয়ে,
শরতের পরিষ্কার রাত পেয়ে সব চেয়ে পোশাকী, উজ্জ্বল—
অথবা সবের থেকে দূরতম নক্ষত্রকে অকৃত্রিম বুঝে
চিন্তা তবু বর্ষারাতে দ্বার থেকে দ্বারে
ভিজে কুকুরের মতো গাত্রদাহ ঝাড়ে।

সমাধির ঢের নীচে—নদীর নিকটে সব
    উঁচু উঁচু গাছের শিকড় গিয়ে নড়ে।
সেইখানে দার্শনিকদের দাঁত ক্বাথ পান করে
পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরামাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে—
জেনে নিয়ে আমরা প্রস্তুত করে নিই নিজেদের;
কেননা ভূমিকা ঢের রয়ে গেছে,
বোঝা যাবে (কিছুটা বিনয় যদি থেকে থাকে চোখে)—
সুশ্রী ময়ূরেরা কেন উটপাখি সৃষ্টি করেছিল
টানাপোড়েনের সুরে—সূর্যের সপ্তকে।

নির্দেশ

জীর্ণ শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে
তামাসা চালাতে আছে পুনরায় সময় একাকী।
তবুও সে ভোরবেলা হরিয়াল পাখি
ধূসর চিতলমাছে—নির্ঝরের ফাঁসে

খেলা ক'রে কাকে দিয়েছিল তবে ফাঁকি?
বসন্তবউরী দুটো এই ব'লে হা হা করে হাসে।

সেই হাসি জ্বলে ওঠে নির্ঝরের 'পরে;
গড়ায়ে গড়ায়ে গোল নুড়ি
উজ্জ্বল মাছের সাথে ভোরের নির্ঝরে
সময়ের মাকুটাকে করে দিল উড়ু খুড়ু খুড়ি।
বিরক্ত ":ময় তাই খুঁজে নিতে গেল কোনো বিষয়ান্তরে
নিজেব নিয়মাধীন হৃদয়ের জুড়ি।

আলো যদি নিভে যায় সময়ের ফুঁয়ে
তা হলে কাহার ক্ষতি—তা হলে কাহার ক্ষতি হবে।
এই কথা ভেবে যায় কালো পাথরের 'পরে নুয়ে
মৈত্রেয়ী—নাগার্জুন—কৌটিল্য নীরবে।
তিন হয়, চার হয়, পাঁচ হয় তবুও তো দুয়ে আর দুয়ে।
হেঁয়ালি ও নিরসন নির্ঝরের নিক্বণের মতো বেঁচে রবে।

প্যারাডিম

সময়ের সুতো নিয়ে কেটে গেছে ঢের দিন
এক-আধবার শুধু নিশিত ক্ষমতা
এসেছিল, তারপর নিভে—মিশে গেছে;
হৃদয কাটাল কাল।
বালুঘড়ি বলে গেল : সময় রয়েছে ঢেব।
সেই সুর দূর এক আশ্চর্য কক্ষের
চোখের ভিতরে গিয়ে স্বর্ণ দীনারের
অমোঘ বৃত্তের মতো রূপ নিয়ে নড়ে।

বালুঘড়ি বলে যায় : সময় রয়েছে ঢের,
সময় রয়েছে ঢের ইহাদের—উহাদের;
সমুদ্রের বালি আর আকাশের তারার ভিতরে
চলেছে গাধার পিঠে—সিংহ, মেষ, বিদূষক,
মূর্খ আর রূপসীর বিবাহে ঘটক,
ক্রীতদাস কাফরিরা তেল বয়ে আনে।
সময রয়েছে ঢের—সময রয়েছে ঢের—
সরবরাহের সব অগণন গণিকারা জানে।

চারিদিকে মৃগয়ার কলরব—সময়ের বীজ।
অনেক শিকারী আজ নেমেছে আলোকে।
আমিও সূর্যের তেজ দেখে গেছি বহুক্ষণ
ভারুই পাখির মতো চোখে;
ঘুরুনো আলোয় ঘুরে সংস্কারে; উড়িবার হেতু

যদিও নেইকো কিছু ক্ষিতিজ রেখার পথে আর।
বহু আগে রণ ক'রে গিয়েছিল বুদ্ধ আর মার;
অগ্নির অক্ষরে তবু গঠিত হতেছে আজও সেতু।
ব্রহ্মার ডিমের সাথে একসাথে জন্মেছিল যারা ভালোবেসে
সেই স্বর্গ-নরককে আবার ক্ষালন ক'রে—প্রামাণিক দেশে
তারাই তো রেখে দেবে,—
মাঝখানে যদিও রয়েছে আজ বিরক্ত সাগর,
বিশ্বাসীরা চোখ বুজে ব'য়ে নেয় মুণ্ড আর কঙ্কালের কেতু।

সম্রাটের সৈনিকেরা পথে পথে চ'রে
খুঁজে ফেরে কোনো এক শুভলাঞ্ছন;
সফেন কাজের ঢেউয়ে মৃত্যু আছে—জানে;
তারও আগে রয়ে গেছে জীবন-মৃত্যুর অমিলন;
যেন কোনো নরকের কর্নিশের থেকে ধীরে উঠে
কোনো এক নিম্নতর আঁধারের বিজৃম্ভিত কাক
আবার সাজাতে পারে দু মুহূর্ত ময়ূরের মতন পোশাক,—
সৈকতে বালির কণা নক্ষত্রের রোলে যদি একসাথে জুটে
আবছায়া, অগ্নিভয়, অন্ধকার—সময়ের হাতে ঠেলে ফেলে
অনাবিল অন্তঃসার নিতে দেয় খুঁটে।

সৈনিকের সম্রাটেরা স্থিরতর—তবু;
চারিদিকে মাতালের সাবলীল কাজ শেষ হ'লে
প্রতিধ্বনিও আর থাকে নাকো যখন আকাশে
জলের উপরে হেঁটে মায়াবীর মতো যায় চ'লে।
(গভীর সৌকর্য দেখে মানবীয় আত্মা জাগে জন্তুদের ভিড়ে;)
অবিস্মরণীয় সব ইতিহাসপর্যায়ের দিকে
চেয়ে দেখে সর্বদাই পৃথিবীর প্রবীণ জ্ঞানীকে
ডেকে আনে তারা নিত্য নতুন তিমিরে;
'নিপুণ ছেলের হাতে লাটিমেব মতো ঘোরে' দ্বৈপায়ন বলে
ঘুরায়ে নিবিড় সেই প্যারাডিমটিরে।

'যখন চিনির দাম বেড়ে গেছে ভয়ঙ্কর
তারা খায় স্বেচ্ছায় নুনের পরিজ।
সমস্ত ভণ্ডুল হয়ে গেলে সব পৃথিবীর,
মসৃণ টেবিলে বসে খেলে যায় ব্রিজ।
জীবনকে স্বাভাবিক নিশ্বাসের মতো মেনে নিয়ে
মঞ্চে বক্তৃতা দেয় কর গুনে—কুকুর ক্ষেপিয়ে।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

'সমস্ত সভার মাঝে তারপর
দম আর থাকে নাকো কোনো কুকুরের;

একটি মাছিও আর বসে নাকো বক্তার নাকে
একটি মশাও তাকে পায় নাকো টের;
এবং পায়ের নীচে পৃথিবীরও মাটি আর নেই
তবু সবই পাওয়া যাবে চালানির মাল ছাড়লেই।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

'আমরা সকলে জানি বাণরাজা নক্ষত্রের থেকে
সে জাহাজ এসে গেছে মৃগশিরা তারকার দিকে;
হয়তো সরমা তাকে তুলে ধ'রে সারমেযদের
নিকটে পাঠায়ে দেবে নির্জন তারিখে।
সম্প্রতি রুটিন তবে শেষ ক'রে—ঘুমাবার পরে
আবার সে দেখা দেবে আমাদের স্বাভাবিক সুবিধার তরে।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

রাত্রি

অইখানে কিছু আগে—বিরাট প্রাসাদে—এক কোণে
জ্বলে যেতেছিল ধীরে এক্সটেন্‌শণ্ লেক্‌চারেব আলো।
এখন দেয়ালে রাত—তেমন ততটা কিছু নয়;
পথে পথে গ্যাসলাইটে রয়েছে ঝাঁঝালো
এখনও সূর্যের তেজ উপসংহারের মতো জেগে।
এখনও টঙ্গে চ'ড়ে উপরের শেলফের থেকে
বই কি বিবর্ণ কীট—ধুলো—মাকড়শা বার হবে
দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান চুপে ভেবে দেখে।
এখনও নামে নি সেই নির্জন রিক্‌শাগুলো—নিয়ন্তার মতো,
সমূহ ভিড়ের চাপে রয়েছে হারায়ে।
অজস্র গলিব পথে একটি মানুষ
যুগপৎ রয়েছে দাঁড়ায়ে;
পৃথিবীর সকলের হৃদয়ের প্রতীকের মতো:
এই রাত থেকে আরো অধিক গভীরতর রাতে
কলুটোলা—পাথুরিয়াঘাটা—মির্জাপুরে
এস্‌প্লানেডের ফুটপাতে
মালাঙ্গা লেনের পথে—ক্রিক রো-তে
কক্‌বার্ন লেনের ভিতর
একজোড়া শিঙ যদি দেখা দেয় লোকটার টাকে—
পরচুলা চুরি করে নিয়ে গেছে তবে জাদুকর।
এখানে রাত্রির পারে তোমার নিকট থেকে আমি
চলে গেলে
চলে যাব;

পৃথিবীর কাছ থেকে নয়;
রাত্রি এই সারা রাত জীবনের সকল বিষয়
হয়ে আছে।
তিত্তিরাজ গাছ থেকে শিশির নীরবে
ঝরে যায়;
ডানার আঘাত যায় কাকদম্পতির:
হলুদ খড়ের 'পরে ঝরে পড়ে আবার শিশির
হাওয়ার শুঁড়ির মতো।
কোথায় হারায়ে তুমি গিয়েছ কখন।
মাথার উপরে সব নক্ষত্রেরা ছুরির মতন বিচক্ষণ
সময়ের সুতো কেটে—অবিরাম সময়ের সুতো কেটে ফেলে;
আমার চোখের 'পরে রাত্রির প্রাঞ্জলতা ঢেলে;
কোথাও বাতাবী উষ্ণ হয়ে ওঠে—ঘুরে যায় মাকড়সা পোকার লাটিম;
ভাঁড় হাসে—সম্রাজ্ঞীর অবয়ব হয়ে থাকে হিম;
নদীরা শিশুর মতো— শিশুরা নদীর মতো দূর;
স্বর্গের কিনারে গিয়ে ভিড় আর ভিখিরির নীল আলো করে টিমটিম।
শিশুর কপাল থেকে বেজে ওঠে নরকের বিচিত্র ডিণ্ডিম।

রবীন্দ্রনাথ

অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোনো এক বলয়িত পথে
মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা
দেখেছি রাত্রির রঙে বিভাসিত হয়ে থেকে আপনার প্রাণের প্রতিভা
বিচ্ছুরিত করে দেয় সংগীতের মতো কণ্ঠস্বরে।
হৃদয়ে নিমীল-হয়ে অনুধ্যান করে
ময়দানবের দ্বীপ ভেঙে ফেলে স্বভাবসূর্যের গরিমাকে।
চিন্তার তরঙ্গ তুলে যখন তাহাকে
ডেকে যায় আমাদের রাত্রির উপরে—
পঙ্কিল ইঙ্গিত এক ভেসে ওঠে নেপথ্যের অন্ধারে: আধো ভূত আধেক মানব
আধেক শরীর—তবু অধিক গভীরতরভাবে এক শব।

নিজের কেন্দ্রিক গুণে সঞ্চারিত হয়ে উঠে আপনার নিরালোকে ঘোরে
আচ্ছন্ন কুহক, ছায়া, কুবাতাস—আধো চিনে আপনার জাদু চিনে নিতে
ফুরাতেছে—দাঁড়াতেছে—তুমি তাকে স্থির প্রেমিকের মতো অবয়ব দিতে
সেই ক্লীব বিভূতিকে ডেকে গেলে নিরাময় অদিতির ক্রোড়ে।
অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেলে কালের দু ফুট মরুভূমি।
অবহিত আগুনের থেকে উঠে যখন দেখেছ সিংহ, মেষ, কন্যা, মীন
ববিনে জড়ানো মমি—মমি দিয়ে জড়ানো ববিন—
প্রকৃতির পরিবেদনার চেয়ে বেশি প্রামাণিক তুমি
সামান্য পাখি ও পাতা ফুল
মর্মরিত করে হলে ভয়াবহভাবে সৎ অর্থসংকুল।

যে সব বিস্রস্ত অগ্নি লেলিহান হয়ে ওঠে উনুনের অতলের থেকে
নরকের আগুনের দেয়ালকে গড়ে,
তারাও মহৎ হয়ে অবশেষে শতাব্দীর মনের ভিতরে
দেয়ালে অঙ্গার, রক্ত, একুয়ামেরিন আলো এঁকে
নিজেদের সংগঠিত প্রাচীরকে ধূলিসাৎ ক'রে
আধেক শবের মতো স্থির;
তবুও শবের চেয়ে বিশেষ অধীর:
প্রসারিত হতে চায় ব্রহ্মাণ্ডের ভোরে;
সেই সব মোটা আশা, ফিকে রঙ, ইতর ফানুস,
ক্লীবকৈবল্যের দিকে যুগে যুগে যাদের পাঠাল দরায়ুস।
সে সবের বুক থেকে নিরুত্তেজ শব্দ নেমে গিয়ে
প্রশ্ন করে যেতেছিল সে সময়ে নাবিকের কাছে:
সিন্ধু ভেঙে কত দূর নরকের সিঁড়ি নেমে আছে?
তত দূর সোপানের মতো তুমি পাতালের প্রতিভা সেঁধিয়ে
অবারিতভাবে শাদা পাখির মতন সেই ঘুরুনো আধারে
নিজে প্রমাণিত হয়ে অনুভব করেছিলে শোচনার সীমা
মানুষের আমিষের ভীষণ ম্লানিমা,
বৃহস্পতি ব্যাস শুক্র হোমরের হায়রান হাড়ে
বিমুক্ত হয় না তবু—কী করে বিমুক্ত তবু হয়:
ভেবে তারা শুক্ল অস্থি হল অফুরন্ত সূর্যময়।

অতএব আমি আর হৃদয়ের জনপরিজন সবে মিলে
শোকাবহ জাহাজেব কানকাটা টিকিটের প্রেসে
রক্তাভ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অভিজ্ঞের দেশে
প্রবেশ করেছি তার ভূখণ্ডের তিসি ধানে তিলে।
এখানে উজ্জ্বল মাছে ভরে আছে নদী ও সাগর:
নীরক্ত মানুষদের উদ্‌রোধিত করে সব অপরূপ পাখি;
কেউ কাকে দূরে ফেলে রয় না একাকী।
যে সব কৌটিল্য, কূট, নাগার্জুন কোথাও পায় নি সদুত্তর—
এইখানে সেই সব কৃতদার, ম্লান দার্শনিক
ব্রহ্মাণ্ডের গোল কারুকার্য আজ রুপালি, সোনালি মোজায়িক।

একবার মানুষের শরীরের ফাঁস থেকে বার হয়ে তুমি:
(সে শরীর ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরীয়ান)
যে-কোনো বস্তুর থেকে পেতেছে সম্মিত সম্মান:
যে-কোনো সোনার বর্ণ সিংহদম্পতির মরুভূমি,
অথবা ভারতী শিল্পী এক দিন যেই নিরাময়
গরুড় পাখির মূর্তি গড়েছিল হাতির ধূসরতর দাঁতে,
অথবা যে মহীয়সী মহিলারা তাকাতে তাকাতে
নীলিমার গরিমার থেকে এক গুরুতর ভয়
ভেঙে ফেলে দীর্ঘ ছন্দে ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে—
কবিতার গাঢ় এনামেল আজ সেই সব জ্যোতির ভিতরে॥

গরিমা

সহসা ঝড়ের দিনে লুণ্ঠনের ঊর্ধ্বে উঠে চিল
আমারই এ হৃদয়ের মতো
হয়তো বা নীলিমাকে চায়।
তবুও দৈত্যের কাছে প্রেমিকেরা হবে পরাহত;
পরিহাস করে যায় বিরক্ত নিখিল?

কখন সে পড়ে গেছে আমাদের পায়ের নিকটে
সোনালি, প্রবীণ এক পাখি;
জীবনকে আকৃতির মতো বড়ো মনে করেছিল;
তবু আজ আকাশের মতো আরো বৃহৎ—একাকী
মৃত; মৃত্যু— প্রিয় আজ আমি তার হাতে আঁকা পটে।

চারি দিকে অবিকল বিকেলের রাঙা সূর্য জ্বলে;
নদীর জলের সুর সন্তর্পণে কান পেতে প্রবাহিত হয়;
আমার হৃদয়ে যেই সুশৃঙ্খলা হয় না গ্রথিত
আকাশ বাতাস নদী তাই নিয়ে তবুও তন্ময়॥
এই সব অভিজ্ঞান রয়ে যাবে দু-একটি গরিমার মতো।
অথবা গরিমালোক এই শতাব্দীর হাওয়া এক গাল
পান করে শেষ হয়ে গেলে
ফাট্‌কাবাজার সব—সেখানে সেয়ানে এসে মেলে।

আবছায়া

ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ
বিকেল বেলায়ও আজ একটি কঠিন
বিষণ্ণতা লেগে আছে পৃথিবীর বুকে।
একটি কৃষাণ এসে দুয়ে দুয়ে যোগ ক'রে তিন
লিখে যায় সারা দিন মাঠের ভিতরে।
কোথাও ফলন নেই তার।
ঠাণ্ডা কঙ্কালের কাছে সারা রাত গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকে;
কিছুই করে না অস্বীকার।

২

নির্মল জলের ঢেউয়ে নদী চলে যায়।
জল ছাড়া কিছু নেই তার।
কখন সকালবেলা বিকেল হয়েছে
আমাদের চেনা শতাব্দীও চলে গেছে।
চলেছে সে জলপাযরার নীড় খুঁজে।
নদীর কিনারে

বাদামি মাটির 'পরে ঝরে পড়ে পাতা।
এই সব শাদা সাধারণ বিশ্বস্ততা।

আমারও আঙুলে প'ড়ে থেমে থাকে—যত দিন আছে—
একটি হলুদ পাতা। নিকটের গাছে
কোথাও কোকিল হিম শূন্যতার পানে গান গায়,
পাখিটির ভয়াবহ একাগ্রতার তুলনায়

কেবলই সময়ান্তর এসে পড়ে সভ্য পৃথিবীতে:
বারবার অপরাহ্নের মৃত্যু হয়।
জানে না কী বস্তু নিয়ে তৃপ্ত হতে হবে
পুরাতন খসড়ায়— অথবা বিপ্লবে।

কুহুলিন

এইখানে অন্ধকার রচনা করেছে তার সপ্রতিভ মুখের পৃথিবী।
এইখানে শীতের বাতাস
মৃদু উষ্ণতার সাথে মিশে কামিনী ফুলের মতো যেন বারো মাস।
মৃত নারীদের সব সমাধিতে—কিছুই লুণ্ঠিত হবে নাকো আর—এমন আভাস।
এখানে শিশির ঝরে দূরবীন-অগোচর কুহুলিন নক্ষত্রের থেকে।
কোথাও নেইকো কোনো পাখি।
মিরুনি নদীর জলে বৃহস্পতি, মঙ্গল, মৃগশিরা ভেসে গেলে বাকি
ইতস্তত তারাগুলো চেয়ে থাকে মৃতদার সারসের মতন একাকী।

সহসা নদীর জলে সূচীমুখ নড়ে ওঠে বলে মনে হয়;
চেয়ে দেখি নির্জন হাত
আমার চোখের চাওয়া তারকায় না জেগে হয়েছে ধূলিসাৎ :
মেধাবীর ভূযোদর্শনের মতো বাসভের নিকটে হঠাৎ।

এখানে শিশির ঝরে সময়বিন্দুর মতো কুহুলিন নক্ষত্রের থেকে।
এদেশ মালয়, বালি, শ্যাম, ইন্দোচীন
সমুত্তীর্ণ হয়ে তবু স্বর্গ-নরকের চোখে চিরকাল সমভাবে বিবেচনাধীন;
লঘুগুরু কুয়াশার আবরণ থেকে চেয়ে দেখেছে অনপনেয় কুহুলিন।

ঘাস

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেল দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল করে নিতে গেল নিজের সঞ্চারে।
উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ

করে নিতে গেল —তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে ধীরে ডেকে নিয়ে গেল তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়।
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীন দুয়ার
খুলে দিতে গেল দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেল ঘাসের মতন তার হাড়।
সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীকে ঘাস
ছ-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয় মাস।

সমিতিতে

ঐখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক।
উঠেছে বক্তা এক—ষড়যন্ত্রহীনভাবে—দেখে
দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক
সহসা দেখেছে কেউ—যদিও অনেকে
আশীর্বাদ করে ওর সূত্র উষ্ণ হোক;
আরো অবারিত সুর বার হোক মাইক্রোফোন থেকে।

আরো বিস্তারিত সুর বার হোক—বার হয় যদি।
কেননা যুগের গালে কালি আর চুন।
আমাদের জলের গেলাস তবু হতে পারে নদী;
গোলকধাঁধার পথ—আকাশে বেলুন।
তা হলে বলুন এই শতাব্দীর সমাপ্তি অবধি—
কী করে একটি চোর সাতজন প্রেমিককে করেছিল খুন।

রবীন্দ্রনাথ

দেয়ালচিত্রের শীর্ষে পৃথিবীর কোনো এক আশ্চর্য প্রাসাদে
একটি গভীর ছবি মানুষ দেখেছে চিরকাল।
কেউ তাকে সূর্য বলে মনে করেছিল;
কেউ তাকে ভেবেছিল গরুড়ের উড্ডীন কপাল :
যখন সে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে
উদয় ও অস্তকে এক করে দিতে ভালোবাসে;
শাদা রাজবিহঙ্গের প্রতিভায় বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে যায়,
হয়তো বা আমাদের মর্ত্যপৃথিবীতে ফিরে আসে।
তাকাতে তাকাতে সেই প্রসাদের মাধবী দেয়াল
আমাদের ইহলোক বলে মনে হয়—তবু সৃষ্টির অনন্ত পরকাল।

তোমার বিভূতি, বাক্-বেদনার থেকে উঠে নীলিমাসংগীতী
আমাদের গরিমার বিকীরণে ডুবে, গড়ে গেছে সব মানুষের প্রাণ
কী করে কল্যাণকৃৎ অর্থের তরঙ্গে জেগে (মোম নিভে গেলে)
স্বাতী, শুক্রতারকার মতন ধীমান

মহা অবয়বদের থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে আভা দিতে পারে:
শেয়াল শকুন শনি বানরের সমাজ ও রাষ্ট্রের 'পরে;
সৃজনের আদি অন্তিমের রাঙা আগুনের মতো গোলাকার
ব্যাপ্ত এক সংগীতের বৃত্তের ভিতরে
পেয়ে যেতে পারে তার তিসি তিলে বিম্বিত ব্রহ্মাণ্ডের মানে;
সে সুর নিমীল হয়ে, লেলিহান হয়ে, নিমীলিত হতে জানে,

মহান, তোমার গানে; এই সব বলয়িত ক'রে চিরদিন—
অথবা যখন তুমি আমাদের দেশে সৃষ্টি শেষ করে ফেলে
প্রকৃতির আগুনের উৎস থেকে উঠে এক দিন
নিঃস্বার্থ আগুনে ফিরে গেলে,
পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওরিজেন, হোমরের মতো
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি একটি পৃথিবী ভাঙা-গড়া শেষ করে দিয়ে, কবি,
দানবীয় চিত্রদের অন্তরালে আপনার ভাস্বরতা নিয়ে;
নিকটে দাঁড়ায়ে আছে নিবিড় দানবী।
অথবা ছবির মতো মনে হয় আমার অন্নপানদোষে ম্লান চোখে :
অল্প আলোকের থেকে পুরাণ পুরুষ সব
চলে যায় অনুমেয়, অজ্ঞেয় আলোকে।

কোরাস

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনও দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

হে চিল, চিলের গান জ্যৈষ্ঠের দুপুরে,
হে মাছি, মাছির গান,
সমুদ্রের পারে এক শব্দহীন মূর্তির বিরাম;
আর সব শাদা পাখি সূর্যের সন্তান।
জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

আলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে যাবার কৌশল
কেবলই আয়ত্ত করে নিতে চায় পৃথিবীর উৎকণ্ঠিত ভিড়।
সৈকতে পাখিদের বরফের মতো শাদা ডানা
সূর্যের পাকস্থলীর।

জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

কেবলই পায়ের নীচে বালির ভিতরে
উঠে আসে পারাপার-প্রত্যাখ্যাত হাড়;
কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত, অব্যক্ত হাত—
তাদের দেখায় কিমাকার।

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনও দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার জুড়িকে চেখেছে ঘানিগাছে।

রবীন্দ্রনাথ

আজ এই পৃথিবীতে অনেকেই কথা ভাবে।
তবুও অনেক বেশি লোক আজ শতাব্দী-সন্ধির অসময়ে
পাপী ও তাপীর শববহনের কাজে উচাটন
হয়ে অমৃত হবে সাগরের বালি, পাতালের কালি ক্ষয়ে?

কোথাও প্রান্তরে পথে ফুল পাখি ঘাসের ভিতরে
সময় নিজেকে ফাঁকি না দিয়ে হয়তো নিখিল চালাতেছে;
আড়াই চালের মতো রক্তের চঞ্চল তাল
সেখানে দু-এক মোড় খুলে, স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

নিমিষে আহ্নিকগতি উতরোল হয়ে উঠে ম্যামথের পরে— মানুষের।
কবি ও নিকট লোকের মতো, বড়ো এক প্রিয়—
অন্ধ মরুতে কবে ফা হিয়ান সূর্যের সোনা দেখেছিল—
বিশদ প্রসঙ্গে আজ ততোধিকভাবে স্মরণীয়।

বাতাসের শব্দ এসে

বাতাসের শব্দ এসে কিছুক্ষণ হরিতকী গাছের শাখায়
মিথিরিত হয়ে থেমে যায়, তার মৃত্যু হল বলে।
এক পা দুই পা করে দুই-চার মাইল
প্রান্তরের সাথে আরো পরিচিত হলে
এমনি প্রান্তর থাকে রৌদ্রময়, শব্দবিহীন,

যতক্ষণ অপরাহ্ন বুকের উপরে পড়ে থাকে
তার; শালিখ পাখিকে আমি নাম ধরে ডাকি;
ছায়া বা অনলোজ্জ্বল পাখিনীকে ডাকে
তবুও সে; মানুষের অন্তঃসার অবহেলা করে
   বিহঙ্গের নিয়মে নির্জন।
উনিশশো চল্লিশের কত গ্রাম, নগর গিয়েছে;
   সে সবের জনসাধারণ
উনিশশো বেয়াল্লিশ খৃষ্টাব্দের অপরাহ্ণে নেই।
উনিশশো অনন্তের ভূখণ্ডে, আকাশ
মাঝে মাঝে অনুভব করে নিতে চাই;
শান্তি নেই; নীললোহিতের প্রতি শেষ অবিশ্বাস
আছে কি না আছে ভেবে চেয়ে দেখি: পাখি, রৌদ্র, ঘাস।

অনুভব

আমরা আশ্চর্য পথে যাব না কি আর?
কোথাও দেখার মতো রয়ে গেছে কিছু।
আত্রেয়ীর থেকে বঙ্গসাগরের সীমানা বিপুল;
ভোরবেলা পশ্চিমের থেকে যাত্রা ক'রে
সায়াহ্নের বাংলার বদ্বীপের মতো উপকূল;
লবণসমুদ্র তাকে যেমন উজ্জ্বল করে—সূর্য যা সব
রৌদ্র দিয়ে সৃষ্টি করে—
তা ছাড়া নীরব।

বাংলার মাঠের শিয়রে বড়ো চাঁদ
ধীরে এসে থেমে দাঁড়াতেই—
প্রকৃতি নিজের মনে যা দেয় তা ছাড়া
কোথাও বাড়ন্ত জ্যোৎস্না নেই।
মৃতদার হয়ে গেলে তবু তার ছায়ার মতন
এই সব এইখানে মানুষের মন
অধিকার করে থাকে।

এই দেশ সূর্যের, সাগরের আলো থেকে সেঁচা;
তাম্রকায় মানুষের কাছে কিনে বেচা সব—মূল্যহীন ভাঁড়ারের পেঁচা
না জেনে জ্যোৎস্নায় ওড়ে কী রকম বিভ্রান্তির মতো
আজ কিছু শান্তি নয়—সুখ নয়,
ব্যথা নয়—তবে
ভেদাভেদ লোপ করে দিতে গিয়ে অন্তহীন বিভেদ জেগেছে,
ফুরাতেছে—এরকম শ্রেণীস্বার্থহীন অনুভবে।

আলোসাগরের গান

মানুষের ঘনবসতির ঢেউ নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে
ছড়ায়ে রয়েছে প্রাচী, অবাচীর, উদীচীর দিকে।
তাদের ওপারে সূর্য উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে
আজ এই বিকেলের আলোর নিরিখে

চুপে চুপে ডুবে যায়।—উত্তরার ভ্রূণ নষ্ট হলে,
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কোনো এক দিন—
লেনিনের লুপ্তি হলে—এরকম ডুবে যেতেছিল।
বাংলার সাগরের আলাপ উড্ডীন

কয়েকটি হরিয়াল পথ খুঁজে পশ্চিমের পানে
কমলালেবুর মতো রঙীয়ান মেঘে
ডুবে গেলে মানুষের আজকের চিন্তার উদ্যম
'অল ক্লিয়ারে'র মতো অস্পষ্ট আবেগে

তিমির রাত্রির ক্রেংকার।
বাংলার হরিয়াল! পশ্চিমের জাফরান মেঘ!
আমরা মানুষ—আজও—জীবিত ও মৃত—সাগরের,
আলোয় ভুলেছি ডোডো পাখিদের বিলীন বিবেক।

দোয়েল

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে
ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে।
লাঙল ও বলদের একগাল স্থির ছায়া খেয়ে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।

নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয়।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে।
লাশকাটা ঘরের ছাদের 'পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে

শিস তুলে বিভোর হয়েছে।
কার লাশ? কেটেছিল কারা?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন?
সে সব কোরাসে একতারা।

অপরাহ্নের চাষা ভুল বুঝে হেঁটে যায় উচ্ছলিত রোদে।
নেই, তবু প্রতিভাত হয়ে ওঠে নারী।
মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিসে মিটে গেলে
আদিম দোয়েল এলে—অনুভব করে নিতে পারি।

পৃথিবীলোক

দূরে কাছে কেবলই নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রামপতনের শব্দ হয়;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।

এ সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান

আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার।
আমাদের অন্ধকার আলো
এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।
এমন অনেক দিন কেটেছে এমনভাবে— তবে
আবার অনেক দিন তবুও কাটাতে চাই এরকমই।
হেমন্তে আশ্চর্য শাঁস ফলে গেছে কালো জলে, পানিফলে, জাউযের ভিতরে
অথবা ফলে নি কিছু;
ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্রবৌকে দেখে বকে;
চোখ মেলে, চোখ বুজে দেখেছি অনেকবার সে রকম রুগ্ন দুর্ভিক্ষকে;
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে অবশেষে ঘরে
চলে গেছি;—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু;—
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়
বিচ্ছেদ, মরণ, ভয় কলের চাকার মতো তেমনি ঘুরাবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে;
তেমনি নীরবে;
শাসাসিদেভাবে।
আমরা জলুস, জোর, কুকুর বা সিংহের সুরে
বাধা পাই;
পেঁচা যে খড়ের চালে নেমে আসে পৌষের রাত্রির দুপুরে
সেই সুরে শান্তি আছে—শেষ আছে—মৃত্যু আছে জানি,
তবু সেই সুর ভালো।
উনিশতিরিশ থেকে উনিশচল্লিশ সাল তবু ভালো ছিল;

আজ একচল্লিশে পৌষ মাসে কেমন অসাধ যেন।
মশা মেরে, ধান ভেনে, ইঁদুর তাড়িয়ে
মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে—ঋণ খেয়ে—ঋণ ভুলে গিয়ে,
হাতুড়ের কাছে গিয়ে শিশিরের মতো শাদা শিশি—
যা সবের কাছে যা নেবার আছে—নিয়ে যাব;
যা সবের কাছে যা দেবার আছে দিয়ে যাব;
ক্রমাগত পায়ে হেঁটে আমাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে পৃথিবী হাঁটাব।
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হক্তেল ঘুঘুদের ঘরে
অথবা ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে—
সেইখানে অসংসর্গ অনুভব ক'রে যাব;—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু।
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়—
বিচ্ছেদ মরণ ভয় কলের চাকার মতো তেমন ঘুরাবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে।

২

এখানে বিশেষ কিছু হয় নি অনেক দিন।
ক্রমাগত মানুষের মরণ হয়েছে।
গরিব, বেচারা, বুড়ো, বিকলাঙ্গ, মহৎ পার্ষদ সব
কী ক'রে কেবলই খ'সে ধুলোসাৎ হয়ে যায়
দেখেছি উদাস, ক্লান্ত—অন্তরঙ্গভাবে;
দেখে দেখে ঘুরে ফিরে অন্ধকারে বিকল হতাম,—
যদি না রাত্রির শেষে ভোর, সূর্য, সময়ের পরিস্রুত হাত
মুছে ফেলে দিয়ে যেত সব।
এইসব ছাড়া
এখানে বিশেষ কিছু হয় নি অনেক দিন।
সমুদ্রের বুদ্‌বুদের মতো অগণন সমুচ্ছ্বাস
তেমনি প্রবল কিছু চেয়ে গেছে—পেয়ে গেছে?—রাতে
ফিরেছে বিবিক্তভাবে সুভ মিত রমণীর সমাজ জুড়াতে;
ফেরে নি কি?
আমরাও ঘুরে গেছি; আমাদের হৃদয়ের রুচি
আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে
ঘাইহরিণীর মতো যে রকম সৃষ্টির জ্যোৎস্নায়
যেমন সহিষ্ণুভাবে ডেকে গেছে,
যেমন নিবিড়ভাবে ডাকে—
সেই সুরে সাড়া দিয়ে।
কখনও নদীর জলে অদলবদল করে ভেসে গেছে মেঘ, রাজহাঁস;
পুনরপি মেঘগুলো—জলগুলো—আশ্বিনের মাস;
ডুবে গিয়েছিল সব,—নেই ব'লে মনে হয়েছিল:
সুরের ছোঁয়াচে সুর যে রকম হয়ে যেতে চায়
অর্থহীনভাবে অনুপ্রাস।
কখনও ধানের ক্ষেতে ধান নেই।
কখনও ধানের ক্ষেতে কৃষাণের হাসি কোলাহল;

গোলায় গোলায় গঞ্জে ইঁদুরের বৌকাঁটকীর মতো কলরব;
বন্দর বেতার তার টের পায় সব।
কখনও পাটের ক্ষেত লক্‌লক্ করে ওঠে বাসুকির মতো;
আলকেউটেরা সব কৃষককে কাটে ইতস্তত;
কখনও পাটের জমি চিত্রগুপ্ত বুঝে নিয়ে গেছে;
একটি মূলেও কোনো ভুল নেই, আহা।
তবুও চড়কপূজা, ভাদুপূজা—কত না গাজন গান এল গেল;
কত চাঁদ বড়ো হয়ে চালার পিছনে রাতে তারপর ছোটো হয়ে এল;
গৃহস্থ, কৃষাণ মিলে ধোঁয়াটে জলের শ্যাম পানফল—
            পোষলার পিঠে আর মিঠে তাড়ি খেল।
এ সব উৎসব তবু মৃত ইতিহাস;
এ সব উৎসব কিছু নয়।
সর্বদা উৎকণ্ঠা এক জেগে আছে সকল ঘনায়মান পার্বণের মাঝে,
মৃত্যুর উদ্‌বেগ ছেপে—আরো বেশি কূট;
যে যার নিজের স্থানে উঠে চ'লে ব'সে
কেবলই জীবন যৌন, নিরাশা, রিরংসা, অর্থ, দশ কথা ভেবে
তবুও একটি কথা ভাবে তারপর
নিজের মনের মুদ্রাদোষে।
প্রৌঢ়েরা এখন আরো বুড়ো,
যুবকেরা প্রৌঢ় হয়ে গেছে,
বালকেরা এখন যুবক;
নারীর দেশের থেকে ঢের নারী হারায়ে যেতেছে:
সকলই ভৃত্যের দেশ।
এই সব স্বাভাবিক—সাধারণ কথা;
এখন মানুষ তবু স্বাভাবিকভাবে কথা ভেবে নিতে গিয়ে
কোথায় পেয়েছে সফলতা?
আজ এই চতুঃসীমানার মুখে আমাদের প্রাণে যদি আত্মপ্রত্যয় থেকে থাকে
ঘাইহরিণীর মতো জীবনের হরিণকে তবে সে জ্যোৎস্নার পানে—
    প্রেতজ্যোৎস্নার পানে ডাকে।
ডাকে না কি?
নিতান্তই কোনো কিছু ভয়াবহ ভয় যদি আমাদের দিকে
ক্রমে ক্রমে চলে আসে আজ,
তবুও তা ভয় বলে মনে হতে দেরি—
যত দিন দেরি হয়— তত দিন ভালো।
আমরা সকালবেলা পেয়ে গেছি সূর্যের আলো;
আমরা রাত্রিবেলা পেয়ে গেছি বাতি:
গণেশ যে সব কূট শ্লোক নিয়ে একদিন বিবেচনা করে গিয়েছিল;
সহজ স্ফূর্তির মতো সে সব তোমার প্রাণে জন্মেছিল, ব্যাস,
স্বভাব সুখের মতো রাত্রির ফুটপাতে একদিন অগণন গ্যাস
জ্বলেছিল—মনে হয়েছিল;—
আমরা সকলে
যে যার নিবিষ্ট জন্ম, প্রসন্নতা, মরণের কাজে

অজানিতে ঘুরে গেছি; কথা
বলে বলে হয়রান মলিন জনতা
হয়ে গেছি;
কেউ তবু হাড়ে হাড়ে আমাদের অল্পপ্রাণতাকে
চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করে নি।
কী এক সম্পূর্ণ ঈর্ষা কেবলই নিকটে নেমে আসে তবু আজ;
কখনও ধানের ক্ষেতে—কখনও নদীর ভুয়ো জলে
নিরন্ন বছর নামে;—
বর্গাদার—মহাজন—প্রজার মহলে
হুলুস্থূল প'ড়ে যায়;
এখানের ভাগচাষ—শহরের হুণ্ডি—ঠিকাদার
ভূশণ্ডির মাঠ—ঘাঁটি—বারভূঞাদের ভূত—ব্যবচ্ছেদাগার—শব—
হাতুড়ে ডাক্তার—
ফিসফিস ষড়যন্ত্র—রাস্তার কানাচ—
এই সব সূর্যের চেয়েও বেশি বালুকার আঁচ;
এরা সব হুলস্থুল ক'রে যায়।
কোনো কোনো প্রৌঢ় এসে অত্যাচার করে;
অগণন যুবকের ভিড়ে কোনো কাজ নেই,—চিন্তার কুশল রয়ে গেছে;
চারিদিকে সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা ;
জনমানবের মুখে নিজ নিজ শোকাবহ গোপনীয় কথা ;
নিজেরই ঘরের জন্যে ঘরন্তী শক্তির নির্মমতা ;
মূর্খ দেশ, মেয়ে দেশ, প্রভু দেশ, ভৃত্য দেশ, পাগলের দেশ রয়ে গেছে,
রয়েছে বালির দেশ;
দার্শনিকদের দ্বিধা— মনীষীর হৃদয়ের প্রেম
সে সব বালির 'পরে দাগ কেটে অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে;
হৃদয়বিহীনভাবে ধূর্ত সমুদ্রের কাছে,
প্রোভারের, পায়রার বিষ্ঠার ভিতরে।
সবেরই স্বতন্ত্র বেদনা র'য়ে গেছে।
এক বেদনার মাইল-মাইল জুড়ে তিল
ধারণের স্থান আছে—আছে কিনা অপার ব্যথার?
আমাদের সকলের বেদনা কি মিলেমিশে যেতে চেয়েছিল—
অথবা যে যার প্রাণে চেয়েছে কি—পেয়েছে কি ভীষণ স্বাধীন অন্ধকার?
দেখি না—জানি না—তবু অনুভব ক'রে কোনো সূর্যালোকে অতিমৃত্যু পেলে
পুনরায় উষালোক হয়তো বা জীবনে পেতাম;
আমরা পেতাম নাকি?
তবুও অনেক উষা এসে গেছে ইতিহাসে,—উষা সব নয়;
জনসাধারণ ভাবে আজ আমাদের একাকী হৃদয়
অনেক জেনেছে,—তবু অমেয় বিপ্লব শুরু শেষ হয়ে গেলে
রুটিনের সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয়
মানবজাতির কাছ থেকে চেয়ে নিখিলের মানবেরা পাবে:
না হলে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞা ও সন্দেহের দিব্যতায় কোথায় দাঁড়াবে।

মানুষ চারিয়ে

এবার তৃতীয়বার চলে যাব বিদেশভ্রমণে;
	এবার তৃতীয়বার হবে।
—স্ট্র্যাণ্ডের 'পরে ফিরে হাতুড়ে কামিন
	এরকমভাবে অনুভবে
বিদেশভ্রমণে ক্রমে অগ্রসর হয়;
চোখে তার সাধারণ নিপীড়িত মানুষের মতন বিনয়।

মৌসুমী মেঘের দিকে মুখ রেখে জাহাজের চোঙা
	লবেজান অনেক জাহাজ
যদিও জীবিত, যুক্ত, পরিদৃশ্যমান
	পৃথিবীর মতো জাঁহাবাজ—
হাভাতে বিড়াল এক ধোঁয়াটে রঙের এক শিকে
চিরদিন খেলা ক'রে জন্ম দিয়েছিল তবু শ্রমজীবীটিকে।

তাই সে বিড়ালটাকে অবশেষে লেজে ধরে নিয়ে
	লট্‌কায়ে শিকের মতন
দেখেছে নীচেয় শিকে থাবার উপরে ওৎ পেতে
	বিড়ালের মতো মোতায়েন।
তবু এক দূর—আরো দূর দেশে আমদানি-রপ্তানি চলে
গাধার গড়ানে পিঠে বিড়াল ও শিকের বদলে।

সেইখানে সারেঙের মাসি, আর খালাসির কানামামা, খোঁড়া লস্কর—
	তিনজনে ঝানু কামিনের সাথে মিলে
সকলেই যে যাহার জামিনে খালাস থেকে থেকে
	সমুদ্রের পারে বসে একটি পাতিলে
মাছের সালুন খায় কোণ ঠেসে—কড়া পাকে জ্বাল;
কেঁপে ওঠে বমারের কলরবে সারা দিন সমুদ্রের পারে বংশাল।

কোনো এক ভিখিরিকে শেষ রাতে হাওয়া এসে ডাক দিয়ে গেল
	কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে;
কৃকলাস কৃশ হয়ে গিয়ে তবু ফুরোবার আগে
গেঁটে বাত, সন্ধি বাত, অবশেষে ভিখিরির বাতে
ধরা পড়ে গিয়েছিল লোকটার আগাপাছতলা ভরা গায়ে;
যখন ভিখিরি তবু জেগে গেল ভোরবেলা চোখ রগড়ায়ে,
পা ছড়ায়ে বসে আছে তখন ভীষণ রোদে ভিখিরিনী—দুই গালে আব,
'যেখানে পুরুষ থাকে সেইখানে মেয়েদের ঘেঁষার স্বভাব'—
বলে গেল কলেজ স্ট্রিটের 'পরে ফুটপাতে একটি ভিখিরি।

এক ঝুড়ি ছাই এনে কে এক ফিকিরে
পাল্লায় মেপে নিতেছিল সেই ভিখিরির দাড়ি;

তবুও ভূষির চেয়ে বুড়ো ইয়ারের
মিয়োনো মুড়ির মতো লোমগুলো ভারী।
হারামি ছোকরাদের এই সব সাউখুড়ি——সব——
লুটে গেলে পরে তবু জাঁদরেল পাথরের মতন নীরব
পা ছড়ায়ে বসে আছে তখন ভীষণ রোদে ভিখিরিনী——দুই গালে আব,'
'যেখানে পুরুষ থাকে সেইখানে মেয়েদের ঘেঁষার স্বভাব',
বলে গেল কলেজ স্ট্রিটের 'পরে ফুটপাতে একটি ভিখিরি।

*

'হাজার বছর গেল নিজের মনের ছকে মানুষ চারিয়ে।
গাছের পাতার ফাঁকে উড়ে গেছে বলা যেত যদি,
জ্যোৎস্নার প্রান্তরে তারা ঘোড়ার মতন যদি অনেক শিশির, ঘাস খেত
পরীর চুলের মতো লেজ দিয়ে মাছি মশা এঁটিলি তাড়িয়ে,
তবে এই শতাব্দীর অগণন সূর্য অস্ত গেলে
গণিকা, অধ্যক্ষ, ভাঁড়, ব্যাঙ্কার চুঁইয়ে যে ডিভিডেন্ট পেত,
সে সব আঙুলে গুনে চুমো দিয়ে ঢেলে দেওয়া যেত।'
ভিখিরিরা মিশে গেল অন্ধকারে এই কথা বলে।

এই শতাব্দী সন্ধিতে মৃত্যু

(অগণন সাধারণের)

সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিল
তততোধিক অসুস্থ সময়ে
আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়।
দূরে কাছে শাদা উঁচু দেয়ালের ছায়া দেখে ভয়ে
মনে করে গেছি তাকে——ভালোভাবে মনে করে নিলে——
এইখানে জ্ঞান হতে বেদনার শুরু——
অথবা জ্ঞানের থেকে ছুটি নিয়ে সান্ত্বনার হিম হ্রদে একাকী লুকালে
নির্জন স্ফটিকস্তম্ভ খুলে ফেলে মানুষের অভিভূত উরু
ভেঙে যাবে কোনো এক রম্য যোদ্ধা এসে।
নরকেও মৃত্যু নেই——প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে;
মর্তে সেই স্বর্গ-নরকের প্রতি সৎ অবিশ্বাস
নিস্তেজ প্রতীতি নিয়ে মনীষীরা প্রচারিত করে।

শতাব্দী শেষ

সূর্যগরিমার নীচে মানুষের উচ্ছ্রিত জীবন
শুরু হল——যখন সে শিশুর মতন;
নদীর জলের মতো আশা দিয়ে উচ্চারিত হয়ে
তবুও সে মানুষের মন।

রঙিন খেলনা, ঘোড়া, জাপানী লাটিম,

আরব্যোপন্যাসের সেই পরী জিন উড্ডীন বক
নিয়ে খেলে বিবেচনা করে হয়ে যায়
ক্রমেই নিঃস্বার্থ বিবেচক।
অপরাবিদ্যার দিন ছাত্রের,
কলেজিয়ানের পুরস্কার,
অধ্যয়নবিলাসীর
দু-চারটে পেপারকাটার

পড়ে থাকে তারপর মলিন টেবিলে;
মানুষ নিজেকে নিজে চিনে
চলে যায় জীবনের চেয়ে আরো বড়ো
বাজেটের কমিটি মিটিঙে—

ভুলের ভিতর থেকে ভুলে—
গরিমার থেকে আরো গরিমার পানে—
যেখানে আসন্ন কাল চিরকাল আগামীপ্রসবা:
আজও যা হয় নি সেই চরিত্রের পানে।

কার্তিকের ভোর ১৩৫০

চারি দিকে ভাঙনের বড়ো শব্দ,
পৃথিবী ভাঙার কোলাহল;
তবুও তাকালে সূর্য পশ্চিমের দিকে
অস্ত গেলে... চাঁদের ফসল
পুবের আকাশে
হৃদয়বিহীনভাবে আন্তরিকতা ভালোবাসে।

তেরোশো পঞ্চাশ সালে কার্তিকের ভোর:
সূর্যালোকিত সব স্থান
যদিও লঙ্করখানা,
যদিও শ্মশান,
তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে
সূর্যালোকিত হয়ে আছে।

শীতের রাতের কবিতা

গভীর শীতের রাত এই সব, তবু
চারি দিকে যুবাদের হৃদয়ের জীবনের কথা
মৃত্যুর উপর দিয়ে সাঁকোর মতন
চেয়ে দেখে মরণের অপ্রমেয়তা
সেতুর ছবির মতো মিলে গিয়ে জলের ভিতরে
জীবনের জয়—

আর মরণের স্তব্ধতাকে অনুভব করে।

অনুভব করে এই জীবনই মহৎ,
মরণের চেয়ে বড়ো জীবনের সুর;
যদিও অন্ন আজ ভূমা নয়—তুবও মৈত্রেয়ী
অন্নলোভাতুর;
হৃদয়বিহীনভাবে—দশ বিশ শত কোটি টন
চলে আজ পঙ্গপাল—নিজেকে উজাড় ক'রে; জেনে
জীবন হতাশ নয় বলেই জীবন।

শ্রুতি-স্মৃতি

আলোর চেয়েও তার সহোদরা আঁধারের পথে বারবার জন্ম নিয়ে
যোদ্ধা জয়ী অবক্ষয়ী কলঙ্কী হয়েছি।
কোনো কিছু শুভ্র আভা—কোনো ভালোবাসার আকাশ পেতে গিয়ে
আয়ু ফুরাবার আগে মরে গেছি।

ইতিহাসে শেষ হয়ে গিয়ে তবু অজর অনড় চোখ মেলে দেখে গেছি
আমাদের হৃদয়ের আশা
নদীর জলের মতো মিশরের, দিল্লীর, মাদ্রিদের, লন্ডনের পথে নেই বলে
নেই নেই—মেটে নি পিপাসা।

তবুও প্রাণের আলোড়নে এসে নবতর নবীনেরা বারবার ক্লান্ত শতাব্দীকে বলে গেছে:
মৃত সূর্য-তপতী কি তুমি!
তাদের আশার ভোর তবুও সূর্যের চেয়ে বালির উত্তেজে বড়ো হয়ে
হয়েছে হত্তেল মরুভূমি—

অগণন অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্‌ট্ গান, সার্চলাইট্ ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখা যায়।
বুদ্ধ, খৃষ্ট, এঞ্জেলোর মোম
মহৎ বস্তুর মতো, নিভে, তবু ব্যাপ্ত হয়ে আছে—সব জেনে—আধো জেনে
চুংকিং, কলকাতা, দিল্লী, মস্কৌ, রোম

অধিক প্রাণের দিকে চলে যায়—নিপট, কপট, শঠ, কর্মী, মর্মগ্রাহী
মানব নিঃশেষ হবে জেনে তবু ভালো
মানবিক কলরবে অন্নপূর্ণা মরীচিকা খোঁজ করে চলেছে—চলেছে—
হে কঠিন, সহজাত সূর্যের আলো।

সমুদ্র-পায়রা

কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারা দিন সমুদ্রপাখির:
যত দূর চোখ যায় সাগরের গাঢ় নীলিমায়
নিজেকে উজোতে গিয়ে চোখের নিমেষে

সকালবেলায় রোদ পাখি হয়ে যায়।

কোথায় আফ্রিকা আলুলায়িত শ্বেতাঙ্গ-নীল চোখে—
এ পৃথিবী কবলিত হয়—
কোথায় চড়ুই দেখে বেড়ালের নির্জন চোখের
নীলিমা কি জীবন—কি মৃত্যুর বিস্ময়—

অনুভব ক'রে প্রিয় মনে হয় জীবনই গভীর—
মদির মৃত্যুর সাথে ঐতিহাসিক কাল খেলে;
সৈকতে বাজারে মৃত পম্‌ফ্রেটের অমা যামিনীর
নক্ষত্রে সূর্যের মতো পাখি তুমি এলে।

আনবার

যেখানে রয়েছে আলো পাহাড় জলের সমবায়—
তবুও সেখানে যদি আবিষ্কার করি প্যারাফিন
অনেক মাটির নীচে—অথবা সেখানে যদি সংগ্রামবিলীন
অজস্র অস্পষ্ট মুণ্ড অনুকম্পা হৃদয়ে জাগায়,
তা হলে প্রভাত এলে মনিয়া পাখির পিছে কী করে বালক
ভেসে যাবে উজ্জ্বল জলবিম্বের মতো হেসে?
কী করে বা নাগরিক নিজের নারীকে ভালোবেসে
জেনে নেবে হেমন্তের সন্ধ্যার আলোক
গ্যাস আর নক্ষত্রের লিপ্সা থেকে জেগে
যারা চায় তাহাদের কাছে তবু স্মিত সমন্বয়?
মৃতদের উপেক্ষিত পীত দেহ—বলো—ক্ষমাময়।
বৃত্তের মতন—এসো, ঘুরি মোরা বঙ্কিম আবেগে।

সোনালি অগ্নির মতো

সোনালি অগ্নির মতো আকাশ জ্বলছে স্থির নীল পিলসুজে:
পৃথিবীর শেষ রৌদ্র খুঁজে
কেউ কি পেয়েছে কিছু কোনো দিকে? পায় নি তো কেউ।
তারপর বাদুড়ের কালো কালো ঢেউ
উড়ায়ে শঙ্খচিল কোথায় ডুবল চোখ বুজে।

অনেক রক্তাক্ত সোনা লুফে নিয়ে চলে গেছে নগরীর পানে
মানুষেরা রক্তের সন্ধানে।
বাদুড়েরা তারপর ছক কেটে আঁধার আকাশে
জীবনের অন্য-এক মানে ভালোবসে:
হয়তো বা সূর্যের ওপিঠের মানে।

চিন্তার-ইচ্ছার শান্তি চার দিকে নামছে নীরবে:

যত কাল লাল সূর্য পিছু ফিরে রবে।
বাদুড় যেখানে দূর—আরো দূর আকাশ-কালোয় গিয়ে মেশে।
সে গাহনে এক দিন মানুষও নিঃশেষে
নিভে গেলে বুঝি তার শেষ হিরোশিমা শান্ত হবে।

সৌর চেতনা

এইখানে অন্ধকার সমুদ্রের জলে
একটি আলোক স্তম্ভ আছে;
তবুও তা' আলো ব'লে বোধ হয় যদি
জঞ্ঝায় শংকিত সব নাবিকের কাছে
অন্ধ প্রহরী তার ঘরে
আপনার অন্ধকার নিয়ে খেলা করে।

মৃত পিতৃপুরুষের বিবর্ণ দেয়ালে
অধিক বিবর্ণতর তরবার দেখে
প্রয়োগ পটুয়াদের সাধ জেগে গেল
হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে;
মদির উল্লাসে তারা আত্মকর্মক্ষম
চেয়েছে কি ঠিকই এ রকম।

কণ্ঠস্থ গ্রন্থের শব্দ উচ্চারণ করে
মোমের নিকট ব'সে মানুষের চোখ
হারায়ে ফেলেছে গ্রন্থ,
হারায়েছে মোমের আলোক,
হারায়ে ফেলেছে এই শতাব্দীকে আজ
গোধূলির সুত মিত রমণী সমাজ।

এই জীবনের পথে জিনিসের মত
অপরের সমীচীন দৃষ্টির নির্দেশে
অচেতন জলের লোহের হেকে জলে
চলেছি বিম্বের মত ভেসে।
শুনেছি কোথাও এক শতাব্দীর মিতব্যয়ী মন
জানে নাক' অপ্রস্তুত হতে;
শুনেছি চ'লেছি লোক—পরিচিত প্রমাণের বলো
জনমত,—অন্ধকার লোক মতামতে
চ'লেছি দৈবের দিকে?

যে আকাশ জনতার নিরাশায় পিছে
প'ড়ে আছে—অথবা মৃত্যুর পরে যেখানে শান্তিতে বসবাস
করা যায়,—অথবা যাদের আমি
প্রতিহত ক'রে যাই আজ,

অথবা যেসব জ্ঞান জ্ঞানময় বলে মনে হয়
অথবা যে সব আশা, আশা বলে মনে হয় আজ
সকলি তন্দ্রার মত।
জ্ঞানপাপী হয়ে তবু যাকে আমি বধ করি আজ
যাকে আমি ভালোবাসি বলে মনে হয়,
যাকে আমি অবহেলা করি,
সকলি রিরংসেরচালীন পেংগুইন।
তবুও সত্যের পরিচয়
নিজের নিপট গুণে ভেদ করে যদি এই মোহান্ধতাকে,
তবে সে তা' করে যায়। বিনয়ের অবসান হ'লে
তবুও বিনয়ী হয়ে ওরা কাল ভোর বেলা হয়তো বা
পেয়ে যাবে তাকে।

অন্তর-বাহির

ভোরের প্রথম রোদ প্রান্তরের দু-চারটে শালিখের মতো
পৃথিবীতে এত দিন যত লোক মরে গেছে—সব
এমন আকাশ পেলে তারাও নীলিমা হয়ে যেত;
তবুও কোথাও তারা নেই বলে এমন নীরব?

সে কবে ভোরের রোদ মেয়েটির মুখে প'ড়ে তবু
দেযালে সিঁড়িতে মাঠে পড়েছিল বলে
সমস্ত পৃথিবী মেঘ জ্যোতির্ময় সাগরের মতো মনে হয়
এখনও কখনও ভোর হলে।

সেই নারী হয়তো বা এক দিন দূরে যেতে পারে,
জীবনের থেকে সরে যাবে এই ভয়ে—
নারীকে না পেয়ে আজ—পেয়ে আজ—বহিরাশ্রিতা
অফুরন্ত রৌদ্রে ভোর হযেছে হৃদযে।

অনির্বাণ

সর্বদাই এরকম নয়, তবু
মাঝে মাঝে মনে হয় কোনো দূর
উত্তর সাগরে কোনো ঢেউ
নেই;
তুমি আর আমি ছাড়া কেউ
সেখানে ঢোকার পথ হারায়ে ফেলেছে।

নেই
নীলকণ্ঠ পাখিদের ডানা-গুঞ্জরণ
ভালোবেসে আমাদের পৃথিবীর এই রৌদ্র;

কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দেখা দেয় মিলাবার আগে
এইখানে সে আকাশ নেই;
রাতে নক্ষত্রেরা সে রকম
আলোর শুঁড়ির মতো অন্ধকার অন্তহীন নয়।

তবুও আকাশ আছে:
অনেক দূরের থেকে নির্নিমেষ হয়ে
নক্ষত্র দু-একজন চেয়ে থাকে;

চেয়ে থাকে আমাদের দিকে—
যেন টের পায়
পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা—সব কথা বলা
ডাভেন্ট্রি ডোমেই টাসে স্টেফানিতে
যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির—
মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে;
—কোনো কথা, কোনো গান
কাউকেই বলে নাই;
কোনো গান
পাখিরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা স্তব্ধতার দেশে
তুমি আর আমি দুই বিভিন্ন রাত্রির দিক থেকে
যাত্রা ক'রে উত্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে
এখন মিশেছি।

এখানে বাতাস নেই—তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মতো সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে
কোনো রাণী নেই—তবু হংসীর আশার কণ্ঠ
এইখানে সাগরের রৌদ্রে সারা দিন।

'ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ ইন্‌ ট্রপিক্‌স্‌' প'ড়ে

নক্ষত্র আকাশ নদী পাহাড়ের বধির গরিমা
দূরে যায়, কাছে এসে করে যায় ভাব;
নিজেকে শত্রুর মতো মনে করে চিরদিন যদি

নষ্ট করে দেওয়া যেত তাহাদের মিথ্যা প্রভাব;
নিজেকে বন্ধুর মতো মনে করে যদি অপলক
অনুভব করা যেত তাহাদের অবহিত মন;—
অনেক চতুরানন মরে গেছে এই সব ভেবে
জেনে হো হো করে হাসে একজন চতুর আনন।

হেমন্ত কুয়াশায়

সকাল-সন্ধ্যাবেলা আমি সেই নারীকে দেখেছি
জেনেছি অনেক দিন— তারপর তবুও ভেবেছি।
তারপর ঢের দিন পৃথিবীর সেই শাদা সাধারণ কথা
ছোটো বড়ো জিনিসের বিস্মরণে ক্রমে ভুলে গেছি।
আকাশ আমাকে বলে: 'সে না তুমি আত্মসমাহিতি?'
পৃথিবী আমাকে দেখে ভেবে যায়: 'এর প্রাণে, আহা,
লাখেরাজ হয়ে পড়ে রয়েছে সততা;
যে নারীকে নদীর কিনারে জলে ভালোবেসেছিল
সময়ের সুবাতাস মুখ ছুঁয়ে চলে গেলে যদি তার কথা
ভুরু কোঁচকায়ে ভেবে নিতে হয়, মানবহৃদয় তবে সে কোন্ রকম।
হেমন্তের কুয়াশায় বেড়াতে বেড়াতে কারু দাবি
অমল ঋণের মতো গ্রহণ করেছি আমি নিতে ভুলে গিয়ে;
তার ভালোবাসা পেয়ে ভযাবহভাবে সৎ হয়ে আছি—ভাবি।

চেতনা-লিখন

শতাব্দীর এই ধূসর পথে এরা ওরা যে যার প্রতিহারী।
আলো-অন্ধকারের ক্ষণে যে যার মনে সময়সাগরের
ক্লান্তিবিহীন শব্দ শোনে;
অথবা তা নাড়ীর রক্তস্রোতের মতন ধ্বনি
না শুনে শোনা যায়।

সময়গতির শব্দময়তাকে তবু ধীরে ধীরে যথাস্থানে রেখে
ট্রামের রোলে আরেক ভোরের সাড়া পেয়ে কেউ বা এখন শিশু,
কেউ বা যুবা, নটী, নাগর, দক্ষকন্যা, অজের মুণ্ড, অখল পোলিটিশ্যান্।
এদের হাতেই দিনের আলো নিজের সার্থকতা
খুঁজে বেড়ায়।

চার দিকেতে শিশুরা সব অন্ধ এঁদো গলির অপার পরলোকে আজ
জগৎশিশুর প্রাণের আকাশ ভেবে
জানে না কবে নীলিমাকে হারিয়ে ফেলেছে।
শিশু-অমঙ্গলের সকল জনিতারা এই পৃথিবীর সকল নগরীর
আবছায়াতে ক্লান্তি-কলকাকলির প্রেতের পরিভাষা

ছড়িয়ে কবে ফুরিয়ে আবার সহজ মানবকণ্ঠে কথা কবে?
আকাশমর্ত্যে মহাজাতক সূর্যগ্রহণ ছাড়া
কোথাও কোনো তিলেক বেশি আলো
রয়েছে জানে না কি?
তবুও সবাই তারা
অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে বার হয়ে কি আসছে আরো
বিশাল আলোতে?

কোথায় ট্রাম উধাও হয়ে চলেছে আলোকে।
কয়লা গ্যাসের নিরেস ঘ্রাণ ছড়িয়ে আলোকে
কোথায় এত বিমূঢ় প্রাণজন্তু নিয়ে অনন্ত বাস্, কার্
এমন দ্রুত আবেগে চলেছে।

কোথার দূরে দেবতাত্মা পাহাড় রয়েছে কি?
ইতিহাসের ধারণাতীত সাগরনীলিমা?
চেনা জানা নকল আলোর আকাশ ছেড়ে সহজ সূর্য আছে।
নব নবীন নগর মেশিন প্রাণের বন্দর—
জলের বীথি আকাশী নীল রৌদ্রকণ্ঠী পাখি?
সেখানে প্রেমের বিচারসহ চোখের আলোয় গোলকধাঁধার থেকে
মুক্ত মানুষ নতুন সূর্য-তারার পথের জ্যোতির্ধূলি-ধূসর হাসি দেখে
কি দীন, সহৃদয়?
জ্ঞান সেখানে অফুরন্ত প্যারাগ্রাফে ক্লান্তিহীন শব্দযোজনায়
কিছুই নেই প্রমাণ ক'রে শূন্যতাকে কুড়ায় নাকো তবে?

পরস্পরের দাবির কাছে অন্তরঙ্গ আত্মনিবেদনে
নবীন করে পরিচিত হওয়ার পরে নতুন পৃথিবী
রয়েছে জেনে আজকে ওরা চলার পথে ইতিহাসের চরম চেতনা—
মানব নামের কঠিন হিসাব হয়তো মেলাতেছে,
কী এক নতুন জ্যোতির্দেশী সমাজ সময় শান্তি গড়ার নীল সাগরের তীরে

চোখে যাদের চলতে দেখি তারা অনেক দেরি করে অনাথ মরুসাগর ঘুরে চলে;
মনের প্রয়াণ মোড় ঘুরে কি দেখেছে সরণি—
সাহস আলো প্রাণ যেখানে সবার তরে শুভ—
এই পৃথিবী ঘরনী।

জার্মানীর রাত্রিপথে : ১৯৪৫

সে এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে
সাগরগামী নদীর মতো স্বরে
আমার মনের ঘুঘুমরালসংসী ঝাউয়ের বনে
আধো আলোছায়াচ্ছন্নভাবে মনে পড়ে
টিউটনের গন্ধে ছড়ায় সাগায় সূর্যালোকে

থেকে থেকে আভাস দিয়ে যেত;—
গ্রিমের থেকে হীগেল শিলার সানুজ দানবীয়
গ্যেটের সে দেশ সূর্য অনিকেত?

মাঝে মাঝে আমার দেশের শিপ্রা, পদ্মা, রেবা, ঝিলম, জলশ্রীকে আমি
সর্পীবোনের মতন কোথাও পাহাড় অবধি
অথবা নীল ভূকল্লোলে সাগর সুভাষিত
করতে গিয়ে শুনেছিলাম রাইনের মতো নদী
কী এক গভীর হ্বাইমারী মেঘ সূর্য বাতাস নিয়ে
নর-নারী নগর গ্রামীণতায় ব্যাপ্ত রীতি
লক্ষ্য ক'রেই সবিতাসাধ জানিয়েছিল—তিন দশকের পরে
এ-সব স্বপ্নমিশেল কী এক শূন্য অনুমিতি।

যদিও আমি আজও বেশি সূর্য ভালোবাসি
তবুও যারা মনের নীহারিকার পথে ঠাণ্ডা অমল দিন
জাগিয়ে সূর্যপ্রতিম আকাশ সমাজ নিয়ে যাত্রা করেছিল
সে সব হৃদয়গ্রাহী টোলার রিলকে হ্যোল্ডার্‌লিন্‌
সবংশে কি হারিয়ে গেছে রাইখ্‌শরীরের থেকে?—
ব্যক্তিস্বাধীনতায় ঘুরে অনাথ মানবতার লেনদেন
শুধতে ভুলে গিয়ে কি ভয় রক্ত গ্লানি রিরংসা ফুঁপায়ে
রেখে গেছে অমোঘ বর্বরতার বেল্‌জেন?

বর্বরতা কোথায় তবু নেই?—তবু এই প্রশ্ন-আতুর মনে
গভীরতর হৃদয়ব্যাধির ঈষৎ সমাধান
আজকে ভীষণ নিরুদ্দেশের অন্ধকারে রয়েছে টিউটন?
রোনকে চিনি—ইউরোপের হৃদয়ে রাইন্‌যান
সহোদরার মতন রৌদ্র আকাশ মাটি যব গোধূমের পাশে
যুগে যুগে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রবেশ ক'রে
এনেছিল কান্ট কাথিড্রাল দৈবতদের উষাপ্রদোষ অখল ভাগনেরের
অভিনিবেশ-বলয়িত গ্যেটের সূর্যকরে।

যদিও তা ব্যক্তিকতার মায়ার মৃগতৃষ্ণাতীত,—তবু,
চমৎকৃত হয়েছিল ইউরোপের ভাবনা-ধূসর মন;
সৌরকরভ্রমে উনবিংশ শতকীরা
হয়তো তাকে ঘরের বহিরাশ্রয়িত দিব্য বাতায়ন—
বাতায়নের বাইরে মেঘের সূর্য ভেবেছিল;
আমরা আজও অনেক জেনে এর বেশি কি ভাবি?
ইতিহাসের ভূমায় সীমাস্বল্পতাকে যাচাই করার রীতি
গ্যেটের ছিল;—তবুও সীমার কী ভয়ঙ্কর বৈনাশিকী দাবি!

সেই তো পায়ের নীচে রাখে পরমপ্রসাদগভীর তনিমাকে
সময়পুরুষ বলে; 'তুমি নিজের কালের ভার

ব'য়েছিলে লীলায়িত সৌরতেজে;—এ যুগ তবু অন্য সকলের;
আরেক রকম ব্যতিক্রমের,—হে কবি, হ্বাইমার।'
সময় এখন জ্যোতির্ময়ী অমেয়তার প্রবাস থেকে ফিরে
নিরিখ পেয়ে গেছে নিজের নিঃশ্রেয়সের পথে;
সেইখানে কাল লোকাতীত হতে গিয়ে কোথাও থেমে গিয়ে—
ক্রান্তি-আলোর বয়স বেড়ে গেলে কঠিন রীতির জগতে

নবজাতক অর্থনীতি সমাজনীতি কলের কণ্ঠে কি প্রাণকাকলি?
এই পৃথিবীর আদিগন্ত ব্যক্তিশবের শেষে
দেখা দেবে হয়তো নতুন সুপরিসর নাগর সভ্যতায়
মানবতার নামে নবীন ব্যক্তিহীনতাকে ভালোবেসে;
হয়তো নগর রাষ্ট্র সফল হয়ে গেলে নাগরিকের মন
হৃদয়প্রেমিক হয়ে যাবে সবার তরে—উচিত অনুপাতে;
জড়-রীতির—অর্থনীতির সনির্বচন মেশিন ভেনে এসব যদি হয়
তাহলে তা অমিয় হোক্ আন্তরিকতাতে।

এই কি সিন্ধুর হাওয়া

এই কি সিন্ধুর হাওয়া—রোদ আলো বনানীর বুকের বাতাস
কোথায় গভীর থেকে আসে!
অগণন পাখি উড়ে চলে গেলে তবু নীলাকাশ
কথা বলে নিজের বাতাসে।

রাঙা মেঘ—আদি সূর্য—স্বাভাবিক সামাজিক ব্যবহার সব
ফুরিয়ে গিয়েছে কত দূরে।
সে অনেক মানবীয় কাল ভেঙে এখন বিপ্লব
নতুন মানব-উৎসে কোথাও রয়েছে এই সুরে

যাযাবর ইতিহাসসহ পথ চিনে নিতে চায়।
অনেক ফ্যাক্টরী ফোর্ট ব্যাঙ্কারেরো আত্মস্থ মনের
অমার ভিতরে অমা রজনীর ভূকম্পনে কথা বলে যায় :
আলো নেই তবু তার অভিগমনের।

নবপ্রস্থান

শীতের কুয়াশা মাঠে; অন্ধকারে এইখানে আমি।
আগত ও অনাগত দিন যেন নক্ষত্রবিশাল শূন্যতার
এই দিক—অথবা অপর দিক; দুয়েরই প্রাণের
বিচিত্র বিষয়জ্ঞানে মিলে গেছে—তবুও প্রেমের
অমর সম্মতিক্রমে। পৃথিবীর যে কোনো মানব
দেশ কাল যে কোনো অপর দেশ সময় ও মানুষের তরে

সেবা জ্ঞান শৃঙ্খলার অবতার হয়ে সব বাধাব্যথাহারা
নবীন ভূগোললোকে মিশে গেছে;—দিকভ্রান্তিহীন
সারসের মতো,—নীল আকাশকে ঈষৎ ক্রেংকারে
খুলে ফেলে। যা হয়েছে যা হয় নি সবই ঐ নক্ষত্রবীথির
একজন অথবা অপরজন;—নিজেদের হৃদয়যন্ত্রের
নিকটে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে উঠে তারা
অনন্ত অমার পটভূমির ভিতরে
অনিমেষ সময়ের মতো জ্বলে;—মনে হয় আশা
অথবা নিরাশা যদি শতাব্দীর জীবনকে খেয়ে শেষ করে
পবিত্রতায় তবু দিক ও সময় মিলে একজন অমলিন তারা
অমিলের ঊর্ণা ধোঁয়া ছায়া কেটে মিলনের পথে
জ্ব'লে যায়; যায় না কি?—নিভু নিভু হয়ে শীতকালের দেয়ালে
ফুটে ওঠে; কথায় কারণে কামে অগণন ক্রেদে কনফারেন্‌সে
বাতির অভাব হ'লে পৃথিবীর মানচিত্রে অন্ধকারে পথ
দেখাবার মতো কোনো কাউকে না পেলে ঐ তারাবলী তারা
প্রাণের ভিতরে জড় মূল্যের অধিক ব্যাপ্তি;—চারিদিকে এই
অবিচ্ছিন্ন পাতা ছায়া শিশিরের নগরের হৃদয়কম্পনে ব'সে আমি
তোমাকে জাগায়ে দিয়ে, প্রিয়, সব কালীন জনীন
মানুষের এক জাতি এক দেশ এক মৃত্যু একটি জীবন এক
গহন আলোকে দেখি না কি? প্রেতের রোলের ভিতরে বাঙালির
ঘর ভেঙে ঝ'রে গেলে জেনিভার অমেয় প্রাসাদ
ম'রে যায়;—ফ্ল্যাণ্ডাস, ভাডুন, ভিমি রিজ, উক্রেইন
হোয়াংহো নীপার রাইন চিন্‌দুইনের পারে সব শব
কলকাতা হাওড়া মেদনীপুর ডায়মনহারবারে বাংলায়
অগণন মানবের মৃতদেহ প্রমাণিত হয়ে
কীরকম শুক্র সৌভ্রাত্রের মতো, চেয়ে দেখ, ছড়ায়ে রয়েছে।
নতুন মৃত্যুর বীজ নয়—ওরা নতুন নেশন—
বীজ নতুন বঞ্চনা-ধ্বংস-মৃগতৃষ্ণাবীজ নয়; নব নব প্রাণনের
সংযমে পৃথিবী গ'ড়ে সফলতা পাবে মনে হয়—
মানুষের ইতিহাসভনিতার দিন শেষ ক'রে তার স্থির
প্রকৃতিস্থ আত্মার আলোর বাতায়নে।

আমার ব্যাহত ঘরে এ ছাড়া অপর কোনো বাতি
নেই আর, আমার হৃদয়ে নেই, এইখানে মৃত পোল্যাণ্ডের
সীমানা রাইনের রোলে মিশে গিয়ে মরণকর্কশ জার্মেনির
হৃদয়ের 'পরে হিমধূমোজ্জ্বল অলিভ-বনের
আন্দোলনে এম্পিডোক্লেসের স্মৃতি বারবার জয় ক'রে নিয়ে
নবীন লক্ষ্যের গ্রীস, নতুন প্রাণের চীন আফ্রিক্ ভারত প্যালেস্টাইন।
পৃথিবীর ভয়াবহ রাষ্ট্রকূট অন্ধকারে অন্তহীন বিদ্যুৎ-বৃষ্টির
জ্যোতির্ময় ব্রেজিল পাথরে আমি নবীন ভূগোল
এরকম মানবীয় হয়ে যেতে দেখি;—ইতিহাস
মানবিক হয়ে ওঠে;—যাযাবর শ্রীজ্ঞানের মতো

এখন অকুতোভয় উদাত্ত আবেগে
সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া অর্বাচীন জেনে নিয়ে তবু
নতুন প্রাণের নব উদ্দেশের অভিসারী হতে
চায় না কি—চায় না কি জনসাধারণ পৃথিবীর?
দেয়ালে ট্রামের পথে নর্দমায় ট্রাকের বিঘোরে হনিতের
অস্ফুট সিংহের শব্দে সবিস্ময় উত্তরচরিত্রে
ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে যেতে পারে বাংলার লোকশ্রুত বিবর্ণ চরিত।
আমার চোখের পথে আবর্তিত পৃথিবীর আঁকাবাঁকা রেখা
যতদূর চ'লে গেছে: কলকাতা নতুন দিল্লী ইয়াঙ্কী আফ্রিক্
দান্তের ইটালী শেক্‌স্‌পীরিয় ইংল্যাণ্ড মেঘ-পাতাল-মর্ত্যের গল্পের
বিভিন্ন পর্বের থেকে উঠে এসে রবীন্দ্র লেনিন মার্কস্ ফ্রয়েড রোলাঁয়
আলোকিত হয়ে ওঠে; মুমুক্ষার অবতার বুদ্ধের চেয়েও
সমুৎসুক চোখ মেলে আপামর মানবীয় ঋণ—
রিরংসা—অন্যায়—মৃত্যু—আঁধারে উজ্জ্বল
পথিকৃৎ সাঁকোর মতন সব শতকের ভগ্নাংশকে শেষ
ক'রে দিয়ে পবিত্র সময়পথে মিশে গেছে;—সব অতীতের
মথিত বিষের মতো শুদ্ধ হয়ে সহজ কঠিন দক্ষিণ ভবিষ্যতে
মিলে গিয়ে মানবের হৃদয়ের গভীর অশোক
ধ্বনিময়তার মতো তুমি হে জীবন, আজ রাতে অন্ধকারে আনন্দসূর্যের
আলোড়নে আলোকিত ব'লেই তো মানব চ'লেছে।

দাও দাও সূর্যকে

দাও দাও সূর্যকে জাগিয়ে দাও:
হে দিন, জ্বালাও তুমি আলো।
যখন নির্বাণ ছিল—কোনো দিকে জ্যোতিষ্ক ছিল না,
যখন শূন্যের সাথে শূন্যের চুম্বনে গাঢ় নীল
নীহারিকা শিখা, সাধ জেগে উঠেছিল,
যখন উদ্দেশ্যহীন আর্ত অন্ধ রোদসীকে চোখে রেখে তবু
অগ্নির বর্ণের মতো আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হল—
সে আবেগ সেই দিন সে আলোকে জেগে
কী যেন অনবতুল আভা চেয়েছিল;
বহে চলা—সূর্যকণ্ঠে কথা বলা—প্রাণ
জন্ম দেয়া
চেয়েছিল।

আজ এক কোটি শতাব্দীর পরে অনন্তের কারুকার্যে লীন
মানুষের সংকল্পের সংঘর্ষে সুন্দর
রাত্রি হয়ে যাক সূর্য; মৈত্রী হোক সফল নির্মল;
নক্ষত্র মৃত্তিকা হোক; প্রেমের প্রতিভা হোক উজ্জ্বল, বিনত—
ব্রহ্মাণ্ড রচনা হলে তার ঘাসে এক ফোঁটা শিশিরের মতো।

পটভূমিবিসার

কবের সে বেবিলন থেকে আজ শতাব্দীর পরমায়ু শেষ
কী এক নিমেষ শুধু মানুষের অন্তহীন সহিষ্ণুতায়?—
নক্ষত্রের এক রাত্রি—একটি ধানের গুচ্ছ—একবেলা সূর্যের মতো?
কেবলি মূষলপর্ব শেষ ক'রে নব শান্তিবাচনের পথে
মানবের অভিজ্ঞতা বেড়ে মানুষেরই দোষে হতাহত

কলঙ্কিনী সংখ্যা গড়ে। অতীতের স্মরণীয় ইতিহাস থেকে
যা কিছু জানার আছে না জানার আছে যত শ্লোক
সবাকে দেখাতে গিয়ে বারবার অন্ধকার বেশি করে দেখে।
তবু এই স্বভাবের প্রতিশোধে আগামীর সমাজ অশোক

হয়তো বা হতে পারে। হে তুমি গভীর ইতিহাস,
আমরা মধ্যম পথে; তোমাকে সকল ক'রে দিতে
ব্যক্তি বিসর্জন দিয়ে মানবের প্রাণনের সাগরে চলেছি;—
মহানির্বাণের দিকে কিংসা গোতমীর অজানিতে

আমরা চলেছি নাকি? তা নয়তো। আজকের চেয়ে বেশি ভালো
প্রাণসূর্য উদয় হয়েছে কবে? একরম অশোক গভীর
শিশিরে উজ্জ্বল দেখে ভুল ব'লে প্রকৃতিকে আজও মনে হলে
মনের বিজ্ঞানে তবে শুভ্র হোক মানবীয় নিখিল ও নীড়।

মৃত্যু, সূর্য, সংকল্প

সর্বদাই অন্ধকারে মৃত্যু এক চিন্তার মতন :
আমাদের এই শতাব্দীর সাধ, স্বপ্ন, কাজ, প্রাণ
আচ্ছাদন করে দিতে আসে।
ভোরের নিশ্চিন্ত মন কেমন সাহসে অনায়াসে
আলো হয়—সূর্য হয়—দেখ;
নদী—মেঘ—দিগন্তের পাহাড়ের নীল
বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে কেমন নিঃশব্দ অনাবিল।
আমরা প্রেমের কথা—জ্ঞান মুক্তি প্রগতির দিন
ঢের আগে শুরু করে এখনও ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্লীন
সুরের ভিতরে সুর-অগ্নি হতে গিয়ে
বারবার অঙ্গারের অন্ধকারে সমাজ নিভিয়ে
মানুষের ইতিহাস-উর্ণা হয়ে আছি।
হে আকাশ, হে প্রতিভা, হে বিচিত্র উচ্ছ্রিত সূর্যের উজ্জ্বলন
আমাদের রোগ, পাপ, বয়সের রূঢ় মরুভূমি
শেষ ক'রে সৃজনের অনাদির দীপ্তিকে আদিম
চুম্বনে বিজ্ঞান, প্রেম, প্রেমাগ্নি-উড্ডীন কর তুমি।

রাত্রি ও ভোর

শীতের রাতের এই সীমাহীন নিস্পন্দ গহ্বরে
জীবন কি বেঁচে আছে তবে!
ডানাভাঙা নক্ষত্রের মতন উৎসবে
আঁধারের ভিতরে কি ঝরে

কেবলই স্ফুলিঙ্গ অন্ধ সংক্রান্তির মতো?
বহু দিন ক্ষমাহীন সময়ের ভিতরে সে অনেক জ্বলেছে।
আছে, তবু তুমি নেই, তাই তো দাহন ভেঙে গেছে।
মৃত নক্ষত্রের গন্ধ ক্রমেই হতেছে পরিণত

অন্ধকার সনাতনে—সৃষ্টির প্রথম উৎসারিত পটভূমি
তারই অস্তিমের কথা? অন্তহীন মোজেইকে আলোকের গোলকধাঁধায়
কেউ প্রিয়া—কেউ তার অনির্বাণ প্রিয় হতে চায়;
ঝরে যায়—দূর মৃগতৃষ্ণিকার মতো দীপ্ত তুমি।

এখন ভোরের বেলা মনে হয় তুমি শাদা যূথিকার মতো।
তেমনই পবিত্র স্বাদ তোমার শরীরশিখা ঘিরে।
কোথাও বিষয় খুঁজে তোমাকে দেখেছি রৌদ্রে লুকানো শিশিরে;
সৃষ্টির প্রথম ভোর থেকে অবশেষে আজ এই পরিণত

শেষ ভোর, শেষ রোদ, শেষ ফুল, অন্তিম শিশির।
মীনকেতনের দিন জন্মান্তরে কেটে গেছে—আজ প্রতিসারী
আরেক প্রয়াণে উৎস—একটি মেঘের মতো চলে এসে তারই
নীলিমায় মিশে যেতে যেতে—থেমে—শুনেছি, বলেছ তুমি, 'স্থির

মেঘশান্তি প্রকৃতির—মানুষ তা হারায়ে ফেলেছে।'
চারি দিকে সময়ের সকল বিশাল মরুভূমি
বলয়িত নগরীর সমাজের সভ্যতার কলঙ্কসুন্দর
মৃগতৃষ্ণায় লয় পেয়ে গেলে স্থির তুমি—স্থিরতর তুমি।

এই পথ দিয়ে

এই পথ দিয়ে কেউ চলে যেত জানি।
এই ঘাস
নীলাকাশ—
এ সব শালিখ সোনালি ধান নরনারীদের
ছায়া-কাটাকুটি কালোরোদে
সে তার নিজের ছায়া ফেলে উবে যেত;
আসন্ন রাত্রির দিকে সহসা দিনের আলো নষ্ট হয়ে গেলে

কোথাও নতুন ভোর রয়ে গেছে জেনে
সে তার নিজের সাধ রৌদ্র স্বর্ণ সৃষ্টি করেছিল।

তবুও রাত্রির দিকে চোখ তার পড়েছিল বলে
হে আকাশ, হে সময়, তোমার আলোকবর্ষব্যাপ্তি শেষ হলে
যখন আমার মৃত্যু হবে
সময়ের বঞ্চনায় বিরচিত সে এক নারীর
অবোলা রাত্রির মতো চোখ মনে রবে।

কার্তিক-অঘ্রান ১৯৪৬

পাহাড়, আকাশ, জল, অনন্ত প্রান্তর:
সৃজনের কী ভীষণ উৎস থেকে জেগে
কেমন নীরব হয়ে রয়েছে আবেগে;
যেন বজ্রবাতাসের ঝড়
ছবির ভিতরে স্থির—ছবির ভিতরে আরো স্থির।
কোথাও উজ্জ্বল সূর্য আসে;
জ্যোতিষ্কেরা জ্বলে ওঠে সপ্রতিভ রাতে
আদি ধাতু অনাদির ধাতুর আঘাতে
নারীশিক্ষা হত যদি পুরুষের পাশে:
আকাশ প্রান্তর নীল পাহাড়ের মতো
নক্ষত্র সূর্যের মতো বিশ্ব-অন্তর্লীন
উজ্জ্বল শান্তির মতো আমাদের রাত্রি আর দিন
হবে না কি ব্রহ্মাণ্ডের লীন কারুকার্যে পরিণত।

ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২

কোথাও বাইরে গিয়ে চেয়ে দেখি দু-চারটে পাখি।
ঘাসের উপরে রোদে শিশিরে শুকায়।
নিজেদের ক্ষেতে ধানে—চার-পাঁচজন লোক
   মানবের মতন একাকী।
মাটিরও তরঙ্গ স্বর্গীয় জ্যামিতির প্রত্যাশায়
মিশে গেছে অতীত ও আজকের সমস্ত আকাশে।

দিগন্তে কি ধর্মঘট?—চিম্‌নি... পাখির মতন অনায়াসে
নীলিমায় ছড়ায়েছে। এখানে নদীর স্থির কাকচক্ষু জলে
ঘুরুনো সিঁড়ির মতো আকাশ পর্যন্ত মেঘ সব
উঠে গেছে—অনুভব করে প্রকৃতির সাথে মিলিত হতেই,
অমিলনে সূর্যরোলে জ্যোতির্ময় এলুমিনিয়ম অনুভব
ক'রে আমি দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি এরোপ্লেন গুনে
নীলিমা দেখার ছলে শতাব্দীর প্রেতাত্মাকে দেখেছি অরুণে।

অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে

তারা সব মৃত।
ইতিহাসে তবুও তাদের
কেবলই বাঁচার প্রয়োজন বলে
তাদের উত্তর–অধিকার
কোনো কোনো মানবের হাতে আসে।
তারা মরে গেছে।
সবারই জীবনে আলো প্রয়োজন জেনে
সকলের জন্যে স্পষ্ট পরিমিত সূর্য পেতে গিয়ে
তবুও বিলোল অন্ধকারে—
তারা আজ পৃথিবীর নিয়মে নীরব।

এই অই ব্যক্তির জীবনে
সুসময় শুভ অর্থ পরিচ্ছন্নতার
প্রয়োজন রয়ে গেছে জেনে নিয়ে তারা,
তবুও ব্যক্তির চেয়ে ঢের বেশি গহন স্বভাবে উৎসারিত
জীবনবিসারী ক্ষুব্ধ জনতাসমুদ্র দেখেছিল।
সেইখানে এক দিন মানুষের কাহিনী জন্মেছে;
বেড়ে গেছে;
কাহিনীর মৃত্যু হয় নাই;
কাহিনী ক্রমেই ইতিহাস।
জীবনধারণে— জানি— তবু—
জীবনকে ভালো করে অর্থময় করে নিতে গিয়ে
ইতিহাস কেবলই আয়ত হয়ে আলো পেতে চায়।
নিজেদের আবছা ব্যক্তির মতো মনে করে তারা,
ইতিহাস স্পষ্ট করে দিতে গিয়ে তবু,
আজ এই শতকের শূন্য হাতে শূন্যতার চেয়ে বেশি দান
দিয়েছিল হয়তো বা।
দেয় নি কি?
আজ এই হেমন্তের অন্ধকার রাতে
আমরা বিহ্বল ব্যক্তি—তুমি—আমি—আরো ঢের লোক;
মানুষসমুদ্রে ঠেকে অন্ধকার বিশ্বের মতন
তবুও সবার আগে নিজের আকাশ
নিজের সাহস স্বপ্ন মকরকেতন
আপনার মননশীলতা
গণনার প্রিয় জিনিসের মতো মনে ভেবে নিয়ে
অন্য সকলের কথা ভুলে যাই।

সকলের জীবনের শুভ উদ্‌যাপনের চেষ্টায়
সূর্যের সুনাম আরো বড়ো করে দিতে গিয়ে তারা
নিজেদের বিষণ্ণ সূর্যের কথা ভুলে গিয়েছিল।

মানবের কথা বিরচিত হয়ে চলে—
সেই সব দূর আতুর ভঙ্গুর সুমেরীয় দিন থেকে আজ
জেনিভায়—মস্কৌ—ইংলাণ্ড—আত্লান্তিক চার্টারে,
ইউ. এন্. ওয়ের ক্লান্ত প্রৌঢ়তায়— সতর্কতায়,
চীন—ভারতের—সব শীত-পৃথিবীর
নিরাশ্রয় মানবের আত্মার ধিক্কারে— অন্তর্দানে।

হেমন্তের রাত আজ ক্ষুব্ধতায়—জনতায়—নর্দমায়—ক্লেদে
লোভাতুর ক্রূর রাষ্ট্রসমাজের রতির নৈরাজ্যে
অসম্ভব অন্ধ মৃত্যুতে
ফুরোনো ধানের ক্ষেতে তবু
মৃত পঙ্গপালদের ভিড়ে
নরকের নিরাশার প্রয়োজন রয়ে গেছে জেনে, তবু বলে:
'গভীর—গভীরতর তবুও জীবন—
নিজেদের দীনাত্মা ব্যক্তির মতো মনে ক'রে ওরা
সকলের জন্যে সময়ের
সুন্দর, সীমিত আলো সঞ্চারিত করে দিতে গিয়ে
প্রাণ দিয়েছিল।

জীবনধারণে, তবু জীবনের আরো বর্ণনীয়
ব্যাপ্তির ভিতর দিযে আরো সুস্থ—আরো প্রিয়তর
ধারণায় ইতিহাস—ইঙ্গিতের আরো স্পষ্টতায়;
তবে তা উজ্জ্বল হলে জীবন তবুও
নিরালোক হয়ে রবে কত দিন?
কত দিন হতে পারে!'

মহাত্মাজি

সফল উজ্জ্বল ভোর পৃথিবীতে আসে,
তারপর অন্ধকার ভাঙনের রাত;
এ রকম টানাপোড়নের বেগে মানুষের সময় চলেছে।
একদিন পৃথিবীর হিংসাব্যথা শেষ হবে, সেই অনিবার
আনন্দের চিন্তার মতন প্রেম আলো
মাথার ওপরকার প্রসারিত নীলিমার মত
সবের ওপরে সত্য হয়ে আছে, আছে মনে হয়;

বসন্তের বায়ু আসে পাখিদের কলরব নিয়ে;
সূর্য জ্বলে ওঠে নিজ মহিমার স্থলে;
জ্যোতির নিঃসৃত নিজ কন্যার মতন
সমুদ্র সমস্ত দিন কল্লোলিত হয়;
পৃথিবীতে, আমাদের সমাজেও এ রকম সুদীপ্ত সময়
অনুভব ক'রে সব মানুষেরা মৃত অপমৃত শতাব্দীর

গ্লানির কলঙ্ক থেকে উঠে এসে তনু মন প্রাণ
করায় কী অন্তহীন অমলিন আলোসূর্যে স্নান!
মানুষের অবিরল রাত্রি দিনে সেই ভুল, লোভ
হননের ইচ্ছা, রক্ত, অন্ধকার, ক্ষয় :
তিরোহিত হল না তো সেই সব আজো;
তবুও কল্যাণকৃৎ মহাত্মার মাধুরীর এটুকু সময়
আর সেই মধুরতা কি ক'রে নিহত হ'ল, তবু
সংরক্ষণ করে রাখে নিজের অমিয়
'সৃষ্টির অক্ষয় অন্ধ সবিতার কাছে
মানুষ, এ সূর্য তুমি নিও।

মহাত্মা

আলোর মতন ব্যাপ্ত অন্তরাত্মা নিয়ে
বিশ্বের অগ্নির উৎস থেকে
মাঝে মাঝে একজন অবিস্মরণীয়
কল্যাণকৃতের জন্ম হয়;
অমর সে নয়—কোনো অন্তহীন অমেয় সময়
তার হাতে নেই; তবু মৃত্যু এসে চোখে
চুম্বন দেবার আগে সব চেয়ে সাত্ত্বিক আলোকে
আমাদের এই অন্ধ ক্লান্ত শতাব্দীকে
স্নিগ্ধ করে চলে গেছে সেই যুবা প্রৌঢ় ও স্থবির ;
বলেছে : মানুষ সত্য, তবু সত্য মানুষের চেয়েও গভীর

পৃথিবীগ্রহবাসী

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়
কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলা রংএর আলোয়
জ্বলে উঠে ঝরে গেল অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি? স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নীচে রক্তনদীর মতো;
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারি দিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল করে!
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে, তবু আরেক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে

পথে পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানাল যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন করে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে
ভাবছে একা একা ব'সে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে:
ফ্রয়েড মার্ক্স গান্ধী লেনিন আইনস্টাইনের ক্রন্দসীতে আজ
যে দোর কঠিন; নেই মনে হয়—সে দ্বার খুলে তবে
মানব, তোমায় সত্য, সুজন পৃথিবীগ্রহবাসী হতে হবে।

চেতনা- সবিতা

সূর্য কখন পশ্চিমে চলে মশালের মতো ভেঙে
লাল হয়ে উঠে সমুদ্দুরের ভিতরে নিভছে গিয়ে
সে যে রোজ নেভে সকলেই জানে, তবু
আজও ডুবে যায় সময়মতন সকলের অজানিতে।
নারী সাপ যখ বণিক ভিখিরি পিশাচ সকলে মিলে
ভোরবেলা থেকে মনের সূর্যনগরীর আলো খুঁজে
পথের প্রমাণ সূর্যের ত্বকে রক্তে ঘুরছে কী যে।
শিশুর মতন বানানের ভুলে মহাজীবনের ভাষা
আধো শিখে আধো শেখার প্রয়াসে পরস্পরকে তারা
দেখেছে কঠিন সিঁড়িকাটা পথে—নরকের থেকে সিঁড়ি
এঁকেবেঁকে ঘুরে বীতবর্ষণ কৃষ্ণ মেঘের মতো
নীলিমায় দূরে কোথায় মিশেছে। মানবহৃদয় তাকে
পেতে চায় প্রেমে আর অনুমানে; ধুলো হাড় উর্ণায়
ডাঙা বন্দরে চোরা নগরের রক্তনদীর ঢেউয়ে
জেনে নিতে চায় কী সে ইতিহাসঠাসা বেদনার থেকে
এ সিঁড়ি জেগেছে—কোথায় গিয়েছে—এত কঙ্কাল খুলি
এত আবছায়া ফেনিল সাগর—জ্ঞান প্রেম প্রাণ একে
ঘিরে আছে কেন; নরনারীদের নিরাশাসূচক মুখে
কেন তবু আসে ভালো প্রভাতের মতন বিচ্ছুরণ?
মুখে ভুল ভাষা পুরুষ নারীর; হৃদয়ের কোলাহলে
কি কাম কারণ কর্দম? তবু আলোনদী হতে চায়।
বোনভাইদের হননে তবুও নদীর রক্ত জল।
সময় এখন মরুভূমি; সীমা : মৃগতৃষ্ণার মতো,
পান্থ বানাল মানুষ তোমাকে—তোমার সাধনা গতি প্রাণনার ঢের
হাড়গোড় ভেঙে পড়ে থাকে, তবু, মানবেতিহাস মানে
আরো আলোকিত চেতনার স্বাদ—মনের সূর্যনগরী জ্ঞানের কাছে
প্রেমের নিজের নিবেদন-তাই মহা অঘটনে কালো
ইতিহাসরাত গ্রহণমুক্ত সূর্যের মতো আলো।

এই চেতনা

হলুদ কমলা ধূসর, মেঘের ফাঁক দিয়ে
কিরণের সব বর্শাফলক দীর্ঘ ছন্দে উঠে
উপরের নীল আকাশের দিকে নির্জনতার মতো
চলে গেছে—আর বাকি সব শাদা সূর্যরশ্মি পৃথিবীর
চোরা গলি ভাঙা দরদালানের দিকে
শুভ্র সুসমাচারের মতন—পৃথিবীর নরনারী নগরীর
নিরুদ্দেশের সীমানায় ঠেকে স্থির হয়ে আছে—দেখ।
এখন বিকেল—গাঁ শহর নটী বণিক ভিখিরী পলিটিশ্যানরা সব
ক্রমেই অধিক স্তিমিত সুরের ধূসর পৃথিবী বেয়ে
নিভু নিভু শেষ রোদের কিনারে ক্রস্ত মাছির মতো
দেখে আলো নেই—জীবমৃত্যুর তবে অন্তিমযুগ?
(চেয়ে দেখে আলো নিভে যায় যেন হেমন্ত-ব্ল্যাকআউটে)
প্রান্তর থেকে নগরের থেকে জীবনের থেকে সবই
ঢেরদিনকার অনাদায়ী তহশিলের মতন শূন্যে কেঁপে
সূর্যের সাথে হারিয়ে যেতেছে কোথায় কামাতলান্তে।
আরো এক দিন কেটে গেলো তবে অনুপম মৃগতৃষ্ণার
মতন সূর্যকিরণ জ্বালায়ে সমাজ-জাতির চোখে।
দিনভোর সব বড়ো বেবিলন আমাদের সিঁড়ি বেয়ে
নক্‌শি উল্কি নারী ভালোবেসে, আত্মবিচারে ধীরে
অলিভের বনে আথেন্স দেখেছে—সূর্যের আগে অণু—
সূর্যের মতো উপনিষদের শীত আলো
ভালো ক'রে পেতে-না-পেতেই রোম—দ্বিতীয় সূর্য নিজে
শাসন করেছে যুদ্ধ করেছে—আমরা যুদ্ধ করি,
সুশাসন কবি গণনাবিহীন রক্তনদীর পারে
নকল সূর্যে শুরু সুপথে পতিত অন্ধকারে।
জানি না প্রাণের সূর্য কোথায়।
আজকে এখন দিন, শতাব্দী পৃথিবী সৃষ্টি চুপে
বিকালের আলো নেভাতেছে; শত নগরীর ভবনের
সিঁড়ির অপার গোলকধাঁধায় মৃত-জীবিতেরা মিলে
প্রকৃতি প্রণয় সমাজ পৃথিবী জীবনের মানে খুঁজে
খাঁচার ভিতরে অনেক রঙিন পাখির মতন— কেমন সন্দীপনী!
যার যার দ্বৈপ আত্মা মুক্ত করে দিয়ে
আত্মঘাতী নেশনের ক্লান্তি লয় ক'রে
দিতে চায়; প্রেম ও হৃদয় জ্ঞানবিনিময় রয়েছে তাদের;
আলো চায়— অনাদি অনন্ত সূর্য খোঁজে।

বিপাশা

অনেক বছর হল সে কোথায় পৃথিবীর মনে মিশে আছে।
জেগে থেকে কথা ব'লে অন্য নারীমুখ দেখে কেউ কোনোমতে
কেবলই কঠিন ঋণ দীর্ঘকাল আপামর পৃথিবীর কাছে

চেয়ে নিয়ে তার পর পাশ কেটে, মেয়েটির ঘুমের জগতে
দেনা শোধ করে দিতে ভালোবাসে, আহা।

আকাশে রৌদ্রের রোল, নদী, মাঠ, পথের বাতাস
সেই স্বার্থ বুকে নিয়ে নিরুপম উজ্জ্বলতা হল;
শূন্যের সংঘর্ষ থেকে অনুপম হল নীলাকাশ;

তবুও স্বাতীর আলো—শিশিরের মতো তার অপরূপ চোখ
নিজের শরীর মন প্রাণশিল্পী আর
না জাগায়ে প্রেমিকের ঋতুপরিবর্তনের মতো;
নারী আজ সময়ের নিজের আধার।

আলোকপত্র

হে নদী আকাশ মেঘ পাহাড় বনানী,
সৃজনের অন্ধকার অনির্দেশ উৎসের মতন
আজ এই পৃথিবীতে মানুষের মন
মনে হয় অধঃপতিত এক প্রাণী।

প্রেম তার সব চেয়ে ছায়া, নিরাধার
নিঃস্বতায়—অকৃত্রিম আগুনের মতো
নিজেকে না চিনে আজ রক্তে পরিণত
হে আগুন, কবে পাব জ্যোতিঃদীপাধার।

মানুষের জ্ঞানালোক সীমাহীন শক্তিপরিধির
ভিতরে নিঃসীম;
ক্ষমতায় লালসায় অহেতুক বস্তুপুঞ্জে হিম;
সূর্য নয়—তারা নয়—ধোঁয়ার শরীর

এ অঙ্গার অগ্নি হোক, এই অগ্নি ধ্যানালোক হোক;
জ্ঞান হোক প্রেম—প্রেম শোকাবহ জ্ঞান
হৃদয়ে ধারণ ক'রে সমাজের প্রাণ
অধিক উজ্জ্বল অর্থে করে নিক অশোক আলোক।

স্বাতী তারা

স্বাতী তারা, কবে তোমায় দেখেছিলাম কলকাতাতে আমি
দশ-পনেরো বছর আগে; সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের মতন লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালাল
তোমার নিশিত নারীমুখের— জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ: চারি দিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল।

কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই— গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে।
তারা যুবা, তারা মৃত; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজও তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছো, নারি—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারই
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারি দিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
আমরা আজও বহন করে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা... প্রেম নিভিয়ে দিলাম প্রিয়।

আলোকপাত

আকাশ দিয়ে উড়ে গেল শাদা হাঁসের ভিড়।
এইখানেতে আজ পৃথিবীর অনেক মলিন অন্তেবাসী ভাবে;
দূর উপরের নীল আকাশের রোদের বিচ্ছুরণে
ও সব পাখি রূপশালি ধান? কোথায় উড়ে যাবে?
হৃদয় থেকে বাহির হয়ে প্রেম বলেছে: ঐ
নীলাকাশের আজ্জি-কাজিডাঙায় যে সব চোরা গলি থাকে
যে সব বাতাস দেয়ালা ছায়া নখ পাখশাট পাপের থেকে আসে
তারই ভিতর মৃত্যুফেনশীর্ষে ওরা পরস্পরকে ডাকে।
ওরা জানে; সব কুয়াশা পেরুনো এক অব্যর্থ নির্দেশ
ওদের বুকে—শুধু ডানার পিস্টনে তা নয়;
প্রেমই ওদের দিক চিনিয়ে সাগরবলয় কল্লোলে পৌঁছায়।
হৃদয়, এ সব স্বপ্ন-পরিভাষা মনে হয়।
তবুও ঠিক। আমিও যুগের অকূল কিনারা ভেঙে
অনেক দিনের অনুষঙ্গে চেনা সে এক অমেয় নারীর পানে
যেতে যেতে আসছে এসে-যাওয়া যুগের অবসাদে ঐ পাখিদের প্রেম—
স্বীকার করি; আমাদেরও প্রেমে কিছু আলোকপাত আনে।

দিনরাত্রি

সমস্ত দিন
সমস্ত পৃথিবীই যেন আকাশ।
চারি দিকে রৌদ্রের ভিতর রয়ে গেছে নির্মল জলের অনুভূতি;
জল আকাশ ও আগুনের থেকে এই সব রাত্রির জন্ম হয়;
অন্তহীন শুভ্রবিবেকী নক্ষত্রের;
এই সব স্থায়ী জিনিস চল-বিশ্বলোকের;
মানবজীবনের; এদের অনবচ্ছিন্ন উজ্জ্বল প্রবাহে ধৌত হয়ে
সমস্ত গৃহযুদ্ধের গৃহবলিভুকদের রক্তের

শেষ বিন্দুও খুঁজে পাবে না কোথাও।
কোথাও থাকবে না আন্তর্জাতিক অন্যায়ের ছায়া আর।

দেখা যাবে দিন সূর্যশরীরী :
যাযাবর হাঁসকে নিয়ে চলেছে মেঘের
ফেনা-ওড়ানো দূরতর নীলিমায়;
জেগে উঠবে বিকেলের শিয়রে
সাগরের বাতাস যেন—দূর ময়দানের;
অন্তহীন নক্ষত্রের চলাফেরার দেশে পাওয়া যায় তাকে;
ঐ ঝাউ গাছের আঁধারে ভিতরেও;
বন্দরে নগরে
মানুষের হিংস্র বেড়ালের মতো গর্জনকে বিনমিত ক'রে
করুণার রাত্রিঋতুর মতো
পাওয়া যায় তাকে—পাওয়া যায় তাকে।

আজকের মলিনতা রক্ত কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে
সময়ের মনে—নিরবচ্ছিন্ন বিসরণে—
দিন ও রাত্রিরে অন্তহীন
জলঝর্নার শুশ্রূষার শব্দের ভিতর।

সূর্যকরোজ্জ্বলা

'আমরা কিছু চেয়েছিলাম প্রিয়;
নক্ষত্র মেঘ আশা আলোর ঘরে
ঐ পৃথিবীর সূর্যসাগরে
দেখেছিলাম ফেনশীর্ষ আলোড়নের পথে
মানুষ তাহার ছায়ান্ধকার নিজের জগতে
জন্ম নিল—এগিয়ে গেল; কত আগুন কত তুষার যুগ
শেষ করে সে আলোর লক্ষ্যে চলার কোনো শেষ
হবে না আর জেনে নিয়ে নির্মল নির্দেশ
পেয়ে যাবে গভীর জ্ঞানের—ভেবেছিলাম,
পেয়ে যাবে প্রেমের স্পষ্ট গতি
সত্য সূর্যালোকের মতন; ব'লে গেল মৃত
অন্ধকারের জীবিতদের প্রতি।

জীবিত, মানে আজ সময়ের পথে
বালি শিশির ধুলোর মতো কণা
মিলিয়ে তাদের প্রাণের প্রেরণা
ক্রমেই চরিতার্থ হতে চায়।
চারদিকে নীল অপার্থিবতায়
সোনার মতন চিলের ডানায় কোনো
খাদ মেশানো নেই, তবু তার প্রাণে

কোটি বছর পরে কোনো মানে
বার করেছে মন কি প্রকৃতির?
মানুষ তবু পাখির চেয়ে ঢের
অমৃতলোক হাতের কাছে পেয়ে
তবু কি অমৃতের?

মানুষ আমি, মানুষ আমার পাশে;
হৃদয়ে তার হৃদয় মেশালেও
ব্যক্তি আমি, ব্যক্তিপুরুষ সে-ও;
দ্বীপের মতন একা আমি তুমি;
অনন্ত সব পৃথক্ দ্বীপের একক মরুভূমি :
যে যার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে
র'য়ে গেছে;—সেখান থেকে ব্যাজস্তুতি কপট প্রণয় ভয়
দেখ কেমন উৎসারিত হয়;
প্রাণের প্রয়াস রয়েছে তবু, তাই
দেখেছি মানুষ অনর্গল অন্ধকারে ম'রে
মানবকে তার প্রতিনিধি রেখে গেছে,—হয়তো একদিন
সফলতা পেয়ে যাবে ইতিহাসের ভোরে।

চারদিকেতে সব মানুষের ব্যথা মধুরতা
নির্মলতার সাগরসূর্যে ঝরে।
বন্ধু আমার ভোরে এলে দেয়ালে ছায়া পড়ে
তবুও কি আজ ম্যামথ-পৃথিবীর?
সে কোন্ যুগের সরীসৃপের অব্যক্ত শরীর
কামনা ভুল কুজ্ঝটিকায় যে সব অসংগতি
এনেছিল— তাদের তুমি সহিষ্ণুতায় শুদ্ধ ক'রে নিয়ে
ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলছ আজও একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে;
হয়তো মানুষ নিজেই স্বাধীন, অথবা তার দায়ভাগিনী তুমি;
ওরা আসে, লীন হয়ে যায়; হে মহাপৃথিবী,
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার ভূমি।

আশা ভরসা

ইতিহাসপথ বেয়ে অবশেষে এই
শতাব্দীতে মানুষের কাজ
আশায় আলোয় শুরু হয়েছিল বুঝি—শুভ্র কথা
বলা হতেছিল; রৌদ্রে জলে ভালো লেগেছিল
শরীরকে— জীবনকে।

কিন্তু তবু সবই প্রিয় মানুষের হাতে

অপ্রিয় প্রহার হতে মূল্যহীন মানুষের গায়ে
আশ্চর্য মৃত্যুর মতো মূল্য হয়—হিম হয়।

মানুষের সভ্যতার বয়ঃসন্ধিদোষ
হয়তো কাটে নি আজও, তাই
এরকমই হতে হবে আরো রাত্রি দিন;
নক্ষত্র সূর্যের সাথে সঞ্চালিত হয়ে তবু আলোকের পথে
মৃত ম্যামথের কাছে কুহেলির ঋণ
শেষ করে মানুষ সফল হতে পারে
উৎসাহ সংকল্প প্রেমে মূল্যের অক্ষুণ্ন সংস্কারে;
আশা করা যাক।

সুধীরাও সেই কথা ভাবে,
আপ্রাণ নির্দেশ দান করে।
ইতিহাসে ঘুরপথ ভুলপথ গ্লানি হিংসা অন্ধকার ভয়
আরো ঢের আছে, তবু মানুষকে সেতু থেকে সেতুলোক পার হতে হয়।

ক্রান্তিবলয়

মৃত্যু আর সূর্যকরোজ্জ্বল এই পৃথিবীর বুকের ভিতরে
সময়ের মহাসমুদ্রের পারে বালির কণার মতো ঘরে
নক্ষত্রের প্রতিশ্রুতি—দিনমান প্রামাণিক মৃত্তিকাব ধুলো
গড়ে গেছে মানুষের জীবনের চলোচ্ছল বাসনার—এই শিশু বৎসরগুলো।
কোথাও পৌঁছুতে হবে মনে মেনে নিয়ে
চলেছে সে;
দেখেছে ভূস্তরে মহাসরীসৃপ অচেতনভাবে ব্যথা দিয়ে
অচেতন প্রকৃতিকে অন্ধকারে গিয়েছে হারিয়ে।
তবুও প্রকৃতি তার মূল্যের নির্ণয় নিয়ে দিনরাত্রি সহিষ্ণু, অশোক;
চারি দিকে শীত রাত্রি অগ্নির বলয় বড়ো ব্রহ্মাণ্ডের কারুশিল্পলোক
মানুষের পৃথিবীর অণুকণিকার মতো পরিসর ঘিরে।

ফেনা রৌদ্র সাগরের কল্লোলে কুয়াশায পতঙ্গে শিশিরে
নিজেকে উজ্জ্বলভাবে চরিতার্থ মনে করে নিয়ে
মানুষের রাত্রিদিন শুরু হযেছিল;
তারপর কবে—
শেষ হয়ে গেলে শ্যাম পৃথিবী ও নীলিমার বলয়ে জিজ্ঞাসা হয়ে রবে;
রবে বুঝি,
গ্লানি ব্যথা রক্তের অক্ষর আজও শিশুসূর্যের মতো হাসে
অপ্রেমের রঙে কৃষ্ণ মানুষের জ্ঞান ও গতির ইতিহাসে।
এত দিন ধরে তবু মানুষ চিনেছে
অন্তরঙ্গভাবে তার সময়কে—এ পৃথিবীটিকে

ভূগর্ভের অশ্ম থেকে ভিন্ন হয়ে অন্য এক আলোকের দিকে
যেতে হবে জানে;
নীলকণ্ঠ পাখি রৌদ্রে উড়ে এলে যাযাবর সময়ের মানে
ধরা পড়ে যেন স্থাণু কণিকার কাছে।
মানুষের কাহিনীতে আরো কত ক্লান্তি রক্ত—
তবু প্রেম ক্ষেম প্রেমক্ষেমহীন রাত্রির উৎসারণ আছে;
তবু এই শতকের সময়ের লোভ ভয় মৃত্যু রণ আত্মসমাহিতি ছেড়ে দিয়ে
আরো স্পষ্ট আকাশের পদার্থের আলোকের মৃত্যু-অমৃতের অনুভবে
মানুষকে শুভ স্থির স্থিরতর বিষয়ের দিকে যেতে হবে;
যদিও সে স্থিরতার ধারণায় কিংবা তার হিসেবের দোষে
সত্যকে আচ্ছন্ন বলে মনে হয়—যেতে হবে আরো দূর দূরতর কূলে
তা হলে সমাজ সীমা সময়ের সত্যের সূর্যের মর্মমূলে।

আজ

অন্ধ সাগরের বেগে উৎসারিত রাত্রির মতন
আলোড়নে মানুষের প্রিয়তর দিকনির্ণয়ের
পথ আজ প্রতিহত; তবুও কোথাও
নির্মল সন্ততি দেশ সময়ের নব নব তীর—
পেতে পারে হয়তো বা মানবহৃদয়;
মহাপতনের দিনে আজ অবহিত হয়ে নিতে হয়।
যদিও অধীর লক্ষ্যে অন্ধকারে মানুষ চলেছে
ধ্বংস আশা বেদনায়
বন্য মরালের মতো চেতনার নীল কুয়াশায়—
কুহেলি সরিয়ে তবু মানুষের কাহিনীর পথে
ভাস্বরতা এসে পড়ে মাঝে মাঝে—
স্বচ্ছ ক্রান্তিবলয়ের মতন জগতে।

মনে হয় মহানিশীথের স্তন্যপায়ী
মানুষ তবুও শিশুসূর্যের সন্তান,
স্থিরতর বিষয়ী সে—
যদিও হৃদয়ে রক্তে আজও ভুল অকূলের গান

পৃথিবী আজ

প্রকৃতি থেকে ফসল জল নীলকণ্ঠ এল:
সময়পাপচক্র থেকে বাহির হল ব্যথিত নিঃসহায়।
সবের পথে শতাব্দীর এই রাত্রি ব্যাপকতা
প্রশান্তি নয়—ক্রমেই বেশি স্পষ্টতা জাগায়।

সময় এখন চার দিকেতে ঘনান্ধকার দেখে

বলছে:'নগর নরক ব্যাধি সন্ধি ফলাফল
জীবনের এই ত্যক্ত সন্ততিদের প্রলাপ আলাপে পরিণত
হল কি প্রায়?—নক্ষত্র নির্মল?'

হয়তো হল:—অন্তত আজ রাত্রি একা অল্প সময়ের
ভিতরে শুভ অনুধ্যায়ী সময়দেবীর মতো
প্রাণের প্রয়াস দেখাতে গিয়ে চলতি ছেদে ব্যর্থতায়
হয় নি নিহত?

নদী পাখি প্রহরী জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা সব
প্রেমিক? তবু সারাটা রাত এ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি
শব কুড়িয়ে ফিরছে অন্ধকারে;
চন্দ্রে সূর্যে রক্ত তরবারি?

মানব কেমন স্বভাবত
এই কথা কি ঠিক
দেশ-সময়ের মানুষমনের সহজ প্রকাশে
করুণা স্বাভাবিক?

আমার চোখে ভেসে ওঠে করুণা এক নারী:
হাত দুটো তার ঠাণ্ডা শাদা—তবুও উষ্ণতা
প্রিয়ের মতন। কাম তবু আজ প্রিয়তর নিরিখ পৃথিবীর:
স্থূল প্রগল্‌ভ বিষয় ব্যবহার ও কথা।

সবের চেয়ে সুখের বিষয় ভেবে
রন্ধ্রে ঋণে উন্মাদনায় পুরুষার্থ লভি;
জীবনে আরেক গভীরতরভাবে
ঢুকেও তো আজ তা অ-প্রেমই স্বভাব।

পিরামিড ও এ্যাটম আগুন অধীর প্রাণনার
উৎসারিত রাষ্ট্র সমাজ শক্তির রচনায়
প্ল্যান কমিশন কন্‌ফারেন্সের বৃহৎ প্রাসাদে
হঠাৎ মহাসরীসৃপকে দেখা যায়।

রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী

এ অন্ধকার জলের মতো; এই পৃথিবীর সকল কিনার ঘিরে
নরক নগর তাপী পাপীর শান্ত শুশ্রূষায়
কোথার থেকে এসে কোথায় লক্ষ্যে চলে যায়;
সকল উত্তেজনায় আসে স্নিগ্ধ শরীরে।

কে ব্যাহত পাখির মতো প্রাণাকাশে ওড়ার পথে সময়শায়কে;

কারা কোথায় আলোককণার মতন, সূর্য হতে
জন্ম পেয়েই হারিয়ে গেছে অন্ধ রক্তস্রোতে;
বুদ্ধিজীবী নষ্ট হল কোথায় মনের গোলকধাঁধার ছকে—

সবের কাছে নিরভিমান রাত্রি এসে নমিত হতে বলে;
কথা ভাবায়; কথা ভাবার সর্বনাশে শান্তি কোথায় আছে?
তবু এসো অনেক কাজের পরে অন্তরাশ্রয়িতার কাছে;
মৃত্যু ঘুমের অতীত ব্যথা ক্ষয় পাবে কি সহজ সরলে?

এখানে কোনো আকাশসারী ইন্দ্রজাল নেই;
এখানে কালের সিঁড়ির 'পরে মধ্যপথে অগম সিঁড়ির দিকে
তাকিয়ে বিষয় ভেবে নিতে হয়েছে নতুন যানের প্রতীকে;
মৃত্যু নেই, মায়া নেই, ইতিহাস অমোঘ তবু ঠিক এ কারণেই

ক্লান্তি নেই; মনোনদীর দু পার ঘিরে ছাউনি পড়েছে।
এপারে এরা জীবনপ্রেমিক : ঘোষণা করে বলে;
ওপারে ওরা এই পৃথিবীর নিষ্পেষিত নরনারীর দলে;
সিদ্ধি চায়: গণনাহীন মৃত্যুসেনা হাজির করেছে।

অনেক বিনাশ সাঙ্গ হলে অন্ধকারে নতুন জাতক, চল
তবুও অনেক প্রাণের প্রয়াস ঝরনা প্রেম সহিষ্ণুতা আলো
দেখেছে আবার নবনবীন নৈরাশ্যে হারাল;
নাবিক ক্লান্ত: নদী কি নিষ্ফল?

অন্ধকারে হৃদয় এখন নিজের কাছে থেমে
আশা আলো হারিয়ে যতই শ্লেষ পরিহাস শক্তিতে কঠিন
হয়ে সন্ততিদের কাছে পিতৃলোকের ঋণ
আঁধার জলাঞ্জলি ভাবে—ততই নদী জনমানব প্রেমে

নিহিত হয়ে নতুন জলকণিকারাশি বানিয়ে নিতে চায়।
আবার কি তা রক্তকণা হয়ে গেল? ক্ষালন ক'রে অন্ধকারে জ্ঞানী
হয়ে সে দেখছে ইতিহাসের বিরাট হয়রানি
নবীন বীজের মতো আজও মানবতার বিবর্ণ আত্মায়।

আশা, অনুমিতি

সূর্যের আকাশের মতো মানুষেরা অনুভাবনায় স্থির
এক আশ্বাস রয়ে গেছে পৃথিবীতে,
রয়ে গেছে আমাদের হৃদয়ে যে এই
ইতিহাস পৃথিবীর রক্তাক্ত নদীর কেবলই আয়ত
উৎসারণ অন্ধকারে নিজেরে প্রচুর ক'রে তবু

স্তিমিত হয়ে পড়ে;
নতুন নির্মল জলকণিকারা আসে
নক্ষত্রের সূর্যের নীলিমার মানবহৃদয়ের
আশ্চর্য রেবার হিল্লোলের মতো।
সময় যা আচ্ছন্ন করেছিল তাকে সময়সংক্রান্তির পারে
মৃত্যু যা নিশ্চিহ্ন করেছিল তাকে উজ্জ্বল বস্তুপুঞ্জে
জাগিয়ে তুলবার জন্যে দেখ
সচেতন হয়ে জেগে উঠে মানব:
চারি দিকে উন্মুক্ত সূর্যের
অন্তরালে সূর্যের
আলোর নক্ষত্রেরা রাত্রির নগরীর জ্ঞানের
অন্তহীন পরিচ্ছন্ন পবিত্রের ভিতর।

মহাগ্রহণ

অনেক সংকল্প আশা নিভে মুছে গেল;
হয়তো এমনই শুধু হবে।
আজকের অবস্থান ফুরিয়ে যাবে কি।
নতুন ব্যাপ্তির অনুভবে?
মানুষ এ পৃথিবীতে ঢের দিন আছে;
সময়ের পথে ছায়া লীন
হয় নি এখনও তার, তবুও সে মরুর ভিতরে
একটি বৃক্ষের মতো যেন যুক্তিহীন;

সফলতা অন্বেষণ ক'রে
হারিয়ে ফেলেছে প্রাণ, নিকেতন, জল;
প্রেম নেই, শূন্যলোকে সত্য লাভ তার
অর্ধসত্য অসত্যের মতন নিষ্ফল।
ভুলের ভিতর থেকে ভুলে
গ্লানির ভিতর থেকে গ্লানির ভিতরে
মানুষ যে গ্রহণের সূর্যে চলেছে
তা তবে শাশ্বত গ্রহণ সৃষ্টি ক'রে।

অন্ধকারে

অন্ধকারে থেকে থেকে হাওয়ার আঘাত মাঠের ওপর দিয়ে
স্মরণ করায় আজকে কারা মৃত;
তাদের স্মৃতিবার্ষিকী আজ নদী পাথর ঘাস পৃথিবীর মনে
ধীরে ধীরে হতেছে বিবৃত।
এ সুর ভালো; পৃথিবীতে তবুও এক প্রেম রয়েছে তার
সুসমাচার ছায়াপথের নক্ষত্রদের মতো,

নারী ও তার পুরুষ নিয়ে—ইতিহাসের রাত্রি নিভিয়ে,
আকাশআশার শীর্ষে ওরা হয় না আহত।

তবুও আঁধার চুপে চুপে সকলই গ্রাস করে ফেলে, নারি,
সে শীত শুধু সেন্টিগ্রেডের নয়;
সে অন্তিমতা সে শূন্যতা কে জানে কোন্ অর্থপ্রবীণ সময়প্রকৃতির:
তুমি জান, তোমার মুখে তাকিয়ে মনে হয়।
প্রকৃতি তখন তোমার নাভির ভিতরে আমি লীন
হয়ে আছি দেখে
অন্তবিহীন অন্ধকারের জন্মদান করে
অমৃতযোগ অন্ধকারের থেকে।

অনেক কাজ হয়েছে সারাটা দিন অনেক প্রেম–জীবনজয় আলোর প্রেরণা
বধ করেছি। সুদীর্ঘকাল জেগে
অনেক শনি শেয়াল শকুন জ্যোতির্ময় ঘোষণা করা গেছে।
আবার সকল মুছে ফেলে বিঘূর্ণনের বেগে
যযাতিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেছে জীবনরাজ্য থেকে।
অসূয়া অসারতা দ্বিধা ঘুচিয়ে নতুন দিন
জাগাতে চেয়ে নানা স্কুলের গণনাহীন ক্যাম্প খুলেছে যারা—
তাদের হয়ে ত্রিশঙ্কুকে বিঁধিয়েছি বড়্কিন্।

দেখে গেছি শতাব্দীময় রক্তনদীরাশির দুরত্যয়
আত্মপ্রসাদ ভেঙে দিতে প্রাণের নদী এসে
পড়ি পড়ি ক'রে নিখিল আত্মীয়তায় পড়ল ঝড়ে প্রায়;
দেখে গেছি করুণ ইতিহাসকে ভালোবেসে
আসি আসি ক'রে প্রাণের সাহস সূর্য সকাল এল প্রায়;
কিছুই তবু এল নাকো; সময়কে যা দেবার সবই দিয়ে
কোটি আলোকবর্ষ পরে আকাশ, তোমার মনের কথা আজ
পেয়েছি অনাথ আমায় সুদর্শনাকে বুকে নিয়ে।

অমৃতযোগ

জন্মেছিল—চেয়েছিল—ভালোবেসেছিল
কম বেশি প্রাণকল্যাণে
মানুষ এ পৃথিবীর মানুষকে; তবু
মৃত্যুরই পূর্ণতর মানে।

তা হলে সময় আজ তুমি।
সময়সিন্ধুর মতো রূপে
এখানে শিশির থেমে আছে

ঘাসের বুকের 'পরে চুপে।

আমিও অনেক শূন্য অনুশীলনের
ধাঁধার ভিতর থেকে উঠে
হংসের ডানার মতো আজ
নীড়ের হংসীর পক্ষপুটে।

এখানে মরণশীল হংস নেই আর;
আর পাখপাখালির নীড় নেই গাছে;
এখানে পৃথিবী নেই, সৃষ্টি নেই, তুমি
আমি আর অনন্ত রাত্রির বৃক্ষ আছে।

তিমির সূর্যে

বাহিরের থেকে ফিরে এসো
তবুও বাহিরে থেকে যাও;
হৃদয়ের ভিতরে ঢুকেও
তবুও দাঁড়াও
সেইখানে নগরীর শূন্যে সূর্য এসে
মানুষকে প্রত্যহের উপাদান নিতে
ডেকে নেয় সম্ভাবনার পৃথিবীতে
তিমির সূর্যের মতো রোজ।

ঢের পথ চলে গেছে মনে হয়েছিল
হিসেবে সঠিক মূল স্বর্গের পানে;
অতীতের কুয়াশায় এরকম বোধ হত, তবু
আজকে ভাবছি এই মরুভূমি প্রাণকল্যাণে
স্নিগ্ধ হবে? হে শতাব্দী, হে নিবিড় মরুবৃক্ষ, জেগে ওঠো তুমি
শরীরের সময়ের শেষ নিরন্তর অগ্রসরে;
ফিরে এসো প্রেম-যুক্তিপ্রেমের ভিতরে;
স্বপ্নের ভিতরে যাও : বস্তুর ভিতরে।

মহাপতনের ভোরে

কেবলই স্বপ্নের ক্ষয় হয়;
তার কোনো ক্ষয় নেই, চারি দিকে চলেছে সময় :
বন্দরের কুয়াশায় কোলাহলে,
পৃথিবীর কোল থেকে অবিরাম উৎসারিত জলে,
এরিয়েলে ধ্বনির প্রবাহে,
অন্ধকারে অন্তহীন মানুষ বা মাছির পতনে,

কন্‌ফারেন্স প্ল্যান কমিশনে।
নগরীর শক্তি নষ্ট হয়ে যায় চারি দিকে—
কেবলই গ্রামের ধ্বংস হয়;
ফুটপাথে পাটাতনে ছোটো বড়ো মাঝারি অগণ্য পরিসরে
সৃষ্টির ও পৃথিবীর ভয়াবহ শূন্যের ভিতরে
প্রেম আছে, ভাবে ওরা, বুঝি সব অপ্রেমের বীজ নষ্ট ক'রে!
কিন্তু তবু কোথাও এখনও শেষ যতি
ছেদ ক'রে মন্তব্যে মননে স্থির গতিপ্রেম আছে?
মানুষের ইচ্ছা চিন্তা সংকল্পের আঁধার আলোর সেতু ঘিরে
ক্লান্তি ব্যথা কুজ্ঝটিকা ঢের
সত্যের ও মৃত সত্যের;
ইতিহাসে পর্ব শেষ হয়ে গেলে সেই মহা দায়ভাগ প্রাণে
নিয়ে ছোটো আকাশের মতো বড়ো নীলিমা সন্ধানে
চলে যায় মানুষেরা ইতস্তত বলয়ের দিকে;
অসত্যের থেকে সত্যে ?—
আশার স্পন্দন ঘিরে রেখেছে এখনও পৃথিবীকে।

পৃথিবী, জীবন, সময়

কোথায় সে যে রয়েছিলাম—

আজকে মনে হয়
সাগর দেখে আরো বৃহৎ আলো
দেখেছিলাম—ঠিক তা সাগর নয়।

প্রশান্ত না কৃষ্ণ বেরিং ভূমধ্যলীন ভারত মেরুসাগর তাকে বলে
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে
একটি ঘোড়া সূর্য হয়ে জ্বলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিল;
মনে পড়ে মাছের ঝাঁকে গহন সাগর জল,
ফেনার হাওয়ায় ফসকে শাদা পাখিগুলো দুরন্ত উজ্জ্বল
নীল কি রৌদ্র? রৌদ্র কি নীল জলের কোলাহল!

গভীর স্বনন; কানে পেতে সেই সুর
মনে হত এই পৃথিবীর অনেক পরের যেন
জাতক পৃথিবীটির মতন দূর—
আজকে তোমার ইচ্ছা চিন্তা শপথ আর-এক রকম সুদর্শনা,
ধুলোকণা এখন আমি—কালের জলকল্লোলে জলকণা।

মনে পড়ে সেই কবেকার গভীর সাগর কী এক্ নিখিল বৃক্ষ থেকে ঝরে,

অন্ধকে চোখ দান ক'রে রোদ ক্রন্দসীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে;
দুপুরবেলা সূর্যালোকের থেকে নেমে অতিথিদের মতো
অসংখ্য সব শাদা পাখি সহসা ঘুম ভেঙে
দিয়েছে বলে মনে হত;
সাগর আলো পাখি নীরব চারি দিকে—বৃক্ষে নির্জনতা;
কে যেন ডেকে নিত আমায়
কে যেন ডেকে নিত তোমার কাছে,
সে যেন ডানা টিউব ট্রেন রাডার-প্লেন টেলিপ্যাথির গতি
ছাড়িয়ে নীল আকাশে এসে নীল আকাশের নিজের পরিণতি।

মাঝে মাঝে পাখির মতন
শিশির ঝরার শব্দ—বিকেল;
আলোও নিজে কেমন যেন অন্ধকারের মতো।
সময় এসে আমার কাছে একটি কথা জানতে চেয়েছিল,
তোমার কাছে একটি কথার মানে;
আমরা দুজন দু দৃষ্টিকোণ দিতাম তাকে হেসে
একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে।

এ সব অনেক আগের কথা—অনেক চিহ্ন চিন্তা রীতির ক্ষয়
হয়ে গেছে তারপরেতে—মানুষকে সব বুঝে নিতে হয়।
কোথায় এখন সে সব আকাশ নক্ষত্র রোদ সত্য উজ্জ্বলতা:
পাখির সাথে মহাপ্রাণের বৃক্ষে পাখির কথা!

এসো জাগো হৃদয়, তুমি বিষয় জেনেছিলে;
গিয়েছিলে অনেক দূরে স্থির বিষয়ের দিকে;
সে সব আলোয় গ্রহণ করো আরেক রকম ব্যবহারের মানবপৃথিবীকে।

নিজেকে নিয়মে ক্ষয়

নিজেকে নিয়মে ক্ষয় করে ফেলে রোজই
চলেছে সময়;
তবুও স্থিরতা এক রয়ে গেছে,
সময় ক্ষয়ের মতো নয়।

অঘ্রানের সকালের আবছা আভার
মতন অসংখ্য কুয়াশায়,
আশ্বিনে আকাশ রোদ মাঠের ভিতরে,
নদীর বিস্তীর্ণ জলে, অথবা ঝড়ের বড়ো ভোরে,
শীতকালে সুস্থির বিকেলে,
মনে হয় আজ
পৃথিবী অনেক মূল্য, সত্য ভুলে গেছে;

সত্যে স্থির হয়ে আছে টের পাই তবু:
তোমার আমার নীড় প্রকৃতির পর্দার থেকে ভেসে চোখে
একটি অমেয় মূল্যে যত দিন আলো ক্ষয় হতেছে আলোকে।

জীবনবেদ

অনেক বছর কেটে গেছে,
আরো কিছু দিন চলে যাবে;
ফুরিয়ে ফেলেছি নীড় শিশির অনেক,
আরো রৌদ্র আকাশ ফুরাবে,
অনেক চিহ্নিত গাছ মাঠ স্তম্ভ জনতা বন্দর
আছে, তবু কাছে নেই আর;
মনন–আভার মতো ঘিরে
রেখেছে সে সব অন্ধকার।

শরীরের থেকে শক্তি ক্ষয়ে
গলিত মোমের মতো যাবে
ক্রমে আরো ক্ষমাহীন অগ্নির ভিতরে;
বিষয়ের থেকে দূর বিষয়ে হারাবে
মানুষের ক্ষুধাতুর মন;
প্রেমের বিষয়ে তবু স্থির
হয়ে থেকে ভয়াবহ ইতিহাস কিছু স্নিগ্ধ ক'রে
নিভে যাবে মনন শরীর।

শত শতাব্দীর

মানুষ অনেক দূর চলে যায়—চলে যেতে চায়
নক্ষত্রের আকাশ–অগ্নির মতো জ্ব'লে;
তবু কেউ অভিজিৎ ধ্রুব স্বাতী লুব্ধক নয়;
মানুষের সেই সব সাধ শান্ত হলে
ঘিরে থাকে সঙ্গী দায়ভাগিনী পৃথিবী;
কিছু তার বরফের গন্ধে স্নিগ্ধ হয়,
কিছু সূর্যকরোজ্জ্বল ক্রান্তিবলয়,
সমুদ্রের ফেনশীর্ষ নীল কল্লোল।

ইতিহাস কত প্রাণবত্তার কথা
ভেবেছিল; সময়ের অন্ধকারে আজও রোজ ভাবে।
সৃষ্টির প্রাণের উৎস যেন
রয়ে গেছে মানুষের সহজ স্বভাবে :
কখনও এঞ্জিন ডাইনামো প্রপেলারের উদ্রেকে মনে হয়।

তবু চোখ খুলে রেখে আশ্চর্য সংজ্ঞানে
ভয় থেকে আরো ভয় ভুল থেকে ভুলে
ছিন্ন বন্যমরালের মতন সে উড়ছে অকূলে।

মনে হয় মানুষের তবু এই শেষ
পরিণতি হয়তো বা নয়;
যদিও ধর্ম ত্যাগ করেছে অনেক দিন আগে
তার সেই অতীতের মুদ্রার অভয়,
সমাজ স্বতোৎসার হারিয়ে নতুন
অনুশীলনের শক্তি ক্ষয় ক'রে ফেলে
অন্ধ তৎপরতার শূন্য লাভ ক'রে আজ
লক্ষ্যহীন ব্যক্তি আর জাতির সমাজ।

চারি দিকে মানুষ চলেছে সব গ্লানি
অন্ধকার তাপ ভয় দুঃখের আকাশে;
সময় ও বিষয়ের সহিত সংঘর্ষে
মরণ ও জীবনের যে দ্বয় মূর্তি ইতিহাসে
জাগে তারা মানুষকে জেনে নিতে বলে;
আত্মসমাহিত হয়ে নিতে;
কোথাও স্বর্গে নয়—এ নিরভিমান পৃথিবীতে;
যেতে বলে গতি ও জ্ঞানের মর্মস্থলে।

সমস্ত দিন অন্ধকারে

সমস্ত দিন অন্ধকারে রৌদ্র ঢেলে অই
পশ্চিমে নীল হলদে মেঘে সূর্য এখন জ্যোতি,
ম্লান হয়ে যায়; নদী অবোধ, তবু অনেক দ্যোতনা তার মর্মস্পর্শী ঠিক;
পাখিও ঠিক তেমন অবুঝ আন্তরিকতায়;
এখন তারা শেষ সোনালি রোদের বিচ্ছুরণে
কিছুই তেমন বলে নাকো—শুধু বলে : 'অধঃপতিত
মানবতা আজকে, তার আত্মবিচার তবু কি সচেতন?
আমরা সবাই পটভূমির ছবির মতো, আধেক বুঝেছি তার মন।'

চারি দিকে নীল হয়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে

চারি দিকে নীল হয়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে দেখে
সাগর ও অরণ্যের সুর শুনে শুনে
মানুষের জন্ম হয়েছিল প্রসবিনী পৃথিবীর
অন্ধকার নিরক্ষর প্রাণের আগুনে
বিহ্বল শীতের রাতে কবে।

তারপর কত দিনরাত্রির ক্ষয়
হয়ে গেল; অগ্রসর হৃদয়ের অগ্রসর নয়
প্রেম-অপ্রেমের মতো,আমাদের জ্ঞানরুচিহীন।

মনবিহঙ্গম

ঢের যুগ নিষ্ফল হয়েছে;
এরকম কেবলই কি হবে?
ইতিহাস কেবলই কি অন্ধ পরীক্ষার
অন্ধকারের অনুভবে?
আশার সঞ্চারে সূর্য আলো,
আকাশের পারাপার নীল
হলেও অজ্ঞান নিয়মের
চাকায় কি ঘুরছে নিখিল?

শাদা আর কালো রঙে মাখা পৃথিবীর
কোলে আজ মানুষের স্থান
পুড়ে কি ছাইয়ের মতো কালিমা হয়েছে?
কোথায় প্রাণের বৃক্ষ তবু, আহা, মরুকল্যাণ?
ধূসরতা স্নিগ্ধ ক'রে জল?
সময় ও সময়ের আত্মা চাতক
সূর্যের অনলে বাষ্পে ক্ষয়
পেলে কি অমিয় হবে অগ্নিবলয়।

*

কারা কবে কথা বলেছিল,
ভালোবেসে এসেছিল কাছে;
তারা নেই, তাদের প্রতীক হয়ে তবু
কয়েকটি পুরোনো গাছ আছে;
নক্ষত্রেরা রয়ে গেছে নদীর ওপরে;
চারি দিকে প্রান্তর ও ঘাস,
দু-চারটে ঘর বাড়ি নীড় ও শিশির,
কূলে কূলে একলা আকাশ।
যারা ছিল তারা কেউ নেই ;
জীবন তবুও এক শান্ত বিপ্লবী,
স্থির আগুনের মতো অবিরল আলোক দিতেছে
সে আগুনে আলো ছাড়া দহে যায় সবই।

*

নিশ্চিত মৃত্যুর শূন্য আঁধারের আগে
হে নিঃসঙ্গ বৃক্ষে মনবিহঙ্গম তুমি,
দেখেছিলে জেনেছিলে ভালোবেসেছিলে;
দ্রুত পরিবর্তনের মতো পটভূমি

পৃথিবীতে মানুষের আসাযাওয়া তবু;
শীগগিরই এ মাটির নিজের স্বভাবে
মিশে সব লোভপ্রেমযুক্তিহীন ধুলো হয়ে যাবে
প্রকৃতির কত শত অনন্ত অমিয়ে।

নিবিড়তর

হৃদয়ে যে স্রোত আছে অন্ধকারে লীন
হয়ে আছে ভেবে মন উড়ে যায় যেন নভোহাঁস;
শাদা বালিরঙা ডানা অনন্ত রোদ্দুরে
জ্বেলে দিয়ে হতে চায় আকাশে আকাশ।

হয়ে যাক একরাশি অগ্নি আর নীল,
কোনো দিকে নেই কোনো বাধা;
হয়ে যাক দুপুরের সূর্যপুরুষের
মতো অগ্নি—অন্তহীন অগ্নিজন্মদাতা।

শীত সমীচীনতায় ঘর বেঁধে, তবু
সময়ের অন্ধকার গ্রন্থি খুলে ফেলে
নব নব ক্রান্তিবলয়ে কি উজ্জ্বল প্রাণ?
অথবা কি মৃত্যু তার সূর্যে শূন্যে শেলে?

রাত্রির আঁধার ভেঙে তবুও প্রাণের এই বিদ্যুৎগতির
শব্দই নিবিড়তর শব্দ ইতিহাসে;
মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে উড়ে যাওয়া,
সূর্য নেই, তবু সেই অয়নের সূর্যের বিশ্বাসে।

নদী

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য-এক আঁধারের দিকে
মুখ ফেরাবার আগে—
কয়েক মুহূর্ত কাজ কথা চিন্তা রয়েছে এ জীবনের।
দেখেছি সূর্যের আলো, নিয়ন বাতির বিচ্ছুরণ,
অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ শেল,
ক্লান্তিহীন ক্রেন, এরিয়েল।

হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণ সাগরগামী হরিয়াল বুনোহাঁসদের

রাশি রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
দেখেছি— জেনেছি অনেক দিন।

মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলের অন্তিম রহস্যসুতো নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের বিবরণে বারবার হয়।

মনে হয় যেন মানুষের মন তবু
দুই কালো বালুতীর ভেদ করে ফেলে
চলেছে নদীর মতো—
চারি দিকে জনতার সকাতর কোলাহল, ঘর বাড়ি সাঁকো
জন্তুর ও মানুষের করুণ পায়ের চিহ্ন প্রশ্নের চিহ্ন সব
পরিতৃপ্ত করে দিতে গিয়ে রূঢ় ইতিহাসধারাকে করেছে অনুভব।
চলতির চোরাবালি ভেদ করে পাতালের সূর্যালোকে মানুষের মন
আলো ভালোবাসা চেয়ে ভুল করে ঘোরে কি এখন?—
পাখির সংগীত এক মুক্ত সমুদ্রের শব্দ দীপ্ত সূর্য কাছে
আছে তবু সে নদীর যত দিন না থেমে চলার শক্তি আছে।

রশ্মি এসে পড়ে

রশ্মি এসে পড়ে—ভোর হয়,
ঝেঁজে ওঠে পাপীতাপীদের গালাগালি;
চারি দিকে মানুষের মৃত্যু হয় মাছির মতন;
মনে হয় অন্তরীক্ষে সৃষ্টির মরালী
হয়ে যেতে—তুমি যদি সে রকম আশ্বাসের দেশে

রয়ে যেতে; কিন্তু তুমি আমি
আজকের চেতনার ইতিহাসবহনের পথে
রক্তাক্ত নদীর অনুগামী
নদীর ভেতরে অন্য স্বচ্ছতার যে অনুশীলন
মাঝে মাঝে দেখেছি তা ইতিহাসে প্রেমিকের মন।

যাত্রা

কত দিন হয়ে গেল—
কত বার কাঁচা ধান কার্তিকের সূর্যে গেল পেকে;
পউষের চাঁদে পড়ে ঝরে গেল,
খড় শুধু পৃথিবীর মুখখানা ঢেকে

রয়ে গেল ; আবার খড়ের দিন এল;
অঘ্রান চাঁদের শাদা ঠাণ্ডা শরীর
আবার দাঁড়াল এসে এই পৃথিবীর
শূন্য প্রান্তরের পাশে।
চোখ না চাইতে বিশ-পঁচিশ বছর
হয়ে গেল; মহান বলয় নেই, নেই নেই বলয়ান্তর;
কিছু নেই; কত পাখি ছেড়ে গেছে এই শিশু জামরুল বন;
আজকের ঘুঘু ফিঙে নীলকণ্ঠ পাখি—তবু সেই সব অন্তর্হিত পাখির মতন
তাদের ভিতরে যেন কবেকার আলোকের দৌত্য আর নেই;
কোথায় হারাল সব—মননের মুহূর্তের বাতি নেভাতেই
পঁচিশ বছর আগে পৃথিবীতে;
প্রতিশ্রুতি এক দিন ছিল। তবু চারি দিকে অন্য সূচনার
অস্পষ্ট গ্লানির শব্দ শোনা যায় আজ;
নির্বিচারে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলে তবুও আবার ইঁটপাথরের ঢিবি
গড়ে ওরা বন্দরের নগরের;
এক দিন ধানক্ষেত মাঠ চাঁদ এঞ্জিন ডাইনামো প্রপেলারের পৃথিবী
আরেক রকম যেন পরিণতি চেয়েছিল এই :
চিল হরিয়াল ভোররাত্রির যাত্রীর এয়ারোপ্লেন মেঘে
ঘর বাড়ি সাঁকো স্তম্ভ মানুষের আসাযাওয়া সারা দিন জেগে
কাজ করে গেলে ব্যাপ্ত সময়কে সব
নীরবে গোছাতে দিয়ে তবু যা সত্য হয়ে ফলে
হৃদয়ে জ্ঞানের দেশে—সে প্রতিভা আভা প্রেম আশা;
নষ্ট হয়েছে; আছে যাত্রা—যাত্রা—এখনও যাত্রার ভালোবাসা।

সূর্য নিভে গেলে

সূর্য, মাছরাঙা, আমি

উত্তীর্ণ হয়েছে পাখি নদী সূর্যে অন্ধ আবেগের
দু মুহূর্ত আনন্দের পরীক্ষায় বুঝি।
তারপর লাল নীল কমলা পালকের পরে ঠিকরিয়ে রোদ
নিভে গেছে; আমি কেন তবু সূর্য খুঁজি।

তুমি

জানি না কোথায় তুমি—সূর্য নিভে গেছে;
তোমার মননে আজ স্থির
সন্ধ্যার কুমোর পোকা—বাঁশের ছ্যাঁদায় ঘুন—
শাদা বেতফলের শিশির।

আছে

'নেই—নেই—' মনে হয়েছিল কবে—চারি দিকে উঁচু উঁচু গাছে,
বাতাস? না সময় বলছে; 'আছে, আছে।'

অঘ্রানরাত

অনেক অনেক দিনের পরে আজ

অন্ধকারে সময়পরিক্রমা
করতে গিয়ে আবছা স্মৃতির বইয়ের
পাতার থেকে জমা—
খরচ সবই মুছে ফেলে দিয়ে
দানের আয়োজনে নেমে এল,
চেয়ে দেখি নারী কেমন নিখুঁতভাবে কৃতী;
ডানা নড়ে, শিশির শব্দ করে
বাহিরে ঐ অঘ্রান রাত থেকে;
এ সব ঋতু আমার হৃদয়ে
কী এক নিমেষনিহত সমাহিতি
নিয়ে আসে; ভিতরে আরো প্রবেশ ক'রে প্রাণ
একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি
লীন দেখেছে, গভীর পাখি গভীর বৃক্ষ তুমি।

যাত্রী

মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ
হয়ে গেলে র'য়ে যায় চারিদিক ঘিরে এই দেশ;
নদী মাঠ পাখিদের ওড়াউড়ি গাছের শিয়রে
কমলা রঙের ঢেউয়ে এসে কিছুক্ষণ খেলা করে।

মনে হয় কোথাও চিহ্নিত এই রৌদ্র ছিল কবে;
মানুষ সার্থক নয়—তবুও সার্থকতর হবে:
মনে হত কাজ ক'রে কথা ব'লে গ্রন্থ মিলিয়ে,
মননের তীর থেকে আরো দূর তীরতটে গিয়ে।

সময় নিজেই তবু সবচেয়ে গভীর বিপ্লবী;
ফুরিয়ে ফেলেছে সেই দিন রাত্রি সেরা সত্য-উদ্‌ঘাটন সবই;
সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তেজিত রক্ত স্থির
ক'রে ফেলে অন্য নব কলেবরে গড়েছে শরীর।

বাহিরে ভিতরে লীন হয়ে থাকে মন,
শান্ত—আরো শান্ত হয় অন্তঃকরণ;
পুরনো দিনের স্তম্ভ দু-চারটে পশ্চিমের আঁধারের কাছে;
নব সূর্যে সম্মেলন-যাত্রা—যাত্রা যাত্রা যাত্রা আছে।

হৃদয় তুমি

হৃদয় তুমি সেই নারীকে ভালোবাস, তাই
আকাশের ঐ অগ্নিবলয় ভোরের বেলা এসে
প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে অমেয় কাল হৃদয়সূর্য হবে

তোমার চেয়েও বেশি সেই নারীকে ভালোবেসে।
বাসুক—তবু সবের চেয়ে আলোর কথা এই:
আমি তাকে সময়পরিক্রমার পথে আবছায়াতে দেখে
নিজের মূল্যে রয়ে গেছে বলেই ভালোবাসি।
শরীর ঘেঁষে ভালোবাসে তবু তো অনেকে।

কাজ-অকাজের ঠাসবুনোনির ফাঁকের থেকে আমি
দেখেছি আমায়, দেখেছি যেন বিকেলবেলার জলে
থমকে ভাসা মেঘের মতো নীলাকাশের পথে
থেমে আছে; অথবা থেমে চলে
জানি না মেঘ; ভালোবেসে অথবা কুতূহলে
জানি না নারীসূর্য আমায় আলোকিত ক'রে
নিজের অস্তকক্ষে নেমে সূর্যপ্রক্রিয়ায়
চলে গেছে কাদের ভিতরে।

যে যার নিজের বিহিত কাজে। সকলই ঠিক—এইরকমভাবে
সারাটি দিন আমার হৃদয় ব্যাপ্ত করে রাখে।
স্বতই আমি যে গাল তিল যে হাত ভালোবাসি
রাত্রি হলে সে হাত—সেই সুদূর হাত এখনও আমাকে
জানি না বিশ্বশৃঙ্খলাকে আঘাত ক'রে ভালোবাসে কিনা;
সীমা সময় প্রকৃতি তাতে চূর্ণ হয়ে যেত;
সকলই তবু স্থির রয়েছে—এই স্থিরতা তবু
তোমার আমার অজাত সব শিশুরও অভিপ্রেত।

এই পৃথিবীর

এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে;
অঘ্রান মাস রাত্রি হলে অনেক বিষয়বিষের সমাধান
মাঠে জলে পাখির নীড়ে নক্ষত্রেতে থাকে;
অমেয় গোলকধাঁধায় ঘুরে প্রাণ
চেষ্টা করে সমাজ জাতি সময় সৃষ্টি সঠিক বুঝে নিতে।
সকল প্রয়াণ সফল হবে গ্লাসিয়ারের দীপ্তি আসার আগে;
এখন রৌদ্রে আজন্মকাল অনুষ্ঠানের দিন;
সফল হতে ইতিহাসের অনেক দিন লাগে।

সে সফলতা এই পৃথিবী—হয়তো সৃষ্টি চূর্ণ হলে হবে;
আমি অনেক দূরের থেকে তাহার কারণধ্বনি
নীল আকাশে জ্যোতিষ্কদের একে একে নিভে যেতে দেখে
সমাজ জাতি ধ্বংস হয়ে যেতেছে ব'লে শুনি।
জানি নতুন নক্ষত্রেরা আবার ফিরে এসে,
নতুন সমাজ শুদ্ধ ভাষা মানুষ সৃষ্ট হয়;

অসংখ্য কাল কেটে গেলে বোঝা যাবে হয়তো প্রেমের মানে
সেন্টিগ্রেডের ধারণাতীত হিমের ভিতর নয়।

এ সব তবু হেমন্তেতে স্তব্ধ হয়ে থেকে
সময় সেতু পেরিয়ে কথা ভাবা
আজকে তবু খণ্ডকালের শিশু আমি;—নারি,
তোমার কাছে জানিয়েছিলাম দাবি;
মহাকালের হাতের স্নিগ্ধতা যে ভালো ক্ষমাময়
অন্ধকারে শিশির পাতায় পালকে নীড়ে ঘাসে
আস্তে সে তা জানিয়ে যায়—যদিও রাতদিন
অবাধ রক্ত রয়েছে ইতিহাসে;

হয়তো তা-ই সত্যি, তবু আজকে রাতে আমি যে একা আছি
সে আধোগামী চিন্তাধারা থামিয়ে দিয়ে তুমি
জেনেছি এই নিখিলে শেষ একটি চেতনা;
অথচ কী ব্যাপ্ত অবচেতন মরুভূমি।
কোথায় তুমি রয়েছে আজ— সে কোন্ নাগর আলোর নয়নে
আজ সমাজের গলিত নাম তোমার মুখে উচ্চারিত হয়?
সে কোন্ মৃত উপগ্রহে সমভ্রমে উঠে
আজকে তোমার পদার্থে চিন্ময়।

তবুও অণু-পরমাণু হেতু রীতির কোথাও কোনো স্খলন হয় নাই;
সকলই ঠিক— তুমিও নিজে স্বাভাবিকতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে
নীলকণ্ঠ পাখিকে আজও আকাশ দেখাবে
তোমার নীলাম্বরীতে সব নীলিমা মুছে দিয়ে।
সূর্য জ্বলে-মেঘরা ভাসে— ঝাউ সিসু নিম প্রকাশিত হয়;

নদীর জলে সমস্ত দিন ক্রন্দসী উজ্জ্বল;
তোমায় আমি ভালোবাসি—এই সত্য স্বভাবপৃথিবীর
দানের মতন নিজেরই ফলাফল।

এখন এ পৃথিবীর

'এখন এ পৃথিবীর গোধূলিসময় আর আমাদের হৃদয়ের যেন বেলাশেষ—'
বলে সে তাকাল; চোখে করুণা রয়েছে তার;
আকাঙ্ক্ষার সে সব আবেশ
নেই আজ; বললে, 'কাঁকররাঙা পথ এই—এই পথ গেছে কত দূর?
শুকনো জামপাতাগুলো পড়ে আছে—এই সব পাতা আমি ভালোবাসি,
অঘ্রান মাসের গন্ধ লেগে আছে এ সব পাতায়
মাটি আর সূর্যের।—বাসনায় শুধু ক্লান্তি—আজ মনে হয়—।'
হাত তার মনে হল ভিজে হিম এক-আধ মুহূর্তের ছোঁয়ার ভিতর;

উষ্ণতা নেইকো চোখে—শান্ত আলো—দু-একটা ঝরা পাতা আধো-খসা বিনুনির 'পর
পড়ে আছে—
আমাকে সে: 'চলো ঐ ভরা ঘাসে ঐখানে প্রান্তরের পথে;
কমলা রঙের মেঘে নরম আলোর ঐ নিজের জগতে';
আকাশের থেকে যেন ধীরে ধীরে শান্তি ঝরে—পৃথিবীর বুকে যেন ধীরে;
দেখলাম শাদা হাত—কেমন সম্পন্ন হিম—স্নিগ্ধ সব রোমকূপ—নিখুঁত শরীরে
স্বভাবকে অতিক্রম করে ফেলে রক্তের ইঙ্গিত মুখে গালে
নেই আজ; হৃদয় শান্ত স্থির; পৃথিবীতে যেন কোনো কালে
রাত্রি ও ভোরের স্বচ্ছ সত্য যাতায়াত ছাড়া নেই আর কিছু;
দুজনে মাঠের পথে নেমেছি—হাঁটছি—চেয়ে দেখলাম মুখখানা নিচু;
দেখছে পথের দূর্বা ধুলো ঢিবি পাতা ঝাউফল;
তাকাতেই মৃদু হেসে ঘাসের কোলের থেকে লুটোনো আঁচল
তুলে শিশিরের জলে চলল মুছে ধীরে
প্রকৃতির পূর্ণ দানশীলতার মতো তার গভীর শরীরে
পাশাপাশি হাঁটছিল।—তখন নক্ষত্র ঢের এসেছে আকাশে।
আমার হৃদয়ে প্রেম—ধীরে ধীরে বাসনার নিশ্চয়তা আসে।
হয়তো তা বুঝেছে সে—তবু তার দিক থেকে যে চেতনা সাড়া
পেলে অর্থ পেয়ে যেত মানুষ মৃত্যুর অর্থ ছাড়া
সে প্রেম শরীর থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে আজ তার;
গেছে যে জানে না তা সে—এই মাঠ রাত্রি প্রকৃতির স্নিগ্ধতার
চেয়ে কোনো অন্য অপরূপ মূল্য আলো
বেশি যদি থেকে থাকে তার চেয়ে ভালো
সেই জ্ঞান আমার এ হৃদয়ের নিজের অমতে
তবু মুছে পাশাপাশি হেঁটে চলা নক্ষত্র ও শিশিরের পথে।

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে
চারিদিকে রক্ত ঋণ গ্লানি ধ্বংসকীট নড়েচড়ে।
তবুও শিশির সূর্য নক্ষত্র নিবিড় ঘাস নদী নারী আছে,
হারিয়ে যেতেছে প্রায় আজ।
মানুষের সাথে মানুষের প্রিয়তর পরিচয়
নেই নেই আর;
আলো আছে তবুও—আলোয় ভরে রয়েছে অনন্ত অন্ধকার।

কে এসে যেন

কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিল বাতি,
বললে, 'আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী
তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে;
তবুও দূরে স'রে গিয়ে তুমি

হারিয়ে যেতে চাও কি আত্মপ্রশ্নে ঘুরে-ফিরে?
অথবা জনগণসেবার ভিতরে শিশিরে
লুপ্ত করে দেবে কি জ্ঞানকামীর মরুভূমি?
সবের ওপর সত্য আগুন—অমেয় মোম শুধু,
আর সকলই শূন্য আশা, অন্ধ অনুমিতির মতন ধু ধু।'

নদী নক্ষত্র মানুষ

'এখানে জলের পাশে বসবে কি? জলঝিরি এ নদীর নাম;
অপরূপ; আমি তবু ঝাউবনী বলি একে'—আস্তে বললাম।
নদীর দুপারে ঢের উঁচু উঁচু ঝাউবন, নীড়—
চুপচাপ ঘাসের ওপরে বসে কিছুক্ষণ তারপরে আমরা দুজনে
কোনো কথা খুঁজে তবু পেলাম না আর যেন—
নদী যেন ঢের দূরে—আমাদের মনে
এ মুহূর্ত এ আকাশ নেই আর আজ;
বিষণ্নতা: তাও নেই—পাতা ঝরবার
স্বর শুনি, ঢেউ নড়বার শব্দ পাই;
এই পৃথিবীতে যেন কিছু নেই আর।

এক দিন—জানি আমি—সম্পূর্ণ আকাঙ্খা ছিল আমাদের মনে;
'নক্ষত্রের নীচে শিশিরের গন্ধ শোনায়েছি শুনেছি দুজনে
চোখাচোখি বসে থেকে; হাতে হাত নিশ্বাসে নিশ্বাস
না জানতে মিশে গেছে—যেমন মাটির গন্ধ হৃদয়ে ফোটাতে চায় ঘাস,
ধান খই দুর্বাঘাসে যেমন মাটির ইচ্ছা নিজেকে রাখতে চায় ঢেকে
এক দিন পৃথিবীর বিলোড়ন রৌদ্র রক্ত আহ্বানের থেকে
দূরে স'রে প্রেম আর আকাঙ্খার ঘরে ব'সে আমাদের ব্যাপৃত হৃদয়
আকাশ ও এ মাটিকে পেয়েছিল এক তিলে—' বললাম; আস্তে তখন
সে বললে—'শেষ সত্য নদী নয়, মন—'

আমি তাকে: 'হয়তো নতুন কোনো রূপে
আমাদের ভালোবাসা পথ কেটে নেবে এই পৃথিবীতে;
আমরা দুজনে এই বসে আছি আজ—ইচ্ছাহীন;
শালিখ পায়রা মেঘ পড়ন্তবেলার এই দিন
চারি দিকে;
এখানে গাছের পাতা যেতেছে হলুদ হয়ে—নিঃশব্দে উল্কার মতো ঝ'রে
এক দিন তুমি এসে তবু এই হলুদ আঁচল রেখে ঘাসের ভিতরে
শান্তি পাবে; সন্ধ্যার জলের দিকে শূন্য চোখে রবে নাকো তাকিয়ে এমন
অস্পষ্ট সংকটে এসে—মুখে কথা ফুরোবে না—এখন যা গভীর গোপন
প্রাণের চারণা পাবে অন্ধকারে; ব্যাপ্তি পাবে; যেই সব কথা
ভুলে গেছ—যে নিয়ম অনুভূতি কবেকার সহজ স্পষ্টতা
হারিয়েছে—নতুন জীবন পাবে তারা সব'—ব'লে মনে হল কোলাহল

মানুষের শোচনার শব্দ যেন; নদীদের অন্ধকার জল
জীবনকে স্থিরভাবে ব্যবহার করে নিতে বলে
প্রেমের নিকটে গিয়ে—কিন্তু অপ্রেমের ফলাফলে
নিজের জ্ঞানের গতির প্রবাহ থেকে চ্যুত হয়ে নয়:
যে রকম এই নদী আর এই নারী নিজ বাস্তবতা নিয়ে তন্ময়।

জীবনে অনেক দূর

জীবনে অনেক দূর সময় কাটিয়ে দিয়ে—তারপর তবু
চলার কিছুটা আরো পথ আছে টের পাই;
সুমুখে বিস্ময়—
দেখেছি সূর্যের আলো, মাঝে মাঝে জলের কম্পন;
আশ্বিনের ঘন নীল আশ্চর্য আকাশে
দেখেছি আরোহী হাঁস বাষ্পের ভিতর থেকে আসে
হংসীর অনিমেষ দেহ লক্ষ ক'রে,
মিশে যায় খুব স্বচ্ছ আলোর ভিতরে।

কোথায় ফুরিয়ে যায় তারা সব—[....?]
অগ্নির উৎসের মতো সৃষ্টির নির্ঝর থেকে জেগে
আমারও শরীর মন মিশে যেতে চেয়েছে আবেগে

নব হরিতের গান

চার দিকেতে হলদে কালো শাদার পৃথিবীর
ব্যসন বাতাস রক্ত কোলাহল
শান্ত ক'রে পথে মাঠে প্রাঙ্গণে ও ঘরে
মহাসরীসৃপের ছায়া পড়ে।

তবুও মাটি সাগর সূর্যে অমৃতস্বাদ আছে
জেনে মানুষ নিজেও হতে চেয়েছে সজ্জন;
ভাবনা ভাষা আবেগ কথা কাজ
নতুন নতুন চেতনা ও সত্যে হৃদয়মন

দান করেছে চীন বেবিলন কুরুবর্ষ গ্রীস;
মহাইয়োরোপের আমেরিকার ক্রান্তি গ'ড়ে
.ইতিহাসের অনেক পর্ব ফুরিয়ে গেল, তবু
এখনও সে মরুভূমির ভোরে

দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ একখানা মেঘ চায় ;
হৃদয়ে তার ভালোবাসার মেঘ কি তবু আছে?
মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো বারবার
ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ—নব হরিৎ গাছে।

দেশ কাল সন্ততি

চারি দিকে আছে ব্যস্ত নদীদের ক্ষণ
হৃদয়ের আত্মীয় নারীর মতন;
শঙ্খচিল উড়ে যায়—ঘরে ফিরে আসে;
ডানার ছায়ায় শব্দ ঘাসে।

এক পৃথিবীর ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে,
অন্য পৃথিবীর বুদ্ধি ক্ষয়ের সন্ধানে;
ইতিহাস কোনো দিনই নির্দোষ নয়;
কাজ করে চলেছে সজ্ঞানে।

তবু সেই ভয়াবহ সময়ের থেকে
ক্লান্ত ব্যর্থ পৃথিবীর ব্যক্তিদের ডেকে
জীবনের অন্য কোনো স্নিগ্ধ, কোনো স্থিরতর স্থল
পেতে হলে অন্বেষণ হবে কি নিষ্ফল?

জলের কণায় রৌদ্রে আকাশের মহাসনাতনে
নক্ষত্রে মিলিয়ে নিয়ে চেতনার অন্তঃশীল আলো
হয়তো বেদনা রক্তে জন্মাধীন মানুষের নষ্ট ইতিহাস
হতে পারে—মাঝে মাঝে হতে পারে ভালো।

দুটি তুরঙ্গম

আকাশে সমস্ত দিন আলো;
পাতায় পালকে রোদ ঝিকমিক করে;
জলগুলো চলে গেছে চেনা পথ ধরে
অবিরল আরো দূর জলের ভিতরে।

যদিও গভীরভাবে সময়ের সাগর উজ্জ্বল—
কী এক নিঃশব্দ নিবিড় আবেগে তাকে কালো
দুটি তুরঙ্গম যেন অনন্তের দিকে টেনে নেয়;
নিরন্তর এ রকম অগ্রসর হয়ে যাওয়া ভালো।

অনেক আঁধার আলো দেখেছি, তবুও
আরো এক বড় আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীরভাবে বোধ করে মন
আকাশ প্রান্তর পথ নক্ষত্রলোকের দিকে গিয়ে।

সারা দিন এঁকেবেঁকে নদীটির ঢেউ
মিশে যায় শাদা কালো রঙের সাগরে;

সারা দিন মেঘ পাখি উঁচু উঁচু গাছ
যেন প্রায় সূর্য স্পর্শ করে।

মৌমাছি রৌদ্র নারী শরীর ও মন
মুহূর্ত ও মহাকাল দুজনের কাছে
বারবার ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিপরিধির
ভিতরে নিবিড় অগ্নিশিল্প হয়ে আছে।

সব শেষ হয়ে গেলে তারপর থাকে
এত দিন যা জেনেছি তার চেয়ে ভালো
সমস্ত দিনের সূর্য—আর সেই সূর্যের বিদায়,
আঁধারের রঙে মাখা নক্ষত্রের আলো।

নগর বন্দর দিক জনতার পথে
ক্ষতি রক্ত ভালোবাসা ব্যথা জ্ঞান লাভ
ভালো, তবু সেই সব স্থিরতর করে নিতে হয়;
প্রকৃতি মানুষ আর সময়ের নিজের স্বভাব,

জেনে নিতে হয় নদী প্রান্তরের ঘাসে;
এ ছাড়া আর কী সত্য ইতিহাস জানে?
কিছু গ্রন্থ রীতি চিন্তা—দু-একটি নক্ষত্র নারীর
দিকে চেয়ে বোঝা যায় জীবন ও মৃত্যুর মানে।

নব নব সূর্যে

মানুষ সার্থক হয় মাঝে মাঝে, তবু
কত তার নিষ্ফলতারাশি
এখনও উজ্জ্বলতর বলে মনে হয়
মৃত ম্যামথের পাশাপাশি
মানবকে, তবুও নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তির জীবন
চারি দিকে ক্ষয় হয়ে আসে;
সকালের সম্ভাবনা মানুষকে সচকিত করে;
আলো ঠিকরালে তবু চোখে এসে পড়ে

শেষ শূন্য— কিছু নেই, বিকেল নিভছে।
যারা আশা করেছিল, কিংবা যারা আশা
করে নাই, যারা প্রাণে ভালোবাসবার
জ্ঞানী পরিভাষা
স্বায়ত্ত না করে তবু প্রেম
চেয়েছিল প্রিয় নরনারীদের কাছে
যারা শুধু বাঁচবার পথ চেয়েছিল...

শিশিরে নিঃশব্দ হয়ে আছে।

সাধনার হয়তো বা সত্য, শুভ লাভ
হতে পারে—এরা কেউ কেউ
সেই আভা দেখেছিল, তবু
অন্ধ অন্নসমস্যার ঢেউ
এসে সব মুছে ফেলে গেছে
ঘর বাড়ি সাঁকো মাঠ পথ
এক দিন আধ দিন ভাঙাগড়া হতে-না-হতেই
চিহ্ন নেই—সে সব মানুষ কেউ নেই।

জীবনের ঢের কাজ হয়ে গেলে তবু
ভাঙনের নদী এসে সমাজের দুই পার ক্ষয়
করে তার অন্ধকার সমুদ্রের দিকে
ভেসে চলে গেছে মনে হয়।
তবু গঠনের কাজে ফিরে এসে মানুষের মন
আগেকার গ্লানিমার যে নিষ্ফালন
বারবার শেষ করে দিতে চায় তার
সূচনায় আলো তবু ভিতরে গভীর অন্ধকার?

অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে বিলোড়িত হয়ে
রাত্রিদিন কাজ করে চলেছে লোকের ইতিহাস;
মানুষ সমাজ দেশ ধ্বংস করে তবু
জ্ঞান শান্তি বাস্তবতা প্রেমের আভাস

মাঝে মাঝে পাওয়া যায় যেন তার বিদ্যুতের কাছে;
যদিও আঁধার বড়ো—ইতিহাসে শোকাবহ অন্ধ বেগ আছে;
সংকল্প প্রেরণা মূল্য উদাসীন শক্তির মতন
ভেঙে—নব নব সূর্যে আলোকিত করে তোলে মন।

একটি নক্ষত্র আসে

একটি নক্ষত্র আসে ; তারপর একা পায়ে চ'লে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারা ভরা রাতে
সে আসবে মনে হয়; আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে!
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বর তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হতে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয়;
                    শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহের আলোড়নে

অঘ্রানের রাত্রি হয়;
এ রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;
চারি দিকে ঘর বাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড়;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

শতাব্দীর মানবকে

চারি দিকে কঠিন পটভূমি,
তার ভিতরে চলেছ আজও তুমি;
দুহাত দিয়ে মরণনদীর জল
সরিয়ে তুমি দেখেছ তার ফল
আবার আদি মরণে গিয়ে মেশে।

তবু সে বিনাশ এখনও দূরে আছে,
ক্রমেই কাছে—ঘনিয়ে আসে কাছে,
যেটুকু সময় রয়েছে তার ফাঁকে
এ দানবীয় অপপ্রতিভাকে
মানুষ ছাড়া ঘোচাবে কে আর এসে।

এরিয়েলের মতন আলোর-কালোর কিনার দিয়ে
কেবলই আশা—গভীর আশার বার্তা জাগিয়ে
নতুন আলো নতুন আকাশভাষা
মহাইতিহাসের ভালোবাসা
আনবে না তার রক্তক্ষয়ের শেষে?

কালের আলোয় দাঁড়িয়ে আছো ঘুমের চোখেই;
ইতিহাস বলেনি: ঘুম নেই ?
বিষয় আর হৃদয় শাদা-কালোর সাগরের
অসীম শাদা ? অসীম কালো ? পেলে না কিছু টের;
চলেছ তাই সকল প্রশ্ন-নির্বাপণের দেশে।

চিহ্ন শেষ করার আগে তবুও একবার
ফুরিয়ে দাও আজ পৃথিবীর মৃত্যুশীলতার
পণ্য গ্লানি নিষ্ফলতা মনে:
মানুষই সত্য বিশালতর আলোর প্রয়োজনে
চারি দিকের অন্ধ নদীর অসীম উন্মেষে।

পটভূমি

আকাশ ভ'রে যেন নিখিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা
জেগে আছে কূলের থেকে কূলে;
মানবজাতির দু মুহূর্তের সময়-পরিসর
অধীর অবুঝ শিশুর শব্দ তুলে
চেয়ে দেখে পারাপারের ব্যাপ্ত নক্ষত্রেরা
আগুন নিয়ে বিষম, তবু অক্ষত স্থির জীবনে আলোকিত।
ওদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন হয়ে তবু
মানুষ আজও স্বাধীনতার মূল্য শেখে নি তো।

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা
আমাদের আজ এনেছে যেই বিষম ইতিহাসে—
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে গরমিল
রয়েছে ব'লে কখনও পরিবর্তনীয় নয়?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হ'তে:
অনেক দীর্ঘ অসময়—অনেক দুঃসময়।

চারিদিকে সৈন্য বণিক কর্মী সুধী নটীর মিছিল ঘোরে;
তাদের সবের সহগামীর মতো
ইতিহাসের প্রথম উৎস থেকে
দেখেছি মানুষ কেবলই ব্যাহত
হয়েও তবু ভবিষ্যতের চক্রবালের দিকে
কোথাও সত্য আছে ভেবে চলেছে আপ্রাণ:
পটভূমির থেকে নদীর রক্ত মুছে মুছে
বিলীন হয় যেমন সে সব পটভূমির স্থান।

জর্নাল : ১৩৪৬

আজকে অনেক দিন পরে আমি বিকেলবেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে;
শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে—নেভে;
এখন অব্যক্ত ঘুমে ভরে যায় কাচপোকা মাছির হৃদয়;
নদীর পাড়ের ভিজে মাটি চুপে ক্ষয়
হয়ে যায় অক্লান্ত ঢেউয়ের বুকে ;

ঘাসে ঘুমে শান্ত হয়ে আসে ঘুঘু শালিকের গতি;
নিবিড় ছায়ার বুকে ক্রমে ক্রমে পায় অব্যাহতি
মাঠের সমস্ত রেখা;

ঝাউফল ঝরে ঘাসে—সান্ত্বনার মতো এসে বাতাসের হাত
অশ্বত্থের বুক থেকে নিভিয়ে ফেলছে খাড়া সূর্যের আঘাত;
এখুনি সে সরে যাবে পশ্চিমের মেঘে।

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠো পথে জারুলছায়ার নীচে নদীর সুমুখে
কতক্ষণ থেমে আছে; চেয়ে দেখ নদীতে পড়েছে তার ছায়া;
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধরে সেও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে;

এই সব নিস্তব্ধতা শান্তির ভিতর
তোমাকে পেয়েছি আজ এত দিন পরে এই পৃথিবীর 'পর।
দুজনে হাঁটছি ভরা প্রান্তরের কোল থেকে আরো দূর প্রান্তরের ঘাসে;
উস্‌খুস্‌ খোঁপা থেকে পায়ের নখটি আজ বিকেলের উৎসাহী বাতাসে
সচেতন হয়ে উঠে আবার নতুন করে চিনে নিতে থাকে
এই ব্যাপ্ত পটভূমি ; মহানিমে কোরালীর ডাকে
হঠাৎ বুকের কাছে সব খুঁজে পেয়ে।
'তোমার পায়ের শব্দ', বললে সে, 'যেদিন শুনি নি
মনে হত ব্রহ্মাণ্ডের পরিশ্রম ধুলোর কণার কাছে তবু
কিছু ঋণী ; ঋণী নয়?
সময় তা বুঝে নেবে...
সেই সব বাসনার দিনগুলো ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেই দিন;
মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কী যে :
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।'

স্পষ্ট চোখ তুলে সে সন্ধ্যার দিকে : 'কত দিন অপেক্ষার পরে
আকাশের থেকে আজ শান্তি ঝরে— অবসাদ নেই আর শূন্যের ভিতরে।'
রাত্রি হয়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতন
কী-এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হয়ে আছে এই মহিলার মন।
হেঁটে চলি তার পাশে, আমিও বলি না কিছু, কিছুই বলে না;
প্রেম ও উদ্‌বেগ ছাড়া অন্য-এক স্থির আলোচনা
তার মনে—আমরা অনেক দূর চলে গেছি প্রান্তরের ঘাসে,
দ্রোণ ফুল লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার—নিম-আমলকীপাতা হালকা বাতাসে
চুলের ওপরে উড়ে উড়ে পড়ে—মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভ'রে,
কঠিন এ সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে ক'রে।

অন্ধকার থেকে খুঁজে কখন আমার হাত একবার কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখে দিল তার : 'রোগা হয়ে গেছ এত—চাপা পড়ে গেছ যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—' বলে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিল ধীরে;
শান্ত মুখে—সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে

নদী নেই—হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে তার;
নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।

মৃত্যুসাগর সরিয়ে সূর্যে বেঁচে আছি

মৃত্যুসাগর সরিয়ে সূর্যে বেঁচে আছি, তোমায় ধন্যবাদ।
হে হেমন্ত, মাছি ফড়িঙ রোদের ভিতর দেয়ালি পোকা উড়িয়ে দিয়ে তুমি
এ ওড়া যে আবছা ক্ষণিক, মানুষের সেই কথা ভাবিয়েছ।
ইতিহাসের অনেক স্তরেই মৃত্যু মরুভূমি
রয়ে গেলেও মানুষ বিশাল বয়ঃপ্রাপ্ত অন্ধকারে আজ,
নিজের প্রাণশক্তি সর্বস্বান্ত করে আলো
যেমন চাইছে সময়—মানবমনে সূর্য কেবলই ক্ষয় হয়ে
তবুও নিখিল প্রাণের বৃক্ষ স্নিগ্ধ করে আলো।
পাখি পতঙ্গ জল
খেলছে যে যার সেই সবেরই অবোধ অসীম কালো।

রবীন্দ্রনাথ

'মানুষের মনে দীপ্তি আছে
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর—'
এ রকম কথা যেন শোনা যেত কোনো এক দিন,
আজ সেই বক্তা ঢের দূর

চলে গেছে মনে হয় তবু;
আমাদের আজকের ইতিহাস হিমে
নিমজ্জিত হয়ে আছে বলে
ওরা ভাবে লীন হয়ে গিয়েছে অন্তিমে

সৃষ্টির প্রথম নাদ— শিব ও সৌন্দর্যের;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশার প্রয়াসে।

কখনও নক্ষত্রহীন

কখনও নক্ষত্রহীন কুয়াশার রাতে
বাইরের ঝড়ের ঝাপসা আলোড়নের
অন্ধকার থেকে পাখি বাতির আলোয় উজ্জ্বল
ঘরের ভিতরে ঢুকে দু মুহূর্ত ব্যথা চিন্তা ভালোবাসা ভরা
মেঝেয় লক্ষ্মীর আল্পনা মেয়েদের

দেয়ালের ফ্রেস্কোর মূল্য বুঝে নিতে চেয়ে
ধুকধুকে বুকের অনন্ত শূন্যে তার
টের পায়–টের পায় যদি
একটি বিদ্যুৎ শুধু মানুষের মতো চেতনার
দেখা দিয়ে মিলোবার আগে
ব্যক্ত করে যায় বুদ্ধ পতঞ্জলি জানে নি যে মানে;
আমিও অনেক দিন পরে আজ তেমনই সকালে
তোমার–আমার—এই পৃথিবীর কারণের দিকে চেয়ে আছি;
ফল নয়—কোনো নিরসন নয়—দুজনের খুব কাছাকাছি
আসা নয়—শুধু সময়ের শাদা–কালোর সাগরে
জল যেন ক্রমে শূন্য অন্ধ হয়ে ঝরে;
তোমাকে আমাকে স্থির নিঃশব্দ করে।

মরুতৃণোজ্জ্বলা

হেঁয়ালি রেখো না কিছু মনে;
হৃদয় রয়েছে বলে চাতকের মতন আবেগ
হৃদয়ের সত্য উজ্জ্বল কথা নয়—
যদিও জেগেছে তাতে জলভারানত কোনো মেঘ;
হে প্রেমিক, আত্মরতিমদির কি তুমি?
মেঘ: মেঘ, হৃদয় হৃদয়: আর মরুভূমি শুধু মরুভূমি।

এ বিশ্বের এই শুধু ধার্য সমাধান;
বাকি সব অনিয়ম, শূন্য, অন্ধকার;
তবু এই সারাৎসার ভেঙে ফেলেছে কি এ নারী!
নিখিলের পাশাপাশি দ্বিতীয় আধার
অন্য এক নিখিলের—অন্য এক নিখিলের তুমি;
মেঘ: মেঘ, হৃদয় : হৃদয়, আর মরুতৃণোজ্জ্বল মরুভূমি।

জন্মতারকা

মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায় চিল—
ঘুরুনো ডানার ওপরে বড়ো নীল,
সমস্ত আকাশ
আমার পায়ের নীচে পৃথিবীর ঘাস,

আমার চোখের পথে অনন্ত রোদ্দুর
মনে হয় যেন সময়ের অশ্বখুর
হারিয়ে ফেলেছে তার সব কটি নাল,
হয়ে আছে অসীম সকাল।

আমার বুকের কাছে নদী

ছোটো ছিল কবে যেন, এখন এয়োতি
মহিলার মতো কালো চুল ভরা জলে
সময় ও প্রাণসাগরের—প্রাণসাগরের কথা বলে।

পেছনে শূন্যে—কোনো শব্দহীন দেশে
ছিলাম আঁধারে শুয়ে জন্মতারকার কোল ঘেঁষে।
এই পৃথিবীর আলো প্রেম চিহ্ন চেনা মুখ কাকে
চেয়ে সূর্যে জেগে চাই নাকো আর মৃত্যুতারকাকে।

সে

আমাকে সে নিয়েছিল ডেকে;
বলেছিল : 'এ নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল;
সব ক্লান্তি বিহ্বলতা থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি
এই নদী তুমি।'

'এর নাম ধানসিড়ি বুঝি?'
মাছরাঙাদের বললাম;
গভীর মেয়েটি এসে দিয়েছিল নাম
আজও আমি মেয়েটিকে খুঁজি;
জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে
কোথায় যে চলে গেছে মেয়ে।'

সময়ের অবিরল শাদা আর কালো
বুনোনির ফাঁক থেকে এসে
মাছ আর মন আর মাছরাঙাদের ভালোবেসে
ঢের আগে নারী এক—তবু চোখ-ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোলো-আনা নাগরিক যদি
না হয়ে বরং হত ধানসিড়ি নদী।

মহাইতিহাস

জীবনে কখনও প্রেম হয়েছিল বুঝি;
দূরে কাছে মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব
হয়েছিল কোনো এক ভোরের আলোয়,
মন স্থির করে কিছু জ্ঞান সত্য লাভ।
সে সব স্বস্তির দিন আজ
গ্রাস করে সংসার সমাজ

বিকেলের অন্ধকারে ক্ষয়
পায়—তবু হৃদয় উন্মুখ মনে হয়।
সে সব মানুষ নারী নদী চিহ্ন সুর
এখন কোথাও নেই আর;
চারি দিকে কোলাহল ভেদ করে ম্লান স্তম্ভ এক
দাঁড়িয়ে রয়েছে শূন্যতার।
আমিও এ নৈষ্ফল্যের অন্ধ একজন
নির্মাতার দূষণীয় শক্তির মতন
এ যুগের পরিণামবহনের পথে
সত্য পাব ভাবি খণ্ড সত্যের জগতে।

আঁধার দেখেছি, তবু আছে অন্য বড়ো অন্ধকার;
মৃত্যু জেনেছি, তবু অন্য সম্মুখীন মৃত্যু আছে;
পেছনের আগাগোড়া ইতিহাস রয়ে গেছে, তবু
যেই মহাইতিহাস এখনও আসে নি—তার কাছে
কাহিনীর অন্য অর্থ, সমুদ্রের অন্য সুর, অন্য আলোড়ন
হৃদয় ও বিষয়ের; মন এক অন্য দীপ্ত মন।

পৃথিবী ও সময়

সময়ের উপকণ্ঠে রাত্রি প্রায় হয়ে এলে আজ
সূর্যকে পশ্চিমে দেখি সারা শতাব্দীর
অক্লান্ত রক্তের বোঝা গুছায়ে একাকী
তবুও আশার মতো মেঘে মেঘে বলয়িত হয়ে
শেষ আলো ঢেলে যায়; জ্যোতিঃপ্রাণধর্মী সূর্য অই;
এক দিন অ্যামিবার উৎসারণ এনেছিল;
জীবনের ফেনশীর্ষ সিন্ধুর কল্লোলে এক দিন
মানুষকে পেয়ে; না-মর্মী মানুষ সেই দিন
ভয় পেত, গুহায় লুকাত, তবু সূর্যকরোজ্জ্বল
সোনালি মানবী তাকে 'হ্যাঁ' বলাল— নীল
আকাশ নগরীরেখা দেখা দিল; শঙ্খ আমলকী
সাগর অলিভবন চেনা গেল রৌদ্রের ভিতরে;
শ্বেতাশ্বতর-প্লেটো-আলোকিত পৃথিবীর রূপ
অনাদির দায়ভাগে উৎসারিত রক্তের নদীর
শিয়রে আশার মতো জেগে উৎসাহিত সূর্যকরে
সহসা নতুন হিংসা রক্ত গ্লানিমার কাছে প্রতিহত হয়ে
ধীরে ধীরে নিঃশেষে ফুরায়ে গেল তবু।

ভাই-বোন-স্মৃতি-শান্তি হননের ঘোরে উদ্বেলিত
বহতা নদীর মতো আজও এই পৃথিবী চলছে।
তবুও তো সেই উদ্‌ঘাতিনী
নদীরমণীর শব্দ কানে নিয়ে—প্রাণে

আকাশে জ্যোতিষ্ক জ্বলে হস্তা অভিজিৎ,
অনুরাধা শতভিষা লুব্ধক স্বাতী;
পৃথিবীতে—হৃদয়েরও গতিপথে বর্ণালির আভা
সম্পূর্ণ দীপ্তির মতো আলোকিত—ক্রমে আলোকিত হতে চায়।

লণ্ডন রুশিয়া গ্রীসদ্বীপপুঞ্জ কলকাতা চীন,
অগণন কন্‌ফারেন্‌সে বিকীর্ণ য়ুরোপা,
আমেরিকা—যেন বীতবর্ষণের কৃষ্ণমেঘ নক্ষত্রের পথে;
ক্ষণিক উজ্জ্বল হয়ে ক্লান্তি ক্লেদ ভয় অন্ধকার হতে চায়
এখুনি আবার তবু। প্রকৃতিতে সূর্য আসে, অস্তের আকাশে
চলে যায়; অস্তগতিহীন শুভ্র জনহৃদয়ের
সূর্যনগরীর দিকে যেতে হবে চেতনায় মানুষের সময় চলেছে।

লক্ষ্য

এখানে অর্জুন ঝাউয়ে যদিও সন্ধ্যার চিল ফিরে আসে ঘরে
যেতে আর সাধ নেই পৃথিবীর ঘরের ভেতরে।
একে একে নক্ষত্রেরা দেখা দেয়—লিচু গাছে পেঁচা নেমে আসে;
গোরুর গাড়ির ঘুন্টি সাড়া দিয়ে চলে যায় সন্ধ্যার বাতাসে;
আস্তে যাচ্ছে গাড়ি আকাশ প্রান্তর ভেঙে মৃদু বাতি নিয়ে—
চুপে চুপে কুয়াশায় যাচ্ছে মিলিয়ে;
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে তার—মুখে তার শান্ত অন্ধকার;
ভালো; তবু আরো কিছু চাই আজ পৃথিবীর দুঃসহ ভার
বইবার প্রয়োজনে; তবুও মানবজাতি রক্তস্রোতে বারবার শক্তিশালী নদী
না হয়ে এ স্নিগ্ধ রাত্রি—শান্তিপথ হয়ে যেত যদি।

রাত্রিদিন

এক দিন এ পৃথিবী জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষায় বুঝি স্পষ্ট ছিল, আহা;
কোনো এক উন্মুখ পাহাড়ে
মেঘ আর রৌদ্রের ধারে
ছিলাম গাছের মতো ডানা মেলে—পাশে তুমি রয়েছিলে ছায়া।

এক দিন এ জীবন সত্য ছিল শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম—তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।

*

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
করে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়।

তোমাকে

ভেবেছিলাম এ কথা স্থির মেনে নিতে পারি:
নিউটন্ ও ইলেকট্রনের অন্ধ সাগরে
ওদেরই জাদুবলে তুমি হয়েছ আজ নারী;
ওদেরই দয়ার ফলে আমি প্রেমিক তোমার তরে।

তবু এ ভুল হৃদয়ঙ্গম—মহাসৃষ্টির মানে
হয়তো ঠিক এমনভাবে উৎসারিত নয়।
তা যদি হত তবে যেদিন নিজেরই পরামর্শে সজ্ঞানে
আমাকে তুমি দিয়েছিলে অব্যর্থ হৃদয়

সে স্বাদ হয়ে যেত কি আজ হেমন্তে আবার ক্ষয়।
শীতের পড়ি-পড়ি বেলায় ফসল কেটে নিচ্ছে চাষা ঘরে;
নদীর বুকে প্রকৃতি জল রেখেছে, তবু রক্তের উদয়
এসে সবই আচ্ছাদিত করে।

আজ শতকে মানুষ নারী শূন্য হতে এসে
চলছে শূন্যে—আঁধার থেকে অপরিসীম আরো
অন্ধকারের ভেতরে গিয়ে মেশে।
এ ছাড়া কোনো সত্য নেই—উপায় নেই কারো।

এরই ভেতর অন্য এক গভীরতর নিরুপায়তা আছে;
মানুষ ও তার চিরস্থায়ী মানবছায়া ছাড়া
জানে না কেউ; প্রলম্বিত নীল আকাশের কাছে
কোনো দিনও পৌঁছোবে না সাড়া।

তবু সবই ঠিক হয়েছে; কবের আদি পৃথিবী থেকে তুমি
কত গ্লানি রক্ত আঁধার বিহ্বলতার থেকে
চলেছ আজও তিলধারণের মতন পটভূমি
দান না ক'রে—নিজেরই গালে সে তিলবিন্দু রেখে।

কোনো এক নারীকে: যে আমাকে আ-ইতিহাস দেখাতে চায়

কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
বঙ্গোপসাগরের কালো বাতাসের কোলাহলকে কেটে ফেলতে পারল না আর
পাহাড়ের মতো কালো নীল মেঘের শিঙে গুঁড়ো হয়ে

নক্ষত্রের ঝর্নার মতো ঝরে পড়ল
মৌসুমী সমুদ্রের জমকালো আনন্দের ভিতর
এক মুহূর্তের শৈশব সৃষ্টি করল সে
তারপর ডুবে গেল কোথায়
আমার প্রেম সাহস স্বপ্ন সমারূঢ় কাস্তে চাঁদ
ইতিহাসের হু হু হু হু অন্ধকারের মুখে দাঁড়িয়ে

মানুষ যেদিন

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল—
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা
আমাদের আজ এনেছে যেই বিষম ইতিহাসে:
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা;
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে গরমিল
রয়েছে বলে কখনো পরিবর্তনীয় নয়?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হতে:
এক নিমেষে আলোকবর্ষে ব্যাপৃত সময়

জর্নাল: ১৩৪২

হিজল-ঝাউয়ের ডাল দুলছে সূর্যের আলোড়নে,
মেঘের পৃথিবী থেকে ছুটি পেয়ে বয়স্কা রূপসী,
আশ্বিন এসেছে নীলকণ্ঠের পালকে শাড়ি ঘষে,
পদ্মের স্তনে—আর ব্যথাতুর মনে।
মাছি রোদ শেফালি মিষ্টি ধান পায়রার ভিড়
সঙ্গে তার—পশ্চিমে মেঘের পিছে সূর্যের হৃদয়
নদী কাশ চোখা বাঁশপাতা থেকে রৌদ্রের ক্ষয়
করলে শাপলার বনে জেগে ওঠে জ্যোৎস্নার শরীর।
চারি দিকে বাড়ি সাঁকো গাছে নীড় উলুঘাসে ঢেউ;
নদীটির চলাফেরা মানবীর মতো;
মনে হয় সৃষ্টির ভেতরে প্রথমত
এ সব জিনিস ছাড়া ছিল নাকো কেউ।
এইখানে চিরদিন রয়ে যাবে সব।
নীলচে ডানার কাক আশ্বিনকে কাছে ডেকে আনে;
তিন-চার মাইল ক্ষেতে হরিণের প্রাণে
এসেছে অপার ব্যাপ্তির অনুভব।
শূন্য চারি দিকে নীল আকাশের মতো হয়ে আসে;
ক্রমেই গভীর নীল বলে মনে হয়:
অন্ধ ইলেকট্রন্— তবু অনিশ্চয়তার পরিচয়
নেই তার সনাতন নির্জন প্রকাশে।

কার্তিক ভোরে: ১৩৪০

কার্তিকের ভোরবেলা কবে
চোখে মুখে চুলের ওপরে
যে শিশির ঝরল তা
শালিক ঝরাল বলে ঝরে

আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিক
কার্তিকের রোদে আর জলে
আমারই হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন;
সূর্য? না কি সূর্যের চপ্পলে

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়
এ জীবনে আমি ঢের শালিক দেখেছি
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায়।

তোমাকে ভালোবেসে

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্মপাতার জল;
তবুও এ জল কোথার থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চলে যায়;
বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।

আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিল ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছ পদ্মপাতা;
হয়েছ তুমি রাতের শিশির—
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার 'পর;
তবুও পদ্মপত্রে এ জল আটকে রাখা দায়।

নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল,
তোমার আলোয় আলো হলাম,
তোমার গুণে গুণ;
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ
জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়।

এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল :

পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে;
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

মহাজিজ্ঞাসা

ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নীচে;
সৃষ্টির মনের কথা সেইখানে আবছায় কবে
প্রথম রচিত হতে চেয়েছিল যেন।
সে ভার বহন ক'রে চ'লে
আজ কাল অনন্ত সময়
সেকেণ্ডে মিনিটে পলে বারবার ক্ষয়
পেয়েছে; তবুও এই সময়ের অহরহ ক্ষমাহীন গতি
থামিয়ে এ পৃথিবীতে স্থির কিছু এনেছে কি?—
যে স্থিরতা বারবার দিয়ে যায় রাত্রির নিয়তি,
পৃথিবীর দিন যে দাহন দেয়,—সেই সব ছাড়া
আরো বড়ো মানে এক—মহাপ্রাণসাগরের সাড়া?

নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খসে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি;
যতদূর যেতে চাই এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে—
চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে
ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসহীনতার দিকে—
মনে হয় এই আধ কণা জল দিয়ে দ্রুত রক্তনদীটিকে
সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি।

মানুষের কত দেশ কাল
চিন্তা ব্যথা প্রয়াণের ধূসর হলুদ ফেনা ঘিরে
সংখ্যাহীন শৈবাল জঞ্জাল
সে নদীর আঘাটার জলে
তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের অন্ধ মর্মস্থলে
অন্ধকারে ভাসে।
তবু তারা নীলিমার তপনের অমৃতত্ব বুকের আকাশে
ধরে নিতে চেয়েছিল বুঝি;
সাহস সাধনা প্রেম আনন্দের দিক লক্ষ্য ক'রে
আমরাও সূর্য খুঁজে নিতে গিয়ে গ্রহণের সূর্য কি খুঁজি?

এঁকেবেঁকে প্রজাপতি রৌদ্রে উড়ে যায়—
আলোর সাগর ডানে—আনন্দসমুদ্র তার বাঁয়ে;

মহাশূন্যে মাছরাঙা আগুনের মতো এসে জ্বলে;
যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের শোকাবহ রক্তে অনলে
মানে খুঁজে পেয়েছে সে অন্তহীন সূর্যের ঋতুর:
জ্ঞানের অগম্য এক অহেতুক উৎসবের সুর
জাগিয়ে বুদ্ধির ধাঁধা দু মুহূর্ত দীপ্ত ক'রে পাখি
মানুষকে ফেলে গেল তবু তার চেতনার ভিতরে একাকী।
শূন্যকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে শেষে
কোথায় সে চলে গেল তবে।

কিছু শীত কিছু বায়ু আবছা কিছু আলোর আঘাতে
ক্ষয় পেয়ে চারি দিকে শূন্যের হাতে
নীল নিখিলের কেন্দ্রভার
দান করে অন্তর্হিত হয়ে যেতে হয়?
শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস;
যদি না মানব এসে তিন ফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম করে রেখে দিয়ে যায়:
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।

অনেক রাত্রিদিন

অনেক রাত্রিদিন ক্ষয় করে ফেলে
এখন এসেছি এক উৎসের ভিতরে;
মাঠের ওপরে ক্রমে ছায়া নেমে আসে,
দু-চারটে উঁচু গাছ রোদে খেলা করে।
পৃথিবীতে রক্তপাত অশান্তি এখন;
অর্থময়তা তবু পেতে পারে মন।

কেউ নেই—শুধু এই মননের সহায়তা আছে;
যা-কিছু বুঝেছি অনেক দিন সে সবের নীতি
দু-চারটে বই ঠাণ্ডা সলতের আলো
নক্ষত্র ও সূর্যে আধো উজ্জ্বল প্রকৃতি
আছে তবে ; পৃথিবীতে হৃদয় যা চেয়েছিল তার
শূন্যতাকে স্নিগ্ধ করে রয়েছে যুক্তির অন্তঃসার।

শরীর নির্বল হয়ে যেতেছে কেবলই;
ক্রমে আরো ক্ষমাহীন কঠিন সময়
মনকে নিস্তার দিলে দিতে পেরে তবু
শরীরকে করে যাবে ক্ষয়;
ক্ষয়িত এ শরীরের সঙ্গে মিলন
ভুলে মন হতে চায় সনাতন মন।

প্রেমিক

সময় অনেক চিহ্ন লক্ষ্য ভেঙে ফেলে;
ছুটেছে দুরন্ত অশ্বখুর;
একে একে সকলকে নষ্ট করে দেবে—
সময়ের হাতে সবই বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুর

হয়ে যায়—জেনেছি অনেক দিন আমি।
তবুও সময় তার সকল ধ্বংসের পটভূমি
দিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে অপ্রেম ও প্রেমকে, তবুও
দেখেছে অনাচ্ছাদিত হে প্রেমিক, তুমি।

অবিনশ্বর

তার সাথে আজ সাত-আট বছর পরে—অঘ্রানে
কলকাতার এই টিউব আলো নিয়নদীপের রাতে
দু-চার মিনিট দেখা হল—কথা বলা হল:
ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।
স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাবকথা
বলা হলে ভাবছি ভালো হত;
কথা আরো গভীরভাবে চেতন হত যদি;
শব্দ কথা ভাষা—সবই সেই নারীকে লক্ষ্য করে ব'লে
সফল হওয়া সহজ—তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবধি।

*

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত; চারি দিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র কাশ হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর;
আমি সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লন্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
অটুট নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন্ পাশার দান হাতে:
কী কাজ খুঁজে; সকল অনুশীলন ভালো নয়;
গভীরভাবে জেনেছি যে-সব মনীষী ভাঁড় প্রেমিক পাপীদের
তারই ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

*

ক্রমেই বয়স বাড়ে—সবই ছড়িয়ে পড়ে নশ্বরতার দেশে।
বৃষ্টি বাতাস হলুদ পাতা ছাতকুড়ো ঘুণ মাকড়শাজাল এসে
বলছে: 'আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে

আমরা এলাম; কোথাও কিছুই নেই;
একটি শুধু মূর্খ আছে মানব ইতিহাসে
চঙ্গে চড়ে চেয়েছে নীল আকাশ ধরবেই;
সারাটা দিন শিমুল তুলোর মতন শত সূর্যে উড়ে তুমি
একটি বীজচিহ্ন নিয়ে মাটিরই ক্রীড়াভূমি।'

বললাম আমি: 'শিশির আলো নক্ষত্র জল মনের উদ্দীপন
অন্ধকারের দিকে টানে ইতিহাস ও দার্শনিকের মন,
দেখেছি আমি: তবুও স্বাদ অনেকরকম—দেখেছি মানুষ অসীম রগড়ে
উত্তেজিত হয়ে অপার গোলকধাঁধায় ঘোরে।
তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূলসীমা আলোর মতো—হয় তো সত্য আলো।'

আলোপৃথিবী

ঢের দিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবীভরা আলো
তবুও গভীর গ্লানি ছিল কুরুবর্ষে রোমে ট্রয়ে;
উত্তরাধিকারে ইতিহাসের হৃদয়ে
বেশি পাপ ক্রমেই ঘনালো।

সে গরল মানুষ ও মনীষীরা এসে
হয়তো বা একদিন করে দেবে ক্ষয়;
আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়
স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।

কোথাও রয়েছে যেন অবিনশ্বর আলোড়ন:
কোনো এক অন্য পথে—কোন্ পথে নেই পরিচয়;
এ মাটির কোলে ছাড়া অন্য স্থানে নয়;
সেখানে মৃত্যুর আগে হয় না মরণ।

আমাদের পৃথিবীর বনঝিরি জলঝিরি নদী
হিজল বাতাবী নিম বাবলায় সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
ফেনিল বুদ্ধির দৌড়;—আজকের মানবের নিঃসঙ্গতা যদি

সে সব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে
হতে চায় অন্য কোনো আলো কোনো মর্মের সন্ধানী,
মানুষের মন থেকে কাটবে না তা হলে যদিও সব গ্লানি
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

আমাদের পৃথিবীর পাখালী ও নীল ডানা নদী

আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি; শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি

নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তা হলেও রবে; তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নব নব জলধারা—উজ্জ্বল জগতে।

আজ

কেবলই আরেক পথ খোঁজো তুমি; আমি আজ খুঁজি নাকো আর ;
পেয়েছি অপার শূন্যে ধরবার মতো কিছু শেষে
আমারই হৃদয়ে মনে : বাংলার ত্রস্ত নীলিমার
নীচে ছোটো খোড়ো ঘর—বনঝিরি নদী চলে ভেসে

তার পাশে ; ঘোলা ফর্সা ঘূর্ণি জল অবিরল চেনা পরিজনের মতন;
কখনও বা হয়ে আসে স্থির;
মাঠ ধান পানবন মাছরাঙাদের আলোড়ন
আলিঙ্গন করে বিছিয়েছে তার নারীর শরীর।

ঘরে কোনো লোক নেই —কয়েকটি গ্রন্থ তবু আছে;
রয়েছে পরম ছবি—চার জন পাঁচ জন একান্ত শিল্পীর :
ফ্রান্সের ইটালির বাংলার কাঙড়ার—নিম জাম নাগেশ্বর গাছে
রয়েছে অগণ্য সব পাখিদের নীড়।

তবুও মনকে ঘিরে মহাজাগতিক আলোড়ন
আর এই পৃথিবীর অন্তহীন দ্বিধা দ্বেষ প্রেম সংগ্রাম
আমাদেরও রক্ত দিয়ে আদি রক্তবীজের নিধন
চেয়েছে—মিটিয়ে দেব ষোলো আনা দাম।

এই শতকের দিন ক্ষয় হয়ে এল প্রায় আজ;
নবীন আশার বার্তা নীল নিরালম্ব শূন্যে ভেসে
মানুষ যা চেয়েছিল সেই নারী সেই সূর্য আর সে সমাজ
দেবে—তার আত্মঘাতী রণাঙ্গন একদিন স্তব্ধ হলে শেষে।

বৃক্ষ

মৃগতৃষ্ণার পিছে ধাবমান হওয়া নয় আর;
ইন্দ্রধনু ধরবার মতো মূঢ় মন;
বিহ্বল আলোর পরে আসে যেই পতিত আঁধার;

কেবলই অন্ন গ্রাস—শাশ্বত গ্রাসাচ্ছাদন;
আস্তে সরিয়ে রেখে, মুখ থেকে রক্তের ফেনা,
পায়ের নীচের থেকে ক্ষমতা-যশের মরুভূমি
ফেলে দিয়ে হে হৃদয়, কখন বসবে
কয়েক মুহূর্ত নীল শ্যামল বৃক্ষের নীচে তুমি?
চারি দিকে ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বল আতপ :
অগ্নির অমৃতভাণ্ড বলে মনে হয় ;
অকূল আগুনে স্নান ক'রে বৃক্ষ শান্ত স্নিগ্ধ সিদ্ধার্থ পল্লব :
হরিৎ সোনালি নীল সৌম্য তন্ময়।
আকাশকে নিরালম্ব করে দিয়ে বোমারু বিমান
উড়ে যায়—পুনরায় প্রাণসাগরের শত ভাষা
মর্মরিত হয়ে ওঠে; কোন্ কথা বলে দূর নীল?
আর এই হরিতের কী মহাজিজ্ঞাসা।

রক্তাক্ত নদীর তীরে কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো;
সনাতন শূন্যের অন্বেষণে দিন-অনুদিন
যে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্য ফুরাল—
অনুভব ক'রে সব মানুষ তবুও
মৃত্তিকায় মূল রেখে— লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে
অথবা নশ্বর প্রেম ভালোবেসে বসবে ছায়ায়?
চারি দিকে দ্রুত অন্ধ সাগরের ঝকঝকে হাসি ;
অনন্ত প্রবহমান রক্তক্ষরা জল ;
জীবনের জয়গান—মরণের যে লাবণ্যরাশি
দুলে ওঠে আকন্যাকুমারী হিমাচল :
সে সব অসত্য নয়, সত্য নয়, ফল নয়, নৈষ্ফল্য নয় ;
যত দিন রয়ে গেছে মানুষ ও মানুষের মন—
নিমিত্তের ভাগী হবে মানবের রক্তাক্ত হৃদয় ;
হরিতের কাছে এসে শুনবে অক্ষয় গুঞ্জরণ।

কুজ্‌ঝটিকায় আকাশ মলিন হয়ে

কুজ্‌ঝটিকায় আকাশ মলিন হয়ে থাকে কী যে!
ঘুচিয়ে দিয়ে দিক্‌নিরূপক সূর্য আসে নিজে,
যা হয়েছে : হয়েছে; সেই পৃথিবীকে অন্ধকারে পিছন দিকে ফেলে
মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইয়েতে জ্বেলে
এসেছে সে আরেক ভোরের পটভূমির দিকে।
সারাটা দিন মাছরাঙা আর জলের ঝিলিকে
সূর্য আছে টের পেয়েছি—সংকল্প সুর তাই

গভীর হল;
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরণে সর্বদাই
মহাদেবের কণ্ঠজ্বালা ফুরিয়ে গেছে তবে
ভেবেছিলাম;
কত অশোকস্তম্ভ বুদ্ধ আনল আলো—কত না ইয়োরোপের বিপ্লবে
মানব-আশা ক্ষণিক জেগে বিনিপাতের শ্লেষে
ফুরিয়ে গেল, তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে
পৃথিবী তার নতুন নতুন ক্ষয় ব্যথা ভুল ভাগে
পিছন থেকে সারাটা দিন ডোডো পাখির টানে
শূন্য হয়ে যেতে যেতে তবুও সকল সাধারণের তরে
আবার নতুন আশাজনক সমাজ আকাশ গড়ে;
জেনেছিলাম।
তোমাকে আমি দেখেছিলাম বেবিলনের ছাদে
না দাঁড়াতেই ইন্দ্রপ্রস্থে ভোরের সূর্যস্বাদে
আমার পানে তাকিয়ে আছো।
অনেক দিনের মানবইতিহাসের পটভূমি
শেষ করে এক নিকটতর ভোরের আলোয় তুমি
এখুনি ছিলে;
নিমেষে তবু নীল আকাশে পালকে পাখি আলোক ঠিকরিয়ে
কখন হঠাৎ চলে গেছে সূর্য সঙ্গে নিয়ে
জানি না কোন্ নিকেতনের দিকে
অন্ধকারে ফেলে গেছে মানবপৃথিবীকে।
ইতিহাসের নতুনতর এ আঁধারে অকূল মরুভূমি
তেমনি আজও ছড়িয়ে আছে-শববহন তেমনি অপার—তুমি
তেমনি অসীম শবের প্রাবরণী খুলে ধীরে
অন্তবিহীন মৃত্যুকে আজ বারে বারে ঢাকছ শিশিরে,
করুণাময় শান্ত মৃত্তিকায়।
মৃত্যু ছাড়া কী আর আসে যায়,
কী আর আছে অপরিসীম শববহন ছাড়া
অন্ধকারে অনন্ত কাল অনুগমন করে গেছে যারা
  মৃতের জগৎ—জীবন পাবে বলে,
  রাতের আকাশ—আলোর অন্বেষণে,
আমরা সে সব প্রবহমান ইতিহাসের মনে
প্রথম সূত্রপাতে জ'ন্মে তবুও চিরদিন
দেখেছি প্রেমিক গণিকাদের নিকট থেকে ঋণ
খাচ্ছে শুধু; অনেক মহৎ মর্ম রীতি প্রতিশ্রুতিক্ষয়
হতে দেখে বুঝেছি তবু সত্য আছে অন্য অর্থময়;
আশার—ভালোবাসার—সেবার—জানার;
এ বেদ ছেড়ে ভালো জীবনবেদে—অন্য আলোর স্পন্দনে
চলে যাবার অপার সেতু আছে মানবমনে।

অন্য প্রেমিককে

মাছরাঙা চলে গেছে—আজ নয়, কবেকার কথা;
তারপর বারবার ফিরে এসে দৃশ্যে উজ্জ্বল।
দিতে চেয়ে মানুষের অবহেলা উপেক্ষায় হয়ে গেছে ক্ষয়;
বেদনা পেয়েছে তবু মানুষের নিজেরও হৃদয়
প্রকৃতির অনির্বচনীয় সব চিহ্ন থেকে দু'চোখ ফিরিয়ে;
বুদ্ধি আর লালসার সাধনাকে সব চেয়ে বড়ো ভেবে নিয়ে।

মাছরাঙা চলে গেছে—আজ নয়, কবেকার কথা
তারপর বারবার ফিরে এসে ডানাপালকের উজ্জ্বলতা
ক্ষয় করে তারপর হয়ে গেছে ক্ষয়।
মাছরাঙা মানুষের মতো সূর্য নয়?
কাজ ক'রে কথা ব'লে চিন্তা করে চলেছে মানব;
যদিও সে শ্রেষ্ঠ চিন্তা সারা দিন চিন্তানাশা সাগরের জলে
ডুবে গিয়ে নিঃশব্দতা ছাড়া আর অন্য কিছু বলে?

অন্য এক প্রেমিককে

মাথার উপর দিয়ে কার্তিকের মেঘ ভেসে যায়;
দুই পা স্নিগ্ধ করে প্রান্তরের ঘাস;
উঁচু উঁচু গাছের অস্পষ্ট কথা কী যেন অন্তিম সূত্র নিয়ে,
বাকিটুকু অবিরল গাছের বাতাস।

চিলের ডানার থেকে ঠিকরিয়ে রোদ
চুমোর মতন চুপে মানুষের চোখে এসে পড়ে;
শত টুকরোর মতো ভেঙে সূর্য ক্রমে আরো স্থির—
স্থিরতর হতে চায় নদীর ভিতরে।

লাল নীল হলদে শাদা কমলা পালকের
মাছরাঙা চিহ্ন হয়ে চুপে উড়ে এসে
দুই অন্ধ সমুদ্রের মাঝখানে কতটুকু রৌদ্রবিন্দু আছে
দেখাতে চেয়েছে ভালোবেসে।

সমস্ত সন্দেহ থেকে হৃদয়েকে সরিয়ে এবার
শান্ত স্থির পরিষ্কার ক'রে
চেয়ে দেখি মাছরাঙা সূর্য নিভে গেছে;
অন্য প্রেমিককে পাবে অন্য এক ভোরে।

এক অন্ধকার থেকে এসে

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য এক আঁধারের দিকে
মুখ ফেরাবার আগে—
কয়েক মুহূর্ত কথা কাজ চিন্তা রয়েছে এ জীবনের
দেখেছি সূর্যের আলো, নিয়ন বাতির বিচ্ছুরণ,
অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ শেল,
ক্লান্তিহীন ক্রেন এরিয়েল,
(নীলিমায় এরোপ্লেন হেলিকোপটারের
এঞ্জিনের
অনুরণনের
আর-একরকম সুর:)
হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণসাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের
রাশি রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু,
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
—দেখেছি জেনেছি অনেক দিন—
মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলের কঠিন রহস্যসুতো নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে
ধীরে ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের ইতিহাসে বারবার হয়।
মনে হয় যেন মানুষের মন তবু কোথাকার
দুই কালো বালুতীর ভেদ ক'রে ফেলে
চলেছে নদীর মতো—
চারিদিকে জনতার সকাতর কোলাহল—
ঘর বাড়ি সাঁকো।
পাখির ও মানুষের করুণ পায়ের চিহ্ন
পায়ের কৃচ্ছের চিহ্ন সব—
মুছে ফেলে বুঝি অনাদির শাদা কালো
নির্দোষ আলো আর অন্ধকার আবার সঞ্চয় ক'রে মন
জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে হ'তে চায় স্নিগ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের মতন।

তোমায় আমি দেখেছিলাম

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
শাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে—দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
সাতটি সাগর তেরো নদীর পার
যেখানে আছে পাঁচটি মরুভূমি
তার ওপারে গেছ কি চ'লে তুমি
ঘাসের শান্তি শিশির ভালোবেসে!

বটের পাতায় সে কার নাম লিখে
(গভীরভাবে) ভালোবেসেছিল সে নামটিকে
হরির নাম নয় সে আমি জানি,
জল ভাসে আর সময় ভাসে— বটের পাতাখনি
আর সে নারী কোথায় গেছে ভেসে।

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দু জনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনো দিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কী গভীর সহজ অভ্যাসে।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

দু দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ

দু দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো,
যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনো দিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়াল।
ভুলে গেছি পটভূমি—ভুলে গেছি কে যে সেই নারী—
আজকে হারিয়ে গেছে সব;
চারি দিকে গুঞ্জরিত হয়েছিল কী সব গভীর পল্লব।
যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী

হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোন্ হরিতের—নব হরিতের
সংগীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
হৃদয়ের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তরে মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোর
ভালোবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হতে চায়।
আমি সেই মহাতরু—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
জাগিয়েছ তুমি অনাদির সূর্যনীলিমায়
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

কেন মিছে নক্ষত্রেরা

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর? কেন মিছে জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে: সোনার ময়ূরপঙ্খী অশ্বত্থের শাখার পিছনে?
কেন ধুলো সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে শিশিরের চুমো খেয়ে—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে ওঠে কাশ?
খঞ্জনারা কেন নাচে? বুলবুলি দুর্গাটুনটুনি কেন ওড়াউড়ি করে বনে বনে?
আমরা যে কমিশন নিয়ে ব্যস্ত—ঘাঁটি বাঁধি— ভালোবাসি নগর ও বন্দরের শ্বাস—
ঘাস সে বুটের নীচে ঘাস শুধু—আর কিছু নয় আহা— মোটর যে সব চেয়ে বড়ো এই মানবজীবনে-
খঞ্জনারা নাচে কেন তবে আর—ফিঙা বুলবুলি কেন ওড়াউড়ি করে বনে বনে?

উপলব্ধি

যা পেয়েছি সে সবের চেয়ে আরো স্থির দিন পৃথিবীতে আসে;
আসে না কি?
চারিদিকে হিংসা দ্বেষ কলহ রয়েছে;
সময়ের হাত এসে সে সবের অমলিন, মলিন প্রেরণা
তবুও তো মুছে দিয়ে যেতে পারে,—ভাবি।

সেই আদি কাল থেকে আজকের মুহূর্ত অবধি
মানুষের কাহিনীর যতদূর অগ্রসর হয়ে গেছে তাতে
প্রান্তে ঠেকে দেখেছি কেবলই:
মলিন বালির দান নিয়ে তার মরুভূমি সূর্যের কিরণে দাঁড়াতে
শিখেছে অনেক দিন;
শিখেছিল—দেখেছিল অনদির সরীসৃপদের রণ
কেলি কাম বিচরণ—
যুগে যুগে ক্ষুধা লোভ-লালসার হানাহানি
অপমৃত্যু অন্ধকার স'য়ে
মাঝে মাঝে দিগন্তের আজ পূর্ণা মরীচিকা হয়ে

জলের লেখার মতো বুদ্‌বুদে হারাতে শিখেছিল—
তবুও তো
মানুষের কাছে মানুষের দাবি র'য়ে গেছে মনে ভেবে হৃদয়ে কুয়াশা
করুণ প্রশ্নের মতো খেলা ক'রে গেছে ঢের দিন।
আমাদের পায়ে চলা পথ ঘিরে অব্যক্ত ব্যথার
কবেকার নচিকেতা—আজকের মানুষের হাড়
প্রাণের সমুদ্রে সুরে ফেনশীর্ষ ঢেউয়ের উপরে
সূর্যের দিগন্তে দেশে আমাদের তুলে নিতে চায়;
নিঃসহায় ডুবুরির মতো ডুবে মরে;
সমুদ্রপাখির শাদা, বিরহীর মতন ডানায়
সেই শূন্য অন্ধকার দিকের ভিতরে
আমাদের ইতিহাস পিরামিড ভেঙে ফেলে;—
লণ্ডন ক্রেমলিন গড়ে।

কেবলই আশঙ্কা, ব্যথা, নিরাশার সম্মুখীন হয়ে
মানুষের মরণের সমুদ্রের ঢেউ
রূপান্তরিত করে নিতে চেয়ে মানুষের জীবনের সুর
জেনেছে কোথাও ভয় নেই—নেই—নেই।
তবুও কোথাও ধর্মমন্দিরের অভয়পাণির সফলতা
আবার ভোরের সূর্যে সমুখে রবে না কোনো দিন।

কবের প্রথম অবপ্রাণনায় জেগে
শাদা পাতা খুলেছিল যারা,
গল্প লিখে গিয়েছিল ঢের,
আদি রৌদ্র দেখেছিল,
সিন্ধুর কল্লোল শুনে গিয়েছিল ঢের, দিয়ে গিয়েছিল,
আকাশের মুখোমুখি অন্য এক আকাশের মতো যারা নীল হয়ে
রাত্রি হয়ে নক্ষত্রের মতো হয়ে মিশে গিয়েছিল;
তারা আর তাদের মরণ আজ আমাদের
পায়ের পথের নীচে যতদূর ভূল
তাহাদের অস্তসূর্য ততদূর আমাদের উদয়ের মতন অরুণ;
শ্বেতাশ্বতর থেকে দীপঙ্কর অবধি সবই শাদা স্বাভাবিক
মনে হয় ব'লে মৃত স্বভাবের মতন করুণ।
বিকেলের ক্ষয়ের ভিতরে এসে আজ তবে আমাদের দিন
অনিবার ইতিহাস অঙ্গারের প্রতিভাকে সঞ্চয়ের মতো মনে ভেবে
মরণকে যা দেবার—জীবনকে যা দেবার সব
কঠিন উৎসবে—দীন অন্তঃকরণে দিয়ে দেবে।

মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত
১৯৫৫—

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে,
সময়ের হাত
সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত।
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মতো ঝরে নাকো বনে,
ঝরে নাকো বনে।
নক্ষত্রও মুছে যায়—মুছে যায়— পৃথিবীর পুরাতন পথ
শেষ হয়—কমলার ফুল, বন, বনের পর্বত;
মানুষের মনে
সে সৌন্দর্য জন্ম লয়— শুকনো পাতার মতো ঝরে নাকো বনে,
ঝরে নাকো বনে।

ঐখানে সারা দিন

ঐখানে সারা দিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে
হলদে সবুজ নীল রং তার বুকে:
পাখি মেঘ রৌদ্রের;
তবু আজও হৃদয়ের গভীর অসুখে

মানবেরা পড়ে আছে কেন।
আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার
ভিতরে আলোর খোঁজে যদি চলে যায়
তবুও শাশ্বত হয়ে থাকে অন্ধকার।

নতুন যুগের জন্য তবুও প্রয়াণ করা ভালো।
চিতল হরিণ ঐ শিঙ তুলে ফিকে জ্যোৎস্নায়
হরিণীকে খুঁজে তবু পাবে না কখনও
ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়।

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিশের দিকে এলোমেলো।
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছেলেদের খেলা মাঠে মুহূর্তেই সাঙ্গ হয়ে গেল—

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছিপ ফেলে বাথানের দিকে ঐ চলে যায় কেলো—
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
'জল ধরে গেলে মাসি, তারপর কাঁথাগুলো মেলো—
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
'গেল গেল আমসত্ত্ব— পোড়ামুখো বৃষ্টি সব খেল—'
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
'হরির মা কতগুলো ডাঁটো আম পেল?'
এল— বৃষ্টি বুঝি এল—
(তবু সে ঘুমায় মাঠে) সমাধির 'পরে তার খড়কুটো ওড়ে এলোমেলো—

জানি না কোথায় তুমি

জানি না কোথায় তুমি—শরের ভিতরে সন্ধ্যা যেই আসে—নদীটি যখন শান্ত হয়,
যখন কাঁদে না আর শঙ্খচিল—(একা চুপে উড়ে যায়)— ঝিঁঝিঁ গুলো চুপ করে রয়,
তখন তোমার মুখ—তোমার মুখের রূপ—আমার হৃদয়ে এসে ভিজে গন্ধে চাঁপার মতন
ফুটে থাকে; শঙ্খচিল তালবনে ডুবে গেছে—নরম সন্ধ্যার রঙে নীল হয়ে আছে শরবন।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—
তবুও রয়েছে মহাসমরের তিমির
আমাদের আকাশ আলো সমাজ আত্মা আচ্ছন্ন ক'রে।
প্রতিনিয়তই অনুভব করে নিতে হয় আলো : অন্ধকার,
আকাশ : শূন্যতা, সমাজ : অঙ্গার,
জীবন : মৃত্যু, প্রেম : রক্তঝর্না;—জ্ঞান
এই সবের অপরিমেয় শববাহন শুধু, নিজেকেও বহন করছে।

এসো রাত্রি, অজানার সহোদরা তুমি,
মুমূর্ষু আলোর ভীষণতাকে তোমার শান্তি-নিঃশব্দতার ভিতর গ্রহণ করবার জন্য
শোনো পৃথিবী, এই রাত্রির শীত, সফল বিসরণ;
এসো মৃত্যু, রাত্রির সহোদরা তুমি,
সময়ের এই অসৎ স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে নিঃশেষ করবার জন্যে।
যে আদি আচ্ছন্নতার থেকে এসেছিল—
মিশে যাক সে অনাদির বাষ্পলোকে;
যে জীবন নয় সে মৃত্যুর নিস্তব্ধ অন্ধকারে
নির্মম পবিত্রতায় লীন হোক, নিত্য হোক, অনিমেষ হয়ে উঠুক;
হে জীবন, এই সব ভীষণতা অনুভব করে
সূর্য নক্ষত্র কল্যাণে উৎসারিত জলস্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠো তুমি;
ওপরের সেতু হও,
সেতুলোকে মানব—
সাহস, আলোক, প্রেমপ্রতিভা, প্রাণ।

পরস্পর

নারী: পুরুষকে

এ আলো নিভে যাবে,
এখুনি রোদ মৌমাছি নীল আকাশ ফুরাবে।
মাছরাঙাদের অবাক ঝিলিমিলি
খুঁজবে কাকে কতক্ষণ আর নদীর জলের মাছে,
মুখের কথা না ফুরতেই মাছরাঙা নেই
সমস্ত দিন শূন্য হয়ে আছে।

পুরুষ: নারীকে

রাতের আলো দিনের আলো—এ আলো ফুরাবে।
ভালো মানুষ খারাপ মানুষ—সকলই মরে যাবে।
সে-ঘুম এলে খারাপ ভালো কে আর কাকে বাছে।
নারি, তোমার চোখে তো সেই ঘুম জড়িয়ে আছে।

কারা কবে

কারা কবে কথা বলেছিল।
ভালোবেসে এসেছিল কাছে,
তারা নেই, তাদের প্রতীক হয়ে তবু
প্রাচীন কয়েকটি গাছ আছে;

নক্ষত্রেরা রয়ে গেছে নদীর ওপরে,
চারি দিকে প্রান্তর ও ঘাস,
দু-চারটে ঘরবাড়ি নীড় ও শিশির
কূলে কূলে একলা আকাশ।

তারা ছিল, তারা কেউ নেই;
মনে ক'রে জীবন তবুও তার নিবিড় বিনয়ে
নিজেকে আগুনে ক্ষয় ক'রে জেগে থাকে
স্থির; আরো স্থির আলোকের মতো হয়ে।

শান্তি ভালো

গুলি খেয়ে শূন্যে মৃত্যু হবার আগে পাখি
যেমন তাহার সুস্থ দেহের পাখিনীকে দেখে
কামের পরিতৃপ্তি খুঁজে আকাশে উড়ে যায়
অন্ধকারে পাখিশরীর ছেড়ে দিতে শেখে
অবাধগতি টিলের মতন ঘাস-পাথরের পানে;
তেমনি আলো-অন্ধকারের মরণ-জীবনের

মোহানা থেকে তোমাকে ভালোবেসে
শান্তি ভালো: শান্তি ভালো, উড়েছি আমি ঢের।

অনেক পথ চলা হল—তবুও আমি আজও
পেয়েছি যা, চেয়েছি সেই চক্রবালের রেখা?
সাত-আট বছর পরে আবার বনচ্ছবির সাথে
শীত সামাজিক রাত্তিরে আজ দেখা।
জীবন আমার সমাহিত অনেক দিনের থেকে;
নদী মাঠে ঘাসে শিশিরবিন্দুতে উৎসুক
হয়ে হৃদয় সফলতায় দিন বা রাত্রি এলে
বলেছে: এই স্পষ্ট শান্ত প্রবাহ আসুক।

নাবীরা আসে, হারিয়ে যায়—ধীর জগতের সাথে
জেগে থেকে পেয়েছি আমি বিষয়স্থিরতা
কিছু ভাষা পৃথিবীকে দেবার—বাকি সবই
নিহিত হয়ে বসে থেকে গ্রহণ করার কথা
নদী শিশির সূর্য বৃক্ষ থেকে,
চারি দিকে আকাশ ভরে হয়েছে উদয
সকল কালের বার্তাবহ নক্ষত্রদের আভা
ব্যর্থ হয়ে তবুও মানব গল্প স্নিগ্ধ হয।

কবি

কবিকে দেখে এলাম,
দেখে এলাম কবিকে
আনন্দেব কবিতা একাধিক্রমে লিখে চলেছে
তবুও পযসা রোজগার করবার দরকার আছে তার
কেউ উইল করে কিছু রেখে যায় নি,
চাকরি নেই
ব্যবসার মারপ্যাঁচ বোঝে না সে
'শেয়ার মার্কেটে নামলে কেমন হয', জিজ্ঞেস করলে আমাকে,
হায, আমাকে!
'লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিলে হয় না', শুধায,
'লটারির টিকিট কিনলে কেমন হয়? ডার্বি নয়, আইরিশ সুইপ
নয়— গোয়ার কিংবা বউবাজারের?'— এই ব'লে
শীতের সকালে চামসে চাদরখানা ভালো করে জড়িয়ে নেয় গায়,
ঘড়ি ঘড়ি মুখে একবার হাত বুলায়
মাজনহীন হলদে দাঁত কেলিয়ে একবার হাসে,
মাইনাস- এইট্ লেন্সের ভিতর আধমরা চুনো মাছের মতো দুটো চোখ:
বেঁচে আছে·না ম'রে?
কোনো দিন যৌবনের স্বাদ পেয়েছিল? পায নি?

মরুশ্বেত দুটো চুনো মাছ চোখের বদলে কাজ করছে যেন,
মরণোন্মুখ ট্যাংরা,
পৃথিবীর থেকে আনন্দ সংগ্রহ করছে,
সবাইকে ভরসার কথা শোনাচ্ছে,
ভালোবাসার জয়গান করছে—
হলদে দাঁতের ভিতর থেকে পিত্তের দুর্গন্ধ
বিড়ি হচ্ছে খোরাক
লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্ট কিছুতেই সে হতে পারবে না
এক হাজার আরব রজনী ঘুরেও এক হাজার টাকা কেস সে
দিতে পারবে না ওরিয়েন্টালকে কিংবা হিন্দুস্থানকে
জীবনে এইটুকু চমৎকার টনক রয়েছে তার,
কম নয়।
আনন্দবাজারে একটা কাজ জুটিয়ে দাও তাকে;
কিন্তু তাতেও সুবিধা হবে কি!
তাকে কেউ কিছু উইল করে গেলে পরেও
তা হলে
চশমার পাথর মুছে নিয়ে
শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চামসে চাদর গায়ে জড়িয়ে
নির্বিবাদে কবিতা লিখে যেতে পারত সে
আনন্দের কবিতা,
হয়তো প্রফিল্যাক্টিক টুথব্রাশও একটা কিনতে পারত
আর ফরহান টুথপেস্ট—
দাঁত ও মাড়ি সুন্দর, শক্ত হত তার
হ্যালিটোসিস থাকত না
থাকত না ডিসপেপসিয়া
পেটের গ্যাস
স্ট্রেপ্টোকোকাস
তেলচিটে ঘেমো ভাপসা চাদরটা প্রাণ পেত
কিন্তু থাক; কবিতার সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক
বিশেষত আনন্দের কবিতার সঙ্গে—
কবিকে দেখে আমরা কী করব?
পড়ব তার আনন্দের কবিতা — কবিতার বই
আর্ট পেপারে আর্ট প্রেসে ছাপা হয়
অনির্বচনীয় কভার
কখনও বা অন্ধকারিক, নাক্ষত্রিক, কখনও বা প্রান্তরের বটের গুঁড়ির ফাঁকে
জ্যোৎস্নার মতো—জ্যোৎস্নার প্রেতাত্মার মতো;
ডিমাই সাইজ; একটার পর একটা বেরোয়
ফী পুজোর মরশুমে
কিংবা বড়োদিনের গুলজারের সময়
হাতে করে গভীর সান্ত্বনা পাই—
অবাক হয়ে ভাবি; কবি কিছু পয়সা পেল?
পেল না হয়তো

কিন্তু উপন্যাস লিখে পায়—
যাক্, এসো আমরা তার কবিতা পড়ি
অজস্র আশাপ্রদ কবিতা
টইটুম্বুর জীবনের স্লটমেশিনে তৈরি
এক-একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের মতো।

চারি দিকে পৃথিবীর

চারি দিকে পৃথিবীর উৎসে জল ঝরে;
রোদ্দুরে শঙ্খচিল মাছি
উড়ে যায়, মনে হয় যেন
নীল আকাশের কাছাকাছি।

যেন এ জীবনে আবছা স্তম্ভ সৃষ্টি আর
ভুল গ্লানি হিংসা চালানির প্রয়োজন
ফুরিয়ে গিয়েছে বলে এ হৃদয় নব জলধারা :
নীলিমার রৌদ্রের মতন।

উজ্জ্বল চিহ্নের মতো উড়ে
হংসী রোদে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার
সম্মুখে অমেয় শুক্র শূন্যে রয়েছে
প্রেম আর জল্পনার ডানা ছড়াবার।

আমরা দুজনে যেন সৃষ্টির প্রথম
অন্ধ রাত্রি ছেদ করে শাদা আর কালো
যে নদী মৃত্যুর গন্ধ বুকে নিয়ে এসেছিল তার
ক্লান্ত তৎপরতার চেয়ে অন্য আলো—অন্য এক আলো।

ভোরের কবি জ্যোতির কবি

ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় :
ভোরের হাওয়া, আলোর হাওয়া
আলোর হাওয়া, আলোর হাওয়া!
নারীর মতন প্রেমিককে তার প্রাণের ইশারায়
সূর্যে উৎসারিত চাতক অবিনাশী চিলকে জাগায়,
জাগায়, জাগায়!
শিবের কণ্ঠ নীলকণ্ঠ বিহঙ্গমের অসীম নীলায়
মিলায়, মিলায়!

গাঢ় নীলে রৌদ্রসাগর অগ্নিশাদা ডানায় জ্যোতির্ময়,
নভোনীলের আলোয় মনোনীলিমা জেগে রয়।

ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় :
নতুন দিনের আলোর গতি প্রেমের চেয়েও সাহসিকা,
জ্ঞানের চেয়েও বৃহৎ করুণায়;
মুক্ত পুরুষ পুরাণপুরুষ সময়পুরুষ—
মানবতার সূর্যপুরুষ চায়!
ইতিহাসের অন্তে নবীন ইতিহাসের ক্রান্তিনীলিমায়
ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায়।

সুন্দরবনের গল্প

ভোরের নদীর জলে হরিণ নামল
কাল সারারাত বাঘিনী ছিল তার পিছু পিছু
কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দরী চিতাবাঘিনী এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে
বাতাসের পায়ের মতো এর ছায়ার পিছনে
ছুটেছে কামনার মতো
গহন রূপের আঘাতে যে রক্তিম কামনার জন্ম হয়
হিংসা নয়—
কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণের মুখের রূপে ফেনিল হয়ে উঠেছিল
কাল চৈত্রের জ্যোৎস্নায়
রুপালি শিশির বেগুনি ছায়ার দেশে
জাফরিকাটা জানালার রাজ্যে
সবুজ জাফরান রঙের বাতাসের উষ্ণতায়
প্রান্তরে প্রান্তরে চাঁদের আলোর কমলাবর্ণের মদিরার ভিতর
এরা দুজনে অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি করেছিল কাল
এই হরিণ—এই চিতা—
জ্যোৎস্নার কোমল স্নায়ু এদের শরীরকে বানিয়েছিল ছবি
অপরূপ নারীর ছবি এঁকেছিল এই বাঘিনীর দেহ দিয়ে
ছুটেছে হাওয়ার মতো তার (ঈপ্সিত) তরুণের পিছে
আঁকাবাঁকা ডালপালা এদের শরীরের উপর চেক-কাটা কার্পেট বুনে চলেছে
দ্রুত গতিতে
সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল
জানালার মতো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে
চৈত্রের বাতাসে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো নীল হয়ে যাচ্ছে আবার
যেন মেহগিনির গহন ঘন ছায়ায়
হয়ে যাচ্ছে মেহগিনি কাঠের হরিণ
নীল দারুময়ী বাঘিনী
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মতো
পাহাড়ের গুহায় গুহায় আবেগে স্ফীত হয়ে উঠছে

রুপালি চাঁদের আলোর ফোয়ারায়

হাওয়ার ফোয়ারায়
রাশি রাশি কাঞ্চন ফুলের মতো ফুটে উঠছে এদের দেহ আরেকবার
ছুটেছে ফিটকিরির ঝর্নার মতো
নীল ছায়ার পর্দার ভিতর হারিয়ে গিয়ে
ছায়ার ভিতর থেকে হীরের মতো জ্যোৎস্নাকে খুঁড়ে বার করে
অন্ধকারকে তম্বুরার মতো বাজিয়ে বাজিয়ে
বাতাসকে তরমুজের মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
চাঁদকে একবার খুঁজে পেয়েছে এরা
কবার হারিয়ে ফেলেছে।

আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ

এ পৃথিবী বড়ো, তবু তার চেয়ে ঢের বেশি এই
সময়ের ঢেউগুলো—অনিঃশেষ সমুদ্রের থেকে
অন্তহীন সাগরের অভিমুখে কোথায় চলেছে।
রাত্রি আসে—রাত্রি শেষ হয়ে গেলে আলো;
আলো আরো মৃদু হ'লে তার চেয়ে বেশি
স্নিগ্ধ অন্ধকার সব—আকাঙ্ক্ষিত মেয়েটির হাতের মতন
কাছে এসে সংবরণ ক'রে তবু, যেন নেপথ্যের
ওপারের থেকে তার কথা বলে।

অগাধ আয়ুর শিশু এরা সব : এই দিন, এই রাত্রি,
বাতাসের আসাযাওয়া নীল নক্ষত্রের ফুটে ওঠা,
শিশির ঝরার শব্দ, আশ্চর্য পাখির
ডিম প্রসবের সাড়া; আবার রোদের দিন মাঘ ফাল্গুনের;
সহসা বৃষ্টির রাত্রি, হেমন্তের ঠাণ্ডা নিঃশব্দতা;
কবের আয়ুর শিশু এরা সব—ম্যামথ দেখেছে।

শতাব্দীর সন্ধিপথে আজ মানুষের
আধো-আলো আধো-আশা অপরূপ অধঃপতনের
অন্ধকারে অবহিত অন্তর্যামীদের মতন ভোরের সূর্য;
দূরতর সমুদ্রের হাওয়া এসে ছুঁয়ে কিছু ভালো বলে যেতে চায়;
নগরীর বিদগ্ধ লোকেরা কথা ভেবে, ব'লে
প্রেরণা জাগাতে চায়;
সহজ ত্যাগীরা কাজ করে;
রক্তে দেশ অন্ধকার হয়ে পড়ে;
কথা ভাষা স্বপ্ন সাধ সংকল্পের ব্যবহারে
মানুষেরা মানুষের প্রিয়তর না হয়ে শুধু দূরতর হয;
হৃদয় মলিন হয়ে যেতে থাকে;
নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানেরও আকাশ ঢেকে কুয়াশা বাড়ছে;
মুক্ত হতে গিয়ে সুধী কেবলই রোমাঞ্চকর রূঢ় সায়েন্সের

জন্ম দেয়; চারি দিকে অগণন মানুষের মৃত্যু তার বড়ো কাহিনীর
যবনিকাপতনের প্রাক্কালে ক্লান্তির মতো;
এখন শতাব্দী অন্ধ—অবসন্ন—ব্যর্থ।—
হয়তো এ পৃথিবীতে মানবের অনন্ত চারণ
লোভ থেকে লোভে শুধু—ব্যথা থেকে ব্যথার ভিতরে,
ভুল থেকে উল্লোল ক্ষমতাময় ভুলের গহ্বরে;
চাঁদের কুয়াশা থেকে অঘ্রান রাতের
নক্ষত্রের অন্ধকারে;
তারপর নক্ষত্রেরা নেই।

নবীন প্রয়াণে স্পর্শে মানুষেরা এক দিন চীন— পিরামিড
গড়েছিল; সূর্যঘড়ি চিনেছিল; প্রিয়তর উজ্জ্বল সূর্যকে
দিব্য দিয়ে নগরীর ভাঙা হাড়ে কেবলই গড়েছে
নতুন খিলান স্তম্ভ ফ্যাক্টরি এঞ্জিন ক্রেন;
এ সব বিচিত্র নীড় কুশলতা কল
সময়ের থেকে দূর বড়ো সময়ের কাছে
মানুষের যেই পরিচয় রেখে যায়
তা তার আবেগ বুদ্ধি উৎকণ্ঠার;
যেন তা কল্যাণ সত্য চায়—তবু অবাধ হিংসার—
রিরংসার পাকে ঘুরে—ঘুরে ঘুরে শূন্য হয়ে যায়;
অন্ধকার থেকে মৃদু আলোর ভিতরে
আলোর ভিতর থেকে আঁধারের দিকে
জ্ঞানের ভিতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
বারে বারে আসা যাওয়া শেষ ক'রে।

চিরকাল ইতিহাসবহনের পথে
রক্ত ক্ষয় নাশ ক'রে সে এক জগতে,
মানুষের দিক্‌চিহ্ন মাঝে মাঝে মুক্ত হয়ে পড়ে;
তা কোনো প্রশান্তি নয়, মৃত্যু নয়, অপ্রেমের মতো নয়,
কোনো হেঁয়ালির শেষ মীমাংসার বার্তা নয়,
অচিহ্নিত সাগরের মতন তা দূরতর আকাশের মতো;
পেছনের পার্শ্বের দ্রুতগতি চিহ্ন ও বলয়
অন্তর্হিত হয়ে গেলে কূলহীন পটভূমি জেগে ওঠে;
ব্যক্তি ও জাতির নাম সময়ের দিগন্তরে শেষ হলে
শূন্য নীল আকাশের—মহাসাগরের শূন্যে মেশে;
চিনে নিতে পারে তার হৃদয়ের অসীম ভূগোলে
আরো শুদ্ধ আরো গাঢ় অনির্বচনীয় সম্মিলন
মানুষ ও মানুষের; চারি দিকে গ্লোবমাস্টারের শব্দে
অন্তহীন অন্ধকারে হাঙর মকর মৃত্যু কুজ্ঝটিকায়
মৃত মূঢ় এরিয়েল ও বেতারের ব্যর্থতায়
যদিও প্রত্যাশা সব সর্বস্বান্ত বলে মনে হয়—
আশার আস্থার আধার তবু নিজেই মানুষ,
মহাকাশ কিংবা মহাসাগরের চিহ্নগুলো নয়।

হে জননী হে জীবন

হে অগাধ সন্তানের জননী, হে জীবন,
হে অসীম নক্ষত্রের মাতা,
তোমার ইশারায় অনন্ত সমতল— ঘাসে সবুজ হয়ে ওঠে,
সোনালি চিনির ঢেউয়ে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষেত হয়ে ওঠে মিষ্টি।
নীহারিকা মিত্র চোখ বুজে ফুরিয়ে গেল— তুমি কোথায় ছিলে মাতা!
আজও তুমি মাছরাঙা ওড়াচ্ছ— স্ফটিকের মতো আলো বুনছ—
হিজল-জামের জানালায় সবুজ বাতাসকে চিলের ডানার মতো উড়িয়ে ঘুরছ—
বিরাট ফলন্ত ভূখণ্ডের মতো সূর্যকে লক্ষ বন্দরের কোলাহলে
অভিনন্দিত করে হাসছ তুমি,
            হাসছ তুমি জননী,
তুমি জেগে থাকতে নীহারিকা মিত্র কী করে হারিয়ে গেল জননী,
            কী করে হারিয়ে গেল?

পড়ে গেল একেবারে আমারই ছায়ার কাছে

পড়ে গেল একেবারে আমারই ছাযার কাছে—ঘাসে
দু মুহূর্ত আগেও যে শাদা নীল রঙের আকাশে

আরো দূর বেগুনি রঙের পানে যেতেছিল উড়ে,
বেতের ফলের মতো টলমল দুই চোখ জুড়ে

নীল আশা ছিল ঢের—আমারই পায়ের কাছে ঘাসে
পড়ে গেল—ভাই বোন আর কেউ অসীম আকাশে

নাই তার? পেঁপের ফুলের মতো সুন্দর কোমল
শাদা বুক—বুকে রক্ত—রক্ত ঢের— চোখে তবু জল

নাই তার: পাখনা মেলিতে চায অসীম সাহসে
আমারই পায়ের কাছে নীল ঘাসে—শিশিরের রসে

এই পাখি এই রং—সাহসের আকাঙ্খার রূপ
অগাধ আঁধারে ধীরে ডুবে যায়—হযে যায় পালকেব স্তূপ।

বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে

বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে:
গাছে পাখি দেখিয়াছি—আকাশে আপন মনে

উড়ে যায়... পায়রা তিতির

পুকুরের শাকে ঘাসে বাঁধে কেউ নীড়,

কিন্তু তুমি: নরম ননীর মতো পাখা
ঘাড় ভাঙা, মুখে রক্ত মাখা

শেফালি বোঁটার মতো ফোঁটা ফোঁটা লাল
আধ পোয়া রক্ত তুমি—কচি মেয়ে যেন লাল শাল

পরে আছে—ঘুমাতেছে : আমার হৃদয়
তোমার মায়ের মতো কাছে জেগে রয়।

জীবন ভালোবেসে

দেখা হল অনেক রক্ত রৌদ্র কোলাহল;
চারি দিকে অধোমুখে মানুষেরা শব বহন করে ;
আজকে শতাব্দীতে মৃত্যু প্রথম কথা। তবু
এ সব মৃত অবশেষে ঘুমের ভিতরে
জুড়োয় গিয়ে দূর পৃথিবীর ঘাস শিশিরে জলে;
এরা নদী সূর্য প্রেমের দিন ফুরিয়ে ফেলে
মাটি, তোমার নিজের মনের কথা হয়ে ধীরে
তোমার কাছে ঘুরছে কেমন অজ্ঞান শরীরে।

এখানে খড়ে ভরে আছে দু-চার মাইল কামিনী-ধানের ক্ষেত
ঘুঘুর ডাকে আদি শান্তি আরো অনেকক্ষণ ;
মিছরিগুঁড়ির মতন বৃষ্টি রোদ্দুরে উজ্জ্বল ;
আকাশে চাতক : ওর একরাশি আত্মীয়স্বজন ;
এ সব ছাড়া ওই মৃতদের ফুরিয়ে গেছে সবই ;
সময়ের এই কার্যকলাপ গভীর মনে হয় ;
জীবন ভালোবেসে হৃদয বুঝেছে অনুপম
মূল্য দিয়ে আসছে চুপে মৃত্যুর সময়।

সবার ওপর

সবার ওপর তোমার আকাশপ্রতিম মুখে রয়েছে
সফল সকালের রৌদ্র।
মনে হয়, সৃষ্টির অগ্নিমরালী পৃথিবীকে বঞ্চিত করে যদিও,
পৃথিবী মানুষকে,
যুদ্ধের অবিস্মরণীয় প্রতিভা ভাইকে আকর্ষণ করে যদিও
ভাইবোনকে নিঃশেষ করে দেবার জন্যে,
রক্তনদীর ভিতর থেকে ফলে ওঠে শাদা মিনার,
মহৎ দার্শনিকের মুণ্ডচ্ছেদ করে জেগে ওঠে খুলির বাটি,

নির্বোধ প্রণয়ীদের নবান্নরসে উপচে ওঠে কিনারা তার,
মিষ্টি, মলিন, রুক্ষ, ভূকম্পহীন অন্নোৎসবে, জেগে ওঠে বাসনা
কৃষ্ণার শাড়ি টেনে নেয়ার,
সাম্রাজ্য ভেঙে যায়—
হেমন্তের মেঘের মতো মিলিয়ে যায় সম্রাটদের চীৎকার,
তবুও দুর্বার সৃষ্টির কুয়াশা সরিয়ে দেবার জন্যে তুমি
ডান হাত হলে তোমার;
একটি কালো তিলের নিখুঁত থেকে অপরিমেয় পদ্মের মতো
হলে তুমি তোমার বাম হাত।
সৃষ্টি ও সমাজের বিকেলের অন্ধকারের ভিতর
সকালবেলার প্রথম সূর্য-শিশিরের মতো সেই মুখ;
জানে না কোথায় ছায়া পড়েছে আমার জীবনে, তার জীবনে,
সমস্ত অমৃতযোগের অন্তরীক্ষে।

জীবনের মানে ভালো

এখানে ঘাসের শুয়ে আছি—পাশে নদী—নদীতে স্টীমার;
এ দিকে বাবলার সারি বহু দূর চলে গেছে—দূর—আরো দূর—
আজ ভোরে ঝাউবনে মনে হয়েছিল, মন মৃত্যু অমৃত্যুর
সীমার বাইরে এক অফুরন্ত সূর্যের ঋতুর।
এখন বিকেলবেলা লাল নীল আলো জ্বেলে ঝাপসা স্টীমার
কোথায় দিগন্তে যায়—কোন্ যাত্রী সঙ্গে আছে তার,
জানি নাকো; কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত স্নিগ্ধতার
কেমন নরম ছবি ভেসে ওঠে সন্ধ্যার আঁধারে;
মুছে যায় কুয়াশার পারে দূর ছ–সাতটি নক্ষত্রের পানে;
শঙ্খচিল মাদারের ডালে বসে টের পায় শিশিরের ঘ্রাণে
জীবনের মানে ভালো; আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুব মানে।

জোনাকী

অসংখ্য সবুজ শিমে শিমলতা পাতা ভরে আছে;
শিম পাড়ি; মেয়েটিও আছে কাছে কাছে;
        চার বছরের ছোটো মেয়ে;
        কাঁপছিল হিমে;
        আঁচল ফেলেছে ভরে শিমে;
        জায়গা নেই যে এক তিল,
তবু সে বাড়াল হাত—তারপর থেমে গিয়ে নিজ মনে বললে, 'কেমন নীল—
        কেমন সুন্দর নীল শিমগুলো—
        ওই শিমগুলো, বাবা, গাছেই থাকুক।'
নদীর মতন টলমল চোখে তাকাল সে—তারপর মুখ
নামিয়ে সে চলে গেল—

বেলা শেষ হলে
শুনলাম ডুবে গেছে পুকুরের জলে।
অনেক গভীর রাতে দেখা গেল জোনাকী পোকার সাথে নক্ষত্রের তলে
শিমগুলো খেলা করে শিশিরের জলে;
আমাকে দাঁড়াতে দেখে বলে তারা: 'বুঝেছ তো কে এই জোনাকী?'
'চিনেছো?' বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি।

সে

আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো।
আকাশ তেমন নীল? আকাশ তেমন নীল নয়,
মেয়েমানুষের চোখে নাই যেন তেমন বিস্ময়,
মাছরাঙা শিশুদের পাখি আজ, শিশুরাও কারো
রেশমি চুলের শিশু নয় আজ; ভাবিতে কি পার
প্রেমে সেই রক্ত আছে? আঘাতে রয়েছে সেই ভয়?
কুয়াশায় সেই শীত? কে সাজায়, কে করে সঞ্চয়
আজ আর! জীবন তবুও যেন হয়েছে প্রগাঢ়।

নতুন সৌন্দর্য এক দেখিয়াছি—সকল অতীত
ঝেড়ে ফেলে—নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে;
শালিখেরা কাঁপিতেছে মাঠে মাঠে—সেইখানে শীত
শীত শুধু—তবুও আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রান রাত শেষ হল—পৌষ গেল চলে
যাহারে পাই নি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে বলে।

আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই

আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই
মৎস্যনারীদের মাঝে সব চেয়ে রূপসী সে নাকি
এই নিদ্রা?

গায় তার ক্ষান্ত সমুদ্রের ঘ্রাণ অবসাদ সুখ,
চিন্তার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন—বিমুখ
প্রাণ তার।

এই দিন এই রাত্রি আসে যায়—কোনো ধ্বনি ঘ্রাণ
বুঝিতে দেয় না তারে কোনো ক্ষুধা—কোনো ইচ্ছা—পরীরও সোনার চুল হয় যাতে ম্লান
আমাদের পৃথিবীর পরীদের; জানে না সে; জীবনের লক্ষ মৃত নিশ্বাসের স্বর;

শোনে না সে; তা হলে ঘুমোত কবে? সে শুধু সুন্দর,
প্রশ্নহীন অভিজ্ঞতাহীন দূর নক্ষত্রের মতো

সুন্দর অমর শুধু ; দেবতারা করে নি বিক্ষত
ইহাদের?

এদের অপার রূপ শান্তি সচ্ছলতা
তবুও জানিত যদি আমার এ জীবনের মুহূর্তের কথা
মানুষের জীবনের মুহূর্তের কথা।

দেবতারা করে নি বিক্ষত ইহাদের :
ঘুঘুদের শাদা ডানা—নীল রাত্রি—কমলা রঙের মেঘ—সমুদ্রের ফেনা রোদ—হরিণের বুকে বেদনার নীরব আঘাত;
এরা প্রশ্ন করে নাকো; ইহারা সুন্দর শান্ত—জীবনের উদ্‌যাপনে সন্দেহের হাত
ইহারা তোলে না কেউ আঁধারে আকাশে
ইহাদের দ্বিধা নাই—ব্যথা নাই—চোখে ঘুম আসে।

শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা?
সকল সংকল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে—মানুষের জীবনের এই বীভৎসতা

ইহাদের ছোঁয় নাকো;—ব্যুবনিক প্লেগের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধতারে নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন!
গোলাপি ধূসর মেঘে পশ্চিমের বিয়োগ সে দেখে না কি?
প্রজাপতি পাখি মেরে করে না কি মানুষের জীবনের ব্যথা আহরণ?
তবু এরা ব্যথা নয় : ইহারা আবৃত সব—বিচিত্র—নীরব
অবিরল জাদুঘর এরা এক; এরা রূপ ঘুম শান্তি স্থির
এই মৃত পাখি কীট—প্রজাপতি রাঙা মেঘ—সাপের আঁধার মুখে ফড়িঙের জোনাকীর নীড়
এই সব।

আমি জানি, এক দিন আমিও এমন
পতঙ্গের হৃদয়ের ব্যথা হব—সমুদ্রের ফেনা শাদা ফেনায় যেমন
ভেঙে পড়ে—ব্যথা পায়।
মানুষের মন
তবুও রক্তাক্ত হয় কেন এক অন্য বেদনায়
কীট যাহা জানে নাকো—জানে নাকো নদী ফেনা ঘাস রোদ—শিশির কুয়াশা জ্যোৎস্না :
অম্লান হেলিওট্রোপ হায়!

সৃজনের জাদুঘরে রূপ তারা—শান্তি—ছবি—তাহারা ঘুমায়
সৃষ্টি তাই চায়।

ভুলে যাব যেই সাধ যে-সাহস এনেছিল মানুষ কেবল
যাহা শুধু গ্লানি হল—কৃপা হল—নক্ষত্রের ঘৃণা হল—অন্য কোনো স্থল
পেল নাকো।

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এল; তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি;
পাখি? না ফড়িং কীট? পাখি? না জোনাকী?
বাদামি সোনালি নীল রোম তার রোমে-রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী :

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ!

জ্যোৎস্নায়—শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে? কত দূর চেয়েছে উড়িতে?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিল? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে!

না—না—তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর
ব্যথা সে তো জানে নাই—বিচিত্র এ জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর;
রোম—ঠোঁট—পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর।

জ্যোৎস্নায়—শীতে
আমার কঠিন হাতে তবু তারে হল যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে দিকে অবিরল—তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি, আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না ; ভুল করে দেবে নাকো ছেড়ে.;
জানি আমি, তবু আহা রাতের শিশিরে ভেজা এ রঙিন তুলার বলেরে
কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়েচেড়ে,
সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার; এই পাখি—এতটুকু—তবু সব শিখেছে সে—এ এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয় ;
আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম-স্বপ্ন নয়
চারি দিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়

এই পৃথিবীতে, এই ক্লেশ ইহাদেরও বুকের ভিতর;
ইহাদেরও ; অজস্র গভীর রঙ পালকের 'পর
তবে কেন? কেন এ সোনালি চোখ জ্যোৎস্নার সাগর
খুঁজেছিল? আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্ট চরাচর?

আমি এই অঘ্রানেরে ভালোবাসি

আমি এই অঘ্রাণেরে ভালোবাসি—বিকেলের এই রঙ—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম—ঢালু মাঠ—বিবর্ণ বাদামি পাখি—হলুদ বিচালি—
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে ঘাসে—কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,

ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—জীবনেরে জেনেছে সে—কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায়—ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনই সে—ক্ষেতের ভিতর
এখনই সে নেই যেন—ঝ'রে পড়ে অঘ্রানে এই শেষ বিষণ্ন সোনালি

তুলিটুকু; মুছে যায় ; কেউ ছবি আঁকিবে না মাঠে মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় না কেউ—এখন অঘ্রান এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয় ;
এক দিন নীল ডিম দেখি নি কি?—দুটো পাখি তাদের নীড়ের মৃদু খড়

সেইখানে চুপে চুপে বিছায়েছে ; তবু নীড়—তবু ডিম—ভালোবাসা সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ তাহা চায় নাকো—জীবন অনেক দেয়—তবুও জীবন
আমাদের ছুটি দেয় তারপর—একখানা আধখানা লুকোনো বিস্ময়
অথবা বিস্ময় নয়—শুধু শান্তি—শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন
অঘ্রান খুলেছে তারে—আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে আহরণ।

আজ রাতে শেষ হয়ে গেল শীত

আজ রাতে শেষ হয়ে গেল শীত—তারপর কে যে এল মাঠে মাঠে খড়ে
হাঁস গাভী শাদা প্লেট আকাশের নীল পথে যেন মৃদু মেঘের মতন
ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও আর যাবে নাকো ঘরে

তাহার রুপালি রোম জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত করে যায় মন,
হৃদয়ে আস্বাদ এল ফড়িঙের—কীটেরও যে—ঘাস থেকে ঘাসে ঘাসে তাই
নির্জন ব্যাঙের মুখে মাকড়ের জালে তারা বরং এ অধীর জীবন

ছেড়ে দেবে—তবু আজ জ্যোৎস্নায় সুখ ছাড়া সাধ ছাড়া আর কিছু নাই;
আছে নাকি আর কিছু? পাতা খড় কুটো দিয়ে যে আগুন জ্বেলেছে হৃদয়
গভীর শীতের রাতে—ব্যথা কম পাবে ব'লে—সেই সমারোহ আর চাই?

জীবন একাকী আজও—ব্যথা আজও—এখন করি না তবু বিয়োগের ভয়
এখন এসেছে প্রেম; কার সাথে? কোন্‌খানে? জানি নাকো; তবু সে আমারে

মাঠে মাঠে নিয়ে যায়—তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় : সে এক বিস্ময়
এ শরীর রোম নখ মুখ চুল—এ জীবন ইহা যাহা, ইহা যাহা নয়;
রঙিন কীটের মতো নিজের প্রাণের সাধে এক রাত মাঠে জেগে রয়।

বারবার সেই সব কোলাহল

বারবার সেই সব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত—ক্লান্তি লাগে যেন :
তাহারা অনেক জানে–এই দূর মাঠে আমি খুঁজি নাকো জীবনের মানে
শুধু এই মাঠ—রাত—আমারে ডেকেছে, আহা—বলেছি, 'যাব না আর'—কেন,

কেন যাব? এই ধুলো খড় গাভী হাঁস জ্যোৎস্না ছেড়ে আমি যাব কোন্‌খানে,
সেখানে চিন্তার ব্যথা—ব্যথা নাকি? আজ রাতে শুধু আমি শান্তির আকাশ
চেয়েছি যে—সেই ভালো—কথা কাজ প্রশ্ন শুধু ভুল করে—ব্যথা বহে আনে,

শান্তি ভালো ; বাদামি পাতার ঘ্রাণ ভালো না কি? পাখির সোনালি চোখ—ঘাস—
কোথায় বিবরে তার মাছরাঙা—তার রঙ তার নীড়—হৃদয়ের সাধ
এই নিয়ে কথা ভাবা এইখানে—ছবি আঁকা—মৃদু ছবি—নরম উচ্ছ্বাস;

ইঁদুর ধানের শিষ বেয়ে ওঠে : এই ছড়া এই সোনা আকাশের চাঁদ
এরা যেন নীড় তার—আমারও হৃদয় আজ চুপ হয়ে শুধু রঙ ঘ্রাণ
শুধু শান্তি—নিঃশব্দতা—আবিষ্কার; এই সব এই সব সঞ্চয়ের স্বাদ

জীবনেরে এই বলে জানিতেছে—জ্যোৎস্না আরো শান্ত হয়ে ভরেছে উঠান
রাত্রি আরো ছবি হয়ে রূপ হয়ে ঘাসের কীটের মুখে শুনিতেছে গান।

রাত আরো বাড়িতেছে

রাত আরো বাড়িতেছে–এক সারি রাজহাঁস চুপে চুপে চলে যায় তাই,
এই শান্ত রাতের পৃথিবীটিরে ইহাদের পালকের নরম ধরল
তুলি দিয়ে আঁকে এরা—পৃথিবীতে এই বিজনতা যেন কোনোখানে নাই

এই ছবি—এই শান্তি—ঘাসের উপরে আজ আঁধার দেখায় অবিরল
এই সব; কোথায় উৎসব যেন শুধু রক্ত—শুধু রূঢ় বিবাহের গান—
জীবনের অসম্ভ্রম;—পৃথিবী সম্ভ্রম ভুলে হতেছে না কঠিন চঞ্চল!

সন্ধ্যার মেঘের পথে দাঁড়কাক তবু জানে অন্য এক বিশ্রাম কল্যাণ,
অন্য এক ক্ষমা শান্তি সমারোহ—আমিও শুনেছি সেই পাখিদের স্বর
নরম অধীর যেন—পথ ছেড়ে দূরে থেকে তখন উঠেছে কেঁপে প্রাণ

বিয়োগের কথা ভেবে—মাথার উপরে তারা বিকেলের সোনার ভিতর
হারায়েছে ; কোন্ দিকে? শালের গলির ফাঁকে মাঠ ছুঁয়ে হামাগুড়ি দিয়ে

উড়েছে রাত্রির পেঁচা—এ জীবন যেন দুটো মৃদু পাখা : তার 'পরে ভর—

জীবনের এই স্তব্ধ ব্যবহার অভিজ্ঞতা আমরা জেনেছি পরস্পর
তারপর : শান্তি এল মাঠে ঘাসে ডানা পাখি পালকের ছবি চোখে নিয়ে।

আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে

আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে—তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি
পুরোনো জ্ঞানের খাতা রক্ত ক্লেশ রোমহর্ষ চুপে চুপে করি সঞ্চয়
অন্ধকারে ; অজন্তার ইলোরার রোম আলেকজান্ড্রিয়ার আমরা প্রহরী

মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা—চামড়া ও কাগজের বিষণ্ন বিস্ময়
এই কি পৃথিবী নয় আমাদের? পৃথিবী কি চেয়েছিল এমন জীবন
সোনালি বেগুনি মেঘে যাহা কোনো ফড়িঙের পতঙ্গের পাখিদের নয়

সেই কথা চিন্তা কাজ সমাবোহ স্তব্ধ ক'রে রাখে কেন মানুষের মন—
অই দেখ পায়রারা—এশিরিয়া মিশরেও ইহাদের দেখিযাছি আমি
হাজার হাজার শীত বসন্তের আগে কবে দিল্লী নিনভে বেবিলন

ইহাদের দেখেছিল—এসেছে ভোরেব বেলা উজ্জ্বল বিশাল বোদে নামি
গভীর আকাশ আরো নীল করে দিযে গেছে ধবল ডানার ফেনা দিযে
এই কি জীবন নয? আমাদের ক্লান্তি তবু ক্লান্তি তবু আরো বেশি দামি

জ্ঞান নাই চিন্তা নাই—পাযরারা সেই সব প্রতীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে
এক দিনও ব্যথা, আহা, পায না কি শুধু নীল আকাশের রৌদ্র বুকে নিযে?

সে কত পুরোনো কথা

সে কত পুরোনো কথা—যেন এই জীবনের ঢের আগে আরেক জীবন
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে
তুমিও ফের নি পিছে—তুমিও ডাক নি আর; আমারও নিবিড় হল মন

যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
আমার এ জীবনেব বন্দরে ; তারপর শান্তি শুধু বেগুনি সাগর—
মেঘের সোনালি চুল—আকাশ উঠেছে ভরে হেলিওট্রোপের মতো রূপে

আমার জীবন এই ; তোমারও জীবন তাই; এইখানে পৃথিবীর 'পর
এই শান্তি মানুষের ; এই শান্তি। যত দিন ভালোবেসে গিয়েছি তোমারে
কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর

চেয়েছি—চেয়েছি, আহা...ভালোবেসে না কেঁদে কে পারে।
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে

তুমিও দেখ নি ফিরে—তুমিও ডাক নি আর—আমিও খুঁজি নি অন্ধকারে

যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে।

এইখানে এক দিন তুমি এসে বসেছিলে

এইখানে এক দিন তুমি এসে বসেছিলে—তারপর কত দিন আমি
তোমারে রয়েছি ভুলে—এক দিন তুমি এসে বসেছিলে কখন এখানে
মুছেছে জীবন থেকে—ফড়িঙের মতো আমি ধানের ছড়ার 'পরে নামি

জীবনেরে বুঝিয়াছি; আমি ভালোবাসিয়াছি—সেই সব ভালোবাসা প্রাণে
বেদনা আনে না কোনো—তুমি শুধু এক দিন ব্যথা হয়ে এসেছিলে কবে
সেদিকে ফিরি নি আর—চড়ুয়ের মতো আমি ঘাস খড় পাতার আহ্বানে

চলে গেছি ; এ জীবন কবে যেন মাঠে মাঠে ঘাস হয়ে রবে
নীল আকাশের নীচে অঘ্রানের ভোরে এক—এই শান্তি পেয়েছি জীবনে
শীতের ঝাপসা ভোরে এ জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে

এক দিন—হেমন্তের সারা দিন তবুও বেদনা এল—তুমি এলে মনে
হেমন্তের সারা দিন—অনেক গভীর রাত—অনেক অনেক দিন আরো
তোমার মুখের কথা—ঠোঁট রঙ চোখ চুল—এই সব ব্যথা আহরণে

অনেক মুহূর্ত কেটে গেল, আহা; তারপর—তবু শেষে শান্তি এল মনে
যখন বেগুনি নীল প্রজাপতি কাঁচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে।

বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা

বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা চুপে চপে নেড়ে
কে যেন বিছাতে চায় নীড় তার গাছের মাথার 'পরে হাঁসের মতন;
তারপর দেখা দেয় একবার; নির্জন বনের এই বিস্মিত হাঁসেরে

দেখি আমি—রুপালি পালকে তার উডু উডু জামপাতা ছায়া শালবন
পড়িতেছে—কালো কালো শাখা ডাঁট দুলিতেছে ডিমের মতন বুকে তার;
কোনো পাখি দেখি নাই তাহার সন্ধ্যার নীড়ে চোখ মেলে বসেছে এমন

এমন কোমল স্থির নিরবিলি পালকের রুপা দিয়ে বনের আঁধার
বুনেছিল; দূর বুনো মোরগের বুকে তাই এই রাতে জেগেছে বিস্ময়—
তাহার অধীর শব্দ শুনি আমি—সোনার তীরের মতো জলপায়রার

বুকে এসে এই জ্যোৎস্না ব্যথা দেয়—সহসা গভীর রাত ব্যস্ত যেন হয়
চাঁদের মুখের 'পরে অনেক মশার পাখা ছোটো ছোটো পাখিদের মতো

উড়িতেছে; মিষ্টি ব্যথা এই সব—জ্যোৎস্নার মাংস খুঁটে লয়;

শরের জঙ্গল নদী ছেড়ে দিয়ে বুনো হাঁস উড়ে চলিতেছে ক্রমাগত।
চাঁদ থেকে আরো দূর চাঁদে চাঁদে—কত হাঁস চাঁদ কত কত।

কী যেন কখন আমি অন্ধকারে

কী যেন কখন আমি অন্ধকারে মৃত্যুর কবর থেকে উঠিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে আমি উড়িলাম
সাত দিন সাত রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম?
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।

সাত দিন শেষ হল—তখন গভীর রাত্রি পৃথিবীর পারে
আমারই মতন ক্ষিপ্র ক্লান্ত এক শকুনের পাল
দেখিলাম আসিতেছে চোখ বুজে উড়ে অন্ধকারে,
তাহারা এসেছে দেখে পৃথিবীর সকাল বিকাল
ক্লান্ত ক্লান্ত শকুনের পাল!

শুধালাম, 'তোমাদের দেখেছি যে বৈতরণী পারে
সেইখানে ঘুম শুধু—শুধু রাত্রি—মৃত্যুর নদীর পারে, আহা,
পৃথিবীর ঘাস রোদ মাছরাঙা আলোর ব্যস্ততারে
ভালো কি লাগে নি, আহা'—শুধালাম—
শকুনেরা শুনিল না তাহা,.
ডুবে গেল অন্ধকারে, আহা!

এক জন রয়ে গেল—বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা ঘুরাযে সে মাঝ-শূন্যে থেমে:
'কোথায় যেতেছ তুমি? পৃথিবীতে? সেইখানে কে আছে তোমার?'
'আমি শুধু নাই, হায়, আর সবই রয়ে গেছে—সকালে এসেছি আমি নেমে
বৈতরণী : তার জলে ; যারা তবু ভালোবাসে—ভালোবাসিবার,
পৃথিবীতে রয়েছে আমার!'

খানিক ভাবিল কী যে সেই প্রাণ—ক্লান্ত হল—তারপব পাখা
কখন দিয়েছে মেলে বৈতরণী নদীটির দিকে;
বলিলাম: 'ঐ দেখ—দেখা যায় তমালের হিজলের অশথের শাখা
আর ঐ নদীটিরে দেখা যায়—আমার গাঁয়ের নদীটিকে—'
চ'লে গেল তবু সে যে কুযাশার দিকে!

তারপর সাত দিন সাত রাত কেটে গেল পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
আবার চলেছি উড়ে একা একা শকুনের কালো পাখা মেলে

পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি—আজও তারা মনে করে রেখেছে আমারে,
ভালোবাসে; রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি—আমার এ সংসর্গের ভালোবাসা পেলে,
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন ক'রে পেলে

তাহারা বাসিত ভালো আরো বেশি—আরো বেশি—এই—শুধু আর কিছু নয়—
সাত দিন সাত রাত তাহাদের জানালায় পর্দায় উড়ে উড়ে কেবল ভেবেছি এই কথা
আবার পেতাম যদি সে শরীর—সে জীবন—তা হলে প্রণয় প্রেম সত্য হত; আজ তা বিস্ময়—
আজ তা বিস্ময় শুধু—শুধু স্মৃতি শুধু ভুল—হয়তো কর্তব্য বিহ্বলতা :
সাত রাত সাত দিন পৃথিবীতে কেবল ভেবেছি এই কথা।

তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু ভালো—মৃত্যু তাই আর একবার,
বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা মেলে দিয়ে মাঝ-শূন্যে আমি ক্ষিপ্র শকুনের মতো
উড়িতেছি—উড়িতেছি; ছুটি নয়—খেলা নয়—স্বপ্ন নয়—যেইখানে জলের আঁধাব
বৈতরণী—বৈতরণী—শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম—ঘুম অবিরত
তারই দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।

আমার এ ছোটো মেয়ে

আমার এ ছোটো মেয়ে—সব শেষ মেয়ে এই
শুয়ে আছে বিছানার পাশে—
শুয়ে থাকে—উঠে বসে—পাখির মতন কথা কয়
হামাগুড়ি দিযে ফেরে
মাঠে মাঠে আকাশে আকাশে...

ভুলে যাই ওর কথা—আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন
বলে এসে : 'বাবা, তুমি ভালো আছো? ভালো আছো?—ভালোবাস?'
হাতখানা ধরি তার : ধোঁয়া শুধু
কাপড়ের মতো শাদা মুখখানা কেন!

'ব্যথা পাও? কবে আমি মরে গেছি—আজও মনে কর?'
দুই হাত চুপে চুপে নাড়ে তাই
আমার চোখের 'পরে, আমার মুখের 'পরে মৃত মেয়ে;
আমিও তাহার মুখে দু হাত বুলাই;
তবু তার মুখ নাই—চোখ চুল নাই।

তবু তারে চাই আমি—তারে শুধু—পৃথিবীতে আর কিছু নয়
রক্ত মাংস চোখ চুল—আমার সে মেয়ে
আমার প্রথম মেয়ে—সেই পাখি—শাদা পাখি—তারে আমি চাই:
সে যেন বুঝিল সব—নতুন জীবন তাই পেয়ে

হঠাৎ দাঁড়াল কাছে সেই মৃত মেয়ে।
বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ, তাই ছোটো বোনটিরে—
তোমার সে ছোটো ছোটো মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নীচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এত দিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে—
ছোটো বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

ব্যথা পেল সেই প্রাণ—খানিক দাঁড়াল চুপে—তারপর ধোঁয়া
সব তার ধোঁযা হযে খসে গেল ধীরে ধীরে তাই,
শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়াল সে একবার
কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক—
চেয়ে দেখি ছোটো মেয়ে হামাগুড়ি দিযে খেলে—আর কেউ নাই।

নদী

রাইসর্ষের ক্ষেত সকালে উজ্জ্বল হল—দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল
তারই পাশে নদী ;

নদী, তুমি কোন্ কথা কও?

অশথের ডালপালা তোমার বুকের 'পরে পড়েছে যে,
জমের ছাযায তুমি নীল হলে,
আরো দূরে চলে যাই
সেই শব্দ পিছে পিছে আসে;
নদী নাকি?

নদী, তুমি কোন্ কথা কও?

তুমি যেন ছোটো মেয়ে—আমার সে ছোটো মেযে;
যত দূর যাই আমি—হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে পিছে আস,
তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি : আমারই নিজের শিশু সারা দিন নিজ মনে কথা কয়।

কথা কয়—কথা কয—ক্লান্ত হয় নাকো
এই নদী

এক পাল মাছরাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম—নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেই সব দেখে নাই।

তখন আমের বনে চ'লে গেছি
এইখানে কোকিলের ভালোবাসা ——লের সাথে,

এখানে হাওয়ায় যেন ভালোবাসা বীজ এক আছে,
নদীর নতুন শব্দ এইখানে : কার যেন ভালোবাসা পুষে রাখে
সোনালি প্রেমের গল্প সারা দিন পাড়ে
সারা দিন পাখি তাহা শোনে; তবু শোনে সারা দিন?
পাখিরা তাদের গানে এই শব্দ তবু
পৃথিবীর ক্ষেতে মাঠে ছড়াতে পারে না,
নদীর নিজের সুর এ যে!
নদী, তুমি কোন্ কথা কও?

গাছ থেকে গাছে—মাঠ থেকে মাঠে রোদ শুধু মরে যায়
সব আলো কোন্ দিকে যায়!
নিজের মুখের থেকে রোদের সোনালি রেণু মুছে ফেলে নদী
শেষ রেণু মুছে ফেলে
সে যেন অনেক বড়ো মেয়ে এক—চুল তার ম্লান—চুল শাদা—
শুধু তার ফুল নিয়ে খেলিবার সাধ—
ফুলের মতন কোন্ ভালোবাসা নিয়ে,
ধানের কঠিন খোসা—খড়—হিম—শুষ্ক সব পাপড়ির মাঝে সেই মেয়ে ইতস্তত বসে আছে;

গান গায় ;
নদীর—নদীর শব্দ শুনি আমি।

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব পৃথিবীর থেকে;
রক্তরূপ ছেনে এখনও হৃদয়ে কোনো আসে নাই ক্লান্তি — অবসাদ
এখনও সবুজ এই পৃথিবীরে ভালো লাগে— ভালো লাগে চাঁদ
এই সূর্য নক্ষত্রের ডালপালা; এখনও তোমারে কাছে ডাকে
মনে হয় যেন শান্ত মালয়ের সমুদ্রেরে পেল পাখি — দেখে
জ্যোৎস্নায় মালয়ালী — নারিকেল ফুল সোনা সৌন্দর্য অবাধ
নরম একাকী হাত — জলে ভেজা মসৃণ; এই রঙ সাধ
কৃমি হয়— কাদা হয়— তবু, আহা; চলে যাব তাই মুখ ঢেকে
তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব পৃথিবীর থেকে।

বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে

বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে, তাই সব থেকে সরে
যখন ঘুমাব আমি মাটি ঘাসে—সেইখানে এক দিন এসে
হয়তো অজ্ঞানে তুমি মাথা নেড়ে বলিবে : 'আমারে ভালোবেসে
ব্যথা পেল; আমি আজও ভালো আছি—তবুও গিয়েছে, আহা, ঝরে
সেই প্রাণ'; হয়তো ভাবিবে এই—তবু একবার চুপ করে

ভেবে দেখ সে কী ছিল—এক দিন পৃথিবীতে তোমার আবেশে
যখন আমার মন ভরে ছিল, মনে হত চলিতেছি ভেসে
জ্যোৎস্নার নদীতে এক রাজহাঁস রুপালি ঢেউয়ের পথ ধরে
কোন্-এক চাঁদের দিকে অবিরল—মনে হত, আমি সেই পাখি:
তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাই তো মসৃণ তুলি হাতে লয়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভরে দিয়ে; চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগে নি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে।

তখন অনেক দিন হয়ে গেছে

তখন অনেক দিন হয়ে গেছে—চলে গেছি পৃথিবীর থেকে;
হয়তো ভাবিবে তুমি এক দিন : 'ভুলেছি কি—তারে গেছি ভুলে
কেন, আহা!' আঙুল ঠোঁটের 'পরে রেখে দিয়ে চুপে চোখ তুলে
ব্যথা পাবে একবার—সারা রাত টেবিলের 'পরে মুখ ঢেকে
রবে তুমি—অনেক অনেক দিন রাত কেটে যাবে একে একে
ব্যথা নিয়ে ; ভূত তবু আসে নাকো ; কে তারে ঘাসের থেকে খুলে
ছেড়ে দেবে! ভূত নাই, ঘাসেও সে থাকে নাকো—তাই ক্লান্ত চুলে
বিনুনি রিবন বেঁধে—একরাশ পৃথিবীরে লবে তুমি ডেকে

ডেকে লবে কাছে তুমি ইহাদের : বাগানের ক্যানা ফুল—আলো
জামরুলে মৌমাছি—বিড়ালের ছানাগুলো—শাদা শাদা ছানা
ন্যাটা ফল আতা ক্ষীর—কমলা রঙের শাল—এক ডিম উল্
নতুন বইয়ের পাতা কবিতার যেইখানে সহজে ফুরাল
পুরোনোরা; যেইখানে শেষ হল আমাদের শেষ ধুয়া টানা :
তারপর সেই স্বপ্ন সাধ এসে খুঁজে গেল আমাদের ভুল।

কেন ব্যথা পাবে তুমি? কোনো দিন

কেন ব্যথা পাবে তুমি? কোনো দিন বেদনা কি দিয়েছি হৃদয়ে
যত দিন পৃথিবীতে তোমার আমার সাথে হয়েছিল দেখা,
তারপর আমি চলে গেলে পরে মনে কর যদি খুব একা
.একা হয়ে গেছ তুমি—ভাব যদি কোথায় সে ঘাসের আশ্রয়ে
চলে গেল—ভালোবেসে, ঘৃণা পেয়ে ; এই ব্যথা ভয়ে
জেগে থাক যদি তুমি অন্ধকারে—সেজো নাকো ব্যথার রেবেকা ;
তুমি প্রেম দাও নাই—জানি আমি—তবুও রক্তাক্ত কোনো রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীত মধু মোমের সঞ্চয়ে,
কুয়াশা হতাশা নিয়ে সরে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে;
তোমারে দেখেছি আমি পৃথিবীতে—নতুন নক্ষত্র আমি ঢের

আকাশে দেখেছি তাই—তোমারে দেখেছে—ভালোবেসেছে অনেকে—
তাহাদের সাথে আমি—আমিও বিস্ময় এক পেয়েছি যে টের—
গভীর বিস্ময় এক শুধু তার ম্লান হাত—চুল চোখ দেখে।
কুয়াশা হতাশা নিয়ে সরে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে।

কমলাবতীর ভালবাসা

একটি খড়ের ঘর যেন এই মাটির সন্তান :
সারা দিন শুয়ে থাকে সূর্যের দেশে ;
উঁচু উঁচু জাম ঝাউ ঝিরঝির আবেশে
নেজনী নদীর ঢেউয়ে পেতে থাকে কান।

বিকেলের মরচে রঙের স্থির মেঘে
আতুর কাকের জন্ম হয়—
পৃথিবীর, তবু যেন তারা কেউ পৃথিবীর নয়।

কোলাহলে সাম্রাজ্যেরা ভেঙে গেলে পর
তারপর থাকে নাকো কোনো কলরব ;
ফাটল — খড়ের মাঠ — প্রচুর, নীরব,
ফরসা ডানার পাখি ঠোঁটে তার খড়;
এই সব থাকে শুধু — পশ্চিমে সূর্যের গন্ধ : যেন মেঠো চাষা;
মাটি যেন ধেনো ঝাঁজ, কমলাবতীর ভালবাসা।

যখন ক্ষেতের ধান ঝরে গেছে

যখন ক্ষেতের ধান ঝরে গেছে—ক্ষেতে ক্ষেতে পড়ে আছে খড়
আম বাঁশ ডুমুরের পাতাগুলো মাঠে মাঠে করে মর্মর
ফাল্গুন ঘাসের ঘ্রাণে ফড়িং এ জীবনের গন্ধ ভালোবাসে
(বিশুষ্ক পুঁয়ের মাচা ঘিরে ঘিরে প্রজাপতিগুলো উড়ে আসে)
হলুদ-জর্দা-শাদা প্রজাপতি—হলুদ-জর্দা-নীল-লাল—
দুপুরের মাঠে শুয়ে এই পল্লী—নিস্তব্ধতা— এই খোড়ো চাল—
ভূতুড়ে স্বপ্নের মতো ডালপালা—নীরব নরম দাঁড়কাক—
তেরছা ডানার ছায়া : চিল বুঝি?—লাল বনে শালিখের ঝাঁক—

এই সব ভালো লাগে—দু দিনেই চুল তবু হয়ে যাবে শাদা
এইখানে মাঠে শুয়ে ভালোবাসিবার পথে আরো ঢের বাধা
জমে যাবে; এখুনি তো ফাল্গুনের মায়াময় অপরাহ্ন ভরি
পরীর মুখের মতো কারা যেন সোনার পাখির পিঠে চড়ি
কুয়াশায় মুছে যায় মুছে গেছে;—কোনো দিন ফিরিবে না আর
যদিও ফাল্গুন আছে—আমি আছি—প্রজাপতি আছে নীল লাল পাখনার।

তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে
তুমি আমার পদ্মপাতা হলে;
শিশিরকণার মতন শূন্যে ঘুরে
শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে
খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে শেষে।

নদী সাগর কোথায় চলে বয়ে
পদ্মপাতায় জলের বিন্দু হয়ে
জানি না কিছু—দেখি না কিছু আর,
এতদিনে মিল হয়েছে তোমার আমার
পদ্মপাতার বুকের ভিতর এসে।

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই,
তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে
চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে
শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।

জানি আমি তুমি রবে—আমার হবে ক্ষয়,
পদ্মপাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয়।
এই আছে, নেই—এই আছে, নেই—জীবন চঞ্চল;
তা তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্মপাতার জল
বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে।

চিঠি এল

কত বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার:
এই সকালবেলার রৌদ্রে
আমার হৃদয়ে
বারুণীর কোটি কোটি সহচরী
তিমির পিঠ থেকে মকরের পিঠে আছড়ে প'ড়ে
নটরাজ্ঞীদের মতো
মহান্ সমুদ্রের জন্ম দিল।

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি,
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল,
একটা সজনে গাছও নেই,

তাই বিবাট আকাশচিল উড়ে এসে
শূন্য বাতাসেব ভিতব আঁকাবাঁকা ব্যর্থ জ্যামিতিব দাগ বেখে গেল শুধু,
তাবপব দূব নীড়েব দিকে উড়ে গেল
হৃদযেব পানীযেব দিকে।

এই পৃথিবীব অব্যবহাবেব দিকে তাকিযে
কেমন একটা তুহিন ছিল হৃদযে:
তোমাকে দেখে ভেঙে গেল;
সমুদ্র যখন (শীতেব শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত শত স্ফীত খোঁপাব প্রেমিকা নাবীব জন্ম দেয। তাব জলেব ভিতবে
তাদেব সমস্ত ক্ষুধা জড়ো ক'বে
আকাশের পানে গভীবভাবে নিক্ষেপ কবে সে:
তোমাব উত্তাল গম্বুজেব উদ্দেশে
আমাব অনুভূতিব আলোড়ন—
সেই সব স্ফীত খোঁপাব নাবী
তোমাব নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'বে
গুঁড়োয গুঁড়োয পৃথিবীব শস্যক্ষেতে ছড়িযে দেবে;
হৃদযেব ভিতব প্রতিভাব নব নব সন্তান কলবব কবে উঠবে।

আমি

বাতেব বাতাস আসে
আকাশেব নক্ষত্রগুলো জ্বলন্ত হ্যে ওঠে
যেন কাকে ভালোবেসেছিলাম—
তখন মানবসমাজেব দিনগুলো ছিল মিশব-নীলিমাব মতো।

তাব তৎপব হাত জেগে বযেছে সৃষ্টিব
অনাদি অগ্নিউৎসেব প্রথম অনলেব কাছে আজও
সমস্ত শবীব আকাশ বাত্রি নক্ষত্র উজ্জ্বল হযে উঠছে তাই,
আমি টেব পাই সেই নগ্ন হাতেব গন্ধেব
সেই মহানুভব অনিঃশেষ আগুনেব
বাতেব বাতাসে শিখা-নীলাভ এই মানবহৃদযেব
সেই অপব মানবীকে।

সমস্ত নীলিমা-সময—প্রেম কী উদাব অনল সংঘর্ষময়ী বাসনা
মহনীয অগ্নিপবিধিব অন্তহীন কারুশিল্প সংগীতে লীন,
সেই নাবীব গুঞ্জবণ শুনছি আমি
আমাব গানে হৃদয বিকম্পিত হযে উঠছে তাব,
কোথাও মৃত্যু নেই—বিবহ নেই
প্রেম সেতুব থেকে সেতুলোকে—
চলছে— জ্বলছে দেখ। এল আলো

গতির গলিতশরীরী আগুনের;
কোথাও প্রয়াণের শেষ নেই—আমি গতিবহ্নি, হে তপতীলোক,
হে অন্ধকার—
হে বিরাট অন্তরীক্ষ অগ্নি।

কনভেনশন্

প্রথম বক্তা

এ যুগের, আমাদের এ যুগের
জন্ম হয়েছিল বটে শূকরের পেটে;
কলম ছেড়েছি তাই অসূয়ায়,
কেননা খঙ্গের সাথে এঁটে
এখন কলম কাৎ রবে ঢের দিন;
তারপর যখন সে মনীষীর হাতে
ধরা দেবে পুনরায়—ঢের দিন কেটে গেল বলে
তখন বেবুন ছাড়া কে উঠেছে মনীষীর জাতে?

দ্বিতীয় বক্তা

পৃথিবীতে ঢের দিন টেকা গেল
সভাসমিতির ফাইল নেড়ে
জলের গেলাসে স্বচ্ছ সূর্যকে রেখে।
মদের পিপেয সব বাছুরকে ছেড়ে
মনে হয়েছিল যত পিপে রযে গেছে
আর যত বাছুরের লোম,
ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তারা রযে গেছে ব'লে
আমাদের চামড়াব জুতোও নরম।
সে সব বাছুর তবু এত দিনে ষাঁড় হযে গেছে,
মদের পিপের থেকে (শেষ অবলেপ সব) উঠে
চাঁদের আলোয সব গোল হযে বসে
আবার নতুন কিছু মাল গেছে জুটে।
তা না হলে দেবদূত হয়ে যেত এত দিনে সব,
আমাদের মর্মরের মতন সিলিঙ
ভরে যেত তাহাদের ধবল শপথে;
আমাদের চুল থেকে বার হত শিঙ।

তৃতীয় বক্তা

সমিতিতে—কৌন্সিলে—গ্যালারিতে যে সব মানুষ
সময় কাটায়ে গেছে আমাদের বক্তৃতা শুনে,
প্রত্যক্ষদর্শীর মতো তারা যেন সব
আমাদের উড়ে যেতে দেখেছে বেলুনে।
সময় গিয়েছে কেটে আমাদের গোলালো তৃপ্তিতে

কথা বলে—কথা বলে—কথা বলে—তবুও এখন
আমাদের চেয়ে ঢেব হালুবালু ভালো জানে বলে
বেবুন চালাবে মাইক্রোফোন।

চতুর্থ বক্তা

চেয়ে দেখি চাবি দিকে আজ
যাদের চোয়ালগুলো লণ্ঠনেব মতো
গরিলা বানাতে গিয়ে নিসর্গ যাদেব
মানুষ বানাল প্রথমত—
কাবণ, অনেক কাজে লিপ্ত থেকে ন্যুব্জ নিসর্গ
মাঝে মাঝে ভুলে যায় ইঞ্চি ইঞ্চি স্তব—
প্যাবাসুট বেয়ে তাবা নাবী আব ধর্মযাজকেব মতো নেমে
সূর্যেব আলোব নীচে সব চেয়ে বিখ্যাত বগড়।
তবু এবা মদ পেলে খুশি হয় খুব,
নির্মল ভাঁড়েব মতো বসিকতা জানে,
শান্তিব দেবতা কোনো যদি নেমে এসে ইহাদেব
মাথা ধবে কান টেনে আনে,
আজ তবু ভুল কবে দশজন নাবী হত্যা ক'বে
একজন দালালেব ঋণ করে শোধ,
যেন শুধু সবমাকে নগ্ন ক'বে সাবমেয়দেব
চাঁদেব আলোব নীচে সব চেয়ে বিখ্যাত আমোদ।

পঞ্চম বক্তা

তবুও ঘোষণা কবে চলে যাই :
ধবেছি অনেক মাছ স্ফটিকেব মতো শাদা জলে,
নির্জন পবিত্র বৌদ্রে ঘুবায়েছি শাটিনেব ছাতা,
পবিশ্রান্ত পা দুটোকে ঢুকায়ে চপ্পলে
ডোবাকাটা জামা গায়ে ঢিলে কবে নিয়ে
বিবেক ব্যথিত হয় বলে আঁট নেকটাই খুলে
শাদা মোম জ্বেলে নিয়ে ঘুমোবাব আগে
হঠাৎ দেখেছি শিশু—চুলে।

ষষ্ঠ বক্তা

কিছু নয়—লঘু অবলেপ শুধু—দু-এক নিমেষ;
এ যুগেব জন্ম হয়েছিল তবু খানাব ভিতবে;
যখন বাজাব বেশ শান্ত হয়ে ববে
অতিবিক্ত তেজী হয়—মন্দা হয়ে প'ড়ে
যখন সবাব কাজ ন্যস্ত ববে শ্বেতাশ্বতব শান্ত ঘুঘুব মতন
ব্যাঙ্ক বুলিযন কাঁচা-পাকা মাল নিয়ে
পবস্পবেব সব মুকুবেব মতো মুখে চোখ চেয়ে দেখি
আমাব কানেব দিকে থতমত খেয়ে কেন বয়েছি তাকিয়ে।

পঞ্চম বক্তা

(উপসংহার)

এখন উইল করে চলে যাই তবু
হয়তো বা কোনো এক অতীতের তরে—
তবু আমি আশাস্থির—বর্তমান টপকায়ে
অতীতই তো আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে;
এখন উইল করে চলে যাই তবে—
ছাতা লাঠি অমুকের হ্যাভেনা—দলিল—
সুন্দর জিনিস সব—বিপর্যস্ত এই পৃথিবীর—
এখন ভূতের হাতে খেয়ে গেল কিল।

আমাদের কপোলের একটি আঁচিল যেন তবু
আমাদের নাসিকার সরলরেখার মতো ডাঁশা
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছে ভালোবাসা।
যদিও পৃথিবী আজ (আমাদের) টেনে নেয় জঙ্গলের দিকে,
রেডিয়োও ব্যবহার করে যায় বেবুনের ভাষা;
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।

কেননা আমরা ঢের পড়েছি বিজ্ঞান ইতিহাস—
অধমর্ণ কখন ঘুরেছে উত্তমাশা?
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।
আমরা দেখেছি ঢের সমাজের ভাঙন-গড়ন—
বিপ্লবের সূত্রগুলো ভুল গণিতের মতো কূট ভাসা-ভাসা;
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।

মানুষের সভ্যতা বিজ্ঞান ধর্ম : রাজমুণ্ড ঘিরে
দীনারের মতো গোল— অকৃত্রিম গোল হয়ে আসা।
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।
সভ্যতাকে ভেঙে দিতে চায় যারা দাঁত বার ক'রে
তাহাদের হালুবালু জঙ্গলের ভাষা—
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।

প্রতীক

এক দিন অবশেষে ভোরবেলা চায়ের টেবিলে
দেখা গেল চিনেমাটি দিয়ে গড়া পেয়ালার 'পর
হেলিওট্রোপের মতো আকাশের থেকে

মানুষ ও মানুষের অলঙ্ঘ্য প্রতীক পরস্পর
এক জোড়া লঘু প্যারাশুট বেয়ে নামে;
লঘুতর মনে হয় পেয়ালার প্রবীণ পালিশে;
যেন তারা অনুকূল বাতাসের ভরে
কোনো এক প্রাসাদের বালিকার শিসে
নেমে আসে নদীর সফল গূঢ় জলে
গোধূমের ক্ষেতের ভিতর—
মনে হয়। ভোরের বাগানে যেন ব'সে
কোনো এক চীনে কারিগর
এই ছবি এঁকে গেছে দুই পল-অনুপল আগে ;
বুদ্‌বুদের মতো উঠে লঘু তামাশায়
ঊর্ণার মতন দুটো প্যারাশুট শূন্যে মাঝপথে
তবুও বৈকুণ্ঠে তারা ; পৃথিবীর রক্তের ঝর্ণায়
বৈতরণী তরঙ্গের নীচে তবু তারা
মাছের উজ্জ্বল লঘু শল্কের ভিতরে;
কোথায় পালাবে তুমি তাহাদের হাত থেকে আজ
অথবা পালাবে কোন্ স্থিরতর বিষয়ের তরে।

সিনেমার দেশে

যখন উঠেছে চাঁদ মাঝরাতে—বনের বিড়াল
গোপন সোনালি চোখ তুলে দিয়ে একবার দেখে
অই চাঁদ অই বন—নরম বাদামি পাতাজাল
কখন গিয়েছে ভরে বনের বিড়ালে একে একে।

তাহারা চাঁদের তলে পশমের থাবা তুলে দিয়ে
রেশমে রেশম লেজ নাচায় লেজের মখমলে।
লুকোচুরি ছায়া চাঁদে—চাঁদ আর ছায়া ভুলে গিয়ে—
অথবা তুলোর চাঁদই ভালো না কি চাঁদের বদলে?

তুমি আলো

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
  চলেছ কোথায়!
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায়!
  হয়তো আলোর ছায়া নেই;
  আলো তুমি তবুও তো—
  আলো তুমি ছায়ারও মনেই;
বাহিরে বিশাল ওই পৃথিবীর জাতীয়তা অ-জাতীয়তায়
      তুমি আলো।

তুমি আলো।
যেইখানে সাগর নীলিমা আজ মানুষের সন্দেহে কালো,
ভাইরা ব্যথিত হলে ভাইদের ভালো,
মানুষের মরুভূমি একখানা নীল মেঘ চায়।

ইতিবৃত্ত

এক দিন কোনো এক আঞ্জিরগাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
সোনালি সবুজ এক ডোবাকাটা রাক্ষুসে মাকড়কে আমি
একটি মিহিন সুতো নিয়ে দুলে নির্জন বাতাসে
দেখেছি স্বর্গের থেকে পৃথিবীর দিকে এল নেমে,
পৃথিবীর থেকে ক্রমে চলে গেল নরকের পানে;
হয়তো সে ঊর্ণনাভ নয়।
অগস্ত্যের মতো নানা আয়ুর সন্ধানে
চোখে তার লেগে ছিল ব্রহ্মার বিস্ময়।

ঢের আগেকার কথা এই সব—তখন বালক আমি পৃথিবীর কোণে।
অশ্বত্থের ত্রিকোণ পাতায় যেন মনে হত বালিকার মুখ
মিষ্টি হয়ে নেমে আসে হৃদয়ের দিকে,
নদীর ভিতরে জলে যেন তার করুণ চিবুক
স্থিরতর কথা ভাবে—সমস্ত নদীর ঘ্রাণ আরো
অধিক উদ্ভিদ মাটি মাংস—ধূসর হয়ে থাকে;
যেন আমি জলের শিকড় ছিঁড়ে এক দিন হয়েছি মানুষ,
কাতর আমোদ সব ফিরে চায় আবার আমাকে।

পৃথিবীর ঘরে তবু ফিরে গিয়ে—অভিভাবনায়
সেগুন কাঠের শক্ত টেবিলের 'পরে
নীরবে জ্বেলেছি আলো ছিপেছিপে ধূর্ত মোমের
তবুও যখন চোখ নেমে এল বইয়ের ভিতরে
এক—আধ—দুই ইঞ্চি ঘুমের ভিতর ডুবে গেল,
কঠিন দানব এক দাঁড়াল মুখের কাছে এসে—
যেন আমি অপরাধে বিবর্ণ বালক
উলঙ্গ পরীর চুল—কিংবা তার ঘোটকীর লেজ ভালোবেসে।

তবুও আকাশ থেকে পুনরায়—ধীরে
জলপাই–ধূম্র এক ভোরবেলা উদ্গীরিত হলে
সকলের আগে ক্ষুদ্র জাগরূক বর্তুল দোয়েল
তখনও বাতাস পেয়ে জাগে নাই ব'লে
নদীর কিনার দিয়ে শঙ্খচূড় সাপের মতন
আমার এ শরীরের ছায়াকে বাঁকিয়ে নিতে গিয়ে
সহসা দেখেছি তুমি কর্কচের মতন আলোকে
শ্বেতকায়া সাপিনীর মতন দাঁড়িয়ে।

আলো অন্ধকারে

এ পৃথিবী জেগে আছে আলো অন্ধকারের ভেতর।
পৃথিবীতে কিছুদিন রয়ে যাব আমি।
দেখেছি কোকিল গান না—গেয়ে নির্জনে
কয়েকটা ফুটফুটে ডিমের প্রণামী

বন্ধুর বাসায় রেখে গেছে।
দেখেছি নক্ষত্র নদী মানুষের মুখ,
ভেবেছি, চেয়েছি রক্তে হারিয়ে ফেলেছি অনর্গল।
আরো বোধি আরো প্রেম হৃদয়ে জাগুক।

খুঁজে নাকো রীতি আর, রক্ত রৌদ্র আর;
খোলো গিয়ে কোণো দূর মেধাবী দুয়ার—
দুই পা ছড়িয়ে বস সেখানে গভীর শান্ত ঘাসে;
পৃথিবী অনেক দান দিতে পায়ে তবু
পৃথিবীর হাত থেকে তুলে নাও এই শান্তি শুধু :
ডানার-ঘুমের মতো পাখির আকাশে।

সেই ঘুম হয়তো বা কারও মৃত্যু নয়—
যা চেয়েছ সেই সব রক্তের সঞ্চয়
নয়।
সেখানে শান্তিকে শুধু চাইবার নিস্তব্ধ প্রেরণা
তৃপ্তি পায়-ধূসর সেতুর 'পরে— তোমারই মনের
ফুরায় গহন উত্তেজনা।

জেনেছি এ পৃথিবীতে শুধু
জ্ঞান প্রেম অগ্নি ভাষা সব উত্তেজনা
উদ্যম এড়িয়ে এক স্থির শান্তি খুঁজে পেতে চায়;
জলে সূর্যে ধ্বনিলোকে বেশি দিব আমাদের টেকে না চেতন।

তোমাকে পাব না আমি আর:
জীবনের এই পারে— অই পারে শান্তির সংস্থান;
সে এক রাতের জ্যোস্না— এক-আধ মুহূর্তের সুকৃতির শুধু।
কিন্তু শান্ত অন্ধকার অনন্তের দান।

এল বুঝি, আহা
অনেক নক্ষত্র নিয়ে এল;
এইবার শরীর ঘুমোবে—
মন : সে কী পেল?

মন কবে শান্তি পাবে, কবে,
যা ঘুমিয়ে অন্ধকার রাত্রির মতন
নদী নক্ষত্রের মুখে স্নিগ্ধ হয়ে রবে—
মৃত্যু নয়। শান্তি পাবে মন।

কোনো ব্যথিতাকে

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছ।
নরম আঁধার ঘর
শান্তি নিস্তব্ধতা;
এখন ভেবো না কোনো কথা।
এখন শুনো না কোনো স্বর।
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মতো মুদে থাকো।

শবের পাশে

(পুরোহিতের প্রার্থনা: অসামাজিক)
মৃত?
তবুও সে মাটি নয়।
মাথার চুল যেন আরো অনেক কাল ব্যবহার করবে সে—
তার হাতির দাঁতের মতো ধূসর কপালের উপর
ভোরের অজস্র দাঁড়কাকের মতো চুলের আনন্দ,
চুলের আবেগ: যেন মিশরের মহীয়সী শাল পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে
লাল নীল কাচের জানালা খুলে দিয়ে
নব নব ভোরের রৌদ্র ও নীল আকাশকে আস্বাদ করবার জন্যে!

কোন্-এক অন্ধকার লাইব্রেরির নিস্তব্ধ হলুদ পাণ্ডুলিপির মতো
দেখলাম তাকে:
শ্রাবণের রৌদ্রে রেবা নদীর মতো ছিল যে এক দিন;
সে আর ঘুমোবে না কোনো দিন,
স্বপ্ন দেখবে না;
তার মৃত মুখের বিমর্ষ মোমের গন্ধকে ঢেকে ফেলে
শুধু তার ঘন কালো চুল
সেই আবহমান রাত্রি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে রয়েছে
কোনো এক দূর, ভালো দ্বীপের মতো
যেখানে জাগ্রত পাখিদের প্রেম
ধূসর সমুদ্রকে জাগাতে পারে না আর।

যে সমুদ্রের কোনো বেলা নেই,

পাণ্ডুর দেহের নীরবতা নিয়ে তারই ভিতর নামল সে;
জ্যামিতির ভিতর থেকে রূপ তার কুহক হারিয়ে ফেলেছে;
তারপর বিশৃঙ্খল মাংসের দুর্বলতা নিয়ে
পৃথিবীর বড়ো বড়ো নাবিকের বিবর্ণ ভয় ও বিস্ময়ের জিনিস সে।

এই নারী আজ নিস্তব্ধ;
মনে হয় যেন কোনো সুদূর দ্বীপে ঘুম রয়েছে শুধু;
এর দেহের ভিতর বিবর্ণ দারুচিনি ছালের গন্ধ,
এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়
কোনো অসীম নির্জনতার ভিতরে উঁচু উঁচু গাছের ধীর আলোড়ন যেন
(আরো নিস্তব্ধ)
এই মৃতার শরীরে সেই দূর দ্বীপের সবুজ শব্দ—স্বাদ—ছায়া-রৌদ্রের বুনুনি—

আমলকী-গাছে কোকিল এই নিস্পাপ স্রোত অনুভব করেছে,
তাই সে ধূসর সম্রাটের জন্যে সংগীত খুজতে চলে গিয়েছে:
মৃত্যুর মহান্ আত্মীয়তা
পৃথিবীর পাখিদের কাছেও মৈথুনের চেয়ে প্রগাঢ়।

রজনীগন্ধা

এখন রজনীগন্ধা—প্রথম—নতুন—
একটি নক্ষত্র শুধু বিকেলের সমস্ত আকাশে;
অন্ধকার ভালো বলে শান্ত পৃথিবীর
আলো নিভে আসে।

অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো;
রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে।

তোমার আমার

তোমার আমার ভালোবাসার এই
পথ ছাড়া পথ নেই
জেনে নদীর জলে চেয়ে দেখি
কালো নদীর রঙ মিশেছে এসে।

এই দু রঙই ভালো,
শাদা পাখির কালো
কালের পাখি সাথী
উড়ছে দেশে দেশে।

তোমার আমার ভালোবাসা—তা কি
একটি পাখি—একট শাদা পাখি!
সময় কি তার পথ দেখিয়ে দিয়ে
সঙ্গে চলে ভেসে।

শাদা পাখিই কালো পাখি কি-না
চিনি না আমি, চিনি না চিনি না;
কালো-শাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালোবেসে।

সুদর্শনা

সুদর্শনা মিশে যায় অন্ধকার রাতে
নদীর এ পারে ব'সে একদিনও দেখে নি ওপার,
প্রকৃতি চায নি সেই মেয়েটি এ আলো আর রাত্রির আঘাতে
পৃথিবীকে কূট চোখে দেখে নেবে—বুঝে নেবে জীবনের গ্লানি অন্ধকার।
চায নি সে কলমীর ফুল ভরা রক্তাক্ত প্রান্তরে
অথবা চিন্তায রূঢ় ক্ষেম সৎ পাণ্ডুলিপি যা খণ্ডন করে
মৃত্যুকে দেবার আগে এই সব একবার তুলে নেবে হাতে

প্রথম ঢেউয়ের থেকে দূর সূচনার মতো নদীর ভিতরে
অরবে সে চলে যায—এক খণ্ড রাত্রি মনে হয়
পৃথিবীর রাত্রিকে যেন তার অনন্তেব কাছে;
সব হাঁস ঘুমালেও নক্ষত্রালোকিত হংসী আছে
সমুদ্রের পারে এসে বড়ো চাঁদ এর চেয়ে নির্জন বিস্ময
দেখে নিকো কোনো দিন; অনেক পবনে মৌমাছিদের ভিড়
যদিও খেযেছে ঢের আকাশের বাতাসের মতন শরীর
তবু সে শরীর নয—মাংসের চোখে দেখা নক্ষত্রেবা নয তার তরে।

সবারই হাতের কাজ

সবারই হাতের কাজ শেষ করে নিতে হবে পৃথিবীতে আজ।
তাদেরই ভিতরে তবু (মুষ্টিমেয়) কেউ কেউ ভালো ক'রে করে;
তাদের রুধিরে আছে জীবনেব সম্পূর্ণ গরজ
সবই অভিনয় জেনে—বিখ্যাত মঞ্চের 'পরে (তবুও তো) চড়ে।
ভালো ক'রে পরে নেয় অবিকল কালো পরিধান;
যেখানে কৃচিৎ প্রেম সততা মহত্ত্ব আছে অগণন দালালের বুকে
যেখানে ক্বাথের দিকে চেয়ে ভাঁড় বলে যায় 'অনোরণীয়ান'
দার্শনিক গাধা ব'লে ফেঁসে যায় দু-এক চাবুকে,
সেখানে তবুও তারা চাঁই সাজে, মন্ত্রী হয়—মুদ্রারাক্ষস

কিংবা শ্লীল প্রেমিকের খেলা খেলে দগ্ধ করে চাঁদনীর চক;
কানে ধরে টেনে এনে ইহাদের মাথার তাড়স
বার করে দিতে চায় অতি সন্দিহান বিদূষক;
তবুও বিয়োগনাট্যে প্রদীপ্তির কাজ করে যারা
—টেবিলে ভাঁড়ের সাথে কাসুন্দিতে প্রায়শই পেয়েছে আমেজ,
তবু জানে নিজেদের পরিধানে গুরুতর বিষয়ের জামা,
ভাঁড়ের ধুতির ভাঁজে লুকায়ে রয়েছে শুধু লেজ।

এই পরিপূর্ণ জ্ঞানে বোঝে তারা তাহাদেরও মেরুদণ্ড বেয়ে
ব্যাঙাচির মতো কিছু সততই নড়ে যায় ধীরে;
এ না হলে অনিরুদ্ধ, কৌটিল্য ও কর্ণ, দেবযানী
ভূত হয়ে মিশে যেত কোন্ কালে নাট্যের তিমিরে
এখনও অঙ্গার থেকে জন্ম নেয় এই সব বীজ:
চেয়ে দেখে ঊর্ধ্বে মেঘ—সম্মুখেতে সিংহ মেষ ষাঁড়
পায়ের ভঙ্গির নীচে কর্কট বৃশ্চিক
পাদপ্রদীপের আলো কেবলই খেতেছে অন্ধকার।
নাট্যের লিখন তারা—তবু তারা পড়েছিল মৃগশিরা নক্ষত্রের নীচে,
কথোপকথন গান স্বগতোক্তি নেপথ্যের রব
শিশিরবিন্দুর মতো শব্দ করে দর্শকের কানে;
গ্যালারিতে মৃগীরোগাতুর নীল মহিলারা সব
কলরব করে ওঠে ভয়ংকর করতালি দিয়ে
চামুণ্ডার মতো নেচে ছিঁড়ে ফেলে চুল
মাথার উপরে সব অগণন ভূতযোনি দেখে
তারা আর তাহাদের প্রণয়ীরা নাচায় লাঙ্গুল;
অতএব যবনিকা মাঝপথে নেমে পড়ে বটে
ম্লান হয়ে নিভে আসে পাদপ্রদীপের গোল আলো,
তবুও মঞ্চের 'পরে অনিরুদ্ধ দেবযানী কচ
নিজেদের ভাষা ভেঙে একটুও হয় না দাঁতালো।

তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছি ঘুরে ফিরে
দেয়াসিনীর মতন শরীরে
খুঁজছ এসে নিজের মনের মানে
কাকে ভালোবেসে যেন—ভালোবাসার টানে।

অনেক দূরের জলের আলোড়ন
যেন তোমার মন;
সেই নদীর জল
যেন আমার মনের কোলাহল;
তোমায় খুঁজে পায় না, তবু
ঘুরছে আমরণ।

অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে
শঙ্খসাগর এ রোদ ভালো লাগে।
এখুনি ঘুম এসে যাবে, কাছে
কালের কালো মহাসাগর আছে।

পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে

পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে মাঠে যারা খেলা করে,
কিংবা যারা অগণন ঘরের ভিতরে
আকাশকে টের পায়;
কোথাও আকাশ আছে মনে করে
কোনো এক নিদারুণ জ্যামিতিক বেদীর মতন,
কিংবা যারা দীর্ঘ—দীর্ঘতর মঞ্চে করে আরোহণ
ক্লান্ত হয় নাকো যারা যশে জয়ে কপালের ঘামে—
এই সব অবিরাম ধুলো যারা কিনে নেয় নক্ষত্রের দামে,
অক্লান্ত থাকুক তারা—ভয় পাক—ক্রমে ক্রমে স্থবির বয়স
কেড়ে নিক তাহাদের—

আশ্চর্য নিশীথে আজ ভাবি আমি: যুবা আমি?
হয়তো যুবক নই

অই সব নক্ষত্রেরা—এই শান্তি—শিশিরের এই শব্দ সব
মসৃণ চামড়া নীল বাদুড়েব—সৃষ্টির এই সব অনাদি বয়স
আমাকে দিয়েছে অব্যাহতি—
চারি দিকে কেবলই বন্দর আর নগরের কথা কাজ শব্দ আর গতি
বাঘের মতন যেন হরিণের ঘাড়
ভেঙে বারবার ইতিহাসে অন্ধকার

যারা রৌদ্রে সারা দিন টহল দিচ্ছে পৃথিবীতে
হুণ্ডি ফাঁদছে লুটছে ঘুরছে সাগরে,
কিংবা যারা ভিক্ষা চেয়ে দোরে দোরে ফেরে,
যারা তিক্ত কিংবা যারা মদের পিপের মতো মিঠে;

এখন করুক তারা স্বার্থের প্রয়োজনে রঙ্গ আর রণ,
অথবা জলের গায়ে কিংবা পাথরের বুকে লিখে যাক নাম,
হোক তারা ইন্দ্রপ্রস্থ মিশরের মতো দীর্ঘ থাম,
সমুদ্রের মতো করে করুক পৃথিবী আলোড়ন ;

অথবা দেখুক ভিক্ষাপাত্রের ফাটল আরো কী করে চৌচির-হয়ে যায়
ক্ষয়িত হয়েছে যা, তা আরো পায় ক্ষয়;
লক্ষ টন ইতিহাসে ছটাক কর্পূর
আছে কি না জেনে আবার গড়ুক রোম লণ্ডন বেবিলন উর।

কোনো-এক জ্যোৎস্না রাতে বারবার শিকারীর গুলির আওয়াজ শুনে

শূন্য রূঢ় অসুন্দর : কত বার ঘুরে ফিরে দেখিতেছি তাহাদের পৃথিবীর পথে :
দিনরাত ও বস্তিটা ... গলায় ঝুলিছে দড়ি তরুণীর ... জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় বারবার গুলির আওয়াজ;
ইচ্ছা হয় কোনো দূর প্রান্তরের কোলে গিয়ে শ্যামাপোকাদের ভিড়ে— কাশ মাখা সবুজ শরতে
বসে থাকি; আবার নতুন করে গড়ি সব ; আবার নতুন করে গড়ো তুমি ;
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই;
মানুষ ঘুমায়ে থাক—এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাক কাচপোকা মাছরাঙা পানকৌড়ি দয়েল চড়াই।
এক দিন হবে নাকি তাই?
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই।

নির্জন হাঁসের ছবি

নির্জন হাঁসের ছবি দেখি স্বপ্নে—চারি দিকে অন্ধকার ঘর
রূপালি গরিমা তার—যেন হীরা তরবার ঘুমের ভিতর
যত দূর চোখ যায় কাহার মুখের মেধা নদী যেন স্থির
কাহার মুখের মেধা যেন অরণ্যেরা
রাত যেন লেবুর ফুলের মতো নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা
শান্ত সব প্রতিবিম্ব— কবেকার জীবনের এই সব বেদনার স্তর।

বড়ো বড়ো গাছ

বড়ো বড়ো গাছ কেটে ফেলছে তারা।
এই সব উঁচু উঁচু গাছকে আমার ইচ্ছা লালন করেছিল;
আমার দেহের ভিতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ,
আমার মনে শহর ও সভ্যতার মতো শূন্যতা,
আমি দিনের আলোয়
কিংবা নক্ষত্রের যে আভা আনে রাতের পর রাতে
এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

কারা যেন অগ্রসরের কবিতা লিখছে কোথায়
কমিউনিজ্‌মের স্তম্ভ তৈরি করছে
মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে আজও মানুষের প্রয়াস।

অনেক দিন দেখেছি: উঁচু উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
আরো অনেক দিন দেখেছি: উঁচু উঁচু গাছ কাকের ভিড়ে
নীল জাফরান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব;
তবুও তারপর দেখেছি: রাত্রির সমুদ্রের পারে

নিস্তব্ধ লুক্কায়িত দ্বীপ যেন এক-একটা গাছ—
হৃদয়কে বাদুড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে বলে-

কিন্তু তোমার এ বিস্ময় থাকুক
গাছ নয়— মানুষকে দাঁড় করাও।

মনকে আমি নিজে

এই জীবনের ছকে-কাটা খেলার ঘরে এসে
হিসেব করে তোমায় ভালোবেসে
আমি যদি জয়ী হতাম—আলো পেতাম না তো।
ভালোবাসার অকূল সাগর বটের পাতায় ভেসে
পাড়ি দিতে চেয়েছি আমি তোমাকে ভালোবেসে।

*

তোমায় ভালোবেসেছি বলে ঋণ
অথবা চুরি করে আমি এই জীবনের দিন
পেয়েছি—চোর ভালোবাসার ধর্মে জ্ঞানী ব'লে
মরণনদী মুছে জীবননদীর পটভূমি
জেনেছে এই নিখিলে শুধু রয়েছ একা তুমি।

*

যদি এমন চলে যাবে তবে
কালের মহাসাগর হয়ে রবে
আমার হাতের জলের অঞ্জলি—
মন ছাড়া কেউ বোঝে না তাই মনকে আমি বলি।

তুমি যদি

তুমিই যদি চলে যাবে তবে
হরির নামের চেয়েও কেন বড়ো হয়ে রবে
তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা
অনন্তকাল বটের গাছে পাতার যাওয়াআসা
তুমি বুঝি যাবে একটিবারের জন্যে এসে?

যদি এমন চলে যাবে তবে
কোনো দিনও স্থির হয়ে কি রবে
গাছের পাতা জীবননদীর জল
তোমায় পেলে পাবে সে শেষ ফল
ঘুমে—অন্ধকারের ঘুমে এসে।

জানি নদী নীল সাগরও দু দণ্ডে শুকায়

চিতায় শরীর ফেলে রেখে মনও কোথায় যায়,
তোমার আমার ফুরিয়ে যাবার সময় তবু নেই
জন্মে জন্মে—তবুও জন্মে জন্মে ভালোবেসে।

সূর্য এলে

সূর্য এলে মনে আসে পৃথিবীর এক কোটি প্রান্তরের কথা—
অসংখ্য আঞ্জির গাছে উর্ণনাভ—মাছি;
জীবনকে পুনরায ময়দানবের মতো বুনন করার লোলুপতা
যদিও পিঙ্গল ধূমা কোথাও রয়েছে কাছাকাছি;

ইতস্তত মিনারের রুপালি আগুন;
কেলাসিত হয়ে আছে নক্ষত্রের দোষ;
আপাদমস্তক ঘিরে যেন তাহাদের
মৃত এক ডাইনীর সজীব মুখোশ;

দাঁড়ায়ে রযেছে তারা ; মিনারবিহীন
মূর্খ দেশ-দেশান্তের নিচু নীলিমাকে
পুনরায় উর্ধ্বে তুলে—সূর্যের কাছে—
যত দিন গিরেবাজ পাখি বেঁচে থাকে।

দিকে দিকে বুলভার জ্বলে ওঠে, তাতে
মানবিক চোখগুলো বিকশিত হয়;
জেব্রা ক্যাঙারু পুমা হলুদ রঙের বাঘ চিতা
পরস্পরের প্রতি মুখোমুখি অনুভাবনায়

চেয়ে থাকে জানালার চিলে ফাঁক দিযে,
এক মুঠো ডাইনামোর অন্তরাল থেকে,
স্টেশনের গ্যাসোলিন-মুণ্ডের পিছে;
কৃমিকীটদের মতো স্থির নিখুঁত বিবেকে

খোঁড়লের মতো করে কুরে খেয়ে ফেলছে হৃদয;
দিকে দিকে শুরু হল নগরীর ভোর—
এই সব কথা কিছু অতীতের। এক চুল ভ্রান্তির বিপদে
এখন সকল দেশে রয়েছে ভোরের হাড়গোড়।

জল

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
অন্ধকারে ঘাসের গন্ধ পাই;
কালো বেতের ফলে নিবিড় দিন

কোথার থেকে আবার এল ভেসে।

মনে পড়ে, জলের মতন ঘুরে অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নীচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে;

মৃত্যু এলে, মরে যেতে হবে
ভালোবাসা নদীর জলের মতন হয়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে অন্য সব সত্য থেকে ছুটি
নিয়ে সব জল হয়ে মিশে যেতে চায়;
পৃথিবীর চলমান স্পন্দনের বিহ্বলতায়
রণ আছে, রক্ত আছে, রুজি আর রুটি
আছে— খাঁটি ভালোবাসা দিতে গিয়ে ত্রুটি
হয়ে যায়; অন্ধকারে হৃদয়ের দায়
বিমুক্ত করার মতো কাকে আর পায়
জল ছাড়া? চারি দিকে কেবলই ভ্রুকুটি

ছড়িয়ে এ পৃথিবীতে রক্তছাইরেখা
এঁকে মুছে ফেলে দিতে গিয়ে ইতিহাস
নদীর নিবিড় জলে কেবল জলের শব্দ খোঁজে;
যেন কাছে—কোথাও গভীরভাবে রয়েছে সহজে
পৃথিবীর স্নিগ্ধ অন্ধকার জল একা :
কবের বিলীন হংসী আর তার হাঁস।

এখন ওরা

এখন ওরা ভোরের বেলা সবুজ ঘাসেব মাঠে
হো হো করে হাসে—হো হো হি হি করে,
অসংখ্যকাল ভোর এসেছে—আজকে তবু ভোরে
সময় যেন ঘোড়ার মতো নিজের খুরের নাল
হারিয়ে ফেলে চমকে গিয়ে অনন্ত সকাল
হয়ে এখন বিভোর হয়ে আছে;
মাঠের শেষে ঐ ছেলেটি রোদে
শুয়ে আছে ঐ মেয়েটির কাছে।
অনেক রাজার শাসন ভেঙে গেছে;
অনেক নদীর বদলে গেছে গতি;

আবহমান কালের থেকে পুরুষ-এয়োতি
এই পৃথিবীর তুলোর দণ্ডে সোনা
সবার চেয়ে দামি ভেবে সুখের সাধনা
নষ্ট করে গিয়েছে তবু লোভে;
ওরা দু জন ভালোবাসে অনন্ত ভোর ভ'রে
এ ছাড়া আজ সকল সূর্য ডোবে।

ডালপালা নড়ে বারবার

ডালপালা নড়ে বারবার,
পৃথিবীর উঁচু উঁচু গাছে
কথা আলোড়িত হয়; কেমন সে কথা।
অন্ধকারে শঙ্খ নুড়ি ঝিনুকের কাছে

অবশেষে একদিন থেমে
মনে হয় ক্লান্তির সাগর
মাঝে মাঝে চেনাতে চেয়েছে তার
দুই ফুট জমিনের ঘর।

শূন্যে শূন্যে ঢের মেঘ মুছে গেছে, তবু
নীলিমায় গা ভাসিয়ে নিয়ে শাদা মেঘ
সারা দিন কী চেয়েছে তবে .
সারা রাত কিসের উদ্‌বে।

কেন এই জীবনের সাগরে এঁসেছি,
হেসেছি খেলেছি কথা বলে গেছি কাজ করে গেছি,
আরো কিছু আলো পেলে ভালো হত ভেবে
তবু তার মূল্য সেই প্রাথমিক আলো হারিয়েছি।

হয়তো সূর্যই আলো—আলো মনোহীন;
মানুষের মনন হৃদয়
আলোহীন; অথবা, যা আলো ছিল—আজ
আলো চাই নব আলো আশার আনন্দে জ্যোতির্ময়।

যাত্রা

জানি না কোথাও শুভ বন্দর রয়েছে কিনা;
কোথাও প্রাণের কল্যাণ-সূর্যালোক আছে?
কোথাও এ অসময় সময়ের নদী পার হওয়া যায়?
পার হলে সাগর কি শান্তি আলো মুক্তির ভেতরে
যাত্রীকে আশ্বাস দেয়?

মানুষের ভঙ্গুর সাহস ভয় যাত্রা আর জীবনের মানে
স্থান পায়—স্থানে এসে পরিণতি পায়?
হয়তো বা পেয়ে যায়; অথবা সকলই অন্ধকার।
মানুষ যাত্রা করে—
যাত্রার প্রথম ফল সাগরের পথে নিরাপদে চলা
বন্দরের দিকে নিরুদ্‌বেগে যেতে পারা
বন্দরের থেকে বন্দরের বাঁধা পথ ছেড়ে দিয়ে
সমুদ্রের বড়ো আবিষ্কারে নেমে পড়া;
হৃদয় অন্তিম ফল হিসেবে আনন্দ চায়
শান্তি চায় নীল মহাসাগরের ভোরের আলোয়
আর একবার তার তারার আলোয়।
মানুষ জাহাজে চড়ে জীবনের সমুদ্রে ভিড়েছে;
সাগর চলেছে—সময় চলেছে—মানুষ চলেছে—
ক্যাবিনের ছ্যাঁদার ভেতরে ঢুকে একা
(সাগরের স্পন্দনে শরীর অসহায়
বমি করে—কাঠবমি হল যেন—
নাড়ি যেন ছেড়ে গেছে বলে মনে হয়।)
ডেকে পাইচারি করে একা। একা। একা।
বর্শার ফলার মতো আলো এসে পড়ে।
স্তব্ধ হয়ে কোনো এক বিন্দুর ভিতরে থেমে থাকা।
অনেকের সাথে পরিচয় হয়, হাসিগল্প চলে,
মন ব্যথা পায়, বোকার মতন লাগে, ভীষণ অবাক মানে;
শোকাবহ ক্লান্তি রয়ে গেছে; ভয়াবহ বেদ আছে :
সূর্যের নক্ষত্রের জাহাজের বিদ্যুতের আলোর ভিতরে
কেউ কেউ গুঞ্জরণ উচ্চাবণ করে যায়;
কেউ কেউ অবচেতনায় চেপে রেখে দিতে চায় সব;
কারো কারো মন স্বভাবত নিহতচেতন;
হাসছে খেলছে গুলগল্পে গরমে মেতে আছে—
খাচ্ছে—ছুটছে—চালানি মালের মতো দিনরাত দিচ্ছে নিচ্ছে
দেহ—ভালোবাসা—(দেহমাংস)—
সারা দিন চামড়া মাংস বিকিকিনি শেষ হয়ে গেলে
তারার আলোয় এসে ঘ-মানুষের মতো এরাও মানুষ :
আচ্ছন্ন করুণ, চেতনা জেগেছে, পথ নেই, বিন্দুর ভিতরে
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে জাহাজ—মুর্গির খাঁচার মতো যেন;
তবুও তা নয়—
আকাশ বিমুক্ত হয়ে আছে।
অনন্তে যে কথা আছে সব স্পর্শসহ
বেতারের বুকে এসে ধরা পড়ে;
জিজ্ঞাসার আলোড়ন—প্রশ্নের মীমাংসা—লেনদেন
কেবলই চলেছে সারা দিন।
জাহাজ চালায় যারা বুদ্ধিমান— নৌবিদ্যাপ্রবীণ
তবু বলে : জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধরে কেবলই ডুবছে:

যাত্রীরা মরে গেছে—নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলই বিপদ আছে বাঁকে—পথে—তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন—
মরে যেতে হবে—যাত্রী, তবু চলো—
না ডুবেও ডুবে যাওয়া যায় দুটো সাগরের জলে—
না মরেও প্রতি মুহূর্তেই তবু মরে যেতে হয়;
জীবনের বিনিপাত প্রতি নিমেষেই আছে—
প্রতি নিমেষেই জীবন মরছে, যাত্রী, সাগরনির্জন তলাতলে
কোথায় ডুবছে চিন্তা অনুবেদনায় ভরপুর যাত্রীদের মাথা
বুদ্‌বুদের শূন্যে ভরপুর
মৃত মাথা আপনার জীবনের খবর রাখছে—
কত বার মৃত্যু হল ভাবছে—গুনছে—
সাগরের তলে—আরো অন্ধকার তলে লীন হয়ে গিয়ে তবু
জাহাজের ডেকের ওপরে ফিরে আসা,
খাওয়া, হাসা, খেলা করা, কথা বলা, চিন্তা করা,
বন্ধু হওয়া, ভেক ধরে থাকা, পরামর্শ দেওয়া,
রেজিষ্ট্রির সময় হয়েছে ভেবে খাতায় স্বাক্ষর করে বিয়ে করা
কাকে যেন : জীবন তো বিবাহিত হয়ে ছিল ঢের বার;
বারবার : বিচ্ছিন্ন হয়েছে বারবার
হয়তো এ জন্মে নয়—এই দিকে—এই প্রান্তে নয়—
চারি দিকে অন্ধকার বেড়ে ওঠে;
ঘুমোবার ভান করে পড়ে আছে ঢের যাত্রী
ভান ঢের ভালো হলে অঘোরে ঘুমোবে;
কারো চোখে ঘুম নেই;
মৃত্যু হলে শব সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়—
সেই মৃত্যু নেই;
অন্য এক হেঁটে চলা বসে থাকা কথা শেষ—
কথা শেষ না করার মৃত্যু আছে।
এক জোড়া তাস নিয়ে জাদুকর হযে
খেলা করা যেত যদি এই অন্ধকারে,
জাহাজ ভর্তি সব পুরুষমেয়েকে যদি খানিক উড়ুক্কু ভোজবাজি
কী করে টুপির থেকে অনেক পায়রা বার ক'রে
উচ্ছ্বাসে ওড়ানো যায়—দেখিয়ে ওড়ানো যেত হৃদয়কে
অনন্ত রাত্রির দিকে উন্মাদ উৎসবে—
জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধরে কেবলই ডুবছে,
যাত্রীরা মবে গেছে—নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলই বিপদ আছে বাঁকে—পথে—তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন—
মরে গিয়ে তবু
মৃত্যুশীল—মৃত্যুর নিঃশেষ নেই—নেই—যাত্রী চলেছে।

বিকেলের আলোয়

রাতের কিনারে বসে নয়
বিকেলের আলোয় আমি স্বপ্ন দেখলাম :
কোন্ এক সুদূর মরুভূমিতে চলে গেছি
সেখানে গভীর জ্যোৎস্নারাতে
বালির গায়ে বালুকণার শব্দ
(পৃথিবীর পাতা ঝরার মতো)
স্ফটিকের নির্জন আলোর মতো বাতাস
কুমারীর নির্মল মসৃণ দেহের মতো।
কয়েকটি প্রেত উড়ে বেড়াচ্ছে সেখানে
মানুষের শব্দে চমকে হাওয়ার ভিতর হারিয়ে গিয়ে।
মরণের কত শত শতাব্দীর পর
সেই ধূসর পরিধি খুঁজে পাব আমি :
তার সেই হাত আমার জিভকে আচ্ছন্ন করবে
স্ফটিক আলোর মতো বাতাসের অনন্ত নিস্তব্ধতার ভিতর?

এখন রাতের শেষে

এখন রাতের শেষে আবার প্রান্তর আছে শ্যাম হয়ে প্রান্তরে ছড়ায়ে;
ঊর্ণনাভের জালে আবার নেমেছে ব্রহ্মা হৃদয়ের কাজ বুঝে নিয়ে;
সেইখানে শান্ত সব শিশিরের সূপে
ভোরবেলা থেকে থেকে জ্বলে ওঠে আধ ফুট সূর্যের রূপে ;
ঘাসের উপরে সব ভূতেরা গিয়েছে খেলে—জ্যোৎস্নার রাতে
মহেঞ্জোদড়োর থেকে এসে—
তাদের গায়ের ঘ্রাণ এখনও বাতাসে লেগে আছে মনে হয়;
একটি ধবল ঘোড়া সন্দেহ আতুর হয়ে পলনিপলের অবলেশে
তাকায়ে রয়েছে দূর চক্রবাল নীলিমার কুয়াশার দিকে;
সেইখানে কারা তবু আছে:
অনেক ধূসর ঘোড়া খেলে যেত যদি কোনো মেহগনি অরণ্যে সেখানে,
সোনালি সবুজ শাদা কাকাতুয়াগুলি জটিল শিকড়শীল গাছে
অসংখ্য ভাষায় হেসে খুন হয় কমলরঙিন রৌদ্র ঘিরে,
তা হলে এ পৃথিবীর রাজনীতিবিদ যোদ্ধা নেতারা এখন
ঢুকে যাক সমুদ্রের পুরুভুজ—পাললিক মলের ভিতরে।
যদিও তাদের দেশে জন্মেছিল অপরূপ নারীমুণ্ড—শঙ্খের মতন শুভ্র স্তন।

অনেক রক্তে

অনেক রক্তে উত্তেজিত হয়েছে সারা দিন।
অনেক সাধ স্বপ্ন নিয়ে ফিরে
বুঝেছে প্রাণ মহৎ নামের অন্তরালে প্রেমও

ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে মানবশরীরে।

জানি আমি; তবুও ভালোবাসা
মানবদেহ ছাড়া
মানবাত্মা কোথাও পায় নাকো
গভীর নারীশরীরে এর সাড়া।

মানবহৃদয় নির্মিত হয় তাই;
প্রেমিক উপলব্ধি করে নিজের মনের কথা;
ভালোবাসা, তোমাকে ভালোবাসা;
না হলে সব জ্ঞানের নিষ্ফলতা।

এসো

এসো—(এসো—এসো) আমার কাছে তোমার আসা
না হলে মরে যাবে না ভালোবাসা;
মানুষ শুধু চায়
কখনও নীল আকাশকে কি পায়
কোনো দিনের কোনো পথের শেষে।

পাখির পালক বটের পাতা হতেছে মলিন;
কোথায় তুমি রয়েছ এত দিন?
সময় তোমার আমার হাতে বুঝি
দেবে না আর যতই আমি খুঁজি
জলের মতন জলের খোঁজে ভেসে।

মন তবুও না হার মেনে চলে
নদীর জলে— পদ্মপাতার জলে
নিজেকে ঢেলে সাজিয়ে নিয়ে মন
সাত সাগরের ঘুরছে আজীবন
খুঁজছে আবার পদ্মপাতায় এসে ॥

আকাশ ভ'রে

আকাশ ভ'রে যেন নিখিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা
জেগে আছে কূলের থেকে কূলে;
মানবজাতির দু মুহূর্তের অনেক পরিসর
(কেমন যেন) অধীর অবুঝ শিশুর শব্দ তুলে

চেয়ে দেখে পারাপারের ব্যাপ্ত নক্ষত্রেরা
আগুন নিয়ে বিষম, তবু অক্ষত, স্থির জীবনে আলোকিত

ওদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন হয়ে তবু
মানুষ আজও স্বাধীনতার মূল্য শেখে নি তো।

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা ·
আমাদের আজ এনেছে যেই বিষম ইতিহাসে
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা—

মানুষ ও তার পটভূমির হিসাবে গরমিল
রয়েছে বলে কখনও পরিবর্তনীয় নয়?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হতে
মানে, ঢের দীর্ঘ দুঃসময়ে।

যেখানে মনীষী তার

যেখানে মনীষী তার মোম নিয়ে বসে আছে রাত্রির ভিতরে
মাথার একটি চুলও (হয়ে আছে) লোহার পিণ্ডের মতো ভারী
মনপবনের চাপ খেয়ে
সকল পাহাড় নদী ডিঙিয়ে এখন তাড়াতাড়ি
সেইখানে চলে এসো—কাচের গেলাসে তার—জলের ভিতরে
যখনই সে দিতে যাবে নির্জন চুমুক—
যেন তার সব চিন্তা—সব ক্লান্তি—সৃষ্টির প্রয়াস
হঠাৎ দেখতে পায প্রমত্ত কুকুরদের মুখ।
আমরা শুনেছি তার কাঁধে এই পৃথিবীর ভার—
সর্বদাই তার মনে জন্ম নিতে চায
নতুন সমাজ চিন্তা কবিতা প্রসাদ।
সম্মুখিন বিষয়ের মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়ায়।
সর্বদাই অসমাপ্ত কর্তব্যের স্তূপে।
তবুও অমূল্য : জল! যদিও জলের মতো দর।
চলে এসো মনীষীকে গেলাসের ভিতরে দেখাই
মত্ত কুকুরের মতো আমাদের দাঁতের রগড়।

কবিতার খসড়া

জীবনের ঢের কাজ হয়ে গেল পরে
মনে হয় মানুষের শরীরের ক্ষয়
পৃথিবীর পথে গিয়ে করণীয় অনেক কাজেই
বিধাতার মতো আর নয়।
তখন নিজের কাছে পৌঁছে ক্রমে মন
অন্ধকারে নক্ষত্রের অগ্নির মতন
স্থান পেয়ে সময়ের সমস্ত আকাশে

নিজেকে সংকীর্ণ করে নিয়ে তবু গভীর পৃথিবী ভালোবাসে।
অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে ভুলে বিলোড়িত হয়ে
রাত্রিদিন কাছে চলে আসে ইতিহাস ;
তাকে যা দেবার দিয়ে তারই ভেতর থেকে তবু
জ্ঞান শান্তি বাস্তবতা প্রেমের নিশ্বাস
পাওয়া যায় কোনো কোনো লক্ষ্য উৎস ব্যক্তির কাছে।
ইতিহাসে শোকাবহ অন্ধ বেগ আছে ;
যদিও আঁধার বড়ো, সংকল্প প্রেরণা প্রেম উদাসীন শক্তির মতন
ভেঙে ফেলে; এখনও ভাঙে নি এই অগ্নি এই মন।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে

ঢেউয়ে–ঢেউয়ে হালভাঙা জাহাজের সাক্ষ্য রেখে দিয়ে—
কুয়াশায় ঘণ্টা নেড়ে কম্পাশ তৈরি ক'রে— চাকা
ঘুরিয়ে–ঘুরিয়ে কল ভেঙে গ'ড়ে গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে
বেনামী নদীকে নাম দান ক'রে নাম ভুলে গিয়ে
মানুষের বিবরণে কুয়াশায় অন্ধকারে চলেছে মানুষ;
মৃত মানুষের বোঝা, বিধানের হৃদয়ের অবিরল পচনশীলতা,
মড়কের ইঁদুরের অন্তহীন খাঁচা নিয়ে চলেছে— চলেছে—
এ–সবের থেকে তবু উৎসারিত অনুভূতি জ্ঞান
প্রেম পেয়ে এই বার সব কুজ্ঝটিকা
শেষ ক'রে মহাসাগরের ভোরে আলো
আরো আলো পাওয়া যাবে?— আরো গাঢ় সম্মিলন?
নদীর ও নীল সমুদ্রের আরো বড় রেখা?
বলয়ের পরে আরো বলয় রয়েছে;
সেখানে অন্তিম শূন্য আছে;
শতকের মহাশতকের
উজ্জ্বলতা আছে।
শ্মশানের স্তব্ধতাও ভালো, তবু উৎস আলো শান্তি প্রীতি সব
ভেতরে—ওপরের— সূর্যের লক্ষ্যে প্রয়াণের।

হেমন্তের নদীর পারে

মাঝে মাঝে মনে হয়
হেমন্তসন্ধ্যায় ওই বৃক্ষদের মুখ দেখে
আবছায়া নদীর দর্পণে:
যে বিতর্ক লোপ পায় বালিকার মেধে
অথবা যুবার চিত্তে অকালজটীর মতো আশ্চর্য নির্বেদে
কিংবা যোদ্ধৃদের প্রাণে সারা দিন বায়ুকুকুরের মতো ঘুরে—
তবু মানুষের সাথে শুরু পরিচয় চেয়ে নিশীথের ভূমিকায়
সেই সব চিন্তা এসে পিতাদের হৃদয়ে দাঁড়ায়।

মৃত, বর্তমানে উপেক্ষিত কবিদের উপর অনেক সমালোচনা পড়ে

শিল্পের উন্মার্গ নিয়ে বেঁচে ছিল যারা পৃথিবীতে
তাহাদের তাপ যদি এক মাঘে জন্ম নিয়ে অন্য এক শীতে
হয়ে যেত পৃথিবীর ভূস্তরে বিলীন,
তাহলে হৃদয়ে আর অহংকার থাকিত না ভাষ্যকারদের;
মৃত্তিকার সাত হাত নীচে থেকে কবিও পেত না তবে টের
যেই সব ব্যূঢ় চিন্তা এক দিন করেছে সে মানুষের মতো দেহ ধরে
বিষুবরেখার সাথে ঘুরে
তাহারা বিষাক্ত সাপ যেন আজ; আর সবই ভারতীয় খেলার সাপুড়ে।

শিল্পী

জীবন কাটায়ে দেয় যে মানুষ সূক্ষ্মতর শিল্পচিন্তা নিয়ে,
ফলকের পর ক্ষুদ্র নিয়ন্তা রেখার টানে ফেলেছে যে সীমানা হারিয়ে,
সেই সব মানুষের আত্মা যেন বিস্রস্ত মুকুরে
কেবলই নড়িতে আছে জলের আভার মতো উদ্‌বিগ্ন দুপুরে।
অথবা আশ্চর্য হংসী অব্যর্থ ডানার অসংযমে
নির্ঝরের কোনো এক রূপালি শঙ্কের মতো মাছকে প্রণয়ী বলে ভেবেছিল ভ্রমে;
আজও ভাবে; বরফের মতো শাদা ডানা নিয়ে পিঙ্গল ঢেউয়ের পিঠে চড়ে
যখন সে তীব খেয়ে—অথবা রক্তের হর্ষে সৌরপৃথিবীর মতো ঘোরে!

অনেক বছর ধূসরতার ভিতর দিয়ে

অনেক বছর ধূসরতার ভিতর দিয়ে তোমার মুখের ছবি ভেসে ওঠে (আবার)
(তোমার মুখ যেন) আমাকে নিয়ে জীবনের (অনেক) সহজ
সৌন্দর্যের ওপর হাত রাখে (আবার)
(মনে হয়) এক প্রান্তরের দেশে চলে গেছি আমরা
পশ্চিমের লাল সূর্য সেখানে চাষার মত তার শেষ
বোমা রাখে
যতদূর চোখ যায় সোনালী খড়ের কান্তার
উঁচু উঁচু গাছের ডালপালা ঘিরে আকাংখার করুণ ঝপৌদি
কাক-পাখিদের ডানার থেকে ঝরে পড়ছে
তাদের নীল মসৃণ ডানা মেঘের কমলা আলোর আঙার
ভিতর বেঁচে থাকে সেইখানে
গাছের হলুদ-রক্তিম পাতা খসে খসে লল
সূর্যের দিকে উড়ে যায়।

আমাদের বুদ্ধি আজ

আমাদের বুদ্ধি আজ অন্তহীন মরুচর, তাই
প্রাণে শুধু বিষয়ের নিত্য দাহ আছে।
তার শান্তি সময়ের সাগরের কাছে
হয়তো বা পাওয়া যেতে পারে;
কিন্তু কোন্ সময়ের দিকে যেতে হবে?
শূন্যের ভিতরে ফল যেখানে রয়েছে মনে হয়?
অথবা যেদিকে গিয়ে হৃদয় ক্রমেই
শান্ত হয়ে টের পাবে শূন্য ছাড়া আর কিছু নেই?
তবুও সূচনা থেকে যাত্রা করে কোনো প্রান্তে যাওয়া
ভালো; কোথাও চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে
বৃক্ষ নদী কুজ্ঝটিকা রক্তের আকাশ শতাব্দীর ভাঙা বাটখারা;
মূল্যনির্ণযের কাজে উঠছে পড়ছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো নীড় ঘাস
ক্রেন এরিয়েল ট্রেন—গুণচট চালানির মাল
যে সাগর রোদে চলে—তবু কালো কুয়াশাকে আলো
মনে ভেবে অনাবিলভাবে চলে
বেতার কম্পাশ বাষ্প কলকজা হাল মাস্তুলের
হাড়গোড়ে বুক ভরে কর্মোৎসাহী ব্যাপারীর মতো
সোনা রূপো চলতি বাজারদর জানার ও জানবার বেগে,
চলে যায় অন্ধকারে ভেদ করে .
অদ্ভুত আবছা মূর্তি বুকে টেনে নিয়ে
বদ্বীপ ও বন্দরের দিকে,
চেতনার সে রকম চলা হল টের।
দূর কাঁটা কম্পাশের দিক্‌চিহ্ন আজ
ক্রমাযত শূন্যে বিলীন?
এক দিন যা-কিছু স্পষ্ট মনে হয়েছিল
সে সব এখন আর স্থির
নির্ধারিত সত্য নয়;
আলো বেড়ে গেছে; আবছায়া আরো
বেড়ে গেছে;
আলো আরো বাড়লে ভয়াল পতঙ্গ সব ঘিরে রবে;
শত্রুদের দণ্ড আরো বেড়ে যাবে;
অনিশ্চিত বড়ো অন্ধকার সব দেখা যাবে;
হয়তো আগুনে পরিণত হয়ে যাবে আলো।
হে হৃদয়, তবুও আঁধারদর্শী চেতনা-বলের দরকার।
দূর থেকে আরো দূরে যাত্রার প্রয়োজন আছে।
ভুল ছেড়ে অন্য এক শুদ্ধ কেন্দ্রে গিয়ে—
তাও ঠিক শুদ্ধ নয়—কী হবে দাঁড়িয়ে।
জন্মের আগে সেই কুজ্ঝটিকা ছিল,
মৃত্যুর পরে যেই অন্ধকার নিঃশব্দতা রবে,

সেই সব কিছু নয়;
জেনে মন চলেছে নতুন সূর্যে দিক্‌নির্ণয়ে
কিছু সূর্য—ঢের বেশি ছায়া দিয়ে হৃদয়কে ভ'রে
মধ্যবয়সী প্রৌঢ় স্থবির আত্মার বর্ণে
বারবার সূর্য ভেঙে গ'ড়ে।

টেবিলে অনেক বই

এইবার চিন্তা স্থির করবার অবসর এসেছে জীবনে
হৃদয় বয়স্ক হল ঢের;
মোম জ্বলে নিভে যায় অনেক গভীর রাত হলে
অন্ধকারে এক আধটা আবছা ইঁদুরের
আসাযাওয়া টের পাই ঘরের মেঝেয
হয়তো বা সিলিঙের 'পরে
বাইরে শিশির ঝরে কুয়াশায়—শীতে
লক্ষ্মীপেঁচার ডানা সজনের ডালে শব্দ করে।

টেবিলে অনেক বই ছড়িয়ে রয়েছে;
চিন্তাগুলো যেন অনুলোম-প্রতিলোম
পরস্পরের প্রতি—ঠাণ্ডা শাদা নারীর মতন
দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপে মোম—
একটি গভীর সূত্রে গ্রথিত কি হবে
বইয়ের সকল চিন্তা জীবনের সব অভিজ্ঞতা?
সকল নক্ষত্র আর সময়ের অপাব গতির
ইতিহাসবৃত্তান্তের আগাগোড়া কথা?

এ সব আশ্চর্য তত্ত্ব ভেবে তবু মন
অনুভব করে এই অন্ধকাব ঘরে আজ কেউ
নেই, শুধু এক বিন্দু মূল্যনির্ণয়ের চেষ্টা ছাড়া।
কোনো এক দূর মহাসাগরের ঢেউ
এসে এই অন্ধকার বন্দর স্পর্শ ক'রে চুপে
কোন্ এক দূর দিকে চলে যায, তবে
সময়ের অন্তিম সঞ্চযে প্রেম-করুণার বলয় রয়েছে?
ব্যক্তির ও মানবের সফলতা হবে?
হযতো এ ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশ অন্ধকার ছাড়া
মানুষের ভবিষ্যতে কিছু নেই আর;
সেবা ক্ষমা স্নিগ্ধতা যে আলোর মতন
মানুষের হাতে, তার বুজে-যাওয়া অন্ধ আধার
বারবার বড়ো এক পরিবর্তনীয়তার দিকে
যেতে চায়—সনাতন অন্ধকারে এ প্রয়াস ভালো:
তবু এই পৃথিবীতে প্রেমের গভীর গন্ধ আছে।
জীবনে রয়েছে তার (অপরূপ) প্রতিভাত আলো।

কখনও মুহূর্ত

কখনও মুহূর্ত আসে সূর্য আর শিশিরের জলে
বসে থাকবার মতো—
অথবা কখনও দেখি দিন নিভে গেছে
হরিয়াল প্রান্তরের পারে চলে গেছে
ডানার ঝিলিকে তার সব চেয়ে শেষ রোদ্দুর
জ্বালিয়ে সে সূর্যকে নিভিয়ে এবার নিভে গেল।

পৃথিবীতে এইবার নদীর নিজের ঠিক মুহূর্ত এসেছে;
টেরচা বাঁক ভাঙা পাড় দিয়ে হেঁটে হেঁটে
মনে হয়, মানুষের হাতে-গড়া সাঁকো
কোনো প্রতীকের মতো বস্তু নয়,
দিক্‌দর্শনের মতো নিজেই রয়েছে এই নদী
অন্ধকার জল থেকে ধূসর জলের দিকে চলে যায়, গেছে;
আজকের কালকের আগামী কালের
নিরিখ ও নাবিককে বুকে করে নিয়ে চলে গেছে;
জীবনকে নৌবিদ্যা শেখায়
ঝড়ে আর শান্ত জলে ঘূর্ণি জলে চোরাবালি পাঁকে
ঢের বার তোমাকে আমাকে গ্রাস ক'রে
আবার ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীর পটে—পটান্তরে—হৃদয়ে—বিষয়ে
দ্রুত ধাবমান শাদা-কালোর রঙের অক্লান্ত ভূমিকায়
যেতে চায় কোনো এক সাগরের দিকে
মানুষের বিবরণ প্রাচীন হয়েছে ঢের
আমাদের সকলের বয়স বেড়েছে খুব
নদী এসে বারবার যযাতিকে যৌবন দেয়
ঘনজলধন্যা নদী—স্থবিরতা নেই;
পাড় ভেঙে ফেলে পাড়া প্রান্তরের দিকে চলে
যেন সে আকাশ নীল—আকাশের ঝড়—দুই দিকে তীর আছে—নেই
যেইখানে রাষ্ট্র নেই—সেই নৈরাজ্যের দিকে যায়
যেখানে মানুষ নেই—অপমানুষের ভিড় মরা-আধমরা
হাড় আছে রক্ত আছে বালি ফণীমনসার কাঁটা
নিয়ন টিউব গ্যাস বিদ্যুৎবাতির বিহ্বলতা
এই সব আলোড়ন ভাঙা শূন্য কান্তি আর নীড়
ভেদ ক'রে বিষ গিলে অমৃতকুম্ভের মতো কোলাহলে
ঢের মৃত নাবিককে নিমগ্ন নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে
নব নব নাবিকের জন্ম দিয়ে তারা আর সূর্যের আলোয়
মাছরাঙা-বর্ণিমায় অন্ধকারে রোদের ঝিলিকে
কেবলই ব্যক্তির মন ভেঙে নিয়ে নিয়ে নদী নব নব জল গ'ড়ে নিল
ইতিহাসবেলা ভেঙে অসীম সাগর
সিন্ধু অতিক্রম ক'রে অপার আকাশ

মানুষকে অতিক্রম ক'রে ফেলে নবীন মানব
নব শীত নব রাত্রি বিপদের দিক্‌চক্রবাল
লক্ষ্য ক'রে অবিরল জলকল্লোলের রক্ত, জল,
আর মরুভূমি আর মানব চলেছে অবিরল।

সুদীর্ঘকাল তারার আলো

সুদীর্ঘকাল তারার আলো মোমের বাতির দিকে
তাকিয়েছিল দুজন ওরা : শান্ত কক্ষে নীল জানালার পাশে
কাছাকাছি দুটো তারা : আলোকবর্ষ অনেক আলোকবর্ষ গেলে পরে
কাছে কাছে থেকে তারা রবে কি প্রবাসে?
এই তারাটির আলো গিয়ে পড়বে না কি অপর তারার বুকে
মনের গভীরতম সুখে—সমস্ত অসুখে?

এ নক্ষত্র ঝরে গেছে হয়তো তখন কালের নিয়মে
ও নক্ষত্রে পৌঁছাতেছে হয়তো তখন সে অনুপম মৃত তারার আলো

এমনি পটভূমির ভূলে কি আমাদের সময় ফুরাল?
ফুরিয়ে যাক—ভুল তো নয়, সে ভুল যদি সত্য মনে হয়
জীবিত বা মৃত তারা বিশ্ব-অন্ধকারের আড়াআড়ি
অন্য মৃত বা জীবিত তারার দেখা চেয়ে
সময় কি শেষ করতে পারে? আমরা তো তা পারি।

ঐ তো নারী বসে আছে হয়তো মৃত তারা;
এই তো আমি তাকিয়ে আছি তারার আলোর মতো
আমরা দুজন অতল অমায় হয়তো নিভে গেছি;
পাশাপাশি জ্বলেছিলাম, অনন্তকাল জ্বলছি; প্রেমের অনির্বাণস্বভাববশত।

কবের সে রাত্রি আজ

কবের সে রাত্রি আজ মনে পড়ে প্রিয়।
হঠাৎ এঞ্জিনরোল স্তব্ধ হল অন্ধকারে এসে
দিল্লীর না লাহোরের বসন্তরাতের টার্মিনাসে,
অপ্রদীপ রাত্রি রীতি অহেতুক উৎসারিত জিনিস হৃদয়ে
ক্লান্ত শরীরের পরে তবু প্রিয় মননের জয়ে
ঈষৎ উৎসবে মেতে হুইলার স্টলের নিকটে বসেছিল
চা খেয়ে দু-এক কাপ বইগুলো নেড়েচেড়ে
তারপর কখন অনেক রাত হলে
মানব আত্মার ক্রান্তি আঁধার সমুদ্র বেয়ে চেনা
ধু ধু ঢেউদের শোরগোলে

কখন নিজেকে দেখে অচেনা পালকদামে আধা
বিভূষিত পাখি এক ঢেউয়ের উঠতি পথে শাদা
চাঁদের আলোয় দূর সুমুখের সমুদ্র নির্জন পরিষ্কার।
সাগরের পার দিয়ে দূর দিগন্তের টেলিগ্রাফ তার।
অথবা তা স্নিগ্ধ এক বাতাসের সুর;
সময় চলেছে নিজ পথ কেটে বাতাসের মতন বিধুর
সেখানে প্রেমের কোনো কথা
পৃথিবীর শারীরিকতায় প্রিয় নারীমুখ কেউ
সৈকতের স্পর্শহীন চাঁদের দুয়ারে দূরে রয়ে গেছে বলে
কবেকার অ্যামিবার নীড় ভেঙে ঋজু নীল সমুদ্রের ঢেউ
মানবজাতির চোখে কেঁপে উঠে আজ
দেখাতেছে কাকে বলে প্রকৃতির বিচ্ছেদের রাত
অথবা তা সমাজের প্রেমিকের হৃদয়ের...
এই সব অবিচ্ছিন্ন অনুভব অন্ধকারে থামবে হঠাৎ
কখন দাঁড়ালে তুমি নারীর মতন কেশপাশে।

নারী তুমি আমার না অপরের?
কাহার পায়ের সুর যেন নেমে আসে
তোমার চোখের সুরে—অপরের অথবা আমার?
বাতাসে অগুরু গন্ধ ভেসে ওঠে বাতিহীন রাতে
মৃত যারা মরে গিয়ে অন্ধ স্নিগ্ধ দিক্‌প্রান্তে সব
সময়ের বিছানায় শুয়ে আছে সব ক্ষোভ ভুলে
তাদের প্রশান্তি এই মেয়েটির আজানুলম্বিত ঘন চুলে
মৃতদের কাছ থেকে এরকম স্বাভাবিক ঋণ
সহজে গ্রহণ ক'রে নারী
দাঁড়ায়ে রয়েছে শাদা সুধাস্পর্শসাক্ষরিত হয়ে
কোটি কাল আগে আমি পৃথিবীতে সেই এক শরীর ছিলাম
যেই এক শরীরিণী জীবনীকে চেয়ে
অনেক নক্ষত্র ক্রান্তি শেষ করে সময়ের রূপ ভেঙে গ'ড়ে
সে আজ নিকটে এসে দাঁড়ায়েছে অগণ্য আঁধার
ভেঙে ফেলে পুনরায় অন্ধকারে দাঁড়াবার সাধ
যেই সব দূর দূর দূরতার নক্ষত্রের
তাদের শখের মতো মেয়েটির গভীর চুম্বক
সৃজনের শোকাবহ অন্ধকারে কান পেতে কোন্ দূর অবক্ষয়ধূসর তারাকে
নিজের অভ্রান্ত একা আয়ুহীন কক্ষলোকে ডাকে

সেই নারী—কোথাও যুবক বুঝি বিশৃঙ্খল অন্ধকারে তাকে
নিয়ে গেছে—নিয়ে যাবে—নিয়ে যেতে পারে—
টার্মিনাসে মরু দিল্লীর রাত ভেঙে ফেলে আমরা দুজন
নক্ষত্রের পথে অন্য নক্ষত্রের আলোকবর্ষের সহ-অসহমরণ
প্রতিভাত করে নিয়ে নেমে গেছি কিছু দূর পৃথিবীর অসুখে আলোকে

হাতে তার দুচারটে বই, স্টলের চায়ের
ঈষৎ সুমিষ্ট ঘ্রাণ—হৃদয়ে অ্যামিবা ঊর্মিময় এক নীল
সাগর অনন্তকাল পথ চলে আজ গভীর ফেনিল
মানুষের প্রমিতির মৃত পত্রে নীলোচ্ছ্বাস হয়ে গেছে বলে বুঝি
ব্যথায় আতুর হয়ে বলেছিলে 'প্রিয়'
আমাকে না আমাদের দুজনের পাশে যে তৃতীয়
যুবক দাঁড়ায়েছিল তাকে?
অনাথ অঙ্গার হয়ে সৃজনের দ্রুত অন্ধকারে
আমার মতন যুবা—হাতে ধরা মোমের বাতির মতো জ্বলে
উঠে যেতে যেতে চুপে অনন্ত সরল বক্র সিঁড়ির দুধারে
দেখেছে বেপথুমান মানবের মহামানবের যান
ক্রমাগত নিভে যেতে থাকে
তারপর দেখেছিল দেখেছি যে সূর্যচক্ষে
সংক্রান্তির সবিতার মতন তোমাকে।

এইখানে সূর্যের

এইখানে সূর্যের তত দূব উজ্জ্বলতা নেই।
মানুষ অনেক দিন পৃথিবীতে আছে।
'মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার
ক্রমেই আলোর মতো হতে চায়—'
ওরা বলে, ওরা আজও এই কথা ভাবে।
এক দিন সৃষ্টির পরিধি ঘিরে কেমন আশ্চর্য এক আভা
দেখা গিয়েছিল; মাদালীন দেখেছিল—আরো কেউ কেউ;
অম্বাপালী সুজাতা ও সংঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
আড়ালে আর-এক আলো দেখেছিল;
হয়তো তা লুপ্ত এক বড়ো পৃথিবীর
আলোকের নিজ গুণ,
অথবা তখনকার মানুষের চোখের ও হৃদয়ের দোষ।

এই বিশ শতকে এখন
মানুষের কাছে আলো-আঁধারেব আর-একরকম মানে :
যেখানে সূর্যেব আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই
সেইখানে অন্ধকার ;
যেখানে চিন্তাব ধারা রীতিহীন—শব্দের প্রয়োগ অসংগত—
প্রাণের আবেগ ঢের শতকের আপ্রাণ চেষ্টায়
যেখানে সহিষ্ণু স্থির মানুষের সাধনার ফলে
বিপ্লবিনী নদীর বাঁধের মতো হয়ে—তবু কোনো এক দিন
কেন যেন জলের গর্জনে আলুলায়িত হয়েছে
সেখানে (ওদের মতো) আলো নেই;
অথবা নিজেকে নিজে প্রতিহত করে ফেলে আলো
সেইখানে অন্ধকার।

মনীষীরা এরকমভাবে আজ শুদ্ধ চিন্তা করে,
সমাজের কল্যাণ চায়,
দিক্‌নির্ণয় করে।
অটুট বাঁধের মতো মনে হয় জ্ঞানীদের মন যেন—
টেনিসির দামোদর অথবা কোশীর।
তবুও আগুন জল বাতাসের প্লাবনের মানে
সেতু ভেঙে নব সেতু প্রণয়ন; আজ তা আত্মস্থ সেতু জানে?
মাঝে মাঝে বাসুকির লিপ্ত মাথা টলে,
ক্লান্ত হয়ে শান্তি পায় অপরূপ প্রলয়কম্পনে;
পৃথিবীর বন্দিনীরা হেসে ওঠে।...
রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায়
সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই।
অনেক কল্যাণশীল নগর জাগছে;
সেইখানে দিনে সূর্য নিজে,
নিয়ন টিউব গ্যাস রাত্রির;
উন্মুক্ত বন্দর সব নীল সমুদ্রের
পারে পারে মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে
নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে।
সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে?

দিন প্রায় শেষ হয়ে এলে শাদা ডানার ঝিলিকে
আলো ঠিকরিয়ে গেলে বুঝেছি সংবাদবাহী আশ্চর্য পায়রা
উড়ে যায় সূর্যকে টুকরো করে ফেলে;
খণ্ড আলোর মতো সঞ্চারিত করেছে আবেগে
প্রকৃতিতে; কোনো কোনো মানুষের বুকে; তারপর
মানুষের সাধারণ ভাবনার বজেট ইনকম ট্যাক্স প্রভৃতি বিষয়ে
ঠেকে নিভে গেছে।

উৎসব হৃদয়-মনে কাজ করে গেছে এক দিন :
সমুদ্রের নীল পথে মহেন্দ্র চলেছে—
সমস্ত ভারত শিলালিপির উদ্যমে আনন্দে ভরে গেছে;
এরকম উৎসাহের দিন আজ তবুও তো নেই আর?
আমাদের কাজে আজ হৃক ছলা, কিছু দূর চিন্তার সাধুতা
তত দূর শব্দযোজনার সতর্ক সংগতি নিয়ে;
মাঝে মাঝে হৃদয়েরও খুচরো টুকরো ব্যবহারে;
(শাদা কালো রঙ এসে বারবার—কেবলই মিশছে অন্ধকারে)
সে হৃদয় মানুষের আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়
শচীর মতন এসে দাঁড়াচ্ছে;
অথবা সে ইন্দ্রাণীকে ভেদ করে অহল্যার মতো;
সহস্র চোখ না যোনি এত দিন পরে আজ কলকাতায় ইন্দ্রের শরীরে?

ইন্দ্র আজ এরা—ওরা;
ইন্দ্রের আসনে আজ বেটপ্‌কা অন্তত বসা যায়
শুল্ক আয়কর সুদ—বেশি সুদ অল্পকে অস্পষ্টভাবে দিলে।

আজও তবু অবিরাম প্রয়াণ চলেছে মানুষের :
শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাষা জ্ঞান
জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি খুঁজে তবু প্রেম
পাওয়া যায় কিনা তার অক্লান্ত সন্ধানে?
মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে
আবার যুদ্ধের ছায়া;
পটভূমি দ্রুত সরে গেলে রূঢ় দেয়ালের মুখোমুখি এসে
আমরা সূর্যের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা
চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেথলেহমে হারিয়ে ফেলেছি—
তাকে শিশুসরলতা মূর্খের আরাধ্য স্বর্গ ভেবে
সূর্যের মাধ্যন্দিন বড়ো ভাস্বরতা
এখনও পাই নি খুঁজে।

এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই;
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনও আসে নি।
চারি দিকে ভোরের দিকে বিকেলের কাকজ্যোৎস্না-ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোনো-এক মৃত পৃথিবীর
ভেতরের চিহ্ন বলে মনে হয়; তবু
মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা;
আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ নগরগুলো সে রকম
আন্তরিকভাবে মৃত নয়।
বাজারদরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে
জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোনো জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে;
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে; ছিন্ন হয়ে; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ—নিজের নেশন
সবের উপর সত্য মনে ক'রে; জ্ঞানপাপে, অস্পষ্ট আবেগে।

মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা যদি হাইড্রোজেনে
পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে হয়ে যাক :
এরকম অপূর্ব অপ্রীতি চারি দিকে
আমাদের রক্তের ভেতরে অনুরণিত হচ্ছে।
কোথাও সার্থককাম কেউ নয়;
আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড়ো সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার-যার নিজের জিনিস,
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়।
এইখানে মর্মে কীট রয়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে

রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।
প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজনমতো তাতে নির্মলতা আছে।
আরো কিছু আছে তাতে; যেন মানুষের সব-রকম প্রার্থনা
মিটিয়ে-বা না-মিটিয়ে প্রকৃতি ঘাসের শীর্ষে এক ফোঁটা নিঃশব্দ শিশিরে
নিঃশব্দ শিশিরকণা—সব মূল্যবিনাশের তীরে।

পাখিদের ডানা-পালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের আচ্ছন্নতা নেড়ে
বাতাসের মুক্ত প্রবাহের মতো; যেন কোনো ঘুমন্তের মনে
কথা কাজ চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এল।

চারি দিকে অবিরল নিমিত্তের ভাগীর মতন
এই সব আকাশ নক্ষত্র নীড় জল;
মানুষের দিনরাত্রি প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
রয়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোয়।
কেউ তাকে না বলতে এ পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
দেখা দেয়; কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের ঢেউ তার কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে;
নিসর্গের কাছে থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভরে যায় : সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, 'নদী,
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?'

এখানে নক্ষত্রে ভরে

এখানে নক্ষত্রে ভরে রয়েছে আকাশ,
সারা দিন সূর্য আর প্রান্তরের ঘাস,
ডালপালা ফাঁক করে উঁচু উঁচু গাছে
নীলিমা সিঁড়ির মতো সোজা, আঁকাবাঁকা হয়ে আছে।

যে যাবে— যে যেতে পারে তার; নীচে রোদের ভিতরে
অনেক জলের শব্দে দিন
হৃদয়ের গ্লানি ক্ষয় কালিমা মুছায়ে
শুশ্রূষার মতো অন্তহীন।

ঊনিশশো চৌত্রিশের

একটা মোটরকার
খটকা নিয়ে আসে।

মোটরকার সব-সময়েই একটা অন্ধকার জিনিস,

যদিও দিনের রৌদ্রআলোর পথে
রাতের সুদীপ্ত গ্যাসের ভিতর
আলোর সন্তানদের মধ্যে
তার নাম সব চেয়ে প্রথম।

একটা অন্ধকার জিনিস:
পরিষ্কার ভোরের বেলা
দেশের মটরশুঁটি-কড়াইয়ের সবুজ ক্ষেতে-মাঠে হাঁটতে হাঁটতে
হঠাৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি
লাল সুরকির রাস্তার ভিতর দিয়ে
হিজলগাছ দুটোর নীচে দিয়ে
উনিশশো চৌত্রিশের মডেল একটা মোটরকার
ঝকমক করছে, ঝড় উড়িয়ে ছুটেছে;
পথ ঘাট ক্ষেত শিশির সরে যেতে থাকে,
ভোরের আলো প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে কোণের বধূর মতো সহসা অগোচর,
মাঠ নদী যেন নিশ্চেষ্ট,
সহসা যেন প্রতিজ্ঞা হারিযে ফেলে,
এই মোটর অগ্রদূত,
সে ছুটে চলেছে
যেই পথে সকলের যাওয়া উচিত;
একটা মোটরকারের পথ
সব সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

স্ট্যাণ্ডে
শহরের বিরাট ময়দানের পুবে পশ্চিমে—ফুটপাথের পাশে
মোটরকাব;
নিঃশব্দ।
মাথায় হুড
ভিতরের বুরুশ-করা গভীর গদিগুলো
পালিশ স্টিয়ারিং-হুইল হেডলাইট;
কী নিয়ে স্থির?
কলকাতার ময়দানের একটা গাছ অন্য কিছু নিয়ে স্থির,
আমি অন্য কিছু নিয়ে স্থির;
মোটরের স্থিরতা একটা অন্ধকার জিনিস।

একটা অন্ধকার জিনিস:
রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার কার হু হু করে ছুটছে
প্যারিসে—নিউইয়র্কে—লন্ডনে—বার্লিনে—ভিয়েনায়—কলকাতায়—
সমুদ্রের এপার ওপার ছুঁয়ে
অসংখ্য তারের মতো,
রাতের উল্কার মতো,

জঙ্গলের রাতে অবিরল চিতার মতো,
মানুষ-মানুষীর অবিরাম সংকল্প ও আয়োজনের অজস্র আলেয়ার মতো
তারাও চলেছে;
কোথায় চলেছে, তা আমি জানি না।

একটা মোটরকারের পথ—মোটরকার
সব-সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

আমি অত তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না;
আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে হেঁটে পৌছুবার সময় আছে,
পৌছে অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।
জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য সফলতার উত্তেজনা
অন্য সবাই এসে বহন করুক: আমি প্রয়োজন বোধ করি না:
আমি এক গভীরভাবে অচল মানুষ
হয়তো এই নবীন শতাব্দীতে
নক্ষত্রের নীচে।

এই সব পাখি

সারা দিন পাখিগুলো কোন্ আকাশ থেকে কোন্ আকাশে থাকে!
শহর কলকাতার শহর যেন পাখিহীন হয়ে থাকে:
পাখিদের আমি সব চেয়ে বড়ো ক্যাপিট্যাল মনে করি;
জুটমিলের মালিকদের মতো অন্যরকম—
কিন্তু কলকাতা কি শুধু জুটওয়ালাদের?
কলকাতা আমাদের,
এবং কলকাতা কলকাতাও পাখিদের।
কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দেখা দেয় মিলাবার আগে
এইখানে সে আকাশ নেই ;
রাতে নক্ষত্রেরা সে রকম
আলোর গুঁড়ির মতো অন্ধকারে অন্তহীন নয়।

তবুও আকাশ আছে :
অনেক দূরের থেকে নির্নিমেষ হয়ে
নক্ষত্র দু-একজন চেয়ে থাকে ;
চেয়ে থাকে আমাদের দিকে—
যেন টের পায়
পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা—সব কথা বলা
ডাভেন্ট্রিডোমেই টাসে স্টেফানিতে

যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির
মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে ;
—কোনো কথা কোনো গান
কাউকেই বলে নাই ;
কোনো গান
পাখিরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা স্তব্ধতার দেশে
তুমি আর আমি দুই বিভিন্ন রাত্রির দিক থেকে
যাত্রা করে উত্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে
এখন মিশেছি।

এখন বাতাস নেই—তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মতো সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে ;
সারা দুপুর পাখিগুলো দূরের থেকে আরো দূরে কোথায় চলে যায়!
শহর দবিদ্র হয়ে পড়ে।
শহর নির্জন হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে বিকেলের নরম আলো
নরম আলো পৃথিবীতে নামে;
ভিস্তির জলে তখন রাস্তা ঠাণ্ডা,
রাস্তায় ছায়া;
ব্যস্ততা তখন কম—আরো কম:
পাখিদের তখন পৃথিবীতে নামবার সময়;
রোদের রঙ তখন পেঁয়াজি,
রোদের বঙ তখন সোনালি,
রোদের রঙের সময় শুধু তখন;
ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জানালাগুলোও সচকিত হয়ে ওঠে:
পৃথিবী কোন্ জিনের সমুদ্রের ভিতর চলে গেল!

পাখিরা তখন আকাশ থেকে নামে,
বলে তারা : 'এমনতর কলকাতায় থাকতে পারা যায়;
এই সন্ধ্যার সমুদ্রে
আমরা গোলাপের পাপড়ির মতো খসে পড়ছি।'

অনেকক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে দেখি আমি
চার দিকে পাখনা পালক;

পালক আর পাখনা
কলেজের উঁচু উঁচু দেবদারু গাছের ভিতর ঘুরে যাচ্ছে;
দেবদারু পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার ডিমের মতো সূর্য,
রূপোর ডিমের মতো চাঁদ,
শিশির ঝরছে;

কলকাতা?
কলকাতা!

উপলব্ধি

কোথায় সে যে রয়েছিলাম—
আজকে মনে হয়
সাগর থেকে আরো বৃহৎ আলো
দেখেছিলাম—ঠিক তা সাগর নয়।

প্রশান্ত বা কৃষ্ণ বেরিং ভূমধ্যলীন ভারত মেরুসাগর তাকে বলে ;
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে
একটি ঘোড়া সূর্য হয়ে জ্বলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিল;
মনে পড়ে মাছের ঝাঁকে গহন সাগরজল,
ফেনার হাওয়ায় ফসকে শাদা পাখিগুলো দুরন্ত উজ্জ্বল;
নীল কি রৌদ্র ? রৌদ্র কি নীল জলের কোলাহল?

হঠাৎ তোমার সাথে

হঠাৎ তোমার সাথে কলকাতাতে সে এক সন্ধ্যায়
উনিশশো চুয়াল্লিশে দেখা হল—কত লোক যায়
ট্রাম বাস ট্যাক্সি মোটর জিপ হেঁকে
যাদের হৃদয়ে বেশি কথা হাতে কাজ কম—তাদের অনেকে
পায়ে হেঁটে চলে যায়—
কেবলই ক্লান্তিতে ধুঁকে আমাদের মুখে ঠোঁটে তবু যেই হাসি
ফুটে ওঠে স্বপ্নকে খণ্ডন করে বিষয়প্রত্যাশী
অমূল্য সংসারী সে-ই—বাজারে বন্দরে ঘোরে, মাপজোক ক'রে
হিসেবের খতিয়ানে লাভ হলে রক্তের ভিতরে
তৃপ্তি পায়—লোকসান হয়ে গেলে অন্ধকারে নিগৃহীত মনে
অনুভব করে কোনো মনিবের সংকীর্ণ বেতনে
ভৃত্যের শরীর তার—। ভৃত্যের শরীরে তার মন
নারী আর নক্ষত্রের তবু মহাজন?

তুমি এলে—সময়ের ঢের আয়ু শেষ ক'রে তবে
এখনও প্রদীপ জ্বলে এ রকম স্থির অনুভবে
তোমার শরীর আজও সুশ্রী নম্র—তবুও হৃদয়
সেই স্নিগ্ধ শরীরের সতীনের মতো কাঁটা নয়?
দুরু দুরু হৃদয়ের বিস্ময়ে ব্যথায় এ কথা যদি ভাবি
তবু সে ব্যথার চেয়ে আরেক শক্তির বেশি দাবি
সেই স্বাদ তুমি—আমাদের চোখে এসেছিলে ব'লে
পৃথিবীকে ভালো করে পাই আমি—এ পৃথিবী অন্তর্হিত হলে
সত্যই সূর্যের আলো—তবুও সূর্যের চেয়ে সুখী
তোমার গভীরভাবে ভালো শরীরের মুখোমুখি
আমার শরীর-মন—ঈশ্বরের অনুরোধে কখনও সময়
গতি কি থামায় তার—লীন হলে অনুসৃত হয়?
তুমি তাকে থামায়েছ—সৃষ্টির অন্তিম হিতাহিত
ভুলে আজ কলকাতার শীত রাতে কবের অতীত
বহমান সময়কে অন্ধকারে চোখঠার দিয়ে
নারীর শরীর নিয়ে রয়েছ দাঁড়িয়ে।
তোমার উরুর চাপে সময় পায়ের নিচে প'ড়ে
থেমে আছে বলে মৃত তারিখকে আবিষ্কার ক'রে
ভালোবাসা বেঁচে উঠে, আহা, এক মুহূর্তের শেষে
তবুও কি মরে যাবে পুনরায় সময়ের গতি ভালোবেসে?

অতীত তো সুজাতার শিশু; নারি, মনীষীহৃদয়
সে শিশুকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত নয়।

হে সময়, এক দিন তোমার গহন ব্যবহারে
যা হয়েছে মুছে গেছে, পুনরায় তাকে
ফিরিয়ে দেবার কোনো দাবি নিয়ে যদি
নারীর পায়ের চিহ্নে চলে গিয়ে তোমার সে অন্তিম অবধি
তোমাকে বিরক্ত করে কেউ
সব মৃত ক্লান্ত ব্যস্ত নক্ষত্রের চেয়েও অধিক
অধীরতা ক্ষমতায় ব্রহ্মাণ্ড শিল্পের শেষ দিক
এই মহিলার মতো নারীচোখে যদি কেউ খুঁজে ফেরে, তবে
সেই অর্থ আমাদের এই মুহূর্তের মতো হবে।

রবীন্দ্রনাথ

তারপর তুমি এলে
এ পৃথিবী সল্লের মতন
          তোমার প্রতীক্ষা ক'রে বসেছিল
সল্লের মতন দীর্ণ যুবা এই দানব পৃথিবী
শক্তিমান রাজার মতন রূঢ় রূপবান রক্তাক্ত নক্ষত্র এই আমাদের

ঝলমল আলম্বিত চোগা প'রে প্রবল উষ্ণীষ শিরে রেখে দিয়ে
কঠিন অসির 'পরে ভর ক'রে
অসীমের অনাবৃত হলঘরে ক্ষণিকের দম্ভ ভুলে ক্যাম্পের নিষ্ঠুর ধাতুর বাদ্য
ইশারায় স্তব্ধ করে দিয়ে—
চোখ বুজে অধোমুখে

এ পৃথিবী মুহূর্তের কাজ তার ভুলে গিয়েছিল
মুহূর্তের চিন্তা এসে কখন হঠাৎ তারে সচকিত শান্ত করে দিযে
চলে গিয়েছিল ব'লে
মুহূর্তের স্বপ্ন এসে লক্ষ—কোটি বছরের সম্পন্ন কাজের সমৃদ্ধির শিরস্ত্রাণ
নিজের পায়ের তলে রেখে দেয ব'লে
আমাদের এ পৃথিবী নিজেরে ব্যথিত বোধ করেছিল
পরাহত— পাণ্ডু— ক্ষুব্ধ;
অবসাদে হিম নীল জর্জরিত হয়েছিল
হয়েছিল না কি?

তুমি এলে।

আমাদের উপভোগে লালসার এত শক্তি সমুদ্রের মতো এক ব্যথারেও
বহিতে পারে সে— বহিতেছে;

আমরা জানি নি তাহা
আমাদের অসুর পৃথিবী জানে নিকো।
কীট পোকা ফড়িঙ হরিণ মানুষের অবিশ্রাম জীবনের সাগরের
ঢেউয়ের ভিতরে
মুহূর্তে মুহূর্তে যেই বেদনারা এশীরীয় সৈন্যদের মতো বর্শা তুলে নেচে ওঠে
তারা পরাজিত হয
ফড়িঙের পাখার ভিতরে ব্যথা: তার শক্তি সম্রাটের ক্রূর আঘাতের
চেয়ে আরো ঢের কঠিনতা নিয়ে বেঁচে আছে
কীটেরও জীবনে এক সহিষ্ণুতা প্রাণ পায়
পাখির জীবনে এক প্রেম
এক প্রেম— মানুষের হাতের প্রতিটি কাজে বেঁচে থাকে

সৃষ্টি চলে তাই সুন্দরের দিকে
ক্ষমা প্রেম স্থিরতার পানে
নক্ষত্রের শান্তির উদ্দেশে।

এরা কি সুন্দর নয়? ব্যথার সমুদ্রে ফোটে এই সব সূর্যমুখী

সব চেয়ে আসুরিক বিজয়ের সাম্রাজ্যের থাম ভেঙে সুন্দর পাবে না তুমি কিছু
সেখানে যে সহিষ্ণুতা নাই—ক্ষমা নাই—প্রেম নাই—
কোনো দিন ব্যথা ছিল নাকো— ছিল নাকো বিশ্ব বোধ।
তাহাদের শক্তি ছিল—ব্যথিত ঘাসের কীট যেই শক্তি জানে, ছিল তাহা।

তবু তাহা সম্ভোগে অন্যায়ে জয়ে অত্যাচারে লক্ষ লাল লাম্পট্যের রাতে
রক্ত মাংস মাটি হয়ে গেছে
আর কিছু হয় নাই।

এই গান গাহিয়াছ কবি তুমি,
গেয়ে চলে গেছ।
অবনত রূঢ় বিদ্ধ একটি পীড়িত মুখে কোন্ এক দৈত্যসম্রাটের মতো
আমাদের পৃথিবী— শতাব্দী তাহা শুনিয়াছে
যেমন শুনেছে সল ডেভিডের গান
এক দিন
আন্দোলিত হয়েছিল এক রাত
তুমি এই পৃথিবীরে তোমার গানের সূতা দিয়ে আকাশের অন্য সব
নক্ষত্রের সাথে বেঁধে দিয়ে চলে গেছ।
আজও তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে, সুন্দর নিকটে এত—শান্তি প্রেম ক্ষমা।

আজও তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে
তাদের নৃত্যের সুর তবু
থেকে থেকে ক্ষীণ হয়ে আসিতেছে
কবি তুমি ক্রমে ক্রমে হিম হয়ে পড়িতেছ বলে
সুন্দর যেতেছে মরে ধীরে ধীরে
শান্তি আর থাকিবে না।

ব্যারাকে ধাতুর বাদ্যে হৃদয়ের ধাতব আঘাতে
রুপালি শলার সেই দীর্ঘদেহ গানগুলো বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত হয়ে পড়ে রবে
মৎস্যনারীদের মৃত শরীরের মতো।
ব্যথা রবে শুধু।
সহিষ্ণুতা রবে।
প্রেম রবে।

ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে

ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আজ
দিন শেষ হয়ে যায়—রাত্রি আসে—
দিন নেমে আসে—
জ্ঞান আছে, তবু তার সে রকম প্রচলন নেই
প্রেম আছে—তবু যে প্রেরণা
কামনার চেয়ে তাকে উজ্জ্বলতায়
সকলের সাধারণ প্রয়োজনে দান করে
সেই প্রেম ফুরিয়ে এসেছে প্রায়।

একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেলে এবারে মানুষ
চেয়ে দেখে আরেক পৃথিবী বুঝি ধ্বংসপ্রায়;

লোভ থেকে লোভে তবু—ভুল থেকে ভুলে
শূন্যতার থেকে আরো অবিকল শূন্যতার দিকে
আবর্ত ক্রমেই আরো দ্রুত হয়ে আসে।

বেলা পড়ে গেলে পশ্চিমের
মেঘের ভিতরে যেই আভা লেগে থাকে কিছুক্ষণ
সেদিকে সম্পূর্ণ চোখে তাকাবার মতো লোক নেই,
যে আলো ঠিকরে ওঠে ভোরে
পথে মাঠে জানালার ভাঙা কাচে
রক্তে শূন্যে বচনে ও নিহতবচনে
তারও কোনো মানে নেই মানুষের মনে।
ক্লান্তি আছে—শীত আছে
অন্তহীন মৃত্যু রয়ে গেছে।
বারবার দৃশ্য মুছে ফেলে
মৃত্তিকার নির্জনতাকে শুধু সাক্ষী রেখে
নতুন আভাস আলো পটভূমি জাগিয়ে জাগিয়ে
কাজ করে চলেছে সময় মনে হয়:
মৃত্যু যেন মৃত্যুর ভিতরে শুধু নির্লিপ্ত নয়;
কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু হয়—তবু সময়ের কাছে
মানব ও মানবতা শাশ্বত কাহিনী হয়ে আছে।
ওরা মরে—ফিরে আসে—নতুন চেতনা এনে দেয়
যেন তা অনাদিকাল থেকে শুধু অগণন গ্লানি ক্ষয় শব
অন্ধকারে বয়ে তবু মহাজিজ্ঞাসার মর্মে উজ্জ্বল মানব।

একবার ভালো নীল ভাঙা ভুল পৃথিবীর

একবার (ভালো নীল) ভাঙা ভুল পৃথিবীর হাত থেকে বার হয়ে আমি
চলে যাব কোথাও হিরণ মেঘলোকে;
তবুও তোমার দেহে রয়ে যাব—রয়ে যাব, নারি,
দেহের ভিতরে প্রাণে—প্রাণের ভিতরে মনোলোকে।

কঠিন আঘাত পেয়ে অন্ধকারে শিখার মতন
ধাতুর ভিতর থেকে জেগে উঠে আমি
সেই কথা আর সেই অন্ধকার পৃথিবীধাতুকে
পরিহার করে দূরে অভিযানকামী
আলোর মতন জ্বলে সূর্যে উড়ে যাব;
মিশে যাব জ্যোতিষ্কের ভিড়ে;
দেহ নেই মন নেই প্রাণ নেই অমেয় আভায়
প্রাণ মন দেহ হয়ে যাব আমি তোমার শরীরে।

যখন দিনের আলো নিভে আসে

যখন দিনের আলো নিভে আসে আমি ক্লান্ত—তবুও উদয়
জ্বলন্ত তারার মতো সময়ের অন্ধকার শক্তিনীলিমায়;
আমার উৎসারী স্নেহ আলো মন প্রাণ
এখন ঠেকেছে এসে অকূলের পবিত্র সীমায়।
পৃথিবীর ধুলো নিয়ে মানুষ কি শরীরী হয়েছে?
শরীর কি ভালোবাসে নারী—নারীমন?
রাত্রির জ্যোতির পথে প্রাণ এক পুরুষনক্ষত্র?
কিন্তু কতক্ষণ।

কী সংগীত জানা আছে প্রাণের মনের
কোথায় সে পেয়েছিল অগ্নিউৎস আলোকের জ্ঞান?
ভোরবেলা অস্তসূর্যে রাত্রির নক্ষত্রবেলায়
পুরুষ নারীকে দান ক'রে তবু তার প্রতিদান
পেয়েছে সৃষ্টির স্বত্বঃ অন্ধকার? অমেয় শীতের
শূন্যের সংঘর্ষ থেকে নীল শিখা বুনে
আমাকে জাগাবে, নারি, এক দিন সৃষ্টি লোপ পেলে,
জেনে আমি গাঢ় স্বর্ণ অনন্তের স্বর্ণকার, তোমার আগুনে।

নক্ষত্রমঙ্গল

(১৯৪২–১৯৪৭)

রাতের আঁধার বাড়লে পথে প্রান্তরে কি ঘরে
থামে এসে সারা দিনের রীতি।
সার্থবাহ নটীর হিসেব ফুরিয়ে গেলে তবে
হস্তা স্বাতী বিশাখা শতভিষা

যত না প্রিয় বাতির মতন জ্বলে বলে যেন
তাহার চেয়ে অনেক বেশি ধীকলরোল ক'রেঃ
'সমস্ত দিন মেঘ ভেঙে কি বৃষ্টি হয়েছিল?
কিংবা অঢেল রক্ত ঝরেছে

এক পৃথিবীর সন্ততিদের আলোড়নের থেকে?
কালো মেঘের পিছে আকাশ ছিল কি নীল তবু?'
'জানি না সে সব। হে গুণ, মনপবনে প্রদীপ তারা,
আমার হৃদয় মৃৎশতাব্দীশীল;

তবুও হাতের মুখের রক্ত শিশির ঘাসে মুছে
হৃদয় আমি তারকাদের পানে
মানবসময় সরিয়ে আইনস্টাইনি লোক ভেঙে
ছড়িয়ে দিলে দিতাম অনবতুল অনবতূলে;

কী মানে তবু নক্ষত্রদের—প্রেমের প্রতীক যদি
ক্লেদপৃথিবীর পুরুষনারীর থেকে স'রে গিয়ে
নিখিলে রেতঃ হয়ে থাকে? মাটি সহজ হয়
ইতিহাসের ক্ষমতাতীত রক্ত খরচ ক'রে?

'তবুও অর্থ রয়ে গেছে—সুপরিসর ঢের;
ম্যামথ বা তার পাঁকের থেকে মানুষ এখন জেগে
স্বাতীতারার শিশির দিয়ে অনিমেষ গল্প বানিয়েছে
তাই তো প্রেম: যান নিরূপন-জ্ঞানের প্রবলতর আবেগে।

রাত্রি অনিমেষ

কেমন এক পরিচ্ছন্ন গভীর বাতাস ভেসে আসে।
অঘ্রান রাত্রির অগণন জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোয়
সমস্ত পৃথিবী তার জলঝর্ণার—নগ্ন নারীহস্তের নির্মলতায়
নিঃশব্দে উৎসারিত হযে উঠছে আজ।
পৃথিবীকে আকাশের মতন মনে হয়;
আকাশকে সময়ের মতন;
কোথায়ই বা উদয় হয় নি সে—কোথায়ই বা যায় নি?
সমস্ত আধো-আলোকিত সৃষ্টির বুকের উপরে
যেন কার দীর্ঘ নারীঅঙ্গের ছায়া পড়েছে
মাঠে—খাদে—বস্তির মরণে—মিনারে—
শান্তি-অশান্তির কলরোলে—নগরীর জ্বলায়—মানুষের চোখের ঘুমে।

আকাশে তারা কম।
বাতাসে—শাদা মেঘের ফাঁকে একটি কি দুটি নক্ষত্রে আলোকিত রাত্রে
কোনো সার্থবাহের উটের পাশে কি এই ছায়া—
আমার জীবন থেমে আছে, অতএব তাকে নিমেষনিহত ক'রে?
কোনো ক্যাম্পে ঘুমিয়েছিলাম যেন সমস্ত হেমন্তকাল;
জেগে উঠে দেখলাম কোথাও কেউ নেই আর;
কোনো শব্দ নেই,
কোনো উট নেই; উটের ছায়া রয়েছে মরুভূমির
অঘ্রানের আলোশক্তির শান্ত অপরিমাণ রাত্রে;
কী এক গভীর বাতাসে প্রতিটি নক্ষত্র নিভে নিভে নিভে
আবার জ্বলে উঠছে সেই নারীর হাতের নিবিড় মোমের মতো।

হে হৃদয় নীড় থেকে ঢের দূরে

হে হৃদয়, নীড় থেকে ঢের দূরে ধরা পড়ে গেছ
বিকেলে আলোর রঙ নিজ মনে কাজ ক'রে পাখিকে না ব'লে
ছায়ায় অঘ্রান মাঠ ঢেকে ফেলে চমকায়ে দিল
কেউ নেই—শূন্যাকাশ পটসঙ্গিনীর মতো হলে

তার কাছে বলা যেত: আমি ডানা-পালকের প্যাঁকাটির মতো হরিয়াল
কাউকে না পেয়ে একা চারি দিকে উপচানো রাত্রির মুফতে
ধাঁধার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা ঘুম মরণের ঢেউয়ে
প্রেমের সূর্যকে কোনোমতে
জাগায়ে জ্বালায়ে আমি উড়ে যাই ডিসেম্বর রাতে—

এই সব ভোরভাষা নীচের নগর হ্রদ বস্তি মৃত্যুকে
দান ক'রে বাতাসের ঘুরনচাকির আগে পাখি
টের পায় জীবনের ভিতরের অনুভূতিটিকে
কেলিরও চেয়ে সে ভালো অন্য এক আনন্দসাগর
সেদিকে যাবার পথে চোখ তার ভর্ৎসনা বেদনা ভয় দোষ থেকে মুক্তির মতন
আকাশ নদীর জল শ্মশান এয়ারোড্রোম ঝাউয়ের সাগরে
হঠাৎ সকলই সূর্য—নিজেও সে সূর্য একজন।

শহর বাজার ছাড়িয়ে

শহর বাজার ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি পড়ে নক্ষত্রদের দূর আকাশের পানে
যখন আমি রাতের বেলা দেখি—
নগবীর ঐ পুরুষ নারী কী চেয়েছে কোথায় যাবে—কিছুই জানে না
চারি দিকে প্রেম ও প্রাণের আততায়ী দীক্ষা অপশিক্ষা আগুন উত্তেজনার ঢেউ
ভাঙছে আমার শতাব্দীকে—স্বাতীতারার মতন তবু কেউ
নিজের স্বচ্ছ কক্ষ থেকে একা
এই পৃথিবীর সে কোন্ অধম শক্তিগুলোর 'পরে
ভালো হবে বলে শিশিরফোঁটার মতো ঝরে।

তোমার আসাযাওয়া কথা আদানপ্রদান কুশীলবের দূর বলয়ের থেকে
আমার পানে নারি, তুমি আজকে রাতে আবার তাকায়েছ
কী যে কবে বলতে চেয়েছিলাম তোমায় আমি
কী যেন ঋণ—সে কোন্ সিঁড়ির ঘুরুনিতে মাঠে অন্ধকারে আজকে মনে নেই—
নিয়েছিলাম? আমায় তুমি ফিরিয়ে দিয়েছিলে?
দুইটি তট; কিন্তু তবু একটি নদী দুইটি তট মিলে।

রোদ যেখানে হরিণ মেঘের মৌমাছিদের সেই পৃথিবীর তুমি
সরোবরের পথে বুকের ঐশী জিনিস ঢেকে
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরণে চমক ভেঙে চেয়ে দেখে
আমার কণ্ঠবিষের পানে তাকিয়েছিলে।
চারি দিকে রক্ত ক্ষতি গ্লানির কাছে ঋণ
লাভ ক'রে আজ শ্রীলাভ করার দিন
মানুষ ও তার আ-চলমান নিশ্চয় মৃত্যুর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—মাঝখানেতে চোরবালি আশ্বাসে ভরপুর
আজ আমাদের পৃথিবী—এই শতাব্দী এ রকম।

তোমার কারণ ক্রান্তি তবু আমায় অভয় দিল
তোমার আলো আঁচল আভাস শরীর
নীল আকাশে শরৎ এলে সূর্য জ্যোৎস্না হরিয়ালের কথা
জাগিয়ে দিয়েছিল—
পাখিহন্তারকের প্রাণে—কামের চেয়ে প্রেমে তাহার দু চোখ পূর্ণ ক'রে
অন্ধকারে তারা নদী সাকোরখোরার ঝিরঝিরানির মতন তোমার চোখের মণি, চুল,
শরীর শান্ত দয়ালুতায় জেগে উঠে পরীর, মনে হয়,
জানে দয়ার মীমাংসা—দান, শরীরদান নয়।

তবুও কেন আমার পানে তাকিয়ে আছো একা
এগারো বৃহস্পতি বারো সূর্যে ভরা আজকে পৃথিবীতে
চারি দিকে আর্তি অব্যাহতি তলব সুখবরের দিনে
খাতা কেন আটকে পড়ে আছে তবু মহাজনের ঋণে?
ক্রূর আমি? তিক্ত তুমি? কিংবা স্বীয় স্বীয়
প্রাণের বিনিময়ে সবই সত্য, স্থির: কাকচক্ষু জলে কি পূরণীয়?

ঢের তাপিত জেগে উঠে ঐ মহিলার বলয়-আলোর পানে
কিশোর যুবা প্রবীণ মনে তবুও নতুন উত্তেজনা নিয়ে
কী চায়, আহা,
সে কোন্ নতুন আলোর গ্রন্থি সন্দীপনের তারা?
আমার এ সব কুশল প্রশ্নে চকিত হয়ে শচী অহল্যারা
বলছে হেসে, সেই রমণী এইখানেতেই আছে
এসো শরীর অথবা তার ব্যাধির অতীত মৃগনাভির কাছে
রাত্রিবেলা ঘাসের শিষে একটি শিশির ফোটে
চার দিকে তার নক্ষত্র ও শিশির লাখো লাখো
প্রেম কি তাদের গণিত স্থির করে দেবার সাঁকো?—
শুধাতেছে তোমার পানে তাকিয়ে মহীয়সী
সময় সূর্য সাগরপারে নতুন দিনে দণ্ডায়মান তুমি
দ্বৈপায়নের মতন অন্ধ মহাশূন্য দেখছ নাকি আলোর প্রতিসারী
  প্রেম তবুও নিজের প্রতিভারই
মতন আরেক আঁধার আলো সময়বীমার শূন্য নিঃসময়,
কৃষ্ণা, তোমার আঁধার ঘিরে শাড়ির মতো নিজেকে মনে হয়।

এখন এ পৃথিবীতে

এখন এ পৃথিবীতে ভালো আলো নেই—
ভাষার বেগের বিহ্বলতার শেষ করে অন্ধকার
মাঝে মাঝে জীবনের পথে আসে,
আজকে সততা সত্য সুধা নেই—কিন্তু পৃথিবীর পথে রূঢ়
রক্তাক্ত অন্যায় আলো বেনামদারের মতো জেগে
নিজেকে প্রাণের সূর্য বলে যদি এখনও প্রচার করে তবে

সে আলোর প্রতিবাদে আজকের পৃথিবীতে অন্য আলো নেই
অন্ধকারে রয়ে গেছে।

আজকের পৃথিবীর নরনারীদের
কেবলই হাতের কাছে পড়ে পাওয়া অন্ধকার নয়
আরেক গভীরতর ধর্মের জিনিস।

প্রকৃতিতে সূর্য আছে; প্রকৃতিতে নয়—তার মানুষের মনে
সূর্য ভেঙে গেলে তার বুক থেকে নিঃসৃত নিষ্ফল অন্ধকার
আকাশের মতো বড়ো ব্যাপ্তির মতন
অখণ্ড অনন্ত এক
প্রাণের কামনা থেকে ইচ্ছুককে মুক্ত করে নিয়ে
হৃদয়ের সব দোষ প্রক্ষালন ক'রে
কবেকার থেকে আজও ক্লান্তিহীন সময়ে সাধনার ফল অন্ধকার
মানুষের পৃথিবীতে সে অনেক শতাব্দীর আগে
ঈশ্বর স্খলিত হয়ে গেছে—তবু মানুষের স্বভাবের গভীরতা আছে
প্রেম চায়, ন্যায় চায়, জ্ঞান চায়—অথবা এ সব
আজ এই পৃথিবীর বিমূঢ় আলোয়
সকলই নিষ্ফলপ্রায় হয়ে গেলে অন্ধকার চায়
সকলই সফলকাম এক দিন হয়ে যাবে ব'লে।

কোথায় গিয়েছে

কোথায় গিয়েছে আজ সেই সব পাখি, আর সেই সব ঘোড়া—
সেই শাদা দালানের নারী?
বাবলা ফুলের গন্ধে, সোনালি রোদের রঙে ওড়া
সেই সব পাখি, আর সেই সব ঘোড়া
চলে গেছে আমাদের এ পৃথিবী ছেড়ে:
হৃদয়, কোথায় বলো—কোথায় গিয়েছে আজ সব!
অন্ধকার: মৃত নাসপাতিটির মতন নীরব।

পথের কিনারে

পথের কিনারে দেখলাম একটা বেড়াল পড়ে আছে,
আস্তে আস্তে ছটফট করে মরে যাচ্ছে;
কেন এই মৃত্যু?—বরং অল্পবয়সের এই প্রাণীটির?
একে ঘিরে কোনো জনতা নেই
খানিকটা কলরবও নেই এর মৃত্যুকে আস্তে আস্তে ভালোবেসে তারিয়ে দেবার জন্য
বেড়ালটা তার শরীরের সমস্ত শাদা কালো রং দিয়ে
মুহূর্তের জন্য আমার মনের ভেতরে চিন্তা হয়ে এল
তার নির্জন অদ্ভুত শরীরের সমস্ত শাদা কালো রং নিয়ে আমার কবিতার ভেতর এল;
বললে, এর চেয়ে অসাধারণ দাবি কোনো দিন[illegible]বব না আমি আর।

বাইরে হিমের হাওয়া

বাইরে হিমের হাওয়া
হেমন্তের হাত;
দরজায় জানালায়
অবিরাম রাতের আঘাত;
যত দূর আকাশের কালো চোখ যায়
অগণন নক্ষত্রের ফোঁটা ফোঁটা বরফ ঘুমায়।

পৃথিবীর সব নদী সকল সমুদ্র—
আর সব রাজপথ ফেলে
এসেছে প্রেমিক এক—
চারি দিকে ঠাণ্ডা ময়লা দেয়াল ও ঘর;
কক্ষ থেকে কক্ষের ভেতর
এঁকেবেঁকে সিঁড়ি চলে গেছে।
পৃথিবী মানুষ প্রাণ হেতু অকারণ
নির্জন আঙুল তুলে করেছে বারণ:
'কোন্ কক্ষে যাবে তুমি সিঁড়ি বেয়ে—
কোন্ দিকে যাবে?
এই সব সিঁড়িগুলো পার হয়ে শেষে
আদি শূন্য সিঁড়িতে দাঁড়াবে ফের এসে।
জীবনের সময়ের বিশ্বের এই এক মানে
পথ ছাড়া নেই কিছু অনন্ত পথের অন্তর্ধানে।'

মানুষের কবেকার অপলক সরলতা

মানুষের কবেকার অপলক সরলতা আজ
নষ্ট হয়ে গেছে বলে মৃত বই ছবি আলো জিনিসের সারি
হৃদয়ে বহন ক'রে সচকিত সার্থবাহদের
পৃথিবী ও পৃথিবীর লক্ষ্যে দরকারী
অনেক নতুন জ্ঞান সহিষ্ণুতা অগ্নির বলয়
স্বভাবে সফল করে তোমার মতন নারী হয়।

আমার চোখের দিকে চেয়ে আধো–ইতস্তত মনের গরজে
কী এক অতল হ্রদের সীমা খোঁজে
কলকাতার বিকেলের নিভন্ত আলোকে
মনে হয় সে হ্রদের তলদেশ যেন তার চোখে।
তবু সে আমার নয়, অপরের, জেনে তার নেই সন্তাপ
এমনই সচ্ছল এই পৃথিবীতে উৎসারিত সূর্যের পাপ।

নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে

নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে
তাকিয়ে আছে হেমন্তলোক স্পষ্ট ক'রে নীচের নিরাশায়
মৃতপ্রায় মানবতার অনাথ চোখের দিকে।
এই পৃথিবীর মৃত মহাজাতকের মুখচ্ছবির মতো
নক্ষত্রেরা শুভ্র শূন্য নিমেষনিহত।

চলার পথে শীত অতীতের প্রয়োজনীয় স্মৃতি
বহন করে ম্যামথ ম্যামাল কালক্রমে মানুষ বানাল,
নিনেভে রোম হিরোশিমায় পৌঁছে অ্যাটমের
হাতে মানুষ, মানব-ফসিল, ক্রমোন্নতির আলো।

তবুও মনকে ঘিরে

তবুও মনকে ঘিরে মহামানবিক আলোড়ন
আর এই পৃথিবীর অন্তহীন দ্বিধা দ্বেষ প্রেম সংগ্রাম
আমাদেরও রক্ত দিয়ে আদি রক্তবীজের নিধন
চেয়েছে, মিটিয়ে দেব ষোলো আনা দাম।

সুঅধ্যায় পর্বের প্রায় ক্ষয় হল আজ
এই শতকের দিন ক্ষয় প্রায় হয়ে এল আজ।
অনাদি আশার বার্তা কালে কালে নীল নিরালয় শূন্যে ভেসে
অসংখ্য শতক ধরে অঙ্কিত রেখেছে সমাজ,
কিছুই হয় নি আজও।
তবুও মৃত্যু ভালো, যুগে যুগে মহান এ যুদ্ধ ভালোবেসে।
আশাশীল রাত্রি আসে চিরায়িত আশা ভালোবেসে।
সচেতন রবে আলো অপ্রাপ্য ও আলো ভালোবেসে।
শত শতাব্দীর আশা নষ্ট হলে মৃতপ্রায় মানবসমাজ
চলেছে তবুও
চলে।
বহু শত শতাব্দীর অনাগত আশা ভালোবেসে।
যুগে যুগে আলম্বন অন্বেষণ করবার কাজ
রক্তাক্ত মানুষদের দিতেছে গভীর ভালোবেসে।

ঘরে কোনো লোক নেই—কয়েকটি গ্রন্থ তবু আছে,
  রয়েছে অব্যয় ছবি তিন জন চার জন একান্ত শিল্পীর
ফ্রান্সের, ইটালির, নিম জাম আমলকী গাছে
রয়েছে অগণ্য সব পাখিদের নীড়।
বারবার নষ্ট হলে তবু ম্লান মানবসমাজ
চলবার বেগ পায় ইন্দ্রধনুকে ভালোবেসে।

শরীরিণীকে

নির্ঝর বনানী নদী আকাশ ও নারীর শরীর
তোমাদের স্বাভাবিক সুকৃতি রয়েছে।
আমরা মৃত্যুর হাতে ভ্রান্ত হয়ে জীবনের সেবা
আধেক তো শুরু করি—সৌন্দর্যকে হয়তো আধেক
হৃদয়ে ধারণ করে চোখ বুজে চুপে বসে থাকি;
দিনের সূর্যের দিকে আমাদের জীবনের বাতি
ঈষৎ ফিরিয়ে—রাতে অনিমেষ নক্ষত্রের থেকে
আশ্বাস হারিয়ে ফেলে, খুঁজি কেন অন্য এক সীমা!
কিছু নেই; হবে না; রবে না ঠিক; তবু স্বাভাবিকতায় সকল ম্লানিমা।
চারি দিকে সময়ের শূন্যতার থেকে
লীনপ্রাণ বৃক্ষকে ডেকে ডেকে
যে রকম স্থির নীল হয় দিন হয় পাখি হয় পাখিদের নীড়
নক্ষত্র নির্ঝর নদীর নারীর শরীর।

জল

অনেক বছর পরে এখন আবার দেখা; ভালো।
চারি দিকে কলকাতার হেমন্তের বিকেল নিভছে;
গ্যাসল্যাম্পে বেশি আভা—আকাশে নক্ষত্রলোক হতে
কম আলো—কোথাও প্রকৃতি নেই—কিংবা তার ভিতরের পাখি
উচ্ছল পাতার মতো শব্দ হয়, জেগে ওঠে
কলকাতার ফুটপাথে ল্যাবার্ নাম গাছে
নারীকে শুধানো যেত—তবু নিরুত্তর হয়ে আছে
বারো বছরের আগের মনের ভিতরে দূর দেশে;
যেন গর্ভিণীর মতো; অজাত শিশুর ধ্যানে চুপ
হয়ে গিয়ে মুহূর্তেই অনুভব করেছে স্বরূপ
স্বভাববন্ধ্যার মতো যেন তার।

রূপকে এ সব কথা ভেবে নিয়ে আমি
বুঝেছি, বুঝেছে সব—আমারই মতন অন্তর্যামী।
তার পরে বেশি হাসে কথা বলে দোকানের কেনাকাটা করে
আমি জল—তবু যেন অন্য কোন্ জল এসে পড়ে
চোখে মুখে নাড়ীর কম্পনে তার জানি
কোনো দূর অন্ধকারে অবিরল ঋণী যে কী ঝরঝরানি
এ নারীকে দেনা নিয়ে, অপর জলের দূর দেশ থেকে শোনা যায়
সে এই নারীর স্বামী অথবা প্রেমিক
তবু জলের মতন যেন ঠিক! ক্রমে সুদ খুব বেশি জ্বলে।
সব জ্ঞান ধর্ম উদ্যমের চেয়ে জল ভালো ব'লে
খাতক হয়েও তবু উত্তমর্ণ মহিলার চেষ্টেও সফল
সৃষ্টির অন্তিম কথা অন্ধকারে জল।

যেন তা কল্যাণ সত্য চায়

যেন তা কল্যাণ সত্য চায়, তবু অবাধ হিংসার
রিরংসা-পাকে ঘুরে ঘুরে ঘুরে শূন্য হয়ে যায়—
অন্ধকার থেকে মৃদু আলোর ভেতরে
আলোর ভেতর থেকে আঁধারের দিকে
জ্ঞানের ভেতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
বারবার আসাযাওয়া শেষ করে ফেলে।
এক দিন আরো জ্ঞানী হয়ে তবু ক্লান্ত হয়ে রবে।
ব্যবসা-বাণিজ্য যুদ্ধে বারবার বিজ্ঞান বিষম
হলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভয়াবহ ব্রহ্মাণ্ডের;
সময়ের আবর্তনে নিমিত্তের ভাগী বুঝি প্রেম।

সনাতন সময়ের উন্মোচন তবু
হৃদয়ে এসেছে প্রেম বারবার;

চিরকাল ইতিহাসবহনের পথে
রক্ত ক্ষয় নাশ ক'বে যে এক বলয়ে
মানুষের দিকচিহ্ন মাঝে মাঝে মুক্ত হয়ে পড়ে
অচিহ্নিত সাগরের মতন তা, দূরতর আকাশের মতো;
কোনো প্রশান্তি নয়, মৃত্যু নয়, অপ্রেমের মতো নয়,
কোনো হেঁয়ালির শেষ মীমাংসার গল্প নয়,
শুধু আরো শুদ্ধ—আরো গাঢ় অনির্বচনীয় সম্মেলন:
(হৃদয়ের ভূগোলের মহাদেশ আবিষ্কৃত হবে।)
সব পেছনের পার্শ্বের লীন লীয়মান
অন্তর্হিত হয়ে গেলে কূলহীন পটভূমি জেগে ওঠে।

যদিও আজ তোমার চোখে

যদিও আজ তোমার চোখে আমি ছাড়া অন্যরা বিখ্যাত
মনে পড়ে অনেক আগে এমন ছিল না তো
মাঠে ঘরে সম্মেলনের থেকে ফিরে
তখন তুমি সহজ স্বাভাবিকের মতন ছিলে
আমিও তখন তোমাকে ছেড়ে সমাজ পৃথিবীর
অসংগতির করুণ ক্লান্ত ভাষা
শুনি নি এমন। গভীর অন্তরঙ্গ আঘাত করে:
চূর্ণ করে ফেলতে পারে তোমার আমার মতন ভালোবাসা।

দিনে তোমার সঙ্গে নিয়ে নদী নগর প্রাক্‌সামরিক রাষ্ট্রে পৃথিবীতে
হৃদয় ভরে কিছু নিতে, কিছু দিয়ে দিতে
ব্যস্ত থেকে ভুলে যেতাম বীজাণু রোগ মৃত্যু মলিনতা
ক্লান্তি বিয়োগ ছিল, তবু সে সব নিছক মাংসপেশীর ব্যথা

সুস্থিরতার কাল চলেছে তখনের প্রায় ভারতে ইউরোপে
প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শুরু তখন, কানে খানিক জল
ঢুকে গেলেও পূর্বাচার্যেরা সব ঝেড়ে
ব্যাঙ্কে ধর্মে যৌন সম্মিলনে সূর্যে আশ্চর্য সফল।
দিনের বেলা ফ্যাক্টরি ডক বস্তি ফাঁড়ি আজিকাজি ডাঙার ভিতর দিয়ে
ঢাকনি খুলে ঘুরে বেড়ায় সে সব পথে তোমার কাছে গিয়ে
পরিহাসের রসিকতায় উৎসারিত হয়ে
সৈন্য, নটী, দালাল, ভাঁড়, ব্রাত্য, সার্থবাহের ঘরে
সচ্ছলতা আশা আপশ কাড়াকাড়ি বিলাস ব্যর্থতায়
দেখেছিলাম কল্কী ও তার ঘোড়া রগড় করে।
আঁধার সভা স্বদেশী মেলা ঢের জানালার হৃদয়বিদারক
অন্ধকারে চেয়ে থেকে পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও ছক
হৃদয় এল ধীরে—ক্রমে—বিষণ্নতার স্থির প্রতীকের মতো।
ইতিহাসের নিয়ম কঠিন, তবুও ফোটায় করুণাবশত
অপার আশার আকাশকুসুম; লোকায়ত সফলতায় প্রবেশ করে নিতে
দেরি করে; মানুষেরাও ক্লান্তিবিহীন প্রাণের প্রকাশ দেখিয়ে দিতে জানে.
বলে: তখন লোহা পাথর ছিল, এখন অণুর বিদারণে
পথে এল, আলো পেল মানবতার মানে।

এখনও সে তেমন হতে পারে নি কিছু তবু
ভেবেছিলাম মানুষ ইতিহাসের হাতে ক্রমেই বড়ো হবে
মেশিনকে বশ করে খেলার চেয়ে
হয়ে পড়ে অন্য সফলতায় প্রবীণ;—তবুও মানুষ খেয়ে
মেশিন ক্রমেই আজ পৃথিবীর একক শক্তি হল
প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা
বেড়েই গেল—জ্ঞানের পরিণামের মানে হল
এই ধরনের পৃথক করার কথা?

এখনও ঢের আলোয় পথিক রয়েছে তবু জানি
অনেক অমর অর্ধসত্যে অবিশ্রান্ত রাজকীয় চালানি
চলছে আজও স্পষ্ট শতাব্দীকে স্পষ্ট অর্থে দাঁড় করাতে গিয়ে
দেখেছি সে কাজ প্রমথদের ; চারি দিকের অন্ধকারের ভিতরে দাঁড়িয়ে
তবুও দেশ সময় ও সমাজ বাস্তবতা
অনেক দূরের থেকে করুণ সুরের মতো ক্রমে ক্রমে বজ্রশব্দে এসে
আজকে যুগের গণনাহীন ব্যক্তি জাতি অর্থ প্রয়াস রীতির স্তম্ভ ভেঙে
মৃত্যু সে কি, গভীরতর (সফলকাম) সত্য ভালোবেসে।

আকাশে রাত

এখন আকাশে রাত,
সে অনেক রাত;
উনিশশো অনন্তের রাত্রি নাকি।

সময় ও অসময়—সকলের সুর
স্থির স্থিরতর হয়ে উঠে
জলের ওপরে জলকণিকার কথিকার শব্দের মতন
অবনমনের ব্যাপ্তি পায়।
পৃথিবীর জাগরীর গুঞ্জরণ দূরে
সৈন্য নটী ভিখিরির;
তারপর কোনো এক সময়ের জন্য নীরবতা
মেনে নিতে হবে জেনে সার্থবাহদের
আলাপ মিইয়ে আসে মুখে
এখন ঘুমের আগে
গভীর রাত্রির পথে।
পৃথিবীর নানা দেশনগরীর কয়েকটি সচকিত ছবি
প্রাণে উৎসারিত হয়ে যেতে চায়:
দিল্লী, চীন, প্যালেস্টাইন, কলকাতা, করাচী,
এথেন্‌স্‌, মিশর, ফ্রান্স, মস্কৌ, লণ্ডন, ন্যুইয়র্ক, ওয়াশিংটন,
আধুনিক ভূমিকার গাঢ় মানদণ্ডের মতন
এই সব।

এই সব নগর বন্দর দেশ আজও
অতীতের উত্তরাধিকার থেকে ক্লান্ত প্রাণে উঠে
নতুন সূর্যকে সেধে তবু তাকে শীত করে দিতে চায় যেন।
কোথাও হ্বার্সাই প্ল্যান লোকার্নো জেনিভা প্রেত....প্রাণে
কথা কয় বলে মনে হয়:
নিথর আটোয়া চুক্তি ফেঁড়ে গিয়ে— থেমে
কেউ নয় আজ আর;
মিউনিখ প্যাক্ট চিরন্তন বিষয়ের
লক্ষ্যভেদ হয়ে গেছে ভেবেছিল;
প্রায়ান্ধ দেবীর মতো নীলজলরাশির ওপার থেকে দ্বীপ
সমস্যার নিরসন হবে বলেছিল
ভারতকে যাকে যা দেবার সব স্থির করে ভালো করে
দান করে;
আরো পরে কনফারেন্স কমিশন প্ল্যান
বিদেশ স্বদেশ সমসাময়িকতার হয়ে তবু
যেন ঢের বিস্তীর্ণ সময়
অধিকারে রয়ে গেছে মনে ভেবে বিহ্বলতায়
মানুষকে বিজড়িত করে চলে গেছে।

কবেকার অন্ধকার আদি দায়ভাগ থেকে ক্রমে মানবের
জীবন বন্ধনমুক্ত হতেছিল নাকি?
কারা যেন সেই
সমুদ্রের মতন মুক্তিকে
গোষ্পদে বিমুক্তি দিতে গিয়ে নেশনের

ব্যবহারে ব্যভিচারে বারবার ছেনেছে ছিঁড়েছে।
রাষ্ট্রনীতি কামনাকেলির চুক্তি সব;
এ ছাড়া এ সব দেশ জাতি অধিনায়কের প্রাণে
কোথাও প্রেরণা নেই—দীপ্তি নেই;
আজ এই আধুনিক দিনে মাসে সময়ে কী কাজ হতে পারে
সে জ্ঞান হারায়ে ওরা অন্তহীন হেতুহীন সময়ের হাতে
সব ভুল শুদ্ধ হবে ভেবে
অবচেতনায় অন্ধকারে প্ল্যান গড়ে, প্যাক্ট করে।
সময়ের ব্যাপ্ত চোরাবালির ভিতরে
ডুবে যায়।
তবুও এখন ওরা
নতুন শক্তির মতো
নিজেদের মতো সেই মূল্যজ্ঞান রয়েছে; তা ছাড়া
কোথাও অপর কাজে মূল্য নেই মনে ভাবে ওরা
আবার প্রলুব্ধ করে যায়,
অবসন্ন পৃথিবীর প্রাণে আত্মপ্রসাদের ঋতু
আবার নেমেছে বলে।

বলে নিতে চায়: সবই নেশনের নেশনের নেশনের।
কানাডার সমুদ্র ও বল্‌কান্‌ বল্‌টিক্‌ গ্রীক সাগরের থেকে
দিল্লী লণ্ডন কাইরো ডাম্বার্টন ওক্‌স্‌ টেহেরান ইয়াল্টায়
ফ্রান্‌স্‌ লেক্‌সাক্‌সেস্‌ চীন আমেরিকা সোভিয়েটে
বিরাট বিসার নাদ মনে হয় যেন ব্যস্ত, অন্তরীক্ষে ঘুরে
সন্তানের মতো নিঃসীম জীবনের জননীকে খুঁজে
শিহরিত হয়ে তবু দেখে গেছে আজ এই অন্ধকার পৃথিবীব সীমা
যদিই-বা আলোকিত হয় তবে সে এক বিমূঢ় হিরোশিমা।
চারি দিকে তাই ব্যর্থ মৃত্যুশীল তবুও আশ্চর্য সব
আশাশীল মানুষের আলোড়ন।

তারা স্থির নেই;
দিন শেষ হয়ে গেলে আরো বড়ো রাত্রির ভিতরে
ঘুমে নেই; মৃত্যু আছে; অথবা আমৃত্যুলোক— পামর, অনন্দা;
সে সব মরণোত্তর ভিড় আজ অন্ধভাবে অনুভব করে;
তাদের দেহের সব অনাগত সন্তানের তরে রেশনের

নির্দিষ্ট মাত্রার মতো কোনো দিকে নারী
নারীরা রয়েছে—কিংবা নেই;
প্রেম নেই, প্রীতি নেই, সূর্য নেই, অন্ন নেই, কিংবা মহাকাল
কেই নয়
অন্ন নেই—অন্ন নেই—নেই;
ইতিহাস: বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃসত্ত্বার মতন;
বাকি সব সন্তানের সন্তানেরা এসে এক দিন
লিখে যাবে।

মানুষের চেতনার দাহ আছে আজও শোকাবহ
যত বেশি আলো তাতে আরো বেশি তাপ
সংগতি বেড়ে গেলে পেতে পারে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
প্রাণের প্রেমের স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে হবে
দিতে হবে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
এ না হলে বিজ্ঞানের মর্মে মর্মে কীট আর ব্যথা
নিরন্তর দোষে পরিণত হবে.মানবের প্রতিভার গুণ
সব আলো হয়ে যাবে ক্ষমাহীন নিয়মের আগুন।

সময়শীর্ষে

কি আসে যায় যদি সাগর থাকে অপার শিশিরকণায় ভিজে।
সূর্য এখন উত্তরণের মালিক হল নিজে।
কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন হয়ে থাকে কি যে
সরিয়ে দিয়ে বিশাল আলোয় দিক্-নিরূপক সূর্য আসে নিজে
যা হয়েছে: হয়েছে,—সেই পৃথিবীকে অন্ধকারে পিছন দিকে ফেলে
মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইয়েতে জ্বেলে
এসেছে সে আরেক ভোরের পটভূমির দিকে।
সারাটা দিন মাছরাঙা আর জলের ঝিলিকে
সূর্য আছে টের পেয়েছি; সংকল্প সুব তাই
গভীর হল।
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরণে সর্বদাই
মহাদেবের কণ্ঠজ্বালা ফুরিয়ে গেছে তবে,
ভেবেছিলাম।
কত যুদ্ধ, কত অশোকস্তম্ভ আলো নিয়ে এল; ইউরোপের বিপ্লবে
মানব আশা ক্ষণিক জেগে বিনিপাতের শ্লেষে
ফুরিয়ে গেল, তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে।
পৃথিবী তার নতুন ক্ষয় ব্যথা ভুলভালে
পিছন থেকে সারাটা দিন ডোডোপাখির টানে
শূন্য হয়ে যেতে যেতে তবুও সকল সাধারণের তরে
আবার নতুন আশাজনক সমাজ আকাশ গড়ে;
জেনেছিলাম।
তোমাকে, আমি দেখেছিলাম বেবিলনের ছাদে
না দাঁড়াতেই ইন্দ্রপ্রস্থ ভোরের সূর্যস্বাদে
আমার পানে তাকিয়ে আছো।
অনেক দিনের মানবইতিহাসের পটভূমি
শেষ করে এক নিকটতর সূর্যালোকে ভোরের আলোয় তুমি তবুও ছিলে
তবু নীল আকাশে পালকে পাখি আলোকে ঠিকরিয়ে
কখন হঠাৎ চলে গেছে সূর্য সঙ্গে নিয়ে
জানি না কোন্ শাদায় কালোয় মিশেল নিবিড় রঙের দিকে;
অন্ধকারে দেখে গেছে মানবপৃথিবীকে:

ইতিহাসের নবীনতর এ আঁধারে অকূল মরুভূমি,
তেমনি আজও ছড়িয়ে আছে—শববাহন তেমন সংহার,—
তেমনি অসীম শবের প্রাবরণী খুলে ধীরে,
অন্তবিহীন মৃত্যুকে আজ ঢাকছ শিশিরে
করুণাময় শান্ত মৃত্তিকায়, মৃত্যু ছাড়া কিছু কি আসে যায়?
অন্তবিহীন কিছু কি আছে শববাহন ছাড়া?
অন্ধকারে অনন্তকাল অনুগমন করে গেছে যারা
শোককাতর মৃতের জগৎ জীবন পাবে বলে,
আলম্বিত রাতের আকাশ আলোয় অন্বেষণ।
আমরা যে সব শববাহক; বিলাপশীল ইতিহাসের মনে
পৃথকসূত্র আছে জন্মে; তবু চিরদিন
অনেক অনেক রকম অন্ধকারে লীন
দেখেছি প্রেমিক গণিকাদের নিকট থেকে ঋণ।

কে কবিতা লেখে

কে কবিতা লেখে
মানুষ, কবি, পুরাণপুরুষ
সূর্য, অন্তহীন শূন্য আধারের স্বগত নীলিমা?
কে?
যেন সময়ের কৌতুকী উৎস থেকে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে
পাপ, অন্ধকার, রিরংসা, মৃত্যু
তবু অগ্নিশ্বেত নারীর মতো জেগে উঠছে স্ফুলিঙ্গের সংঘর্ষে
এইসব অপরিমেয় সচ্ছল নদী-পৃথিবীর,
জ্বলন্ত রাত্রির মতো এইসব অকুতোভয় আলো
ভোরের বেদনার বিপ্লবের ব্যাপ্তির
ক্যাসাণ্ড্রা কণ্ঠের মতন উজ্জ্বল বাণীর
বিদুর, দ্বৈপায়নের মতন অনিমেষ নির্মম প্রেমের শক্তির।

হাজার বর্ষ আগে

সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হ'লো না:
কেবল সে দূরের থেকে আমার দিকে একবার তাকালো
আমি বুঝলাম
চকিত হয়ে মাথা নোয়ালো সে
কিন্তু তবুও তার তাকাবার প্রয়োজন—সপ্রতিভ হয়ে
সাত-দিন আট-দিন ন-দিন দশ-দিন
সপ্রতিভ হয়ে—সপ্রতিভ হয়ে
সমস্ত চোখ দিয়ে আমাকে নির্দিষ্ট করে
অপেক্ষা করে—অপেক্ষা ক'রে
সেই মেয়েটি এর চেয়ে নিকটতর হ'ল না;

কারণ, আমাদের জীবন পাখিদের মতো নয়
যদি হ'ত
সেই মাঘের নীল আকাশে
(আমি তাকে নিয়ে) একবার ধবলাটের সমুদ্রের দিকে চলতাম
গাঙশালিখের মতো আমরা দু'টিতে
আমি কোনো এক পাখির জীবনের জন্যে অপেক্ষা করছি
তুমি কোনো এক পাখির জীবনের জন্যে অপেক্ষা করছো
হয়তো হাজার হাজার বছর পরে
মাঘের নীল আকাশে
সমুদ্রের দিকে যখন উড়ে যাবো
আমাদের মনে হবে
হাজার হাজার বছর আগে আমরা এমন উড়ে যেতে চেয়েছিলাম।

বর্ষবিদায়

পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে এই মানবজীবন
একদিন শুভ পাবে;—হয়তো বা অতীতেই পেত;
সবাই সবার হলে; ক্ষুধা পেলে কেউ
একগাল বাতাস কি খেত।

অনেক মানুষ ভেবে গিয়েছিল স্বপ্নই সফল।
দিনরাত নক্ষত্র নীলিমা অনুভব
করে তারা নিজেদের মননের দেশ গড়ে তবু
দেখেছিল পৃথিবীর রক্তাক্ত বিপ্লব।

তাই আরো বাস্তবিক হয়ে তারা সমস্তই ঠিক
করে নিতে চেয়েছিল শূন্য, সীমা অনর্থ ও অমেয়তা ভেঙে;
মানুষের জীবনের প্রতিটি দিনের কাজে লেগে
ইতিহাস বিকথিত সমাজে নগরে
জেগেছিল। করাল রাত্রির দিকে, নীহারিকা, নারীদের দিকে
নিজের সৃষ্ট ড্রোম, ক্রেন, প্লেন, কালো আকাশের পানে তাকায়ে জীবন
এই মৃগপিপাসায় তবুও মানুষই হতে চায়;—
গভীর রৌদ্রের প্রেমে লোকসাধারণ

সফলতা পেতে গিয়ে সৃষ্টি করে নবীন মৃত্যুর দিন তবু?
—জেনে লোক ক্রমশই জীবনে মহৎ
হ'লেও তো হয়ে যেত;—ইতিহাসবিষমতা আর ইলেক্‌ট্রোন—
অন্ধতাকে মেনে তবু মহাসামাজিকভাবে সৎ
  হওয়া যেত নীড় আর নিখিলের বঞ্চনার পথে।

মনমর্মর

আমার মনের ভিতরে ছায়া আলো এসে পড়ে;
যেইসব অনুভূতি ঝরে গেছে তাদের কঙ্কাল
নদীকে দিয়েছি আমি—বিকেলকে—নক্ষত্রের দাহনে বিশাল
আকাশকে; ফিরে আসে নব দিকচিহ্ন নিয়ে মর্মরে ভিতরে।

সময়ের ঢের উৎস গ্রন্থ ছবি মননের পদ্ধতি সব
নিয়ে যায় হৃদয়কে যেন কোন্ শেষ অনুশীলনের পানে;
অন্তহীন অন্ধকার রয়ে গেছে হয়তো সেখানে :
অসীম আলোর মতো তবুও করেছি অনুভব।

১৯৩৬

সময়ের পথে পথে ঘুরে ফেরে সারাদিন—তবু—তাবপর
ঘুমের সময় আসে অন্ধকারে নদীদের ঢেউযের ভিতর

অনেক মাছের প্রাণে; চারিদিকে চেয়ে থাকে অগণন ঘাস
ধূসর পাখির মতো থেমে থাকে নক্ষত্রের নির্লিপ্ত আকাশ;

বাঁশের বনের পিছে মশার বিন্দুর ভিড়ে জেগে ওঠে চাঁদ।
মনে হয় সমস্ত থামিযে দিয়ে যেন এক মায়াবীর ফাঁদ

তারপর রয়ে গেছে; রূপ প্রেম; সবি অন্ধকার;
সবই দীর্ঘ নিস্তব্ধতা; কঙ্কাল হবার—শূন্যে মিলিযে যাবার।

বিজয়ী

নহি আমি উঞ্ছবৃত্তি, উদাসী ভিক্ষুক;
দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা মাগি বেড়ায় না মন।
মোর তাই নাই শঙ্কা, নাই নিষ্পেষণ;
নম্র নহে শির মোর,—নত নহে বুক।
বিজয়ী সৈনিক আমি, আমার কার্মুক
করিতেছে অহরহ অসত্য খণ্ডন;
টঙ্কারে টঙ্কারে ভরি ধরার অঙ্গন
ছুটিতেছে চিত্ত মোর উৎসাহী, উৎসুক।

কোথায় চকিত ভীত যাত্রিকের দল?
নির্জিতা বসুধা কোথা? নিপীড়িত জীব!
কোথা হিংসা, অত্যাচার, অসুরের বল!
কোথা সিংহাসন জুড়ে জেগে আছে ক্লীব!
আছি আমি সব্যসাচী,—দৃপ্ত, অচঞ্চল,
হস্তে মোর অনিদ্রিত উদ্যত গাণ্ডীব।

জর্নাল ঃ ১৯৩৪

খানিকটা দূরে লাইন—রেলের কঠিন লাইন সব
অন্ধকারে রয়েছে নীরব;
এখানে ঘাসের 'পরে শুয়ে আছি কার্তিকের রাতে;
অসংখ্য আলোর বিন্দু নেভাতে নেভাতে
আবার জ্বালায় বারেবারে
নক্ষত্রেরা আকাশের এপারে—ওপারে।

হঠাৎ রেলের লাইন কেঁপে ওঠে : হিস হিস—
চারিদিকে রূঢ় কলরব;
এক সারি গাড়ি আলো কালো ধোঁয়া বিদ্রূপ বিপ্লব।
তবুও যখন তার লাল আলো মুছল কুয়াশায়
পৃথিবীর আদি দায় অনাদির দায়
ফুরিয়ে গেল কি কিছু? খানিকটা লাল নীল আলো
লজেনচুষের মতো গলে গলে ক্ষীণ শিশু মৃত্যুতে হারালো।

জর্নাল : ১৯৩৬

বিস্মৃতি ধুলোর মতো জড়ো হয় যেইখানে—
সেই হিম নিস্তব্ধ আঁধারে
একবার—আধবার—চেয়ে দেখি
আজো আমি সেইখানে তাকে
খুঁজে পাই:—
নিচের তলায় ঠাণ্ডা বোগা অন্ধকারে
রেলিঙের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছে;—
আলোর বেগের মতো প্রাণ
ছিল সেই যুবকের :
সূর্য আর নক্ষত্রের যেন সে সন্তান।

তবু তার ভালো লাগে আজ স্থবিরতা;
সেখানে সময় শুধু ধূসর ঘড়ির মতো মুখে কথা
বলে ক্লান্ত—ক্লান্ত করে রাখছে হৃদয়;

বসে থেকে বসে নেচে বসে থেকে মানুষের ক্ষয়
সেখানে একটি নারীর জন্য হয়।

আমার এ জীবনের দীর্ঘ—দীর্ঘতর স্তর—অলিগলি ঘিরে
ঈশ্বর বাসনা স্বপ্ন—কতবার গেছে সব ছিঁড়ে।
শুধু তার প্রতীক্ষা আমাকে

কুশপুত্তলীর মতো বারবার সৃষ্টি করে চলে।
ব্রহ্মাণ্ডের কত সৃষ্টি—কত প্রলয়ের কোলাহলে
টলে না তবুও তার প্রেমিকের মন।
তবু সে খাতক, আহা, সময়ই প্রকৃত মহাজন।

লেডা

কোথাও বিদ্যুৎ নাই— তার শুদ্ধ করুণার ভরে
অন্ধকার মাঝরাতে অগ্নি জ্বলে মেঝের উপরে।
কার মেঝে?— মৃত্তিকার, শাদা পাথরের—
নিবিষ্ট আলোর রঙে পাই না তা টের।
ধবল ডানার মৃদু করতালি দিয়ে রাজহাঁস
সকল নদীর জলে ঢেলে ফেলে আঁধার গেলাস
পেয়েছে আগুন এই—বিস্মিত কুন্তীর সহবাস।

১৯৩৮
বিকল্প পাঠ।। ছত্র ১ ঃ 'করুণার' স্থানে 'পিসিমার'
ছত্র ৮ : 'বিস্মিত' স্থানে 'প্রথম'।

মিডিয়া

আমি এই পৃথিবীর হেলিওট্রোপের মতো নীল সমুদ্রকে
একদিন ভালোবেসে চোখ বুজে থেমে গেছি—
তবু তারপর চোখ মেলে
তারে আর কোনো দিগন্তেরে
পাই নিকো; (আমরা প্রতিভূ তবু জেসন ও থিসিয়ুসদের
যে দেশে সমুদ্র নাই আজ আর আমাদের
ভিজে কনিফার কাঠে নড়ে উঠে তবুও জাহাজ
রয়ে গেছে; যাত্রী; কিসের উপর যায় তারা।
মনে পড়ে একদিন গাধার দুধের মতো ম্লান শাদা হাত—
হাতের প্রতিভা ছিল সে সময় পৃথিবীতে বেঁচে
মিডিয়ার : (লেসবস–এর) সমুদ্রের গরম উর্মির রৌদ্র ভেঙে গেলে ঘুম
মাথার অগণ্য চুলে নেমে এসেছিল— সেই শঠ সর্পীদের
নির্জন নিস্তব্ধ করে রেখে
সর্বদাই দুপুরের রৌদ্র চারিদিকে জলে–স্তনের উপরে— থামে
মাথার উপরে দূর দড়ির রহস্যে বাঁধা শাদা পালগুলো
হয়তো সিল্লির মতো উড়ে গেছে আকাশের দিকে
সাগরে জলের রোল চারিদিকে যুবাদের দৃষ্টির ভিতরে
বালির ঘড়ির মতো বেজে যায়— মোমের আলোর মতো নড়ে
মিষ্টিরের মতো এসে কলস্বরে উত্তেজিত করে।

জাহাজের কাঠের ছালে গন্ধে—অন্ধকার মোলায়েম তলনিরে ঘিরে
মদের পিপার নাচ—অগণন শামুকের ভিড়
ক্ষিপ্র হাঙরের গতি—সময়ের দ্রুততাকে স্থির
স্থির করে রেখে দেয়।

সোনালি ডোরার মতো রৌদ্ররেখা আমাদের নাকে মুখে চোখে
জল থেকে সূর্য যাহা তুলে দেয়—দুপুরের গম্ভীর আলোকে
সে সব বিম্বের মাঝে দীর্ঘ নারী দাঁড়ায়েছে একা
মাথার গভীর খোঁপা ভূমার মতন উঁচু, ধীর
হাজার বছর ধ'রে চোখ বুজে অনুভব ক'রে
হে মিডিয়া, আজ আমি সূর্যের শরীর।

১৯৩৯–১৯৪০

বিকল্প পাঠ ॥ ছত্র ৯ : 'গাধার দুধের' স্থানে 'অশ্বীর দুগ্ধের' এবং 'মৃগীর...' ও 'ভেড়ার দুধের'; ছত্র ১১: 'উর্মির' স্থানে 'দুগ্ধের'; ছত্র ১৪: 'উপরে' স্থানে 'ভিতরে', 'থামে' স্থানে 'স্তম্ভে'; ছত্র ১৬: 'সিল্লির' স্থানে 'বকের': 'আকাশের' স্থানে 'নিলিমার'; ছত্র ১৭: 'জলের' স্থানে 'আলোর'; দৃষ্টির স্থানে 'শক্তির'/'প্রাণের'; ছত্র ১৮: 'বালির ঘড়ির মতো বেজে যায়' স্থানে 'থেমে যায় বেজে যায়'; ছত্র ১৯: 'তলোনিরে' স্থানে 'তলদেশ'; ছত্র ২১ : 'ক্ষিপ্র' স্থানে 'শাদা'; ছত্র ২৩: 'রোদ্ররেখা' স্থানে 'প্রতিবিম্ব'।

কিছুদিন আগে ইয়াসিন আলি মরে গেছে

কিছুদিন আগে সেই ইয়াসিন আলি মরে গেছে
সারাদিন ভবঘুরে নাবিকের মতো
সমস্ত নহর ঘুরে নিরপেক্ষতায়
তারপর ফ্ল্যাটে ফিরে পাঁচফুট জমিনে ফলত
একটি মৃত্যুকে পেত পরিষ্কার চোখে।
আমরা বিশদ হয়ে মরণের দিকে
অগ্রসর হয়ে চলি পৃথিবীতে রোজ,
বহুল আস্বাদ নিয়ে তবু পৃথিবীকে
অবসন্ন করে ফেলে সম্পূর্ণ দ্রাঘিমা খুঁজে দেখি।
দুইদিকে চাপা এক কমলালেবুর চেয়ে বড়ো
এই শতাব্দীর সব অমরতা, তবু কবে হবে
ইয়াসিন আর তার মরণের চেয়ে দীর্ঘতর?

১৯৪০

বিকল্প পাঠ ॥ ছত্র ১: 'কিছুদিন' স্থানে 'বহুদিন' 'ইয়াসিন আলি' স্থানে 'পুরঞ্জয় সেন/বোস/সুরঞ্জন ঘোষ/সোমনাথ রায়' ছত্র ৩: 'নহর' স্থানে 'প্রান্তর'; ছত্র ৪: 'ফ্লাটে' স্থানে 'ঘরে'; ছত্র ৯: 'সম্পূর্ণ দ্রাঘিমা খুঁজে দেখি' স্থানে 'আরো ঢের দ্রাঘিমাকে দেখি': ছত্র ১১: 'অমরতা' স্থানে 'হস্তাক্ষর'; ছত্র ১২: 'মরণের' স্থানে 'মৃত্যুর'।

প্রেমিক ১৩৪৫-৪৬

এমন সময় এক মানুষকে হাতে পাওয়া গেল
যাকে ধ'রে পৃথিবীর বাজারের কাছে
ভবঘুরে ভিড়দের বলা যায় : তোমাদের চেয়ে
অধিক আবহমান ধাতু বেঁচে আছে।

সারাদিন কবি আর মুখের ভিতরে
অবহিত দার্শনিক যার প্রণিধানে
নিজেদের, পৃথিবীকে, ব্যাপ্ত পৃথিবীর
বাস্তবতাকে আরো ভালো করে জানে।

এ না হলে ঘড়ির ঘণ্টার শব্দে
ভোরবেলা জেগে উঠে রোজ
ঈষৎ বিবর্ণ সব মুখোসকে দেখা যায় শুধু
মেজে-ঘষে মানুষের মতন সহজ

অথবা আত্মস্থ সব লোকগুলো বসে আছে উচ্চ আসনে,
যতদিন টিকে আছে পৃথিবীর নাম
তাহাদের কারু কোনো সংশয় নেই
পেতে পারে আপনার পিতার প্রণাম।

অথবা অসংখ্য কোটি লোক যেন কেঁদে যায়,
কান পেতে মনে হয় অগণন লোক যেন হাসে,
সমান্তরাল দুই ঘন ঘোর রেখা যেন সম্মিলিত হল
ইন্দ্রজালে—স্মরণীয় দিনের আকাশে।

মে ১৯৪০

বিকল্প পাঠ।। শিরোনাম : 'মধুসূদন পালিত'; ছত্র ৪ : 'আবহমান' স্থানে 'চিরায়ুমান': ছত্র ৬: 'অবহিত' স্থানে 'সাধারণ'; ছত্র ১৩ : 'উচ্চ' স্থানে 'স্বকীয়'; ছত্র ১৬ : 'আপনার' স্থানে 'নিজ নিজ': ছত্র ১৮: 'কান পেতে মনে হয় অগণন' স্থানে 'অথবা অসংখ্য কোটি'; ছত্র ১৯-২০ ব্যবহৃত পাঠের স্থানে :

দুইটি সমান্তরাল ঘোর বিচ্ছেদের রেখা
সম্মিলিত হল যেন মুহূর্তের জাদুর বাতাসে।

একদিন মনে হয়েছিল

একদিন মনে হয়েছিল সব যুবক ও তরুণীকে
রাবিশের ফুটপাতে শাদা নীল হরিদ্বর্ণ পাখির মতন
কোনো এক সমুদ্রঘড়ির দিকে ভেসে যায় তারা—
তাহাদের অবয়বে সূর্যফেনার আলোড়ন।

তাদের পিতারা সব দাঁড়ায়েছে হেমন্তের নদীর নিকটে,
সুদীর্ঘ দিবস ক্লান্ত বায়ুকুকুরের মতো ঘুরে
মৃত পৃথিবীকে মিছা প্রভাতের সূর্যে ফেলে দিয়ে
উদ্ভিদধূসর অন্ধ মাংস হয়ে নদীর মুকুরে

দেখে গেছে নিজেদের—অনুভব করে গেছে অন্ধকারে
সূর্যের অকৃত্রিম অন্ধকারে নীরবে দাঁড়ায়ে,
অনুভব করে গেছে কী করে মানুষ ক্রমে জল হয়ে যায়
মাছের শল্ক, গুল্ম, ছাতকুড়ো লেগে থাকে গায়ে,

কী করে শরীর ক্রমে স্মৃতি হয়ে যায়।
গার্গী, নাগার্জুন, বুদ্ধ, শেলি, প্যাসকাল—
চোখের খোড়ল থেকে অঙ্কুরের মতো জেগে উঠে
হয়ে থাকে পাললিক উদ্ভিদের-জাল।

তাদের শিকড় দূর—দূরতর মাটির ভিতরে
আঁকাবাঁকা কঙ্কালের কঞ্চির মতন,
ওলের মতন বুনো মুখ নিয়ে মৃত্তিকাকে পরিহাস করে
অন্ধকারে বাব করে পরিণত গাজরের স্তন।

বহুতব আলোচনা হয়েছিল পৃথিবীতে—একদিন
অনেক মানুষ এসে বসেছে কুশনে,
তারপর কী যে হয়েছিল—কিছু মনে নেই
জল গুল্ম উদ্ভিদেব গলাধঃকরণে
মৃত্তিকা নিজের যুষ টের পায়
মিষ্টি আলুর শীর্ণ দীর্ঘ এক দাড়ির ভিতরে,
আপন জন্মের আগে বেঁচেছিল কনফুশিযাস,
টিকে আছে আপনার মধুমান মৃত্যুর পরে।

ভোরের মানুষ এক

ভোরের মানুষ এক প্রান্তরেব পথে একা ঘুরে
নিসর্গের কথা ভাবে পুনরায়,
মীমাংসার পরিণতিদের কথা ভাবে।
মাঠে জলে মাকড়ের জলে এই শিশিরের রূপ
কতদিন রবে আর?
নেউলধূসর এই মাঠের ভিতরে হাঁস ব্যাঙ খরগোশ
মানুষের জীবনের নক্ষত্রের দোষ
পুনরায় ধূর্ততায় পৃথিবীতে পথ চেয়ে তবু—কতদিন
ষড়যন্ত্রহীন স্বচ্ছ এরকম প্রভাতকে রেখে যাবে
মানুষের সংসর্গলোলুপ?
শরীরের অন্ধকার ঘাসে পাবে শিশিরের গৃপ?

মে ১৯৪০

গফুর

'গফুর'—নীরবে তাহাকে আমি ডাকিলাম, তবু—
তবুও আমার কানে লেগে এই—এরকম বায়বীয় রোল
-ততটা কৃত্রিম নয়, যতটা অসমীচীন—হিম—

'তোমার বলদদুটো কই গেল?'—'সে সব অনেকদিন আগে
মরে গেছে'—যেন কারু সহোদর মরে গেছে, অথবা হানিফা
নেই আর—তবুও কিছুই নেই ব'লে
কোথাও অন্য কিছু নেই ব'লে গফুরের মুখের ভিতরে
নিসর্গ নিজেই চুপে বিকেলের প্রান্তরের দোয়েলের মতো
নেমে এল—কোনো এক উপস্থিত কৃমির উপরে
নীরবে আঁচড় কেটে—নিজ মনে—তবুও কোথাও কোনো রেখা—
ভাষা—সুর—বক্রোক্তির অব্যর্থ স্পষ্টতা
পেল নাকো—সকলই অব্যর্থ, হিম—হেমন্তের অব্যর্থতায়।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪০

পেলবশীর্ষ

ধানের পেলব ফুল মাইল মাইল ক্ষেতে
মণিমালা শঙ্খমালা নারীর মতন
কৃষকের সরলতা থেকে জেগে উঠে
দাঁড়ায়েছে ঈষৎ অনন্য সাধারণ।

নিমেষে হারায়ে যাবে পৃথিবীর আলোর বাজারে
নিমেষে হারায়ে যাবে পৃথিবীর রাতের বাজারে
যেখানে ভূমিকা নেই সেই দেশ মূল গায়েনের হাতে তুলে
অভিজ্ঞ পেঁচার শ্লেষে ফেলে রেখে যাবে, শূন্যতারে।

১৯৪০-১৯৪১

বিকল্প পাঠ।। ছত্র ১: 'পেলব ফুল' স্থানে ছোঁয়াচে মুখ; ছত্র ৩। দাঁড়ায়েছে ঈষৎ অনন্যসাধারণ' স্থানে দাঁড়ায়েছে গণিকার মতো বিচক্ষণ।'

আমি ওই সমুদ্রের যুবনারীদের

আমি ওই সমুদ্রের যুবনারীদের সাথে কোনো একদিন
কোথাও ছিলাম বলে মনে পড়ে—ট্রিপলি, ইটালি, গ্রীস, সিন্ধু মালাবারে
তবুও সময়ে ঢের বেড়ে গিয়ে মানুষের ক্লান্তিহীন জন্মমরণের
গণনার দাঁড়ি টেনে যুগ যুগ—বিচিত্র মূল্যের পথে দাঁড়িয়েছি আজ।

জানি না তুমিও কেউ সেই দীপ্ত দূর উদয়ের
সাগরেব পার থেকে আমার নিকটে এসে দাঁড়াযেছ কি না।
নাবী আছে—সে অনুবাধাপুবেব যদি হযে যেত তবে
হযে যেত—তবুও নাবীবা আজ ইতিহাসভণিতার থেকে
ক্লান্তি নিযে কাছে আসে—দূবে যায—কৃতী ইতিহাসপ্রতিভাব
নিকটে কাহাবও ঋণ নেই আজ—নাবীসূর্য নেই।

১৯৪১

আঁধার থেকে উঠে এসে

আঁধাব থেকে উঠে এসে অন্ধকাবে ফুবিযে যাবাব আগে
জীবনেব এই সাদাকালো বঙেব মুখে এসে
অন্য কোনো নতুন কথা নদী পাখি সূর্য মানুষেব
নিকটে নেই বোধ কবেছি—বলেছে সবই তাবা।

মানুষকে তাব দেশ শতাব্দীব লক্ষ্য মনে বেখে
তবুও বহিঃপৃথিবী ধ্রুব অধ্রুব সবদিকে
গভীবভাবে তাকিযে স্থিব কবতে হয প্রিয
সত্য সেবা সংকল্পকে—না হলে সবই অনবনমনীয।

বিকল্প পাঠ।। ছত্র ১–২ এব পবিবর্তে
দাঁড়িযে থেকে—ধীবে হেঁটে—হেমন্তলোক আগাত ক'বে আমি যা জেনেছি তাবই মৃদু প্রতিধ্বনি
ছত্র ৮: 'সবই' স্থানে 'আলো'।

কে শরীর কে বা ছায়া

কে শবীব? কে বা ছাযা? সমান্তবাল সব ছাযাব ভিতবে
শবীবিণী মৃগী এসে (মনে হয) নিজ পথে বিচবণ কবে।
পিপুলেব ডালগুলো সেই মৃগী রূপসীব মুখে এসে পড়ে।

তাদেব পিছনে গিযে টেব পেযে যাই তবু ভুল,
কণ্‌ফুশিযাস থেকে কার্ল মার্ক্‌স্ হযেছে বিমর্ষ
এ সব ছাযায চ'বে—ক্রমেই আকীর্ণ শিবাকুলে।

বর্ষবিদায়

পৃথিবীব আলো অন্ধকাবে এই মানবজীবন
একদিন শুভ পাবে;—হযতো বা অতীতেই পেত;
সবাই সবাব হলে; —ক্ষুধা পেলে কেউ
একগাল বাতাস কি খেত।

অনেক মানুষ ভেবে গিয়েছিল স্বপ্নই সফল।
দিনরাত নক্ষত্র নীলিমা অনুভব
করে তারা নিজেদের মননের দেশ গড়ে তবু
দেখেছিল পৃথিবীর রক্তাক্ত বিপ্লব।

তাই আরো বাস্তবিক হয়ে তারা সমস্তই ঠিক
ক'রে নিতে চেয়েছিল শূন্য, সীমা অনর্থ ও অমেয়তা ভেঙে;
মানুষের জীবনের প্রতিটি দিনের কাজে লেগে
ইতিহাস বিকথিত সমাজে নগরে
জেগেছিল। করাল রাত্রির দিকে, নীহারিকা, নারীদের দিকে
নিজের সৃষ্ট ড্রোম, ক্রেন, প্লেন, কালো আকাশের পানে তাকায়ে জীবন
এই মৃগপিপাসায় তবুও মানুষই হতে চায়;—
গভীর রৌদ্রের প্রেমে লোকসাধারণ

সফলতা পেতে গিয়ে সৃষ্টি করে নবীন মৃত্যুর দিন তবু?
—জেনে লোক ক্রমশই জীবনে মহৎ
হ'লেও তো হয়ে যেত;—ইতিহাস বিষমতা আর
ইলেক্‌ট্রোন—অন্ধতাকে মেনে তবু মহাসামাজিকভাবে সৎ
হওয়া যেত নীড় আর নিখিলের বঞ্চনার পথে।

কবিতাগুচ্ছ

১
নক্ষত্র, কেমন ক'রে জেগে' থাক তুমি অই আকাশের শীতে!
যখন সকল বাতি নিভে যায়, নক্ষত্র কেমন ক'রে জ্বলে!
আমাদের দ'লে যায় মৃত্যু এসে অন্ধকারে; তারপর, তারে তুমি দল;
তোমারে তবুও মৃত্যু আমাদের মতো ক'রে একবার চেয়েছে দলিতে!
হিম হাওয়া অন্ধকারে পৃথিবীর রুগ্ন বিরহীরে ব্যথা দিতে
চ'লে আসে,—সে বেদনা কোনোদিন বুকে তুমি পেয়েছ কি বল?
তুমিও জেনেছ ব্যথা হে নক্ষত্র,—নিঃশব্দে তবুও পথ চল;
যে ফসল ঝ'রে যায় তার মতো আমাদের হতেছে ফলিতে!

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে কখন জেগেছে বুকে ভয়;
সবুজ পাতার গন্ধে ফুটে ওঠে হলুদ পাতার মতো প্রাণ
এইখানে;—কাস্তে হারেত চারিদিকে ফিরিতেছে এখানে সময়!
দিনেরে ডাকিছে রাত্রি,—মৃত্যু এসে জীবনেরে করিছে আহ্বান
এইখানে;—কখন ফুরাতে হয়,—কখন থামিয়া যেতে হয়—
এই ভয়ে নক্ষত্র তোমার চোখ কোনোদিন হয়েছে কি ম্লান!

২
ঘুমায়ে পড়িতে হবে একদিন আকাশের নক্ষত্রের তলে
শ্রান্ত হ'য়ে—উত্তর মেরুর শাদা তুষারের সিন্ধুর মতন!

এই রাত্রি,—এই দিন,—এই আলো,—জীবনের এই আয়োজন,—
আকাশের নীচে এসে ভুলে যাব ইহাদের আমরা সকলে!
একদিন শরীরের স্বাদ আমি জানিয়াছি, সাগরের জলে
দেহ ধুয়ে;—ভালোবেসে বুঝিয়াছি আমাদের হৃদয় কেমন!
একদিন জেগে থেকে দেখিয়াছি আমাদের জীবনের এই আলোড়ন,
আঁধারের কানে আলো—রাত্রি দিনের কানে কত কথা বলে

শুনিয়াছি;—এই দেখা—জেগে থাকা একদিন তবু সাঙ্গ হবে,—
মাঠের শস্যের মতো আমাদের ফলিবার রয়েছে সময়;
একবার ফ'লে গেলে তারপর ভালো লাগে মরণের হাত,—
ঘুমন্তের মতো ক'রে আমাদের কখন সে বুকে তুলে লবে!—
সেই মৃত্যু কাছে এসে একে একে সকলেরে বুকে তুলে লয়;—
সময় ফুরায়ে গেলে সব চেয়ে ভালো লাগে তাহার আস্বাদ!—

৩

যতদিন আলো আছে আমাদের জাগিবার শেষ অবসর
যতদিন রয়েছে এ পৃথিবীতে,—উচ্ছৃঙ্খল সৃজনের পানে
আমরা তাকায়ে রব ততদিন;—যদি কোনো শৃঙ্খলার গানে
আকাশ ভরিতে পারি,—শান্ত করে দিতে পারি পৃথিবীর জ্বর
আমাদের গানে যদি;—হাত ধ'রে আসিয়াছি তাই পরস্পর!
একদিন অন্ধকারে মৃত্যু এসে কথা কবে আমাদের কানে,—
জানি না কি? আজ তবু আসিয়াছি হে জীবন, তোমার আহ্বানে!
ঘুমের সান্ত্বনা ভুলে জেগে আছি বেদনার গহ্বরের পর!

জেগে আছি ধীর চোখে;—তাহাদের স্থির আলো লয়ে
আকাশে নক্ষত্র জাগে শৃঙ্খলায় আকাশের নক্ষত্রের সাথে;
তাহাদের ছন্দ এনে সৃজনের অন্ধকারে যদি স্থির হয়ে
আমরা জ্বলিতে পারি; যদি পারি নক্ষত্রের মতন জ্বালাতে
পৃথিবীরে;—আগুনের অসহিষ্ণু স্ফুলিঙ্গের মতো আজ দ'হে
তারার আলোর মতো জ্বলিয়ে উঠিতে পারি যদি কালরাতে!

৪

হৃদয়ের ক্লান্তি ভুলে', সারাদিন জীবনের ক্ষেতে কাজ ক'রে,
তারপর—ভালো লাগে পৃথিবীর অন্ধকার,—ঘুমের সময়;
বীজ বুনে শস্য কেটে—তারপর আমাদের প্রাণ ক্লান্ত হয়,
লাঙল পড়িয়া থাকে মাঠে মাঠে,—তারার আলোয় থাকে পড়ে
তখন হাতের কাস্তে;—ঘুমন্ত দেখে না সেই তারার আলোরে!
যখন অনেক ঘুম পৃথিবীতে আমাদের বুকে জন্ম লয়;
পৃথিবীর ফসলের ক্ষেতে ব'সে অবসাদ জেনেছে হৃদয়
আমাদের দুই চোখ তাই ঘুমে আরো ঘুমে উঠিয়াছে ভ'রে!

পৃথিরী বিদায় লয়ে দূরে—দূরে—আরো দূরে—দূরে চলে যায়,
তাহার পায়ের শব্দ তারপর থেমে যায় নক্ষত্রের তলে;

তারার আলোর মতো দিনের আলোর কাছে লয়েছি বিদায়,
স্থির নক্ষত্রের মতো ঘুমায়ে রয়েছি ধীর নদীটির জলে;
ঘুমের সান্ত্বনা শান্তি পাবে ব'লে সকলেই ক্লান্ত হতে চায়,—
ব্যথা পেতে চায় গিয়ে একবার পৃথিবীর ক্লান্তি—কোলাহলে!

৫

অন্তরে চাই না তাপ,—হৃদয়ে তারার মত স্থির আলো চাই;
শান্তির বীজের মতো ছড়ায়ে থাকিতে চাই পৃথিবীর 'পরে!
সকল সাম্রাজ্য রাজ্য সিংহাসন আমাদের মন ক্লান্ত করে,
আকাশের নক্ষত্রের তলে এসে তারপর আমরা দাঁড়াই!
দুই চোখ মেলে জেগে যেই তৃপ্তি পৃথিবীতে কেহ পায় নাই,
যেই শান্তি যে সান্ত্বনা রয়ে গেছে মরণের ঘুমের ভিতরে,
তাহার আস্বাদ পেতে চ'লে আসি শান্ত এক আকাশের তরে!—
ধীর নক্ষত্রের তলে জেগে জেগে আকাঙ্ক্ষা মিটাই;
এই ভালো,—নক্ষত্রের স্থির আলো—পথিকের চোখের ধীরতা;
পৃথিবীর কোলাহলে জাগিবার যতটুকু রয়েছে সময়—
তাপ নয়,—জ্বালা নয়—তারার মতন আলো আর নিশ্চয়তা
আকাশের বুক থেকে চেয়ে নিয়ে আমাদের স্থির হতে হয়!
অসহিষ্ণু পৃথিবী কি কোনোদিন শুনিতেছে জীবনের কথা?
উচ্ছৃঙ্খল পৃথিবী কি কোনোদিন ভুলে যায় মরণের ভয়!

৬

নক্ষত্র হারায়ে ফেলে কোনোদিন যদি তার হৃদয়ের জ্যোতি,
সিন্ধুর সুরের ছন্দ অন্ধকারে কোনোদিন যদি স্তব্ধ হয়,
উচ্ছৃঙ্খল বিচ্ছৃঙ্খল যদি এই পৃথিবীর বুকে লেগে রয়,
প্রাণেরে শাসন করে কোনোদিন যদি মৃত্যু—নিরাশা—নিয়তি,
যদি পথ বুজে যায়,—স্তব্ধ হয়ে থেমে যায় পথিকের গতি,
ক্লান্ত হয়ে ঘুমাবার অবসর খুঁজে ফেরে যদি এ হৃদয়,—
তা হলে প্রেমের সে কি হারায়েছে?—জীবনের সাথে কথা কয়
যেই প্রেম,—যার দুটি হাত ধ'রে ভুলে যাই পৃথিবীর ক্ষতি;
কোনো দূর আকাশের নক্ষত্রের বুক থেকে পৃথিবীতে তারে
আমরা ডাকিয়া আনি,—সে আসিবে কবে?—তার অপেক্ষায় থেকে
মানুষ জাগিয়া রয়;—মানুষের মতো আর কে জাগিতে পারে
প্রেমের প্রতীক্ষা ক'রে,—হে প্রেম,—তোমারে ডেকে ডেকে!
আমাদের সব আলো নিভে যায় আমাদের সব দীপাধারে,—
হৃদয়ের অন্ধকারে তারার মতন আলো লয়ে জ্বলিবে কে!

৭

তুমিও মৃত্যুর মতো ওহে সিন্ধু অই দূর উত্তর মেরুর,—
জীবনের ঘণ্টা নিয়ে কেউ গিয়ে তোলে নাকো কোনো কোলাহল
তোমার বুকের 'পরে,—মৃত্যুর চুমোর মতো ঘুমন্ত শীতল
তোমার হৃদয় এই;—আকাঙ্ক্ষা নাইকো তার,—কোনো এক দূর

অধীর করে না তারে;—আমাদের অন্তরের অসহিষ্ণু সুর
শোনে না সে,—খোঁজে না সে অবসাদে অন্য এক আকাশের তল!
তারার আলোর নীচে প'ড়ে আছে শান্ত হিম সমুদ্র ধবল!
জীবনের সব শ্রান্তি শেষ হলে মরণের মতন মধুর
যেই অবসর আসে তারার আলোর তলে আমাদের তরে
কোনো এক শীত রাতে পৃথিবীর অন্ধকার ঘুমের জগতে,—
তখন তোমার মতো হে সমুদ্র, আমরা ঘুমাই পরস্পরে!
তখন জানি না আর,—জানিতে চাহি না আর পৃথিবীর পথে
কারা সব জেগে আছে!—জানিতে চাহি না কারা কোলাহল করে!
অথবা ঘুমায় কারা ক্লান্ত হয়ে তুষারের সমুদ্রে পর্বতে!—

৮

আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে মুছে ফেলে তুমি যাও চ'লে
হে সময়,—সিন্ধুরেও তুমি এসে এক দিন স্তব্ধ ক'রে যাও;
ডুবায়ে নিভায়ে যাও সবই তুমি,—তুমি এসে সকল ফুরাও;
তুমি একা জেগে থাক হে সময়, সকলের জাগা শেষ হ'লে!
পথে পথে প'ড়ে যায় পথিকেরা,—তবু তুমি পড় না ক'স্খ'লে!
সবারে ভুলায় মৃত্যু;—হে সময়, তুমি নিজে মৃত্যুরে ভুলাও!
হে পথিক, মৃত্যুর সান্ত্বনা ভুলে আর কোন্ শান্তি তুমি চাও?
কোন্ স্বস্তি জেগে থেকে? বলো তুমি কোন্ স্বাদ একা জ্ব'লে জ্ব'লে!

আমরা জেনেছি ক্লান্তি,—তাই ভালোবাসিয়াছি ঘুমের সময়,
আলো আর অন্ধকারে অসংযত সমুদ্রের মতো ঢেউ তুলে
অনেক আকাশ খুঁজে ছুটে ছুটে তারপর দুই চোখ অবসন্ন হয়!
নক্ষত্র—পৃথিবী—সিন্ধু—ঘুমে তাই একে একে পড়িতেছে ঢুলে,
তোমার পায়ের পথ প্রতীক্ষায় প্রেমিকের মত জেগে রয়!
তোমার মতন সে-ও ভুলে গেছে ঘুম, গেছে মরণেরে ভুলে!—

৯

আমি যদি কোনোদিন চ'লে যাই এই আলো অন্ধকার ছেড়ে,
চ'লে যাই যদি আমি অন্য এক অন্ধকার—আলোর আকাশে,
পায়ের অক্ষর সব মুছে যায় যদি এই ধুলোমাটিঘাসে,
ওগো পথ,—একজন চ'লে যাবে তবে শুধু—পাবে অনেকেরে
তোমার বুকের কাছে তবু তুমি;—কখন যে ক্লান্তি এসে ঘেরে
আমাদের,—কখন জড়ায়ে পড়ি অবসাদে—সময়ের ফাঁসে!—
কখন পাতার মতো খসে যাই ক্ষয়ে যাই উত্তর বাতাসে!
কখন মাছির মতো আমাদের মৃত্যু এসে নিয়ে যায় কেড়ে

আমরা জানি না কিছু;—একদিন ওগো পথ,—যাই যদি চ'লে—
শীতরাতে স্থির নক্ষত্রের তলে আসে যদি ঘুমের সময়,
মনে হয় যদি ঐ আকাশের নক্ষত্রের সাথে শেষ হ'লে
মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়-শান্তি তবে হয়,—

সেই কথা কে শুনিবে সেইদিন!—তখন যে ঘুমায়ে সকলে;
আমার পায়ের পথ পৃথিবীর সে কি তবু কান পেতে রয়!

১০

দূর পথে জন্ম নিয়ে রহিতাম যদি আমি—কাফিরের ছেলে।
সবুজ শাখার মতো সেইখানে মানুষের হৃদয় সচ্ছল,
অন্তরের অবসরে শান্ত হয়ে আছে সেই আকাশের তল,—
বুক থেকে আমাদের আজিকার পৃথিবীর ফাঁস খুলে ফেলে
সেইখানে ব'সে যদি রহিতাম বালকের মতো অবহেলে!
সেইখানে কোনোদিন এই চূর্ণ পৃথিবীর কোনো কোলাহল
কেউ গিয়ে শোনে না কো;—শুদ্ধ হয়ে ধরণীর সমুদ্রের জল
যেই সাধ পূর্ণ করে অন্ধকারে আকাশের নক্ষত্রেরে পেলে

আমিও তেমন করে অসহিষ্ণু হৃদয়ের অন্বেষণ ভুলে,
সেই দূর আকাশের আলো আর আঁধারের সাথে এক হয়ে
রহিতাম সেইখানে জীবনেরে শিশুর মতন বুকে তুলে!
কাফ্রির ছেলের মতো রহিতাম সে অনেক অবসর লয়ে;
জন্মাতাম যদি আমি দূর পথে সকল শৃঙ্খল খুলে খুলে,—
প্রভাতের সমুদ্রের শাদা ফেনা—সচ্ছল জলের মতো ব'য়ে!

১১

লাল মানুষের মতো সমুদ্রের শঙ্খ আর ঝিনুক কুড়ায়ে
রব আমি অই সমুদ্রের পাশে তাহাদের অবকাশ লয়ে;
সেই সব মানুষের ভিড়ে গিয়ে তাহাদের মত আমি হয়ে
শরীর ভাসায়ে দেব তাহাদের মতো আমি সাগরের গায়ে!
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ছুটে গিয়ে ল'ব আমি হৃদয়ে জড়ায়ে
সমুদ্রের শাদা ফেনা;—আমি সেই সাগরের পারে যাব রয়ে
সব ভুলে;—আমি এই এখানের পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষ'য়ে
ঢেউয়ের মতন গিয়ে লুটায়ে পড়িব সেই পৃথিবীর পায়ে!

সেখানে অনেক আলো জেগে ওঠে পরিচ্ছন্ন ভোরের আকাশে,
হাতের শাঁখের মতো তাহাদের সেইখানে সিন্ধু গায় গান!
তারার আলোয় ভেসে সেইখানে পরিষ্কার রাত্রি চ'লে আসে,
নক্ষত্র সিন্ধুর মতো সেইখানে জেগে আছে মানুষের প্রাণ!
শাদা ফেনা শঙ্খ লয়ে ভুলে আছে,—হৃদয়ের সান্ত্বনা আশ্বাসে
ব'সে আছে,—বেঁচে আছে পরিচ্ছন্ন আকাশের রাত্রির সমান!

১২

আবার দেখেছি স্বপ্ন কাল রাতে,—নক্ষত্রের আলোয় শীতল
আকাশ ছড়ায়ে ছিল শান্ত হয়ে,—মৃত্যুর মতন স্তব্ধ হয়ে;
পৃথিবীর বুক থেকে কে আমারে নক্ষত্রের কাছে ডেকে লয়ে
চলে গেলে;—সেখানে আকাশে আর ছিল নাকো কোনো কোলাহল!

তারে আমি বলিলাম, 'আমিও তো খুঁজেছি এ আকাশের তল,—
সহিষ্ণু নদীর মত ঘুম ভুলে সব চেয়ে ক্লান্ত পথ ব'য়ে,
পৃথিবীর অন্ধকার পথে ঘুরে মানুষের মত ব্যথা স'য়ে
খুঁজেছি তো;'—চেয়ে আমি দেখিলাম চোখে তার ভ'রে আছে জল!

চোখ বুঝে আমার এ করতল সে কেবল টেনে নিল বুকে,
আর কিছু বলিল না;—বলিবার কী যে ছিল গেলাম তা ভুলে;
নক্ষত্রের কোলে থেকে পৃথিবীর মানুষের মতন অসুখে
বুক তার ভরে আছে!—পৃথিবীর পার থেকে নিল তাই তুলে
সে আমারে;—যেই বিরহের ব্যথা জেনেছি লাগিয়া আছে মুখে,—
তারি বোধ অনুভূতি জেগে আছে তার চোখে নক্ষত্রের কূলে—!

১৩
অনেক আকাঙ্ক্ষা ক'রে ব'সে আছ তুমি এই পৃথিবীর পারে,
নক্ষত্রের কাল গুণে এক হয়ে আকাশের নক্ষত্রের সাথে
জেগে আছ, হে মানুষ,—তুমি এই পৃথিবীর অন্ধকার রাতে;
কাহার পায়ের শব্দ শুনেছ কোথায় তুমি!—কবে তুমি কারে
দেখেছ তোমার মতো ব'সে আছে!—দেখিয়াছ কোন্ দেবতারে
যন্ত্রণার ক্রুশ লয়ে স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে একাকী—দাঁড়াতে
তোমার মতন এসে!—দেখেছ কি পরস্পর হাত ধরে হাতে
যতদিন জেগে আছ পৃথিবীর নদী আর পর্বতের ধারে!

আকাশ হতেছে ক্লান্ত,—আকাশের সব তারা অবসন্ন হয়;
আকাশের বুক থেকে পুরাতন দেবতারা পড়িতেছে খ'সে;
মৃত্যু শুধু জেগে আছে,—মৃত্যুর মতন জেগে রয়েছে সময়;
তাহাদের সাথে তুমি সহিষ্ণু মানুষ হয়ে রহিয়াছ ব'সে—
বেদনার পরে শান্তি—হতাশার শেষে এক আশা জেগে রয়
যখন নিয়তি নিজে এক দিন ম'রে যায় নক্ষত্রের দোষে—!

১৪
কোথায় পেয়েছ তুমি হৃদয়ের স্থির আলো পৃথিবীর কবি!
নক্ষত্র ধরেছে হাত ধীর হয়ে আকাশের নক্ষত্রের সাথে
যেই শান্তি শৃঙ্খলার গান গেয়ে কোনো এক তুষারের রাতে,—
যখন নিয়তি—ব্যথা অন্ধকার পৃথিবীতে উঠেছে বিক্ষোভি;
ঘুমায়ে পড়েছে প্রেম ক্লেশ পেয়ে মৃত্যুর শীতল চুমা লভি;—
তখন তাদের মতো জেগে আছ হাত রেখে নক্ষত্রের হাতে!
সময় ফুরায়ে যায়,—আকাশের ছন্দ তবু পারে কি ফুরাতে!—
শুদ্ধ পুরোহিতদের মতো অই নক্ষত্রেরা যায় যারে স্তবি

পরিচ্ছন্ন আকাশের পারে এসে! পৃথিবীর অন্ধকারে ঢেকে
আকাশের নক্ষত্রের তলে এসে হৃদয়ের অবসর নিয়ে
পূজা করে যারে মধ্য সিন্ধু তার পবিত্র জলের অভিষেকে!

পৃথিবীর মানুষের ভগ্ন ভাষা হে কবি, তোমার আলো দিয়ে
গহ্বরের নগ্নতারে পূর্ণ ক'রে নিয়ে তার প্রার্থনা কি শেখে
পৃথিবীর ক্লান্ত মানুষের দল, হে কবি, তোমার কাছে গিয়ে!

১৫

পৃথিবীর সাথে চলে ক্লান্ত হয়ে খুঁজি না কো তবু অবসর;
কারণ,—দিনের পরে রাত আসে,—লয়ে আসে তার নিশ্চয়তা
জীবনের পরে মৃত্যু;—যতদিন জেগে আছি নক্ষত্রের প্রথা
কে করিবে বিচ্ছৃঙ্খল?—যতদিন সমুদ্রের শাসনের স্বর
জেগে আছে,—যতদিন দিনরাত হাত ধ'রে চলে পরস্পর
চোখ বুজে মেনে নিতে হবে এই পৃথিবীর তীক্ষ্ণতা-খর্বতা
ধীর মানুষের মতো;—সারাদিন পথে চ'লে সকলের কথা
শুনে নিয়ে তারপর অন্ধকারে খুঁজে নেব আমাদের ঘর;

ঘুমাবার অবসর এর আগে খুঁজিবে কে পৃথিবীর পথে!
যেই বীজ বুনে গেছি তার শস্য একবার নিতে হবে কেটে,
একবার সৃজনের নিয়মের অর্থ বুঝে নেব ভালোমতে,
তার শৃঙ্খলার সাথে হৃদয়েরে নিতে হবে ভালো ক'রে এঁটে;
জীবনের সাথে সাথে ফিরে ফিরে পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
ঢেউয়ের ফেনার মত তারপর তৃপ্ত হয়ে ঘুমাব সৈকতে!
শুদ্ধ

১৬

এ হৃদয় শুধু এক সুর জানে,—সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো শুধু এক গান
জানি আমি;—ভুলিয়া গিয়াছি আমি পৃথিবীর—আকাশের আর সব ভাষা;
চিনেছি তোমারে আমি সকলের মাঝখানে,—জেনেছি তোমার ভালোবাসা!
জীবনের কোলাহলে সব চেয়ে আগে গিয়ে তোমারেই করেছি আহ্বান!
দিন নিভে গেলে পরে রহিয়াছে অন্ধকার আকাশের বুকে যেই স্থান
স্থির নক্ষত্রের তরে,—সিন্দুর ঢেউয়ের বুকে রয়েছে যে ফনার পিপাসা,
মানুষের বেদনার গহ্বরের অন্ধকারে আলোর মতন যেই আশা
জেগে থাকে,—হলুদ পাতার বুকে লেগে থাকে যেই মিষ্ট মরণের ঘ্রাণ

কোনো এক শীতরাতে;—আমার হৃদয়ে এসে তুমি জেগে রয়েছ তেমন!
পৃথিবীর শুদ্ধ পুরোহিতদের মতো অই প্রভাতের সমুদ্রের জল
অই দূর আকাশের বুক থেকে মুছে ফেলিতেছে সব আঁধার যেমন
তুমিও ফেলেছ ধুয়ে বুক থেকে সব ব্যথা—সব গ্লানি-কলঙ্ক সকল!
তুমি জেগে আছ ব'লে আমি এই পৃথিবীতে জাগিবার করি আয়োজন,
যখন ঘুমায়ে যাবে তোমার বুকের পরে মৃত্যু হয়ে ঘুমাব কেবল!—

১৭

বাহিরে ডাক ছেড়ে এক দিন রাত্রির পাখির মতো ঘরের ভিতর
চলে গেছিলাম আমি,—সেইদিন ভালো লেগেছিল শান্তি সান্ত্বনার স্বাদ

তুমি কাছে ছিলে ব'লে;—তাই মনে হয়েছিল মানুষের হৃদয়ের সাধ
যে ভালোবেসেছে তার ভালোবাসা লয়ে শুধু একখানা ঘর
বাঁধিয়া রাখিতে চায়;—নির্ভর করিতে চায় হৃদয়ের প্রেমের উপর!
কারণ, তারার মতো স্থির প্রেম,—বালির মতন এই পৃথিবীর বাঁধ
খ'সে পড়ে চারিদিকে;—প্রেম যে দিয়েছে তারে মনে—মনে করি আশীর্বাদ
আজ আমি,—ভালোবেসে মনে পড়ে কাটায়েছি রাত আর দিন পরস্পর

আমরা দুজনে;—আজ তুমি চ'লে গেছ—ফ'লে গেছে যে এক ফসল,—
ঝ'রে গেছে;—চারিদিকে ধোঁয়াধুলো—পৃথিবীর প্রতিহত মানুষের ভিড়,—
আমিও এসেছি আজ তাহাদের মাঝখানে—পূর্ণ ক'রে তাহাদের স্থল;
তবুও আমারে যদি ডেকে নাও পথ থেকে আমি প্রিয়া রব কি বধির!
সারা রাত ঢেউ তুলে ক্লান্ত হয়ে নক্ষত্রেরে ডাকে অই সমুদ্রের জল,—
দূর আকাশের পর তোমার মতন প্রিয়া তবুও নক্ষত্র থাকে স্থির!

১৮
জীবনের যতদিন কেটে গেছে অন্ধকারে একবার তাহাদের স্মৃতি
ভাসিয়া উঠিল মনে;—তখন শীতের রাত, গাছের শাখার থেকে ঝরে
শিশির—হলুদ পাতা;—মরণের গন্ধে এই পৃথিবীর নদী মাঠ ভরে,
হৃদয়ের মাঝখানে শূন্য এক গহ্বরের মতন বিকৃতি
জেগে থাকে;—অন্ধকারে প'ড়ে থেকে একাকী শিশুর মত বুকে জাগে ভীতি!
আমার যে দিনরাত্রি ফুরায়েছে একবার তাহাদের কথা মনে পড়ে;
প্রেম লয়ে যে এসেছে এক দিন, তারপর চলে গেছে—আমি তার তরে
একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখি চারিদিকে,—আকাশের নক্ষত্রসমিতি

হারায়ে গিয়েছে কোথা?—চেয়ে দেখি কোনো দিকে কেউ নাই, কিছু নাই আর!
তোমার পায়ের শব্দ কখন থামিয়া গেল চোখ বুজে একবার তাই
ভেবে দেখি,—চোখ মেলে জেগে দেখি আকাশের বুকে আরো জমেছে আঁধার!
নিঃসাড় মাঠের পর আড়ষ্ট নদীর পর কিছু নাই,—কেউ আর নাই!
মরণের হাতে তাই অবসন্ন হয়ে আমি হাত তুলে দিলাম আমার,
চেয়ে দেখি প্রেম তুমি পাশে এসে দাঁড়ায়েছ, মৃত্যু দ'হে হয়ে গেছে ছাই!

১৯
এক দিন, মনে আছে সে এক বিস্তৃত রাতে জেগে থেকে বলিয়াছি আমি,
কোন্ দূর নক্ষত্রের ফাঁস খুলে পৃথিবীর পারে নেমে এলে মহীয়সী,
আড়ষ্ট শীতেব রাতে আকাশের কোল থেকে বলো কেন পড়িয়াছ খসি
পবিত্র তারার মতো আলো লয়ে মানুষের দারিদ্র্যের মাঝখানে নামি!
—এখানে ফুরায়ে সব,—শূন্য হয়,—স্তব্ধ হয় সব শক্তি,—যায় সব থামি,
হৃদয় কাতর হয়ে তৃপ্তি চায় অন্য নিঃসহায় হৃদয়ের পাশে বসি,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো এইখানে ইচ্ছা শুধু একবার উঠিবে উচ্ছ্বসি,
তারপর, ভেঙে যাবে;—প্রেম নয়,—কিন্তু মৃত্যু আমাদের সকলের স্বামী—!

তোমার নক্ষত্র ছেড়ে কেন তুমি আমাদের মাঝখানে এই পৃথিবীতে
চলে এলে?—কোন্ স্থির নক্ষত্র যে কতদূরে তোমার আশায় জেগে রয়।

জানে সে কি নামিয়া এসেছ তুমি নষ্ট ক্ষেতে আড়ষ্ট মাঠের এই শীতে
'হে প্রেম, তোমারে খুঁজে অনেক নক্ষত্রে গিয়ে তারপর থামিতে যে হয়
তোমার বুকের 'পরে;—যেইখানে জেগে আছ সেইখানে হয় যে জাগিতে
যেইখানে ঘুমায়েছ সেইখানে ওগো প্রেম মৃত্যু খুঁজে লয় যে হৃদয়!'

২০

সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর দিন আর রাত্রি শুধু করে কোলাহল,
মাঝে মাঝে শুধু এক অসম্ভব নিঃশব্দতা পৃথিবীর পথে জন্ম লয়!
কান পেতে শুনি যেন সেই কালে জীবনের ক্ষেতে ক্ষেতে যেতেছে সময়
বীজ বুনে,—পৃথিবীর পথে পথে ব্যস্ত হয়ে চলিতেছে তাহার লাঙল!
অনেক নক্ষত্র লয়ে সে সময় ভরপুর হয়ে থাকে আকাশের তল,—
মনে হয় কোনোদিকে কোনো ক্ষতি হয় নি কো,—কারু যেন হয় নাই ক্ষয়,—
ছড়ায়ে রয়েছে শুধু চারিদিকে আমাদের জীবনের অনেক বিষয়!
চারিদিকে খুঁজে পাওয়া যায় ঢের আমাদের হৃদয়ের ভরসার স্থল!—

কোনোদিন ঝরে না যা,—স্থির হয়ে পচ্ছিন্ন আকাশের মতো টিকে থাকে,
প্রেম—আশা,—আমাদের তুলে দেই সে সময় একেবারে তাহাদের হাতে;
সময় অধীর হ'য়ে চ'লে যায়;—জানি,—তবু অন্তরের এই ধীরতাকে
যখন সে শ্রদ্ধা করে কোনো এক শান্ত দিনে—হেমন্তের কোনো এক রাতে;—
তখন সে রেখে যায় মুখোমুখি হে জীবন, ওগো প্রেম তোমাকে—আমাকে!
সময় না ফুরাবার আগে আর আমরা কি আমাদের পারিব ফুরাতে!

২১

মৃত্যুরে বেসেছি ভালো সকলের আগে আমি,—মৃত্যুরে তবুও করে ভয়;
কখন অনেক পথ ঘুরে এসে ক্লান্ত হয়ে তারপর আর একবার
আমার শীতল হাত খুঁজে তুমি—ভুল ক'রে মরণের কাস্তের ধার
হৃদয়ে তুলিয়া লবে;—জেগে আছি তাই আমি,—অন্তরের সকল বিষয়
ছড়ায়ে রেখেছি আজ;—কখন আসিবে তুমি,—কোথায় পায়ের শব্দ হয়,—
অপেক্ষায়ত ব'সে আছি;—যদিও লেগেছে ভালো মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধার!
ঘুমের সময় তবু সব শেষে,—তার আগে পৃথিবীতে জেগে প্রতীক্ষার
অনেক সময় থাকে,—অনেক আড়ষ্ট রাত তার আগে মাঠে পড়ে রয়!

তার আগে আকাশের কাছে ঢের প্রশ্ন থাকে,—নক্ষত্রের সাথে কত কথা
থেকে যায়,—পৃথিবীর পথে পথে মিছেমিছি হাঁটিবার কত অবসর
পড়ে থাকে;—তার আগে মৃত্যু নয়,—কেবল মৃত্যুর মতো এক নিঃশব্দতা
আপনার স্থল খুঁজে চেপে থাকে পথিকের হৃদয়ের 'পরে;
যতদিন জেগে আছি পৃথিবীতে তুমি তবু আসিলে না কেন বল তো তা,—
তুমি বলিলে না কিছু,—প্রশ্ন করি,—আকাশের নক্ষত্রও দিল না উত্তর!

২২

সমুদ্রের পারে এই নক্ষত্রের তলে যদি আজ আমি শেষ হ'য়ে যাই,—
ঘুমাবার আগে তবু মনে রবে পৃথিবীতে কোথায় আমার ছিল স্থল;
আমি এখানের নই,—এই তারা, আর এই বিদেশের সমুদ্রের জল,—

তোমাদের কাছে এসে এইখানে যদি আজ অন্তরের সকল হারাই;
যাহাদের ভালোবেসে গেছি আমি একদিন পৃথিবীতে—সেই বোনভাই
জেগে আছে,—জড়ায়ে রয়েছে আজ অন্ধকারে অন্য এক নক্ষত্রের তল,
ঘুমায়েছে,—তারার আলোয় আজ হয়ে গেছে তাহাদের হৃদয় শীতল
হয়তো বা;—তারা যাহা জানিয়াছে—বুঝিয়াছে—জানিয়াছি আমিও তাহাই;

আমি সেই বাংলার,—সেইখানে চোখ মেলে এক দিন দেখিয়াছি ঘাস
উঠেছে সবুজ হয়ে,—হৃদয়ের শান্ত আকাঙ্ক্ষার মত ঢুলে কাছে এসে
মাঠে পথে ধুলোমাটি সেইখানে একদিন নিজেদের করেছে বিকাশ
আমার বুকের কাছে,—তাহাদের আরো ঢের কথা ছিল থেমে গিয়ে শেষে!
পরিচ্ছন্ন আলো লয়ে ভোরবেলা দেখা দিয়ে গেছে সেই দেশের আকাশ,—
আমি সেই বাংলার,—তাহার মাটির মতো ঘ্রাণ ল'য়ে ফ'লেছি যে দেশে—।

২৩
যেদিন ফুরাব আমি পৃথিবীতে,—ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘুমাব আবার,—
তখন হয়তো সেই আকাশের বুক থেকে শেষ রোদ লয় নি বিদায়,—
চোখ মেলে দেখিব তা;—আমার এ শরীরের চারিপাশে সবজীর গান শোনা যায়
কান পেতে শুনিব তা;—সেদিন সবুজ দেহ,—তার 'পরে সবুজ পাতার
ছায়া এসে পড়িয়াছে হয়তো বা;—সেইদিন কোনো এক শাখা এসে তার
হৃদযের সবটুকু সচ্ছলতা নুয়ে প'ড়ে একবার আমারে জানায
হয়তো বা;—ঘাসের উপরে শুয়ে সেইদিন জীবনের শেষ স্বাদ পায়
এ হৃদয়,—চোখ মেলে রুধিরের সচ্ছলতা বুঝিয়া নিতেছি শেষবার

সেইদিন;—যতদূর দেখা যায় জেগে আছে বাংলার বিস্তৃত আকাশ,
দিনের সকল শেষ রৌদ্র লয়ে আমার চোখের দিকে রয়েছে তাকায়ে,—
চোখ মেলে দেখি যদি;—যদি চোখ বুজে ফেলি তবু এই রহিবে আশ্বাস:
বাংলার মাঠে শুয়ে ঘুমাযেছি,—তাহার দিনের আলো লাগিযাছে গায়ে,
তাহার সবুজ পাতা শাখা রোদ পাখি এসে শেষ ঘুম গিযেছে পাড়ায়ে,
ফুরায়ে গিয়েছি তার নক্ষত্রের তলে,—তার ঘাসে আমি হয়ে গেছে ঘাস—।

২৪
পৃথিবীর যেই পারে থাকি আমি এই কথা আমার তবুও মনে রবে:
সেই এক সমুদ্রের ধারে আমি তোমারে এসেছি ফেলে,—আমি একজনা
এক দিন বিদেশের এই আকাশের তলে আমি ক্লান্ত হয়ে আর রহিব না;
এক দিন আমার সে আকাশের পরিচিত নক্ষত্রের তলে যেতে হবে!
সেখানে শীতল রাত্রি জেগে থেকে পরিষ্কার শিশিরের জলে ধুয়ে লবে
তখন আমারে;—অনেক আকাশে ফিরে হৃদয়ে জাগিয়া গেছে যেই উত্তেজনা
শান্ত করে দেবে সব;—(দেশের সবুজ মাঠ হয়তো তবুও সেই ব্যথা জানিত না,
বালকের মতো আমি পথ থেকে স্খ'লে গিয়ে সেই ব্যথা শিখেছি যে কবে!—
জানিব না;)—আলো আর অন্ধকারে আশ্বাসে রয়েছে ভ'রে তবুও হৃদয়,

বিকল্প পাঠঃ ২৪ পঙ্ক্তি ১৪ 'যখন' স্থানে' 'যেদিন'।

অনেক ভিড়ের থেকে ফিরে এসে পৃথিবীর পথ থেকে ছুটি লয়ে আমি
ফুরায়ে ফেলিব এক শেষ সাধ,—করে লব এক শেষ আকাঙ্ক্ষার ক্ষয়;
শীতের নদীর মতো এক শেষ ঢেউ তুলে যাব আমি থামি
এই বাংলার পথে,—ছড়ায়ে ফেলিব আমি অন্তরের সকল বিষয়
এইখানে,—যখন সকল পথ দেশের মাঠের পথে এসে শেষ হয়—।

২৫

যদি আমি গেয়ে থাকি বাংলার পরিষ্কার আকাশের নক্ষত্রের গান,—
সবুজ শাকার গন্ধ—তাহার পাতার ছায়া—এই তার মাঠের আস্বাদ,
তাহার নদীর জল—ফসল শিশিরে ভেজা—কাস্তেব মতো তার চাঁদ
হেমন্তের হাত ধরে সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিতেছে যখন অঘ্রান
মাঠে মাঠে,—যখন আঘাত পেয়ে হলুত পাতার সাথে খ'সে পড়ে ধান
এক ক্ষেতে,—তারপর অন্য এক ক্ষেতে পেঁচা উড়িতেছে যখন অবাধ,
আমাদের আকাশের এই সব নিঃসঙ্গতা—নিঃশব্দতা—আঘ্রাণের সাধ
সবজীর পরিপূর্ণ ভাঁড়ারের মতো আজ ভ'রে ফেলে যদি এই প্রাণ,—

তাহলে লেগেছে ভালো এই মাঠ, এই নদী—এই নিষ্ক্রিয়তার কথা
সব চেয়ে লাগিয়াছে ভালো আজ,—আজ ঐ পানিশুদ্ধ আকাশের দিকে
চেয়ে আছি–পবিত্র শিশির এই—নক্ষত্রের এই বিশুদ্ধতা
হৃদয়ের শান্তি—স্বপ্ন—অবসর যাহা শুধু বেঁচে থাকে—যাহা থাকে টিকে
তাহাদের লয়ে আমি শান্ত হয়ে জেগে আছি, এই ভোর—পথের স্তব্ধতা
ইহাদের কাছ থেকে কোনো এক নিশ্চয়তা আজ আমি লইতেছি শিখে—।

২৬

ডুবারির ছেলেগুলো শঙ্খ লয়ে সমুদ্রের ধারে আজ করিতেছে খেলা
যেইখানে,—একদিন—কত আগে—আমাদের পৃথিবীর স্বচ্ছ এক ভোরে
এই হৃষ্ট শিশুদের মতো এই সাগরের পাশে এসে কোলাহল ক'রে
পৃথিবীর প্রথম মানুষ এক নীল সমুদ্রের সাথে কাটায়েছে বেলা;
প্রথম আকাশ তারে দেখিয়াছে,—হৃদয়ের কাছে তারে পেয়েছে একেলা
প্রথম উষার রোদ,—যখন সে এসেছিল প্রথম বিস্তৃত পথ ধ'রে
আমাদের পৃথিবীর,—সহজ ফেনার মতো যখন সে প্রথম সাগরে
উথলিয়া উঠেছিল,—হৃদয় সেদিন তার জেনেছিল এক অবহেলা!

অনায়াস ইচ্ছা কোনো বুকে তার সেইদিন স্ফীত হয়ে উঠেছিল জেগে,
জাগিয়া রহিয়াছিল সেদিন সে এই তৃণতরুদের সচ্ছলতা লয়ে,
আমাদের আজিকার পৃথিবীর কোনো স্রোত—প্রতিরোধ যায় নাই লেগে
সেইদিন বুকে তার;—যেই আলো আর যেই অন্ধকার পড়িতেছে ক্ষ'য়ে
আকাশের বুক থেকে—তাহাদের মতো হয়ে—তাহাদের সাথে এক হয়ে
সেদিন সে জেগেছিল সবুজ পৃথিবী—নীল আকাশের মতন আবেগে—।

২৭

সে এক বালক আছে কুড়ায় ঝিনুক নুড়ি একাকী সিন্ধুর পারে ব'সে
হাওয়াই দ্বীপের পারে, কিম্বা ফিলিপাইন দ্বীপে,—কিম্বা দূরে আরো!

সেখানে আকাশ নীল,—আকাশের চেয়ে সেই সমুদ্রের নীল আরো গাঢ়!
আকাশের বুকে আজও সেইখানে লেগে আছে পৃথিবীর প্রথম আলো সে!
সেই বালকের বুক ভরে আছে মানুষের হৃদয়ের প্রথম সাহসে,
প্রথম সে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আহ্লাদ আজো বুকে জেগে রহিয়াছে তারও!
তেমন সমুদ্র এক রহিত-আমার যদি,—দ্বীপ এক রহিত আমারও
সাগরের পারে যদি;—আজিকার জীবনের ফাঁস যদি পড়ে যেত ধ্ব'সে

আমিও বালক হয়ে তবে সেই দূর দ্বীপে ঢের দূর সমুদ্রের পারে
এখানের পৃথিবীর বুক থেকে খ'লে গিয়ে শিখিতাম বিস্ময়ের ভয়!
যখন দিনের আলো আকাশের বুক সাঁতারিয়া মিশে যায় অন্ধকারে,
অথবা নক্ষত্র সব স'রে গেলে যখন হতেছে অন্য আলোর উদয়,
আবিষ্কৃত আকাশের পার ছেড়ে সন্তর্পণে চোখ মেলে দেখিতাম তারে
সাগরের পারে গিয়ে দূর দ্বীপে একবার পথ ভুলে যা দেখিতে হয়!

২৮

শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে,—এক আলো,—রহিয়াছে সে এক সুন্দর
আকাশে—বাতাসে—জলে—অন্ধকারে আমাদের সব আলোড়ন আয়োজনে
দেখা দেয়;—তাহার ছায়ার মতো আমরা চলিতে চাই তাহার পিছনে!
জল—ধনুকের মত আকাশের উচ্ছৃঙ্খল মেঘ আর বিদ্যুতের 'পর
আমরা দেখেছি তারে;—যখন হতাশা সব আমাদের বুকের ভিতর
পুড়ে গেছে—অপেক্ষায় চোখ মেলে—পলাতক বালকের মতো সন্তর্পণে
আমরা দেখেছি তারে;—অধীর বিস্ময় এক জাগিয়াছে আমাদের মনে
তারে দেখে;—পশ্চিম মেঘের দিকে ছুটে যায় বিকালের আলোক যেমন
দিন ক্লান্ত হয়ে গেলে,—যেমন নক্ষত্র সব খুঁজে লয় আকাশের তল
পৃথিবীতে রাত্রি এলে,—অশান্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে আমরা তেমন
তাহারে খুঁজিয়া পাই;—তখন সরিয়া যায় পৃথিবীর সমুদ্রের জল
স্তব্ধ হয়ে;—ভয় পেয়ে চ'লে যায় প্রতিহত অজগর সাপের মতন
পৃথিবীর সব অবসাদ—সাধ,—হৃদয়ের বিহ্বলতা—গহ্বর সকল!

২৯

অনেক শতাব্দী ঝরে চলে গেছে,—তবু সেই পৃথিবীর পুরানো সে পথ
রয়ে গেছে;—মাথার উপর আজও রয়ে গেছে সেদিনের বিস্তৃত আকাশ!
যদিও অনেক তৃণ ঝরে গেছে,—তবুও মাটির থেকে যে সবুজ ঘাস
ফ'লে ওঠে তার গন্ধে স্থির হয়ে জেগে আছে আজও সেই পুরানো জগৎ।
খুঁজেছি নতুন আলো আমরা আরেক বার,—মনীষার নব নব মত
খুঁজে দেখিয়াছি সব;—তবু যেন মনে হয় যেই শষ্য হয়ে গেছে চাষ
তারপর ঝরে গেছে,—ক্ষেতে মাঠে হইতেছে যেন তার আবার বিকাশ!
তাহার অঙ্কুর লয়ে কাজ করিতেছে এই পৃথিবীর সমুদ্র পর্বত—।

সময়ের হাতে তুমি হাত ধ'রে জেগে আছ পৃথিবীর ওগো পুরাতন,
ভবিষ্যৎ বর্তমান খ'লে গিয়ে ভ'রে ফেলিতেছে সেই অতীতের স্থল;
যদিও মশাল লয়ে আঁধারের আবিষ্কারে চলিতেছে মানুষের মন,

যদিও নতুন দিনে জন্মিয়াছি,—কাঁধে করে আনিয়াছি নতুন লাঙল,
অব্যর্থ অতীত তবু হৃদয়ের পিণ্ডে আজও তুলিতেছে সেই শিহরণ;—
তার ক্রীতদাস হয়ে শুধু আমাদের অন্তরের রক্ত আজও হয়ে যায় জল!

৩০

আলো আর আঁধারের পানে চেয়ে যদিও গাহিতে পারি সে অনেক গান,
যদিও বীণার তারে বেঁধে নিতে পারি সুর উচ্ছৃঙ্খল মনের মতন,
আজ তবু এক সুর জানি শুধু,—এক গান জানে শুধু মন;
ঢেউয়ের পিছনে ঢেউ ফনা তুলে ফুলে উঠে করে যে আহ্বান,
আগুন যে ক্ষুধা লয়ে বুকে তুলে নিতে চায় একবার স্ফুলিঙ্গের ঘ্রাণ,
তোমার পিছনে চলে তোমারে বুকের 'পরে তুলে নিতে চেয়েছি তেমন!
তুমি খ'লে চলে গেছ,—আজ তাই পৃথিবীতে চলিবার করি আয়োজন;
এক পথ চিনি আজ,—এক সত্য—এক আলো—ধ'রে আছি সে এক নিশান

অনেক পতাকা ছেড়ে;—অনেক আশ্বাস শান্তি সান্ত্বনার পথ থেকে ফিরে
ড্রাগনের দাঁত দিয়ে বীজ বুনে চলিতেছি আজ এই পৃথিবীর 'পর,
চলিতেছি পথ খুঁজে সে অনেক বেদনার—সে অনেক চিলদের ভিড়ে!
তোমার আমার মাঝে অনেক পাহাড় আছে,—রহিয়াছে অনেক সাগর;
বাহির হবে না তুমি যতদিন তোমারে খুঁজিয়া আমি রহিব বাহিরে,
যদিও কবরে তুমি পড়ে থাক,—যদিও নক্ষত্রে তুমি বেঁধে থাক ঘর!

৩১ **সমুদ্র**

সবুজ মাটির পথে ব'সে আমি দেখিতে চেয়েছি জল,—জলের নিঃশ্বাস
হৃদয়ের রক্তে আমি মিশাতে চেয়েছি এই মাটির ধুলোর পথে ব'সে;
অনেক আকাশ দেখে যেই জল জেগে আছে আকাশের মতন সাহসে,
তাহার হৃদয় থেকে যেই জল খুলে ফেলে গেছে এই পৃথিবীর ফাঁস,
পূর্বের সমুদ্র থেকে যেই জল চলিতেছে পশ্চিমের সমুদ্রের পানে,
উত্তর সিন্ধুর থেকে যেই জল ছুটিতেছে দক্ষিণের সিন্ধুর আহ্বানে,
পৃথিবীর সব শক্তি শেষ হ'লে তবুও হৃদয়ে যার রহিবে ক্ষমতা,
নক্ষত্রে উজ্জ্বল হয়ে যেই জন অন্ধকারে নক্ষত্রের সাথে কয় কথা,
আলো আর অন্ধকারে আবিষ্কৃত দ্বীপ—অন্তরীপ ভ'রে গেছে যার গানে!

যেই দ্বীপ দেখি নাই,—যেই অন্তরীপে গিয়ে কোনোদিন পৃথিবীর কেউ
অন্ধ বাতাসের খেদ শোনে নাই সমুদ্রের পারে ভিজা পাহাড়ের 'পরে,
পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে নাই যেইখানে অন্ধকার ছায়ার গহ্বরে,
সিন্ধুর সাপের মতো ফুলে উঠে সেইখানে তুমি গিয়ে তুলিয়াছ ঢেউ!
বৈকালের অন্ধকারে তীক্ষ্ণ হয়ে ফিরিয়াছ তুমি ভিজে বাতাসের সাথে!
মানুষের মতো কাঁদে একা একা যে পাহাড় বৈকালের হাওয়ার আঘাতে
তারে তুমি কাঁদায়েছ;—তাহার বুকের 'পরে ফোঁপায়েছে শিশুর মতন

বিকল্প পাঠ॥ ২৯ পঙ্‌ক্তি ১২ : 'জন্মিয়াছি;' স্থানে 'আসিয়াছি'।
পঙ্‌ক্তি ১৪ 'শুধু' স্থানে 'তবু'।

তোমার বুকের ঢেউ;—একা একা মানুষের মতো সেই সমুদ্রের মন
নিঃশ্বাসের মত ভেসে ফিরিয়াছে পাহাড়ের পাশে পাশে অন্ধকার রাতে—

৩২ কবিতা গুচ্ছ

সেখানে জন্মেছে ব্যথা,—বুঝেছ তা,—সেইখানে তবু এক জন্মেছে বিস্ময়!
সেই এক দূর দিকে—অন্ধকারে—পৃথিবীর মানুষের অনাহত পথে
এই সব আকাশের পিছে আরো,—অন্য সব নক্ষত্রের সে এক জগতে
বিস্ময় লয়েছে জন্ম সেইখানে;—সেইখানে জন্মিয়াছে বিস্ময়ের ভয়!
কোনো গ্রীক নাবিকেরা অসময়ে অন্ধকারে সমুদ্রের পথে পথ ভুলে
সেইখানে গিয়েছে কি? চক্ষুর কোটর থেকে মানুষের মতো চোখ তুলে
অদ্ভুত সমুদ্র এক দেখিয়াছে হয়তো বা পাতালের গহ্বরের পারে!
অবিশ্বাসে চোখ তুলে সেই সব যুবকেরা হয়তো বা দেখেছে তোমারে!
তাহাদের মৃতদেহ ভরে গেছে তারপর সমুদ্রের ফুলে—ফেনাফুলে—!

অথবা সিন্ধুর পথে স্বাদ পেয়ে তাহারাও সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
ফিরিয়াছে;—গ্রীক তারা,—সমুদ্রর মতো ঢের ক্ষুধা—ঢের পিপাসার ধার
তাহাদের বুকে ছিল;—সব নক্ষত্রের শেষে ক'রে গেছে তারা আবিষ্কার
নতুন নক্ষত্র আরো;—পূর্বের সমুদ্র এসে সেইখানে করে আলোড়ন
পশ্চিম সিন্ধুর বুকে,—দক্ষিণ সমুদ্র গিয়ে সেইখানে উত্তর সাগরে
মানুষের মতো ব্যথা—আহ্লাদের আলোড়ন করে,
সেখানে গিয়েছে তারা;—সমুদ্রের যেই জল পৃথিবীর ঘ্রাণ নিতে আসে,
নিঃশ্বাস মিশায় গিয়ে যেই জল আকাশের নক্ষত্রের শীতল নিঃশ্বাসে,
সেখানে গিয়েছে তারা,—তাহাদের সাথে সিন্ধু ভেসে গেছে পশ্চিমে—উত্তরে!—

৩৩

ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাহাদের সূর্য্যের প্রবল আলো,—বিস্তৃত আকাশ
ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাহাদের এক পথ হতে দূর অন্য এক পথে!
শীতের প্রথম হাওয়া যখন এসেছে ভেসে,—কাঁদিয়াছে প্রথম পর্বতে
যখন শীতের হাওয়া,—যখন শিশির এসে করে গেছে গ্রাস
পাহাড়ের দেবদারু,—কুয়াশার খোঁচা খেয়ে যখন বুজেছে ভিজে শাখা,
সন্ধ্যার পাখির মতো যখন গুটায়ে গেছে অন্ধকার পর্বতের পাখা,—
সিন্ধুর পাখির মতো তখন শুনেছে তারা তাহাদের সমুদ্রের কথা!
রক্তের মতন তাপ যেই ঢেউয়ে,—যেই সমুদ্রের ঢেউয়ে রক্তের তীক্ষ্ণতা,
ঘূর্ণির মতো করে ঘুরায়েছে তারা সেই সমুদ্রের তরঙ্গের চাকা—!

টাইটানের মতো তারা,—প্রথম করেছে এসে সাগরের ফেনার আস্বাদ!
উষ্ণ সমুদ্রের ডাকে দল বেঁধে চলে গেছে,—প্রথম ছাড়িয়া গেছে স্থল!
আহত পাখির মতো ব্যথা পেয়ে কেঁদে ওঠে যেইখানে সমুদ্রের জল
ভাঙা পাহাড়ের বুকে; যেইখানে ধ্বসে পড়ে পাহাড়ের পাথরের বাঁধ,—

বিকল্প পাঠ॥ ৩২ পঙ্‌ক্তি ৯ : 'তারপর' স্থানে 'তবু গেই'।
বিকল্প পাঠ॥ ৩৩ পঙ্‌ক্তি ৫ : দেবদারু' স্থানে 'দেবদারু'। পঙ্‌ক্তি ১৮: 'তবু' স্থান 'জাগে'।

নষ্ট হয়ে পড়ে যায় পুরাতন দেবতার উপেক্ষিত আসনের মতো;
সমুদ্রের বুকে এসে যেইখানে পৃথিবীর সমুদ্রেরা হতেছে আহত;
বাতাসের বুকে এসে যেইখানে ঝড় তোলে পৃথিবীর সকল বাতাস;
যেখানে সমুদ্র এসে আকাশেরে গ্রাস করে;—যেখানে আকাশ করে গ্রাস
সমুদ্রেরে;—তবুও সমুদ্র তবু আকাশ সিন্ধুর পিছনে জেগে ওঠে যত!

৩৪

অদ্ভুত সিন্ধুর ঘ্রাণ বুকে লয়ে নামিয়া গিয়েছে তারা আশ্চর্য সাগরে,
উপদ্বীপ হতে দ্বীপে—এক দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে অন্য এক দূর উপদ্বীপে!—
যেখানে অনেক রৌদ্রে ভরিয়া গিয়েছে দ্বীপ,—যেখানে বিস্তৃত অন্তরীপে
সমুদ্র ভরিয়া গেছে—যেইখানে সিন্ধু শুধু সমুদ্রের বুকে এসে পড়ে,
দৈত্যের হাতের মতো হাত তার তুলে দেয় অন্য এক দানবের হাতে;
যেখানে প্রবল সিন্ধু পরিচ্ছন্ন ভোরবেলা কিম্বা এক অন্ধকার রাতে;
জীবন্ত সিন্ধুর ঢেউ মৃত্যুর বিছানা পা'তে যেইখানে সমুদ্রের জলে;
নেকড়ের মতো কাঁদে যেইখানে রুষ্ট হাওয়া ব্যথা পেয়ে নক্ষত্রের তলে;
সমুদ্র কেবল চলে,—একদিন চলেছিল তারা সেই সমুদ্রের সাথে—।

বিপদ জড়াতে তারা গিয়েছিল,—বিপদের বুকে যেই রয়েছে বিস্ময়
তাহার আস্বাদ পেতে খুঁজেছিল দূর মধ্য সমুদ্রের জলের গহ্বর!
যেই নক্ষত্রের খোঁজে সমুদ্র ভাঙিয়া পড়ে অন্য এক সমুদ্রের 'পর;
আকাশের সব নক্ষত্রের শেষে তবু যেই নক্ষত্রের স্থল পড়ে রয়;
সব চেয়ে দূর নক্ষত্রের চোখে যেই এক স্বপ্ন ভেসে আসে
আরো দূর নক্ষত্রের;—সব আকাশের শেষে কোনো এক পশ্চিম আকাশে
যে নক্ষত্র জেগে আছে;—সব সমুদ্রের শেষে কোনো এক পশ্চিম সাগরে
যেখানে দিনের আলো নিভে যায়;—যেখানে সন্ধ্যায় নক্ষত্র স্নান করে
পূর্ব সমুদ্রের মতো তারা ভেসে যেতে চেয়েছিল সেই দূর পশ্চিমের সমুদ্রের পাশে—।

৩৫

টাইটানের মতো তারা;—টাইটান্ মায়ের মতো হে তুমি সাগর,
প্রথম সে পৃথিবীর প্রথম সে আকাশের নক্ষত্রের মাঝখানে এসে
সেইদিনি দাঁড়ায়েছ;—টাইটান্ মায়ের মতো টাইটান সন্তান ভালোবেসে
বিস্তৃত ফেনার জটা এলায়েছ চরে চরে তাহাদের শরীরের 'পর!
গ্রীসের পাহাড় সব,—কালো কুয়াশায় ভিজা পর্বতের দেওয়ার শাখা—
কাঁপিয়া উঠেছে তাই;—পিছনে রয়েছে প'ড়ে তাহাদের এথেন্স-ইথাকা!
পুরোনো বনের গন্ধ—পুরোনো সিন্ধুর গন্ধ ভরা এক মৃত পৃথিবীতে
তোমার জরায়ু থেকে হে সমুদ্র, সেই সব সন্তানের জন্ম তুমি দিতে!
সন্ধ্যার পাখির তুমি দিয়েছিলে হে সমুদ্র, সিন্ধুর পাখির মতো পাখা—!

শীতল সমুদ্র ছেড়ে, পাহাড়ের শীত হাওয়া পিছে ফেলে রেখে

বিকল্প পাঠ॥ ৩৪ পঙ্‌ক্তি ৩ : 'বিস্তৃত' স্থানে 'অনেক'। বিকল্প পাঠ॥ ৩৫ পঙ্‌ক্তি ৪ 'শরীরের' স্থানে 'হৃদয়ের'। কবিকৃত টীকা ❁ Lesbian promontory

এলায়ে দিছিল ডানা তাই তারা আরো গাঢ় সমুদ্রের দিকে!—
যেখানে সূর্য আলো স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে সমুদ্রের ফেনার স্ফটিকে,
যেখানে মেঘের ফেনা সমুদ্রের মতো নীল আকাশেরে রাখিতেছে ঢেকে,
আফ্রিকার কাছাকাছি—হয়তো বা সমতল এশিয়ার পারাপারে এসে
দুরন্ত সাগরে দূরে সমুদ্র—চিলের মত সেদিন গেছিল তারা ভেসে!
'লেস্‌বিয়ান্‌ প্রোমোন্টরি' পিছে ফেলে,—পিছনের হতাশার-কান্নার স্বর
ভুলে গিয়ে,—অন্য এক সমুদ্রের কুহকের বুকে তারা করেছে নির্ভর
সেইদিন;—সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢুকে কৌতূহলে নামিয়াছে পাতালের দেশে—!

৩৬

চোখের জলের মতো যেখানে সমুদ্র ডাকে অন্ধকার গহ্বরের তলে!
সিন্ধুর ঢেউয়ের শ্বাস সেইখানে মৃতদের নিঃশ্বাসের মতো মনে হয়!
সেখানে সময় নাই,—ফুরায়েছে সেইখানে পৃথিবীর পথের সময়!
এক সুড়ঙ্গের জল মিশিয়া যেতেছে শুধু অন্য এক সুড়ঙ্গের জলে,
বাতাস অন্ধের মতো ফিরে যায় গহ্বরের থেকে আরো দূরের গহ্বরে,
অসুস্থ আগুন শুধু নিভে নিভে জ্ব'লে ওঠে সেইখানে গন্ধকের 'পরে
মৃতের ইচ্ছার মতো;—সেইখানে,—পৃথিবীর সব মৃত আকাঙ্ক্ষার দেশে
পৃথিবীর সিন্ধু সব পথ ভুলে সেইখানে—পাতালে সমুদ্রে গিয়ে মেশে;
সেই অন্ধকারে তারা নেমেছিল একদিন হাতে হাত বেঁধে পরস্পরে—।

সেখানে গোপন ব্যথা গুমরিয়া ফিরে যায়,—তবুও পিপাসা জন্ম লয়
অদ্ভুত জলের পারে;—হৃদয়ের সাধ সব সেইখানে রাত্রি জেগে থাকে,—
সান্ত্বনা আসে না তবু;—নরকের প্রহরীরা ফেরে শুধু গহ্বরের ফাঁকে!—
পৃথিবীতে যেই ধ্বনি বেজে ওঠে সেইখানে শুধু তার প্রতিধ্বনি হয়;
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা তবু সেইখানে বিষের লতার মতো আজও বেঁচে আছে
তাদের বুকের রক্তে;—অদ্ভুত জলের কাছে—অন্ধকার গহ্বরের কাছে
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সকল অঙ্গার—সব পিপাসার বিনষ্ট ফসল
অস্পষ্ট সিন্ধুর জলে সেইখানে একবার খুঁজিতেছে আশ্বাসের স্থল!
ঢেউয়ের ছায়ার মতো সেখানে জলের 'পরে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে—!

৩৭

সেই দূর পাতালের সাগরের সুরে এই পৃথিবীর সমুদ্রের বীণা
যেইখানে মিশে যায়,—পথ খুঁজে সেইখানে গিয়েছিল তারা একবার!
তাদের হৃদির রক্তে মিশে গিয়েছিল সব সমুদ্রের জোয়ারের ধার;
নরকের অন্ধকারে ব্যথা পেয়ে সেখানে বসেছে 'প্রসারপিনা'—
সবুজ শাখার মতো,— গহ্বরের অন্ধকারে পৃথিবীর নিঃশ্বাসের মতো
জেগে আছে; —বধির নরক তার অন্ধ চোখ দিয়ে তারে করেছে আহত!
সে সব জেনেছে তারা,—নরকের রাত্রে এসে;—উপরের পৃথিবীর পানে
চোখ তুলে তাই তারা— পাতালের সিন্ধু ছেড়ে ফিরে গেছে সূর্যের আহ্বানে!

বিকল্প পাঠ॥ ৩৬ পঙ্‌ক্তি ১০: 'গোপন' স্থানে 'গভীর'।
বিকল্প পাঠ ॥ ৩৭ পঙ্‌ক্তি ৭ : 'জেনেছে' স্থানে 'দেখেছে'/'বুঝেছে'।

সিন্ধুর সাপের মতো ছুটে গেছে সমুদ্র সাপের মতো ছুটে গেছে যত—!

টাইটান্ মায়ের মতো জেগে তুমি হে সমুদ্র,— প্রথম টাইটান্!
উত্তর আকাশে তুমি বহে নিয়ে চলে যাও দক্ষিণের বায়ুর আহ্লাদ,
পূর্বের বাতাসে তুমি মিলায়ে দিতেছ গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের স্বাদ!
সিন্ধুর জলের গন্ধে মিশায়ে নিতেছ তুমি আকাশের নক্ষত্রের ঘ্রাণ!
বীজের রক্তের মতো শক্তি লয়ে ঝরে পড়িতেছ তুমি পৃথিবীর পথে!
সিন্ধুর বাতাসে লয়ে জল—ঈগলের মতো সমুদ্রের পারের পর্বতে
তীক্ষ্ণ হয়ে উঠিতেছে,—তীরের মতন ফ'লে উঠিতেছে আকাশে আকাশে!
পৃথিবীর পালকের পাখিদের হৃদয় ভরিয়া ওঠে ত্রাসে,—
সমুদ্রের ঢেউ—পাখা বেজে ওঠে যুদ্ধের রাতের নহবতে—!

৩৮
টাইটান্—মায়ের মতো সিন্ধু তুমি,—সমুদ্রের গর্ভ হতে অব্যর্থ সন্তান
জন্মিয়াছি;—পৃথিবীর সকল সমুদ্র—উপসাগরের জলের নিঃশ্বাসে
সিন্ধুর হাওয়ার মতো আমার নিঃশ্বাস গিয়ে ভাসে!
সিন্ধুর শৈলের মতো সমুদ্রের পারে আমি বাছিয়াছি জীবনের স্থান!
সেখানে ভরিবে মাথা রাত্রিদিন সমুদ্রের তরঙ্গের অসংখ্য সঙ্গীতে!
গীতের দেবতা হয়ে যে গান গাহিছে সিন্ধু—সময়ের বুকে ছন্দ দিতে,
সিন্দুর বুকের 'পরে গানের দেবতা হয়ে যেখানে নক্ষত্র গায় গান,—
পৃথিবীর সেই সিন্ধু আর সেই আকাশের নক্ষত্রের ছন্দের আহ্বান
স্ফুলিঙ্গের মতো রক্তে জ্ব'লে কোনোদিন পারিবে কি আঁধারে নিভিতে!

৩৯
সন্ধ্যার প্রথম তারা চিনিয়াছে তারে,—
পশ্চিমের সমুদ্রের পারে
সেই এক দেশ আছে;

যখন দিনের শেষ আলো এসে পড়ে
এক সমুদ্রের বুকে,—তারপর,—আর এক সাগরে
পশ্চিমের আকাশের তলে
যখন একটি তারা—প্রথম এসেছে তার স্থলে;
সেই এক দেশ ওঠে জেগে
সকল মেঘের শেষে পশ্চিমের মেঘে!

সূর্যের অস্তের রঙে ঘেরা,
আকাশের সব চেয়ে দূর নক্ষত্রেরা
দেখিয়াছে তারে;
তখন দিনের আলো শাদা হরিণের মতো গহ্বরের আঁধারের পারে—
(প্রথম আঁধারে)

মিশিতেছে;
পৃথিবীর সব হাত তখন সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়,
পৃথিবীর সকল হৃদয়
তখন হয়েছে শান্ত,—
দূর সমুদ্রের ঢেউ নিজ মনে করে আলোড়ন
মাছিদের গানের মতন!

সেই সুর ভেসে ওঠে তখন আকাশে,
হৃদয়ে তখন ঘুম আসে,
হৃদয়ে তখন স্বপ্ন আসে;

মনে হয়,—
পশ্চিম সিন্ধুর পারে সেই এক দেশ জেগে রয়,—
পৃথিবীর সাথে কবে জন্মেছিল
নক্ষত্রের মতো হয়ে নক্ষত্রের সাথে
জন্মিয়াছে;
সারাদিন কোলাহল ক'রে সিন্ধু—তারপর—চেয়েছে ঘুমাতে
সেইখানে;

অবসন্ন হয়ে গেছে যাহাদের মন
পৃথিবীর দিকে দিকে সিন্ধুর মতন
ধ্বনি তুলে;—
যাহারা সন্তান হয়ে এসেছিল এক দিন
(পৃথিবীর সমুদ্রের কূলে);
ভালোবেসে গেছে যারা,—যাহাদের জন্মেছে সন্তান;
এই পৃথিবীর মাটি—সমুদ্রের ঘ্রাণ
যাহারা পেয়েছে সব;—শরীরের স্বাদ
যাহারা বুঝেছে সব; —পৃথিবীর বেদনা আহ্লাদ
যাহারা জেনেছে সব;

যাহারা তাদের আয়ু ফুরায়েছে ধীরে
ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত ক'রে গেছে যারা এই পৃথিবীরে;
সুস্থির বাতির মতো হয়ে
সব তেল শেষ করে উজ্জ্বল আলোর স্বাদ লয়ে
যাহারা বুজিয়া গেছে;—পরিচ্ছন্ন জীবনের যশ
যাহারা পেয়েছে সব;—মানুষের সকল বয়স
তৃপ্ত ক'রে গেছে যারা;—তাই যাহাদের বুকে ঘুমের মতন
সহজে এসেছে মৃত্যু;—
সকল স্বাদের 'পরে তাহাদের মন
পশ্চিম মেঘের পারে অই দূর সমুদ্রের 'পর

খুঁজিয়াছে অবসন্ন মানুষের মতো অবসর;—

তাহাদের মতো এই পৃথিবীতে জেগে থেকে
স্থির—স্থির হয়ে
উল্কার মতন নয়—নক্ষত্রের মতো আলো লয়ে
জাগিয়া থাকিতে হবে এই পথে এই পৃথিবীতে!
সন্তানের মতো জন্মে—হবে জন্ম দিতে
সন্তানের;

ভালোবাসা বোধ অশ্রু—বেদনা—আহ্লাদ,—
পৃথিবীর মাটি—তার সমুদ্রের স্বাদ
পেতে হবে;

পৃথিবীর অন্ধকার—আলো—আলোড়ন
সমুদ্রের সাপের মতন
সময়ের সাগরের পরে
নাচিবে অনেক দিন,—অন্ধকার আলোর গহ্বরে
সরীসৃপদের মতো দুলিবে হৃদয়;

আসিবে যখন ক্ষয়
অনেক দিনের পরে—তারপর শেষে,
সহজ ঘুমের মতো বুকে মৃত্যু এসে
সব অবসাদ
তখন মুছিয়া লবে;—পশ্চিম মেঘের সাধ
হৃদয়ে উঠিবে জেগে সেদিন আমার!

সহজ ঘুমের মতো মৃত্যু এসে তার
সব অবসর
দিয়ে যাবে,
নিয়ে যাবে পশ্চিমের সমুদ্রের 'পর।

৪০. সমুদ্র

আমার লেগেছে ভালো তবু অই সমুদ্রের শ্বাস,
পুরোনো সিন্ধুর গন্ধে যেইখানে ভরেছে বাতাস
এ নতুন পৃথিবীর;—পাইনের শাখার মতন

বিকল্প পাঠ ॥ ৩৯ ছত্র ১৩ : 'সারে' স্থানে 'ধারে'।
ছত্র ৩২ : 'দিকে দিকে' স্থানে 'পথে পথে'।
ছত্র ৩৯ : 'পৃথিবীর' স্থানে 'এখানের'।
ছত্র ৪১ : 'তাদের' স্থানে 'দেহের'।
ছত্র ৬৮ : 'সহজ' স্থানে 'স্বচ্ছন্দ'।

যেখানে সিন্ধুর গন্ধ,—যেখানে জলের আলোড়ন
সুস্থ বাতাসের মতো পাহাড়ের—পাইনের বনে;
যেখানে ফেনার ফুলে—যেখানে ফেনার আলোড়নে
অনেক পুরোনো ভিজে পাহাড়ের শিশিরের স্বাদ
জেগে ওঠে,—যেখানে অবাধ
পবিত্র শীতল ঢেউ—পুরোহিত—যুবাদের মতো
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের তলে ইতস্তত
চলিতেছে; কোনো উৎসবের ররাত—বিবাহের গান
তাহাদের ডাকে নাকো; —নীড়ের মতন কোনো স্থান
পৃথিবীর পাখিদের যখন হৃদয়ে তুলে লয়
সব পাহাড়ের শেষে সমুদ্রের পারে জেগে রয়
যে পাহাড়,—সেইখানে অন্ধকারে যে শিশির পড়ে
সন্ধ্যার আঁধারে সেই পাহাড়ের শিশিরের তরে
তাহারা চলিযা যায়; তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, সাহস
খোঁজে নাকো পৃথিবীর মানুষের মতো কোনো যশ, —
ভালোবেসে—মানুষের মতো এক ভালোবাসা চেয়ে;
সন্তানের জন্ম দিয়ে—সন্তানের স্বাদ বুকে পেয়ে;

পৃথিবীর কোলাহলে বেড়ে ওঠে,—আলোড়ন ক'রে
মউমাছিদের মতো নরম মোমের মধু গড়ে
দিনের আলোর ঢেউয়ে;—কাঁচা পাতার সবুজে
জেগে থেকে; —মশালের আগুনের থেকে আলো খুঁজে
অন্ধকারে;—পৃথিবীর মানুষের মতন জীবন
বহে নাকে সিন্ধু অই,—কিন্তু অই সমুদ্রের মন
ভোরের কুয়াশা খুঁজে—সব দূর তুষারের পথে
পুরোনো বনের গন্ধে ভরা এক জলের জগতে
ঢের দূরে—কোনো এক শীত সুস্থ বাতাসের দেশে
অন্য এক সমুদ্রের আলো—অন্ধকারে গিয়ে মেশে;

কিন্তু অই সমুদ্রের ফেনা শাদা পাখিদের মতো
সিন্ধু—পাখিদের পিছে পাখা মেলে চলে অবিরত;
তারপর—পাখিদের—মাঝপথে—পিছে ফেলে রেখে
আকাশে মেঘের মতো শাদা হয়ে মেশে একে—একে!

পিছের আকাশ লয়ে পড়ে থাকে পৃথিবীর স্থল,
দূর মধ্য—আকাশের বুক থেকে ঝ'রে পড়ে জল
পরিচ্ছন্ন শিশিরের স্বাদ লয়ে সমুদ্রের 'পরে;
পরিষ্কার নক্ষত্রেরা অন্ধকারে এসে স্নান করে
পুরোহিতদের মতো সিন্ধুর পবিত্র জলে নেমে;
পাইনের বনে ঘেরা ভিজে এক পাহাড়ের প্রেমে

বাতাস হয়েছে মুগ্ধ;—বাতাসের পিছনে সাগর
চলিতেছে;—স্নিগ্ধ করিতেছে গিয়ে হৃদয়ের জ্বর
শুদ্ধ শাদা বরফের কোনো এক শীতল পাহাড়ে!

নেক্‌ড়েরা দল বেঁধে নামে না সে পর্বতের ধারে,
অন্ধকারে শেয়ালেরা সেখানে ওঠে না কেঁদে আর,
তীরে ফলার মতো পৃথিবীর আলো—অন্ধকার
সেইখানে বেঁধে নাকো পাইনের পাতালের বুক
হিম রাতে!—কিন্তু সেই পাহাড়ের শিশিরের শীতে
ফলেছে সবুজ শাখা—সেইখানে ফলেছে নিভৃতে
কাঁচা পাতা;—জ্বর ছেড়ে গেছে তার;—নক্ষত্র শীতল
সেইখানে;—নক্ষত্রের মতো সুস্থ সমুদ্রের জল—!

নদী

১। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ঐ যাইছে বহিয়া।
কত শত জীবজন্তু বক্ষেতে ধরিয়া।
স্রোতস্বিনী বহে ঐ কল কল রবে।
উতরিয়া কত দেশ সমুদ্রেতে যাবে।

২। সমুদ্রের পানে সদা ছুটিতেছে নদী।
কুলুকুলু রব করি বহে নিরবধি।
কখন বা বড় হয় কখন বা ছোট।
তরণী পোতাদি কত বহিতেছে মোট।

বিকল্প পাঠ ॥ পঙ্‌ক্তি ২ : 'সিন্ধুর' স্থানে 'জলের'।
পঙ্‌ক্তি ৪ : 'গন্ধ' স্থানে 'ঘ্রাণ'। 'জলের' স্থানে 'ঢেউয়ের'। 'আলোড়ন' স্থানে 'শিহরণ'।
পঙ্‌ক্তি ৭ : 'পুরোনো' স্থানে 'অতীত'।
পঙ্‌ক্তি ৯ : 'যুবাদের' স্থানে 'ছেলেদের'।
পঙ্‌ক্তি ১২ : ' কোনো স্থান' স্থানে 'এক ? স্থান'।
পঙ্‌ক্তি ১৪ : 'সব পাহাড়ের' স্থানে 'সকল শৈলের'।
পঙ্‌ক্তি ১৬ : 'পাহাড়ের' স্থানে 'পর্বতের'। 'শিশিরের' স্থানে 'নীহারের'।
পঙ্‌ক্তি ২১ : 'কোলাহলে' স্থানে 'আয়োজনে'। 'আলোড়ন' স্থানে 'কোলাহল'/'আয়োজন'
পঙ্‌ক্তি ২৮ : 'পুরোনো' স্থানে 'প্রথম'।
পঙ্‌ক্তি ৩০ : 'সমুদ্রের' স্থানে 'সাগরের'।
পঙ্‌ক্তি ৩২ : 'পাখিদের' স্থানে 'ঘুঘুদের'।
পঙ্‌ক্তি ৩৩ : 'পাখিদের' স্থানে 'তাহাদের'।
পঙ্‌ক্তি ৩৪ : 'আকাশে' স্থানে 'কোথায়'; 'মতো' স্থানে 'গুড়ি'; 'মেশে' স্থানে 'যায়'।
পঙ্‌ক্তি ৩৫ : 'আকাশ' স্থানে 'আস্বাদ'/ 'আহবান'; 'লয়ে' স্থানে 'নিয়ে'।
পঙ্‌ক্তি ৩৭ : 'স্বাদ' স্থানে 'শব্দ।
পঙ্‌ক্তি ৪০ : 'বনে' স্থানে 'গাছে'।
পঙ্‌ক্তি ৪৯ : 'ফে'লেছে' স্থানে 'বেঁচেছে'।

৩। পর্বত প্রমাণ উঠে বীচিমালা কভু।
কভু শান্ত করে রাখে দয়াময় প্রভু।
কত পোত মনুষ্যাদি করিছে ভক্ষণ।
কখন করিছে নদী ভীষণ গর্জ্জন।

৪। উর্ব্বর করিছে কত দেশ কত গ্রাম
নীরবে সে করিতেছে আপনার কাম
করিতেছে কত দেশ শস্যশালিনী
নীরবে করিছে নাহি একটিও বাণী।

২৭/৫/১১

কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভ'রে

কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভ'রে
আমরা কি জানি কিছু?—দিনের আলোয় পথ ধ'রে
চলি আজ,—অবসর নাই কারু,—কেউ কারু কাছে
থাকিবে না,—যেই ব্যথা সহিবার জন্য আসিয়াছে
মানুষ,—যে ব্যর্থতা মানুষের মেনে নিতে হ'বে
চুলে,—একা, (সঙ্গে তার কে আবার র'বে!)
শিখিতেছি—জানিতেছি শুধু তারই ভাষা
ঘুমাবার আগে তবু, ঘৃণা এক—কিম্বা ভালোবাসা
নিবিড় আনন্দ এক,—কোনো এক গভীর উল্লাস
অসীম কলঙ্ক এক কিনিবার চাই অবকাশ
চাই তাই,—তারপর চোখ বুজে' সকলের মতো
ঘুমাব,—হ'ব না তবু আমি পরাহত
আমার মরণে,—
কারণ,—ঘুমের আগে জীবনের ব্যর্থতার ভাষা
ভুলে গিয়ে এক ঘৃণা—কিম্বা এক গাঢ় ভালোবাসা
নিবিড় আনন্দ এক—কিম্বা এক গভীর উল্লাস
অসীম কলঙ্ক এক কিনিবার ছিল অবকাশ

এত দিন ডাকি নাই

এত দিন ডাকি নাই—তবু আজ—আজ তুমি চ'লে এস কাছে!
রেলের লাইনের পাশ দিয়ে আমি চলিতেছি মেঠো পথ ধ'রে,
এমনি তো বিকালের অন্ধকারে এইখানে ছিলে,—মনে আছে;
এই আবহাওয়া ছিল একদিন তোমার মতন ঘ্রাণে ভ'রে!
এখানে ঘাসের পথে আমাদের চোরকাঁটা ফুটেছে কাপড়ে,
এখানে পাখির নাম জানি নাই,—গান শুধু শুনেছি বিকালে;

সন্ধ্যায়—তারপরে অন্ধকারে মাটির অঘ্রাণ মনে পড়ে,
বাতাসের ফোঁপানি—সে মনে পড়ে বারলার বকুলের ডালে।
বিকালের অন্ধকারে মাঠের হেমন্তে আজ বেড়ায়েছি একা,
সেই সব পাখিদের গান আমি শুনিয়াছি, আড়ষ্ট এমন!—
তোমার ভূতের সাথে হলুদ ঘাসের পরে হ'লে যেন দেখা,—
আগুনের মত কেঁপে—হাতের হাড়ের মত শাদা সে কেমন!—
আমারে সে দেখা দিয়ে দাঁড়াল না,—চ'লে গেল আলেয়ার পাছে;
এত দিন ডাকি নাই, তবু আজ—আজ তুমি চ'লে এস কাছে।

আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে

আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে সমুদ্রের মতো
তারই তীরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
মনে হয় বিরাট প্রাসাদ যেন একে একে কক্ষ খুলে দেয়
ঢের দূরে—রাত্রির গায়ে

এ পৃথিবী চ'লে গেছে—ঘুমের ভিতরে
যে মিনার বাজারের বন্দরের নয়
সমুদ্রের রূঢ় জল স্তব্ধ হয় যেন মনে হয়
যখন সে প্রাসাদের আলিসার জ্যোৎস্নার বিস্ময়

চোখে এসে লাগে তার—আমিও দেখেছি তাই নিশীথের তীরে
ঝাউয়ের নির্জনে নিত্য অবিনাশ পাখিদের কথা
মনে পড়ে;—সেই সব পাখি এই পৃথিবীর নয়;
পৃথিবীতে পাখি আর পাখিনী হত্যার নিষ্ফলতা।

বিকল্প পাঠ :
পঙ্‌ক্তি ১ : আশ্বিন কার্তিক/গভীর শীতের
পঙ্‌ক্তি ৪ : রাত্রির/নিশীথের
পঙ্‌ক্তি ৬ : মিনার/প্রাসাদ;—*বাজারের/এই সব; বন্দরের/পৃথিবীর*
পঙ্‌ক্তি ৮ : *আলিসার/আলিসায়*
পঙ্‌ক্তি ৯ : *আমিও দেখেছি তাই/আমিও দেখেছি তাই; নিশীথের তীরে/শরবন্ধনে?*
পঙ্‌ক্তি ১০ : *ঝাউয়ের নির্জ্জনে নিত্য অবিনাশ/কোনো দূর প্রান্তরের বড় বড়*
পঙ্‌ক্তি ১১: *মনে পড়ে/মনে হয়/ভাবি শুধু*

বর্জিত:
দ্বিতীয় স্তবক প্রথম পঙ্‌ক্তি—'এ পৃথিবী চ'লে গেছে—জানে না ক' ঘুমের ভিতরে'-র 'জানে না ক' বাক্যাংশ

সময়ের কাছ থেকে

সময়ের কাছ থেকে যদি কিছু নিতে চায় বিহ্বল মানুষ
পাখি ও নির্ঝর প্রীতি সংস্কৃতির থেকে চেয়ে নিক
ঘাসের তরঙ্গ—রোদ—বেঁচে থাকা : পবিত্র জিনিস
এ সবের চেয়ে কি অধিক
সাধ কেউ চেয়েছিল কোনো দিন কারু কাছ থেকে

সকলের সফলতা সকলকে দিতে তবু চেয়েছিল না কি
সারা দিন প্রিয় সৃষ্টি রাত্রির আলোকবর্ষ চোখে রেখে ঘুম
ঘুমের ঈষৎ আগে স্মরণীয় জীবনের প্রতিধ্বনি
আবার ভোরের রৌদ্রে সমাজ শুভ্রতা, পাখি, নভোনীল—
আকাশ কুসুম

আজ সব। মানুষের আগে পাখি দূর চিত্রভানুলোকে উড়ে চ'লে গেলে
মৃতদের অনাগতদের কাছে আমাদের ঋণ
মুক্ত হোক মধু হোক সুবাতাস শুভ্র সূর্য হোক
সে অনেক-ইতিহাস-তীর্ণ নরনারীদের রীতিতে নবীন।

দ্বিতীয় স্তবকের চতুর্থ পঙ্ক্তির 'সমাজ শুভ্রতা'র বিকল্প : জলের স্পন্দন, সকল শুভ্রতা, সমাজ সংগতি, ক্ষণিক শুভ্রতা, ক্ষণিক সংগতি।
তৃতীয় স্তবকের চতুর্থ পঙ্ক্তির 'তীর্ণ'র বিকল্প : ভাঙা, চলা, সহ, স্খলা; এবং 'রীতিতে'র বিকল্প : আলোকে, আসঙ্গে, প্রমাণে, সঞ্চারে, নিঃস্বপ্নে, স্বভাবে, উদয়ে ক্রান্তি।

স্ট্যাঞ্জা তিনেক

আকাশের মেঘ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি প'ড়ে ভিজে গেছে ধুলো,
এখন মাটির গন্ধ চারি দিকে টের পাওয়া যায়
স্টেশন ছাড়িয়া ট্রেন চ'লে গেল,—এঞ্জিনের কালো ধোঁয়াগুলো
চাঁদের আলোয় যেন বাদুড়ের মতন লাফায়!

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে : একটা কি দু'টো কালো মোটরের পিছে
ব্রুহ্যাম—ছ্যাকড়া গাড়ী চ'লে গেছে যে যাহার দিকে;
কারা এল? ঐ দূরে সাহেবের ল্যান্ডোর ল্যাম্প কি জ্বলিছে?
শব্দ নাই কোনো দিকে,—বাতাস ছাড়িয়া গেছে ঝাউ গাছটিকে।

এখন তোমার নাম ধ'রে ডাকি,—ভাবি আমি, তুমি যে কোথায়!
এখানের ভিজে মাটি ঘাস পাতা ডালিয়ার কামিনীর ঘ্রাণে
কোনো পাখি জেগে নাই আমার মতন একা—একা—অসহায়
এখন তোমার নাম ধ'রে ডাকি,—কই তুমি!—কেই কি তা জানে!

এ ও সে

এ

শীতের সকাল বেলা রোদের ভিতর
ডেক—চেয়ারের পরে ঢের বসা যায়;
পাখির মতন বুড়ো হ'য়ে
এইখানে তবু যেন বুড়ো আর হয় না হৃদয়!
ঐখানে গেলাসের জলের ভেতরে
মুক্তা এক প'ড়েছিল,—
সারা রাত গ'লে গ'লে
তারপর পৃথিবীতে
ছড়ায়ে পড়েছে যেন!

সে

তবুও সে মুক্তা কেউ চুরি করে নিতে পারে!

এ

কোথায়? কখন?

সে

সেই দিন শীত আরো বেশী হবে;
কাঁকড়াবিছের ছানা এসে
তোমার হাড়ে থেকে মাংস খেয়ে বেঁচে রবে;
কেউ জানে?

এ

তোমরা জান না কিছু;
মুক্তা চুরি গেলে কোথাও র'বে তা তবু;
কোথাও গেলাসে জল র'য়ে যাবে;
আমার টেবিলে নয়
অন্য কারু দেরাজের নীচে

র'বে তবু;
তবুও তা র'বে!

আজ তবু এখানেই আছে;
তোমার হৃদয় থেকে হয়তো কাহারও হাত এসে
মেয়েমানুষের পেটে সন্তানের মতো
বাঁচায়ে রেখেছে তারে!

এমন সকালে
আকাশের নীলের চেয়েও
নীল মলাটের বই ভালো লাগে!

সমুদ্রের জলের চেয়েও তারা নীল?

আরো নীল!

বইগুলো ঝেড়ে দেই?
মনে হয় ময়লা হ'য়েছে
শাদা বিড়ালের লেজ অন্ধকারে
ঝেড়ে দিয়ে যায়!

তখন সে ঘুমায়ে ঘুমায়ে

হয়তো হলুদ এক বিড়ালমেয়ের
সবুজ চোখের স্বপ্ন দেখে!
নরম থাবার নীচে
রূপার মতন তার নখ;
আমিও দেখেছি তারে।

সেই সব অন্ধকারে দেখেছ ত'!
—এখন দিনের বেলা;
টেবিলের থেকে গেলাস সরায়ে রাখি?

কোথাও কি নিয়ে যেতে চাও?

কোথাও;

নিয়ে যাও;

একখানা বই তুমি নেবে নাকি?

দাও;

হাতের ভিতরে বই রেখে দিয়ে
চোখ বুজে আছ তবু?

নিয়ে যাও;
(বইখানা ফিরিয়ে দিয়ে)
পাতার ভেতর থেকে কোন্ এক গন্ধ এসে যেন
নরম থাবার নীচে রূপার নখের কথা
সেই সব রূপকথা বলে!
সেইসব অন্ধকারে শোনা যাবে;
এখন শীতের বেলা তাড়াতাড়ি বেলা পড়ে যায়;...
দুধের ভেতর থেকে মাখন কোথায় যেন তোলে,—
আমি সেই শব্দ পাই!

কোথায়?

দুধের ফেনায় চুমা কাহারো বুকের দুধে লাগে?
কই?...

হয়তো কাপাশ ফেটে গিয়েছে কোথাও!
তারি শব্দ হয়তো শুনেছ;
ভোরের হাওয়ায় তুলো তার ভেসেছিল;

চোখের পাতার পরে কেউ এসে কার যেন আঙুলের মতো লেগে থাকে!
আঁতুরের ঘরে এমন আঙুল থাকে,
মাখনের গন্ধ লেগে থাকে তাহাদের গায় যেন!
সন্ধার অন্ধকারে সে সব দেখেছি ভেবে'।

এখন সকাল বেলা তবু;

মাকড়ের পেটের ডিমের মতো শাদা অই আলো!

তবুও পৃথিবী যেন সেই ডিম ল'য়ে
চোখ বুজে এক দিকে র'য়ে গেছে স'রে;
স্বপ্ন দেখে তাহার সময় কেটে যায়!

ঐ হাওড়ের জল যেইখানে ফুরায়ে গিয়েছে
আরেক পৃথিবী থাকে তবু;
তারে তুমি দেখ নাই'
কেমন সে?
সেইখানে মাঠের উপরে
গোল হয়ে 'গোসেমার' নাই?

নাই;

সেইখানে বিকালের হাওড়ের জলে
মাছরাঙা ঢিলের মতন শব্দ করে
ডুবে যায় নাকি?

সেইখানে হাওড়ের জল ফুরায়েছে;

আমি তবু সেই দেশে যাই নাই;

ডেক—চেয়ারের গাছ এই দেশে আছে;—তবু—
চেয়ার সেখান থেকে আসে;;
কাঠের পালিশ আছে সেইখানে,
লাল নীল কেম্বিশ্ রয়েছে,
দেরাজ টেবিল আছে,
এনামেল—রূপার পেয়ালা,
তোমার এ ঘরখানা এক দিন তারা এসে করে গেছে।
এইখানে হাড়ের চিরুনি হাতে নিয়ে
এলোমেলো রোগা চুল বুলোতে বুলোতে

যখন দু চোখ তবু বুজে আসে সন্ধায়,
আমার মাথার স্বপ্ন রূপার জালের মতো হ'য়ে
হাওড়ের অন্ধকার জলের উপর থেকে
ছায়া ধ'রে আনে!
তাই খেয়ে বেঁচে থাকে!

পৃথিবীর থেকে তুমি ন্যাকড়ার থলির মতন
খ'সে গেছ;
সোনায় রূপায় তার পেট চিরে' যাবে,—
পাখির ঠোঁটের থেকে এক মুখ বাতাস সে চায়!

শিকার

একজন শিকারী মিছেমিছি কেন অই শিকারীর সাথে
আমরা শিকারে যাই?

আরজন শিকার জানে না সে কি?

এক জন ধলা এক ঘোড়া শুধু আছে;

আর জন দুধের ভিতর থেকে সেই যে মাখন তোলে
গয়লার ধলা মেয়ে ভোরের বেলায়
ফেণার ধোঁয়ায় তার দুই চোখ ঘোলা হয়ে আসে;
তাদের সবার কথা মনে হয় যেন
ঘোড়ার পিঠের দিকে চেয়ে,—
আমরা ঘোড়ার মুখ দেখি না কো'!

একজন
কেবল সে চ'লে যেতে আছে;

আরজন
কোথায় সে যায়?

আমরা জানি না কেউ!

তবু তার পিছে যেতে হবে?

স্বপ্নের ভিতরে যে চলিতেছি!
আমাদের লাল ঘোড়া;

আমাদের ঘোড়া এত লাল,—
তাহাদের লোম যেন কালো হ'য়ে আসে!

ওদের গায়ের রং আমাদের ক্ষুধার মতন;

পৃথিবীর জল থেকে ফিরে
মিছেমিছি অন্য দিকে যায় এরা;
কোন্ ঘাস কোন্ জল এদের সান্ত্বনা দেবে?
এরা ম'রে যাবে,—আমরাও;
আমরা র'য়েছি বেঁচে পৃথিবীতে তবু,
সেইখানে আমাদের খুঁজে পাবে—দেখ;
বুড়ো পাখীদের মত সেইখানে থাকি না আমরা;
হাঁসের ছানার মত পাখনায় ভিজে'
ছোট এক পুকুরের পাড়ে
আমরা সেখানে থাকি;

তারপর বড় হই;
আমরা হই না তবু বুড়োঃ

হাঁসের মতন ডিম পাড়ে সেইখানে
আমাদের হৃদয়ের আশা!

হাঁসের মতন ডিম,
তবুও সোনার ডিম নয়!
খড়ের কুটার মাঝে অনেক ময়লা ডিমে অন্ধকারে ব'সে
ভেবেছি অনেক দিন এই কথা;—
এই ডিমে ব্যথা পাই!

এর চেয়ে বেশী ব্যথা আছে,—

জানি আমি;

কোনো দিন কড়ি ফেলে তেল আমি নেই নাই,—
তবু কোনো কুনো ব্যাঙ কানাকড়ি দেবে?
কানাকড়ি ছাড়া তবু তেল পাবে না কি?
তাই আমি হিজলের গাছে
এবার ল'য়েছি নাও বেঁধে'!
দাও ছাড়া কথা নেই;
সাড়ে সাত চোর যদি ম'রে বেঁচে' ওঠে
আমি সেই আধখানা চোর হ'ব!
মেয়েমানুষের ব্যথা,—
আমার মদের মুখ নাই!
মদের পিপার পরে সারা রাত একা ব'সে থেকে
আমি তবু মাংসের—মাংসের কথা ভেবে' ভেবে'
মেয়েমানুষের স্বাদ চাই আমি শুধু;
এর চেয়ে কম কিছু নয়!

গাছের খোড়লে থেকে সারা দিন ব'সে
পেঁচানীর কাছ থেকে পেঁচার মতন
চুমো খেয়ে তোমরা হয়েছ ক্লান্ত,—জানি—;
কিন্তু আমি কিছু পাই নাই!

আমরা হই নি ক্লান্ত;

তোমরা অনেক চুমো পেয়েছ তবুও;
পেঁচার মতন তবু,—ঘুঘুর মতন কিছু নয়;

জানি আমি;—চুমা তবু চুমা;
তোমরা পেয়েছ চুমো, আর সব চুমার সন্তান
তোমরা পেয়েছ;
আমি তবু একদিন ঘুম থেকে উঠে
রাতের বিছানা ধ'রে শুয়ে থাকি;
তবুও দেখিতে হবে চুনের মতন আলো এসে
চুন শাদা ক'রে গেছে জুলপীর কাছে;
কাদাখোচা জলপিপি আবার এসেছে
চোখের ঘুমের পাতা খুড়ে'—খুড়ে' খেতে;
নষ্ট বিড়ালের মত সারা দিন মন
শুকনো পাতার পিছে ছুটে' ছুটে' অবসন্ন হয়!

পৃথিবীতে ক্লান্ত হ'য়ে আমরা তো বেঁচে থাকি তবু;

চুমো খেযে বেঁচে থাকি;
তবু জানি অন্য দিকে কোনো এক চুমো বেঁচে থাকে
আমাদের সব মেযেমানুষেরা ম'রে গেলে!...
রূপার হাঁসেব পাখা দেখি নাই,
তবুও রূপার হাঁস আছে
কোনো এক পালকের বিছানার পরে;
সাত দিন সাত রাত শেষ হ'লে বনের ভিতরে
যে মানুষ ম'রে না ক' তার মেয়েমানুষ সে আছে—।

আমরা কি সেই দিকে চলিতেছি?

ধলা ঘোড়া সেই দিকে যায়;
আমরাও?

পিছে পিছে যাই;

তবুও এ দিকে গিয়ে কেউ খুশি হয়?

আমি খুশি হ'ব না ক' আর;

কেন তুমি?

আইবুড়ো;
দেশে ফিরে গিয়ে
আমার করিতে হবে বিয়ে!

হাঃ! হাঃ! হাঃ!

আমি এ সবের নই;

আমিও না;

আমাদের ফিরে যেতে হ'বে;

হয়তো হিজল গাছ সেখানেও আছে;

হয়তো;

ওর ঘোড়া চ'লে যাক্ ওর চাঁদকপালের দিকে;

যেই দিকে যায় চ'লে যাক;

(শিকারী দু'জন ফিরে চ'লে গেল।)

তুমি

তোমার পিছনে কারা?

আমি

আমার পিছনে আমি এত দিন ঘুমে—জেগে' কি কয়েছি কথা
কেউ তুমি শুনেছ কি?
চাঁদের আলোয় এসে যেন কোন চিতাবাঘ হ'য়ে
ঘাড় ধ'রে কাম্‌ড়ায়ে গিয়েছে আমারে আকাশের চাঁদ যেন!
ব্যথা পেয়ে তবুও দেখেছি
চিতার উজ্জ্বল ছালে রূপ লেগে আছে!
চোখে তার পৃথিবীর কোনো এক মেয়ের মতন
ভালোবাসা আছে!
তাই আমি ক্লান্ত হ'য়ে গেছি।

তুমি

কোথায় যেতেছ তুমি? পৃথিবীর শেষে?
তুমি খুসি হবে নাকি পৃথিবীতে থেকে?
অন্য সকলের মত ডিমের হলুদ খেয়ে তুমি
স্বাদ তবু পাবে নাকি?
জলের পদ্মের বড় পাতার নীচেতে
ছায়া খুঁজে থাকিবে না মাছের মতন?
—মাছের আঁশটে গায়ে লেগে'

কোথাও পুঁটির মুখে রূপ খুঁজে'!
তুমি ধান ভানিবার উঠানের পরে
ইঁদুরের শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে এসে
র'বে নাকি ছোট এক ইঁদুরের সাথে
সকল ভয়ের থেকে ছুটি নিয়ে—ভালোবেসে—?
কমলালেবুর মত লাল রোদ গিলে?
—অশথ বটের গাছে পাখীদের মত
ব'সে থেকে দুই ঠোঁট বাঁকা হ'বে নাকি!
বুড়ো পাখীদের মত হ'বে নাকি আর
পৃথিবীতে ব'সে থেকে!

আমি

বেহালার মত তবু সেই সব প'ড়ে আছে;
তবুও কোথাও কানে দোষ;
তাই আমি অশথ বটের গাছে বাঁকা ঠোঁট ল'য়ে
পাখীদের মত বেঁচে বুড়ো হব নাক'!

তবুও শেখাও
গাছের ছালের পরে ঠোঁট ভেঙে ফেলে.
পাখীরা কি মরে যায়?
অনেক দেখেছি মেয়ে পড়শিনীদের;
তাদের বুকের থেকে ক্ষুদের মতন ঘ্রাণ পেয়ে
কেউ যেন এক বার গিয়েছিল খেয়ে
মুখের স্বাদের মত তাহাদের স্বপ্নের হৃদয়!
তারে তারা একদিন মশারির জালের ভিতরে
মাথার স্বপ্নের মত
কাছে পেতে চেয়েছিল!
কিন্তু তবু এক ভোরে পঁচা এক ডিমের মতন
সেই সব ভেঙে ফেলে' চলে গেছে তারা;
মাংস আর রক্তের বিছানার পরে—তারপর
সন্তানের জন্য তারা দিয়েছে সকলে;
...আমি তবু তাহাদের মত নাই।

স্বপ্ন নয়,—কিন্তু তবু যাদের হৃদয় জ্ঞান আছে
তাহাদের ঠোঁট বাঁকা!

জানি আমি;

ব'সে থেকে তাহাদের রোম সব সাদা হ'য়ে গেছে,
তাদের কপালে শিঙ্ পেঁচার মতন জেগে ওঠে;
অনেক রাতের বেলা জেগে' থেকে তাহারা তারার কাছ থেকে
ফিতা আর চাখড়ির সাদা লাঠি ধার ক'রে আনে;

তারপর পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ের মেপে ফেলে।
তাহাদের কথা তবু সকলেই মানে।

—জানি;

স্বপ্ন নয়,—তাদের হৃদয়ে বোধ আছে!
পাঁকের জলের মত তারা নয়,—তাহাদের গভীরতা আছে!
তবু তারা ভালোবাসে!

তবুও তারার মত আমি কোনো সবুজ পাহাড়ে
অন্ধকারে তাহাদের দেখি নাই!
তারা পাহাড়ের নীচে তারার আলোর মত আছে;
সেইখানে? ঘোড়া আর কুকুরের সাথে?

চাঁদের শিঙের দিকে চেয়ে
পাহাড়ের পাথরের গায় মাথা খুঁড়ে'
তাহারা অলস নয়—!
ছোট মেয়েদের মত হ'য়ে গেছে আমার হৃদয়!
পৃথিবীর অন্ধকারে ভয় পেয়ে তবুও সে পারে নি ঘুমাতে,
লুকাতে চেয়েছে মুখ বিছানার কাপড়ের তলে;
সেইখানে স্বপ্ন খুঁজে ভুলিতে চেয়েছে ব্যথা,
তবু তার বুড়োরা তো ঘুমিয়েছে;
তাহারা ঘুমায়।

কোন্ এক ইঁদুর এসে ঘুম ভেঙে গেছে?
কোন্ ভয়?

আমি এক বোতলের মত ক'রে তোমার নিকটে যদি রাখি
আমার এ হৃদয়েরে,—
তুমি তার ছিপি খুলে দেখো;—
কিছু কি দেখিতে পার?

ছিপি তুমি খুলে দাও;

আমি এক কাঁচের গেলাসে সব হৃদয়ের ঢেলে'
তোমার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরি যদি;

সেই জলে কার যেন মুখ ভেসে ওঠে!
চেয়ে দেখ,—
তবু তারে কোথাও কি দেখা যায়?
..কোথাও সে চলে যেতে আছে!
ইঁদুরেরা খুঁজে' গেছে সব-শেষ শিষ,
ছড়ায়—ছড়ায় ছিঁড়ে' ইঁদুরের খুঁজে গেছে পেঁচা,

তারে তবু দেখে নাই কেউ!

আমার হৃদয়ে তারে তবুও দেখেছ;

সেখানে পেঁচার পাখা রূপার মতন,'
তাদের কপাল থেকে দুই শিঙ্ উঠে
চাঁদের শিঙের সাথে মিশে গেছে যেন;
সেই সরু পোলের উপর দিয়ে হেঁটে
মুখের রূপের মত কারা সব আসিতেছে যেন!
রূপ তাই বেড়ে গেল এত!

—তবু তারে পৃথিবীতে চাই আমি!

যারা চায় তা তা'দের বিষণ্ন হ'তে হয়!

সব বিষাদের স্বাদ জানি;

তবু তারে পাবে না তো;

হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন আছে!

পাখার মতন স্বপ্ন তাহার পায়ের চারি পাশে,—

স্বপ্নের ওপর দিযে তবুও সে চ'লে যায়!

গেলাসে-গেলাসে আমি হৃদয়েরে ঢেলে দিযে
সেই জলে ছবি খুঁজে খুঁজে
অবসন্ন হয়ে গেছি;

অবসন্ন হ'তে হয়;

চাঁদের আলোয় এক সমুদ্রের নউকার মত
আমার হৃদয়;
ভূতের নাওয়ের মত,—আমি তবু একা তার হালে;
কোনোদিকে কোনোখানে কেউ নাই আর!
সমুদ্রের বড় সেই সাদা পাখি চলে গেছে উড়ে'
যেইখানে জ্যোৎস্নায় ছাওয়া থাকে হয়তো সেদিকে;
অথবা যে ম'রে গিয়ে র'য়েছে পিছনে;
ময়লা আলোয় তার ডানা যেন দেখিয়াছি আমি
মাঝ-সাগরের ঢেউ ভেঙে' ভেঙে' আসিতেছে কাছে;
আমারে সে নিয়ে যাবে;
শান্ত ঘুঘুর মত এক রাতে তবুও হৃদয়
শেষের চাঁদের শীতে বইঠার পরে

একাই ঘুমায়ে থাকে;
সেই ঘুম ভেঙে' দিয়ে তবু
কোলের ছেলের মত কেঁদে' ওঠে ঢেউ!
মাঝ রাতে মোম জ্বেলে কে তুমি এসেছ!
চোখ কচলায়ে উঠে দেখি নাই আর,—
বাতাসে মোমের গন্ধ প'ড়ে থাকে পিছের সাগরে!...

অস্পষ্ট ভূতের ছাওয়া দেখা যায় ঢের
মাঝসাগরের পথে চাঁদের আলোয়!

—তোমার হৃদয় মরে গেলে তবু এ সব থাকে না।

আমার হৃদয় তবু বেঁচে আছে;
খোলা পাখা তবু তা'র র'য়েছে পিছনে;

কখনো সুমুখে;
কখনো বা ডান ধারে,—কখনো বা বাঁয়ে;
ঢেউ ভেঙে' বার বার সে আমার কাছে এসে পড়ে;
কোথায় সে নিয়ে যাবে?

কোথাও সে নিয়ে যেতে পারে;

তবু তার ঢেউ ভাঙা হয় না ক' শেষ;

একদিন শেষ হবে,—কেউ জানে?

তবু তার পাখা যেন পৃথিবীর মত নয়;
কাঁচা চোখে উঠে
ময়লা আলোর ঢেউয়ে দূরে
তারে দেখে মাঝসাগরের ঢেউ ভয় পেয়ে ওঠে!
তবু তার মোহ আছে,—
ভয় হয়—আমি তারে একদিন ভালোবাসি যদি!

তারে ভালোবেসে তুমি ঢের দূরে চ'লে যেতে পার,
সেখানেও সুখ আছে;
সেইখানে হৃদয়ের স্বপ্নের শিশুরা সব বড় হয়ে বেড়ে গেছে,-
ঢের বড় সুন্দরীর মাংসের মতন!
সেইখানে রূপসীর মাংসে শুধু রূপসীর মাংস জন্ম লয়,
তারপর মাংসে পোকা পড়ে যায়!
সব চেয়ে রূপ যারা ভালোবাসে।
তাহারা রূপের স্বপ্ন ভালোবাসে সবচেয়ে!
তবুও সেখানে সব স্বপ্ন নষ্ট হয়!

কারা তবু সেইখানে যায়?

পৃথিবীতে বিবাহের বিছানায় শুয়ে
যাহারা অনেক ক্লান্ত হ'য়ে গেছে।
—তাহাদের ঢের অবসাদ,
তবু তারা আরো ক্লান্তি চায়;
তাহাদের মাংস ছুঁয়ে দেখেছ কি?

দেখি নাই;

হয়তো দেখিবে তুমি একদিন!
আমি মাঝ—সাগরের চাঁদের আলোয় একা আছি;
কিন্তু চাঁদ হেলে প'ড়ে গেলে
কপাল ঘামায়ে পড়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে,
তখন ব্যথার জন্ম হয়;
পৃথিবীর মানুষেরা সেই ক্ষুধা জানে!

বুড়ো মরা পাখীদের গলার নলির মত নষ্ট মনে হয়
সকল মাংসের কথা এইখানে!

স্বপ্নের নাড়ীর সাথে হৃদয়ের নাভি যারা বাঁধে
তারা কি হয় না নিঃসহায়!
...ভেবে দেখ তবু তুমি।

এইখানে হালে ব'সে
পৃথিবীর মেয়েদের রূপ তবু আমার পড়েছে মনে:
তাদের মাড়িতে আর দাঁত নেই,
তাদের নাকের ডাঁশা ভেঙে প'ড়ে গেছে;
তাহাদের পেট থেকে অনেক সন্তান
কৃমির মতন ক'রে খেয়ে গেছে তাহাদের;
কোনোদিন যারা আর মরে না ক' তাহাদের মনের ভিতর
রূপ হ'য়ে বেঁচে আছে তারা তবু!

অনেক-বয়সের মেয়ে
তোমাদের সব কথা আমিও শুনেছি,
ঘুমাতে ঘুমাতে তাই জেগে ব'সে আছি;
হয়তো আমার মুখ ধনেশ পাখির মত হ'বে;
তাহার তেলের মত মন তবু;
আমার হৃদয়ে আছে অসুখের তবুও ওষুধ!

তুমি
কোনো এক মেয়েলোক?

আমি
পৃথিবীর বিছানায় শুয়ে
মানুষের বুক থেকে সেই ভালোবাসা ফুরায় না;
ভোরের আলোর মত আঁশটে জালের থেকে ফেঁসে'
তবু আমি চ'লে গেছি!

অনেক-বয়সের মেয়ে
তবু তুমি রূপ ভালোবাস!

আমি
মাছের আঁশের মত তবু তুমি;

অনেক-বয়সের মেয়ে
আমার পেটে থেকে যাহারা হ'য়েছে?—

আমি
তারাও তোমার মত হ'বে;

অনেক-বয়সের মেয়ে
তাদের মতন কেউ সুন্দরী কি আছে।

আমি
মন্ত্রীকোটালের সাথে তাহাদের বিয়ে হ'য়ে যাবে;
পৃথিবীর মানুষেরা তাহাদের নিয়ে ক্লান্ত হবে,
তাহাদের মত আমি কেউ নই;
অনেক-বয়সের মেয়ে
রূপ নয়—রূপ নয়—কোনো এক ডাইনীর হাতে
কাপাশ তুলার মত হৃদয় তোমার ধরা পড়ে গেছে!
চরকায় সব শেষ সূতা কেটে' তোমারে সে ছেড়ে' দেবে,—
তারপর হৃদয়ের রবে কিছু?

তুমি
কে জানে হয়তো তারা ঠিক কথা বলে—
পৃথিবীর এই সব মেয়েমানুষেরা!

আমি
এরা শুধু পৃথিবীর মানুষেরে দেখেছে যে,
সেখানে হৃদয় তবু অনেক সহজে খুশি হয়!
সবুজ তোতার মত মটরশুঁটির ক্ষেতে থেকে
দুই ঠোঁট লাল ক'রে তারা আর চায় না ক' কিছু!
কিন্তু আমি পৃথিবীর মটরের ক্ষেতে গেলে ম'রে যাব,—

দু' ঠোঁট হলুদ হবে,—তারপর সাদা হ'য়ে যাবে;
বল তুমি, এমন বিষণ্ন মুখ দেখেছ কি!

আমি তবু পারি না কি খুসি হ'তে
পৃথিবীর পথে গিয়ে?

পৃথিবীতে কে তোমারে দেখেছিল?

হয়তো দেখেছে কেউ,
একজন থাকে; দেখে ফেলে;—
হয়তো সে পৃথিবীর গর্ভের ভিতর আজো এসে জন্মে নাই,
কিম্বা তার জরায়ুতে সোনার ডিমের মত উঠিতেছে ফ'লে!...

অথবা,—
মাংস আর রক্তের জীবাণুর ঢেউয়ে
কোথাও অনেক স্বপ্ন বেঁচে থাকে!

(সমুদ্রের ভেতর দামী জাহাজ ডুবে যাচ্ছে।)

তুমি
ঐখানে কারা?

আমি
কোনো এক রাণী হবে,
আর তা মেয়েমানুষেরা;
কোথায় চ'লেছে তারা?
ওদের জাহাজ অই সমুদ্রের হীরেকষ ফেণার ভিতরে
ডুবে যায়;—চেয়ে দেখ!

তুমি (অবাক হ'য়ে) জাহাজের অই সব পুরুষেরা এই এই মেয়ে নিযে ছিল!
পৃথিবীর শেষে গিয়ে কোথাও তবুও
অই সব মানুষেরা আবার বাঁচিতে পারে।
মরে যায়;—
ওদের মেয়েরা তবু এদের এখন ভালোবাসে?

আমি মখ্‌মল্‌ পেটারার থেকে লাল রেশমের রুমালের মতো
এ সব মেয়েরা;
সাগরের সবুজ চোখের রঙে তাহাদের ভয় নেই,
'এলডোরেডো'র থেকে সোনা খোঁজে যারা
তাহাদের হৃদয়ের জুতোর হীলের তলে রেখে
তাদের সোনার থলি এরা 'ভালোবাসে—।

তবুও ডাকাত যদি রাজা হয়?

বেদে আর ডাকাতেরা তবুও অনেক বার রাজা হয়,—
তা না হ'লে পৃথিবীতে রূপার পেয়ালা সব চুরি যাবে;
পৃথিবীতে রূপ আর রবে না তো কিছু!
দাঁত থেকে এনামেল নষ্ট হ'লে
সেখানে রূপার দাঁতে রূপ তবু থাকে?

রূপা আর রূপ!...
চাঁদ হেসে চ'লে গেলে অন্ধকারে জলের ভিতরে
মুখ তার,
সে কাহার মেয়ে!

যখন সে চ'লে যাবে
এক মুখ বাতাস সে রেখে যাবে
পাখির মুখের মতো মুখ থেকে;
আর কিছু থাকিবে না!

দেখেছি অনেক বার;
তবুও বুঝেছি—আমারে সে ধরা দেবে!

সময়ের শেষে গিয়ে তার পাওয়া যাবে!

আমার হৃদয়ে তবু সময়ের শেষ আছে;

তবে তুমি বেঁচে থেকে দেখো,—
সব পেঁচা ম'রে গেছে জ্যোৎস্নায় হিম্‌শিম্ হয়ে!
ইঁদুরেরা ম'রে গেছে আগে;
সকল চাঁদের শিঙ্ খ'সে গেছে আকাশের থেকে
ভেড়ার শিঙের মতো বুড়ো হয়ে;
ফুটোনো জলের থেকে ধোঁয়ার মতন
আমার হৃদয় তবু ভাসিতেছে!

সব ধোঁয়া কোথায় যেতেছে?

জল হয়ে ফিরে আসে সব!

যখন ভেঙেছে সব, হারায়েছে, গেছে সব চুরি
তোমার হৃদয় এক বাসনের মতো তুমি রেখেছ গুছায়ে;
আমার চোখের জল মাংসের মতো তার!
তাই খেয়ে বেঁচে থাকে!

রচনা ১৯২৯

গান

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

১

আজ বিকেলের ধূসর আলোয়
তোমার সাথে দেখা
এতটা দিন পথ চলেছি—শেষে
কালো মেঘের কেয়াবনের জলহিজলের দেশে
আমি তোমার পাতা শিশির
হাতের তুলির রেখা

বেতের ফলের মতন আমার ম্লান
চোখে তুমি হাজার বছর রয়ে গেছ, আহা
সময় তোমার হাড়ের স্রোতে লেখা
সকল দারা-সুতের শিয়র ছেড়ে আমি একা

আকাশ আলো পাহাড় শিশির
সে কত পৃথিবীর
তোমাকে শেখা সে কত রমণীর
সে কত রজনীর
আঁধার অবচেতন থেকে শেখা।

২

রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে
আমাদের এ জীবন জনহীন বলয়ে আকাশে
সাগরের দূরগামী জাহাজের মতো
কী ক'রে কখন
অতি দূর থেকে ভেসে আসে।
কোথায় সে ছিল কবে ভুল তারকায়
সাগরের রাঙা নীল জলকাকলিতে
ঢের মৃত—ঢের অনৃতে
কুহলীন দ্বীপের আভাসে

হে নাবিক, হে মানব রজনীর,
এ আঁধার বন্দিনী জানি, তবু
যুগে যুগে কেউ
জেনেছ কি তুমি আছো
শুনেছ কি সাগরের ঢেউ
শঙ্খরেখায় ঘুরে আঁধারে আঁধারে
দূর দিক্‌মাধুরীর পারে
আরো আশা আলো ভালোবাসে।

৩

সারা দিন আমি কোথায় ছিলাম, আলো
এই জীবনের ইতিহাসে আমি আগে
তোমাকে কখনও দেখি নি, তবুও দেখেছি
সূর্যে যখন আকাশী গ্রহণ লাগে
পৃথিবী মলিন হয়
হৃদয়ে গ্রহণ নয়
আলোর অশোক ঝর্ণার মতো কাঁপে
সব সুখে সব শোকে সব পরিতাপে
তোমার শরীর সমাসূর্যের ধারা
আঙিনা ছড়ানো ম্লান পায়বারা
আলো হয়ে ওঠে ঘুম—
ঘুমনগরীর রাজার কুমারী জাগে।

৩ ক

পৃথিবীতে যত ইতিহাসে যত ক্ষয়
মানবের স[illegible] মানবের প্রাণবিনিময়ে অবিনয়
যত গ্লানি ব্যথা ধূসরতা ভুল ভয়
সকল সরায়ে ঘুমোনো নগরী
ঘুমনগরীর রাজকুমারী কি জাগে।
নিখিলের শাদা চাতকের মতো প্রাণ
তোমার আমার হৃদয়ে করে কি গান
(কবে আহ্বান, কবে কবে আহ্বান)
অপার অসীম সূর্যশালিনী
মহাপৃথিবীর অনুরাগে।

৪

অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে
দূর আকাশের তারা,
নীল নিখিলের নীরবতা
নেই কিছু এ ছাড়া,
অকূল অলখ থেকে হাওয়া
কোন্ দিকে তার চলে যাওয়া
মৃত্যু-স্বাতীর থেকে এসে
কী মৃত্যু-ফোয়ারা!

একটি জাহাজ, একটি সাগর, একটি অনিমেষ,
আগুন আলো জ্যোতিষ্কদের দেশ,
ঘুমের মাঝে তবুও যেন অপর বন্দিনী
আরেক আলোক জানালা দিয়ে দিয়েছিল সাড়া।

এই জীবনের দিক্-শরণের গভীর রাতে আমি
তোমায় ছেড়ে দিক্-অ-চেনা ক্রান্তিসাগরগামী,
সৃষ্টি কি নীলকণ্ঠ পাখির অথবা আকাশে
উড়ে যাওয়ার অপরিসীম সাগরধ্বনিধারা।

৫

আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো
চকোর ঘুঘুর ঝলকানিতে অপার নীলিমা
আলোয়—গভীর আলোয় মিশে গিয়ে
উড়ো গাঁয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে
নগরীদের মিনার জ্বালাল।
ভাঙা খিলান মৃত দেয়াল
অন্ধকারের খাত
নরনারীর চোখে অকূল রাত,
অন্তবিহীন প্রেম-বেদনায়
নিস্ফলতার কালো।

এসো, অফুরন্ত সূর্য
আলোর ঈগল
জ্যোতির্ময়ী ফণা,
ইতিহাসের চেয়ে মানবইতিহাসের
আলোর প্রার্থনা,
সকল বিরাট নৃপতিদের ধূলির চেয়ে ভালো
এসো আলো—

৬

আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে
নগরী দিনের মতন কলরবে
এই জীবনের পথে চ'লে তবু
জানি শুধু এখনও যেতে হবে
তবুও দেখি সকলই ঘুমে ঘেরা
সাগবতীরে শঙ্খবালকেরা
সে উতরোল রোলের ধু ধু নীল
দেখেছে কিছু—ভেবেছে কিছু
খেলেছে ঝিলমিল
(আলোর জিব্রাইল)
শাদা আলোর, শাদা পাখির মতো
সহজ ঘুমে ডুবেছে নীরবে
ঘুমের ভিতর যে ঘুম আছে
সে দিক পানে চ'লে
ঘুমিয়ে জেগে আছি

অসীমারই ওপরে তুমি স্বাতী
ভেবেছি প্রতিপদের কাছাকাছি
চিত্রাতারার মতন (তবু তুমিও) জেগে রবে।

৭

ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো
ঘুমের দেশের প্রেম (কী তোমার নাম?)
অইখানেতে শঙ্খনদীর তীরে তুমি দাঁড়িয়েছিলে নাকি
আমিও এলাম।

আমায় তুমি মেঘের গভীর থেকে ভেবেছিলে
এখনও সেই মেঘ
তোমায় আমায় জড়িয়ে আছে, তবু
এই কি জীবন? জেগে ওঠা?
ভোর? হৃদয়াবেগ?
এই কি তোমার শরীরতীরে পেলাম।

গভীর ঘুমে হৃদয় ছেয়ে আসে
মিনার বাড়ি নগরী রোল যুদ্ধ জনগণ
পাথর ধোঁয়া ধুলো খড়ের মতো
এখন অচেতন
এই কি জীবন? জেগে থাকা?
অমৃতেরই হাওয়া?
জ্যোতিষ্কদের ঘুম ভাঙানো?
নারীর দেখা পাওয়া?

৮

দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে আজ এ পৃথিবীর
এই নগরীর হৃদয় দেখা যায়
পথে ঘাটে মেঘে মনের বর্তিকাতে
সেই কি মিলাল
সব পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া আলো?

যে সব নারী নগরীরা চলে গেছে
পুনরুদ্‌যাপনের তারায় জ্বলে গেছে,
যারা স্ফীত অবহিত ছায়ার মায়ায় অকথিত
সকলে আজ নতুন করে জেগে।
জলের কলরোলে রাত্রি-সংক্রান্তি হাওয়ায়
অপার ব্যথা অসীম প্রয়াস আশা ভালোবাসা
অশোক সাধনায়
নতুন সময় সৃষ্টি যন্ত্রগিরি জ্বালাল কি?

মৃত সূর্য অমর করে জ্বালিয়ে নিতে চায়?

ভাঙা দেয়াল বস্তি ব্যথা ধূসর মিনার
নিভে যাওয়া ইতিহাসের ঊষর কিনার
        নিভে গেছে— নিভে গেছে—
ভোরের চাতক চিলের সাগর একক এখন
        ইতিহাসের জ্যোতির কল্পনায়।

অপার ব্যথা, অসীম প্রয়াস ইত্যাদি...

৯

কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি
        তবুও ভালোবাসা,
দুপুরবেলার সূর্যে ভোরের
        শিশির নেমে আসা,
ভোরের দিকে হৃদয় ফেরাই
        যাই চলে যাই—
        নীল সকালে যাই চলে যাই—
একটি নদী একটি অরুণ
        শিউলি শিশির পাখি—
'আমরা মায়ার মনের জিনিস
        মায়াবিনীর বেলায় শুধু জাগি'
বলছে সে কোন্ ত্রিকোণ থেকে
        ছায়ার পরিভাষা।
কাউকে ভালোবেসেছিলাম, জানি,
        তবুও ভালোবাসা।
সে কোন্ সুদূর মরুর মনে চলে গেছ
        হায়, যাযাবর তুমি,
সেইখানে কি মিলবে বনহংসী বাঁধা বাসা!

হায় বলিভুক্, কখন ভেবেছিলে
মাটি ছেড়ে দূর আকাশের নীলে
ধূসর ডানার অগ্নি ছেড়ে দিলে
        মিটে যাবে মায়াময়ী মাটির পিপাসা।

১০

(তোমার সাথে আমার ভালোবাসা
        চলো কেবল সুমুখপানে চলো
সূর্যডানায়—ঈগল পুরুষ জ্বলো
        সময়সাগর শুকিয়ে গেলে সেই সোনালি বালির
        মরুভূমির সঙ্গে কথা বল।)

তোমার সাথে এই তো ভালোবাসা
নরনারীর অঙ্গ প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদলে আমার প্রেম
হে মীনকেতন, তোমার নারী ভালো—ভালো
দিকের থেকে দিগন্তের এই তো আমি এলাম
হে প্রেম, তুমি গৃহবলিভুকের শান্ত কাতর ডানা ধরে
মহান যাযাবরের নিজের সূর্যে ফিরে আসা
হে মীনকেতন, তোমার নারী অমর জানি (আমি),
অমরতর (তবুও) আরো বলয় আকাশ আরো
আলোর পিপাসা—

১১

ভোরের বেলায় তুমি আমি—
নীল আকাশের ভরতপাখির গানে
কবে যে এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে
প্রথম দেখেছিলাম
কেন এসেছিলাম এ সব আলোর অভিযানে
আজকে আবার সকাল এলে সেই কথা কি তুমি
পাখির গানের আলোর সিঁড়ি-সূর্যে উঠে ভাবো
(এই সৃষ্টির) অলখ আলোর থেকে এসেছিলাম
আবার কবে আলোয় মিশে যাব
অন্ধকারের এ ছাড়া কি নেইকো কোনো মানে?
ইতিহাসে ভায়ের-বুকে-ভাই
গল্প ছবি প্রেম— কি শুধু জ্বলন্ত মিথ্যাই
সকলই ছাই করে দিয়ে আঁধার সসম্মানে
বসেছে কি তোমার আমার—
ভোরের সাগরকণ্ঠী পাখির গানে?

হয়তো বা তাই হবে—তবু আজকে আলোয় আমি
এই পৃথিবীর প্রথম ভোরের
সূর্য পাখি নারী
দেখে কি তার আদিম আঁধার ভেবে নিতে পারি
যদিও গহীন থেকে এলাম—গহন আমায় টানে।

১২

ধ্বনি পাখির আলো নদীর স্মরণে এসেছি
আবার তুমি আমি
ভেবেছিলাম আমরা দুজন
মিশরীয় মামি
ঘুমিয়ে আছি সকাল বিকাল
ভোরের হাওয়া সবুজ পাতার নড়া
আমলকীডাল শাল
রুপালি বৃষ্টি পড়া

হয়ে গিয়েছিলাম তুমি আমি।

আমরা কত নগরী হাটে জলে
রক্ত আগুন আবছা অবক্ষয়ে
অসময়ের অন্ধকারে মরেছি বারবার
তবুও আলো সাহস প্রাণ চেয়েছি হৃদয়ে
দূর ইতিহাসযানী!

কোথাও নীড় বেঁধেছিলাম
ভেঙে গেলে কেঁদেছিলাম
ফেনার শীষে হেসেছিলাম
জীবন ভালোবেসেছিলাম
আলো—আরো আলোর প্রয়াণী।

আজকে মানুষ চলে গেলে তবু
মানব রয়ে যাবে,
পাতা শিশির ইতিহাসের বেলা
হয়ে যাবে গভীরতরভাবে
নরনারীর নিজের রাজধানী।

১৩

মকরসংক্রান্তি প্রাণে

তুমি আমার মনে এলে।
বালুঘড়ি বিকল রাতের বেলা।
থেকে থেকে পড়ছে মনে
সে কোন্ ধূসর বেবিলনে
কবের গ্রীসের অলিভবনে
তোমার সাথে সূর্যতীরে
হয়েছিল খেলা।

জানি সবই ফুরিয়ে গেল অতল সনাতনে
থেকে থেকে তাঁবা নদীর জলের উৎসারণে
জলদেবীর মতন জেগে জানিয়ে গেছ তুমি
চম্পা কনকবতী এখন সুধার মরুভূমি
মরুভূমি—মরীচিকা—মায়ামৃগের মেলা।

তবুও আবার সূর্য নিয়ে এল রজনী
আমার—তোমার—আধুনিকের
শতঘ্নী আঘাত

জননটের মতন নেচে—কবে
কী হারাল—সে কার মনে রবে
তোমার—আমার—
    সে কার অবহেলা।

১৪

মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা
    তুমি ছিলে আমার ক্রীতদাসী,
রাতের মিনার শুকতারকায় জ্যোৎস্নামলিন ছিল
    দিনের প্রাসাদ পায়রা ঘেরা—সুনীল আকাশী
ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল কবে,
তোমার সাথে আবার দেখা হবে
তবুও আমার জানা ছিল—কালের কুহর থেকে
    হাজার হাজার বছর তোমায় ডেকে
শুনেছি তুমি বলেছ 'আসি—আসি—'।

আজকে আবার গৃহবলিভুকের সকাল এলে
    তাকিয়ে দেখি মিশর-নীলিমায়
সে সব চেনা দুধের মতো শাদা
    পাখিরা উড়ে যায়—
আমি আমার মনকে বলি, 'আমি ভালোবাসি'।

হাজার হাজার বছর আগে হারিয়েছিলাম যাকে
এখন সে তার প্রতীক নিয়ে হেতুর পারাবারে
খেলা করে ফেনার শীষে কেঁপে ওঠে শুনি,
আমি আমার নির্বলতায় বেবিলনের বাঁশি
বাজিয়ে তাকে নীল অতিবেল অন্ধকারের থেকে
আলো—আরো আলোর পানে
    আসছি না কি ডেকে।
এ সব কারা মহিলারা আমার পাশাপাশি
চোখে চুলে হাতের নির্জনতার স্রোতে এসে
আধেক মনে পড়িয়ে হারায় কোথায় অনিমেষে
(হারায় রাতে) হঠাৎ জাগা শিশুর মতো :
    ঘুমের পিয়াসী।

I HAVE FELT THE BREATH

I have felt the breath of autumn wind,
With the fragrance of spring still in my heart;
I have touched, shiveringly, the skirt
Of autumn—her treasures nervously gleaned;
She laughed not like summer, nor grinned
Like the wind-weary phantom-girt;
Nights that out of winter dart
To her own winning sadness she is pinned.

With a flower, or two—a vanishing scent,
A flash of smile on her demure face,
She walks with a light half-spent
By life and half in death's embrace;
She looks like a lady that is gracefully bent
To track the lost lover's fading trace.

BANALATA SEN

Long I have been a wanderer of this World.
Many a night
My route lay across the sea of Ceylon somewhere winding to
The ocean of Malay.
I was in the dim world of Vimvisar and Asok, and further off
In the mistiness of Vidarbha.
At moments when life was too much a sea of sounds–
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom.

I remember her hair dark as nights at Vidisha,
Her face : image of Sravasti; the pilot
Undone in the blue milieu of the sea
Never twice sees the earth of grass before him.
I have also seen her, Banalata Sen of Natore.

When day is done, no fall somewhere but of dews
Dips into the dusk; the smell of the sun is gone
Off the kestrel's wings. Light is your wit now
Fanning fireflies that pitch the wide things around.
I am ready with my stock of Tales
For Banalata Sen of Natore.

MEDITATIONS

We are closed in, fouled by the numbness of this concentration cell.
The honeybees on the upper wall know well enough
That the man below have been crossed by the stars
Turned on their uncertainty : they are lost
Treading upon the phantasy of their hearts,
They should have been men.

Outside the rage momently undoes
What were patterns of human hope and love.
In the sharp history of man, with his back turned
                    upon the sensuousness of the sea,
And neck craning on to some usable good
Every phase were glad of its own death
Had it felt that keeping to their own past intent
Were sons whom it bore—
Holding out hopes of more mature dispensations.
The golden Sun, the wings of this, the wisp of grass which
Grown miraculously somewhere in the waste
Is at peace with its life and our mockery;
The river bickering down with its sudden waters of death:
Mirrored in the eyes of a couple of mating flamingoes—
      Too late to be saved—
      As the love of Nature that is forsworn;
      And the men who have played their parts to build
And were outwitted by—genius, love, common mistake
      Or natural declension of the soul
      To full down what they created;

All the flavour stays in the Sun
And moves forward on the fatal flood of times
Like parables that improve as they are recounted

DARKNESS

In deep darkness
I awoke once more
Distracted by the splash and fret of the river flowing by.

Vaitarani-equivalent of Lethe.
Kirtinasha lit, destroyer of great works. This epithet is synonymous with the river Padma, and refers to its erosive capacities—কবি-কৃত টীকা।

I saw the pale moon wont to gleam on Vaitarani
Had caught Kirtinasha in its still noose of shade.
I had slept by Dhansiri river on a cold December night,
And had never thought of waking again.

O Moon, dimmed to a faint blue disc,
Day's light you are not, you are not enterprise,
ambition, or dream;
The quiet and peace of death,
Its sleep—so dear to our heart
Is like a holy tryst
Which you moon have no means to spoil.

Do you not know, O Moon,
Do you not know, O Night,
I have gone to bed with Darkness,
And slept with her
For long, silent ages;
And then all of a sudden on a morning
I have found myself awake in the horried crack
of this earth's light—
So loud, so foolish!

The sun from a red sky, in a dry level tone,
has called on me as a soldier
To range against foes I have never known.
The vast belt of the sun-bedevilled earth
Has shrieked and squealed like millions of pigs in merriment.
Ah, mirth!....a penumbra in my soul radiating
darkness—darkness ever more.

O Man, O Woman,
I have never known your level;
Nor am I a wanderer from another star.
Only this I have known that wherever there is
movement, desire, work and thought
There are divisions of friends, families, nations, the
whole range of day-time madnesses.

I am too full of sleep, of enveloping nescience;
Why should you keep me awake?
O Time, O Sun, O Kokol of January night, O Memory,
O Winter wind,

Why stir to announce me to the day?

Never more shall I waken
By the river's ruthless gurgling.
I shall not see how the dim, assorted moon
Divides her flickering between the River of Death
and the River of Mutability.

By the water of Dhansiri
I shall go to bed with Darkness that never ends,
The sleep that never abates.

CAT

All day long
I hail a cat in shine, shades of brown leaves.
He is just up from a few bones of fish.
And then has will of this earth.
Like a hushed bee.
Is again a cat clawing the barks of Krishrachura.
Moves in the sun's wake.
He gleams upon me.
He is gone.
Autumn twilight.
I see his white paws disembark
Like love in and out on the mildewed sun—
Hauling in balls of darkness.
And make it a world of night.

SAILOR

The sailor has a sense of defeat as he gets up with a start
And finds that instead of taking his post at the helm
He had dozed off hoping that his ship at mid sea
Would take care of itself.
He pulls himself together, resumes his position of watch and toil.

Sun—the din and hurry of a port nearby
And the row of palms hail him.
His ship moves on.

To the priestess with a shock of golden hair

The evening sun seems like the egg of the bird of paradise,
To the farmer a plaything amid his acres of ripening wheat.
Human heads huddled together in dark
Have a glimpse of Sunray's slant
Piercing like a lance into their hovel ;
They look, rapt, at the golden beam and the motes in it
Rapidly throbbing and flying—flying and throbbing ; why? to what end?

O Sailor, you press on, keep pace with the Sun;
You have been caught awhile in the mirrors of
Babylon, Nineveh, Egypt, China and Ur ;
Loosened yourself and headed for other shores,
The impulse from Vaishali, Byzantium and Alexandria
Has been to you like thin, straight candles glowing on remembered beaches.
They are good, but whet the quest ;
You want deeper knowledge, completer experience.

As long as honeybees with wings sparkling like spray fly in the sun
And the heron with a surer touch than the jet plane
Brings home the virgin vastness of the blue
Man will not rest content ;
Purged of follies, sin and tragic mistakes
His sailor-soul will fare forward
To move into a better discovery of life on this planet,
A greater joy—a deeper communion.

The Sky is Red

I

The sky is red
Another night is gone
The silver-sheeted dew
Lies on the lawn

But there are patches
Of crushed dewless grass
Imprinting the footsteps
That nightly pass

On the day I see the trace

Of the farers' feet
They are gone— gone away
Elsewhere to meet

On the hill there are scratches
Of fingers and toes
Unfamilliar name
In straggling rows.

They are gone—gone away
Their voices are still
Their steps I find
Their nerves I feel

They stamped on this earth
This mud they prest
Now they are safe
In some coign of rest.

Their aimless sprawling feet
Their flickering brain
Have gained the sphere
Above the strain.

THE COUNTRY-SIDE...

The country side is lulled in a shell.
The woods are looking at the sky.
The heaven tonight is full of stars.
They seem so dear,—they seem so night

Like a noisy baby is slumber's hush
Rests the tumultuous pulse of earth
The silence is in the milky way
The silence is in creation's girth

Soft some one will come tonight
Blow out our candles in the darkened face
Of the trackless sands and waters
I catch the tune of his pace

The empty road that rambles through the wood

Through fen, through hill

is brooding of the dawning hour
Is lying still

Tis the season of his bloom
The self same hour
When our cracking bones
Will gain in power

When in our darkned socket
Will rain a light
He is coming—coming
Tonight-tonight.

CHORUS

I

They have been long on this earth
But they have not been able to make much of life.
And now Death is at hand.
Once they held that Doom was far away,
And graced their harts with ease.
But now a shadow, not of the sun, hails on them.
It has come home to stay.

To their children life is a violent expreience now.
Touched but lightly by family & fireside
These fledglings are old enoug to know better
Than what old birds in their fouled nests have to teach.
With their innate love of values, not their fathers',
Their sons have hiked their faith to what seems to be
a baffle of their fathers' faith.

The fathers have had faith to build houses, come home to
roost now,
Empty of children.
They have had faith of grow food, to put shadows into
the mouths of their children.
The children have given all to travel the road of
same ideas
And midmost of the track find it fudge.
Silence is astir in homes of fathers
They have wandered about places, moralised their days out of
possible aberrations;

They have worked, been paid for, and voted for the people's man;
Have read to know; have cursed; have not cared a
Tinkers curse for the spirit when the letter was gay;
Have given rope enough to the sanctity of honest sex;
But it has not been a furlough in Heaven for them
to have been through all this fór a lifetime.

Out there on the streets of the city
They are dancing on their graves.
Out beyond it the read the landscape of the dead.
Their experience, knowledge, women, autumnal crops
Are pitched forward to fall across the semblance
of a hope;
We hope there is hope yet; there is hope.

II

As we look on, looms 1944 before us
Soughing like wind on sands.
Sunk within themselves apart, men stare straight in front of them.
They feed on the vagueness of their hearts;
Time is a grey wood to them, a grove of gallows-trees,
Which, nonetheless, would sing as a green deodar (?) gratto--
Had they known that it is not for history to always ache to the bone;
But that there is hope as men have known more & wondered more.
But these people have been taught by time to save their pleasures.

They dont know if life would have the laugh of them in the end.
Now they draw together in fear; fear gone, are loosened up.
These men have long been in our land,
Have seen how our heroes have given hostages to fortune,
And have been beaten by reality.
In the darkness of our fields
The far year has no guts in it.
Put in the hearts of our cities
Are the men wh have created nothing.
And don't know it.
The moving tunes come on them unawares,—
Come on congenital clam they can't put away.

Matter of habbit with them to sleep
Rise & sleep as a matter of right.

From all this grow clamour, fear, sick heart,
Wasted breath, split & fall.

III

Has the will been awakened?
Do we get the common people today as becoming
more & more the great book of the people?
They seek love and wisdom?
They have hoodwinked,—or, moralised their moments
Out of blood, lechery vandalism, lie & terror?
ah, Common people,
Common man, comman woman.
Fresher than blades of grass is woman;
and man, dead & unborn, nobler than rivers.

The sunlit Horials, high above the nuzzles of cannons
Hold the freedom of their will to quit the skyline of lost rhythms-
—
And fare on to a great, boble blue.

Favourable winds & our tenderness follow them.
With all their airiness them are no more than birds.
Give room to millions as round their path the sun falls
Catching their dishonoured shrouds and unfaltering
headpieces into yet another sun.

Wind stirs
With gentle head over the grass;
Minds us of the grass that is green.
Dim images, before we can make they, look into
our eyes as chiming rivers of the earth.

Quickened by many more suns than we have seen
The waters of joy pass away into image
Of man's death, disease, dereliction and strain,—
Hoping to rise refreshed from the wasters of 1944.

Man seeks love & wisdom?
He has hoodwinked?—or, moralished his moments
Out of blood, lechery, vandalism, lie & terror?

Has the will been awakened?
Do we see the common people today as singing masters to Time & Times.

Children

(I) Like birds in winter
Tucked in a snug nest
The are nonchalant.
Unobsessed
(II) I did not know
The earth was so soft
Before a woman came to me
And stopt

I did not know
The sky was so tender
Before the Gods of grace
Were pleased to send her

I could not think
The stars were so bright
Before she flashed
Her eye-lash light.

(III) Life seems to be like a placid mill-pond
Big boulders we need
To splash the smooth surface
And a commotion breed
Life seems to be like a monastic cell
Where phantom orders live

Let us break them- violate
We should never grieve
Life seems to be like a seething school cation
With weary bone-sucking tasks
But, unabashed truants let us be
Fro morning till dusk.

খসড়া, পাঠান্তর, আনুষঙ্গিক কবিতা

'নীলিমা'। ঝ রা পা ল ক। সাময়িক পত্রের পাঠ।

নীলিমা

হে মৌন গগন— ওগো সুদূরের নীল,
হে বিচিত্র অনন্ত নিখিল,
অপার ঐশ্বর্য বেশে দেখা তুমি দাও বারে বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।
— উদ্‌বেলিছে হেথা গা ধূম্রের কুণ্ডলী
উগ্র চুল্লিবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,
আরক্ত কঙ্করগুলি মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
—মরীচিকা ঢাকা!
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে আনিবার— পায় নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী!
জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবি
কোন্ দূর স্বপ্নপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নিলাম্বরখানা
হে সুদূর বিরাট অজানা।
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধিরলিপিকা,
জ্বলে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!
বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি— ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
— প্রস্ফুটিত মেঘকুঞ্জে, সুনির্জন নক্ষত্রের রাতে ;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,
তোমার চকিত স্পর্শে হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

'মাঠের গল্প'। ধূসর পাণ্ডুলিপি। বর্জিত (?) অংশ। '

পৌষের চাঁদ

'তুমি
কোনো এক মৃত মুখ দেখেছ কি
কোথাও নদীর ধারে পাড়াগাঁয়

পউষের চাঁদ?'

'আমি?
পগাশ ধানের ক্ষেত মৃত
মড়ার মুখের 'পরে কাপড়ের মতো
এ কুয়াশা,
এখন পাখির গান মরে গেছে
ডিম নাই
বীজ নাই
প্রেম নাই
আশা নাই কিছু।
পউষের নিস্তব্ধ আকাশ
ভালোবাসি তবু
তুমি আছো ব'লে'।

'ক্যাম্পে'। ধূসর পাণ্ডুলিপি। আনুষঙ্গিক কবিতা।

১

সে এক শীতের রাতে—জ্যোৎস্নার রাতে
প্রথম যৌবনে আমি কোনো এক শিকারীর সাথে

ক্যাম্পে ছিলাম শুয়ে আসামের জোকাই জঙ্গলে
রাত কিছু বেশি নয়—জোনাকীর নীল কোলাহলে

হৃদয়ে আমার ঘুম আসে নাকো, তাই চুপে ধীরে
ক্যাম্প ছেড়ে একবার জ্যোৎস্নার অরণ্যের তীরে

দাঁড়ালাম—দীর্ঘ নাহর গাছে ছেয়ে আছে বন
ছায়া-উপছায়া তার খেলিতেছে হাওয়ায় কেমন

খেলিতেছে জ্যোৎস্নায়—আকাশে নতুন চাঁদ যেন
কোনো দিন পৃথিবীতে দেখি নাই হেন

হেন চাঁদ; আকাশ প্রান্তর মেঘ-শিশিরের জল
যেন কোন্ রাত্রিচর বাঘিনীর অগণন ইঙ্গিতে উজ্জ্বল—

তখন অনেক রাত—ক্যাম্পে ঘুমের গন্ধ—হৃদয়ে আমার
ঘুম নাই—নক্ষত্রেরা নাহরের নীল জানালার

ফাঁকে ফাঁকে ঘুমায়েছে— ঘুমায়েছে ময়না মুনিয়া-
স্তব্ধ রাত। কুয়াশায় জ্যোৎস্নার দূর পথ দিয়া
ভীত এক হরিণেরে অকস্মাৎ দেখা গেল, আহা,

বিশাল বিচিত্র প্রাণ বনের প্রেমিক সে যে তাহা

সমস্ত আকাশ যেন নক্ষত্রের কোটি চোখ দিয়ে
জেনেছে অনন্তকাল—তুমিও বুঝিতে তাহা প্রিয়ে

মরণের ঘুম ভেঙে উঠে এলে—উঁচু-মাথা গাছের মতন
কুয়াশায় দেখা দিল—সমস্ত বনের আবরণ

পিছে তার—চোখে তার প্রান্তরের হাওয়ার আঘাত—
ধারালো ঘাসের বর্শা পায়ে তার—হাড়ভাঙা শিশিরের রাত

বুকে তার—পিছে তার নাহরের অন্ধকাব অরণ্যের থেকে
ছুটিছে নক্ষত্র এক—ক্ষিপ্র দেহ ঢেকে

চিতার বিচিত্র শালে—বিদ্যুতের মতো গতি নিয়ে
জ্যোৎস্নার পথ থেকে ঢুলুঢুল জ্যোৎস্নার স্বপ্নপথ দিয়ে

সুন্দব দুইটি প্রাণ—ক্যাম্পের পাশ দিয়ে ছুটে গেল তারা
রুপালি চাঁদের গুঁড়ি হরিণের দুই চোখে—চিতাবাঘিনীর পাড়া

মখমল ঘাসে ঘাসে—শিশিরের রুপার হীরায়
যত দূব চোখ যায—যত দূর দুই চোখ যায—

সন্ধ্যার নদীর পারে দাঁড়ায়েছিলাম একা ক'রে
নাহবের ঘন বন দাঁড়ায়েছে নিকটে নীরবে

বুলবুল মুনিযাব ছোটো পাখা মুছে গেছে কখন আকাশে
নদীর হ্রদ জল ধীরে ধীরে ঘরে চলে আসে

নাহরের বন থেকে একরাশ জ্যোৎস্না লয়ে মুখেচোখে তার
হঠাৎ হরিণ এক— বনের সে মৃগ নয়, স্বপ্ন-কল্পনার

ছবি এক—ছুটে এল—নেমে গেল পীত স্তব্ধ নদীর ভিতরে
দুধাবে জ্যোৎস্নার জলে হীরা যেন ঝরে

(গায়ের দুধারে তার মুক্তার হার যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে;)

শীতল ফেনায; জানালার মতো তার প্রসারিত চোখে
ভয়ের প্রদীপ নড়ে অন্ধকার বেগুনি আলোকে
সাঁতরায়ে চলিতেছে জ্যোৎস্নার ছায়াসিঁড়ি নদী—
কেন ভয়? কই যায?..... জানিতাম যদি

সুস্বাদ বনানীমাতা দেহের ভিতর থেকে তার
জন্ম তারে দিয়েছিল—ভালো তারে বেসেছিল সুঘ্রাণ নক্ষত্র অন্ধকার

প্রশস্ত বিরাট শিঙ নাহরের শাখার মতন।
নাহর দাঁড়ায়ে আছে শান্তি স্বপ্নে—ভয়ে বেদনায় তবু মন

ভরে কেন হরিণের? হলুদ নদীর জল হয় কেন লাল?
গুটায়ে নিতেছে জ্যোৎস্না আরেকবার তার মুক্তার জাল...

হরিণের রাঙা মাংসে ভরা
ছায়াসিড়ি নদীটির মেয়েলি মায়ের হাতে পড়ে গেল ধরা।

'শকুন'। ধূসর পাণ্ডুলিপি আনুষঙ্গিক কবিতা।

এখন ভুলেছি সব, ভালো আছি—বৈতরণী নদীটির পারে
আমরা রয়েছি বসে চুপে চুপে সারি সারি শকুনের মতো
অথবা নদীর পারে সহস্র সহস্র মাইল ধরে অবিরত
চরিতেছি—কেন যেন; স্মৃতি নাই—চিন্তা নাই—শুধু অন্ধকারে
চরিতেছি; ভয় নাই—ব্যথা নই—কিছু নাই—নদীর কিনারে
উড়িতেছি—উড়িতেছি; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শকুন সে কত
ক্লান্তি নাই—ক্লান্তি নাই—বৈতরণী নদীর তরঙ্গ ক্রমাগত
শান্ত হয়; শকুনেরা জীবনের শেষ জ্বালা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝাড়ে,

ঝেড়ে ফেলে; মরণ কি ভালো নয়?... আমরা হয়েছি কবে মৃত
আমরা এসেছি চলে শেষ দেশে—বোর্নিয়োর সমুদ্রের থেকে
মাঝিরা দেখেছে চেয়ে একবার—সন্ধ্যার সোনালি পাম্ সারি
তাদের নিয়েছে ডেকে তারপর—এখনও হয়নি ব্যবহৃত
জীবনের সাধ আশা তাদের—মৃত্যুর সুখের ছবি দেখে
আলো গ্যাস ধোঁয়া কোলাহলে তারা চলে গেছে তাই তাড়াতাড়ি।

'বনলতা সেন'। আনুষঙ্গিক কবিতা।

বাঙালি পাঞ্জাবি মারাঠি গুজরাটি বেহারি উৎকলি—আর সব সাগরপারের দেশের মানুষ
এই কলকাতায় আমরা লক্ষ লক্ষ লোক, কোটি কোটি প্রাণ—রোজ
ভোরে জাগি, অন্ধকারে ঘুমাই
এই কি শুধু? এর প্রচণ্ড রহস্যের কথা তোমাদের মনে জাগে না?
এক মুহূর্তের জন্যও কি মনে হয় না
যেন সেই অতীতের এশিরিয়া মিশর আবার তাদের গল্প বলে যাচ্ছে
এই কলকাতায়
মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে বেবিলনের সেই বিরাট স্তম্ভের কথা

মনে হয় না কি যার উপরে সিংহের মূর্তি ছিল?
এই শহরটাকে বেবিলন বলে মনে হয় না? মিশর বলে?

আমার কাছে এই শহরের ধুলো হাজার হাজার বছরের পুরোনো বলে মনে হয়
জানালায় এর নারী, দিঘির জলে এর মাছ, আলিসায় এর পাখি, দেয়ালে এর কীট
এক-এক সময় হেঁয়ালির মতো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বনলতা সেন, তুমি যখন নদীর ঘাটে স্নান করে ফিরে এলে
মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য তোমার,
অসংখ্য চিল, বেগুনের ফুলের মতো রঙিন আকাশের পর আকাশ
তখন থেকেই বুঝেছি আমরা মরি না কোনো দিন
কোনো প্রেম কোনো স্বপ্ন কোনো দিন মৃত হয় না
আমরা পথ থেকে পথ চলি শুধু—ধূসর বছব থেকে ধূসর বছরে—
আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকি শুধু, মুখোমুখি দাঁড়াই : তুমি আর আমি,
কখনও বা বেবিলনের সিংহের মূর্তির কাছে
কখনও বা পিরামিডের নিস্তব্ধতায়
কাঁখে তোমার মাদকতাময় মিশরীয় কলসী
নীল জলের গহন রহস্যে ভয়াবহ
মাথার উপর সকালের জ্বলন্ত সূর্য তোমার, অসংখ্য চিল,
বেগুনফুলের মতো রঙিন আকাশের পর আকাশ।

২

একটি পুরোনো কবিতা

আমরা মৃত্যুর থেকে জেগে উঠে দেখি
চারি দিকে ছায়া ভরা ভিড়
কুলোর বাতাসে উড়ে ক্ষুদের মতন
পেয়ে যায়—পেয়ে যায়—অণুপরমাণুর শরীর

একটি কি দুটো মুখ—তাদের ভিতরে
যদিও দেখি নি আমি কোনো দিন—তবুও বাতাসে
প্রথম গার্গীর মতো— জানকীর মতো হয়ে ক্রমে
অবশেষে বনলতা সেন হয়ে আসে।

আনুষঙ্গিক কবিতা: ব ন ল তা সে ন কাব্যের নানা কবিতার

বেবিলন

নক্ষত্রের রাত্রির মতন
বিলাসের ব্যসনের মৃত্যু নাই নাই
এশিরিয়া-নিনভে-টায়ার-বেবিলন
উজ্জয়িনী-বিদিশায় যাহা ছিল তাই

এখানেও দেখি আমি
জ্যোৎস্না আর বসন্তের রাতে
বিস্মিত পায়রা এক যখন তাহার
মৃদু ধীর ডানার আঘাতে

সব চেয়ে উঁচু ঐ দেয়ালের 'পরে
বসে এসে—শহরের সবখানি চাঁদের আকাশ
এই পাখি, আমি যেন চলে যাই সে কোন্ শহরে
যেখানে আমার হাতে রঙ নিয়ে খেলিবার ব্রাশ

মদালসা নিজে এসে কেড়ে লয়; বলে,
ছবি আর এঁকো নাকো, দেখো নাকো স্বপ্ন—দেখো চেয়ে
বারবনিতাব সাথে বসন্তের জ্যোৎস্নারাত চলে
তবু তার প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে

যেখানে চন্দনবাতি মৃদু হয়ে আসিতেছে ক্রমে,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্না লাল লাম্পট্যের ঠাঁই
পাতিযাছে—মীঢ় অ্যালো, গোলাপি সালোমে—
চোখে তার ঘুম নাই—ঘুম নাই—নাই

আমারে সে চেয়েছিল—আমাবেই—তাই তার উজ্জ্বল চিতারে
ধবল স্তনের থেকে নামাল সে বসন্তের রাতে
তবু যেন কোন্ দূর প্রাচীরের পারে
সিংহ ডাকে বেবিলনে—তরবার হাতে

তাই আমি চলে যাই—প্রাচীরের ভাঙা শেড়্—সোনালি কেশর
জ্যোৎস্নায় ছায়া ফেলে—সমারোহ সমৃদ্ধির স্বপ্ন হিংসা ভয়
চারি দিকে; থিসবির ভালোবাসা— নিনাসের নির্জন কবর—
বেবিলন! আজও মৃত নয়।

অনন্ত বিস্ময়! কবে শেষ হয়!
যদিও বিধাতা এসে বারবার ভরে গেছে তার জঙ্ঘা স্তন
গলিত কুষ্ঠের ক্লেদে—বসন্তের জ্যোৎস্নায় উজ্জীবিত হয
তবুও বিদিশা, কাঞ্চী—নিনভে—নতুন বেবিলন—
জীবনের রোমহর্ন—নগরের বিলাস ব্যসন,
আবার নতুন বেবিলন।

২

স্বপ্ন দেখি মৃত মুখ ছবির মতন
আঁধারের বুক থেকে জেগে ওঠে ঢের
মৃত উর, মৃত বেবিলন,
আজও আমি পাই তাহাদের

হৃদয়ের আঁধারে অতলে
জেগে ওঠে তাহাদের প্রাণ
রুপালী রেবার জলে
পুষ্পসেনী আজও করে স্নান

সুমাত্রার সমুদ্রের পারে
সিংহলের বেগুনি সাগরে
মণিমুক্তা প্রবালের হারে
আমার স্বপ্নের ডিঙা ভরে

হৃদয়ে গোধূলি লেগে আছে
কোন্ দূর পুষ্করের তীরে
ময়ূর উড়িয়া যায় গাছ থেকে গাছে
লক্ষ বছরের কোন্ মৃত ময়ূরীরে

পেতে চায়; ক্রৌঞ্চপর্বতের থেকে, আহা,
ক্রৌঞ্চীরা উড়িয়া গেছে (বুঝি) সব?
কই গেছে? হৃদয়ের স্বপ্ন জানে তাহা।
(শোনে যে তাদের কলরব।)

আনুষঙ্গিক কবিতা : 'হাওয়ার রাত,' 'নগ্ন নির্জন হাত'। ব ন ল তা সে ন।

কলকাতা আবার জেগে উঠেছে (এক দিন মরে যাবে যদিও)
হাজার হাজার বছর আগে বেবিলন যেমন এমনি ভোরের বেলা জেগে উঠত
কাদের মস্ত মস্ত (বিরাট) বিবর্ণ প্রাসাদ সব ছড়িয়ে রয়েছে চারি দিকে
এ যদি বেবিলন না হয়!

ঐ আলিসার পায়রাগুলো যেন তিন হাজার বছরের পুরানো
আমি এদের প্রতিটি পায়রাকে বেবিলনের রাজপ্রাসাদের চারি দিকে ঘুরতে দেখেছি
তিন হাজার বছর আগের আকাশের গভীরতর নীল জানালায় উড়তে দেখেছি
সিংহের সোনালি কেশরের মতো জ্বলন্ত রৌদ্রে
কোন্ এক নিবিড় বেবিলনে।

কে এসেছ? তুমি নাকি?
তুমি বুঝি মনে করেছ তুমি বাইশ বছরের একটি নারী—এই নগরের
জারুলের একটি নরম শাখার মতো ফেনিল ফুলের রূপে জেগে উঠেছ আজ ভোরে
তিন হাজার বছর ধোঁয়ায় মিলিয়ে যায় তোমার মুখের দিকে তাকালে
বেবিলনের সেই বিরাট প্রাসাদ জেগে ওঠে আবার
রাজপুরীর থেকে নেমে
রৌদ্রপ্লাবিত ভূমধ্যসাগরের মতো জ্বলন্ত রৌদ্রে
অনাদি সবুজ ঘাসের বাগানে এসে দাঁড়ালে তুমি
মাথা ঘিরে তোমার পায়রার ওড়াউড়ি

কোলে তোমার সোনালি সিংহের ছানা
চিতাবাঘের উদ্দৃপ্ত চামড়ার গায় তোমার স্তন, তোমার কাঁধের উপর
হাবসী বালিকা একটি কালো প্রজাপতির মতো
        তোমাকে ঘিরে ঘাসের ভিতর খেলা করছে
প্রখর রোদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে
সন্ধ্যার টায়ারের সমুদ্রের মতো তোমার প্রশান্ত নীলাভ খোঁপার ছায়ায়
        আমি বসে রয়েছি
        আজ বসে আছি যেমন
তিন হাজার বছর ধোঁয়ায় মিলিয়ে যায় তোমার মুখের দিকে তাকালে।

আনুষঙ্গিক কবিতা: 'শঙ্খমালা'। ব ন ল তা সে ন।

সারা দিন ট্রাম-বাস—ফেরিঅলাদের ডাক—কুষ্ঠরুগি পথের উপর—
হাড়ভাঙা মহিষের গাড়িগুনো—বাজারের রুক্ষ শব্দ—বস্তির চিৎকার।
আমার হৃদয়ে যেই শঙ্খমালা কিশোরীটি বাঁধিতে আসিয়াছিল ঘর
তাহারে ফিরায়ে দেয় শহরের পথ থেকে পাড়াগাঁর কান্তারের পার—

কবে যে কান্তার ছেড়ে আসিয়াছি নির্বাসিত আমি রাজপুত্রের মতন,
কোথায় শিমের গন্ধ? শ্যামা পাখি? কিশোর গেল কি মরে বুকের ভিতর?
দুপুর ঘনায়ে ওঠে ভিজা মেঘে—চিল কাঁদে—কই বলও? কই হীরামন?
আমার হৃদয়ে যে গো শঙ্খমালা কিশোরীটি বাঁধিতে আসিয়াছিল ঘর।

২
আমি যে সংসারে মন দিতে চাই, আমি যে বাঁধিতে চাই পৃথিবীর মানুষের মতো
বাসা এক; আমি যে বন্দরে যাই, অন্নের উপায় করি—স্বামী হই পিতা হই আমি;
আমি যে ভিড়ের গন্ধ গায়ে মাখি দিনরাত; আঁধারে ঘুমাই, দিনে রৌদ্রে ইতস্তত
ঘুরে ফিরি; সংসারের কাজ কথা হাটের ভিতরে আমি অলক্ষ্যে যে পড়িতেছি নামি—
এই সব ছেড়ে দিয়ে, হে হৃদয়, চলে যাও অঘ্রানের পাড়াগাঁর ম্লান তেপান্তরে,
সেখানে বটের বুকে দাঁড়কাক বাঁধে বাসা—রাঙা পশমের মতো ফলগুলো ঝরে
শুকনো পাতার 'পরে; সেখানে সন্ধ্যার বক শঙ্খের মতন শাদা পাখনা ভাসায়
কামরাঙা-রক্তমেঘে—তিনশো বছর ধরে কোন্ এক অভিমানী মঠ দেখা যায়—
খড়কুটা মুখে নিয়ে শালিখ উড়িয়া যায় কান্তারের ঘাস থেকে প্রান্তরের ঘাসে,
এক তারা ফুটিতেই রূপসী প্রেতিনী সেই শঙ্খমালা দেখা দেয় মাঠের বাতাসে ...

৩
যেদিন আমি এই পৃথিবীর থেকে চলে যাব—হে শঙ্খমালা—
        অপরিসীম নক্ষত্র তুমি বিছিয়ে রেখো আকাশে,
আকাশের অন্ধকার সমতলতা ঘিরে যুগান্তের লুপ্ত মানবীদের মতো কয়েকটি নির্জন নক্ষত্র—
        এর চেয়ে গভীর জিনিস কী আর থাকতে পারে
কী আর থাকতে পারে শঙ্খমালা—
আর আমার বিছানা করে দিয়ো সমতল দেশের শিয়রে

সবুজ ঘাসের ছবির ভিতর
ধানসিড়ি নদীর জলের গন্ধের কাছে
এই বাংলায়।

আনুষঙ্গিক কবিতা: 'সিন্ধুসারস'। ম হা পৃ থি বী।

সিন্ধুশকুন

বৈশাখের এক পর্যাপ্ত রোদের সকালবেলা
হে সমুদ্রপাখি, আমি তোমাকে দেখেছি
মাথার উপরে তোমার ধূম্রবর্ণ আকাশ
বুকের নীচে তোমার হীরেকষের মতো চঞ্চল সমুদ্র
জন্মেছ তুমি সেই প্রবলতার ভিতর থেকে
সমুদ্রের শাদা ফেনা হঠাৎ রোদের ভিতর ঝাঁপ দিয়ে
হয়েছে সিন্ধুশকুন—

২

রোদের সোনালি মদ অন্ধকারের নীল রস পান ক'বে
সমুদ্র নাচছে মাতাল পহ্নবী প্রেমিকের মতো
আমরা জানি না কোথায় তার প্রেয়সী
কিন্তু সেই অপরূপ সোনার চুলের বিছানা তুমি দেখে ফেলেছ
আকাশপাষাণের দেয়ালের মতো তোমার কাছে তাই
সমুদ্রের নীল জল আনন্দের জানালার মতো।

৩

শকুন আকাশের পাখি
চিল পাহাড়ের পাখি
মাছরাঙা ধানসিড়ি নদীটিব পাখি
ঘুঘু নির্জন শান্ত নীড়ের—
হূণ সৈন্যের মতো, সিদ্ধ কিন্নরের মতো অবিরল জল যেখানে গর্জন করে
সারা দিন হাজার হাজার ইস্পাতের বর্শা ঝলসায়
সারা রাত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের ভাঙা গড়া হয় যেখানে
তুমি সমুদ্রের পাখি
পৃথিবীর ধানের রস, নিস্তব্ধ নিস্পন্দ মৃত্তিকার থেকে জন্মে:
পৃথিবীর ধানের রসে কঠিনতা-ঈর্ষা-চিন্তা-বন্ধন-অতীত-ভবিষ্যৎ:
সৃষ্টির প্রথম পাণ্ডুলিপির মতো ঐ সমুদ্র
সৃষ্টির প্রথম ও শেষ পাণ্ডুলিপির মতো
শাদা ফেনা, রৌদ্র ও সিন্ধুশকুনের ধবল গন্ধে উষ্ণ, অবাধ, মৃত্যুহীন—

৪

আমার শৈশব কৈশোর যৌবন হারিয়ে গিয়েছে
আমি মানুষ—আমার ডানা নেই

আমি সামান্য পথচারী—আমার কণ্ঠে গান নেই
আজ এই সমুদ্রের পারে যৌবন ফিরে পেয়েছি আমি
পেয়েছি সমুদ্রের সীমাহীন কান্তার
পেয়েছি পক্ষীরাজের মতো পবনগতি সিন্ধুশকুনের বিদ্যুৎবল্গা আমার কিশোর হাতে
কণ্ঠে পেয়েছি উত্তর হাওয়ার গান।

৫

এর পর পৃথিবীতে ফিরে যাব যখন আমি
আমার উষ্ণ হৃদয়ের উল্লাসে মাটি চাষ করব আমি, বীজ বুনব
ক্ষেতের পথে পথে—পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায়
নারীকে উত্তপ্ত হৃদয়ের আঘাত দিয়ে ভালোবাসব
ভালোবাসাকে সমুদ্রের ঝংকারের মতো হৃদয়ের রক্তে গাঁথব আমি।

৬

ধূসর অতীতকে ধূসরতম ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে
এক সীমা–সময়হীন স্বপ্নের সমুদ্রকে আবিষ্কার করব আমি
নিঃশব্দ তরঙ্গের জানালায় এক স্বপ্নের সিন্ধুশকুনকে।

আনুষঙ্গিক কবিতা: 'শীত রাত'। ম হা পৃ থি বী।

কোকিল

চৈত্রের রাত চলেছে শাদা শাদা মেঘ, অনেক পাতা, অনেক নক্ষত্র নিয়ে
মানুষের হৃদয়ের ঘুমকে ফুলের মতো কুড়িয়ে
নিরুদ্দেশ বাতাসের সঙ্গে অনেক দূরে চলেছে সে—

শিশির নেই, কুয়াশা নেই আজ আর, নক্ষত্র তুষারের গুঁড়ি নয়
অশ্বত্থের শাখায় পেঁচাকে খুঁজে পাই না আর আমি
শীতের রাতে তার গানের ভিতর আর-এক রকম আস্বাদ ছিল—

আজ রাতে—উঁচু উঁচু চঞ্চল গাছ—প্রচুর ছায়া—সবুজ হাওয়ার রাতে
জামরুল বনে জেগে আছে কোকিল—পলাশের জানালায় উড়ে আসছে সে—
ঘুমাবে না সে—মৃত্যুকে সে চেনে না—আমরাও চিনি না মৃত্যুকে

তার সঙ্গে সঙ্গে—ঘাসের উপরে কৃষ্ণচূড়ার ছায়া দুলতে থাকে
রাত্রিকে নারীর অতলস্পর্শ স্নায়ু বলে মনে হয়—মনে হয় নির্জন কঠিন খোঁপা
কোনো প্রিয়তমা নারীর : কোকিলের গানে গানে একবার অজস্র এলোচুলের মতো
খসে পড়ছে আমার আকাঙ্ক্ষার মুখ ঢেকে—একবার ঝরাপাতার সাম্রাজ্যের ভিতর
নিরুদ্দেশ হাওয়ার সঙ্গে উড়ে উড়ে এই ধানসিড়ি নদীর তীর থেকে
চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে

এই বেদনা... কিন্তু তবুও কোকিলের গান অপেক্ষার অপার ঐশ্বর্য দানে

স্তিমিত হৃদয়কে উষ্ণ করে আবার তার সংহত নিটোল পথে ফিরিয়ে দেয় তাকে
সঙ্গে দিয়ে দেয় বেদনা ও অকুতোভয় আশা

কোনো এক অন্ধকারে কারু এক নগ্ন নির্জন হাত অবশেষে আমার হাতে এসে ঠেকবে
অন্ধকার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে কোনো এক দিন
অন্ধকার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে সেই এক দিন

এই আশার ক্ষতবিক্ষত আনন্দ কোকিলের গানে মৃত্যুকে চূর্ণ করে দেয়
বেদনাকে গোধূলির জাফরান সমুদ্রের মতো সুন্দর করে তোলে
উঁচু উঁচু গাছ—অন্ধকার—রাতের বাতাস ও প্রান্তরকে করে তোলে
মায়াবীর নদীর পারের দেশের মতো

পৃথিবীকে করে তোলে উঁচু উঁচু গাছ—অন্ধকার—প্রান্তর ও হাওয়ার মতো সুন্দর
এরা কোনো দিন ছিল না—কোনো দিন এই পৃথিবীতে ছিল না—
কোকিলের গানের ভিতর থেকে জন্মেছে আজ—
জন্মেছে এই অন্ধকার নরম পৃথিবী—উঁচু উঁচু গাছ—হাওয়া—সোনালি [illegible]ড়ের মাঠ—

জন্মেছে অন্ধকার আঁকাবাঁকা সিঁড়ি—উচ্চতার থেকে আরো দূরে উচ্চতার দিকে চলে গিয়েছে
চলে গেছে আকাশের বিস্তৃত নীল বসতলতার ভিতর
পৃথিবীতে মৃত এক নারীকে ঘিরে যেইখানে নক্ষত্রেরা মৃদু কণ্ঠে বলছে—

আনুষঙ্গিক কবিতা: 'ফুটপাথে'। ম হা পৃ থি বী।

ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি : এখন গভীর রাত
কবেকার কোন্ সে জীবন যেন টিটকারি দিয়ে যায়
'তুমি যেন রড ভাঙা ট্রাম এক—ডিপো নাই, মজুরির প্রয়োজন নাই
কখন এমন হলে হায়!'
আকাশের নক্ষত্রে পিছে অন্ধকারে
কবেকার কোন্ সে জীবন ডুবে যায়।

কোন্ দিকে যেতে হবে? নিস্তব্ধ শহর কিছু জানে নাকো
সে শুধু বিছায়ে আছে
বিশ্বাসীর বিধাতার মতো।

কোলে তার মুখ রাখি—বিশ্বাস করিতে চাই, তবু মনে হয়
শহরের পথ ছেড়ে কোনো দিকে হেঁটে যদি চলে যেত আমার হৃদয়

অজস্র গ্যাসের আলো গ্যাসের আলোর পিছে ডাকে
বিমর্ষ গলির ফাঁকে ফাঁকে
আঁধারের কাতর আকৃতি এসে ডেকে লয়

তাহাদের চিনি আমি—তারাও আমার মতো সব জানে; তাই এত অন্ধকার ক্লান্ত হিম

এই গলিগুলো।

তবু তারা পথ চলে নাকো—ঘুমের গভীরে ডুবে নক্ষত্রের তলে এক অবসর
পায় তারা
আমারে কে অবসর দেবে?
স্কোয়ারে ঘুমায় যারা নগ্ন হয়ে শীত রাতে কিম্বা ফুটপাথে
তাহাদের মতো ক'রে কথা কে ভুলিতে দেবে? কথা কে ভুলিতে দেবে?
আমারে ভুলিতে দেবে কথা?

গ্যাসের আলোর নদী অবিরল—এঁকেবেঁকে গিয়ে শেষে কোন্ পথে কোনো অভিজ্ঞতা
জানাতে যাবে না আর?

আনুসঙ্গিক কবিতা : 'মনোকণিকা'। ম হা পৃ থি বী : সংযোজন।

কোনো এক দার্শনিক বলেছিল: পৃথিবীর মানুষের প্রাণ
(অথবা জন্তুর প্রাণ) যাত্রীর মতন
এই জেনে পথ পেয়ে আমিও করেছি প্রাণপণ
পথ উৎরায়ে গিয়ে কোনো এক সুনির্দিষ্ট স্থান
অধিকার ক'রে নিতে—বলে গেল একজন সামান্য ভোটার
মাথাগুনতিতে তারও রয়েছে ভোটের অধিকার।

তবু আমি বারবার ভালোবেসে ভোট দেই যারে
অথবা তাহাকে শেষে ছেড়ে দিয়ে বীতশ্রদ্ধভাবে
যে কেউ খুরের 'পরে ভর দিয়ে—ভোট নিতে যখন দাঁড়াবে
সহচর যাত্রী ভেবে আমাদের জীবনের স্মরণীয়তাকে
ছেড়ে দেই তার কাছে—বাঘা তেঁতুলের সাথে মিশে থাকে তবু বুনো ওল;
ব্রহ্মাণ্ডের মতো গোল প্রপঞ্চ, সর্ষেবীজের মতো গোল।

'হাঁস'। সা ত টি তা রা র তি মি র। খসড়া।

১
জলের ভিতরে মেঘ দেখা গিয়েছিল।
আকাশে অনেক মেঘ—তবু
নদীটির প্রবীণ উদ্‌বেগ
তিনটি হাঁসে তরে—তবু।

যদিও হাঁসের কোনো মৃত্যু নেই, মেঘের মতন
সারা দিন জলে জলে করে গিয়েছিল প্রাণপণ।
তবুও বিকেল শেষ হয়ে গেলে শতাব্দীর শেষে
তিনটি নির্বাক হাঁস নিভে গেল একটি মোমের মতো এসে।

২
সেখানে তিনটি হাঁস সারা দিন খেলা করে জলে
তবুও অপর এক হাঁস কারু কাছে নাই ব'লে
যদিও বালুর ঘড়ি সারা দিন বেজে যায় রোদে
তবুও জলের 'পরে রৌদ্র শেষ হলে
তিনটি নাররীর মতো তিন জন হাঁস
নীরবে উঁচায়ে গলা স্থির হয ছায়ার পিছনে–
এরকম স্থিরতার ছবি দেখে বাদামি শেয়াল
কী যেন কী কথা ভেবে ডুবে যায় বনে।
রোদের সোনার রেখা পুকুরের কোণ থেকে উঠে
লেগে আছে দু মুহূর্ত গৃহিণীর গমের জাঁতায়
অনেক ধ্বস গম চাঁদের আলোয়—শান্তি—প্রেম—
হৃদযে চারটি হাঁস পরস্পর তিন হয়ে যায।

আনুষঙ্গিক লেখা : 'ক্ষেতে প্রান্তরে' ২। সা ত টি তা রা র তি মি র।

১৯১৪-১৯৪১

দুইটি বৃহৎ কুরুক্ষেত্র এই পৃথিবীর 'পরে
আধো অসমাপ্ত হয়ে মানুষের মনে
মিশে আছে আজ এই বিকেলের আলোর ভিতরে।
একটি কৃষক তার হৃদয়ের কঠিন স্পন্দনে

দাঁড়াযেছে এই কালে মহাসূর্যাস্তের মুখোমুখি।
শহবাহকের কাঁধে একজন বুর্জোয়ার মৃত্যু চলে যায়।
কোথাও কোকিল ক্লান্ত পিপুলের ফাঁক থেকে দিয়ে গেল উঁকি,
আধো অসমাপ্ত সব মহাসমাপ্তির শান্তি চায়।

'স্বভাব'। সা ত টি তা রা র তি মি র। পূর্ব-পাঠ।

দুর্দিন

যদিও আমার চোখে ঢের নদী জেগে যেত এক দিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হলে,
তবুও একটি নদী দেখা যেত শুধু তারপর;
কেবল একটি নারী খরগোশ কোলে
নদীর রেখার দিক লক্ষ্য করে চলে যায়;
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
শিল্পীর কাঁচিতে কাটা শাদা কাপড়ের
যেন এক মহিলার মূর্তি এসে পড়ে;
সমস্ত সূর্যের বড়ো বিভোর পরিধি

যেন তার নিজের জিনিস।
এত দিন পরে সেই ছবি ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ—
তা হলে সে স্মৃতি দেবে মোমের আলোকে,
হলুদ কাগজে মোড়া এই ম্লান দেয়ালের ঘরে;
একটি তরুণী যেন বহু দিন হয়
নিজেকে ছবিতে ছেঁটে—সূর্যের ভিতরে
ঢুকে গেছে—তারপর বার হতে ভুলে গেছে
সে ও তার নিরাবিল শাদা খরগোশ।
নদীরা যে নেই আজ পৃথিবীতে—সূর্য নেই—
সব এই জানুহীন সময়ের দোষ।

পাণ্ডুলিপিতে বিকল্প পাঠ।
ছত্র ১ : যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিল এক দিন
ছত্র ৫ : নদীর রেখার 'পরে লক্ষ্য ক'রে চ'লে
ছত্র ৭ : শিল্পীর কাঁচিতে কাটা কালো কাগজের
ছত্র ৯ : মনে হত– সমস্ত সূর্যের বড়ো তন্ময় পরিধি
ছত্র ১১ : এত দিন পরে সেই সব ফিরে পেতে
ছত্র ১৩ : তা হলে সে স্মৃতি দেবে মোমের আলোয়
ছত্র ১৫–১৭ : একটি মানুষ যেন বহু দিন হয়
নিজেকে কাঁচিতে কেটে সূর্যের ভিতরে
ঢুকে গিয়ে তারপর বার হতে ভুলে গেছে
ছত্র ১৯–২০ : নদীরা যে নেই আজ পৃথিবীতে—
সূর্য নেই— সে কেবল সময়ের দোষ।

আনুসঙ্গিক কবিতা : 'জুহু'। সা ত টি তা রা র তি মি র।

সোমেশ্বর মুস্তফী

সিন্ধুর ধবল তীরে একা বসে করোমণ্ডলের দীর্ঘ দুপুরবেলায়
সবার থলেব থেকে রুটি, টক, ডিম, ঝাল বার করে নিয়ে
শূন্যে সব ফিকে ফেলে দিয়ে গেল বালুকার উপরে দাঁড়িয়ে
মনে হল যেন এক সিন্ধুকাক এসব খাবার খেতে চায়
পৃথিবীর পরিধির মতো গোল চোখের বিরহে নষ্ট হয়ে
অথচ সেখানে কোনো সিন্ধুকাক ছিল নাকো—যত দূর ট্যুরিস্টের চোখ
চলে যায়—সোমেশ্বর মুস্তফীর প্রাণে তবু প্রতীকের মতো ডানা, বিষণ্ন পালক
নেমে এল—সূর্যের শরীরে কালো সান্স্পট-বিম্ব রেখে দিয়ে
নীলাভ গগল্ আঁটা কোনো এক ওয়েল্স্ মহিলা
সমুদ্রের পারে ওই যুবককে চিমনির মতো কালো মেসায়ার মতো
একাকী দাঁড়াতে দেখে—ভেসে এল বড়ো রৌদ্রে স্থির—রবাহূত
প্লোভার পাখির হর্ষে—তাহার চারটি ছেলে এক টন ডিম, কেক, মার্মালেডে অজগর লীলা

বালিতে চালাতেছিল—ঠেলাগাড়ি, আয়া বেয়ারার ভিড়, দড়ি, তার্পুলিন
মলয়ালী যাদুকর, তামূল রঙের জিপসি ভবঘুরে-পিষ্ট ঔপনিবেশিক
গোয়ানিজ বাবুর্চিরা—টোমাটোর মতো লাল গালের মালিক
অসংখ্য পুরুষ নারী দেখা দিলে খোসা ছেঁড়া পিঁয়াজের মতন নবীন
তাদের হৃদয় সব শাদা সমুদ্রের কূলে জ্যৈষ্ঠের আলোকে
মক্ষিকার মতো যেন গুঞ্জরণ সর্বদাই—কোথাও নতুন সম্ভাবনা
এখুনি সাধিত হবে বলে তারা ক্যাম্পে আর বনে ছুটে ধনাত্মক বিদ্যুতের কণা
কেবলই ছুঁড়িতে আছে মুস্তফীর কালো গোল অন্ধকার পরিপৃক্ত চোখে।

২

অবনী পালিতের মৃত্যু

ভূমধ্যসাগরপারে কবে যে সে গিয়েছিল—কোনো এক বৈশাখের ভোরে
ইটালির কিছু কম গরিমার সচ্ছল জাহাজে চড়ে খালাসির বেশে
বন্ধুরা জানে নি কেউ—গুহার ভিতর থেকে গ্যানেট যখন নিরুদ্দেশে
উড়ে যায়—সবের বিস্মিত চোখে নিজেকে সে সেরকম করে
উড়ায়ে অনেক দূর নিয়ে গেল (ভেবেছিল হয়তো বা)—তবু তাকে
দেখে নিকো কেউ দেখিতে চায় নি কেউ—হাঁড়ির ভিতরে
মুখ দিতে গিয়ে বিড়ালের চোখে ঘুম আসে
তার কথা মনে হলে—অতএব বোম্বাইয়ের শূন্য টার্মিনাসে
পিছনে সে রেখে গেল একান্ত জিরোর মতো ঢেউ
বিশ্রী এক চিত্রকর—স্কুলহীন—নিষ্প্রাণ গল্পিক অনর্গল
জাহাজের দুলুনিতে যখন চতুর্দিকে নক্ষত্রের নীলাভ সিলিঙ্‌
কেঁপেছিল—চুলের ভিতরে তার জেগেছিল ছাগলের শিঙ
দু কাঁধে দুইটি ডানা যখন সে চেয়েছিল সারসের মতন নির্থল
কোনো এক কেবিনের নিটোল বার্টুলিকাটা পাথরের মতো মুখ দেখে
খালাসির রসাতলে সারা রাত আকস্মিক ভূতের মতন
অবিশ্বাস করেছিল নিজের এমন নিচে নিরয়ে গমন
অগণন লস্করেরা এরকম হিরন্ময় আগুনের প্রবাহের থেকে
 কী করে প্রসূত হয় নরকের শূকরের মতো কালিমায়
এ সব সে ভেবেছিল এক দিন.... ভূমধ্যসাগরপারে আজ এই ভোরের আলোকে
সে সব সে ভুলেছিল... তবুও একটি ছবি এঁকে দিতে গিয়ে তার চোখে
সহসা আঞ্জনি এল... এবং তিনটি মাছি—নাকের ডাঁশায়
থলের খাবারে মৃত বাবুর্চির আবির্ভাব—সাগরের সক্রিয় বাতাসে
রিরংসাকে শাদা বিড়ালের [মতো] মনে হল কাঁধের ওপরে
অনেক পুরুষ, নারী, কুকুর ও রৌদ্রের জয়জয়কারে
মানে বা মোনে-র মতো শিল্পীকে মরে গেছে দেখে খুন-খুন হয়ে হাসে
পাললিক মৃত্তিকার চিত্রকর মরে যায় দেখে...

'রবীন্দ্রনাথ'। অ ন্যা ন্য ক বি তা, দ্র পৃ ৫৩১, ৫৩৭, ৫৪০, ৬৩২।

রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীর কোলাহল সব ফুরিয়ে গেছে
সেই শেষ ঘুম এসেছে নক্ষত্রের ভিড়ে
 এখুনি তাদের আলো নিভে যাবে।
পড়ে থাকবে অন্ধকার নিস্তব্ধ চরাচর
পড়ে থাকবে ভালোবাসার চিরকাল
সেই হিম অন্ধকারের শান্তির ভিতর
 বিধাতার হাতের কাজ ফুরিয়ে যাবে।
সেই শেষ ঘুম এসেছে নক্ষত্রের ভিড়ে
 সেই শেষ ঘুম।

'পাখিরা'। ধূসর পাণ্ডুলিপি। খসড়া।

আজ এই হেমন্তের প্রশ্নময় রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে।
নতুন নক্ষত্র তুমি চাও কি ধরাতে

পুরোনো সৃষ্টির ক্লান্ত ধূসর আকাশে?
সে নক্ষত্র ডিম তবে—পাখির সকাশে?
ঘাস বুঝি?—মৃত্তিকার শান্তি ভালোবাসে।

আকাশ ঘুমায়ে আছে আকাশে আকাশে
ডিমেরা ঘুমায়ে আছে পাখির সকাশে,
ঘাস তার মৃত্তিকার শান্তি ভালোবাসে।

'পাখিরা' ও ধূসর পাণ্ডুলিপি র আরো কোনো কোনো লেখার বিমিশ্র খসড়া।

কোনো স্বর্গ, কোনো এক নরকের থেকে
 আমি তারে ডাকিলাম কাছে
কোনো এক ডাইনীর আয়নায় হঠাৎ তাহার মুখ দেখা দিল তাই
 চিনিলাম—এই সেই
 তোমার নিজের ঘ্রাণে আবার দাঁড়ালে তুমি কাছে
মৃগীর মুখের রূপে যেমন আবিষ্ট হয় চিতা
 বনের গভীর পথে—জ্যোৎস্নায়
 মুগ্ধ হয়ে রহিলাম।

 তুমি–আমি অই রূপকথার ভিতরে
 এক রাত এক দিন কাটায়েছি শুধু

জীবন অক্লান্ত ছিল আমাদের সে সময়ে
ডাইনীর আয়নায় চোখ তুলে যখনই তোমারে আমি ডাকিতাম
আমার নিকটে এসে বলে যেতে—'এই আমি, এই আমি আছি'
কোথাও অনেক দূরে চলে গিয়ে হঠাৎ আমার কথা মনে হলে
মুহূর্তে আসিতে তুমি কাছে
(ডাইনীর কার্পেটে চ'ড়ে)
সে সময় দিনে রাতে যত বার গিয়েছি মরিয়া
সেই—সেই—পুরোনো সে ডাইনীর ওষুধ পেয়েছ তুমি তত বার
তত বার বাঁচায়েছ
জেগে উঠে পেয়েছি দুধের ঘ্রাণ আমি
তোমার বুকের থেকে ঝরিতেছে।

এই সব মনে হল বসন্তের রাতের বাতাসে
পাখির বোনের নীড়ে এখন নীড়ের জন্ম হবে
তাই তারা দলে দলে আসিতেছে
মেরুর পাহাড় ছেড়ে
আফ্রিকার বন থেকে
নিস্ফল আড়ষ্ট মাঠপ্রান্তরের
মিছে কথা পিছে ফেলে রেখে
সমুদ্রের ফেনার ভিতর দিযে ভেসে
মৃত্যুর দাঁতের সাথে খেলা ক'রে
উৎসাহে-সাহসে তবু
নতুন নক্ষত্রে এই—আমাদের বসন্তের রাতে
তাদের ডিমের জন্ম দিতে

কোনো পাখি পিছে পড়ে নাই আজ
কেউ আজ অপেক্ষায় নাই
সকলের সময় এসেছে
প্রেমের সময়,
অনেক বিস্ময়ে আমি ভাবিলাম
তাহার অন্তরে ডিম জন্মিবে না কি!

ক্ষেত্রের ভিতর থেকে শস্য কেটে লয়ে গেছে চাষা
তবুও ফারো-র ফাঁকে ফাঁকে
অসংখ্য ধানের সোনা পড়ে আছে
সে সবের দিকে চেয়ে আহ্লাদ কি হবে না তাহার?
নীড় বাঁধিবার সাধ হবে না কি?
নীড়ে থেকে আজ এই বসন্তের রাতে
রোমহর্ষ হবে না কি—
সে এক প্রথম ডিম রক্তে তার আসিতেছে ব'লে?

আজ আমি সে মায়াবী নই—
ডাইনীর আয়না সে নাই আজ

ডাইনী মরিয়া গেছে
জাদুর প্রথম কথা, শেষ কথা, ভুলে গেছি আমি সব
(সামান্য মানুষ হয়ে গেছি)

আমার ঘুমের চোখে সে আমারে দেখা দিল,
আমি তারে বলিলাম;
বাইজেনটিয়ামে—রোমে—তুমি যেন কোনো এক জানালায় ছিলে
অনেক পায়রা লয়ে কোনো এক অলিন্দেতে ছিলে না কি
নীল, লাল, মসলিন্ পর্দা সরায়ে
অসংখ্য বিষণ্ন বার্ড-ব্যালাডের জন্ম তুমি দিয়েছিলে না কি?
তোমার বাগানে সেই গোলাপের রঙ ছিল ননীর মতন—
লাল নয়—
তোমার মুখের রূপ গাঢ় হয়ে উঠেছিল তবু সব প্রেমিকের বিমর্ষ প্যাশনে
(মনে পড়ে উজ্জয়িনী, অবন্তী, বিদিশা—)
তবুও আবার মনে পড়ে
আরো গাঢ় হয়ে
বাংলার পূর্ব দিকে
পদ্মার ওপারে
অনেক জলের রাতে তারাবনে—তারাবনে চলেছিলে তুমি—
মানুষ ঘুমায়ে থাকে বলে এই পৃথিবীতে তখন জাদুর সৃষ্টি হয়
তোমার মুখের মতো রূপ শুধু জন্ম লয় সে সময়ে
সেই প্রেম—সেই সাধ—সেই স্বপ্ন—আবেগের জন্ম হয়
আমরা দেখি না তাহা
হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে বুঝি
তবু তুমি আমারে দেখায়েছিলে সব—
দুপুরে মেঘের অন্ধকারে
ভিজে বাতাসের হাতে কেঁপে উঠে
বাজকুড়ুলের শব্দে বাদলের ভোরে
মনে পড়ে সব

আজ এই বসন্তের রাতে
সিন্ধুর উপর দিয়ে বিদেশের পাখি সব
আসিতেছে আমাদের দেশে
তাদের প্রথম ডিম জন্মিতেছে
তোমারে খুঁজেছি আমি তাই
মেয়েলোক, আছো তুমি নাকি?

ঘুমের ভিতর দিয়ে তারে আমি শুনিলাম :
'সত্য হয়ে আছি আমি।'

জেগে দেখি সে দাঁড়ায়ে আছে
বলিতেছে, 'আমি আছি।'
আমার হতাশা-পীড়া-অবসাদ-বিহ্বলতা দেখে

বিমর্ষ সে হয়ে গেছে
গভীর আঘাত এক মুখে তার লেগে আছে যেন
আমার সন্দেহে-প্রশ্নে—
ডাইনীর মন্ত্র সব ঝরে গেছে সব দিকে
· আমার মায়ার কৌটা হারায়েছি
সাহসে আশ্বাসে তবু হৃদয় ভরিয়া গেল সেই দিন
প্রেম যেন ডাইনীর আয়নার মতো
(কিংবা তারও চেয়ে তার শক্তি বেশি)
সেই দিন মনে হল
তোমারে নিকটে পেয়ে—তোমার মুখের দিকে চেয়ে
তোমার আঘ্রাণে স্বাদে বেঁচে থেকে
তোমারে ডিমের মতো জেনে
বসন্তের রাত সেই অন্ধকারে মিশে গেল—আহা,
পাখিরা চলিয়া গেল সমুদ্রের ওপারের বরফে—ব্লিজার্ডে—
নিস্পৃহতা খুঁজে
অনেক গোলাপি, শাদা, নীল ডিম ভেঙে পড়ে গেল,
অনেক পাখির ছানা মরে গেল বিছানায়
অনেক পাখির মাতা প্রতারিত হয়ে গেল,
অনেক পাখির পিতা বিষণ্ন-বিমর্ষ হল,
হৃদয কঠিন হল দিকে দিকে—
আমি তারে বলিলাম—মেয়েলোক, আছো তুমি নাকি?
ঘুমের ভিতর দিয়ে শুনিলাম—'আছি আমি।'
কী এক শূন্যতা তবু অন্ধকারে জেগে থেকে হৃদয়েরে ধরে নিল,
প্রশ্ন শুধু বেঁচে রল
অশ্রান্ত সন্দেহ এক শকুনের ঠোঁটের মতন
কোথাও আমারে যেন তাড়া করে আসে
কেউ এসে বাধা আর দেয় নাকো
যাহার পায়ের শব্দ শুনে
ম্যাগপাই সব চেয়ে আগে উড়ে যেত
কোথায় কাহার তরে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েছে সে চলে
অনেক বিস্মিত হয়ে ভাবি আমি।
কোন্ সে পাখির
তাহার পাখায় আজ বর্ণ ধরিয়াছে?
মিলনের দিন আসিয়াছে
কার সাথে তার?
কোন্ দিকে?
হাড়ের মতন শাদা গাছের ডালের ফাঁকে যেইখানে চাঁদ
সোনার ডিমের মতো ঝুলিতেছে
বিকালের আঁধারের প্রথম বাতাসে
সেই স্বপ্ন—ম্যাজিকের দেশে
রয়েছে সে—
(তাহার ভিতরে ডিম আসিতেছে—আসিতেছে—সেইখানে)

এইখানে শীতের বাতাসে
দাঁতে দাঁতে খিল ধরে যায়
মুখের ভিতর থেকে কড়ু কড়ু কড়ু কড়ু শব্দ হয়
মড়ার খুলির মতো আমার নিজের মাথা নাকি?
কবরের ভিতরে কি শুয়ে আছি
ভ্যাম্পায়ারের মতো?

কিছু নয়—কিছু নয়—কিছু নয়—নয়—
আমার এ মধুর হৃদয়
নরম—গভীর—
যখন আঁধারে মশা নেমে আসে গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
ছাগলছানার নাচ থেমেছে নদীর ধারে ঘাসে
আবার তাহারে গিয়ে প্রশ্ন করে
ভেবে লয় সে আজও আমারে ভালোবাসে
অনেক কবিতা লেখে তার নামে
তাহার হাতের লেখা সেই সব চিঠির বাতাসে
আবহাওয়া সৃষ্টি হয়
ভালোবাসা ফুলে ওঠে আকাশের নক্ষত্রের নিয়মের প্রতি
সে এক অতল সত্য আবিষ্কার করি আমি অন্ধকারে
একজন ছোটো মেয়ে এক দিন যেই সত্য তার মুখে বলেছিল
তাহার আশ্চর্য জোর লক্ষ করি
আশ্বাসে-সাহসে-প্রেমে নক্ষত্রের মতো হয়ে
আমি তারে বলি গিয়ে, মেয়েলোক আছো তুমি নাকি?
'আছি আমি, আমি—আমি আছি',
স্বপ্নের ভিতর দিয়ে শোনা যায়।

'মৃত্যুর আগে'। ধূসর পাণ্ডুলিপি। সাময়িকপত্রের পাঠ।

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ-সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর কোলে নিমগ্ন দেউল,
দেখিযাছি নদীটিরে: ম্লান বাঁকা নিস্তব্ধতা চোখে দেখা যায়
যত দূর : আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকীতে ভরে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিযরে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ— কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীতরাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার:
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারাল।
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ; মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আস্বাদে ভরা; অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক;

আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনো হাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্খায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
শুকনো গুঁড়ির 'পরে চৈত্রের দুপুরে বেজী করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিযাছে খুদ,
চাল-ধোয়া গন্ধ পেয়ে ঘাটে এসে মাছগুলো ভিড়েছে দু বেলা,
শামু গুল্‌লি ভরা পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
শুনেছে ঘরের ডাক— মেয়েলি হাতের স্পর্শ লযে গেছে তারে;

দেখেছি ভোরের আলো খেজুরগুঁড়ির 'পরে দোয়েলেরে ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুইয়ের ডিমগুলে মুখ গুঁজে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ— বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্খায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নীচে লাল লাল ফল
পড়ে আছে; নিঃসহায় রাঙা মাঠ নেমে গেছে নদীর ভিতরে;
কাঁচপোকা-টিপ্ প'রে গেঁয়ো মেয়েটির মুখ হয়েছে উজ্জ্বল;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে;
আমবা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ
প্রতি দিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হলে পর
একটিও নম্র মুখ কাছে এসে অন্ধকারে আন্তরিক কথা
কযে গেছে; আমরা বুঝেছি যারা পৃথিবীর আলোর ভিতর
পথে পথে মেঘলা দিনের মতো রয়ে গেছে মুগ্ধ সজলতা;
সোঁদা ভিজে ধূলো, মাঠ-কলমীর ঘন দাম, ডাহুকের নীড়,
ভাঙা মন্দিরের ইঁট, শাদা শাঁখা, স্নিগ্ধ হাত, ঘাসের শরীব;

আমবা মৃত্যুর আগে কী বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
মৃত্যু এসে এক দিন মৃদু কীট জীর্ণ প্রজাপতিটির আগে
রুক্ষ হাতে ভেঙে দেবে পৃথিবীর পথে পথে ছড়ায়েছি যাহা
রঙিন ডানার ভরে একদিন ফড়িঙের মতো অনুরাগে;
কী বুঝিতে চাই আর।... রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখালির ডাক
শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!

'বনলতা সেন'। ব ন ল তা সে ন। খসড়া।

শেষ হল জীবনের সব লেনদেন,
বনলতা সেন।

কোথায় গিয়েছ তুমি আজ এই বেলা
মাছরাঙা ভোলে নি তো দুপুরের খেলা
শালিখ করে না তার নীড় অবহেলা
উচ্ছ্বাসে নদীর ঢেউ হয়েছে সফেন,
তুমি নাই বনলতা সেন।

তোমার মতন কেউ ছিল কি কোথাও?
কেন যে সবের আগে তুমি চলে যাও।
কেন যে সবের আগে তুমি
পৃথিবীকে করে গেলে শূন্য মরুভূমি
(কেন যে সবার আগে তুমি)
ছিঁড়ে গেলে কুহকের ঝিলমিল টানা ও পোড়েন,
কবেকার বনলতা সেন।

কত যে আসবে সন্ধ্যা প্রান্তরে আকাশে,
কত যে ঘুমিয়ে রব বস্তির পাশে,
কত যে চমকে জেগে উঠব বাতাসে,
হিজল জামের বনে থেমেছে ষ্টেশনে বুঝি রাত্রির ট্রেন,
নিশুথির বনলতা সেন।

'ধান কাটা হয়ে গেছে'। ব ন ল তা সে ন। পাণ্ডুলিপির পাঠ

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন— মাঠে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম— সাপের খোলস খড় শীত—
এই সব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ কেমন নিভৃত।

ঐখানে একজন শুয়ে আছে — দিনরাত দেখা হত কত কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ।
শান্তি তবু, আজ তারে ঢেকে আছে গভীর সবুজ তৃণ
নাই তার— নাই আর চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

বনলতা সেন' 'হাজার বছর শুধু খেলা করে'। পূর্ব পাঠ।

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো
চারি দিকে চিরদিন রাত্রির বিধান;
বালির উপরে জ্যোৎস্না— দেবদারু ছায়া ইতস্তত.

বিচূর্ণ থামের মতো: দ্বারকার— দাঁড়ায়ে রয়েছে নত, ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের— সূচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' শুধাল সে— শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'

'পথ হাঁটা'। ব ন ল তা সে ন। খসড়া।

রেনকোট কাঁধে রেখে শহরের রাস্তায় কত বার নেমেছি যে রাতে
কত যে গভীর রাত হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে
কেবল গিয়েছি চলে পিছল পথের থেকে আরো দূর অন্ধকার পথে
গলির ঘুঁজির ফাঁকে—ডাস্টবিন ইঁদুরের বিড়ালের আড়ষ্ট জগতে
কত যে গভীর রাতে রাতে
হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে—

হাইড্রেন্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী ধুয়েছে নীরবে ক্লেদ শরীরে তাহার
গ্যাসের আলোর দিকে চেয়ে আছে ঘোলা চোখ হিম কাঠ মৃতবৎসার
লেড়িকুকুরের ক্ষুধা পথ থেকে পথে পথে মিটে যায় ট্যাক্সির নীচে
চেয়ে দেখি চূর্ণ তার দাঁত মুখ নিঃসহায় নক্ষত্রের দিকে আছে খিঁচে
হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে—

অবসন্ন ট্রাম বাস্ কলের পৃথিবী সব তখন গিয়েছে চলে ঘরে
তবুও মানুষ—সে যে কল নয়—পথ থেকে আরো দূর পথের ভিতরে
একা একা চলে যায়—যত দূর স্তব্ধ এই শহরের গ্যাসপোস্ট জ্বলে
কী যেন কিসের তরে হাঁটিয়াছি—হেঁটে হেঁটে একদিন ক্লান্ত হব বলে
কত যে গভীর রাতে রাতে
হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে—
তবু কোন ক্লান্তি নাই—কী যে চাই গাঢ় রাত্রে মিনোটায় মিনারের পাশে
একেলা দাঁড়াই গিয়ে—নক্ষত্রেরা মুখোমুখি দাঁড়ায়েছে কঠিন আকাশে
বাতাসে ভাসিয়া আসে ধুলো খড় হিম হাওয়া এককোঁটা-আধফোঁটা জল
আমারে কে ডাকে যেন—কেউ নাই; হাওয়া শুধু কথা কয় কেমন বিহ্বল—
হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে—

চুরুট জ্বালাই চুপে; এখন কত যে রাত—আকাশ ভরেছে ছেঁড়া মেঘে
সারা রাত জলে জলে ভিজে ফিরি... প্রণয়িনী ডাহুকীর মতন আবেগে
কার সাথে প্রেম তবু? কে বা সেই? কারে আমি ভালোবাসি নক্ষত্রের তলে!
বেবিলনে তারে আমি দেখিয়াছি— আজও তার লাগি আমি ভিজি জলে জলে—
কত যে গভীর রাতে রাতে
হেঁটেছি হেঁটেছি শুধু স্তব্ধ গ্যাসপোস্টদের সাথে—

'পথ হাঁটা'। ব ন ল তা সে ন। পাণ্ডুলিপির পাঠ।

ছত্র ৬ : চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে ভেলভেট আকাশের তলে।
ছত্র ৯ : নির্জনে ঘিরেছে এসে— তবু আমি কোনো দিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব
ছত্র ১১ : চোখ নীচে নেমে যায়— সিগারেট ধীরে জ্বলে— বাতাসে অনেক ধুলো খড়

'সিন্ধুসারস'। ম হা পৃ থি বী। সাময়িকপত্র ও প্রথম সংস্করণের পাঠ।

সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস!
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারান্‌টেলো— রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীর আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান
সে সিন্ধুসারস,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বা; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে—আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জান কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
হে সিন্ধুসারস,
অনেক সোনার ধান ঝরে গেছে জান না কি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে— হারায়েছি আনন্দের গতি
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান— এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের— বেদনার আমরা সন্তান?

জানি না কি ওগো পাখি, শাদা, পাখি, ওগো নীল মালাবার ফেনার সন্তান!
হে সিন্ধুসারস,
তুমি পিছে চাহ নাকো, তোমার অতীত নাই, স্মৃতি নাই, বুকে নাই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নাই শীত রাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নাই তব; নাই নিম্নভূমি, নাই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দেখ নি তো— পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
হে সিন্ধুসারস,
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার —ম্লান চুল— চোখ তার হিজল বনের মতো কালো;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে;— তুমি স্বপ্ন দেখ নাকো— যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
হে সিন্ধুসারস,
মাছি আর; হলুদ পাতার গন্ধে ভরে ওঠে অবিচল শালিখের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে— সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন

মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে;
সেখানে আকাশে কেউ নাই আর, নাই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুই সেই নিস্তব্ধতা চেন নাকো; অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
সে সিন্ধুসারস,
জান নাকো আজও কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের— ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন!

এই সব জান নাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে
হে সিন্ধুসারস,
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে!
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি— জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে
হে সিন্ধুসারস,
বিষণ্ন পৃথিবী ছেড়ে দলে দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে— দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে!
শীতার্ত এ পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে!

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর— পৃথিবীর নরম অঘ্রান
হে সিন্ধুসারস,
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই; আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ— বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
তুমি তাহা কোনো দিন জানিবে না; সমুদ্রের নীল জানালায়
আমারই শৈশব আজ আমারেই আনন্দ জানায়।

'ইহাদেরই কানে'। ম হা পৃ থি বী। খসড়া।

নক্ষত্রের আলোয় গা বিছিয়ে দিয়ে
ঘাসের স্পর্শের ভিতর কবিতা লিখলাম

দরিদ্র শীর্ণস্তন নারীর আর-একখানা ঝিলমিল কাঁথা তৈরি করবার মতো লালসায়
কবিতা লিখে গেল যুবকের দল

যাদের সৌন্দর্য নদীর জলে ধূসর প্রাসাদের আবছায়ার মতো,
যাদের হৃদয় তেমনি অস্পষ্ট—নিরুত্তর—বিপরীত—

যারা এই পৃথিবীতে কোনো দিন জন্মায় নি
সেই সব সুদূর পালঙ্কের ঘুমন্তদের আঘাত করবার জন্য

মৃত পাখি তার দেহের সমস্ত নিস্তব্ধতাকে যেমন করে আঘাত করে।

'ইহাদেরই কানে'। ম হা পৃ থি বী। মূল পাণ্ডুলিপিতে বিকল্প পাঠ।

ছত্র ৫ 'সোনার পিত্তল মূর্তি' স্থানে 'ঘুমন্ত পাথর মূর্তি'।

'আকাশলীনা'। সাতটি তারার তিমির। সাময়িকপত্রের পাঠ।
কবিতা-নাম: 'আকাশলীনা' স্থানে 'ও হৈমন্তিকী!'
ছত্র ১, ছত্র ৩ ও ছত্র ১৩ : 'সুরঞ্জনা' স্থানে 'হৈমন্তিকী'।

'সমারূঢ়'। সা ত টি তা রা র তি মি র। খসড়া।

তারপর তারা তাদের জীবনের সমস্ত শূন্যতা—বিষম শূন্যতার কথা ভুলে যায়
কোনো এক মৃত কবির পাণ্ডুলিপির কাছে ধূসর আলো জ্বেলে ব'সে
লাল কালি, নীল–লাল পেন্সিল, অভিধান, টিকাটিপ্পনীর দারুণ ক্লান্তি চলে শেষ রাত পর্যন্ত
সারা রাত হন্যে শকুনের মতো এদের কালো ছায়া দেয়ালে দেয়ালে লড়তে থাকে
এদের এরকম জান্তব বেদনা দেবার জন্য তুমি কবিতা লিখেছিলে? কবি?

কোথায় সেই সুন্দরীরা যাদের উদ্দেশে কবিতা লিখেছিলে তুমি?
তোমার কবিতা যাদের কাছে কঠিন মেঘপাহাড়ের মতো মনে হত?
বিচ্ছিন্ন, দূর, দানবীয়।
আহা, তাদের আজ দাঁত নেই—চোখে পিচুটি, ঘুম,
(ধূসর সিন্দুকের মতো) তাদের অবিরল মাংস দিকে দিকে হাঁ করে পড়ে রয়েছে
তুমি তোমার কবিতা লিখেছিলে?

মৃত রূপসীর বসার ভিতরে অজস্র কৃমির মতো
তোমার কবিতা অনেক পণ্ডিতের জন্ম দিল
জন্ম দিল আরো অনেক পাণ্ডিত্যের—অধ্যাপকের—অধাপকদের বেতনের,
সংসার–সমাজের এই সব শাশ্বত ব্যবস্থার জন্ম দিল।

'সমারূঢ়'। সাতটি তারার তিমির। পাণ্ডুলিপির পাঠ।

ছত্র ২ 'বলিলাম ম্লান হেসে' স্থানে 'বলিলাম রূঢ় আমি'।
ছত্র ১০ 'হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি' স্থানে 'নিরাশার স্বপ্ন থেকে উঠেছিল ফুটি'।

সপ্তক। সা ত টি তা রা র তি মি র। পাণ্ডুলিপির পাঠ।
ছত্র ৪ 'পাখিদের' স্থানে 'বেলুনেরা'। 'ফানুসেব'.এই দুটি বিকল্প পাঠ।

কেন লিখি

জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা কি সম্ভব? কবির অভিজ্ঞতা যা আকাশ পাতাল সমস্তই উপলব্ধি করে নিতে চায় তাও তো মানবীয়। অবশ্য এ রকম কবি আছেন—বা কাব্যনিয়তির পথে এমন সব মুহূর্ত মাঝে মাঝে এসে পড়ে যখন মনে হয় কবির ভাবনাপ্রতিভা এমন এক অপরূপ অপ্রশান্তির আস্বাদ পেয়েছে যা জীবনের কোনো ব্যবহারের ভিতরেই ধরা পড়ে না, জীবনের প্রতিবিম্বও নয়, আমাদের এই ইতিহাসসম্মত জীবন ছাড়িয়ে কবিমানসের কোনো অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চলে গিয়েছে। কোনো কবি যদি এ রকম মনে করেন তা হলে বুঝতে হবে যে তিনি কালকের বা আজকের নিত্যব্যবহার্য সমাজপদ্ধতির বাইরে কোনো কিছুর কথা ভাবছেন, কিন্তু তবুও জীবনের বাইরে কোথাও চলে যেতে পারেন নি। কারণ জীবন,—এই জীবনের পদ্ধতি যে কোনো সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়ো, এরই ভিতরে মানুষের সমবায়-ব্যবস্থা বারবার ভেঙে যাচ্ছে ও নতুনভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রহের জীবনসাক্ষ্যের সবচেয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ; কোনো বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অন্য রূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন; তার কল্পনাপ্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিংবা নতুনভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এই সব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়।

যাঁরা মনে করেন কবিতা যে-কোনো সময়ে সৃষ্ট হতে পারে কারণ কবিতা সমীচীন গদ্য বা ভূয়োদর্শী সম্পাদকীয় মন্তব্যের মতোই,—কবিতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অন্য রকম হবে। তাঁদের মতে হয়তো মানুষের ভূয়োদর্শী মনই কবিতা রচনা করে যেতে পারবে—গদ্যে কি পদ্যে, এবং সে কবিতার ভাষা ও অর্থে কোনো দিব্য ইঙ্গিত বা দিব্যতার স্পর্শ থাকবে না, কিংবা থাকা অবান্তর, বা অপরাধ।

থাকা অপরাধ। তাঁদের কারু হয়তো এই মত। অনেক স্থলেই তাই দেখেছি সৎ সম্পাদকীয় উক্তিই যেন কবিতা। কিন্তু কবিতা বাস্তবিকই কি তাই? যে-কোনো সুস্থ ও সমীচীন মানস অসুস্থ বা অন্যবিধ সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উক্ত রকমের মন্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন,—এবং অহরহ করে যেতে পারেন। এর জন্য আত্মভ্রষ্ট হৃদয়াবেগ ও কল্পনাপ্রতিভাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার মতো কোনো বিশেষ সুযোগ বা প্রতীক্ষার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ তাঁদের মতে কাব্য রচনা সম্পর্কে ভাবনাপ্রতিভা ও হৃদযাবেগেব কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কবিতা লেখার কাজ খুব উন্নতভাবে সম্পন্ন করবার পক্ষে রচয়িতার সচেতন জীবনদর্শী মন ও সেই মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করবার মতো লিপিকুশলতাই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুটো জিনিসের উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্যে যে সুলিপি প্রবর্তিত হয কবিতা কি তা ছাড়া অন্য কিছু? আমার মনে হয়, এই সুলিপি সত্যই খুব ভালো জিনিস। কিন্তু সুসমাচারের মতো এই সুলিপি—এই সমস্ত জিনিসকেই অবান্তর করে দিযে কবিতা নিজের চরিত্রবলে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। পূর্বজ কবিরা একে মনে করতেন মায়াবল। অতটা সাহস আমার নেই। আমি একে কবিতার চরিত্রবল বলে অভিহিত করেছি। যে কোনো রচনাসৌষ্ঠবকে অপ্রাসঙ্গিকতায পরিণত ক'রে দু-একটা লাইন. কয়েকটি লাইন কিম্বা সম্পূর্ণ একটি জিনিস অবিসংবাদীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে কবিতা হয।

কবিতার সংজ্ঞা ও কবিতা পাঠ সম্পর্কে ধারণার স্পষ্টতা লেখক ও পাঠক উভয় শ্রেণীর ভিতরেই সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে এ আশা স্পষ্টভাবে পোষণ করবার মতো কোনো উৎসাহ অভিজ্ঞ মানবের হৃদয়ে আজ হয়তো নেই। কিন্তু সে আশা যাতে চিরকালই ছলনার মতো না থেকে যায় সে জন্য আধুনিক লেখকেরা আবার অবহিত হয়ে উঠছেন।

লেখক হিসেবে আমিও অবহিত হয়তো, কিন্তু অসমর্থ। আমার সৃষ্টিপন্থাও সূর্য ও তপতীকে আশ্রয় ক'রে; হয়তো তপতীকেই অবলম্বন করেছি বেশি—কোনো এক ভবিষ্যতে বিশেষ করে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য। কবিতা কী,—কী তার কাজ,—কী করে কবিতা গ্রহণ করতে :ব,—এই

সব জিজ্ঞাসা সম্পর্কে কবি ও পাঠকের ধারণা ক্রমশই আরো পরিচ্ছন্ন না হলে উভয় পক্ষই অস্বস্তি বোধ করবেন। আমার এবং যাদের আমি জীবনের পরিজন মনে করি তাদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে, জ্ঞানময় করবার প্রয়াস পাই এই কথাটি প্রচার ক'রে যে জীবন নিয়েই কবিতা; যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত করে চলেছে তা হলে সে ধারণা ঠিক হবে না।

কবিতার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণমানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভযাবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে; আমাদের হৃদয়, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো (ভেবে নেওয়া যাক) উপস্থিত হয়; আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বতোভাবে সব কথা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে; আমাদের ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়; অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তরভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে।

এই করে। এবং এই সমস্ত করে বলেই আমাদের গতিপরিণতির কাহিনী নিয়েই কবিতা; পরিণতিশীল জীবনকে পূর্বোক্ত উপায়ে সজাগ ও শালীন করে তুলবার ভার কবিতার উপর।

কিন্তু তবুও কবিতার উপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারু নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবিমানসের ভিতর, কিম্বা তার সৃষ্ট কবিতায়। অথচ সৎ কবিতা খোলাখুলিভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা। মহৎ কবির ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক (আশা করা যেতে পারে), অভিজ্ঞতা সজাগ ও চেতনা অবচেতনা ঐকান্তিকভাবে সক্রিয থাকার দরুণ ব্যবহারিক পৃথিবীতে এ রকম মানুষের কাছ থেকে জীবনের উন্নতিশীল ভাঙাগড়ার কাজে শুভ ও সার্থক আত্মনিয়োগ দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রাযই দেখা যায় কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির ভিতরেই তিনি ঢের বেশি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়—এমন কি অধিকতর মহৎ—বাস্তব কার্যক্ষেত্রে তেমন নন।

এ রকম উক্তি করতে গিয়ে আমি সত্যই আত্মবিস্মৃত কি না তা সমসাময়িক কবিবন্ধুরা বিচার করে দেখবেন।

আমার মনে হয়, এই সমস্ত উপরোক্ত বিষয় অনুভব করে আমি লিখি। কিন্তু কবিতা বা সাহিত্যই শুধু নয়, সুলিপি সৃষ্টি করবার জন্যও (এই সমস্তই ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষার কথা, সফলতার কথা নয়) লেখা প্রয়োজন মনে করি। আজকের দুর্দিনে মানুষের নিঃসহাযতার রূপ কী রকম, কী করে তা কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থ বোধ করতে পারা যায়, এ সব বিষয় নিয়ে যে কোনো প্রবীণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার লিপিময় প্রকাশ মূল্যবান জিনিস। যদিও এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে অগণন কবি মনীষীর সৎ জীবননির্দেশের সমুদ্র আমাদের হৃদয়ের কাছে থাকতেও তা প্রায়শই আমাদের জন্য লবণাক্ত হয়ে রয়েছে—এবং তার পাশেই ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের অন্নপূর্ণা মরীচিকা,—তবুও তাতে এ জিনিস প্রমাণিত হয না যে কবিতা ও সাহিত্য ও সুলিপির ইতিহাস বিশ্বমানুষের ভাবনা ও চেতনাকে মূল্যজ্ঞানময ও চরিত্রবান করে তোলে নি।

শোষিত মানবজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের ও সেই বিপ্লবের শেষে আশা-ভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময়, দেশ, প্রকৃতি ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিস হয়েও কেবলই শ্রুয়মান, ধ্যেয়মান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ;—ও এই অভিজ্ঞতা—সেই সুজাতার থেকেই উৎসারিত।

'কেন লিখি।' বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দী।

হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত। মাঘ ১৩৫০

কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ

কবিতার রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই: যখনই 'ভাবাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি; —একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার; এর অনুশীলনের। এই ইমাজিনেশন শব্দটির বাংলা কী? কেউ হয়তো বলবেন কল্পনা কিংবা কবি-কল্পনা অথবা ভাবনা। আমার মনে হয় ইমাজিনেশন মানে কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা। বুদ্ধি—ধী—সকলেরই আছে এ কথা বলা চলে না। কল্পনা সব মানুষের মনেই সমান বিস্তার ও নিবিড়তা পেয়েছে বা পেতে পারে এ কথা মনে করা ঠিক নয়। ঔৎকর্ষ্যের তারতম্য আছে। কল্পনার (ও অন্যান্য মনোদৃষ্টির) সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি হয়, কিংবা নবীন রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান। কিন্তু এ সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পনা একইভাবে কাজ করে না, তার অন্তঃসারও একই রকমের নয়। যে কবির কল্পনাপ্রতিভা আছে সে ছাড়া আর কেউ কাব্যসৃষ্টি করবার মতো অন্তঃপ্রেরণার দাবি করতে পারে কি? এ প্রেরণা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা কী করে সম্ভব হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরের মর্যাদায় টের পাওয়া যাবে আলোচনার বিচারসহনশীলতা।

কিন্তু ভাবনাপ্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে; এ জিনিস ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই। এই সব কারণেই—আমার পক্ষে অন্তত—ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামো এমন কি সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে প্রায়। কিন্তু তারপর প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চার দিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায়: পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে। এর ফলে আমার এক বন্ধু আমাকে লিখেছেন 'কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস করে তোলে। এতে করে কোনো একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু সমস্ত নকশাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি।' কিন্তু এ রকম ঐকান্তিক কবিতা আমি বেশি লিখতে পারি নি। এর কারণ, ভাবপ্রতিভা, তাকে বলয়িত করে নেবার অবসর ও শক্তি এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির উপযুক্ত প্রভাব কোনো না কোনো কারণে শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

আজ পর্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি সে সবে মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি' তৃতীয় বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার করে কেবল মাত্র তারই ভিতর থেকে উৎস-নিরুক্তি খুঁজে পাই নি। নাট্যকবির পক্ষে এটা পাওয়া প্রয়োজন। প্রাতিভাসিক কবিতাজগতের একাগ্রতা ভেঙে ফেলে তাকে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা দেয় সেই কবি। কিন্তু তবুও তিন জগতেই বিচরণ করে সে—মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে ওঠে। লিরিক কবিও ত্রিভুবনচারী, কিন্তু তার বেলায় প্রকৃতি, সমাজ, ও সময়অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে না; অন্তত মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়। কাজেই উপন্যাস ও নাটকের মতো মানুষমনকে সমূলে আক্রান্ত না করেও কবিতা মানসের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—তাকে নির্মলতর করে তুলবার জন্য—কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।

কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই; রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখাও চায়। এতে করে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরি হয়ে চলতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্বাণের দিকে কারু মতে; অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজপ্রয়াণের দিকে অন্য কারু ধারণায়; কবি-জগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন করে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই।

আমিও সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিসকে 'চরম' মনে করে নিয়েছি জীবনের ও সাহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখঠার দিয়ে মাঝে মাঝে—টেম্পররি সস্‌পেনশন্ অব ডিজ্‌বিলিফ্ হিসেবে। কিংবা কখনও কখনও মনকে এই বলে বুঝিয়েছি যে যাকে আমি শেষ সত্য বলে মনে করতে পারছি না তা তবুও আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকনির্ণয়সত্তা; আজকের প্রয়োজনে চরম ছাড়া হয়তো আর কিছু নয়। কিন্তু তবুও সময়প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি। অনেকদিন ধরেই পরিপ্রেক্ষিতের আবছায়া এত কঠিন যে এর চেয়ে বেশি কিছু আয়ত্ত করা আধুনিকদের পক্ষে অসম্ভব না হলেও কিছুটা সুদূরপরাহত।

'পূর্বাশা;', কার্তিক ১৩৫৩

'ক্যাম্পে'

আমার 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার মনে করি। কবিতাটি যখন লেখা শেষ হল তখন মনে হয়েছিল সহজ শব্দে—শাদা ভাষায় লিখেছি বটে, কিন্তু তবুও কবিতাটি হয়তো অনেকে বুঝবে না। বাস্তবিকই 'ক্যাম্পে' কবিতাটিব মানে অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে যে এ কবিতাটিকে তাঁরা নির্বিবাদে অশ্লীল বলে মনে করেছেন।

কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের—মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়—'ক্যাম্পে' কবিতাটিব ইঙ্গিত এই; এই মাত্র। কবিতাটির এই সুব শিকারী, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল—পৃথিবীর এই সব ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়, বিষণ্ন যতখানি; বিষণ্ন, নিবাশ্রয়। 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবির মনে হয়েছে তবু যে স্থূল হরিণ-শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলেছে; প্রেম-প্রাণ-স্বপ্নের একটা ওলটপালট ধ্বংসের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সব দিকে : King Lear এব 'As flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for their sport'—এই আয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে—অন্তত কাব্যে, এ সুর—'ক্যাম্পে' কবিতাটির এই পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয়তার সুর: 'জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই'—এই সুর আগে এসেছে কিনা জানি না। অন্তত এ সুরের সঙ্গে চলতি বাঙালি পাঠক ও লেখক যে খুব কম পরিচিত তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে।

যে জিনিস অভ্যস্ত বুদ্ধি বিচার ও কল্পনাকে আঘাত করে—যা পরিচিত নয় তার অপরাধ ঢের। কিন্তু তবুও অশ্লীলতার দোষে 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সব চেয়ে কম অপরাধী। ইংরেজী, জার্মান বা ফ্রেঞ্চে এ কবিতাটি অনুবাদ করে যদি বিদেশী literary circleএ পাঠানো হত, তা হলে এ কবিতাটির কী রকম সমালোচনা হত ধারণা করতে পারা যায়; 'ক্যাম্পে' কবিতাটির যে সুরের

দ্র: 'সংবাদ-সাহিত্য'। 'শনিবারের চিঠি', মাঘ ১৩৩৮

কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি তাই নিয়ে বিশ্লেষণ চলত। দু-একটি prurient মন ছাড়া এ কবিতাটির ভিতর থেকে অত কিছু খুঁজে বার করবার কোনো ক্ষমতা কারুর থাকত না; prurient মন যাদের, সব সময়ই সব জায়গায়ই সব কিছুর ভিতর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বার করবার অবাধ শক্তি তাদের রয়েছে; এই তাদের একমাত্র শক্তি! এই prurience-এর কাছে 'ক্যাম্পে' অশ্লীল—আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়। শেলীর soul's sister পাশ্চাত্য কবি সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression;—কিন্তু 'হৃদয়ের বোন' (এই expression-টির জন্য শেলীর কাছে আমি ঋণী)—এই শব্দ দুটি prurient অন্তঃকরণকে শুধু বুঝতে দেয় যে সে কত prurient—তার ভিতর অন্য কোনো চেতনা জাগায় না। Muleykeh (একটি ঘোটকী) সম্বন্ধে Browning বলছেন : 'She was the child of his heart by day, the wife of his breast by night' না জানি Browning সম্বন্ধে prurience কী বলত!

কিন্তু বাংলা দেশে সজনে গাছ ছাড়া আরো ঢের গাছ আছে—সুন্দরী গাছ বাংলার বিপুল সুন্দরবন ছেয়ে রয়েছে যে সজনের কাছে তা অবিদিত থাকতে পারে— prurience-র কাছে প্রকৃত সমালোচকের অন্তরাত্মা যেমন চিরকালই অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত।

বাংলা দেশের সব কবিই এই ১৯৩২ সালে কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের naivete-র ভিতর রয়ে যায় নি। কিন্তু, হায়, যদি তেমন হয়ে থাকতে পারা যেত! সহজ সরল বোধ নিয়ে সুসাধ্য সুগম পথে চিন্তালেশশূন্যতার অপরূপ উল্লাসে জীবন কত মজারই না হত তা হলে।

১৩৩৮ [?]। পুনর্মুদ্রিত : 'শতভিষা', ভাদ্র ১৩৮১

'আট বছর আগের এক দিন'

বামেন্দ্র দেশমুখ্যের বই রিভিউ করতে গিয়ে নীরেনবাবু বলেছেন[০] : 'জীবনানন্দ দাশের আত্মঘাতী ক্লান্তি থেকে তিনি মুক্ত।' 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়, কোনো দিনই ছিল বলে মনে পড়ে না। 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি লাসকাটা ঘরের কবিতাটি বেছে বের করেছেন। এ কবিতাটি প্রায় ১২/১৪ বছর আগে রচিত হয়েছিল। কবিতাটি subjective নয়, একটা dramatic representation মাত্র ; কবিতাটি পড়লেই তা বোঝা যায়। Hamlet বা Lear বা Macbeth এর 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র সঙ্গে শেক্স্পীয়ারের যা সম্পর্ক, ও কবিতার ক্লান্তির সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটুকুও সেই রকম। কবিতাটিতে subjective note শেষের দিকে ফুটেছে; কিন্তু সে তো লাসকাটা ঘরের ক্লান্তির বাইরে—অনেক দূরে—প্রকৃতির প্রাচুর্য ও ইতিহাসের প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে আনন্দিত করে রেখেছে কবিকে। তবু নীরেনবাবু লাসকাটা ঘরের নায়ককে নায়কের স্রষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোত করে না জড়িয়ে কবিতাটি আস্বাদ করতে পারেন না মনে হয়। তিনি কি শেক্স্পীয়ারকে Macbeth বা Bardolph, Dogberry বা Golbs মনে করেন?

তা ছাড়া লাসকাটা ঘরের কবিতাটিকে তো আমার সমগ্র কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ representative হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ঐ কবিতাটির নিকষে আমার সমস্ত কাব্য অধ্যয়ন করতে যাওয়া ভুল।

২. 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' বা আজকের যুগের যে-কোনোরকম ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধু 'আশাবাদী মনোভাব' কবচের মতন যে-কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানালয় থেকে কিনে আনলে চলবে

[০] 'ধানক্ষেত'। বামেন্দ্র দেশমুখ্য। শ্রীহট্ট লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রকাশিত। আলোচনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। 'পূর্বাশা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

না। সে মনোভাব আশাবাদী হতে পারে, কিন্তু তা আরোপিত ও আড়ষ্ট—স্বাভাবিক ও সার্বজনীন নয়। 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়', বালভাষিত, কিন্তু কবিতা নয়; শস্য প্রচুর হলেই যে 'মরণের ভয়' কেটে যায় না আজকের এই জটিল শতাব্দীতে শিশুকে এ-কথা বোঝাবে? নীরেনবাবু হয়তো মনে করেন এ রকম কতকগুলো লাইন লিখতে পারলেই কবিতা হয়, আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আত্মঘাতী ক্লান্তির থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও উদয় হয়। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি এত সোজা নয়।

৩. আধুনিক কবিতায় যে 'আমি'র ব্যবহার করা হয়—যেমন 'ইতিহাসযানে' একটু-আধটু করেছি—সে 'আমি' যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়, কবিমানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপ যে-ভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা—আধুনিক কাব্য পড়বার সময় অনেক সমালোচকই তা মনে রাখেন না; ফলে 'ইতিহাসযানে'র জায়গায় জায়গায় যে ক্লান্তি—আত্মঘাতী কিনা জানি না—সে-সব কবির নিজেরই ব্যক্তিগত ক্লান্তি মনে করে ওঁরা কবিতা পাঠ করতে পারেন। কিন্তু এ রকম কাব্যপাঠ সমালোচকদের নির্বিচারে আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪. জ্ঞান-বিজ্ঞানালয়ের প্রাচুর্য আজকাল অনেক। ওরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মালিক। কবি তা জানেন। নিজেও সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মেনেই চলে; না হলে সে কবি হিসেবে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু এ বিজ্ঞান প্লাকার্ড-মারা বড়ো বড়ো সাইনবোর্ড টানানো ফলিত বিজ্ঞানের নগরীর থেকে গৃহীত হয় না—এ বিজ্ঞানকে ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির গতিপরিণতির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে স্থির করতে হয়েছে কবিমানসের ভিতর; আমি বলেছি কবিমানসের ভিতর ; সাধারণ যুক্তিবাদী মনের ভিতর উপরোক্ত গতিপরিণতির ধারা স্থিরীকৃত হয় ক্রমপরিণত জ্ঞানবিজ্ঞানে—সমর্থন পায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরীতির প্রচলনে; কিন্তু এই অন্যরূপ মানসের সম্পর্কে এসে তা হয়ে ওঠে কবিতা, সমর্থন পায় visionএ উজ্জ্বল কবিদৃষ্টির উৎসারণে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করলেই কবিতা আশাবাদী হয়ে ওঠে এ-কথা মনে করা ভুল। Arnoldএর সে যুগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি ছিল, কিন্তু তার কবিতা নিরাশাবাদী, অথচ facile আশাবাদের চেয়ে তা কত উন্নত ও সংহত। মহৎ গ্রীক কবিদের কাব্যে নীরেনবাবুর আশাবাদ কোথায়? Greek Tragedyতে তখনকার শতাব্দীসহ পরম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপ্রতিভারই বা অভাব কোথায়? রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'র দৃষ্টিনীতি সব চেয়ে বেশি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক; বইয়ের ১১নং এর মহান কবিতাটি নীরেনবাবুর আশাবাদে সংশোধিত হতে পারল না; না হয়ে ভালোই হয়েছে; আমরা বিজ্ঞান ও কবিতা সবই পেয়েছি। Eliot অগস্ত্যের নীতি অবলম্বন করে পান করেছেন বিজ্ঞান;—দৃষ্টিরীতি অবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে কে বলবে?—কিন্তু কবিতা তাঁর 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়' এর চেয়ে ঢের বড়ো নিরাশাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এতই তা উজ্জ্বল ও আন্তরিক যে তাকে আশাবাদ ছাড়া কী আর বলতে পারা যায়।

আধুনিক অনেক সমালোচকই কতকগুলো শব্দ, বাক্য ও শ্লোগানের দাস মাত্র, যুক্তিবিচার ও অন্তর্দৃষ্টির ধার ধারেন না। 'আশাবাদ', 'আশাবাদী মনোভাব , 'বৈজ্ঞানিক, দৃষ্টিভঙ্গি' ইত্যাদির ছেলেমানুষি বাজারি অর্থ ঘুচিয়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট কবির সম্পর্কে—তাদের কবিতার প্রতিভানুষঙ্গে ব্যবস্থিত হয়ে এদের যথার্থ সত্য সংজ্ঞালাভ করা প্রয়োজন। এর মানে এ নয় যে কবিতার ভাবপ্রতিভাই সব, বৈজ্ঞানিক চেতনা অবাস্তব; তা নয়; বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য নানা শ্রেষ্ঠ চেতনার ভিতর থেকেই মহৎ কবিতা জন্মলাভ করছে। সে কবিতা যদি আগামী প্রভাতের সূর্য-সমাজ ঘোষণা করে তবে ভালোই। কিন্তু এ ঘোষণা কাব্যশরীরী হয়ে এসেছে বলেই এর ঔৎকর্ষ্য; এ ঘোষণা রয়েছে, কাব্য নেই—তার কী মূল্য? এ ঘোষণা রয়েছে কাব্যাত্মক হয়ে—এরও শ্রেষ্ঠ মূল্য।

'আলোচনা'। 'পূর্বাশা', আষাঢ় ১৩৫৩

চিঠি

১

৩রা পৌষ ১৩৩৭ [?]
66 Harrison Road, Calcutta.

শ্রীচরণেষু,

আপনার স্নেহাশিস লাভ করে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীন লেখকদের সব চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য এই যে মাথার ওপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মতো আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এত বড়ো দানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতার পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু এ দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার অভাব অনুভব কচ্চি। অক্ষম হলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সাধনা। আর আমার জীবনের আকিঞ্চন সেই আরাধ্য শক্তি ও সেই কল্যাণময় শান্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসচে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকেরা serenity জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে, সেখানে কাব্য ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedyর ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানারকম moods খেলা করে। সে mood-গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিস তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগণ্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে,—সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। Moodএর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে serenity অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।

সকল বৈচিত্র্যের মতো সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর। কোনো একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশি করে স্থায়ী স্থান কী করে দাবি করতে পারে। আকাশের নীল রঙ, পৃথিবীর সবুজ রঙ, আলোর শ্বেত রঙ কিম্বা অন্ধকারের কালো রঙ—সমস্ত রঙগুলিরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি সুন্দর ও সুচির বলা চলে ব'লে মনে হচ্চে না। এই অন্ধকার, এই আলো, আকাশের নীল, পৃথিবীর শ্যামলিমা—সবই তো সুচির, সুন্দর। সৌন্দর্য ও চিরত্বের বিচার তাই একটু অন্য ধরনের বলে মনে হয়। ঘুড়ির কাগজের সবুজ, নীল, শাদা বা কালো রঙ যখন পৃথিবী, আকাশ, প্রভাত বা রাত্রির বর্ণের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের দাবি করে বসে, তখন আর কোনো প্রসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না। আমার তাই মনে হয়, রচনার ভেতর যদি সত্যিকারের সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো

অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা serenityর সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।

বীঠোফেনের কোনো কোনো symphony বা sonataর ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু আজও তো টিকে আছে—চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।

আমার যা মনে হয়েছে, তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার অন্তরলোকের আলোপাতে আমার ত্রুটি ও অক্ষমতাকে মার্জিত করে নেবেন আশা করি। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

। দাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি, পৌষ ১৩৩৭ [?]

২

Sarbananda Bhavan
Barisal
2. 7. 37

শ্রীচরণেষু,

এত দিনে 'ভারতবর্ষ' যোগাড় করতে পারলাম। সেই জন্যে আপনাকে চিঠি লিখতে দেরি হয়ে গেল। কলকাতায় থাকলে পাঁচ মিনিটে যে জিনিস পাওয়া যেত, এখানে তা পেতে এক সপ্তাহের বেশি লেগে গেল। মফস্বলের এই শহরগুলো এখনও নানা দিক দিয়ে intellectual backwater হয়ে আছে। এখানে culture জিনিসটা একরকম নেই বল্লেই হয়। সাহিত্যসৃষ্টি তো দূরের কথা, সাহিত্যচর্চাও খুব কম লোকেই করে। সেই জন্যেই কলকাতায় কোনো কাজ নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করে, এই আবহাওয়ার ভিতর মন আর টিকে থাকতে চায় না।

আপনার 'বীণাবাই' আমার খুবই ভালো লাগল। আপনি আগে যে গল্প লিখেছেন আমি তা পড়ে এসেছি; এবং আপনার গল্প লিখবার স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট প্রণালীর বাহবা দিয়েছি মনে মনে। আপনার 'চার-ইয়ারী কথা' প্রথম যখন আমার হাতে এসেছিল, তখন আমি বালক মাত্র। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাত মুখুয্যের গল্পেরই আওতা ছিল বেশি; 'ভারতী' পত্রিকার মারফৎ গল্পসাহিত্যের একটা নতুন স্কুল কিছু প্রত্যাশা দিচ্ছিল হয়তো। বিমুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়ে তখন হঠাৎ একদিন আপনার 'চার-ইয়ারী কথা' পাঠ করলাম। Keatsএর ভাষায় বলতে গেলে 'Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken', অনুভব করতে পারলাম প্রবন্ধসাহিত্যেও যেমন কথাসাহিত্যেও তেমনি আপনার রচনা যেন মানুষের মননের তীক্ষ্ণ ও সরস ক্রীড়াভূমির মতো সমস্ত সৃষ্টির আস্বাদ নিয়ে এই প্রথম জন্ম নিল। আমি পূর্বের পত্রে আপনাকে লিখেছি যে বাংলাসাহিত্যের যে কোনো বিভাগ আপনি স্পর্শ করেছেন—প্রবন্ধ, সমালোচনা, গল্প, সনেট ইত্যাদি—সেখানেই আপনার অনন্যসাধারণ লিপিচাতুরী ও স্বতন্ত্র মনীষার ছাপ রেখে গেছেন আপনি। 'চার-ইয়ারী কথা' পড়ে তখন মনে করেছিলাম যে আপনি আরো বড়ো বড়ো উপন্যাস লিখবেন। কিন্তু তা লিখলেন না। প্রবন্ধ ও সমালোচনার ভিতরেই আপনি আপনার সমস্ত প্রতিভা ঢেলে দিলেন। এ ভালোও হল—কিন্তু কয়েকখানা বড়ো বড়ো উপন্যাস লিখে বাংলা কথাসাহিত্যকে যে আপনি অলক্ষিতপূর্ব্ব রূপ, গভীরতা (আপনার গল্প কখনই ফিলজফি-বর্জিত নয়), ও প্রসার দিতে পারতেন আপনার তরফ

থেকে সে জাতীয় প্রচেষ্টার অভাব আমাকে থেকে থেকে পীড়িত করে তুলত। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি বড়ো উপন্যাসই হোক, কিংবা ছোটো গল্পই হোক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে আসল জিনিস। এবং এ জিনিসের নব ও নবতর দক্ষতার সূচক পরিণতিতে আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রেষ্ঠ লেখকদের একটা বিশেষ গুণ এই যে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির স্তরে স্তরে তাঁদের পূর্বতন রচনাবৈশিষ্ট্যের প্রতিধ্বনি মাত্র করতে যান না; নিজেদের লেখা ছাড়িয়ে যাবার, নূতনতর সৃষ্টি করবার আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে তাঁদের। আপনার 'বীণাবাই' গল্পে তারই প্রমাণ পেলাম। ঘোষালের মুখ দিয়ে ইদানীং আপনি অনেক গল্প বলিয়ে নিচ্ছেন। এ সব গল্প আপনার আগেকার গল্পগুলোর মতো নয়; আপনার জীবন্ত স্রষ্টামনের নব নব পরিণতির পরিচায়ক। এই হচ্ছে সম্যক্ প্রতিভার লক্ষণ। এই সম্পর্কে একটা pertinent কথা বলছি;—অপরাধ নেবেন না। এই আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' শরৎবাবুর 'দেওঘরের স্মৃতি' পড়লাম। শরৎবাবুর ও রচনাটি তাঁর পুরোনো লেখারই পুনরুক্তি মাত্র। শরৎবাবু যেন নিজের লেখাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না আর। একটা মস্ত obsession এসে তাঁকে বাধা দেয়। পরন্তু রবীন্দ্রনাথ ও আপনি এরকম বাধায় ব্যাহত হন না। বরং সেই জন্যই আপনাদের শ্রেষ্ঠতা তর্কের অতীত।

ঘোষালের গল্পগুলোর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার আছে। কোনোরকমে কলকাতায় কোনো collegeএ চাকরী নিয়ে বসতে পারলে সুবিধে হত। Ripon Collegeএর ইংরেজির staffএ আপনি যদি আমার জন্য একটা জায়গা করে দেন তা হলে আমার বড়ো উপকার হয়। Mr. J. Choudhury ও Mr. Bhavasankar Banerjeeকে আপনি যদি একটু বিশেষভাবে বলেন তা হলেই সব হয়ে যায়। এখনই নতুন session আরম্ভ হবে; আজকালই নতুন লোক নিযুক্ত কবার সময়।

ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সম্বন্ধে আপনি লিখবেন জেনে অব্দি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আছি। সমালোচনাটি 'পুস্তক পরিচয়ে'র no-man's land এর ভিতর না দিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আকারে লিখলে ভালো হয়। আমি খুব খুশি হব। কলকাতার গরম আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমার মনে হয় কিছুদিন আপনি কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বেড়িয়ে এলে শরীরে নবীন আস্বাদ ফিরে আসবে আবার। আজ এই পর্যন্ত।

Ripon collegeএ একটা ব্যবস্থা করে দেযার ভার আপনার ওপরে—দযা করে মনে রাখবেন। সামান্য মাইনেতেও আমি যেতে প্রস্তুত। কারণ কলকাতায় থাকাই প্রধান উদ্দেশ্য।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি-
স্নেহাকাঙ্ক্ষী
জীবনানন্দ

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা।

৩

সবানন্দ ভবন
বরিশাল
১০. ১০. ৪২

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি বৃহস্পতিবার এখানে এসেছে। আমি তখন বাড়ি ছিলাম না, শুক্রবার বিকেলে পেয়েছি। আপনি রবিবারের মধ্যেই আমার কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ চেয়েছেন। আমি সব সময় তাড়াতাড়ি কবিতা লিখতে পারি না; লিখলেও ভেবেচিন্তে দাঁড় করাতে হয়। কবিতার অনুবাদের বেলায়ও তাই।

তাড়াহুড়ো করে তিন-চারটে কবিতার তর্জমা পাঠাচ্ছি; শনিবারের শেষ ডাকের আগে

পাঠানো অসম্ভব; আপনি হয়তো সোমবার পাবেন। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কি ঠিক জিনিস হয়? উপযুক্ত সময় ছাড়া আমি অন্তত মনের মতন জিনিস গড়তে নিতান্তই অক্ষম। Harold Acton এরকম short noticeএর ব্যবস্থা করলেন কেন? তাঁর anthologyতে অসতর্কভাবে উপস্থিত থেকে কি খুশি হওয়া যাবে?

'বনলতা সেন', 'বিড়াল ও 'মনোবীজ' (কয়েক বছর আগে 'শারদীয়া আনন্দবাজারে' বেরিয়েছিল) অনুবাদ করে পাঠালাম। ইংরেজি লেখার অভ্যাস নেই। হয়তো নানারকম ত্রুটি রয়ে গেছে; আপনি একটু দেখে দিলে ভালো হবে। 'হাওয়ার রাত' ও কয়েকটি সাম্প্রতিক লিরিক আপনি যদি অনুবাদ করে দেন তা হলে খুব ভালো হয়; চর্চা ও প্রতিভা আছে আপনার—আমার চেয়ে ঢের ভালো তর্জমা হবে।

আরো কিছুদিন সময় দিলে আমি নিজেও অন্য কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে দিতে পারি।

'হাওয়ার রাত', 'বিড়াল', 'বনলতা সেন' ইত্যাদি কবিতাগুলো আমার কাব্যজীবনের এক বিলুপ্ত পর্যায়ের। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলোর থেকে কয়েকটি কবিতা না দিলে anthologyতে আমার কবিতা কোনোক্রমেই representative হবে না।

'বনলতা সেন'এর বিজ্ঞাপন তো দিয়েছেন। কিন্তু ঐ নামই কি থাকবে? আশা করি ভালো আছেন।

লক্ষ্মীপূজোর পর কলকাতায় যাব ভাবছি। প্রীতি নিন।

জীবনানন্দ দাশ

৪

সর্বানন্দ ভবন
বরিশাল
১০. ৩. ৪৪

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি।

অল্পক্ষণের আলাপ হলেও আপনার কথা আমার মনে আছে। আলাপের আগেই আপনার লেখার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল।

ইংরেজি তর্জমায় আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন বার হলে আনন্দিত হব। প্রায় দু বছর আগে বুদ্ধদেববাবুর অনুরোধে এরকম একটা সংকলনের জন্যে আমার কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। শুনছি Harold Acton তা নিয়ে কোথায় গেছেন, খোঁজ নেই। সে সবের কপি আমার কাছে আছে কিনা,—কোথায় আছে, খুঁজে দেখতে হবে। কপি থাকলেও তা খসড়ার মতন—ঘষে-মেজে বুদ্ধদেববাবুর কাছে পাঠিয়েছিলাম।

সম্প্রতি Universityর পরীক্ষার খাতা দেখতে বড়ো ব্যস্ত আছি। আপনাদেরও সময় অল্প। নতুন তর্জমার কিংবা পুরোনো অনুবাদ (যদি পাওয়া যায়) শোধরাবার সময় তো আমার হাতে এখন নেই। তর্জমায় ওস্তাদ অমিয়বাবু—এবং বুদ্ধদেববাবু। তাঁরা যদি আমার কোনো কোনো কবিতা—বনলতা সেন, নগ্ন নির্জন হাত, মাঠের গল্প, ক্যাম্পে, সহজ, পাখিরা, শকুন (এ কটির ভেতর থেকে তাঁদের রুচি অনুযায়ী কয়েকটি), এবং তাঁদের পছন্দমতো আমার আধুনিকতর 'সমাজচেতন' কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেন তা হলে আনন্দিত হব।

ইতিমধ্যে আমার নিজের তর্জমার পাণ্ডুলিপি খোঁজ করে পেলে—একটু দেরি হবে—আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

অমিয়বাবু ও বুদ্ধদেববাবু কোন্ কোন্ কবিতা তর্জমা করতে রাজি জানালে খুশি হব। প্রীতি নমস্কার।

ইতি
জীবনানন্দ দাশ

৫

সবনন্দ ভবন
বরিশাল
২০. ৩. ৪৪

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পেয়েছি।

বুদ্ধদেববাবুর কাছে 'বনলতা সেন', 'বিড়াল ও 'মনোবীজে'র যে ইংরেজি তর্জমা রয়েছে তাও খুব তাড়া খেয়ে লেখা; ও তর্জমায় আমি খুশি নই। ওগুলো আপাতত অমিয়বাবুকে দেখাবার দরকার নেই।

আমি এই সঙ্গে Sankhamala ('শঙ্খমালা', বনলতা সেন) To the Song-Kite ('হায়, চিল', ব. সে.), If I were ('আমি যদি হতাম', ব. সে.), Meditations ('মনোবীজ', কয়েক বছর আগে 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বেরিয়েছিল), Chorus ('বিভিন্ন কোরাস', 'কবিতা' ১৩৪৯) ও Antiphony ('আলোকস্তম্ভ', অনেক বছর আগের পত্রিকায় ছাপানো) পাঠালাম।

এবারও তাড়াহুড়ো করেই সারতে হল। বেশি সময় পেয়ে স্থির হয়ে নিতে না পারলে এসব জিনিস মনের মতন হয় না।

'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জন হাত'—এর পরে তর্জমা করে পাঠাতে পারি। Chorus কবিতাটি খুব বড়ো—মাঝে মাঝে বেছে নেয়া যেতে পারে। আশা করি অন্য কবিতা কটি গ্রহণযোগ্য মনে হবে—'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জন হাত' এসে দু-একটিকে সরিয়ে না দিলে। এই শেষোক্ত কবিতাদুটো অমিযবাবু নিজেই তর্জমা করলে খুব ভালো হত; বুদ্ধদেববাবুকে তো অনেকবার করতে বলেছি, তিনি করলেন না।

যে তর্জমা কটি পাঠালাম অমিয়বাবুকে দেখাতে পারেন। আমার অস্পষ্ট হাতের লেখা, final proofএর আগে আমাকে দেখালে খুশি হব। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

৬

সর্বনন্দ ভবন
বরিশাল
১৪. ৯. ৪৪

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ১০ই তারিখের চিঠি ও আমার কবিতা চারটের ইংরেজি তর্জমা ১৩ই পেয়েছি। If I were ও Meditation ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে—এত কম যে আমার নিজের তর্জমা মনে করা যেতে পারে।

Kirkmanএর Banalata Sen খুবই ভালো হয়েছে, সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি। এই কবিতাটির এক জায়গায় 'raising her birds-nest eyes' আছে, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে'র এত বেশি literal translation না করে কিছুটা ভাবানুবাদ করতে পারা যায় না কি? বাংলায় আমি নীড় নয়—নীড়ত্বের সঙ্গে চোখের তুলনা করেছিলাম। O, Kite মন্দ হয় নি। O, Kite ও If I wereএ বাংলার নদী গাছ ইত্যাদির নাম তুলে দিয়ে 'pool', 'time' প্রভৃতি ঢুকিয়ে কি ভালো হল? হয়তো ভালো হল। বিদেশীদের জন্যে। তাদের মতামত মূল্যবান।

যা দু-একটা ছাপার ভুল চোখে পড়ল ঠিক করে দিলাম।

কবিতা ও Jivanananda (Jivananda নয়) Das সম্পর্কে যেন errata না বেরোয়।

আমার 'বনলতা সেন'এর পরের কাব্যপ্রকৃতির কোনোই পরিচয় নেই এই সংকলনের ভিতর। এই সব ও আরো অনেক জিনিস নিয়ে ক্ষুব্ধ হবার কিছু থাকবে না—আপনার ভূমিকার সফলতায়; এই তো আশা করি। সংকলনটি বার করতে আপনি যথেষ্ট প্রয়াস ও পরিশ্রম করেছেন। আপনাকে ও Mr. Kirkmanকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানাচ্ছি। এই জাতীয় সাধনা আমাদের সাহিত্যে এই প্রথম। সফল হোক।

আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ

৩, ৪, ৫ ও ৬ সংখ্যক পত্র দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা।

৭

সবানন্দ ভবন
বরিশাল
২. ৭. ৪৬

প্রীতিভাজনেষু,

কলকাতার থেকে যে কার্ড লিখেছিলাম তা পেয়েছেন আশা করি। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার কাজে হাত দিয়েছেন কি?

(১) আমার কাব্যগ্রন্থগুলো আপনি চেয়েছেন। এ পর্যন্ত আমার চারটে কবিতার বই বেরিয়েছে; আমার পঞ্চম কবিতার বই—যার ভিতরে আমার শেষের দিকের অনেক representative কবিতা থাকবে তা এখনও গ্রন্থাকারে বেরয় নি; সে সবের পাণ্ডুলিপিও আমার কাছে নেই—press এ আছে; বই বেরুতে বেশ কিছু দেরি হবে। আপনার চিঠি পেলে আমার দুখানা বই আপনাকে পাঠিয়ে দেব। প্রথম কবিতার বইটি পাঠাব কিনা ভাবছি; সে বইয়ের বিশেষ কোনো importance আছে বলে মনে হয় না। আর 'বনলতা সেন' বইটের সমস্ত কবিতাই 'মহাপৃথিবী'তে আছে।

(২) 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি' ইত্যাদির কোনো সংখ্যা এখন আমার কাছে নেই? কলকাতায় কোনো কোনো প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে থাকতে পারে।

(৩) আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয় চেয়েছেন। সম্প্রতি বড়ো ঝঞ্ঝাটের ভিতর আছি; লিখবার তাগিদ নেই। আপনি কি জানতে চাচ্ছেন তাও স্পষ্ট বুঝতে পারছি না।...আমার জন্ম হয়েছিল বরিশালে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে। পড়েছিলাম B. M. Schoolএ, B. M. Collegeএ, Presidency College, University ও Law Collegeএ। শেষ পর্যন্ত আইন পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। অধ্যাপনা করেছি কলকাতায় City College-এ, দিল্লীর এক Collegeএ, বরিশালে B. M. Collegeএ। আরো ২/৪ রকম কাজ করেছি ফাঁকে ফাঁকে। এখনও অধ্যাপনাই করতে হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশি দিন থাকা ভালো না। যে জিনিস যাদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সবই অসাড়ত্তার নামান্তর নয় কি? এইবার নতুন পটভূমি নেমে আসুক।

আমাদের পরিবার খুব বড়ো—কিন্তু সাহিত্যপ্রীতি ও রচনারীতির উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছি বাবার জীবনে। তিনি অনেক ইংরেজি ও দেশী বই কিনতেন ও পড়তেন, ভালো library ছিল তাঁর; সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী যুবা ও প্রৌঢ়দের আনাগোনা ছিল তাঁর গ্রন্থাগারে। বাবা মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের বিদেশী ও দেশী সাহিত্য। নিজে বিশেষ কিছু লিখতেন না। যে ক'টি রচনা তাঁর পেয়েছি তাতে উচ্ছ্বাস কম—সংহতি বেশি। খুব তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ ছিলেন।

মা অনেক কবিতা লিখেছেন। সে সব কবিতার শাদা ঝর্ঝরে শব্দনিক্কণ ও আশ্চর্য অর্থসঙ্গতি বরাবরই আমাকে প্রলুব্ধ করেছে; কিন্তু তবুও আমি প্রথম থেকেই অন্য পথ ধরে চলেছি। আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্যপ্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস—স্বদেশী ও বিদেশী—নেহাৎ কম পড়ি নি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচে নি। শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও অবসরের অভাবে দানা বাঁধতে পারছে না। না পারছি মহৎ নাট্য-সমালোচকের নেতিবাচক নিরাশা ভঙ্গ করে তেমন কিছু নাটক লিখতে। এই দারুণ সংগ্রাম-কঠিন সময়ে নানারকম আধিজৈবিক দায়িত্ব মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকে তাতে সাহিত্যের কোনো একরকম অভিব্যক্তি (যেমন কবিতা) নিয়েই যত দূর সম্ভব পটভূমির প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো যায় সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে। কিছু পরিমাণে এই জন্যই কবিতা লিখতে উৎসাহ পেয়েছি। কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রেরণা পেয়ে লিখেছি এই কারণে যে আমার যুক্তিধর্মী মানস আধুনিক সময়ের সমস্ত সঙ্গ ও অহেতুকতার সংস্পর্শে এসে কবিমানসের দৃষ্টি-উজ্জ্বলতায় রূপান্তরিত হতে চেয়েছে (হয়তো হয়েছে) ব'লে। এর পর বলতে হয় কবিমানস কী, কবিতা কাকে বলে? এ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি, করব। আজ সময় নেই।

প্রথমেই 'কল্লোলে'এ কবিতা ছাপিয়েছি বল্লে ঠিক হবে না, কিন্তু 'কল্লোলে'ই প্রথম কবিতা ছাপিযে ভালো লেগেছিল। 'কল্লোলে'র যুগে আমি কলকাতায় থাকতাম। 'কল্লোলে'র শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা, কথাবার্তা হত। কিছুকাল পরে 'কালিকলম' বেরুল; 'কালিকলমে'র দিক-নিরূপক ছিলেন প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। মোহিতলাল 'কালিকলমে' কবিতা লিখতেন। 'কালিকলম' অফিসেই নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখেছি। ভালো না মন্দ, বড়ো বা ছোটো কী এক যুগ ছিল সেটা? যাই থাক না কেন, ইস্কুল পড়বার সময় যেমন প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন দত্ত, প্রভাত মুখুয্যে, ফরাসী ও রুশ গল্পের 'ছায়াবলম্বনে'র ওস্তাদ সূপকার চারুবাবু ও মণি গাঙ্গুলি—ও পরে অন্য গ্রামে—শরৎ চাটুয্যেকে অন্তর্জীবনে বিজড়িত করে নিতে হয়েছে, 'কল্লোলে'র যুগে তেম্নি সমালোচকদেব পেয়েছি আর-একরকমভাবে, অনেকটা নাগালের ভিতরে; মানসপরিধি থেকে পূর্বজেরা তখন সরে গিযেছেন খানিক দূরে—অনেক দূরে;—রবীন্দ্র বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড়ো বড়ো বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোর কাছে। বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল'-আন্দোলনের প্রযোজন ছিল। সাহিত্য ও জীবনের ঘুরুনো সিঁড়ি দুযে-মিলে এক হয়ে এক পরিপূর্ণ সমাজসার্থকতার দিকে চলেছে মনে হয়; 'কল্লোলে'র সাময়িকতা সেই সিঁড়ির একটা দরকারি বাঁক।

'কল্লোল' 'কালিকলম' ক্রমেই বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হযতো বুদ্ধদেবেব মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়; স্পষ্টতাসম্ভবা তারা; অতএব সাহস ও সততা দেখবার সুযোগ লাভ করে চরিতার্থ হলাম—বুদ্ধদেববাবুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে—'বনলতা সেন'এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।

'নিরুক্ত' ও 'পূর্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার শেষের দিকে কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। এ পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে। কিন্তু আরো দু-চাররকম চেতনা আছে, আজও যাদের কবিতায় শুদ্ধ করে নিয়ে নির্ণয় করে দেখতে আমি ভালোবাসি। সমাজ যত বিশুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃৎ হোক না কেন, প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টিপ্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনো ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি?

ঘটে নি তো আমার জীবনে। সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড়ো চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কিন্তু কোন্ কবি তার কবিতায় সেই অমোঘ 'বিজ্ঞানদৃষ্টি'র প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে—কবি-লক্ষিত যেই পথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পেয়েছে? প্রয়াণের প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজও আমরা সে সমাজ পাই নি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-দিব্যতা—যা নতুন শুদ্ধ সমাজ মানবকে দান করতে পারে—এই দৃষ্টিদিব্যতার দিক থেকে তা হলে কি অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই বিফল? কিংবা সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই কি অল্পাধিক সার্থকতায় অবিচ্ছিন্ন সময়ের সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানশুদ্ধ শুভ্র নিঃশ্রেয়স সমাজ গড়ছে? তা হয়তো গড়ছে (এ প্রয়াসের পথে কোনো শেষ কৈবল্যলোকও নেই হয়তো) যেমন সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষী অর্থশাস্ত্রী ও সঠিক বিষয়ালোকিত সেবক ও সাধকেরা গড়ছে। আধিদৈবিক উপায়ে এরা যেমন করে গড়ছে সমাজস্রষ্টা কবিতা সে সফলতার দাবি করতে পারে না হয়তো—কিন্তু অন্য এক শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রয়েছে তার—যেখানে শুদ্ধ সমাজসৃষ্টির শুভেচ্ছা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরীতির শুদ্ধতা (যা ও-রকম সমাজ রচনা করছে, যদিও সে সমাজ আজও পাচ্ছি না আমরা) সব কিছু হয়েও আরো কিছুর অপেক্ষা রাখে যা বিষয় ও বিষয়-বিচারের উজ্জ্বলতাকে ভাবপ্রতিভার সাহায্যে কবিতার স্বতন্ত্র আভায় পরিণত করে।

আমার আধুনিক কবিতা এই সব ব্যাপারের থেকেই উৎসারিত হতে চাচ্ছে।

জীবনানন্দ দাশ

পত্রের উদ্দিষ্ট অজ্ঞাত। 'ময়ূখ' জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যায় মুদ্রিত।

৮

প্রিয়বরেষু,

আশা করি ভালো আছেন।

বেশি ঠেকে পড়েছি, সে জন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে! এখুনি চার-পাঁচশো টাকার দরকার; দয়া করে ব্যবস্থা করুন।

এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ-ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটি উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়—ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপতে পাবেন; দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার জীবনস্মৃতি আশ্বিন কিংবা কার্তিক থেকে 'পূর্বাশা'য় মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে, কিন্তু টাকা এক্ষুণি চাই,—আমাদের মতো দু-চারজন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকের এ রকম দাবি গ্রাহ্য করবার মতো বিচার বিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন—সে জন্য গভীর ধন্যবাদ।

লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ করে দেব,—না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ-সাত মাস (তার বেশি নয়) দেরি হতে পারে।

কবিতাগুলোর সবই এক সময়ে লেখা নয়। কবিতা বেছেই পাঠিয়েছি; তবু যদি কিছু অপছন্দ হয় আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কবিতা আপনার সুবিধামতো পূর্বাশায় কিংবা অন্য কোনো ভালো পত্রিকায় (উপযুক্ত টাকা দিলে ও মর্যাদা রাখলে) ছাপতে পারেন।

জরুরি। আজকালই প্রত্যাশা করছি। প্রীতি নমস্কার ইতি—

জীবনানন্দ দাশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

স্ট্র্যাণ্ডে

গরমের দুপুরবেলা
স্ট্র্যাণ্ড রোডে দাঁড়িয়ে আছি
গঙ্গা এত কাছে
তবুও গঙ্গা কত দূরে
কত শেকল কল কব্জা বল্টু ধোঁয়া ধুলা আইন অর্ডিন্যান্‌স্‌
আমাদের দুজনার মাঝখানে
লরি এখানে প্রবল—লরি ট্রাক ট্রাম ফ্যাক্‌টরি এবং এদের দেবতারা
এদের দেবতারা

নদী এখানে ট্রামের লাইনের মতো যেন
কিম্বা টেলিগ্রাফের তারের মতো
টেলিফোনের তারের মতো
নদীকে এখানে কে কবে দেখেছে?
কিন্তু পৃথিবীর সব নদী
সব সমুদ্র
সমস্তই
ক্রমে ক্রমে এমন হয়ে যাচ্ছে
টেলিফোনের তারের মতো হয়ে যাচ্ছে

বেল্টে ছাতা গুঁজে ট্র্যাফিক পুলিশ
ব্যাটন হাতে সার্জেন্ট
চারি দিককার ট্র্যাফিকের সমুদ্রের ভিতর
সমস্ত হাঙরগুলোর দিকে নজর রাখছে
এই মহিষের গাড়িগুলোর দিকে—গাড়োয়ানদের দিকে—
কাঁচা চামড়া—বস্তা—পাটের পাহাড়ের দিকে
কিন্তু মাল টানা মহিষের চোখের দিকে
একবারও তারা ফিরে তাকায় না
চোখের রক্তের দিকে
রক্তের ওপর মাছির দিকে
মহিষের মুখের ফেনার দিকে
তাকিয়ে দেখবার মতো কিছু নেই
এক মুহূর্তের জন্যও
স্ট্র্যাণ্ডের একটি লোকও
এই সবের দিকে ফিরে তাকায় না।
কেন তাকায় না?

কেন?
অনেকক্ষণ ধরে ভাবি আমি
স্ট্র্যাণ্ডে এই মহিষগুলোই কি সব চেয়ে বেশি দেখবার জিনিস নয়?
এই মহিষদের প্রবল আকর্ষণ আমি এড়াতে পারি না
  বারবার এদের লোমশূন্য চামড়ার দিকে তাকিয়ে দেখি
  কেমন ধূসর ভঁয়সা রঙের চামড়া—কিচড়ে কাদায় ল্যাটপ্যাট করছে
চামড়ার ওপরে চাবুকের অজস্র ক্ষতের দাগ
দুপুরের রোদে আগুন চামড়া
অর্কমণ্য নিরীহ্ ফোঁপড়া শিক্
বাদামি গভীর চোখ
ভীরু বড়ো বড়ো চোখ
পাখা পিয়ালের মতো—জল ভরা
  পিচুটি ভরা
চোখের ওপরে মাছি—

এই সবের দিকে তাকিয়ে দেখি আজ

স্ট্র্যাণ্ডের একটি লোকও
এ সবের ভিতর দেখবার মতো কিছু আছে বলে মনে করে না,
এক দিনও
এক মুহূর্তের জন্যও মনে করে নি।
পৌষ–মাঘ ১৩৩৮

মনে পড়ে সেই কলকাতা

মনে পড়ে সেই কলকাতা—সেই তেরোশো তিরিশ-
  বস্তির মতো ঘর,
বৌবাজারের মোড়ে দিনমান
  ট্রাম করে ঘর্‌ঘর্।
আমাদের কিছু ছিল না তখন
  ছিল শুধু যৌবন,
সাগরের মতো বেগুনি আকাশে
  সোনালি চিলের মন।

ছেঁড়া শাড়ি পরে কাটাইতে দিন
  বাঁটনা হলুদ মাখা
বিভারানী বোস, তোমার দু হাতে
  ছিল দুটো শাদা শাঁখা,
শাদা শাঁখা শুধু তোমার দু হাতে

জুটিত না তেল চুলে,
তবুও আমরা দিতাম আকাশে
বকের পাখনা তুলে।

জুটিত না কালি কলমে আমার
কাগজে পড়িত টান,
তোমার বইযের মার্জিনে, বিভা,
লিখিতাম আমি গান।
পাশের বাড়ির পোড়া কাঠ এনে
দেয়ালে আঁকিতে ছবি।
আমি বলিতাম—'অবন্তী–বিভা',
তুমি শুধাইতে 'ঈগল কবি'।

চক্ষে তোমার মিঙ্ যুগ ভাসে
কাঙড়ার ছবি ঐ নীল চোখে
আমার হৃদয়ে অনুরাধাপুর
পুরানো ফরাসী গানের বোকে।
সেদিন আমার পথে পথে হাঁটা
সেও তম্বুরা মাণ্ডলিন
তোমার সেদিন ঘর সিঁড়ি ভাঙা
বাংলার পট, পুরোনো চীন।

পৃথিবীর মুখে তুড়ি দিযে দিয়ে
দুইটি হৃদয সেই
ডাল তেল নুন জোটে না যাদের
জামা--শাড়ি কিছু নেই,
তবুও আকাশ জয়ের বাসনা
দুঃখের গুলি সে যেন ঢিল,
আমরা দুজনে বেগুনি আকাশে
সোনালি ডানার শঙ্খচিল—

শরীরের ক্ষুধা মাটির মতন
স্বপ্ন তখন সোনার সিঁড়ি,
মানুষ থাকুক সংসারে প'ড়ে
আমরা উড়িব পৃথিবী ছিঁড়ি।
সকাল হয়েছেঃ চাল নাই ঘরে,
সন্ধ্যা হযেছে : প্রদীপ নাই
আমার কবিতা কেউ কেনে নাকো?
তোমার ছবিও ঘুঁটের ছাই?

ছ মাসের ভাড়া পড়ে আছে না কি?
ঘরে নাই তবু চাল কড়ি নুন?
আকাশের নীল পথে পথে তবু
আমার হৃদয় আত্তিলা হূণ
আকাশের নীল পথ থেকে পথে
জানালার পর জানালা খুলে
ভোরের মুনিযাপাখির মতন
কোথায় যে দিতে পাখনা তুলে।

সংসার আজ শিকার করেছে
সোনালি চিলেরা হল শিকার,
আজ আমি আর কবিতা লিখি না
তুমিও তো ছবি আঁক না আর।
তবুও শীতের শেষে ফালগুনে
মাতাল যখন সোনাল বন
তেরোশো ত্রিশ—দারিদ্র্য সেই
ফিরে চাই আজ সে যৌবন

ফিরে চাই আমি তোমারে আবার
আমার কবিতা, তোমার ছবি—
শুধাতাম আমি 'অনুরাধাপুর—'
শুধাইতে তুমি 'শকুন কবি'
সেই যে আকাশ খোঁজার স্বপ্ন
দুখের ছররা—সে যেন ঢিল,
আমরা দুজনে বেগুনি আকাশে
সোনালি ডানার শঙ্খচিল।

কবিতা-নাম ও প্রকাশ সূচী

উল্লেখের সুবিধার্থে বাঁ পাশে কবিতার সংখ্যাক্রম নির্দেশ করা হয়েছে। ডান দিকের সংখ্যা এই বইয়ের পৃষ্ঠাঙ্ক। কবিতার পাশে সাময়িকপত্রে বা অন্যত্র তার প্রথম প্রকাশের সূত্র যত দূর সন্ধান করা গেছে সংকলন করে দেওয়া হল।

ঝ রা পা ল ক। আশ্বিন ১৩৩৪

---

১ পত্রিকায় 'সুদূর বিধুর কবি' নামে।

২ দ্র. সাময়িক পত্রের পাঠ পৃ ৬৮৯।

৩ পত্রিকায় 'শেষ শয্যায়' নামে।

---

৪ 'খুশরোজী' নামে পত্রিকায় প্রকাশিত।
৫ 'পুরোহিত' নামে পত্রিকায় প্রকাশিত।
৬ 'শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন ১৩৪০–এ উল্লিখিত।
৭ দ্র. সাময়িক পত্রের পাঠ পৃ ৬৯৯–৭০০।
৮ ১৩৫৯ সংস্করণে 'বেড়াল' রূপে পরিবর্তিত।

বনলতা সেন : সংযোজন। শ্রাবণ ১৩৫৯

বনলতা সেন : সংযোজন। বৈশাখ ১৩৬১

মহাপৃথিবী। শ্রাবণ ১৩৫১

---

৯ পত্রিকায় 'শ্বেতপত্র' নামে।

১০ দ্র. পাণ্ডুলিপির পাঠ পৃ ৭০৭।

১১ 'আবহমান' ২১-৪০ এই ২০ ছত্র 'জয়শ্রী',ভাদ্র ১৩৪৭এ 'বিচিন্তা' নামে প্রকাশিত তত্রত্য ছত্র ৩৬এ 'এখনও মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়' স্থানে পাঠ 'এখনও মানুষ তবুও প্লিওসিন মানবের মতন দাঁড়ায়।

১২ 'রাত্রি মাখা ঘাসে' নামে 'কবিতা'য় প্রকাশিত।

১৩ দ্র. সাময়িক পত্র ও প্রথম সংস্করণের পাঠ পৃ ৭০৮।

---

১৪ দ্র. পাণ্ডুলিপি বিকল্প পাঠ পৃ ৭১৪।
১৫ 'ময়ূখ' জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যার 'পঞ্জি' থেকে তারিখটি গৃহীত, পত্রের উল্লেখ নেই।
১৬ পত্রিকায় 'বন্ধনী' নামে।
১৭ পত্রিকায় 'সুবিনয়' নামে।
১৮ পত্রিকায় 'ও হৈমন্তিকী!' নামে দ্র. সাময়িকপত্রের পাঠান্তর পৃ ৭১৫।
১৯ পত্রিকায় 'মনোবীজ' নামে প্রকাশিত।

শ্রে ষ্ঠ ক বি তা। বৈশাখ ১৩৬১

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অগ্রন্থিত কবিতা কয়টি মাত্র এই পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে।[২২]

---

২০ মৃত্যুর পব 'দুর্দিন' নামে পূর্ব–পাঠ অপব কয়েকটি পত্রিকায মুদ্রিত। দ্র.সাময়িকপত্রেব পূর্ব–পাঠ ও পাণ্ডুলিপির পাঠ পৃ ৭১৭।

২১ পত্রিকায 'ছায়া, ছবি, দিব্যযোনি' নামে।

২২ অগ্রন্থিত এই ১২টি সদ্য রচনাব আগে পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের ৫৪টি কবিতা, এবং তার দু'খানিতে ৩টি করে ৬টি নতুন সংযোজন নিয়ে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় মোট ৬০ কবিতা নিম্ন-ক্রমে গৃহীত হয় :

'ঝরা পালক' ২, ২৭, ৩৩

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ৫১, ৪২, ৩৬, ৪৩. ৪৪, ৩৭, ৩৮, ৪৯, ৫০, ৫২

'বনলতা সেন' ৭৪, ৮২, ৫৩, ৭২, ৭৩, ৬৬, ৭৭, ৭৯, ৮০

'ব. সে.' সংযোজন ৮৩, ৮৪, ৮৫

'মহাপৃথিবী' ৭৬, ৯২, ৫৮, ৮৭, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬২, ৬১, ৯৫

'ম. পৃ.' সংযোজন ১০৮, ১০৯, ১১০

'সাতটি তারার তিমির' ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৯, ১২৩, ১২৯, ১২৪, ১২৫, ১৪৩, ১৪৮, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৫, ১৪৪, ১৪৬, ১৪১, ১৩০

---

২৩ বিন্দু চিহ্নিত লেখা কয়টি 'ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে কিংবা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নি,   বলে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় উল্লেখ ছিল।

২৪ মূল ও সংযোজন মিলে 'রূপসী বাংলা'র ৭৩টি কবিতাব ৪টি কবিতা পাণ্ডুলিপিতে নামাঙ্কিত।
১০টি কবিতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বলে জানা যায়, যথাক্রমে
১৬৫ 'তোমবা যেখানে সাধ....' ইত্যাদি 'রূ. বাং.' ৩ সংখ্যক কবিতা। অনুক্ত, আশ্বিন ১৩৬৩ ৩৪৯
১৬৬ 'বাংলার মুখ আমি দেখিযেছি' ইত্যাদি 'রূ. বাং.' ৪ সংখ্যক। " ৩৫০
১৬৯ 'আকাশে সাতটি তারা.....' 'রূ. বাং.' ৭ সংখ্যক। একক শারদীয় ১৩৬৩ ৩৫১
১৭৮ 'আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির তীরে...' 'রূ. বাং.' ১৬ সংখ্যক। দেশ, ৫ ফাল্গুন ১৩৬২
১৮৩ তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে' 'রূ. বাং.' ২১ সংখ্যক। অগ্রণী, আশ্বিন ১৩৬৩
২০৪ 'এক দিন যদি আসি....'রূ. বাং.' ৪১ সংখ্যক কবিতা। অনুক্ত, আশ্বিন ১৩৬৩ ২২৭
২০৫ 'দূর পৃথিবীব গন্ধে....' ইত্যাদি 'রূ. বাং.' ৪৩ সংখ্যক।
২১১ 'মানুষের ব্যথা আমি পেযে গেছি...'ইত্যাদি 'রূ. বাং.' ৪৯ সংখ্যক।
কবিতা আশ্বিন ১৩৬৩ ৩৭৬
২১২ 'তুমি কেন বহু দূরে....'ইত্যাদি 'রূ. বাং.' ৫০ সংখ্যক। দেশ, ৩২ শ্রাবণ ১৩৬৪ ৩৭৭
২৩০ 'কেমন বৃষ্টি ঝরে....' ইত্যাদি 'রূ. বাং.' সংযোজন ৮ সংখ্যক। ময়ূখ, শারদীয় ১৩৬২ ৩৯৩

অ ন্যা ন্য ক বি তা ১৩২৬–

২৫ দ্র 'ময়ূখ' জীবনানন্দস্মৃতি সংখ্যা পঞ্জি।
২৬ জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্র কর্তৃক পাবনা থেকে প্রকাশিত।
২৭ কিরণশঙ্কব সেনগুপ্ত-সম্পাদিত পাক্ষিক পত্র, ঢাকা।
২৮ পুনর্মুদ্রিত, কবিতা, আষাঢ় ১৩৬২।
২৯ 'মিছিল' সতীকুমার নাগ ও শতদল গোস্বামী সম্পাদিত কবিতা-সংকলন।
৩০ ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

---

৩১ পবে 'প্রাণবৃক্ষ' নামে 'অনুক্ত', চৈত্র ১৩৬৩ সংখ্যায় পুনরায় মুদ্রিত। 'অনুক্তে'র পাঠে তৃতীয় স্তবকে এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়

কোথায় ডুবিয়ে যায় তারা সব—কেমন সফল।
অগ্নিব উৎসের মতো সৃষ্টির নির্ঝর থেকে জেগে
আমারও শবীর মন গাছ হযে চারি দিকে মেঘে
মিছে আছে নীলিমায় নব নব হরিতের নিবিড় আবেগে।

'জীবনে অনেক দূব'এব পাঠ 'আলোক পৃথিবী' (প্রকাশ : ১৩৮৮) কাব্য থেকে গৃহীত। দ্র. পাদটীকা ৩২।

৩২ 'মাথাব ওপর দিযে' নামে পুনর্মুদ্রিত, 'পূর্বপত্র,' ফাল্গুন ১৩৬৭

৩৩ এই বইয়ের যথাক্রমে ৪৭০–৪৮০, ২৯৬, ৪৮১–৪৮৬ সংখ্যার আঠারোটি কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দ্বিতীয় সংস্করণ বইয়ের নতুন কবিতা রূপে গৃহীত হয়, দ্র 'ধূসর পাণ্ডুলিপি,' প্রথম সিগনেট সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৩ 'অপ্রকাশিত কবিতা'-পর্যায় পৃ ৮৫–১০৭। ভূমিকায় উল্লেখ আছে, 'দুখানি খাতা...থেকে মোট পনেরোটি কবিতা এ সংস্করণে সংযোজিত হল। "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র সুর ও সাময়িকতা যে সব কবিতায় মোটামুটি প্রখর, সেই সব কবিতাই অগ্রাধিকার পেল।' খাতা দুটি অগ্রহায়ণ–পৌষ ও মাঘ ১৩৩৮ এর দুখানি খাতা। পনেরো গণনা অবশ্য চারটি কবিতাকে একটি কবিতায় গ্রথিত করার ফলে। সংযোজিত সব কয়টি কবিতাই সম্পাদক নামাঙ্কিত করে দেন, 'নদী' নামে 'কবিতা' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৩–এর একমাত্র প্রকাশিত কবিতাটিরও 'নদীরা' এই নাম পরিবর্তন হয়।

অতঃপর এই বইয়ের ২৯৫, ২৯৮, ৩০২, ৩০৪–৩০৭, ৩১৫–৩১৭, ৩১৯, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৭, ৩৪৬, ৮৩, ৪১৫, ৩৩৮ সংখ্যার উনিশটি কবিতা এই উল্লিখিত ক্রমে 'মহাপৃথিবী' নতুন সংস্করণে 'আমিষাশী তরবার' নামে পর্যায়ে সংযোজিত হয়। জীবনানন্দেরই একটি কবিতার নামে (৩০৭ সংখ্যক) এই পর্যায়-নাম। দ্র 'মহাপৃথিবী' প্রথম সিগনেট সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ ৫৭–৮৪।

৩৪ মানসী' এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত।

৩৫ ৩৬২, ৪৯৫, ৪৪৩, ৫০৪, ৫২০, ৪৬৯, ৩৮৪, ৪৮৯, ৫০১, ৫১২, ৪৬৬, ৪০৫, ৩৯৭, ৩৫১, ৩৮৫, ৪৯৬, ৪৯১, ৪৯০, ৪০১, ৩৫০, ৪৩৭, ৩৬১, ৫০৯, ৫১০, ৫১৯, ২৯১, ২৯২, ৪১৯, ৩৮৮, ৩৯৯ (অংশ) ৪৯৮, ৫১৪, ৩৭৩, ৩৭৪, ৪০৩, ৪০৬, ৪২৬, ৪৫৬, ৪৬২ ও ৪৯৯ সংখ্যার চল্লিশটি কবিতা এই ক্রমে 'সুদর্শনা' নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়, সাহিত্য সদন, ভাদ্র ১৩৮০ পৃ ১২ + ৫২। ভূমিকায় সংকলনকারী গোপালচন্দ্র রায় বইখানিকে জীবনানন্দের অগ্রন্থভুক্ত প্রেমের কবিতার সংকলন গ্রন্থ' বলে উল্লেখ করেন।

. ২২৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪০৬, ২১১, ৪০৩, ৪২৫ (অংশ), ৪৫০, ৪৬০; ৪৬২, ৩২৮, ৩৬১, ৪১২, ৪৬৫, ৫২৩, ৫৩৪, ৩৫৮, ৩৮৭, ৩৭৪, ৪৫৩, ৩৬৭, ৩৭৩, ৪৬১, ৫০০, ৩৯৪, ৫৩৫, ৩৯০, ৪৩০, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪১, ৫০০, ৪৩০, ৪২৯, ৪৪০, ৫২৪, ৫১০, ৪১১, ৫২৫, ৪১৯, ৪৪৪, ৪৩৬, ৪০৬, ৪৫৮, ৪৩৭, ৪৯৫, ৫০২, ৫০৬, ও ৫১৫ এই ক্রমে উনপঞ্চাশটি কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, দ্র 'মনবিহঙ্গম' বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কার্তিক ১৩৮৬, পৃ ৫৬। ভূমিকায় লেখা হয়েছে, '১৯৩৪ থেকে ১৯৫৪ এই কুড়ি বছরের লেখা থেকে কিছু কিছু নির্বাচিত কবিতা এই গ্রন্থে সংযোজিত হল। কবিতাগুলি যথাসম্ভব রচনার কালক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে।' ভূমিকা সম্ভবত প্রকাশকের, সম্পাদক বা সংকলয়িতার নাম নেই।

'মনবিহঙ্গমে'র ২১১ ও ২২৬ সংখ্যার লেখা 'রূপসী বাংলা' কাব্যের ৪৯ ও সংযোজন ৪ নম্বর কবিতা, ৩৭৩, ৪০৩, ৪০৬, ৪৩৭, ৪৪৩, ৪৬২, ৪৯৫, ৫০৪ ও ৫১৪ সংখ্যার নয়টি লেখা পূর্বে 'সুদর্শনা' (ভাদ্র ১৩৮০) কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৪৪৯, ২৯৭, ৩০০, ৩১০–৩১২, ৩২৩, ৪৪৭, ৩৪৭, ৩২২, ৩২১, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৩৬, ৩৬৫, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৪৪, ৩৫৬, ৩৫৩, ৪২৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৫৭, ৩৭৫, ৩৭২, ৩৬৯, ৩৬৪, ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৭৭, ৩৭০, ৫১৬, ৩৭১, ৩৭৬, ৩৮০, ৩৮১, ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৯৯, ৪০০, ৪০২, ৪০৭, ৪১০, ৪১৪, ৪২৪, ৪২২, ৪২৯, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪০, ৪৩৮ (অংশ), ৪৪৮ ও ৪৩৬ সংখ্যার বাষট্টিটি কবিতা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্র 'আলোপৃথিবী', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ফাল্গুন ১৩৮৮, পৃ ৮ + ৮৭। ভূমিকা অশোকানন্দ দাশ-কৃত। 'এই কাব্যগ্রন্থ ১৩৪৪ থেকে ১৩৬১ এই আঠারো বছরের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা সংযোজিত হল' বলে ভূমিকায় উল্লেখ আছে।

৩৬ 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার।' রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ঢাকা ১৩৭৬।

৩৭ 'জীবনানন্দ সমগ্র' প্রথম খণ্ডে সংকলিত।

পরিশিষ্ট ১ ২ ৩

পাণ্ডুলিপি

১৯৩১ থেকে ১৯৫৪র মে-জুন মাস পর্যন্ত সংরক্ষিত জীবনানন্দের আটচল্লিশটি কবিতার খাতায় এই বইয়ের যে সব লেখার পূর্ণ, খণ্ডিত বা খসড়া পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার বিবরণ এখানে খাতার নম্বর ধ'রে, আবার পর পর বই ধ'রে কালানুক্রমে সংকলন করে দেওয়া হল। কোনো কোনো লেখার নকল একাধিক খাতায় অংশত, অবিকল বা পাঠান্তরে লিখিত আছে, তারও সাধ্যমতো সন্ধান এখানে দেওয়া হয়েছে।

সংকেত

ধূসর পাণ্ডুলিপি = ধূ পা
ধূসর পাণ্ডুলিপি সংযোজন ১৯৫৬ = ধূ পা. সং
বনলতা সেন, ১৯৫২ ও ১৯৫৪র সংযোজন সহ = ব
মহাপৃথিবী= ম
মহাপৃথিবী সংযোজন ১৯৬৯ = ম. সং
সাতটি তারার তিমিব = সা তা তি
শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৫৪ = শ্রে ক
রূপসী বাংলা, ১৯৮৪র সংযোজন সহ = রূ
বেলা অবেলা কালবেলা = বে অ কা

বিবরণের সংকেত-বর্ণহীন সংখ্যা 'অন্যান্য কবিতা' পর্যাযের বাকি কবিতার সংখ্যা।

খাতা ৩। পৌষ-মাঘ ১৩৩৮, ডিসেম্বর ১৯৩১-ফেব্রুযারি ১৯৩২
ধূ পা ৫০
ব ৫৪
ধূ পা. সং ২৯৬, ৪৮০-৪৮৬
৩০৩, ৪৬৯, ৪৯৮

খাতা ৪। ১৯৩১-১৯৩২
ধূ পা ৪৪

খাতা ৫। অগ্রহাযণ-পৌষ ১৩৩৮, নভেম্বব ১৯৩১-জানুযারি ১৯৩২
ব ৮২
ধূ পা. সং ৪৭০-৪৭৯
৫৪০

খাতা ৬। মার্চ ১৯৩৪
রূ ১৬৩-২৩৫

খাতা ৭। মার্চ-এপ্রিল ১৯৩৪
ব ৬৯, ৭৩-৭৫, ৮১
ম ৮৬, ৯৪
বে অ কা ২৭০

খাতা ৮। ১৯৩৪
ব ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬২-৬৩, ৭৬
ম ৯৩, ১০০
ম. সং ২৯৫
৪৬৩, ৪৬৪

খাতা ৯। ১৯৩৪
ধূ পা ৫১'
ব ৫৮
ম ৯৫

৪৮৮

খাতা ১০। ১৯৩৪–১৯৩৬

ব ৫৭, ৬১

ম ৮৭

২৯৭, ৪৬০, ৪৬২

খাতা ১১। এপ্রিল ১৯৩৬

ব ৬৬

সা তা তি ১১৭, ১১৮

বে অ কা ২৭৪

৩০৮, ৪২৭, ৫০২, ৫০৫, ৫০৭, ৫০৮

খাতা ১২। এপ্রিল ১৯৩৬

ব ৬৪, ৬৭, ৭১

ম ৮৮, ৯০–৯২, ৯৬–৯৮, ১০২

সা তা তি ১১৩, ১১৯

বে অ কা ২৭১

ম. সং ২৯৮

৩৪৮, ৪৩৭, ৪৫০, ৫০৭

খাতা ১৩। জুন ১৯৩৭

ম ১০৪

৪৯৯

খাতা ১৪। অক্টোবর ১৯৩৭

ম ৯৯

৪৯০

খাতা ১৫। ডিসেম্বর ১৯৩৭

সা তা তি ১১৬

খাতা ১৬। মার্চ ১৯৩৮

সা তা তি ১২০

২৯৯

খাতা ১৭। এপ্রিল ১৯৩৮

সা তা তি ১১৫, ১২১

বে অ কা ২৪৮

ম. সং ৩১৫–৩১৭

৩০১

খাতা ২০। নভেম্বর ১৯৩৮–জানুয়ারি ১৯৩৯

সা তা তি ১১২, ১১৯

বে অ কা ২৫৭

ম. সং ৩০২, ৩০৪–৩০৭, ৩১৯

৩১০–৩১৪, ৩৪৭

খাতা ২১। নভেম্বর ১৯৩৮–মে ১৯৩৯

ম ১০৫

৩০৯, ৫২৫–৫২৭

খাতা ২২। মে ১৯৩৯

ম. সং ৩৩২

খাতা ২৩। জুন–সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

সা তা তি ১২২

৩২৬, ৩২৮

খাতা ২৪। ১৯৩৬, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৫০

বে অ কা ২৭১, ২৭৩

৪১৯, ৪২২, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৫৬, ৪৬১

৪৬৫, ৪৮৭, ৫৩৪

খাতা ২৫। অক্টোবর ১৯৩৯–জানুয়ারি ১৯৪০

ব ৮৩

সা তা তি ১২৩

৩১৮, ৩২০

খাতা ২৬। জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

সা তা তি ১৩৫

৩২১, ৩২৩

খাতা ২৭। জানুয়ারি–মে ১৯৪০

সা তা তি ১৩১

বে অ কা ২৪৯

৩২৩

খাতা ২৮। মে ১৯৪০

৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৬, ৫১১, ৫২২

খাতা ৩০। জুন–সেপ্টেম্বর ১৯৪০

ব ৭০

সা তা তি ১২৪

ম. সং ৩২৯, ৩৩০

৩২২, ৩২৪

খাতা ৩২। অক্টোবর–ডিসেম্বর ১৯৪০

ব ৮৪

সা তা তি ১২৫, ১২৬

৩৪০

খাতা ৩৩। ডিসেম্বর ১৯৪০–মে ১৯৪১

ম ১০৬ (১,২), ১০৮, (৩, ৪)

সা তা তি ১২৮, ১৩০, ১৩৩

বে অ কা ২৩৮, ২৪৭

খাতা ৩৪। মে–অগস্ট ১৯৪১

ম ১০৮ (১,২)

সা তা তি ১১৪, ১২৭, ১৩২, ১৩৪

৩২৫, ৩৪১

খাতা ৩৫ ক। অগস্ট ১৯৪১ মার্চ ১৯৪২

ম ১০৬ (৩), ১০৭, ১০৯, ১১০

সা তা তি ১২৭, ১২৯

বে অ কা ২৪৫, ২৪৬

ম. সং ৩৩৭

৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৩

খাতা ৩৫ খ। মার্চ–এপ্রিল ১৯৪২/সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ১৯৪৩

সা তা তি ১৩৭–১৪৫, ১৪৮–১৫০

বে অ কা ২৪৪, ২৫০, ২৫২

শ্রে ক ১৫২, ১৫৬

৩৩৪, ৩৪৩–৩৪৫, ৩৫০, ৩৬৪, ৩৬৫

খাতা ৩৬। মার্চ–এপ্রিল ১৯৪২/ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫/ মে ১৯৪৫
সা তা তি ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭
বে অ কা ২৪৩, ২৪৪, ২৫০, ২৫৩, ২৫৬, ২৫৯
শ্রে ক ১৫২
৪৪৮

খাতা ৩৭। মে–জুন ১৯৪৫/সেপ্টেম্বর ১৯৪৫
বে অ কা ২৩৮, ২৩৯, ২৬১
শ্রে ক ১৫১
৩৫১, ৩৫৫

খাতা ৩৮। অক্টোবর ১৯৪৫–জানুয়ারি ১৯৪৬
বে অ কা ২৫৪, ২৫৫
৩৫৬, ৩৬১, ৪১২

খাতা ৩৯। অক্টোবর ১৯৫০/১৯৪৫–১৯৪৬/নভেম্বর ১৯৫১
বে অ কা ২৪১, ২৬৭, ২৭৩
ম. সং ৩৩৮
৩৮৫–৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৯, ৪১১
৪১৪, ৪১৬, ৪৩৫, ৪৫৫, ৪৫৬, ৫২১, ৫৩৫

খাতা ৪০। সেপ্টেম্বর ১৯৪৬
বে অ কা ২৩৬, ২৪০, ২৫১, ২৫৮, ২৬০, ২৬৪–২৬৬
শ্রে ক ১৫৪, ১৫৭
৩৫৮, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৮–৩৭২, ৩৭৪, ৩৮১, ৪০১
৪০৩, ৪২১

খাতা ৪১। জুন ১৯৪৬
বে অ কা ২৬৯
৩৫৪, ৫১৯, ৫৩২

খাতা ৪২। সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ১৯৪৬/মে–জুন ১৯৪৭/জুন ১৯৪৬/১৯৪৫–১৯৪৬
ব ৬৫, ৭৭, ৭৮, ৮০
বে অ কা ২৩৭, ২৬২, ২৬৯
শ্রে ক ১৫৫
৩৬৭, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৮, ৪০২, ৪৫৩, ৪৯১, ৫১৯, ৫৩২

খাতা ৪৩। মে–জুন ১৯৪৭
ব ৬৫, ৬৮, ৭৭–৮০
শ্রে ক ১৫৩, ১৫৫
৩৭৩, ৪২০, ৪৮৭, ৫০০

খাতা ৪৪। নভেম্বর ১৯৫১–সেপ্টেম্বব ১৯৫২
শ্রে ক ১৬০, ১৬১
৩৯৯, ৪১৩, ৪১৮, ৪৩১, ৪৩২, ৪৪১, ৪৪২-৪৪৪, ৪৫৪, ৪৮৯, ৫০১, ৫০৪,
৫০৯, ৫১০, ৫১২, ৫১৩, ৫২০, ৫২৯–৫৩১

খাতা ৪৫। নভেম্বর ১৯৫১–সেপ্টেম্বর ১৯৫২
শ্রে ক ১৬২
৩৯০, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪১০, ৪২০, ৪২২, ৪৩০, ৪৩৪, ৪৪২, ৪৪৪
৫১৪–৫১৬, ৫২০, ৫৩৫

খাতা ৪৬। মে–জুন ১৯৫৪
৪২১, ৪৪৫, ৪৪৬

প্রথম ছত্রের সূচীপত্র
